

উদ্বোধন

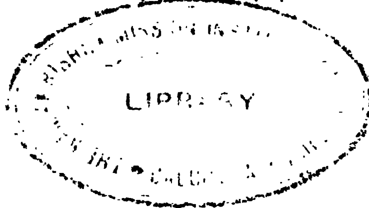
বর্ষসূচী

৫৬ম বর্ষ

(১৩৬০ মাঘ হইতে ১৩৬১ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মূল্য ৫৲ প্রতি সংখ্যা ॥৹

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(বর্ণানুক্রমিক)

(মাঘ, ১৩৬০ হইতে পৌষ, ১৩৬১)



স্বামী বিবেকানন্দ



উপায় আছে

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষো-
র্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য
মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ॥

—শ্রীশঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি—৪৩,৪৬

হে শ্রেয়স্কামী সুধী, ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসারসিন্ধু পার হইবার উপায় রহিয়াছে। যে পথে চলিয়া নির্মলচিত্ত সাধকগণ উহাকে অতিক্রম করিয়াছেন সেই পথেরই সন্ধান তোমায় বলিয়া দিব।

বেদবাণী বলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তির অজ্ঞান-মোহ হইতে মুক্তি লাভ করিবার প্রত্যক্ষ উপায় হইতেছে শ্রদ্ধা—গুরু এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের বাক্যে (শাস্ত্রে) বিশ্বাস; ভক্তি—জীবনের পরম আদর্শের উপর গভীর ভালবাসা আর ধ্যানযোগ—অন্তরতম চৈতন্য-সত্তায় মন সমাধান করিয়া উহার সহিত তাদাত্ম্য-বোধের চেষ্টা। এই সাধনসমূহ যিনি অবলম্বন করিয়া চলেন অজ্ঞান-কল্পিত দেহবন্ধন তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। (দেহে থাকিয়াও তিনি জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মসত্যের জ্ঞান লাভ করেন। ইহারই নাম মোক্ষ।)

কথাপ্রসঙ্গে

পশ্চাতে ও সম্মুখে

উদ্বোধনের ৫৩ তম বর্ষ আরম্ভ হইল।

পত্রিকার এই নূতন বৎসরের প্রারম্ভে সকল পাঠক-পাঠিকার সহিত আমরা শ্রীভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। বাক্যের মধ্য দিয়া, অবশেষে বাক্যকে অতিক্রম করিয়া আমাদের বচনাতীতকে ধরিবার সাধনা—মননকে সহায় লইয়া, পরিশেষে উহাকে স্তম্ভিত করিয়া 'সর্বচিন্তা-সমুত্থিত' 'দুর্দর্শ অতিগম্ভীর সাম্য'[1]-রূপ পরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা। বাক্য ও মনন উভয়েই উপায় মাত্র—উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়া থাকি, লক্ষ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততায় যদি কোন ফাঁকি না ঢুকিয়া থাকে, তাহা হইলে কথা ও পর্যালোচনার প্রচুর সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইব। পুরাতন বিষয়ও আমরা নূতন করিয়া ভাবিতে শিখিব—ভাবিয়া নূতন শক্তি, উদ্দীপনা লাভ করিতে পারিব।

ভাবগুলিকে কর্মে রূপ দেওয়াই তো আসল কথা। আদর্শকে জীবনে ফুটাইয়া তোলাই আমাদের প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে কত কথাই তো শুনিয়া আসিয়াছি, বলিয়া চলিয়াছি—জীবন-ভোর কত চিন্তা ও আবেগরাশির সহিত পরিচিত হইয়াছি—কিন্তু কয়টি বাণীকে আমরা আমাদের জীবন-বাণী করিতে পারিলাম? কয়টি শুভ চিন্তাকে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিতে সমর্থ হইলাম? ইহাই আমাদের দুর্বলতা, ব্যর্থতা। বাক্যের মর্মশক্তি আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া যায়, কল্পনার দূর-প্রসারী মঙ্গল সম্ভাবনা আমাদের আলস্য ও ঔদাস্য দেখিয়া বেদনায় মুখ ঢাকে। কবে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবে? কবে বাক্যকে সত্য করিতে আসিবে চিত্তের একতানতা, কল্পনাকে বাস্তব মূর্তি দিতে উদগ্র আগ্রহ, লক্ষ্যের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ, শ্রেয়ঃকে অনুসরণ করিবার জন্য নির্ভীক অধ্যবসায়?

পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনই এক দিনে (১লা মাঘ, ১৩০৫) আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে পশ্চাতে ও সম্মুখে তাকাইবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। আফশোষ করিয়া বলিয়াছিলেন[2]— "ইউরোপ, আমেরিকা যবন (প্রাচীন গ্রীক)-দিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।" কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাসও অবিচলিত ছিল যে—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"

এই 'পৈতৃক শক্তির পুনঃস্ফুরণের' জন্য পশ্চাতে দৃষ্টিপাত অপরিহার্য। আর্যসংস্কৃতির উপর অন্ধ অনুরাগ নয়—উহার মধ্যে যাহা বলিষ্ঠ, যাহা চিরন্তন তাহা বিচার করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহসের সহিত অনুশীলন। ইহা শুধু ভারতবাসীর নিজেদের জন্যই যে প্রয়োজন তাহা নয়, সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন। ভারতের এই 'পৈতৃক শক্তি' সত্যই এক অমূল্য সম্পদ। অতীত কালে ভারতবর্ষের এই সম্পদের ভাগ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জগতের অন্যান্য নরনারীও কমবেশী পাইয়া আসিয়াছে। এখন আবার ব্যাপকভাবে সেই ভাগ দিবার সময় উপস্থিত। সারা বিশ্ব ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

১ গৌড়পাদ, মাণ্ডুক্যকারিকা—৩।৩৭, ৪।১০০

২ নিম্নের এবং এই নিবন্ধের পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলিও উদ্বোধনের প্রথমবর্ষের প্রথমসংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'প্রস্তাবনা' হইতে।

কিন্তু 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'র—ভস্মকে সর্বাগ্রে অপসারণ করিতে হইবে। তবে তো 'বহ্নি' সকলের কাজে লাগিবে। ভস্ম কি?—তামসিকতা।

"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধূয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে; সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

পঞ্চান্ন বৎসর পরে আজ চিত্র কিছুটা বদলাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও প্রচুর পরিবর্তন বাকী। এই পরিবর্তনের জন্য স্বামীজী আমাদিগকে "পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি" আনিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জাতি-সমূহের "উদ্যম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভর, কার্যকারিতা, একতাবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণা" চরিত্রে সঞ্চার করিবার কথা বলিয়াছিলেন। এই 'সম্মুখে'র সাধনাই জাতিকে সবল করিবে—সেই সবল জাতিই নিজস্ব উত্তরাধিকারকে পরিমার্জিত, পরিরক্ষিত ও পরিপ্রসারিত করিতে পারিবে।

সম্মুখ ও পশ্চাতকে এই ভাবে সমন্বিত করিতে পারিলেই 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—স্বামীজীর উক্তি সার্থক হইতে পারে। আমরা গত পঞ্চাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ধরিয়া এই পশ্চাত ও সম্মুখের মিলনের চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। নূতন বৎসরেও ইহাই থাকিবে আমাদের অকুণ্ঠিত ব্রত। সম্মুখের দিকে পরম উৎসাহে আমরা আগাইয়া যাইব কিন্তু পশ্চাতের ধ্রুব প্রশান্তি সম্মুখের কর্মচাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রিত করুক—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সংসারের দিকে আমরা চোখ বুজিয়া থাকিব না কিন্তু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বানুভূতি ইন্দ্রিয়গোচরকে ধরিয়া রাখুক—যাহা বাক্যমনাতীত তাহা আমাদের বাক্য ও চিন্তা-রাশিকে পরমলক্ষ্যের দিকে চালাইয়া লইয়া যাক।

স্বামীজীর জন্মদিনে

আগামী ১২ই মাঘ, (২৬শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার) পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মদিন। প্রতি বৎসর ভারতের নানাস্থানে এই সময়ে স্বামীজীর নামে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জনৈক লেখক একবার 'ক্লাসিক্‌স্' শব্দটির সংজ্ঞা, রহস্যচ্ছলে এই ভাবে দিয়াছিলেন,—'ক্লাসিক্‌স্' সেই জাতীয় গ্রন্থ যাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধার অন্ত নাই, কিন্তু যাহা কেহ পড়ে না! মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও বোধ করি এই কথা খানিকটা খাটে। মহা-পুরুষ তিনি যাঁহাকে আমরা পূজা করি কিন্তু যাঁহার কথায় কর্ণপাত করি না! স্বামীজীকেও যদি আমরা এই পর্যায়েরই মহাপুরুষের মধ্যে ফেলি তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের কথা। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়া উচিত অতন্দ্রিত জনসেবায়—পুষ্পমাল্যে, ধূপদীপে, স্তুতি-বক্তৃতায় নয়। তিনি ভারতের সাধনার রূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন দুটি ছোট কথা দিয়া—ত্যাগ ও সেবা। দশের জন্য, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ—নিজের ক্ষুদ্র অভিমান, ভোগলিপ্সা বর্জন আর ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞানে আর্ত, বুভুক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণের বৈষয়িক ও পারমার্থিক অভাবমোচনের চেষ্টা। এই কার্যপন্থাদ্বয় রাজনীতি-নিরপেক্ষ, দল-মতবাদ-সম্প্রদায়-ধর্মের সহিত জড়িত নয়। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীকে স্বামীজী ইহাও তারস্বরে শুনাইয়াছিলেন যে, এই দুটি কর্মরীতিই

এ যুগের সর্বজনীন 'ধর্ম'। গভীর বিশ্বাস লইয়া যাহারা এই ধর্মের অনুশীলন করিবে তাহাদের ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ সাধনার ফল লাভ হইয়া যাইবে।

স্বামীজী স্বাধীন ভারত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—কিন্তু পরাধীন ভারতের স্বাতন্ত্র্য-লাভের সম্ভাবনাসম্বন্ধে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আরও সংশয় ছিল না ভারতের আগামী ভবিষ্যৎসম্বন্ধে। ইতঃপূর্বে ভারত বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু গত কয়েক শতাব্দীতে ভারতের যে পতন হইয়াছিল, স্বামীজী বলিতেন, তাহা অতি মর্মান্তিক। তবে আশার বিষয় এই যে, ভারতের ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। অমানিশা কাটিয়া যাইতেছে। ভারত আবার উঠিতেছে—আবার তাহার সম্মুখ-যাত্রা শুরু হইয়াছে। এই যাত্রা সহজে থামিবে না। অনাগত দুরবর্তী শতাব্দীগুলিকে প্রজ্ঞানেত্রে নিমেষে যেন সমীপাগত দেখিয়া স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—

"এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়; এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।"

(ভাববার কথা—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

এই ভবিষ্যতকে সত্য করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রহিয়াছে আমাদের বর্তমানকালীনগণের উপরই। স্বাধীন ভারতে জনসেবার কী বিপুল ক্ষেত্র চারিদিকে পড়িয়া! কে সঙ্গে আসিল, না আসিল সেদিকে না তাকাইয়া স্বামীজীর দেশাত্মবোধ ও ভারতপ্রীতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া শরীর মনের সামর্থ্যানুযায়ী যে কোন সেবার ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া যুবকগণ কাজে নামিয়া পড়িবেন, স্বামীজীর অশরীরী প্রেরণা তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে। যত শীঘ্র ভারতের ঐহিক দুর্গতি, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষার অবসান ঘটিবে ততশীঘ্র তাহার প্রকৃত জীবন—আত্মিক জীবনের বিকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইবে। ঐ জীবনের 'সমুজ্জ্বলতার' ইঙ্গিতই স্বামীজী দিয়াছিলেন।

নিরুপায়?

গত ১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) হায়দরাবাদে ভারতীয় সমাজ-সেবা-সম্মেলনের এক অধিবেশনে ভারতসরকারের তপশীলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত কমিশনার শ্রী এল এম শ্রীকণ্ঠের ভাষণের শেষাংশ বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি বলিতেছেন—

"বিভিন্ন উপজাতির উপর খৃষ্টান মিশনারীদের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আসামই উপযুক্ত ক্ষেত্র। লুসাই পাহাড়ে শতকরা প্রায় ৮০ জন উপজাতি ধর্মান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে শতকরা ৩০ জন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। আসামের অন্যান্য স্থানে উপজাতিদিগকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ এখনও চলিতেছে। বিহার ও মধ্য-প্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ। * * আসামের উপজাতিরা তাহাদের সঙ্গীতে ইংরেজী সুর মিশাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চার্চে যাওয়ার সময় নিয়মিত ভাবে বিদেশী পোষাক পরিতেছে। উপজাতিরা যে ধর্ম পরিবর্তনের প্রতি গভীর আগ্রহহেতু ধর্মান্তরিত হইতেছে, তাহা নহে। অর্থ, পদ, জীবন ধারণের উচ্চমান প্রভৃতির লোভ দেখাইয়াও তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করা হইতেছে। নৃতত্ত্ববিদ্ বা অন্যান্য লোকে এই ধরণের প্রচারকার্য পছন্দ করুন বা না করুন, ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এইরূপ প্রচারকার্য বন্ধ করা সম্ভব নয়।"

শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ মহাশয়ের উক্তিতে যেন একটা নিরুপায়তার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বড় করুণ সুর! ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত জিনিস সন্দেহ নাই—ভারতবাসী কেহ যদি আপন রুচি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতের মাটির বাহির হইতে আমদানী করা কোন ধর্মকে স্বেচ্ছায় বরণ করে তাহাতে চিরকাল পরমতসহিষ্ণু হিন্দুদের বলিবার কিছু নাই।

কিন্তু "অর্থ, পদ, জীবনধারণের উচ্চমান প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া" ধর্মান্তরিতকরণের সক্রিয় প্রতিরোধ হিন্দুদের তো বটেই—শতকরা ৮৫ জন হিন্দু জনসংখ্যাযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রচালকগণেরও অপরিহার্য কর্তব্য। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হউক ভাল কথা, কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মের রক্ষকত্বের দায়িত্ব এড়াইবে কি করিয়া? রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী পর্যন্ত কেহই খ্রীষ্টান গির্জার অনাহূত অবাঞ্ছিত প্রভাবকে সমর্থন করেন নাই।

শ্রীকণ্ঠজী উপসংহারে বলিয়াছেন—

"আমার ইচ্ছা, আমাদের দেশের যুবকগণ যেন খৃষ্টান মিশনারীদের জনসেবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং দুর্গম স্থানের অবহেলিত অধিবাসীদের নিকট আশা ও আনন্দের বাণী প্রচার করেন। আমার মনে হয়—এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ এবং দেশভক্ত ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন।"

খাঁটি কথা।

ছন্দে উপাসনা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কৈশোর হ'তে কবিতা লিখ্ছি, প্রভু এক তুমি ছাড়া
যাহা কিছু ছিল বিষয়বস্তু সব করিয়াছি সারা।
তাই বন্ধুরা কয়,
এখন কেবল পুনরাবৃত্তি হয়।
নিজেরো আমার ভাল লাগে নাক আর
একই কথা শুধু বলি আর কত বার?
এক তুমি আছ বাকী,
বন্ধুরা বলে তোমাকে লইয়া কবিতা হয় না নাকি!
না হোক কবিতা, কারো কথা শুনিব না,
তোমার কথাই ছন্দে রচনা হোক মোর উপাসনা।
ভক্তি কোথায় পাব?
ভক্তিমন্ত্র লইতে কোথায় যাব?
এক বাজিকর, বাজি ছাড়া তার কিছুই ছিলনা পুঁজি,
বাজি দেখাইয়া জননী মেরীরে, মুক্তির পথ খুঁজি
পেয়েছিল শুনি, সেই সরলতা তার
কোথা পাব আমি? মোর চারিপাশে ঘিরে আছে সংসার।
নাই মোর তপ, নাই মোর জপ, নাইক তত্ত্বজ্ঞান,
জানি না তোমার ধ্যান,
ছন্দোরচনা আছে মোর সম্বল,
আর শুধু আছে নয়নে অশ্রুজল,
ছন্দসূতায় গাঁথিয়া অশ্রুকণা
উদ্দেশে তব নিবেদিব প্রভু, তাই মোর উপাসনা।

'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রূপ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বড় কথা। কত শাস্ত্রে কত মহাপুরুষের বাক্যে জন্মমৃত্যু-চক্রের দূরপ্রসারী বিপদনিচয়ের ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ফলে ঐ চক্রের প্রতি নিঃশ্রেয়সকামীর চিত্তে দারুণ বিতৃষ্ণা অনুভব করিবার প্রেরণা আসিয়াছে! আলোকহীন আশাহীন সহায়হীন পথে যখনই অনিশ্চিততার সংশয় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে তখনই চোখের সম্মুখে নিত্য-ঘটিয়া-যাওয়া জন্মমৃত্যুর নিষ্ঠুর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া অজানা অপাওয়া আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রতি মানুষের ঘুমাইয়া-পড়া ক্ষীণ উৎসাহ পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিয়াছে—পুনরায় অন্তরের মুমুক্ষুটি দৃঢ়স্বরে জপ করিয়া চলিয়াছে—'জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জীবন দুঃখ—সর্বং দুঃখম্।' নিরাশাবাদ!—কিন্তু ভালমন্দ বিচার যতদিন আছে, 'জানি, জানি, আরও জানি,' 'যাই যাই, সত্যের পথে আরও আগাইয়া যাই'—এই আবিষ্কার ও অগ্রগতির স্বপ্ন যতদিন রহিয়াছে ততদিন এই বাদের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বোধ করি কঠিন। মানুষের ভিতর একটি নিদ্রাহীন বৈরাগী চিরদিনই বুঝি জাগিয়া আছে!

তবুও কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের কোন পথচারীই একদিন বলিয়া উঠেন—'জন্মমৃত্যু মোর পদতলে'*—চলিতেছি, কিন্তু জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পার পাইবার জন্য নয়—উহাদের বিভীষিকা চিত্তে আর সন্ত্রাস জাগায় না—জন্মিতে ভয় পাই না, মরিতেও নয়, প্রয়োজন হইলে বহুবার জন্মাইতে পারি, মরিতে পারি।

ইহা একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ—যেখানে সংসারের ঝড়বিপদ দুঃখকষ্টগুলি অন্তরের অপর এক বৃহৎ সংপ্রাপ্তির অনুভূতিতে একান্তই তুচ্ছ হইয়া যায়, মনে হয় এতবড় লাভ যখন অধিকারে আসিয়াছে তখন তাহার জন্য সামান্য একটু দুঃখ সহিতে পারিব না? আসিলই বা আধি ব্যাধি হতাশা প্রবঞ্চনা অপমান আঘাত ক্ষতি মৃত্যু। যে অক্ষয় ধন নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে তাহার এক তিল দিয়া ঐ দুঃখগুলিকে কিনিয়া লইতে পারি, যে অপরিসীম শক্তি সমস্ত আত্মাকে বেড়িয়া আছে উহার এককণা দিয়া যতই কেন প্রচণ্ড অভিশাপ আসুক প্রতিরোধ করিতে পারি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী 'প্রেম'-এর দৃষ্টিভঙ্গী—ভগবান মানুষের দুঃখকষ্টে বিচলিত হইয়া মানুষদেহ ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি—তাই তাঁহার ব্রত আমারও জীবন-ব্রত; তিনি যদি জন্ম-মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করিতে পারেন আমিই বা উহাদের ভয়ে মুষড়াইয়া থাকিব কেন? তাঁহাকে যে আপনার জন বলিয়া পাইয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্মভারের অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—ইহাই তো অমূল্য সম্পদ, অপরাজেয় সামর্থ্য।

অধ্যাত্ম-রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায়—

সুগ্রীব বানরগণকে সীতান্বেষণে পাঠাইয়াছেন। দিকে দিকে বনে বনে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একমাস কাটিয়া গেল—কোন

* "আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্ম-মৃত্যু মোর পদতলে।"
—স্বামী বিবেকানন্দ, 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'

সন্ধান মিলিল না—শরীর ক্লান্ত, প্রাণ নিরুৎসাহ। তখন বানরদের একদল জল্পনা করিতে লাগিল, কেন আমরা এই বৃথা পরিশ্রম করিয়া ফিরিতেছি? রাম আমাদের কে? ঘর সংসার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া তাঁহার জন্য এই খাটিয়া মরিয়া কোন্ পুরুষার্থ আমরা লাভ করিব? নেতা মহাবীর হনুমান তখন ঝঙ্কার দিয়া বুঝাইলেন—

অন্যদ্ গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে সুত।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥
সীতা ভগবতী মায়া জনসম্মোহকারিণী॥

শুন শুন অতি গূঢ় কথা বলি। সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ রামরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন—সীতা তাঁহারই মহাশক্তি—মহামায়া।

আর আমরা?

বয়ং বানররূপেণ জাতাস্তস্যৈব মায়য়া—

তাঁহারই মায়ায় আমরা বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

বয়ন্তু তপসা পূর্বমারাধ্য জগতাং পতিম্।
তেনৈবানুগৃহীতাঃ স্মঃ পার্ষদত্বমুপাগতাঃ॥

পূর্বে জগৎ-পতিকে তপস্যা দ্বারা ভজনা করিয়াছিলাম। আমাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া তিনি অমূল্য ধন দান করিলেন—তাঁহার পার্ষদত্ব—যুগকার্যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও স্বেদ মোক্ষণ করিবার দুর্লভ অধিকার।

তাই তো আসিয়াছি—তাঁহারই জন্য কাঁটার মুকুট পরিয়াছি। তাঁহার কাজ যতদিন না শেষ হইবে ততদিন ছুটি নাই—অতন্দ্রিত অকুণ্ঠিত কর্ম-ব্যাপৃতি—সঙ্কট ব্যথা বেদনা—মৃত্যু, হয়তো বার বার মৃত্যু। তহাতেই বা ভয় কি?

ইদানীমপি তস্যৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া।
পুনর্বৈকুণ্ঠমাসাদ্য সুখং স্থাস্যামহে বয়ম্॥

তাঁহার সেবায় যদি দেহ যায় সে তো পরম মঙ্গল। নিত্য বৈকুণ্ঠে তাঁহার সাহচর্যে নিত্য সুখ—সে ভবিষ্যৎ তো সুস্থির রহিয়াছেই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণ 'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়'—এই উপদেশ সাধিতে পারিয়াছিলেন কোন্ সামর্থ্যে? ভগবান তথাগতের উপর ভালবাসার সামর্থ্যে—তাঁহার জীবন-ব্রত উপলব্ধির গরিমায় নয় কি? যীশুখ্রীষ্টকে যাঁহারা মানব-দরদী ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া মানবসেবার কথা মনে পড়ে। তাঁহারাও কি গাহিতেন না 'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে'?

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভক্তি-মুক্তি লাভ করিবার উপদেশ লইতে যত ব্যক্তি আসিয়া হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্রের -ভাবী বিবেকানন্দের মতো যোগ্য অধিকারী আর কেহই ছিলেন না। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণই বহু বার বহু লোককে বলিয়া গিয়াছেন। তবুও সেই নরেন্দ্রেরই সমাধি-কক্ষের চাবিকাঠি ঠাকুর লুকাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, মায়ের কাজ করিতে হইবে। কাজ শেষ হউক, তাহার পর ঘর খুলিয়া দিব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সারা ভারত ঘুরিয়া এই 'মায়ের কাজের' স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেন। অপর শ্রীরামকৃষ্ণানুগগণের কাছে তিনি যখন উহা ক্রমান্বয়ে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অশিক্ষিত চাষা-ভূষাদের, জেলে মালাদের ইস্কুল করিব তো নিজের ধর্ম কর্ম শিক্ষা হইবে কখন? মরণপথগামী পীড়িতের মুখে জল সাগু ঔষধ দিতে বসিব তো আপনার মৃত্যু-জয়ের সাধনা করিব কোন্ অবসরে? মায়ার সংসারের দশটা ঝামেলা লইয়া মাথা ঘামাইব তো চিত্তকে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সুশান্ত করিব কোন্ ক্ষণে? স্বামীজীকে এ সকল সংশয়ের উত্তর দিতে অনেক কথা বলিতে হইয়াছিল, অনেক তর্ক করিতে, অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল, পরিশেষে ৩৯ বৎসর-পরিমিত অমূল্য জীবন খাটিয়া

শেষ করিয়া দিয়া অবিশ্বাসীদের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখাইতে হইয়াছিল। বেলুড় মঠের দ্বিতলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষটির মেঝেতে ১৯০২ খ্রীঃর ৪ঠা জুলাই ভূমিশয্যায় শায়িত প্রাণ-হীন নিস্পন্দ বিবেকানন্দ-দেহের মুখখানিতে যে স্মিত প্রশান্তি অঙ্কিত ছিল তাহার মৌন ভাষায় কি এই গানই ঝঙ্কৃত হয় নাই—'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে'?

ঐ গীতিই এ যুগের শ্রেয়ঃকামীদের জীবন-গীতি। আত্ম-মুক্তি নয়—বিশ্বমুক্তি, বন্ধনকে ভয় নয়—প্রেমের দ্বারা জয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর আর একটি নূতন ঠাকুর রূপে প্রচার করিতে চাহেন নাই—তাহা যদি চাহিতেন তাহা হইলে যাঁহাকে তিনি 'অবতার-বরিষ্ঠ' বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন তাঁহারই ঘটিত মর্মান্তিক অপমান। স্বামীজীর ধ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মানব-সভ্যতার আদি জননী ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের ভাব-মূর্তি—আবার ভারতের আগামী কালের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থানের জীবন্ত প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের যাহা 'মিশন'—উহাকে যদি ভালবাসিয়া থাকি তো সেই ভালবাসার পরিচয় দিব কি করিয়া? শুধু 'আহা উহু' করিয়া, 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' বলিয়া—না, জন্ম-মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই 'মিশন' এর জন্য নিঃশেষে আত্ম-বলিদান করিয়া?

হে রামকৃষ্ণ-সাথী

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

মর্তের নরলোকে
নরের শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ আসিলে বঙ্গ-বুকে।
ভগবান ভজি মানব কেমনে দেবতারে জয় করে,
গুরু-গৌরবে লঘু কৈতব নিমেষে কেমনে হরে
গুরু অনুসরি' লোক-সমক্ষে দেখাইলে তাই এঁকে।
হে বীর সাধক কৃতী,
অভেদের দেশে ভারতে আবার গেয়ে গেলে প্রেম-গীতি।
শিব-জ্ঞানে জীবে সেবা দিয়ে তুমি আর্য-সাম্যধারা
বহালে শুষ্ক নীতি-মরুভূমে, দেখিল বিশ্ব সারা :
ভারত আজিকে গরবে বহিবে তোমার পুণ্যস্মৃতি।
তুমি অপূর্ব ন্যাসী ;
ছিলে লোকালয়ে, ছিলে না ক তুমি গুহাবাসী সন্ন্যাসী।
আপন শোণিত গণিতে সবার ধমনীর লোহধার,
আপামর তাই ভাবিতে আপন : মেথর চর্মকার—
কেহ নহে পর, সকলেই তব ছিল অন্তরবাসী।
হে রামকৃষ্ণ-সাথী,
যেথা দেখি যত আলোকপুঞ্জ, সে তোমারি অনুভাতি :
পৃথিবীর এই পান্থনিবাসে যতটুকু প্রেম আছে,
মূলধন তার তোমারি সাধন, প্রাপ্ত তোমারি কাছে।
ভারত আজিকে করিবে গর্ব আমরা তোমার জাতি॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

কর্মযোগ সাধনমার্গের অন্যতম। কিন্তু কর্ম বলিতে কি বুঝিব? কোন কাজ কর্ম, আর কোন কাজ কর্ম নয়—অর্থাৎ যোগ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর পাই গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে—'মা ফলেষু কদাচন।' অর্থাৎ কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু আসক্তি থাকিবে না। কথাটা বলা খুব সহজ—শুনিতেও বেশ, কিন্তু মানুষের পক্ষে অভ্যাস করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। তাই গীতার এই উক্তি যুগ যুগ ধরিয়া উপদেশের পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছিল। আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশমত অন্যান্য সাধনপথগুলি—জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি বরং মানুষ অভ্যাস ও অনুসরণ করিয়াছে এবং ঐ পথে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সব যোগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু কর্মযোগ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া শাস্ত্রের বাণী ও ভগবানের উপদেশেই রহিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিবার পূর্বেও নাকি গঙ্গানদীর অস্তিত্ব ছিল—ব্রহ্মার কমণ্ডলুতেই হউক, বা স্বর্গের মন্দাকিনীতেই হউক, বা হিমালয়ের পাষাণ-বক্ষের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায়ই হউক। তারপর ভগীরথ তাঁহাকে নিয়া আসিলেন পৃথিবীর বুকে, মানুষ পাইল জীবনের সন্ধান—গঙ্গার পূত স্পর্শ, তৃষ্ণার জল, আর শ্যামলশস্যরূপ আশীর্বাদ। অনাসক্ত কর্মযোগও তেমনি ছিল শাস্ত্রের কমণ্ডলুতে লুক্কায়িত। স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম তাহাকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া দিলেন। একথার মধ্যে একবিন্দু অতিশয়োক্তি নাই। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা যাগযজ্ঞ করিতেন যতখানি মানুষের কল্যাণের জন্য, তার বেশী করিতেন নিজের মুক্তির জন্য। পরবর্তী কালে প্রজাদের হিতের জন্য রাজা ও জমিদারগণ জলাশয়-খনন, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করিতেন প্রধানতঃ পরপারের পাথেয়-সংগ্রহের জন্য। পাশ্চাত্যের মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়া অনেক পার্থিব উপকার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধর্মমত-প্রচার, মানুষের কল্যাণ-সাধন একটা গৌণ ব্যাপার। তাঁহাদের কাজ বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার ফলে অনাসক্ত বা নিষ্কাম কর্মের পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। কর্তব্যবুদ্ধিচালিত হইয়াও অনেকে সৎকর্ম করিতেন। কিন্তু তথাকথিত কর্তব্যপালনে কামনা নিহিত থাকে বলিয়া সে কাজও সকাম। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কেহ কেহ জীবনে মাঝে মাঝে দুইচারিটা নিষ্কাম কর্ম করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম কর্মযোগের সমষ্টিগত প্রয়োগ দেখাইলেন। কর্মের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত করারূপ অনাসক্ত ও নিষ্কাম কর্মের গঙ্গাপ্রবাহ আনিলেন স্বামীজী। তিনি যে দিন কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, —'আমি চাই না মুক্তি, চাই না ভগবান, একটি কুকুরের মুক্তির জন্য আমি সহস্রবার জন্মপরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত'—সেদিন কি পৃথিবী নূতন কথা শুনিল না? নিজের কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া নয়, নিজের পার্থিব আর দশটা কাজের পাশাপাশি নয়, অন্তর্গূঢ় কোন উদ্দেশ্যের জন্য নয়—কর্মের জন্য নিষ্কামভাবে সম্পূর্ণভাবে তিনি আত্মনিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন—'যদি আমি আমার তমোহ্রদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা

অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষের মত নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব।'

স্বামীজী এইরূপ উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে কর্মযোগের প্রবর্তন করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। তিনি তখন সদল-বলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রোগাক্রান্তদের সেবায়—নারায়ণজ্ঞানে সেবায়। ঘোষণা করিলেন, এই কাজের জন্য প্রয়োজন হইলে বেলুড়মঠ-স্থাপনের জন্য ক্রীত জমি বিক্রয় করিবেন। তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয় হইতে উত্থিত এই ঘোষণা গভীরভাবে প্রণিধান-যোগ্য। আসক্তিহীন কর্মপ্রেরণার এইরূপ দৃষ্টান্ত ইহার পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। দেশে তিনি কর্মের বান আনিলেন। মুর্শিদাবাদে, আর অন্যান্য নানাস্থানে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের সেবকার্য সুরু হইল। সেবার পথে কর্ম, মুক্তির জন্য নয়—নারায়ণ-জ্ঞানে মানুষের সেবা। উচ্চারণ করিলেন নবমন্ত্র, দুঃস্থিত জীবের নবপরিচিতি—'দরিদ্রনারায়ণ'।

স্বামীজী যে কর্মযোগের প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে, একমাত্র সেই প্রেরণার ফলেই আজ দেশব্যাপী নানাপ্রকার জনহিতকর কর্মের অভিযান চলিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশ সেই ত্যাগী সন্ন্যাসীর বাণীর প্রধান সুরটি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। যন্ত্রযুগে যন্ত্র আসিয়া মানুষের স্থান দখল করিয়াছে। কর্মও ফলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে যান্ত্রিক। মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে যেন কোন তফাৎ নাই। তাই জীবপ্রেমের মন্ত্র মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। আসিয়াছে দলের জন্য বা দলাদলির জন্য কাজ—মতবাদ-প্রচারের জন্য কাজ এবং ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির জন্য কাজ। এইরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনহিতকর কাজকে আর যাহাই বলা যাক্, কর্ম-যোগ বলা যায় না।

কেন এমন হইল? অর্থাৎ সাধনার পথ ছাড়িয়া কর্মের ধারা কেন একটা যান্ত্রিক বা হুজুগের পথে প্রবাহিত হইল? ইহার কারণ এই যে, সাধনার মূলকেন্দ্র মানুষ বা জীবের প্রকৃত সত্তা কি তাহাই ভুলিয়া গিয়া আমরা কর্ম করিতে মাতিয়া উঠিয়াছি। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত সত্তা বা পরিচয় কি তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু তাহার তথাকথিত secular (বৈষয়িক) রূপটি দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছি। এই অন্ধ secularism (বৈষয়িকতা)-এর মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে আর দার্শনিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া আমরা দেখিতেছি বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, তথাকথিত secular দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা। তাই আমরা ভাবি শুধু মানুষের জঠরের বুভুক্ষার কথা—ভুলিয়া গিয়াছি তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধাকে। অথচ এই ক্ষুধা আছে বলিয়াই মানুষ অন্যান্য প্রাণী হইতে বিশিষ্টতর। আত্মার বুভুক্ষা জাগিয়াছে বলিয়াই মানুষ আজ হইতে পারিয়াছে স্রষ্টা, পাইতেছে জ্ঞানের আলোক, দার্শনিক দৃষ্টি ও সত্যের সন্ধান। চরম বিশ্লেষণে বিবর্তনের পথে মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ আত্মচেতন জীব। এই প্রকার উন্নততর জীব মানুষ লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে secularismই যদি সর্বকর্মের ভিত্তি হয় তাহা হইলে আমাদের কাজকে তুলনা করা যায় শবব্যবচ্ছেদের সঙ্গে। অর্থাৎ সমগ্র মানুষটির সেবা না করিয়া করিতেছি তাহার শবদেহের সেবা। কিন্তু মানুষ বলিতে একদিকে যেমন বুঝায় রক্তমাংসের প্রাণী, তেমনি আবার বুঝায় চৈতন্যের প্রতীক আত্মচেতন জীব। এইরূপ মানুষের সভ্যতা বলিতে শুধু কলকব্জার আবিষ্কার এবং দৈহিক ও সামাজিক সমস্যার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাধানই বুঝায় না। স্বামীজী বলিতেন, জড়ের মধ্যে তিলে তিলে চৈতন্যের আবিষ্কারই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। সত্যের সন্ধান করিতে করিতে বিজ্ঞানও আজ যেখানে পৌঁছিয়াছে,

সেখানেও কি এই ইসারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না ? জড়ের চরম সত্তা আবিষ্কার করিতে করিতে বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যের আভাস পাইতেছেন, তাহাকে আর তাঁহারা নিছক জড় বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের আবিষ্কারই যদি মানুষের ধর্ম হইয়া থাকে, তবে সেই মানুষের যাবতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন secularism-এর ভিত্তিতে হইতে পারে না। মানুষকে সর্বতোভাবে secularism-এর নাগপাশে বাঁধিয়া তাহার অন্তরতম চৈতন্যের সন্ধানকে ব্যাহত করিবার প্রয়াস পাইলে মানুষ ক্রমবিবর্তনের পথে প্রচণ্ড বাধা পাইবে। তাই তাহাকে এই নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে হইবে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের আবিষ্কারের সাধনার পথে। মহত্তম পূর্ণতার যাত্রাপথে আপন অন্তর্নিহিত দেবত্বের অভ্যুদয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহাই কর্মযোগীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই কর্ম যান্ত্রিক কর্ম নয়, ইহা সাধনা। এই সাধনার জন্য সত্যিকারের কর্মযোগীর প্রয়োজন, যন্ত্রের নয়। কিন্তু secularism-এর শিক্ষায় আমরা যন্ত্রে পর্যবসিত হইতে বসিয়াছি। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, এই সাধনার জন্য প্রকৃত কর্মযোগী গঠন করিতে। এইরূপ কর্মযোগী তৈরী করাকেই তিনি বলিতেন মানুষ তৈরী করা।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—দৃঢ়নিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ত্যাগী, চরিত্রবান কর্মী, যাহারা 'পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবে;' 'উদ্ধারকর্তারূপে নহে, সেবকরূপে অন্নবস্ত্র, বিদ্যা, জ্ঞান লইয়া জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত কর্ম করিবার জন্য দৃঢ়হৃদয় কর্মী।'

শিক্ষাদানব্রত স্বামীজীর কর্মপ্রণালীর অন্যতম প্রধান ধারা। তিনি বলিয়াছিলেন 'মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হোক্। মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা।' স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মযোগের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে তাঁহার এই সাধনার কথা সর্বোপরি মনে রাখিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপর্যয়ে মানুষের সেবা করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এইরূপ কর্মের তিনিই প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন. কিন্তু এই সেবা করাই চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। মানুষের মত মানুষ তৈরী করিতে পারিলে অনেক সমস্যারই আপনা হইতে মীমাংসা হইয়া যাইবে। তখন সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাধি ও বিপর্যয় দূরীভূত হইলে মানুষ মহত্তম পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। মানবজাতির এই অগ্রগতিতে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সেই জন্য চাই যথার্থ কর্মী গঠন করা। ইহাই ছিল স্বামীজীর কর্মযোগ।

পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ত্যাগী বীরহৃদয় আত্মবলিদানে প্রস্তুত কর্মীর জন্য স্বামীজী যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, দেশ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। সেই সাড়ার ফলেই দেশে দেখা দেয় নবজাগরণ। এইরূপে স্বামীজীর আহ্বানে জাগরণ আসিয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী কালের নেতৃবৃন্দের আন্দোলন সম্ভব হইয়াছিল। আজ সেই আন্দোলনের ফলে দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে। স্বাধীনতা আসিয়াছে সহস্র সহস্র নির্ভীক নরনারীর ত্যাগ ও আত্মবলিদানের পথে। এইরূপ আদর্শ কর্মী গঠনের যাদুমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু মানুষ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ হয় নাই; বরং সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতালাভ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মহাবিপ্লবের সূচনামাত্র। ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। জ্ঞানের জন্য, আলোকের জন্য, শান্তির পথনির্দেশের জন্য অনেকেই আজ স্বাধীন ভারতের দিকে চাহিতে সুরু করিয়াছেন। আজ

আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অদ্ভুত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসহায়ে এই কর্মযোগের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

পৃথিবীর ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব আসিবে, তাহার পরিণতি হইবে ভারতীয় আদর্শের জয়াভিষেকে। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য, ইহাকে মহত্তম পূর্ণতার পথে চালিত করিবার জন্য ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা জগৎ জয় করিয়া ভারতকে আবার জগতের নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে—ইহাই ছিল স্বামীজীর কর্মযোগের লক্ষ্য। তাই তিনি মানবজাতির পরমকল্যাণকর কর্মযোগ বিশ্বে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। কোন একটি বিশেষ ধর্মমত প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; ভৌগোলিক সীমানায় তাহার নির্দেশিত কর্মযোগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। এই কর্মযোগের প্রবর্তন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিবার গুরু দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের উপর দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের এই গুরু দায়িত্ব যেমন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তেমনই আবার এইদিকে তাহার সীমাহীন সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সমগ্র বিশ্বে অধ্যাত্মপিপাসা জাগিয়া উঠিতেছে; ইহাকে মিটাইতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ।

যান্ত্রিক বুভুক্ষা ও আত্মিক বুভুক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। সেই সংঘর্ষে একদিকের কাণ্ডারী হইবে ভারতীয় আদর্শ, অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ। সেই সংঘর্ষে মানবকল্যাণকর ভারতীয় আদর্শের পতাকা বহন করিবার জন্য স্বামীজী বীরহৃদয় কর্মিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিবার সময় আসিয়াছে। প্রয়োজন হইয়াছে একনিষ্ঠ কর্মযোগীর যাহারা জড় ও চৈতন্যের সংঘর্ষে চৈতন্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সমগ্র মানবজাতির মহত্তম পরিণতির যাত্রাপথে নেতৃত্ব করিবে। এই অভিযানে কর্মযোগীর দায়িত্ব অসীম। পথ বন্ধুর, সংগ্রাম প্রচণ্ড। তাই কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

প্রার্থনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রীপুত্র-সংসার ল’য়ে দিনগুলি যায় বয়ে,
দুঃখে সুখে আলোয় আঁধারে।
এবার করুণা ক’রে পথে নিয়ে যাও মোরে,
ছড়াবো নিজেরে দুইধারে।
আপনারে বিস্তারিয়া যে-আনন্দ পায় হিয়া
সে আনন্দ অনির্বচনীয়!
নিজেরে একই ঠাঁই বেঁধে রাখা যাতনাই,
মরণ সে—জানিও, জানিও।
গণ্ডী টানি চারিধারে কেন আছো কারাগারে?
কেন রহো বৃক্ষের সমান

শিকড়ে আঁকড়ি মাটি? কামনার গুটি কাটি
নীলাকাশে হও ধাবমান।
পুঁথি পড়া হোলো ঢের! লভিলে কি অসীমের
অমৃত-রসের আস্বাদন?
পেলে কি শাশ্বত শান্তি? ঘুচিল মনের ক্লান্তি?
মিটিল কি মর্মের কাঁদন?
বুদ্ধিরে সারথি ক’রে কত দূর যাবি ওরে?
বিচারের প্রান্তে অন্ধকার!
ও পথে গিয়েছে যারা—ফিরে এসে বলে তারা;
হালে, ভাই, পানি পাওয়া ভার।

শ্যাম্পেনে মোটরে হায়, প্রাণের শূন্যতা যায় ?
রূপসীর অধরের সুধা—
ক্ষণিকের ছায়া সে তো ! ছায়া দিয়ে মেটে না তো
অন্তরের অনন্তের ক্ষুধা।
খ্যাতি সে তো মরীচিকা ! রঙ তার হয় ফিকা !
জ্ঞানী তারে করে না কামনা।
জ্বালা যায় মালা দিয়ে ? অচল আধুলি নিয়ে
হাটে ফেরা—সে তো বিড়ম্বনা !
ভেঙে দাও, ভেঙে দাও খেলা-ঘর, নিয়ে যাও
ঐ মুক্ত আকাশের তলে।
মেঠো পথ আঁকা-বাঁকা, দিগন্ত স্বপন-মাখা,
তরী চলে 'জলঙ্গী'র* জলে।
দিগন্তবিস্তারী মাঠ, কোথাও বা খেয়াঘাট,
কাদাখোঁচা পুচ্ছটী নাচায় ;
ওড়ে নীলকণ্ঠ পাখী, পল্লব-আড়ালে থাকে
আরণ্যকপোত গান গায়।
বন-মল্লিকার গন্ধ প্রাণে ঢালে কী আনন্দ !
সমীরণে মধু, শুধু মধু !

* নদীয়ার নদী ; পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নবদ্বীপের কাছে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে।

রাখাল বাজায় বাঁশি, ঘাটে শুনি মিষ্ট হাসি,
ঘট ভরে কিষাণের বধূ।
হাতে বই কবিতার, নির্জন নদীর ধার,
দূরে দূরে চরিতেছে ধেনু।
বসি সেথা কিছুক্ষণ কাব্যপাঠে দিই মন,
মর্মে বাজে কি মধুর বেণু।
এই ভালো, এই ভালো : পথে চলো আর ঢালো
আপনারে সকলের মাঝে !
ঘনায়ে আসিছে রাত্রি, ঘরে ঘরে জ্বলে বাতি,
কুটীরে কুটীরে শঙ্খ বাজে।
আদরে যে লয় ডাকি তার ঘরে মাথা রাখি,
ক্রমে আসে যত নর-নারী ;
কথামৃত করি পাঠ, বসে আনন্দের হাট,
পর নয়, সবাই আমারই।
শেষ রাত্রে উঠে পড়ি, যাত্রা ফের সুরু করি,
দিগন্তে কাহার হাতছানি ?
রামকৃষ্ণপদাশ্রিত কার ভয়ে তুই ভীত ?
কণ্ঠে তোর ঠাকুরের বাণী।

শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্

স্বামী আদিনাথানন্দ

জীব অসীমপ্রত্যাশী। জীবের চিত্তবৃত্তিমাত্রই অসীম পিপাসায় হা হুতাশের মধ্য দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া চলিয়াছে। আরও জানিতে, আরও ভালবাসিতে, আরও পাইতে, আরও ধর্মকর্মা সত্যসন্ধ হইতে জীবের কি প্রয়াস চলিতেছে। যেন সে এক অব্যক্ত পূর্ণতাকে ব্যক্ত করিয়া এক বিরাট ভূমিকায় আবির্ভূত হইবার জন্ত যাত্রা করিয়াছে। এই অব্যক্ত প্রেরণাটি কি বস্তু ? উপনিষদের ঋষি আবিষ্কার করিলেন এই হাড়-মাংসের খাঁচার মধ্যে এক চিন্ময় সত্তা—যিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা হইয়া 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—। এই সত্তাই জীবকে কোথাও সীমাকে স্বীকার করিতে দিতেছে না। এ যেন বহির্দেশে কুঞ্জাভিসারী করিবার জন্য বংশীবদনের নিত্য বংশীর আহ্বান। আণ্ডারহিল্ (Underhill) তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহাকেই "His innate tendency to that Absolute spiritual weight" (জীবের সর্বনিরপেক্ষ অধ্যাত্মসত্তার তাৎপর্য-অনুভবের এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্তর প্রয়াস)

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই চূড়ান্তলক্ষ্য প্রত্যাশাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তন-সাধন করিতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সেই আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে। নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেতো। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিতে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু তার মন বলছে এই সমস্তের সত্য রয়েছে সীমার অতীতে।'

জীবের মন জ্ঞান-অনুভব-ক্রিয়ারূপ ত্রিমুখী বৃত্তি লইয়া আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। এই ত্রিতয়বৃত্তিশীল মন লইয়াই মানুষ বিশ্ব-সংসারকে ধরিতে, বুঝিতে, ব্যাখ্যা করিতে, উপভোগ করিতে চাহিতেছে। এই প্রচেষ্টা হইতেই জন্ম নিয়াছে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যসাধনা ও সৌন্দর্যচর্চা।

বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণকে এই মনটুকু দিয়াই ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহার পরিচয় পাই ঋগ্বেদের ঋষিগণের গানে, স্তবে, ও বিভিন্ন সূক্তগুলিতে। ঐ যুগে আর্যমনীষা কবিত্বানুরাগী ছিল। ঋষিগণ আবেগভরা অনুভূতি লইয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

ক্রমে বিশ্বপ্রকৃতির লীলাসন্দর্শন করিয়া তাঁহারা সহজাত কার্য-কারণ-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মহাশক্তির কল্পনা করিলেন। শুদ্ধির উচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়া প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অনুভব করিলেন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া এক পরম দ্যুতিময় সত্তা বিরাজ করিতেছে। গায়ত্রীমন্ত্র এই তত্ত্বের প্রকাশক। এই সর্বব্যাপক চিন্ময় সত্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

> যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্‌সু,
> যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
> য ওষধীষু যো বনস্পতিষু,
> তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ

ইতঃপূর্বে যে সকল বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলিলেন—একই তত্ত্ব বিভিন্ন দেবদেবীর শক্তিরূপে সৃষ্টি-তন্ত্রে প্রকটিত হইতেছে। সৃষ্টিপ্রকটিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তাঁহারা এক 'ভাগবত সৌন্দর্যের' পরিপ্রকাশরূপে অনুভব করিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই তত্ত্ব 'মহাদেবী'-রূপে ব্যাখ্যাত হইল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ইহাকেই চরম কৃষ্ণতত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করিলেন। ইঁহাদের মতে জড়দেহবাসী জীবের কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণের অর্থই হইতেছে প্রকারান্তরে এই অপ্রাপ্ত প্রেমসুন্দরের টান। কারণ সেই অমৃত-স্বরূপ রসঘন, জ্ঞান-ঘন পরমাত্মাই জীবজগতে জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমরূপে লীলায়িত এবং কাব্যানুভূতির মাধ্যমে রসতত্ত্বরূপে প্রকটিত হয়।

কিন্তু আর্যমনীষা এই 'একেশ্বরবাদ' (Mono-theistic)-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তৃপ্ত রহিল না। বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক, কার্য-কারণ-বুদ্ধিদ্বারা উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গী চরম বলিয়া প্রতিভাত হইল না। তাই দেখিতে পাই সংহিতোত্তর কালে দর্শনচিন্তা আরও গভীরভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এখন হইতে শুরু হইল অন্তর্জগতের বিশ্লেষণ, জ্ঞান-ভূমির বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করিয়া জগৎ ও জীবনের রহস্যের কেন্দ্রানুসন্ধান। এই যুগে ঋষিগণ বিশ্ব-প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইয়া ভীত বা বিস্ময়বিহ্বল নহেন। আদিকারণকে মানুষীকৃত করিয়া (anthropomorphism) সন্তুষ্ট করিতে এবং অভীষ্টলাভের জন্য যজ্ঞরত বা প্রার্থনাপরায়ণ নহেন। ধ্যানের গভীরতায় নিবিষ্ট বুদ্ধিসহায়ে সৃষ্টির তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে নিরত হইলেন। এখন হইতে পথ হইল epistemological (জ্ঞানবিশ্লেষণমূলক) এবং subjective (জ্ঞাতৃনিষ্ঠ)। এই নূতন ভঙ্গিমায় বিচার করিয়া এবং পরিশেষে 'ধ্যানযোগাৎ'—সূক্ষ্মবুদ্ধি-সহায়ে সৃষ্টির নিদান আত্ম-চৈতন্য কেন্দ্রে

অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তত্ত্বদ্রষ্টাগণ ঘোষণা করিলেন 'অয়মত্মা ব্রহ্ম', 'নেদং যদিদমুপাসতে'। কারণ, যাহা জ্ঞেয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং কল্পনার বিষয় তাহা চিরন্তন সত্য নহে। তাঁহারা জীবের জ্ঞান-ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়া দুইটী অবিসংবাদী পদার্থ পাইলেন—একটী নিত্য স্থির অবাধিত জ্ঞান বা চেতনা, অপরটি 'জ্ঞেয়'—যুষ্মৎপ্রত্যয়-বিষয়যোগ্যত্ব যাহার ধর্ম। আমরা যাহাকে 'বিষয়জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করি উহা চিত্তের মধ্য দিয়া প্রকটিত নিত্যজ্ঞান। কিন্তু চিত্তমূল বলিয়া বিনাশ-ধর্মী, মর্ত্য এবং তদ্ধেতু হেয়। জড়জগতের যাবতীয় বস্তু চিত্ত-স্পন্দনের মধ্য দিয়া প্রমাতা 'আমি' বিষয় হয়—অন্য ভাষায় 'আমার চেতনা'র নিকট দৃশ্য হয়। তাই চিত্তবৃত্তির অবস্থানকালীন দৃশ্যস্থানীয় বস্তু সত্তা লাভ করে এবং তদভাবে উহা অন্তর্হিত হয়। এই জন্যই জ্ঞেয়রূপী জগৎ এবং চিত্তের বৃত্তির যাবতীয় অনুভূতিই পরিবর্তনশীল বলিয়া অবস্তু। নিত্য সাক্ষি-ভূতজ্ঞানই বস্তুকারণ, ইহার সত্তা অবাধিত। এই জন্যই বিবেকী পুরুষগণ বিভিন্ন অনুভূতির অধিষ্ঠানস্বরূপ জ্ঞানকেই আত্মস্বরূপ জানিয়া অবস্থান করেন। উপনিষদের ঋষিগণ এই 'জ্ঞান'কেই সর্বব্যাপক ভূমা আখ্যা দিলেন। কারণ এই 'জ্ঞানের' কোন পরিধি থাকিতে পারে না। যে সত্তা দেশ কাল ও নিমিত্তের স্বপ্রকাশ অববোদ্ধা, উহা সীমাতীত ভূমিতে অনন্ত কাল অবস্থিত থাকিয়াই সব বস্তুর অবভাসক হয়। আমরা দেখিতে পাই ঐ যুগে কতিপয় দার্শনিক ঋষি বিভিন্ন চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া এই মহান আত্মতত্ত্বে উপনীত হইলেন। বৃহদারণ্যক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই চিন্তাধারার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। জীবের প্রাত্যহিক জীবনের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থাত্রয় বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, আমাদের সত্তার এমন দিক আছে যাহার বিস্তার আরও অন্তরের দিকে—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ চিত্তের স্পন্দন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির গণ্ডীর অতীতে যাহার স্থিতি। তাই তাঁহারা বলিলেন 'যদা বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্'—অর্থাৎ বুদ্ধির যাবতীয় বিক্রিয়া উপশান্ত হইলে যে নিশ্চল জ্ঞান, এই ভাব ও অভাবের দ্রষ্টা উহাই জীবের স্বকীয় সত্তা এবং ঐ অবস্থায় স্থিতিলাভই পরম শান্তির উপায়। আমাদের চেতন মন ও অবচেতনার ওপারে স্বকীয় সত্তার মধ্যেই একটি সুসূক্ষ্ম নিভৃত লোক আছে যাহাকে বলা যায় তুরীয়। সেই তুরীয় ভূমিতেই জীবের সত্যকারের আবাস। এই ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া জগরেণ্য ঋষি বলিলেন, "অহংপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" তাঁহারা আরও বলিলেন, "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোঽস্য পরমো লোকো এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥"

ভারত ও আমেরিকা*

শ্রীগগনবিহারী এল্ মেহতা

এক ভাবে—সম্ভবতঃ বিপরীত ভাবে, বলা যায় যে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক সুরু হয় কলাম্বাসের আবিষ্কার থেকে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে তিনি যেন দৈবাৎ আমেরিকায় এসে পড়লেন। অবশ্য বলতে পারা যায় যে, কলাম্বাস যদি আমেরিকা আবিষ্কার না করতেন তাহলে অন্য কেউ করত, কিন্তু সে যাই হোক, তিনি খুঁজছিলেন ভারত কোথায়। পরবর্তী বহু বছর ধরে ভারত বৃটিশ, পর্তুগীজ, ডাচ্, ফরাসী প্রভৃতি

* আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমেহতা কর্তৃক নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে ১৭।৫।৫৩ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত।

পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে তাকে ইংরেজ-শাসনাধীনে আসতে হল বলেই ইংলণ্ড বা সংযুক্তরাজ্যের সঙ্গে তার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অনেক দিক দিয়ে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়েছিল। আমেরিকা-দেশের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগ খুব কমই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—১৮১০, ১৮৩০ ও এরই কাছাকাছি কোন সময়ে কয়েকজন আমেরিকান মিশনারী ভারত পরিদর্শনে আসেন এবং সেই থেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশে আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। এঁদের কাজ ছিল জনসেবা ও বিশেষ করে যাদের বলা যেতে পারে 'অধিকার-বঞ্চিত' হেয়, ও নগণ্য, তাদের সামাজিক অভাব পূরণ করা। বহু আমেরিকান পর্যটক মাঝে মাঝে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন এবং ভারত-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। কেউ বা ভারতের ধর্মভাবে, কেউ বা তার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐশ্বর্যবিভবে মোহিত হয়েছেন; আবার অন্যে তার দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট ও অন্যান্য বিভিন্ন অবস্থা দেখে কিছুটা হতাশও হয়েছেন।

এদেশে বহিরাগত ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, কিন্তু সেই প্রথম যাঁরা এদেশে আসেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে আমি যথার্থই বলতে পারি ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক দূত। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দেন এবং তাঁর কথায় ও লোকেদের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি যে বাণী বহন করে এনেছিলেন তার গভীর ছাপ রেখে যান। এর পরেই এই শহরে প্রথম একটি বেদান্তকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ আর একবার এদেশে আসেন। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাক্ষাৎ-ভাবে সাংস্কৃতিক সংযোগ-স্থাপনের যত সুযোগ এসেছিল এইটি তার মধ্যে প্রাচীনতম। অবশ্য এ ছাড়াও কয়েক জন আমেরিকান মনীষী ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করছিলেন এবং ভারতীয় চিন্তায় প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এমার্সন ও ট্রানসেনডেন্টালিষ্টরা এইভাবে হিন্দু চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কয়েকটি আমেরিকান লেখক ও গ্রন্থকারের লেখা অনুসরণ করে চলতেন। এমার্সন তাঁদের মধ্যে একজন। এঁদের মধ্যে আরও পড়েন কবি হুইটম্যান ও লঙ্‌ফেলো, কয়েকজন ঔপন্যাসিক, মার্ক টোয়েনের মত হাস্যরসিক। একথা অনেকেই জানেন, যে সব গ্রন্থকাররা মহাত্মা গান্ধীকে প্রভাবিত করেন, থোরো (Thoreau) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। থোরো একবার বলেছিলেন যে, অন্যায় যখন প্রবল হয় তখন কয়েদখানাই হল ন্যায়বানের প্রকৃত স্থান; গান্ধীজীর চিন্তার সঙ্গে এটা খুব মিলে যায়।

এও সত্যি যে আমাদের দেশের কয়েকজন বিখ্যাত লোক এদেশে এসেছিলেন এবং এখানের লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের লেখাও পড়েছেন। সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা আছে যে, দু'জন ভারতীয় নোবল পুরস্কার পেয়েছেন; একজন সাহিত্যে, অপরে পদার্থবিদ্যায়। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই অল্প। তবুও সাহস করে ঐ বিষয়ে যদি কিছু বলি তাহলে বলতে হবে যে আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত শ্রেষ্ঠ কবি জন্ম নিয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এদেশে এসেছিলেন ও তাঁর অনেক বই, কবিতা ও উপন্যাস আজও এখানে পঠিত হয়। আর একজন মহিলা কবি তথা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত বক্তা সরোজিনী নাইডু যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার কারাবাসও করেছিলেন এবং যিনি একাধিকবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করেন ও স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের একটি রাজ্যের রাজ্যপাল

হন—তিনিও এদেশে এসে নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও গান্ধীজী, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের লেখা এখানকার লোক আগ্রহ-ভরে পড়ে থাকেন।

সম্প্রতি আমি পশ্চিম আমেরিকার মধ্যাংশে ভ্রমণ করে এসেছি। সাধারণতঃ এই অংশটিকে আমেরিকার এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলেই ধরা হয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে দেখেছি যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শুধু অন্তর্জাতীয় সমস্যা-সম্বন্ধে নয়, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া-সম্বন্ধেও জানবার এক প্রবল আগ্রহ রয়েছে। আরও দেখলাম, কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা নয়, ব্যবসায়ীরাও গান্ধীজী ও নেহেরুর লেখাগুলি পড়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভারত ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক সংযোগ সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের এগারটি শাখা অনুরূপ কার্যধারায় ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করে আসছেন। তা ছাড়া কয়েক বছর ধরে একদল ভারতীয় ছাত্র আমেরিকায় থেকে পড়াশোনা করছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে খুব কম ভারতীয় ছাত্রই এদেশে এসেছিল। তার আংশিক কারণ এই যে, আমেরিকা আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে—ভূমণ্ডলের সেই অপর পৃষ্ঠে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে একে পাতাল বলেছে (অনুগ্রহ করে এ কথাটায় দোষ নেবেন না, কেননা যে অর্থে এ শব্দটি আমরা ব্যবহার করি অন্তত্র তা নয়) এবং আমার এখানে আসার কথা যখন ঘোষিত হল, তখন কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি পাতালে যাচ্ছি নাকি! যদি আপনারা একটি ভূমণ্ডলের মানচিত্র নিয়ে তার মধ্য দিয়ে পেন্সিল চালান তাহলে দেখবেন ভারতের ঠিক বিপরীত দিকে সম্ভবতঃ রয়েছে ফ্লোরিডা বা টেক্সাস্। এতটা দূরত্ব নিঃসন্দেহে একটা সমস্যা হয়েছিল। তা ছাড়া ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকায় সরকারী চাকরী বা আইন বা চিকিৎসা-বিষয়ে আমাদের দেশে ব্রিটিশের দেওয়া উপাধিই গ্রাহ্য হত, যন্ত্র-শিল্পে ও রাসায়নিক ব্যবসায়ে ব্রিটিশ যে কর্মমান ও কর্মসূচী অবলম্বন করত আমাদের দেশে সেইটাই স্বীকৃত হত। ফলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এদেশে আসার জন্যে খুব একটা তাগিদ ছিল না। প্রায় ১৯১০ খ্রীঃ থেকে শিল্পবিজ্ঞান, পূর্তবিদ্যা ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার সাফল্যের কথা ক্রমশঃ বেশী বেশী করে জানা যেতে থাকে, আর তদবধি ভারতীয় ছাত্ররা দলে দলে এ দেশে আসতে লাগল। শিল্পবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে বহু ভারতীয় ছাত্র যখন দেশে গিয়ে বেশ প্রসার লাভ করল, তখন স্বভাবতই তাদের উন্নতি দেখে আরও অনেকের উৎসাহ জাগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে শিল্পক্ষেত্রে আমেরিকার উন্নতিতে শুধু যে ইউরোপ মুগ্ধ হয়েছিল তা নয়, সারা জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল; সে জন্যেই দেখা যায়, নানান বৃত্তির সাহায্য নিয়ে দলে দলে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় ছাত্ররা এদেশে আসতে সুরু করেছে।

আজ আমেরিকায় প্রায় ১৫৭০ জন ভারতীয় ছাত্র আছে। তারা যন্ত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। এ ছাড়া এদের অনেকে আবার সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, পৌরশাসন-বিজ্ঞান, ব্যবসা-নির্বাহ প্রভৃতি মানবতান্ত্রিক বিষয়েও অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে প্রায় এক শতের বেশী মহিলাও আছেন। তাঁরা চিকিৎসা, শিক্ষণরীতি, শিশুমনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত ও ডলারের সঞ্চয় কম থাকার দরুণ, ভারত সরকার বিদেশে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া সংকোচ

করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু এদেশের কয়েকটি বৃত্তি-ব্যবস্থার বদান্যতায় বহু ছাত্র এখানে আসতে সমর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ফোর্ড, রকফেলার, ফুলব্রাইট প্রভৃতি বৃত্তি উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত যত ভারতীয় ছাত্র আমেরিকায় এসেছে তাদের সংখ্যার তুলনায় এই ১৫৬০ কি ১৫৭০ সংখ্যাই সর্বোচ্চ হবে। এদের মধ্যে অনেকে নিজের খরচায় এলেও বেশীর ভাগ আসতে পেরেছে শুধু এই সব বৃত্তি এবং অর্থনৈতিক সাহায্য ছিল বলে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক যোগ্য ছাত্রকে ব্যক্তিগত বৃত্তি দেওয়ার ফলে তাদের এখানে আসা ঘটেছে। সত্যি এমনও উদাহরণ রয়েছে যে, আমেরিকার বিশেষ কোন কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা নিজেদের পকেট-খরচা বা একদিনের খাবার বাঁচিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের এখানে আনতে সক্ষম হয়েছে।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, অন্তর্জাতীয়তা এখনও শুধু আশামাত্র, বাস্তব কিছু নয়, তাঁদের এ সব ঘটনা অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত। কারণ, প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি যাই করুক না কেন, অজ্ঞাত-পরিচয় নরনারীরা, যারা অনগ্রসর বা নগণ্য ও অপরিচিত তারা এ সব ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করছে। পক্ষান্তরে ফুলব্রাইট এ্যাক্ট, ফোর্ড ফাউনডেশন প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-সংস্থার সাহায্যে বহু আমেরিকান ছাত্র ও শিল্পী ভারতে যেতে সক্ষম হয়েছে। গত বছর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 'ইণ্ডিয়া প্রোজেক্ট' নামে একটি কর্মসূচী রচনা করেন। তার ফলে সাত আট জন আমেরিকান ছাত্র ভারতীয় পরিবেশে বাস ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করবেন এবং হাতে নাতে ভারতের সমস্যা-সম্বন্ধে অবহিত হবেন বলে ভারতে গিয়েছেন। এ বছর (১৯৫৩) মিনেসোটা (Minnesota) ও সাইরাকিউস (Syracuse) বিশ্ববিদ্যালয়ও ঐ পথ অনুসরণ করেছেন। এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় জানবার জন্যই যান— যেমন শ্রমিকদের অবস্থা, ভূমি-সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী-আন্দোলন, শিশু-আন্দোলন ইত্যাদি। এ সব প্রচেষ্টাকে খুবই প্রশংসা করতে হয়, কারণ, এটাও সত্যি যে, সব ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এদেশে আসা

নয় বা সব সময় বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবার জন্য আমরা বেশ কিছু টাকা খরচ করি; এদেশে ১৬০০ ও ইংলণ্ডে ১৬০০ ছাত্রের শিক্ষা নেবার বন্দোবস্ত আমাদের করতে হচ্ছে। জগতের খুব কম দেশই বিদেশে ৩০০০।৪০০০ ছাত্রের পড়ার জন্যে এতটা খরচ করে থাকে। আমার বিশ্বাস যে, যদি চীন ও কানাডার ছাত্রদের ধরা না যায় তবে আমেরিকায় সম্ভবতঃ ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী হবে।

তাই সংবাদপত্রের চমকপ্রদ শিরোনামা বা অভিসন্ধিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে ভারতকে না জেনে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের উচিত ভারত যথার্থতঃ যেমন, তেমন করে তাকে জানা। শুধু তার সম্বন্ধে সুখ্যাতি ও অত্যুক্তিটি দেখলেই চলবে না, মানুষ হিসেবে আমাদের দোষত্রুটি ও বাধা-বিপত্তির দিকটাও দেখতে হবে। অতি বিনীতভাবে আমি বলতে চাই যে, আমরা গত ছ'বছর ধরে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের দেশকে গড়তে চেষ্টা করছি, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করছি এবং বহু পুরানো দোষ-ত্রুটির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি। তা সে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা বা সামাজিক কুপ্রথা যে বিষয়েই হোক না কেন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারত একটা বৃহৎ সাহসিক কাজ ও পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে লোকেরা যদি আমাদের দেশ দেখতে আসেন, সে আরও ভাল; কেননা আমাদের লুকোবার কিছুই নেই, কিছুই গোপন নেই। ভারতে বই ও পত্রিকাদি প্রকাশ করার আগে সেগুলি প্রকাশযোগ্য কিনা তা সরকারী

কর্মচারী দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় না, ছাপাখানা ব্যাপারেও কোন বাধানিষেধ নেই; লোকে সব জায়গায় ঘুরতে পারে ও যা খুসী তাই দেখতে পারে, দেশকে জানতে পারে। ভারতের স্থপতি-বিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ বা নানাবিধ রহস্য-বিদ্যাসম্বন্ধেই যে শুধু যথেষ্ট জানবার আছে তা নয়, সেখানকার সাধারণ নরনারী কি ভাবে জীবন-যাপন করে তাও জানবার যোগ্য।

এ সব সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা ছেড়ে দিলেও এই দুই দেশের মধ্যে বহুদিন থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগও রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে যে কতখানি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগ আছে একটু পরেই আমি তা বলছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে ভারত এ দেশের বেশ বড় একটা জনমতের নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে; তাদের মধ্যে শুধু যে বিশিষ্ট জননেতা ও পণ্ডিতেরা ছিলেন তা নয়, বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকেরাও ছিলেন; আর ছিলেন তাঁরা, যাঁরা কংগ্রেস ও দেশশাসন-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের অগ্রগামী রাজনৈতিক দল যখন দাবী করল যে, যে গণতন্ত্র ও স্বাধিকার-রক্ষার নীতিতে এই যুদ্ধ চালিত হচ্ছে, সে নীতি ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের অধীন লোকদের প্রতিও যেন প্রযুক্ত হয়, তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট খুব জোর দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে বলেছিলেন—ভারতের সঙ্গে যেন একটা রাজনৈতিক মিটমাট করে নেওয়া হয়, কারণ কোন দেশের জনসাধারণের সমর্থন না পেলে একটা সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণা করা চলে না। আমার মনে হয়, আজ আবার যখন 'নিষ্ক্রিয় যুদ্ধে'র মহড়া চলেছে তখনও সে কথা মনে রাখা উচিত। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত-সরকার বিদেশে প্রথমেই যে কয়টি দূতাবাস স্থাপন করেছেন, ওয়াশিংটনেরটি তা'র মধ্যে অন্যতম। এটা শুধু যে ওয়াশিংটনের আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে সম্মান দেবার জন্য তা নয়, বরং জাতীয় সংগ্রামের দিনে আমেরিকার জনসাধারণ ভারতের জনগণের প্রতি যে সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেছিল তারই সমাদরের জন্য।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে বহুদিক দিয়ে এই যোগাযোগ সংরক্ষিত ও বর্ধিত হয়েছে। আমেরিকা ও ভারতের প্রতিনিধিগণ মিলেমিশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এবং বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্রে কাজ করে আসছেন এবং আরও কয়েকটি দিকে এই ভাবে সংযোগের ফলে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাপারের প্রত্যেকটিতে যে সম্পূর্ণ ঐক্য এসেছে তা নয়; বস্তুতঃ স্বাধীন জাতিগুলোর মধ্যে এমনটি আশা করাও ঠিক নয়। জগতের স্বাধীন জাতিগুলি ও যাদের বলা হয় একনায়কচালিত জাতি তাদের ভেতরে মূল পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত জাতিগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সহজেই তাদের বিভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে, ন্যায়তঃ এই সব পার্থক্যগুলোর সম্মুখীন হতে পারে, আবার সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য সহ-যোগিতাও করতে পারে। উদ্দেশ্যের ঐক্যের জন্য মতের মিলের প্রয়োজন নেই, কিন্তু উদ্দেশ্য সকলের মোটামুটি একই। ভারত ও আমেরিকা এই দুই দেশের লক্ষ্য ও যে সব সাধারণ প্রেরণায় তাদের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত, তা হল শান্তি, গণতান্ত্রিক জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং এই ক'বছরে এই সব উদ্দেশ্যের সংসাধনে ভারত-সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার অতীত ঘনিষ্ঠতা আজকের মত ছিল না। তার আংশিক কারণ এই যে, তখন ভারতীয় অর্থনীতির সারা কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশের সংযোগ দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। আরও একটা কারণ এই যে, গত শতাব্দীতে আমেরিকা নিজেই স্বকীয় অর্থনীতি গড়তে ব্যস্ত ছিল। তাই তেলের মত বিশেষ মাল ছাড়া সে যে বিদেশে টাকা খাটাতে পারে, এ কথা

নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্য কেউ বড় বেশী জানত না। তা হলেও কিন্তু এটা বেশ লক্ষণীয় যে, আমেরিকার শিল্পবিদরা বেশ কিছু বছর ধরে ভারতীয় অনেকগুলি বৃহৎ শিল্পপ্রচেষ্টায় সাহায্য করে এসেছেন। আমাদের দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানাটির নাম হল টাটা আয়রন্ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। এটাকে শুধু প্রাচ্যের নয়, জগতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারখানা বলা যায়। এখান থেকে ৭৫০,০০০ টনেরও বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হয়। এক কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠান ছিল বৃহত্তম ও আজও প্রাচ্যে তা বৃহত্তম আছে। পেরিন মারস্যাল এ্যাণ্ড কোম্পানী নামে এক আমেরিকাস্থ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সুরু থেকেই এই কারখানার পরামর্শ-দাতা ছিলেন। তাঁরাই এই কারখানা ও জামসেদ-পুর নগরের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন।

আমি এই সেদিন জেনেছি যে, ১৯০৭ খৃঃ হতে এই কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে জেনারেল ইলেকট্রিক কোং। বোম্বাইতে টাটার জল থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটা ব্যবসা আছে। প্রথমে এই দেশ থেকেই তার যন্ত্রপাতি-সম্পর্কীয় পরামর্শ প্রদত্ত হয়। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারি যে, আরও একটি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র খাড়া করে তুলতে আমেরিকা থেকেই মূলধনের কিছু অংশও পাওয়া গিয়েছিল। ঐ কেন্দ্র থেকে বোম্বাইএর কাপড়ের কল ও শাখা-ট্রেনগুলি (আমেরিকায় যাকে 'কমিউটার' ট্রেন বলে) তাদের বিদ্যুৎসরবরাহ পেয়ে থাকে। পরে অবশ্য ভারতে আরও কয়েকটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে; তবে আমি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যেতে ইচ্ছুক নই। আজ পর্যন্ত ভারতে নিয়োজিত আমেরিকার মোট মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী নয়, মাত্র ৪.৫ কোটি ডলার, কিন্তু বোম্বাই ও ভারতের পূর্ব-উপকূল বিশাখাপত্তনম্-এ ষ্টাণ্ডার্ড ও ক্যালটেক্স নামে দুই আমেরিকান তৈলব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি দুটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করার ফলে এই টাকার পরিমাণ বেড়েছে। এদের টাকা ধরলে আমাদের দেশে নিয়োজিত আমেরিকান মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় ১০ কোটি ডলার।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে কয়েকটি আমেরিকান শিল্প-সংস্থা নিজেরা ও ভারতীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিলে রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

গত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। যুদ্ধের আগে, ভারতের মোট বৈদেশিক ব্যবসার শতকরা সাত ভাগ ছিল আমেরিকার সঙ্গে। আজ সেটা শতকরা ২৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ খৃঃ বিদেশে আমাদের মোট রপ্তানীর শতকরা ১৭ ভাগ হয়েছে এ দেশের জন্য, তেমনি আবার আমাদের মোট আমদানীর শতকরা ৩৫ ভাগ এদেশ থেকেই গেছে। আমেরিকার সঙ্গে ধাতবদ্রব্য, যানবাহন প্রভৃতি, কলকব্জা, তেল ইত্যাদি অনেক জিনিসের ব্যবসা যুদ্ধের আগের চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেড়ে গেছে। আমরা আশা করি যে, এই সব ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আরও বেড়ে যাবে এবং এখানের 'টি কাউনসিল' প্রভৃতি প্রতিনিধিদের মারফৎ যে সংযোগ রয়েছে তা আরও বিকাশ প্রাপ্ত হবে ও আমেরিকায় আজ পাটাদির তৈরী মোটা চাদর আমদানী করার যে প্রচেষ্টা চলছে সেটাও ক্রমশঃ বেড়ে যাবে।

এ ছাড়া একটি প্রধান ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আরও সহযোগিতা দেখতে পাওয়া গেছে। আমাদের দেশ দু বছর আগে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন এখান থেকে ১৫০ কোটি ডলার মূল্যের গম ধার দেওয়া হয়। সেই দুঃসময়ে যখন আমাদের গম ও বহি-র্বাণিজ্যের শক্তি সীমাবদ্ধ, তখন এই সাহায্যের ফলে

আমরা ভয়ংকর একটা সংকট এড়িয়ে গিয়েছি। এই গমের বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রতিটি পাই আমাদের দেশের উন্নতিবর্ধক কাজ, কৃষি ও জলসেচের জন্য ব্যয়িত হবে বলে আলাদা করে রাখা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল যে, আমাদের প্রধান অসুবিধা হল অর্থের অভাব। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মত অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির প্রধান বাধা এই যে, সেখানে যদিও প্রচ্ছন্নরূপে অনেক সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু তাকে কার্যকরী করতে গেলে প্রথমে হাতে-নাতে কিছু টাকার দরকার হয়।

ভারত হল পরস্পরবিরুদ্ধ অবস্থার দেশ, তাও আবার বহুদিক হতে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে জগতের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেষ্ট ভারতে অবস্থিত এবং এই পর্বতমালার পাদদেশে আছে বিস্তৃত সমতলভূমি; ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে দুই থেকে চার ইঞ্চি বারিপাত হয়, আবার চেরাপুঞ্জিতে হয় বার্ষিক ৪০০ ইঞ্চি। কিন্তু এগুলিই শুধু একমাত্র বিপরীত অবস্থা নয়। ভারতের সবচেয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব এই যে, দেশটা সম্পৎ-শালী, কিন্তু দেশের লোকেরা গরীব। যতদিন না আমরা দেশের সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছি, এবং ঠিক ঠিক ভাবে জীবনে সমান ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারছি, ততদিন আমাদের অর্থনীতি গড়তে পারব না। তাই প্রথমেই নির্দিষ্ট কিছু অর্থ চাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে গত তিন চার বছরের মধ্যে আমরা ১০৯,০০০,০০০ ডলার ধার পেয়েছি এবং আমাদের ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের মত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না যদি আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কিছুটা ধার না করি। ১৯৫২খৃঃ ভারত ও আমেরিকা সরকারের মধ্যে ইণ্ডো-আমেরিকান টেকনিক্যাল করপোরেশন এগ্রিমেণ্ট নামে এক চুক্তি হয়েছে, যার ফলে কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্টস্ নামে কথিত খাতে ও গ্রাম-সেবার আকারে আমেরিকা-সরকার প্রায় এক শত লক্ষ ডলারের মত খরচ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এখানেও আমি খুব বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, কিন্তু এটুকু বলব যে কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্টের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল আমাদের দেশের মূল ভিত্তি চাষের ক্ষেত্রে অধিক ফসল ফলান, জলসেচ, মাছের চাষ, গ্রামের বাড়ী-ঘরদোরের উন্নতি, সংবাদ-আদান-প্রদান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের উন্নতি-বিধান করা। আমাকে আরও বলতে হচ্ছে যে, এই অর্থভাণ্ডারের প্রতিটি ডলারের জন্যে ভারত-সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বা সাত ডলার এবং অন্যান্য ব্যাপারে নয় পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে। এটা হওয়াই উচিত, কেন না কোন দেশ যদি নিজে চেষ্টা না করে তা হলে কোন বিদেশী সাহায্য তা সে যত বেশীই হোক না কেন, তাকে রক্ষা করতে পারে না। 'নিজে চেষ্টা করলে ভগবান সাহায্য করেন' এবং নিজের চেষ্টা ব্যতীত কোন দেশও মুক্তি লাভ করতে পারে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয়রাই এই কার্যসূচী নির্ধারণ করেছে, তারাই একে কাজে লাগাচ্ছে এবং প্রধানতঃ তারাই এতে টাকা যোগাচ্ছে; তবে খুব একটা সংকট-সময়ে ভারত উপরোক্ত বহিঃসাহায্য নিয়েছিল। তা ছাড়া এই দেশ থেকে ক্রমাগত পরামর্শ ও শিল্প-সংক্রান্ত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। পয়েণ্ট ফোর প্রোগ্রাম নামে আর একটা কাজ চলেছে। তার সব শেষ হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৭০ জন শিল্পবিদ ভারতে গেছেন, আর এদেশে এসেছেন ৮০ জন এখানকার চাষবাস ও জলসেচ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা-গ্রহণ করবেন বলে। এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে একটা বিরাট সহযোগিতা চলছে। কিছু গোপন না করেই বলতে পারি যে, আজ পর্যন্ত যাঁরা ভারতে গিয়ে এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করছেন তাঁদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা ভুল বোঝাবুঝি হয় নি।

বক্তব্য শেষ করবার আগে আমাকে অবশ্যই

বলতে হবে যে, যদিও এই সব নানান দিকের গুরুত্ব আছে, তবুও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল এই যে কি মনোভাব নিয়ে এই সব কাজ হচ্ছে। একদিকে যদি মাতব্বরী করবার ভাব থাকে আর অন্য দিকে যদি অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে, তা হলে শুধু আর্থিক সাহায্যে এ সব সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সত্য, খাদ্য মানুষের খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষ শুধু খাদ্য পেয়েই বাঁচতে পারে না; তাই যে মনোভাব এই দুই জাতির মধ্যে কাজ করছে তা জানা সত্যিই খুব দরকারী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দুই জাতির বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে কোন মতবাদ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বোঝার ভুল, একটু ধৈর্যের অভাব এবং পরমত-সহিষ্ণুতার অভাব বাধা সৃষ্টি করে। জীবনযাত্রার পথ যেখানে এত বিভিন্ন, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার। বক্তৃতা করার সময় এটাকে হয়ত আমরা খুবই সহজ বলতে পারি, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা ততটা সহজ নয়। আমি এদেশে থেকে বুঝেছি যে এখান থেকে যে একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণীয় সেটা হল—হতাশ না হওয়ার শিক্ষা, উদ্যম, আশাবাদী ও সাহসী হবার শিক্ষা। এখানকার সাধারণ লোক মনে করে যে সুযোগ পেলে সে না করতে পারে এমন কিছুই নেই। এমন কোন সীমান্ত নেই, তা জ্ঞান বা কর্ম যে দিকেরই হোক, যা সে পার হতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষাটি হল মূল গণতন্ত্র রাজনীতিতে নেই, আছে মানুষ ও মানুষের সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে শ্রমের মর্যাদা দেবার দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমার মনে হয়, এই দুটি প্রধান শিক্ষা এদেশ থেকে আমাদের শিখতে হবে। ভারতীয় আমরা কাজের চেয়ে ধ্যানেই বেশী অনুরক্ত; আমেরিকান আপনারা সম্ভবতঃ ধ্যানের চেয়ে কাজেই বেশী অনুরক্ত। এই দুই মনোভাবের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব। আমাদের ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্য কিছু নেই, করণীয় কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষা কিছু নেই, তবুও আমি অনবরত কাজ করে থাকি।' কেন? সৃষ্টির আনন্দের জন্য। বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক যখন কোন কিছু আবিষ্কার করেন বা কোন চিত্রকর কোন ছবি আঁকেন, তখন সে জন্য যে টাকা তিনি পুরস্কার পান বা যে সম্মান পান, সেটা তাঁকে আনন্দ দেয় না, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির আনন্দে তিনি হন আনন্দিত এবং এটাই হল বৈজ্ঞানিক বা চিত্রকরের যথার্থ পুরস্কার। আর কেবল জাগতিক সুখসুবিধার দিকটা না শিখে লোকে অন্য দেশ থেকে এই অধ্যাত্মভাবটাও শিখতে পারে।

স্বামীজীর স্মরণে

শ্রীশৈলেশ

যতনে সংগোপন করেছিলে তুমি
তোমার আপনে
ছাই চেপে আগুনের প্রভার ঝলক্
লুকাবে কেমনে?
তোমারে বাঁধোনি তুমি গন্ধ-রূপ-রাগে
এ জগৎ সনে,
প্রস্ফুটিত কুসুমের রূপ-মধু-বাস
ভ্রমর যে চিনে!

তোমারে আঁকোনি তুমি রঙ্গিন রেখায়
আলেখ্যের মত,
রামধনু-সাত রংয়ে তবু আছ আঁকা
তুমি অবিরত!
কাহারে কহোনি তুমি রাখিবারে ধরে
অনন্ত স্মরণে
তবুও সকাল সাঁঝে অন্তরের প্রীতি
নিত্য জ্বাল বোনে

ব্যক্তির মুক্তি

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'ব্যক্তির মুক্তি' কথাটির অর্থ কি দাঁড়ায়? চূড়ান্ত অদ্বৈতমতে তো ব্যক্তি অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তিমাত্র—ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই নাই। ব্যক্তিরই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে মুক্তিই বা কি, বন্ধনই বা কি—মুক্তিই বা কার, বন্ধনই বা কার? চূড়ান্ত অদ্বৈতমত চিন্তার অতীত একটি মতমাত্র—তাহা নিয়া কোন আলোচনাই চলে না।

কিন্তু সাধারণ মানবমন অনেক অদ্বৈতের পিয়াসী—সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সত্তাকে সে খুঁজিয়া পাইতে চায় এবং সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাহী অদ্বৈতে সে একটা সমাধান ও শান্তি পায়। ঋষিকল্প ব্যক্তিদের উপলব্ধির কথা বাদ দিলেও সাধারণ মানুষের এই চাওয়া হইতেই তাহার ঈশ্বর-সম্বন্ধে একেশ্বরবাদের জন্ম, যে মতবাদ ঈশ্বরকে এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সমষ্টিচৈতন্যরূপে ভাবনা করে।

মানুষের উপলব্ধি বা ধারণার এই অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়া ব্যক্তিমানুষের মুক্তির অর্থ কি দাঁড়ায় তাহাই চিন্তা করা যাক্।

এই অদ্বৈতের স্বরূপ কি? তিনি 'সর্বব্যাপী', অর্থাৎ সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী—তাঁর এই সর্বগ্রাহিতা এবং সর্বগ্রাহিতার ভাবটিই ব্রহ্মশব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী'—কথাটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই অনন্ত অচিন্ত্য বিরাট বিশ্বই তাঁর দেহ—আমাদের কল্পনায় এমন স্থান চিন্তিত হইতে পারে না যাহা তাঁহার সেই সর্বব্যাপী দেহের অংশ নয়—তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'।

তাঁহার যে বিশ্বরূপ তাহা শুধু আজকের বা এ মুহূর্তের বিশ্বকে লইয়া গঠিত নয়—তাঁহার এই বিশ্বরূপ অচিন্ত্য অনাদি অতীত, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বে দোলায়মান বর্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকে লইয়া। তেমনি অনাদি অনন্ত কালের মনঃসমষ্টি ও বোধ লইয়া তাঁহার মন ও বুদ্ধি, এই ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম সর্বকালের সব অস্তিত্বের সমষ্টি লইয়া সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের রূপ।

এই বিরাট বা ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? তাঁহাকে যখন ব্রহ্ম বা সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন ব্যক্তি অংশ ছাড়া আর কি হইতে পারে, যে অংশ তাঁকে বাদ দিয়া নয় এবং যাহা তাঁর একত্বকে অস্বীকার করিয়া নয়?

কিন্তু 'এক'ই যদি থাকে, আর কিছু যদি না থাকে, তবে অংশের কল্পনাই বা আসে কি করিয়া? অংশ কখন কল্পিত হইতে পারে? অংশের কল্পনায় তিনটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয়: (১) যার অংশ, (২) যে অংশ, (৩) যে এই অংশের দ্রষ্টা বা কল্পয়িতা। এই তিনকে স্বীকার করিয়াও অদ্বৈতকে স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ঐ তিন বা ঐ তিনকে উপলক্ষ করিয়া বহুর কল্পনাও ঐ অদ্বৈতের স্বরূপেই আছে। সেই অদ্বৈতই নিজেকে তিন এবং বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—এই তিন, এই বহু এবং এই সব লইয়াই সেই অদ্বৈত।

একের এই বহুরূপে প্রকাশ যদি একটা ভ্রান্তি হয় তবে এই ভ্রান্তিও তাহার স্বরূপেই অবস্থিত, ইহাও তাহাকে বাদ দিয়া নয়—তাই চণ্ডীতে তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই। তবে ব্যক্তির মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? ব্যক্তি-অংশই হোক আর যাহাই হোক, ব্যক্তির যে দুঃখ আছে তাহা কে

অস্বীকার করিবে? এই দুঃখই ব্যক্তির বন্ধন—ইহার হাত হইতে মুক্তিই ব্যক্তির মুক্তি। কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি দুঃখবোধ হইতে মুক্ত হন তাঁহার মুক্তিই বা কেমন এবং অপর ব্যক্তিদের 'মুক্তি' বা বন্ধনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কেমন?

দুঃখবোধ হইতেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—জড়ের দুঃখবোধ নাই এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও নাই। এই দুঃখবোধেরও তারতম্য আছে। দুঃখ ব্যক্তিরই, কিন্তু অহংবোধসম্পন্ন এই ব্যক্তি এই দুঃখবোধের সীমাকে সংকীর্ণ বা প্রসারিত করিতে পারে। এই দুঃখবোধ সংকীর্ণতম অর্থে সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহ-সম্পর্কে সীমাবদ্ধ হইতে পারে, আবার পরম উদার অর্থে সমস্ত বিশ্বমানব বা বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্বন্ধবোধে বা একত্ববোধে প্রসারিত হইতে পারে। কিন্তু যেরূপই হোক্ না কেন এই দুঃখবোধ ব্যক্তিরই এবং ইহা 'অহংবুদ্ধি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গৌতমবুদ্ধ বিশ্বের জরাব্যাধির দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন—তাই বুদ্ধের মুক্তির সাধনা ছিল বিশ্বমুক্তির সাধনা, বিভিন্ন ধর্মে বা শাস্ত্রে এই ব্যক্তির দুঃখবিমোচন বা মুক্তিপথেরই সাধনার নির্দেশ।

এই মুক্তির জন্য ব্যক্তির দিক হইতে প্রথম প্রয়োজন দুঃখ বা বন্ধন-সম্বন্ধে চেতনা—নতুবা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বা আসিবে কেন? এই দুঃখবোধের যে তারতম্য আছে, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জড়জগতে এই দুঃখবোধ প্রায় সুপ্ত, প্রাণিজগতেই এই দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়. কিন্তু এখানেও সর্বত্র দুঃখসম্পর্কে সমান চেতনা নাই, কারণ মনের বিকাশ নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে অত্যন্ত ক্ষীণ। এই দুঃখবোধ এবং দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতির আকাঙ্ক্ষা মানবজগতেই সুস্পষ্ট। কিন্তু মানুষের মধ্যেও এই চেতনার যথেষ্ট তারতম্য ব্যক্তিভেদে লক্ষিত হয়। ব্যক্তিমানুষের অহংবোধের ধারণা ও গণ্ডী বিভিন্ন ধরনের, তাই দুঃখবোধের প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষেই এই অহংবোধের পূর্ণচেতনা সম্ভব।

প্রশ্ন এই—বিশ্বের মুক্তি বাদ দিয়া কি ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব এবং উহা কি একটি ভ্রান্তি বা আত্ম-প্রতারণামাত্র নয়? মানুষ নিজের দুঃখ-সম্বন্ধে যদি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখে তবে সে দুঃখের পরিধি কি তাহার দেহাত্মবুদ্ধিতে সীমায়িত সংকীর্ণ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায় না? নিজ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বন্ধু—তাহাদেরও দুঃখবিমোচন বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি স্বাভাবিক নয়? যদি না মানুষ তাহার মুক্তিসাধনার আরম্ভেই কাপুরুষের মত আত্মপ্রতারণা ও অবিশ্বাসের পথে চলে?—'অবিশ্বাস' কি সে? —অবিশ্বাস অপরের মুক্তিতে, অপরের দুঃখবিমোচনের ক্ষমতায়, খুব উচ্চাঙ্গের সাধকও অনেক সময় এই আত্ম-প্রতারণার পথেই চলেন। সংকীর্ণ অর্থে তাঁর ব্যক্তিজীবনে এবং দুঃখজয়ে হয়ত তিনি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, সংযম, বীরত্ব এবং অবস্থার উপর আধিপত্য ও দুঃখজয়ের পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি সংকীর্ণ এবং তথাকথিত ব্যক্তিগত সাম্য ও শান্তিতে মনকে বলপূর্বক একটা সাময়িক ও কৃত্রিম তৃপ্তিদান করেন না কি? আপনার জন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করিয়া মুক্তির চিন্তা তাহাই নয় কি? এই 'অসত্য' কি ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের পথে তাঁর কাছে কোন দিন প্রকাশিত হইবে না, এই মিথ্যার ফাঁকিটুকু কি সত্যের চিরন্তনত্ব দাবী করিতে পারে? তাহা মনে হয় না—মিথ্যার ভুল সত্যের সাধকের নিকট জীবনে বা জীবনান্তরে কখনো প্রকাশিত হইবে, ইহাই অনুমান করা যায়।

ব্যক্তির দুঃখবোধ যেমন ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া ব্যক্তিরই আপনজনে পরিব্যাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, ব্যক্তির মুক্তিসাধনাও তাহাই এবং সেক্ষেত্রে সেই 'আপনার সকলে'র মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি।

ব্যক্তির আপনবোধেরও তেমনি ছোটবড় আছে। এই পরিবার-বোধ, ব্যক্তিবোধের পূর্ণ এবং প্রকৃত অভিব্যক্তিতে শুধু বিশ্বমানব নয় বিশ্বজগৎকে আপনার করিয়া লইবে, ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। 'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পের মধ্যে ব্যক্তির তৃপ্তি খুঁজি, কিন্তু সেই তৃপ্তি স্থায়ী হয় না—ব্যক্তির প্রসার হয়, তাহার আকাঙ্ক্ষার প্রসার হয় এবং ব্যক্তির আপনত্ববোধ সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে চায়। তাই সংকীর্ণতর মুক্তি একটা আত্মপ্রতারণার মুক্তি হইতে পারে—ব্যক্তির নির্ভীক দৃষ্টির কাছে তাহার সংকীর্ণতার প্রাচীর ভাঙিয়া যাইবে এবং প্রশস্ততর আকাঙ্ক্ষা প্রশস্ততর মুক্তির দাবী করিবে, নূতন ও মহত্তর দুঃখের সৃষ্টি করিবে, নূতন ও বৃহত্তর মুক্তির পথ খুঁজিবে। কিন্তু এই মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? সংকীর্ণতর অর্থে আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ দুঃখের কাল্পনিক অব্যাহতি তবু সাময়িকভাবে সম্ভব, যতদিন না জ্ঞানচক্ষু উহার সংকীর্ণতাটুকু দেখাইয়া দিয়া বৃহত্তর দুঃখ ও বৃহত্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে। কিন্তু এই কাল্পনিক ও সাময়িক তথাকথিত ব্যক্তিমুক্তিতে ব্যক্তিমুক্তির মহত্তম আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া মিটিবে? বিশ্বমুক্তিই তবে ব্যক্তিমুক্তি। কিন্তু বিশ্বমুক্তি কি আদৌ সম্ভব? তবে এই অসম্ভবের সাধনায় সংকীর্ণতর অর্থে যে ব্যক্তিমুক্তির সাধনা (যাহার ফল পরীক্ষিত), তাহাকে ছোট করায় লাভ কি? লাভ কি কে জানে? যাহা সত্য তাহাই বলা চলে। সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তিমুক্তির সাধনা যে অলীক তাহাই দেখান হইল—সেই উদার বা মহান অর্থে ব্যক্তি-সাধনার সিদ্ধি সম্ভবই হোক আর অসম্ভবই হোক না কেন, উহাই প্রকৃত ব্যক্তিমুক্তির সাধনা। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু ঐ সাধনাই যে ব্যক্তির প্রকৃত অন্তরের সাধনা তাহাই দেখান হইল। বুদ্ধদেব সাধনার এই অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়াও বলিয়াছিলেন: যতদিন বিশ্বের একটি প্রাণীও অজ্ঞানজনিত দুঃখে পীড়িত হইবে ততদিন আমি আত্মমুক্তির শেষস্তরে পদার্পণ করিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। হিন্দুদের গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনায় দেখি, ব্যক্তিসাধক প্রার্থনা করিতেছেন বহুবচনে··· 'ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—বহুর মুক্তির সাধনা সিদ্ধ হোক আর নাই হোক, ব্যক্তিহৃদয়ের উহাই অন্তরতম প্রার্থনার সত্য।

উপনিষদের ঋষিদের প্রতি মঙ্গলপাঠে দেখি এই বিশ্বমুক্তির উদার বাণী। হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় প্রার্থনা:

সর্বে চ সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

বিশ্বের জন্য এই প্রার্থনা শুধু উপনিষদ বা হিন্দুর নয়, সমস্ত ব্যক্তিমানবেরই ইহা অন্তরতম অন্তরের প্রার্থনা ও সাধনা। এই মুক্তিসাধনায় কাম্যের বিশালতা উপনিষদের ঋষিকে সংশয়ান্বিত করিতে পারে নাই। অন্তর-দেবতাকে ঋষি এই প্রার্থনা, অন্তরের এই সত্যকেই জানাইয়াছেন—ফল তাহারই হাতে রাখিয়াছেন, কারণ ফলদাতা তিনিই। 'মা ফলেষু কদাচন'—ফল-সম্বন্ধে সংশয় আর্যঋষির মুক্তিসাধনাকে মিথ্যার স্পর্শে সংকীর্ণ করিতে পারে নাই। ব্যক্তির মুক্তিসাধনা বিশ্ব-মুক্তিরই সাধনা, সংকীর্ণতর সাধনা আত্মপ্রতারণা-মাত্র, উহা ব্যক্তির অন্তরের শেষ কথা নয়।

ভয় নাই আর ভয় নাই

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

ভয় নাই আর ভয় নাই !
আমার সঙ্গে আজিকে আমার হয়ে গেছে পরিচয় ভাই।
দেখেছি আমার অতি অপরূপ
সত্যিকার সে নিত্য স্বরূপ
জেনেছি আমারে, চিনেছি আমারে, বুঝেছি আমার ক্ষয় নাই,
দুঃখে দহিতে ধুঁকিতে জরায়
জন্ম আমার হয়নি ধরায়
ভাগ্যে আমার লিখে নাই বিধি জয় ছাড়া পরাজয় ভাই।
ভয় নাই আর ভয় নাই !

দিগন্তরের প্রান্ত ছুঁয়েছে আমার মহিমা-গৌরব,
পবন-প্রবাহে উছলি ছুটেছে পুণ্যের সুধা-সৌরভ ;
আকাশে ঠেকেছে উন্নত শির,
পৃথিবীর চেয়ে আমি গম্ভীর,
সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল আমি জ্ঞান-আনন্দময় ভাই ;
'সত্য' আমার অমর ভূষণ
'সুন্দর' মোরে করেন পোষণ
শিয়রে 'শিবের' অভয় হস্ত নিত্য জাগিয়া রয় ভাই,
ভয় নাই আর ভয় নাই !

আপনার প্রভুশক্তিতে আমি স্বরাট্, সদা শুভঙ্কর,
চিত্ত আমার অধীন ভৃত্য ছয় রিপু চির-কিঙ্কর।
ইচ্ছা আমার অপ্রতিহত
শক্তি সাহস করতল-গত
বিঘ্ন বিপদ সভয়ে সতত পদতলে নত রয় ভাই ;
সিন্ধু আমার করে সম্ভ্রম
পথ ছেড়ে দেয় গিরি দুর্গম
'অসম্ভব' এ কথাটি আমার অভিধানে লেখা হয় নাই ;
ভয় নাই আর ভয় নাই !

হেলায় জিনিয়া নিতে পারি আমি বিশ্বের যত সম্পদ,
সাধনা-মূল্যে কিনে নিতে পারি অমরাবতীর রাজপদ
সুমেরুশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া
রাখিতে পারি এ মুঠায় ভরিয়া
লুটে নিতে পারি আমি চক্ষের নিমেষে কুবেরালয় ভাই ;
চন্দ্র, সূর্য, তারকা-নিকর
আমার ভুবনে এনে দেয় কর
গ্রহগণ মোর দৃষ্টিপ্রসাদ নিত্য মাগিয়া লয় ভাই ;
ভয় নাই আর ভয় নাই !

আমাতে বিরাজে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সকল গীর্বাণ
ধরা দিতে আসে চতুর্বর্গ, শান্তি পরম নির্বাণ—
সংহিতা গীতা বেদাদি আমার
স্বভাবে স্বরূপ লভে অনিবার
ভক্তি কর্ম জ্ঞান জীবনের চিরসাথী হয়ে রয় ভাই ;
আমি নির্মল, আমি নির্দোষ
সৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ
মানুষেরে আমি ভালবাসি সদা মনুষ্যত্বের জয় গাই।
ভয় নাই আর ভয় নাই !

কুম্ভস্নান

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

পুরাণে আছে প্রাচীন কালে দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতকুম্ভ প্রাপ্ত হন। ঐ অমৃত অধিকার করিবার জন্য দেবাসুরের মধ্যে বারদিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উক্ত বারদিন অমৃত-কলসটি ভূলোকে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই চার স্থানে রাখা হইয়াছিল। সেই সময়ে কলস হইতে কিছু অমৃত ঐ সব স্থানে পড়িয়া যায়। দেবতাদের বার দিন মানুষের বার বৎসর। এই কারণে ঐ চার স্থানে প্রত্যেক বারবৎসর পরে কুম্ভ-মেলা ও স্নান হইয়া আসিতেছে। যে তিথি, রাশি ও নক্ষত্রে অমৃত-কলস রাখা হইয়াছিল ঠিক ঐ সময়েই কুম্ভযোগের মুহূর্ত হইয়া থাকে। ঐ শুভক্ষণে সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থী—সকলেই স্নান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে। মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তিতে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে, মকর-সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রয়াগের

ত্রিবেণী-সঙ্গমে, চাতুর্মাস্তে নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে স্নান হয়। এই উপলক্ষে দশনামী সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও উদাসী সম্প্রদায়ের মহাসম্মেলন হইয়া থাকে। প্রতি ছয় বৎসর পরেও এই স্নানের যোগ হয়, উহাকে অর্ধকুম্ভ যোগ বলে। ইহা একমাত্র হরিদ্বার ও প্রয়াগেই হয়।

জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসিগণকে সম্প্রদায়-ভুক্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের দ্বারা জগতের উন্নতিসাধন হইবে ভাবিয়া ভারতের চারিদিকে চারিটি সন্ন্যাসীদের মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরে বদ্রিনারায়ণ ক্ষেত্রে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে দ্বারাবতী-ক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং পূর্বে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রধান চারজন শিষ্যকে পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। আচার্য শঙ্করানুগ সন্ন্যাসিবৃন্দকে দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া ঐ চার মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ সময় হইতেই সন্ন্যাসিগণ চার মঠের অন্তর্গত দশনামী সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

মুসলমান রাজত্ব কাল হইতে ইংরেজের সময়াবধি এই সন্ন্যাসিবৃন্দ নানা ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশকে ও সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ধর্মের রক্ষার জন্য কখনও কখনও তাঁহাদিগকে বৈদেশিক অত্যাচারী রাজশক্তির সহিত যুদ্ধও করিতে হইয়াছে। মধ্যযুগে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য 'আস্তানা' নির্মাণ করিয়া কিছু জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঐ সব আস্তানাই এক একটি 'আখড়া' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এই সব আখড়াতে দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে নাগা ও পরমহংস এই দুইটি সংস্কারের প্রথা আছে। আবার পরমহংসগণ পৃথক ভাবে মঠ বা আশ্রম করিয়া পূজার্চনা ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। এখনও আখড়াবাসিগণ দেশে দেশে ঘুরিয়া প্রচারকার্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের 'রমতাপঞ্চ' সন্ন্যাসীদেরই বলা হয়। আখড়া-পরিচালনার জন্য কয়েকজন নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদেরও পঞ্চ বলে। এই পঞ্চের আদেশানুযায়ী আখড়ার সমস্ত কার্য-পরিচালনা হয়। পঞ্চের যিনি প্রধান, তিনিই সংস্কারের সময় আচার্যের কাজ করিতেন। কিন্তু আজকাল একজন ব্রহ্মবিদ্ শাস্ত্রজ্ঞ পরমহংস সন্ন্যাসীকে পৃথকভাবে মনোনীত করিয়া আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁহাকে মণ্ডলীশ্বর বলে। তিনিই আখড়ার সন্ন্যাসিবৃন্দকে শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন এবং সংস্কারের সময় আচার্যের কাজ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইল মঠ বা আশ্রমেও মণ্ডলীশ্বর হইয়াছেন। তাঁহারাও মঠবাসীদের শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন ও সংস্কার দিয়া থাকেন, আবার সাধুমণ্ডলী সহ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যান দেন। মণ্ডলীর অধীশ্বর হইয়াছেন বলিয়াই মণ্ডলীশ্বর বলা হয়।

'আখড়াগুলি' নির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, আবাহন, অটল, আনন্দ ও অগ্নি—এই সাতটি নামে অভিহিত। অগ্নি আখড়ায় কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্যসংস্কার হইয়া থাকে। নাগা সন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ বিভূতি-ভূষিত জটাজুটধারী দিগম্বরবেশে থাকেন। কিন্তু পরমহংসগণ মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক আখড়ার আলাদা আলাদা নিদর্শন আছে। যেমন জটার বাঁধন কাহারও মস্তকের মধ্যে, কাহারও বা বামদিকে, কাহারও বা ডানদিকে, তেমন উত্তরীয় পরিধানের গাঁট বুকের উপরে, মাঝে বা নীচে হইয়া থাকে। বিভূতির যে গোলা হয়, তাহা গোল, চেপটা, ত্রিকোণ ও চৌকোণ প্রভৃতি আকারের হয়। আবার ত্রিপুণ্ড্রধারণও রকমারী হইয়া থাকে। এই সব নিদর্শনে প্রত্যেক আখড়ার মহাত্মাগণ অপর অপর আখড়ার মহাত্মাগণের পরিচয় পান।

এই মহাত্মাগণ প্রথমে বিরজা হোম করিয়া পরে ডালাদেবতার সম্মুখে আলাদা সংস্কার গ্রহণপূর্বক নাগা হইয়া থাকেন। দেশরক্ষার্থ যুদ্ধের সময় সন্ন্যাসিগণ শক্তির উপাসনা দ্বারা লড়াই করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই শক্তির প্রতীকরূপে বল্লমের পূজা হইয়া আসিতেছে। ঐ বল্লমই ডালা দেবতারূপে পূজিত হইতেছে। কুম্ভযোগ উপলক্ষে ডালা দেবতাকেই শোভাযাত্রা করিয়া আখড়া-বাসিগণ স্নান করিয়া থাকেন। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) হইতেই এই কুম্ভমেলার প্রবর্তন হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রতি ছয় বৎসর প্রয়াগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবৃন্দের সম্মেলন করিয়া ধর্মালোচনা করাইতেন। ইহা হইতেই পরবর্তী সময়ে পুরাণোক্ত কুম্ভযোগে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে সন্ন্যাসিবৃন্দের মহাসম্মেলন হইয়া আসিতেছে।

বর্তমানে সাতটি আখড়ার মধ্যে তিনটি আখড়াই প্রধান। যথা নির্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনা। নির্বাণীর সহিত অটল আখড়া, নিরঞ্জনীর সহিত আনন্দ আখড়া এবং জুনা আখড়ার সহিত আবাহন ও অগ্নি আখড়া একত্রে শোভাযাত্রায় যায়। এই দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ব্যতীত বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা সম্প্রদায় পরপর শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিতে যায়। নির্মলা সম্প্রদায় নানকপন্থী, আর উদাসী সম্প্রদায় নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ-প্রতিষ্ঠিত। কুম্ভযোগের স্নানে দশনামী সন্ন্যাসিগণ প্রথমে স্নান করিয়া থাকেন। পরে পরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ যান।

চৈত্রসংক্রান্তি বা মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতি কুম্ভরাশির সহিত এবং রবি মেষরাশির সহিত মিলনের সন্ধিক্ষণেই হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভযোগ হয়। একমাত্র হরিদ্বারেই কুম্ভরাশির সহিত বৃহস্পতির মিলন হয় বলিয়াই প্রকৃত কুম্ভযোগ বলা হয়। ব্রহ্ম-কুণ্ডেই এই মুখ্য স্নান হইয়া থাকে। শিবরাত্রিতে প্রথম স্নান, চৈত্র-অমাবস্যাতে দ্বিতীয় স্নান এবং মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে তৃতীয় বা প্রধান স্নান হয়। প্রথমে নিরঞ্জনী ও জুনা পাশাপাশি শোভাযাত্রায় বাহির হয় তাহার পর নির্বাণী, বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা।

পৌষ-সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতির সহিত মেষ এবং রবির সহিত মকররাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভযোগ হয়। ঐ দিনই প্রথম ও প্রধান স্নান, পরবর্তী অমাবস্যায় দ্বিতীয় ও বসন্ত পঞ্চমী বা সরস্বতীপূজার দিন তৃতীয় স্নান হইয়া থাকে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান হয়। প্রথমে নির্বাণী শোভা-যাত্রায় বাহির হয়। পরে পরে নিরঞ্জনী, জুনা, বৈরাগী, উদাসী, নির্মলা যাইয়া থাকে।

নাসিকে কুম্ভমেলা হয় চাতুর্মাস্যের সময়। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত চাতুর্মাস্যকাল। শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতির সহিত মঙ্গল ও শুক্রের সহিত সিংহরাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই পূর্ণ কুম্ভযোগের প্রধান ও প্রথম স্নান হয়। ভাদ্রের অমাবস্যায় দ্বিতীয় স্নান ও কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে তৃতীয় স্নান হয়। সন্ন্যাসিগণ নাসিক হইতে বিশ মাইল দূরে গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান ত্র্যম্বকেশ্বরে আস্তানা করিয়া কুশাবর্ত ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। এখানকার ক্রম এইরূপ: প্রথমে শোভাযাত্রায় জুনা ও নিরঞ্জনী পাশপাশি যায়; তারপর নির্বাণী, উদাসী ও নির্মলা আর বৈরাগিগণ নাসিক পঞ্চবটীতে থাকিয়া গোদাবরীর রামঘাটে স্নান করেন।

বৈশাখী পূর্ণিমাতে রবির সহিত মেষ ও বৃহস্পতির সহিত সিংহরাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই উজ্জয়িনীর পূর্ণ কুম্ভযোগের প্রধান স্নান হয়। এই স্থানে একটিই স্নান হয়। শোভাযাত্রায় মধ্যে জুনা,

ডানদিকে নিরঞ্জনী ও বামদিকে নির্বাণী—এই তিন আখড়াই পাশাপাশি যাইয়া শিপ্রা নদীতে দত্ত আখড়ার ঘাটে স্নান করে। সন্ন্যাসিগণের স্নানের পর অপর তীরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা পর পর স্নান করিয়া থাকেন।

দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার পদ্ধতি

দিগ্বিজয়ডঙ্কা— জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের বিজয়ধ্বনি : একজন নাগাসন্ন্যাসী ঘোড়ার পিঠে বসিয়া দুইটি জয়ঢাক বাজাইয়া থাকেন।

দিগ্বিজয়ঝাণ্ডা— জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের বিজয়-পতাকা : একজন নাগাসন্ন্যাসী একটি গেরুয়া পতাকা সহ ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকেন।

কসরৎ— নাগাসন্ন্যাসিগণ পদাতিক ভাবে এবং ঘোড়সোয়ার হইয়া যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার খেলা। ৩২,৮৭২.

নিদর্শন— যে আখড়ার শোভাযাত্রা উহার নাম-লিখিত নিশান।

ঐকতানবাদ্য— যুদ্ধকালীন যে বাদ্য বাজিয়াছিল।

গেরুয়া পতাকা— হাতীর উপরে সন্ন্যাসিগণের ত্যাগের প্রতীক বড় গৈরিক পতাকা।

বিজয়ী ঝাণ্ডা— যুদ্ধে জয়লাভের নিদর্শন, হাতীর উপরে জরিদার মখমলের বড় নীল রংয়ের বিজয়-পতাকা।

দণ্ডধারী— যুদ্ধকালীন যে সকল নাগাসন্ন্যাসী তাঁহাদের আরাধ্যা দেবী ও ভাণ্ডার রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকজন বস্ত্রধারী মহাপুরুষ (সন্ন্যাসী) সোনা ও রূপার নানা কারুকার্যে মণ্ডিত যষ্টিহস্তে যান।

ধুনাধারী— যুদ্ধকালীন নাগাসন্ন্যাসিগণ আরাধ্যা দেবীর পূজার্চনা করিতেন, তাহার নিদর্শন। কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রজ্বলিত সুগন্ধি ধুনার পাত্র হস্তে লইয়া যাইয়া থাকেন।

ভালা দেবতা— নাগাসন্ন্যাসিগণ শক্তির আরাধনা করিয়া বল্লমহস্তে যুদ্ধ করিতেন। শক্তির প্রতীক-রূপে ঐ বল্লমকেই পূজার্চনা করিয়া আসিতেছেন। এই বল্লমই ভালা দেবতা।

বেদপাঠ— কয়েকজন ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অক্ষতচন্দন ছড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে করিতে অগ্রসর হন।

দণ্ডধারী— দেবতার রক্ষক সন্ন্যাসিগণ।

ইষ্টদেবতা— প্রত্যেক আখড়ার ইষ্টদেবতা সোনা ও রূপার নানা কারুকার্যের পাল্কীতে বিবিধ অলঙ্কার ও ফুলের মালায় সুশোভিত। দুই দিকে দুই জন চামর ব্যজন করিতে থাকেন।

ঐকতানবাদ্য— ইষ্টদেবতার মাঙ্গলিক বাদ্য।

দণ্ডধারী— আচার্যের রক্ষক সন্ন্যাসিগণ।

মণ্ডলীশ্বর— আখড়ার আচার্যকে সুসজ্জিত পাল্কী বা হাওদাসহ হাতীর উপরে জরিদার ছাতার নীচে বসাইয়া দুইদিকে চামর ব্যজন করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হয়।

দণ্ডধারী— সন্ন্যাসীদের রক্ষক।

দিগম্বর— বিভূতি-ভূষিত নাগাসন্ন্যাসিগণ।

অবধূত— গেরুয়া বহির্বাসধারী পরমহংস সন্ন্যাসিগণ।

ব্রহ্মচারী— অগ্নি আখড়াবাসিগণ।

অবধূতানী— সন্ন্যাসিনীগণ, তাঁহারা একমাত্র জুনা আখড়ার অন্তর্ভুক্ত।

আখড়ার বিবরণ

আখড়ার নাম	আখড়ার দেবতা
নির্বাণী	কপিলমুনি
নিরঞ্জনী	কার্তিক স্বামী
জুনা	দত্তাত্রেয়
অটল (নির্বাণীর অন্তর্গত)	গজানন
আনন্দ (নিরঞ্জনীর অন্তর্গত)	সূর্য
আবাহন (জুনার অন্তর্গত)	গণেশ
অগ্নি (জুনার অন্তর্গত)	গায়ত্রী

মঠের বিবরণ

মঠের নাম : শৃঙ্গেরী মঠ　গোবর্ধন মঠ　সারদা মঠ　জ্যোতির্মঠ

ক্ষেত্র বা ধাম : রামেশ্বর　পুরুষোত্তম　দ্বারকা　বদরিকাশ্রম

প্রথম আচার্য : পৃথ্বীধর বা পদ্মপাদ　বিশ্বরূপ বা ত্রোটকাচার্য
হস্তামলক　সুরেশ্বর বা মণ্ডনমিশ্র

সম্প্রদায় : ভূরিবার　ভোগবার　কীটবার　আনন্দবার

সন্ন্যাসীদের পদবী : সরস্বতী, পুরী,　বন　তীর্থ　গিরি, পর্বত
ভারতী　অরণ্য　আশ্রম　ও সাগর

ব্রহ্মচারীদের পদবী : চৈতন্য　প্রকাশ　স্বরূপ　আনন্দ

বেদ : যজু:　ঋক্　সাম　অথর্ব

তীর্থ : তুঙ্গভদ্রা　মহোদধি　গোমতী　অলকানন্দা

অধিদেবতা : আদি বরাহ　জগন্নাথ　সিদ্ধেশ্বর　নারায়ণ

দেবতা : অধিষ্ঠাত্রী　কামাক্ষী　বিমলা　ভদ্রকালী　পূর্ণাগিরি

বৈরাগি-সম্প্রদায়

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে 'বৈরাগী' বলে। ইঁহারা অদ্বৈতবাদী নহেন ; সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। সত্ত্বগুণপ্রধান শ্রীবিষ্ণু পরাৎপর ব্রহ্ম ; তাঁহার উপাসনা অথবা তাঁহার অবতারপুরুষগণের (সত্যযুগে নরনারায়ণ, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিযুগে শ্রীচৈতন্যদেব) উপাসনা করাই ইঁহাদের সাধনা।

শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্যগণের আবির্ভাবের যুগে তাঁহাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা এই সকল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকে উপাসনা-ভেদে ইঁহাদিগকে রামায়েত, রামায়তী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এইসকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও বড় বড় আখড়া ও মঠ আছে। দক্ষিণ-দেশের স্থানে স্থানে, নাসিকে, চিত্রকূটে, অযোধ্যায়, শ্রীবৃন্দাবনধামে ও নবদ্বীপে ঐ সকল আখড়া ও মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদেশে রামানুজী বৈরাগিবেশী। অযোধ্যায় ও চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক বৈরাগিবেশী। ইঁহারা তুলসীদাসী রামায়ণ ও তুলসীদাসের দোঁহা অধ্যয়ন করেন। শ্রীবৃন্দাবন-অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বৈষ্ণব সমধিক। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সংখ্যাধিক্য।

বৈরাগী বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি প্রধান মঠধারী সম্প্রদায় আছে :

১। রামানুজাচার্য-প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়।

২। মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত মাধ্বী বা ব্রহ্মসম্প্রদায়।

৩। বল্লভাচার্য-প্রবর্তিত বল্লভাচারী বা রুদ্র-সম্প্রদায়।

৪। নিম্বার্কাচার্য-প্রবর্তিত সনকাদি সম্প্রদায়।

অন্যান্য কয়েকটি সাধুসম্প্রদায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, গরীবদাসী ইত্যাদি। তাঁহারাও বৈরাগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রীরামানন্দ, শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীর, কবীরের পুত্র কমাল, কমালের শিষ্য দাদু, দাদুর শিষ্য গরীবদাস।

শ্রীচাঁদ-প্রতিষ্ঠিত উদাসী সম্প্রদায়

গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসী হইয়া বাহির হইয়া যান। তিনি পরে যে সম্প্রদায় গঠন করেন, তাহার নাম উদাসী সম্প্রদায়। সুতরাং ইঁহারা সকলেই শ্রীচাঁদকে প্রধান বা আদি আচার্য বলিয়া মান্য করেন। ইঁহাদিগের আচার্য-গণকে মণ্ডলীশ্বর বলে। দশনামী পরমহংস সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মত এই মণ্ডলীশ্বরদেরও স্বতন্ত্র আশ্রম পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও ভারতের নানা স্থানে আছে। ইঁহারা নানকপন্থী, কিন্তু কালবশে ইঁহারা গুরু নানক অপেক্ষা শ্রীচাঁদকেই বেশী মানিয়া চলেন। গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম পাঁচ গুরুর (নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস ও অর্জুন) রচিত এবং শ্রীচাঁদের রচিত গ্রন্থসমষ্টি 'গ্রন্থ সাহেবে'র ইঁহারা পূজা ও পাঠাদি করিয়া থাকেন

বলিয়া ইঁহাদিগকে 'নানক-পন্থী' সাধুও বলা হয়। ইঁহারাও বেদান্তবাদী। ইঁহাদের আখড়ার প্রধানতঃ দুইটি শাখা : (১ উদাসী বড় আখড়া। এই আখড়ার পাঁচজন মোহন্ত আছেন। (২) শ্রীসঙ্গত সাহেবের সময় হইতে উদাসী ছোট আখড়া বা নয়া আখড়া সংগঠিত হইয়াছে। এই আখড়াতেও পাঁচজন মোহন্ত আছেন।

নির্ম্মল-সম্প্রদায় নানক-পন্থী

গুরু নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, হররাও, হরকিষণ, তেজবাহাদুর ও গোবিন্দসিংহ—শিখসম্প্রদায়ে এই দশগুরু ছিলেন। মুসলমানদের প্রবল অত্যাচারের ফলে দশম গুরু গোবিন্দসিংহ শিখসম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন : (১) সাধু-সম্প্রদায় (ধর্মরক্ষক ও প্রচারক) (২) আকালী-সম্প্রদায় (অবিবাহিত যোদ্ধাবেশে)। সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় : (১) নির্মলা আখড়া—নানক-পন্থী দশমগুরু গোবিন্দসিংহই এই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। কাজেই তিনি প্রধান বা আদি আচার্য। ইঁহাদের আশ্রমকে 'গুরুদোয়ারা' বলে। (২) দশনামী পরমহংস সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের ন্যায় বিভিন্ন মোহন্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। যথা, নির্মলা বিরকৎ কুঠিয়া নির্ম্মলবাস ইত্যাদি

সাধ ও সাধনা

'বৈভব'

হে প্রিয় সখা এসেছ তুমি
আমার মাঝেতে
আকাশ-ভরা তারায় ঘেরা
স্বপন-সাঁঝেতে!
এসেছ সখা হে প্রিয়তম
আলোর বানেতে
দূরের প্রিয় বারতা তুমি
ঢালিতে কানেতে।
ঘুমানো হিয়া জাগিয়া উঠে
তোমারি পরশে
বিরহগাথা জাগায় ব্যথা
আকুল হরষে।
হৃদয়মাঝে ফুলিয়া উঠে
পুরাণো অভিমান
মরমমাঝে রণিয়া উঠে
হারানো শত গান।
সুদূর-প্রিয়-বারতা-বহ
আসিলে তুমি আজ
অসীম পথে জ্যোতির রথে
অরূপ তব সাজ!

আঁধার রাতে তোমার আসা
বাধার পথে গো
সুনীল-ঘন-আকাশ চিরি'
আলোর রথে গো!
অরূপ-ঘন রূপের ছায়া
জাগালে কেন হায়?
কী যেন পাওয়া হারায়ে যাওয়া
তাহারে ফিরে চায়।
তাহারে ফিরে চাহিছে বুকে
হিয়ার মাঝেতে
যে প্রিয়তম আসিয়াছিল
স্বপন-সাঁঝেতে—
যে প্রিয়তম হাসিয়াছিল
নীরব রাতেতে—
যে প্রিয় ভালো বাসিয়াছিল
প্রথম প্রভাতে—
তাহারে ফিরে চাহিছে হিয়া—
তাহারি বাসনা—
তাহারি লাগি জীবন ভরি
সাধের সাধনা!

অঙ্কুর

শ্রীমতী গায়ত্রী বসু

বয়স্করা বড় বড় বিষয়-বুদ্ধির কথা বলেন, নানা পরিকল্পনা, নানা সংগঠনের কথা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁদের সেই প্রকাশভঙ্গীর অঙ্কুর নিতান্ত শৈশবেই কি গ্রথিত হয় না? শিশু-জীবনের পরিকল্পনা বৃহত্তর জীবনে কার্যকরী হয় মাত্র। শিশুরা বড়দের মত ভাবতে পারে, দূরবর্তী না হ'লেও নিকটবর্তী ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য হাস্য-রোধক বা হাস্যকর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দান করে। বারান্তরে 'শিশুমানস' প্রবন্ধে সে সব কথা আলোচনা করেছি। (শ্রাবণ, ১৩৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আজকের আলোচনার মূল বিষয় বস্তু দুটো—একটা হলো শিশুদের চিন্তাধারার পিছনে তাদের মানসিক সংগঠনা ঠিক কী প্রকার, আর দ্বিতীয়টা হলো শিশুর জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-ক্রোধের অভিব্যক্তির স্বরূপটা কেমন ধরনের।

সব মানুষের মধ্যেই তাদের মানসিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার নিজস্ব আত্মিক যোগ আছে। কথাটা সংক্ষেপে হলো 'আমি করছি' ভাব। আমি যা বুঝি, আমি যা বলি বা করি, তার মধ্যের সকল প্রকার কার্য-পরম্পরাই হলো সমীচীন। তাই কেউ যখন বেশী ত্রুটি বা বেশী অন্যায় করে, তখন তাকে কেউ সমর্থন না করলেও নিজের আমিত্ব তা' সমর্থন করে। এটার মানে হ'ল egoism. এই ইগোয়িজম্ বা আমিত্ব-ভাবাপন্ন মনোভাব ভাল-মন্দ দুই বস্তুরই সংগঠনার ক্ষেত্রে এমনই অলক্ষ্যে কাজ করতে সুরু করে যে, তার সামান্যতম অনুসন্ধানও বড় সহজ ব্যাপার নয়। শিশুর প্রারম্ভ-জীবনে এই আমিত্ব-কেন্দ্রিক ভাব খুব প্রকট। তার ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সে এটা পরিবেশন করে চলে। তবে সবার আমিত্বও শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের এবং পরের কল্যাণকর অবস্থার দিকে নিয়ে যায় না। দেয় না তাকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'বার আয়ুধ। বরং পারিপার্শ্বিকতার দুরতিক্রম্য চাপে আমিত্ব তার অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতার ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে উঠে। যখন তারা খেলা করে, দল বাঁধে, আর পাঁচ জনকে নিয়ে সমাজজীবনের প্রাথমিক জীবনযাত্রা শুরু করে, তখন তাদের প্রত্যেকেরই কার্য-পরিবেশনে লক্ষ্য করা গেছে যে, তারা তাদের নিজ নিজ প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেবার জন্য দাবী জানায়—পক্ষান্তরে, সে স্বীকৃতি না ঘটলে নানা ভাবে আপত্তি জানায়। সবার আমিত্ব সত্যকার কল্যাণপ্রসূ নয়, তার কারণ সবাই সেটাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। আবার সবার আমিত্বের স্বীকৃতিও হয় না। তারও একটা কারণ আছে। সেটা হলো আমিত্বকে চালিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব। শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এটা শুনতে কেমন হ'লেও খুব সত্যি। যেমন সত্যি মধ্যাহ্ন-সূর্যের চেয়েও প্রভাত-সূর্যের স্বাস্থ্যগত তাপ-উপযোগিতা অধিক।

এই ব্যক্তিত্বের কার্যকারিতা-সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার প্রয়োজন আছে। অনেক মহান্ লোকের শিশুজীবনের কাহিনীতে শোনা গেছে, তাঁরা নাকি তাঁদের অপরাপর সমসাময়িক শিশুদের প্রত্যেকের চেয়েও বিভিন্ন ধরনের ছিলেন। এই বিভিন্ন ধরনটা হলো তাঁদের egoismকে চালিত করবার জন্যে অতিশক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। দল গড়বো, কিন্তু দলের নেতা হ'বো, ছবি আঁকবো, সবাইকে চমকে দেবো, মনের ঔদার্য-প্রখরতা দেখাবো

যাতে সবাই আশ্চর্য হ'য়ে যেতে পারে—এমনই মনোবিকাশের বাসনা অবরুদ্ধ মনের অন্তরে অনবরতই তরঙ্গাঘাত করছে, কিন্তু বাইরে আসবার পথ সবার পক্ষে সুগম হচ্ছে না। কারণটা হলো তাকে, বিশেষ করে আমিত্ব-ভাবাপন্ন মানসিক সংগঠনকে চালিত করবার প্রকৃত শক্তির অভাব। সাহসটা ক্রমেই তার কাজে আর মনে দৃঢ়তা এনে দিতে পারে যখন সাফল্যের জয়মাল্য তার গলায় এসে পড়ে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা, "এসেছিস্ যখন তখন একটা দাগ রেখে যা।" এই দাগ রেখে যাবার পিছনে যে সংগ্রামের অন্তর্লীন চিহ্ন পাওয়া যাবে, তার মূল কোন্ প্রেরণাসঞ্জাত? পৃথিবীতে যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিনের মধ্যে অন্ততঃ কমপক্ষে কয়েকটি দিনও যেন তার নাম, তার পরিচয়, তার স্মৃতি অম্লান থাকে, এই প্রচেষ্টা মানবের আদিম প্রচেষ্টা, এই ইচ্ছা মানুষের শ্রেষ্ঠ আন্তরিক ইচ্ছা, এই উদ্দেশ্যই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। শিশুদের খেলা-ঘরের জীবন অলীক —এই রকম মন্তব্য করেন সুগঠিত মস্তিষ্ক বয়স্করা। কিন্তু তার এই অলীক জীবনের মধ্যেই উত্তরকালের সম্ভাব্য পরিণতির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। খেলা-ঘরে তার মনের সঙ্গে, মতের সঙ্গে ক্রীড়াসূচীর মিল হ'ল না। ফলে খেলা সে ভেঙ্গেই দিল। সামাজিক কর্মি-পরিষদ গঠিত হ'ল— কর্তৃত্ব করতে পেল না ব'লে দলে ভাঙ্গন এনে দিল। সাহিত্য-সেবার অঙ্গ হিসাবে সাময়িক পত্রিকা, বুলেটিন, আলোচনাপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করবার প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল। মূল উদ্যোক্তার মত ভিন্নমুখী হওয়ার জন্য সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল। আর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। এ সবই হ'ল আমিত্বের সর্বাধিনায়কতা। প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, উদ্দীপনা, এমন কি অহঙ্কারের সঙ্গেও পা মিলিয়ে মিলিয়ে সে চলে। তাই যার মধ্যে সে শক্তির সঞ্চয় অতিরিক্ত তার প্রভাবকে কেউই ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আসলে সেটাই হলো আমিত্বের ব্যক্তিত্ব।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা। সব প্রবণতার অভিব্যক্তি শিশুর মানসলোকে শিশুকাল থেকেই অঙ্কুরিত হয় না। কোনো কোনো আবেগ তার স্পষ্ট রূপ প্রকাশ করে তখন, যখন শৈশবের সুবিস্তীর্ণ অসহায়তা কেটে যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু যে ভাবাবেগের অস্তিত্বটা জীবনের শুরু হ'তেই প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয় সেটা হ'ল ক্রোধ। তার অর্থ হ'ল, ক্রোধকে একেবারে প্রাথমিক ভাবাবেগ বা ভাবানুভূতি এবং তার প্রকাশ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ক্রোধ-লোভ-বিরক্তি প্রায় একই পাত্র হ'তে পরিবেশিত হয়। কেবলমাত্র প্রকাশ-ভঙ্গীর রূপ বা স্বরূপটা একান্তই ভিন্ন। আয়ত্তে আনবার উদ্যম বা উদ্দামতা সকল সময়েই বেশ প্রবল। সেই প্রাবল্যকে রোধ করবার শক্তির অভাবেই ক্রোধরূপে বাইরে দেখা দেয়। অবশ্য সেই শক্তি অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে না-পাওয়া-জনিত ক্ষতিকে সহ্য করবার সংযম অনেক পরে অর্জিত হয়। মনোবিকারের আদিমতা যতদিন এবং যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা হওয়া সম্ভব নয়। মুঠোর বাইরে যেটা রয়ে গেল, সেটাকে পাবার জন্য যে চেষ্টা তার বিফলতা থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ সব সময় একই প্রকাশ-ভঙ্গী নিয়ে বিদ্যমান থাকে না। রূপান্তরিত হয় নব নব বিন্যাসে। লোভ হয়েছে কোন বস্তুর উপর; শিশুর মানসিক গঠন তাকে তখনই পাবার জন্যে প্রেরণা যোগালো। বিফলতার ফলে আবার সঙ্গে সঙ্গে জাগল ক্রোধ; আর বাড়লো লোভ। পাওয়া গেল না বলে পাবার আগ্রহটা তীব্র হ'তে তীব্রতর হ'তে লাগল এবং ক্রমেই বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট লোভের আকার গঠন করতে সমর্থ হল। বিরক্তিও সেই ভাবে এবং সেই বিচারভঙ্গীর দিক থেকে ক্রোধের অপ্রত্যক্ষ পরিণতি।

প্রথম অবস্থায় তীব্র ক্রোধ সংযমের অভাবে মনের মধ্যে একটা মানসিক বিকার সৃষ্টি করতে পারে। সেটা অতৃপ্তি, প্রকারান্তরে বিরক্তি। মান-অভিমান বা ঈর্ষা, মনোমালিন্য, রাগ, বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্যসূচক ভাবাবেগের প্রকাশ শৈশব-মনোজগতে মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং বলা যেতে পারে, সেগুলোর উপলব্ধি একান্তই অনুপস্থিত। রাগ ক'রে ধূলোয় গড়াগড়ি দেওয়া, খাবারের থালাটাকে দূরে ঠেলে দেওয়া, সমবয়সীদের প্রহার করা, কীট-পতঙ্গদের যন্ত্রণা দেওয়া, জিনিষপত্র ভেঙ্গে ক্ষতি করবার চেষ্টা করা প্রভৃতি বহু কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেগুলি যে সময়ে ঘটছে তখন থেকে পিছনের দিকে যে অল্পপরিসর শিশুজীবন অতিক্রান্ত হয়ে এসেছে তার বিষয়ে গবেষণা করা দরকার। অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তথ্যের আর তত্ত্বের—যা থেকে এই পরিণতিটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যেখানেই জয়ী হয়েছে, সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বগুলি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, কারণটা সম্পূর্ণ ক্রোধসঞ্জাত—অথবা ক্রোধের পরিণতি যে বিরক্তি, অতৃপ্তি তা থেকেই উদ্ভূত। বিক্ষোভ যেখানে কার্যকর ফলদান করবে না সেখানে বিক্ষোভ ত চলবে না। তবে উপায়? উপায় কিছু আছে অবশ্য, কিন্তু সেটা সংযম-শিক্ষার পরে। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে উপায়টার চেয়ে পরিণতির প্রশ্নটা বিশেষ প্রত্যক্ষ। বিক্ষোভ যখন বাহিরে প্রকাশমান নয়, পরিণতি তখন অন্তর্দিকে চলে—অনেকটা মর্মলোকের গোপনদ্বার দিয়ে অন্তঃপুরের অন্তরীক্ষে।

এবার আরও একটা প্রয়োজনীয় ভাবানুভূতির কথা আলোচনা না করলে প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ হবে না। সেটা হ'ল আনন্দ। প্রাথমিক ভাবাবেগের পর্যায়ভুক্ত এটাও। প্রকাশের ভঙ্গিমা সবসময়ে না থাকলেও প্রকাশমান যে আছে সেটা চোখ আর মুখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হ'তে পারে। আনন্দের অনুভূতিটা হ'ল অনেক পরিমাণে মনো-বীণার সহানুভূতি বা দরদের তারে সুরসৃষ্টির কাজ করা। যেখানে কিছুটা সমর্থন, কিছু পরিমাণে সহানুভূতি, কিছু অংশের স্বীকৃতি থাকে, সেইখান থেকেই এই রসের উৎস তার জয়যাত্রা শুরু করে। ভাল লাগলেই ভাল ব'লে অনুভূত হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে ভাল লাগবার মধ্যে সমর্থনের অভাব যদি না হয়, তা হ'লে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত শিহরণ সৃষ্ট হয়। সেটা আনন্দ-রসানুভূতির তরঙ্গাঘাত। শিশু কিছু প্রত্যাশা করল, সেটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হ'ল, সুতরাং সে খানিকটা আত্মপ্রীতি বা আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোধ করল। সেটাই তার খুশীর মনে আনন্দের ঢেউ তুলে দিল। কোনো সামান্য-তম প্রকাশ বা নড়াচড়া স্বীকৃতি লাভ করলে শিশুর কাছে সেটা বিরাট কীর্তি—সাফল্য, গর্ব আর আনন্দে ভরা। আর এই আনন্দের রসলোক প্রকৃতির মূল অনুভূতি থেকে সঞ্চারিত হয় ব'লে এই ভাবানুভূতি প্রকৃতপক্ষে শিশুর প্রাথমিক সংগঠনার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। যার মনের মাঝে কোনো সময়ে আনন্দের ঢেউ লাগে না, তার প্রসারের সম্ভাবনা নেই। আনন্দানু-ভূতি হ'ল একমাত্র আবেগ যা' সব বড় হবার পথগুলোকে আলোকিত ক'রে রাখতে সক্ষম। আনন্দটা কেমন করে শিশুর মানসিক শক্তির সঞ্চার ও বুদ্ধির সহায়তা করে সেটা বোধ হয় একটু বুঝিয়ে বলা প্রাসঙ্গিকই হবে। প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতে যে উদ্দীপনা সঞ্চিত হয় সেটার প্রতি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ মানুষের শৈশবে বড় হবার বিরাট গ্রন্থি। সেই গ্রন্থির বন্ধন খুলে দিতে পারে আনন্দের পরিবেশন। দ্বিতীয় অবস্থায় হ'ল সাফল্যলাভ ও আকারগত বৈশিষ্ট্য। সাফল্যলাভ সমাধানের জন্যই নয় বরং প্রকারান্তরে

এটা আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সফলতালাভ ঘটেছে যখন, তখন শিশু আরও ভিন্নতর বস্তুতে নিজেকে নিযুক্ত করবার প্রয়াস করবে। তা না হ'লে সাফল্যের উপযোগিতাই কী? সাফল্যের জন্য যে অনুভূতি বিশেষ করে তাকে আরও কোনো কর্ম-প্রেরণার প্রতি উন্মুখ ক'রে তোলে সেটাই ত আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। তৃতীয় পর্যায়ে হ'ল আনন্দের রসপাত্র হ'তে পরিবেশিত হয় ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, কর্ম-দ্যোতনা, পুনঃপ্রয়োগ, উদ্যোগ ও উদ্যম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ে আনন্দই একমাত্র একটা শিশুকে পরিণত মানবে রূপান্তরিত করবার অঙ্কুর ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে। ব্যর্থতা কেন আসে বা ব্যর্থতা কি বস্তু? প্রকৃত কথা বলতে গেলে শিশুর কাছে এর পরিচয় অত্যন্ত আপেক্ষিক। আনন্দ যদি না থাকে সফলতাও ব্যর্থ ব'লে অথবা ব্যর্থতার রূপ ধরে মনোবেদনার কারণ হ'য়ে দেখা দিতে পারে। মিষ্টি-মাখানো তিক্ত দ্রব্য যেমন মিষ্টতার প্রভাবে আপন তিক্ততাকে হারাতে বাধ্য হয়, জীবনের সব অসামঞ্জস্য, তুচ্ছতাও তেমনি আনন্দধারায় প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠে। এইটাই আনন্দরসানুভূতির গূঢ় কথা। আর এই মূল সুরটাও অতি শিশুজীবনেই দানা বেঁধে উঠে এবং যথাকালে অঙ্কুরিত হ'বার জন্য অনুকূল পরিবেশের সন্ধান করে।

তাহ'লে দেখা গেল, গঠনের ক্ষেত্রে egoism যতটা আনন্দকে বাহন করে চলা শুরু ক'রতে পারবে ততটাই তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুসাধিত হবে। ক্রোধকে ও অন্যান্য তীব্রতর উদ্দীপনা বা ভাবাবেগকে সংযত করবার পক্ষেও তার উপযোগিতা কম নয়। বরং প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে egoism যেখানে ব্যর্থ হ'য়েছে, সেখানে আনন্দের মন্দাকিনীধারা অনুপস্থিত ছিল। কারণ, যে বিরুদ্ধশক্তি আমিত্বভাবাপন্ন মনোভাবকে ধ্বংস করতে পারে তাকে পরাভূত করবার একমাত্র উপায় হ'ল আনন্দের সাধনা। প্রারম্ভ-জীবনে মানবশিশু যাতে সেই সাধনায় ব্রতী হ'তে পারে, তার জন্য সকলকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার আলোচনার এইটাই হ'ল প্রধানতম ইঙ্গিত।

দুটি কবিতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

'উত্তর'

কহিল সাগর
আকাশের মুখ চুমি
"ওগো প্রিয়তম
কত বড় বলো তুমি?"
কহিল আকাশ
"একি কথা তব মুখে?
মোর ছবি আঁকা
রয়েছে যে তব বুকে!"

আকাশে সাগরে যেথা
করে কোলাকুলি
উদার বাতাস সেথা
নিচ্ছে পদধূলি।
মহতে মহতে যেথা
হয় দরশন
বিরাজে কেবলি সেথা
লীলা উপবন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ

শ্রীনবশঙ্কর রায় চৌধুরী

ধর্মের আকাশে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আচার্যরূপে ও প্রচারকরূপে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রতিভা যে দিকেই নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই দিকই অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষকে তিনি চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যেই নারায়ণ বিদ্যমান, এবং তাহার সেবাই ঈশ্বরের সেবা এইরূপ প্রচার করিয়া মানুষকে অপূর্ব মর্যাদা দান করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও বলিয়াছিলেন, "I am called to serve men. My object is not merely to look to the spiritual welfare of men, but also to their bodily welfare." (The Apostle's Calling) ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহাতেই ব্রহ্মলাভ, ইহা কেশবচন্দ্র বার বার প্রার্থনামঞ্চ ও তাঁহার বক্তৃতাবলীতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইখানে স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মানবপ্রেমে ও মানব-সেবাতে দুইজনই জীবন উৎসর্গ করেন। আমাদের মহৎ কর্তব্য-সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা শুধু এযুগে নয়, যুগ হইতে যুগান্তরে মনুষ্যসমাজের চিন্তার খোরাক হইয়া থাকিবে। তাঁহার ধর্মজীবনে যে সব মহাপুরুষ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। যৌবনে পৌত্তলিকতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া কেশবচন্দ্র নিজ চিত্তে অস্থিরতা অনুভব করেন। অন্য কোন মতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া পাপবোধের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়েন। এইপ্রকার মানসিক কষ্টের মধ্যে যখন তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত একটি প্রচারপুস্তক তাঁহার হাতে আসে। সেই প্রচারপুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও নিজ মতের অনেক সমর্থন দেখিতে পাওয়ায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহার পূর্বে তাঁহার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীঃ ইংলণ্ডে এক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "English education unsettled my mind, and left a void; I had given up idolatry, but received no positive system of faith to replace it. (Lectures in England)

তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের আদেশে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য যতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে অথবা মহর্ষির আকর্ষণে, যে ভাবেই হউক, মহর্ষি-সঙ্গলাভ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া যিনি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় গতিলাভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াই কেশবচন্দ্র নিজ ব্যক্তিত্বের বলে নেতা ও উপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইলেন। প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া রুদ্ধ কারাগারে এতদিন যাহা অপ্রকাশিত ছিল তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সমাজ ও দেশ ঈশ্বরের আদেশ ও নববিশ্বাস-সম্বন্ধে নূতন কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের চরিত্রে বৈরাগ্য-প্রণোদিত দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। যে যুগে খ্রীষ্টধর্ম ও ইংরেজী সভ্যতার হাবভাব আমাদের শিক্ষিত সমাজে উগ্র আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, সে যুগে কেশবচন্দ্রের চরিত্রের গতি উহা হইতে ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছিল। তৎকালে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উহার আচার-ব্যবহার হইতে নিজেকে দূরে রাখা কেশবচন্দ্রের দৃঢ় চরিত্রের এক অভিনব প্রকাশ। মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতেই দুইজন দুইজনকে বুঝিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন এই বৃদ্ধ ও যুবার মধ্যে ধর্মের গভীর আলোচনা চলিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র বলিয়া যাইতেছেন, বৃদ্ধ একমনে শুনিয়া যাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে মহর্ষি কিছু বলিতেছেন, কিন্তু শুনিতেছেন বেশি। এরকম শ্রোতা মানুষের জীবনে কয়জন আসে? মহর্ষির সত্যসন্ধানী দৃষ্টি কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশা-ভরসার একটি উজ্জ্বলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। কেশবচন্দ্রও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় শান্তি লাভ করিলেন। পরবর্তী জীবনে কেশবচন্দ্র মহর্ষি-প্রদর্শিত পথ হইতে ভিন্নপথ অনুসরণ করিলেও দুইজনের মধ্যে মধুর আত্মিক সম্বন্ধ চিরদিনই অটুট ছিল। ১৮৬২ খ্রীঃ মার্চ মাসে বর্ধমানের অন্তর্গত শুসকরা গ্রামে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকাকালীন মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে বরণ করিবার নির্দেশ ঈশ্বরের নিকট হইতে পান। "কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে বরণ কর, সমাজ সর্বপ্রকারে সমুন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইবে।" (শ্রীকেশব-কাহিনী) ঈশ্বরের নিকট হইতে এইপ্রকার নির্দেশ পাওয়া মাত্র মহর্ষি তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ করিলেন ১৮৬২, ১লা বৈশাখ।

ইহার পর কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার-রূপে আমরা দেখিতে পাই। ব্রহ্মবাণী অনুসরণ করিয়া তিনি যেদিকেই চলেন সকল ব্রাহ্মেরা সেইদিকেই চলিতে লাগিলেন। আচার্যের গুরু দায়িত্বের পদে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি মন স্থির করিয়া মহর্ষির অনুমতি লইয়া পূর্ববঙ্গ-প্রচার-সফরে যান। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মিলন ও আচার্যপদে অভিষেক; অতএব ব্রহ্মানন্দের পূর্ববঙ্গ সফরেও আমরা করুণাময়ের মঙ্গলহস্ত অনুমান করিয়া লইতে পারি। ইহার পূর্বে তিনি একবার ধর্ম-প্রচারে কৃষ্ণনগরে আসেন। সেই সময় কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত নদীয়া জেলা খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের কবলে পতিত হয়। কেশবচন্দ্রের প্রচার-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাক্তার ডফ্ তাঁহার অসাধারণ কার্যক্ষমতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "The Brahmo Samaj is a power—a power of no mean order—in the midst of us." (শ্রীকেশব-কাহিনী) কেশবচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ-সফরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কখনও পদব্রজে কখনও নৌকায় ব্রহ্মবাণী প্রচার করেন। এই সময় তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ 'True *Faith*' রচনা করেন। কেশবচন্দ্র বিশ্বাসাত্মা পুরুষ, তাঁহার বিশ্বাস তাঁহাকে নানারূপ পরীক্ষার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছে। সমস্ত জীবনটাই যুদ্ধক্ষেত্র মনে করিয়া তাঁহার 'জীবনবেদে' এক জায়গায় লিখিয়া গিয়াছেন, "এখন যদি শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্বলিত হয়, বিপদ আসিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি ভয় নাই। কেননা জয়ী হইবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি, কোন যুদ্ধেই হারি নাই। যত মহারণে প্রবৃত্ত হইলাম, যত অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলাম, সর্বত্রই জয় হইল।" 'True Faith' গ্রন্থে তিনি যে অপূর্ব বাণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা

ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে এবং সমষ্টিগতভাবে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে ধর্মজগতের এক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে ব্রাহ্মসমাজে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর জন্য যাঁহার নাম প্রথমেই করিতে হয় তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাড়া আর কেহই নন। ব্রাহ্মসমাজে নানাপ্রকার ব্যাপারে লিপ্ত থাকাকালীন কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে নানাভাবের উদয় হইতে থাকে।

১৮৭০ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরে, ঠিক এই সময়টিতে কেশবচন্দ্রের মনের ভাব বিশ্লেষণ করা অথবা তাহার গতিধারা চিন্তা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পূর্বেই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান এবং প্রার্থনার সময় সময়মত তাহার উল্লেখ করেন। এখন তিনি তাঁহার কর্মপদ্ধতিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। প্রথম মানুষ প্রস্তুত করা, দ্বিতীয় মনুষ্যসমাজের সেবা। 'The Apostle's Calling'এ তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "I am called to form men." আবার বলিয়াছেন, "I am called to serve men." এই দুইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বেই সেখানে কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত এবং ধার্মিক সম্প্রদায়ের একটি পরিচয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনবার্তায় তৎকালে ইংলণ্ডে সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহার ইংলণ্ডভ্রমণ-বৃত্তান্ত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। নববিধান, তথা এশিয়ার মর্মবাণী লইয়া এডিনবরা, মাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, যেখানেই তিনি গিয়াছেন, জনসাধারণ তাঁহার বাণী ও বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে অবস্থান স্বল্পকাল হইলেও তাঁহার প্রভাব বহুকাল ছিল। তাঁহার মৃত্যুর ২৭ বৎসর পর ১৯১০ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী লণ্ডনে এক কেশব-স্মৃতিবাসরে পণ্ডিত ষ্টিফেনস্ শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া অবনতমস্তকে বলিয়াছিলেন, "England owes him a debt of gratitude not only for his direct, but also for the influence of his indirect teaching." (শ্রীকেশব-কাহিনী) কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডগমনে প্রচারের উদ্দেশ্য যতটা ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি সেখানকার রাজনৈতিক মহলে আবেদন করিলে তাঁহারা তাঁহাকে পিতৃভূমির অভাবমোচনের যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া ফিরিবার পথে মিশর হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর সেখানকার সুহৃদ্‌গণকে এক পত্রে লিখেন,—"আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকট গিয়াছিলাম; উহার দুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাবপূরণনিমিত্ত আপনারা প্রস্তুত, এ বিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ-সহকারে আমার নিকট যে আপনারা কৃতসঙ্কল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা ভাবি তখনই আমার আহ্লাদ উপস্থিত হয়।" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিজয়ী বীরের মত ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নববিধান-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেকে ব্রহ্মানন্দকে ভুল বুঝিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন নববিধানই তাঁহার ধর্মজীবনে পূর্ণতা আনিয়াছে তাঁহারাও ভুল করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার ধর্মজীবনে নববিধান উল্লেখযোগ্য

হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। তাঁহার ধর্মজীবনে নববিধান ক্রমবিকাশ মাত্র। নববিধানের পূর্বে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহার ভিতর দিয়া নববিধানের লীলা প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইল। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া ব্রহ্মানন্দ কেন বাহির হইয়া আসিলেন, এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ যখন কেশবচন্দ্রের সংস্কার পছন্দ করিল না তখন সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসা ছাড়া তাঁহার আর কি উপায় ছিল? প্রার্থনামঞ্চ হইতে এই সময় তিনি বলিতেছেন,—"হে মুক্তিদাতা বিধানের মালিক, সেই পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে, প্রায় অতীত হইল। একটি সামান্য শিবির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী।" কেশবচন্দ্রের যোগদানের পূর্বে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের গতি ছিল না বলিলেই হয়। তিনি উহার আচার্যপদে আরোহণ করিয়াই চাহিলেন উহাকে টানিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে, চাহিলেন উহার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রচারকার্য চালাইতে। এইখানেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ নববিধান তাঁহার আরব্ধ কার্য, যাহা ঈশ্বরের কার্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহাই সমাপন করিবার জন্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ-ত্যাগের কথা উঠিলেই প্রথমেই মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা। ব্রহ্মানন্দের সংস্কারকার্য মহর্ষি পছন্দ করিতেন না; উহা তাঁহার পত্রাবলীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুভাবের সঙ্গে জগতের অন্য ধর্মের মূলভাব মিশাইয়া এক মহাধর্মবিধানের ইচ্ছা মহর্ষির মনঃপূত হইল না। নিখিলবিশ্বকে কার্যক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া ও ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিধান প্রচারের ইচ্ছা মহর্ষি অনুমোদন করেন নাই। মূলতঃ একদিকে মহর্ষির অনিচ্ছা, অন্যদিকে ব্রহ্মানন্দের ঈশ্বরের বিধান প্রচারের অদম্য ইচ্ছা, এই দুই বিরুদ্ধ-শক্তির সংঘাতেই নববিধানের প্রকাশ। নববিধান-স্থাপনে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের দৃঢ়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার মহিমাপ্রচারের তাগিদ এমন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্বজীবন হইতে তাঁহাকে হাত ধরিয়া যেন একটি অদৃশ্য শক্তি পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে পূর্ণতার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ ও মহর্ষিকে ত্যাগ করিবার পরও মহর্ষি ব্রহ্মানন্দের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায়: "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না—তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার মত মনে হয়।" অন্য এক পত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে লিখিতেছেন,—"আমার জীবনে বঙ্গভূমিমধ্যে তোমা অপেক্ষা বিশুদ্ধচরিত্র ও মহৎব্যক্তি দেখি নাই।"

নদী ও সাগরের মিলন যেমন মহামিলন, এইরূপ কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণদেবের মিলন। সাগরের আকর্ষণে নদী যেমন আকৃষ্ট হয় কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন-আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দুইজনই দিব্যোন্মাদ, দুইজনই ধর্মের স্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছেন। বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্দ্র মাঝে মধ্যে সশিষ্য উপাসনার ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৭৫ খৃঃ এপ্রিলের শেষে ব্রহ্মানন্দ সশিষ্য যখন বেলঘরিয়ার তপোবনে উপাসনায় নিযুক্ত আছেন, সেই সময় পরমহংসদেব তাঁহার ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব প্রথমেই কহিলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।" ইহার পর একটি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন। সমাধি থাকা কালীন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্রের মধ্যে কি দর্শন করিয়াছিলেন তাহা চিন্তার বিষয়। হিন্দুধর্মের নবযুগের বাহকগণ বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" পরমহংসদেব ধর্মজগতে নবযুগের বাহকগণের গুরুস্থানীয়। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে উপমাযোগে কত অধ্যাত্মতত্ত্বকথা শুনাইলেন। বহুবার ব্রহ্মানন্দ-পরমহংসদেবের মিলন হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিলে পরমহংসদেব ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। কখনও তাঁহার হাত ধরিয়া নাচিতেন, কখনও বুকে জড়াইয়া কহিতেন, "তুমি শ্যাম আমি রাধা।" ভাবের জগতে ভাবপাগলের এই খেলা কয় জন বুঝিতে পারে?

বহুদিন হইল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছেন। যে সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আজও সম্যকরূপে হয় নাই। যে যুগে যে ভাবের আদর্শ তিনি বহন করিতেন এবং যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহাকে অসাধারণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এবং উপলব্ধি করা যাইবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কেন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান ধর্মের প্লাবন হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যেমন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই রকম খ্রীষ্টধর্মের প্লাবন রোধ করিতে বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। নিজেকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার অনুসাশন-পালনই ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নিজের উপর অখণ্ড বিশ্বাসই ইহার মূল কারণ। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মুক্ত বিহঙ্গের মত ধর্মাকাশে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী আমাকে এবং আমার ধর্মকে গ্রহণ করিবে।" শতবর্ষ পূর্বে এক কর্মবীর ধর্মবীর বাঙ্গালী যতখানি আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ভারতবাসী কি কোনদিন তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে?

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

[আগামী ২২শে মাঘ, শুক্রবার (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'মানসপুত্র'—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর (রাখাল মহারাজের) পুণ্য জন্মতিথি। সময়োপযোগী এই স্মৃতি-কাহিনীগুলি ভগবৎ-পার্ষদ 'নিত্যসিদ্ধ' মহাপুরুষের উদ্দেশে স্মরণার্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।—উঃ সঃ]

(এক)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

পাঠ্যাবস্থায় প্রথম 'মহারাজ' ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয় স্বামীজীর তিথিপূজার দিন (১৯১২ খৃষ্টাব্দ) বেলুড়মঠের ভিজিটার্স রুমে। ঘরের মধ্যেই বেড়াচ্ছেন। পাখোয়াজের সহিত গান হবে, সব প্রস্তুত। বাগবাজারের একটি ছেলে তাঁকে একখানি হাতে আঁকা স্বামীজীর ছবি, পেন্সিল স্কেচ উপহার দিলে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি আসনে বসলে ধ্রুপদ গান চলতে লাগলো। আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। যখন বেরিয়ে এলেন, তখন

আমি ও আমার সহপাঠী শচীন উভয়ে প্রণাম করলুম। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছ?" বল্লুম, "আমহার্ষ্ট স্ট্রীট থেকে।" বল্লেন, "আজ বড় ভিড়, লোকজন, আর একদিন এসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।" এমন মিষ্ট কথা কখন শুনিনি। কিন্তু যতবারই এসেছি পাঠ্যাবস্থায় আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। একেবারে দেখা হলো যখন গৃহত্যাগ করে মঠে যোগ দিলুম। সবে মঠে ঢুকেছি কয়েক মাসমাত্র, মহারাজ মান্দ্রাজ বা কাশী থেকে এলেন, ঠিক মনে নেই। উঠানে আমগাছ-তলায় বেঞ্চির উপর বসে তামাক খেতে লাগলেন। আমি, ঈশ্বর, বিরূপাক্ষ, বীরেন, মাখন, যতীন ডাক্তার, চারুদা, গোঁসাই, নরেনদা, গোপাল প্রভৃতি সকলে নমস্কার করলুম। বাবুরাম মহারাজ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহারাজ বল্লেন, "একজনকে করলে সকলকে নমস্কার করতে হয় আমরা তখন বাবুরাম মহারাজকেও প্রণাম করলুম। হঠাৎ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "তোমাকে দেখা করতে বলেছিলাম না একবার?" আমি বল্লুম, "হাঁ, কিন্তু যতবারই আমি মঠে এসেছি, আপনি ছিলেন না।" জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম লাগছে, পারবে ত?" আমি বল্লুম, "খুব ভাল লাগছে, ঠাকুরের যদি কৃপা থাকে, তা হলে আর পারব না কেন?"

তিনি বল্লেন, "হাঁ, হাঁ, থাকা না থাকা তাঁর হাত। বেশ কাজকর্ম কর। সর্বদাই মনে রাখবে যে ঠাকুরের সেবা করছি, মানুষের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে শান্তি পাবে না। ঠাকুরের সেবা করছি মনে করলে, ভাল মন্দ সকল অবস্থায় আনন্দে থাকবে।"

* * *

মঠে তখন কেনা বলে একজন চাকর ছিল। একবার তার জ্বর, কাজে কাজেই আমাকে, বিরূপাক্ষ, বীরেন প্রভৃতিকে গোয়ালের কাজ, বাসন মাজা, বিচালী কাটা, মঠ ও উঠান ঝাড়ু, ঠাকুরের ঘরের বাসন তোলা, বাগানের কাজ, ট্যাণ্ডা চালানো প্রভৃতি সব করতে হত। মহারাজের দর্শনের জন্য একদিন ফল-ফুল নিয়ে বলরাম-মন্দিরে গেলুম। সব খবরাখবর নিয়ে বল্লেন, "কাজ ভাল, তবে নিয়মিত ধ্যান-ভজন ও লেখাপড়ার চর্চাও রাখা চাই।" হঠাৎ বল্লেন, "তোকে আমি পাঠক করব, বক্তা করব।" আমি হাসতে লাগলুম; ভাবলুম আমি শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ি না, কেবল কোদাল, কুড়ুল, বাঁক নিয়ে থাকি; লেখা পড়া করি না বলে ঠাট্টা করছেন। বল্লুম, "এবার থেকে লেখাপড়া করবার চেষ্টা করব। আমি ত ভাল সংস্কৃত জানি না, তবে বাংলা বা ইংরেজীতে যতটুকু নিজে পারি তা করব।" কিন্তু তার পর থেকে মঠে খুব পাঠ আরম্ভ হলো, বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। বাবুরাম মহারাজ ক্লাশ পরিচালনা করতেন। চারুদা, বিরূপাক্ষ, মাখন, আমি হতুম পাঠক। প্রথম আরম্ভ হলো স্বামীজীর বই। মহারাজ যখন মঠে থাকতেন, তখন বাইরের গঙ্গাধারের বেঞ্চিতে বসে মাঝে মাঝে শুনতেন। সঙ্গে ব্যাকরণকৌমুদী পড়া আরম্ভ হলো। কিছু দিন পরে কলকাতা থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দজী এসে ব্রহ্মসূত্রের ক্লাস সকালে আরম্ভ করলেন। পরে ললিত, অবনী, পরেশ এসে যোগ দেওয়ায় ক্লাস খুব জোরে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে উদ্বোধন থেকে কপিল মহারাজ, রাজদা, দ্বিজেন, বিমল প্রভৃতিও যোগ দিত। এদিকে শ্রীশ্রীমহারাজ স্বয়ং ভোরে ধ্যানের ক্লাস আরম্ভ করলেন। যখন কালীকৃষ্ণ মহারাজ, শুকুল মহারাজ থাকতেন, তখন তাঁরাও ক্লাসে যোগ দিতেন।

বড় ও কঠিন কাজ ভুল করলে মহারাজ হেসে উড়িয়ে দিতেন। তিনি শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন

ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়ে। পুরাণো ফটকের কাছে একটা চাঁপার চারা যখন পোঁতা হলো, মহারাজ চারুদাকে রোজ তাতে জল দেওয়ার ভার দিলেন। বলরাম-মন্দিরে গিয়েও খবর নিতেন, "চারু গাছটায় জল দেয় ত?" হরিপদ একবার ম্যাগনোলিয়া গাছের ডাল ভাঙায় এক দিন তাকে ভিক্ষা করে খেতে বল্লেন। আবার একজন তাঁর কাছে অনুযোগ করলেন, "ছোঁড়ারা তামাক ধরেছে।" শুনে বল্লেন, "আমি ন বছর থেকে তামাক ধরেছি, তা আমার মানা কি কেউ শুনবে?"

*　　*　　*

শ্রীশ্রীমহারাজ একদিন প্রার্থনার উপর খুব জোর দিয়ে বল্লেন, "সরল ভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। স্বাধীনভাবে মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, একটুও যেন তাতে অবিশ্বাস না থাকে। যারা দীন এবং শান্ত তারা খুব শীঘ্র তাঁর কথা শুনতে পায়। অনেকদিন তাঁকে ডাকিনি বলে, অথবা ভুলচুক হয়েছে বলে তাঁর কাছে লজ্জা করতে নেই। সরলভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেই তিনিও দেখবে সামনে দাঁড়িয়ে। 'সরল না হলে সরলেরে যায় না চেনা।' "

একদিন সকালে বেলুড়ে তাঁর ঘরে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মাবলী পড়া হলো। পূজনীয় মহারাজ তাঁর ছোট খাটটিতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে। স্বামী শুদ্ধানন্দজী পড়লেন। পাঠ শেষ হলে মহারাজ বল্লেন, "এসব কথা স্বামীজী এ দেহে থেকে বলেননি, খুব উঁচু স্তরে মনকে তুলে তারপর বলেছেন এবং তারকদা লিখেছেন। এসব কথা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য কোরে স্বামীজী বলেননি। ঠাকুরকে কেন্দ্র কোরে সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য, তাঁর ভাব প্রচারের জন্য বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় সকলের সমান অধিকার—তা সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, ধনী বা দরিদ্র হোক, উচ্চ বা নীচ বংশের হোক—তাঁর কথা ও সেবা যে গ্রহণ করবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। তোমরা জীবনে এই সব সরল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ কর, আচরণ কর, আর একধার থেকে ছড়াতে থাক, দেখবে কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্য যুগের আবির্ভাব হবে।"

*　　*　　*

একজন আর একজনকে মিথ্যা গালাগালি করায় তাকে উত্তেজিত দেখে শ্রীশ্রীমহারাজ বল্লেন, "হরি মহারাজের কাছে গীতা পড়ছ; কিন্তু শুধু পড়লে কি হবে? সেই রকম জীবন যাপন করতে হবে। সর্বংসহ হতে হবে, লোকের কথায় টললে চলবে কেন? কেবল বিচার করে দেখবে, তুমি ঠিক সত্য পথে আছ কিনা। একরকম লোকের স্বভাব কি জান? তারা ওপর ঠোঁটে ভাল বলে, আবার নীচের ঠোঁটে মন্দ বলে। 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' ভগবান বলছেন, জানত?"

একদিন বল্লেন, "কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও কুরুক্ষেত্র, এই পঞ্চপীঠে তপস্যা করলে খুব শীঘ্র সিদ্ধি হয়—এ সব জায়গায় তপস্যা কর।" পরে কুরুক্ষেত্রে যখন গিয়েছিলুম পাণ্ডার খাতায় শ্রীশ্রীমহারাজের নাম দেখলুম। আবার বৃন্দাবনে গোবর্ধনের পাণ্ডারা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের নামমালা রচনা করেছে দেখেছিলুম। শুনলুম কুসুম সরোবরে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন তপস্যা করেন, তখন একবার মৌনী অবস্থা। শীতকালে একজন শেঠ তাঁর গায় একখানা ভাল কম্বল জড়িয়ে দেয়। একটি চোর দেখলে, এ সাধু ত মৌনী। সে কম্বলখানি খুলে নিয়ে নিজের ছেঁড়া ময়লা কাঁথাটা তাঁর গায় জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

*　　*　　*

শ্রীশ্রীমহারাজের একবার ভাব-সমাধি দেখেছিলুম। পুরাতন মঠবাড়ীর উত্তর পশ্চিমের ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর। নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) গাইছিলেন ঃ 'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব-আবেশে।' কালীকীর্তনের গান। দেখি চোখ দিয়ে অবিরল ধারা বইছে ; পুলক-কম্প, সমস্ত শরীর লাল, কণ্টকিত, দাঁড়িয়ে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন এইরূপ দেখেছিলুম। নাটমন্দিরে—মাঝখানে মহারাজ, একদিকে মহাপুরুষ মহারাজ এবং অপরদিকে রামলালদাদা। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে। মহারাজ রামলালদাদাকে বল্লেন, "ঠাকুর যেমন এখানে দাঁড়িয়ে গাইতেন ও নাচতেন, দাদা, তেমনি ক'রে গান।" হাত নেড়ে রামলালদাদা শ্রীশ্রীভবতারিণীর দিকে তাকিয়ে গান ধরলেন, 'কে নাচে সমরে বামা, তিমিরবরণী। শোণিতসায়রে যেন ভাসিছে নীলনলিনী॥' মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ ঠিক সেইরূপ অনুকরণ করতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে একবার জোরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দিকে এগিয়ে যান, আবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসেন। তিনজনেরই সে কী ভাবের অভিব্যক্তি! বুঝলুম—স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অঙ্গগুলি কী এবং 'অনুরাগের' পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 'ভাবের' প্রাকট্যই বা কী!

(দুই)

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, ব্রহ্মানন্দের জীবনমূর্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণোপান্তে বসিবার পরম সৌভাগ্য জীবনের অল্প কয়টি দিন লাভ হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ-প্রবরের দুর্লভ সঙ্গের সেই পূত স্মৃতি গ্লানি-মলিন কলুষ-জর্জর জীবনের অক্ষয় সম্পদ, অমৃতের অফুরন্ত উৎস হইয়া আছে।

মহারাজের পার্থিব জীবনের শেষভাগে তাঁহার দর্শন ও দিব্যসঙ্গলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তখন কলেজে পড়ি এবং নিয়মিতভাবে বেলুড়মঠে ও মধ্যে মধ্যে বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত করি শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের দর্শনলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন প্রথম যাই, তখন মহারাজ কিছু দিনের জন্য বাংলার বাহিরে ছিলেন। একদিন সকালে মঠে গিয়া শুনিলাম তিনি মঠে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পূর্বে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন। শীঘ্রই ফিরিবেন। গঙ্গার ধারে, মঠের ঘাটের বাঁধান সিঁড়ির উপর বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আরও কয়েকজন গৃহী ভক্ত একই উদ্দেশ্যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। একটু পরেই একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। দুই তিনজন সাধু-ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মহারাজ নামিয়া আসিলেন এবং ঘাটসংলগ্ন ছোট মাঠটির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রশান্ত, সৌম্য মূর্তির দিকে মুগ্ধনয়নে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে দেখিলাম কয়েকজন তাঁহার বিশেষ পরিচিত। মহারাজ সকলের দিকে চাহিয়া কয়েক জনকে সাধারণ কুশলপ্রশ্নাদি করিলেন। এই সময়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন কেমন আছেন?" মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "দেখুন, আমরা সাধু মানুষ, আমাদের আর কেমন থাকা না থাকা কী? যে দিনটা তাঁর নাম গুণগানে কাটে, সেই দিনটাই আমাদের ভাল গেল মনে করি।" শারীরিক কুশল-সম্বন্ধে প্রশ্নের যে উত্তর মহারাজ দিলেন তাহা আমার হৃদয়কে সেদিন বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল—দেহের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের যোগ্য উত্তর। ইহার পর তিনি গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন। তখন উপস্থিত গৃহী ভক্তগণ নানা ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। মহারাজ মৃদু হাস্যের সহিত

সাধারণভাবে 'হাঁ' 'না' বলিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। সেদিন আর কোন সৎপ্রসঙ্গ হইল না। মনে পড়ে, সেদিন একটু অতৃপ্তি ও ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়াছিলাম। কারণ আরও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিবার আশা অন্তরে ছিল।

ইহার পর একদিন একাদশী তিথিতে মঠে গিয়াছি। মহারাজের দর্শনলাভ এবং রামনাম গান শোনা দুইই উদ্দেশ্য ছিল। মঠে পৌঁছিয়া প্রথমে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া পরে মহারাজকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি তখন একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিতেই আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় থাকি, কি নাম, কি করি,—ইত্যাদি। আমি তখন কলিকাতায় হেদুয়ার নিকট একটি পল্লীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতাম। আর্থিক অসুবিধার জন্য সেদিন আমার আবাস-স্থান হইতে হাঁটিয়া আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হই এবং সেখান হইতে হাঁটিয়া মঠে যাই। মহারাজকে ধীরে ধীরে সমস্ত পরিচয় দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করিলাম যে, সেদিন তাঁহার চরণ দর্শন এবং বিশেষভাবে 'রামনাম' শুনিবার উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়াই মহারাজ আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! তুমি রামনাম শোনবার জন্য অতদূর থেকে, অত কষ্ট করে হেঁটে মঠে এসেছ! বেশ, বেশ! তোমার কল্যাণ হোক্। যাও, রামনাম শোন গিয়ে। ভগবানের নামগান, মহা পবিত্র জিনিস। সব পাপ-তাপ, কলুষ ওতে ধুয়ে যায়। আর দেখ, রামনাম গানের সময় সবাইয়ের সঙ্গে নিজেও গাইবে আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম, কারণ সে সময় আমি গান করা, বা স্তবস্তোত্র সুর করিয়া পাঠ করা, এ সব বিশেষ পারিতাম না। একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "গান আমি মোটেই গাইতে পারি না, সুর হয় না।" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "তা হোক। যেমন পার, আস্তে গাইবে। দেখ, যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয় সেখানে উপস্থিত থাকলে তাতে যোগ দিতে হ'য়, গাইতে হয়। ঠাকুর নিজে একথা বলতেন। যাও, এক্ষুনি রামনাম আরম্ভ হবে।" এমন মধুর, স্নেহপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, আমার সমস্ত মনপ্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল। মনে হইল, একজন সামান্য দীন দরিদ্র ছাত্রের কল্যাণের জন্য এই মহাপুরুষের কী স্নেহগভীর আকুলতা! পরম আনন্দে রামনামের ঘরে গেলাম। একটু পরেই রামনাম আরম্ভ হইল। সেদিন পরমপূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ রামনামে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার খুব নিকটে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিলাম। সেদিন রামনাম-গানের সময় মহাপুরুষজীর যে আনন্দোচ্ছল ভাবোদ্বেল মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও মনে পড়ে। রামনামের পর পুনরায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

ইহার তিন চারি দিন পরে একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে মঠে যাই। পৌঁছিয়াই দেখিলাম ভিতরের দিকে প্রাঙ্গণে, ঠাকুরঘরের সিঁড়ির কিছু দূরে, মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন এবং জনৈক সেবককে কিছু বলিতেছেন। আমি প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসেছ?" আমি একটু লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে না, এইবার যাব।" মহারাজ বলিলেন, "না, আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এস। মঠে এসে সকলের আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসে তার পরে অন্য কিছু করবে। যাও!" আমি অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়া প্রণাম করিলাম, এবং তাহার পর নীচে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলাম। এই সময় মঠে পালিত একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গাভী সেখানে আসিয়া মহারাজের একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ একজন সেবককে কিছু তরকারির খোসা আনিতে বলিলেন। সেবকটি

একটি চুপড়িতে করিয়া উহা আনিলে মহারাজ নিজের হাতে সেই তরকারির খোসাগুলি পরম স্নেহে গরুটিকে খাওয়াইতে লাগিলেন এবং আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, এই গরুটার এখানে আসার একটা history (ইতিহাস) আছে। এটি যখন বাছুর, তখন একজন কসাই এটিকে মঠের ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবুরামদা (স্বামী প্রেমানন্দজী) একে দেখে সেই কশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচটাকা দিয়ে একে কিনে নিয়ে আসেন। আমি অনেক সময় একে নিজ হাতে খাওয়াতুম, যত্ন করতুম। এও আমার এমন বাধ্য হয়ে পড়েছে যে, আমাকে দেখলেই কাছে ছুটে আসতে চায়। দেখ, পশুদের ভেতরও কত স্নেহমমতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ রয়েছে। গরুটিকে খাওয়াইবার পর মহারাজ উঠিয়া মাঠের মধ্য দিয়া বেড়াইতে চলিলেন। গরুটি তখনও তাঁহার পিছু পিছু যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যা, মা,—যা, যা।" তখন গরুটি ফিরিয়া গেল, এবং মহারাজ বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। আমি ও আমার সঙ্গী যুবকটি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার ধারে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মহারাজ দোতলার বারান্দায় একখানি ইজি-চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। আমি নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িলাম। এই সময়ে একজন মাদ্রাজী ভক্তও সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। চারিদিকে শান্ত, নিস্তব্ধভাব। মহারাজ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মাদ্রাজী ভক্তটি মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই প্রসঙ্গের অনুসরণে আমি মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, ভগবানের নিকট আমার যদি কোন আন্তরিক প্রার্থনা থাকে, তাকি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়?" মহারাজ বলিলেন, "যদি ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তরিক প্রার্থনা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। শুধু প্রার্থনা নয়, বিশ্বাসী ভক্তের মনের আন্তরিক ইচ্ছাও তিনি পূর্ণ করেন। সব সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। (মাদ্রাজী ভক্তের দিকে ফিরিয়া) He is the fulfiller of all wishes. ঠাকুরের জীবনের সেই তুলসী বাগান ঘেরার ঘটনা জানতো? ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে থাকার গোড়ার দিকে তিনি নির্জনে সাধনার জন্য পঞ্চবটীতে একটা জায়গায় অনেকগুলি তুলসী গাছ পুঁতেছিলেন। ঐ তুলসী বাগানটি ঘেরার জন্যে তাঁর খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাগান ঘেরার জিনিসপত্র জোগাড় করার বা ঘেরার ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঠিক সেই সময় রাত্রিতে গঙ্গায় জোয়ারের স্রোতে বেড়া দেওয়ার উপযুক্ত কতকগুলি ছোট ছোট রলা কাঠ, বাখারি, খানিকটা দড়ি, মায় একখানা কাটারি পর্যন্ত একসঙ্গে বোঝা বাঁধা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঘাটে এসে লাগল। ভর্তাভারি নাম করে বাগানের এক মালী ঠাকুরকে খুব ভক্তি করত। সে ঐ বোঝাটা তুলে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল। সেইগুলি দিয়ে তখন তুলসী-বাগানের বেড়া দেওয়া হল দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সত্যই ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করেন,—এতে কখনও সন্দেহ করো না।" খুব আবেগপূর্ণ স্বরে শেষের কথা কয়টি বলিয়া একটু-খানি চুপ করিয়া রহিলেন। ইহারপর বলিলেন, "দেখ, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন সত্য; কিন্তু তা বলে প্রকৃত ভক্ত তাঁর কাছে যা তা চায় না। ভগবানের কাছে বিষ চাইতে নেই; তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য, এইসব চাইতে হয়।" এই বলিয়া মহারাজ চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর

কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি. জনৈক পরিচিত ব্রহ্মচারীজীর নিকট শুনিলাম, মহারাজ উপরে আছেন। খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম দোতলায়, গঙ্গার দিকের বারান্দায়, মহারাজ একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। সামনে পায়ের চটি জুতা দুখানি খোলা, তাহার উপর পাদুখানি রহিয়াছে। বারান্দায়, কোণের দিকে তিন চারিজন সাধু-ব্রহ্মচারী জপধ্যান করিতেছেন। কোন শব্দ বা কথাবার্তা নাই। মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, বদ্ধাঞ্জলি,—স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। আমি অতি সন্তর্পণে যাইয়া—তাঁহার ইজি চেয়ারের পার্শ্বে তাঁহার পায়ের নিকট নিঃশব্দে বসিয়া একটু জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর মহারাজ যেন কতকটা আপনমনে, মৃদুস্বরে বলিলেন, "পা টা কেমন যেন টস্ টস্ করছে।" আমি উহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা জানাইলাম, "আমি পা টা একটু টিপে দেব মহারাজ?" তিনি বলিলেন, "দাও।" আনন্দে আমার চোখে জল আসিল; একটা উন্মাদনায় দেহ যেন কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের আরও নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে পায়ের পাতা দুইখানি টিপিয়া দিতে লাগিলাম। মহারাজের পদসেবা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কত দিন ধরিয়া ছিল। কিন্তু কোনও দিন সুযোগ পাই নাই, বা সাথে করিয়া চলিতে পারি নাই। অবশেষে ঠাকুর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার কৃপায় সেদিন তাঁহার 'মানসপুত্রে'র পদসেবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। নিস্তব্ধ, মৌন পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ অবস্থায় উপবিষ্ট মহারাজের পদসেবা করিতে করিতে মনে হইল তাঁহার পবিত্র পদস্পর্শে জীবনের সমস্ত কলুষ, সমস্ত গ্লানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে মহারাজ একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "আর এখন দিতে হবে না। থাক্।" তখন তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

আর একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে গিয়াছি। সঙ্গে আমার একটি আত্মীয় বালক ছিল। মহারাজ এক তলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিলেন। গুড়গুড়িতে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। নিকটে দুই তিন জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও দু-একজন গৃহী ভক্ত ছিলেন। আমি নিজে মহারাজকে প্রণাম করার পর সঙ্গের বালকটিকে প্রণাম করাইলাম। মহারাজ তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" আমি পরিচয় দিতে তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—আর কোন কথা বলিলেন না। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আস্তে আস্তে তামাক খাইতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিলাম,—মহারাজ যেন খুব বেশী অন্তর্মুখ। ক্রমে তাঁহার শরীর যেন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। অর্ধ-নিমীলিত নয়নে গঙ্গার দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই হাত হইতে গুড়-গুড়ির নলটি পড়িয়া গেল। একজন সেবক তৎক্ষণাৎ সেটি তুলিয়া লইয়া মহারাজের হাতে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহা তখনই আবার পড়িয়া গেল, হাতে রহিল না। মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, তেমনি অর্ধনিমীলিত নয়ন, —স্থির নিশ্চল দেহে বসিয়া রহিলেন! নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা বুঝা গেল না। প্রায় জড়বৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গেল,—চারিদিকে আঁধার জমিয়া উঠিয়াছে। আমরা যে কয়জন সেখানে ছিলাম, নিস্পন্দভাবে মহারাজের এই অপূর্ব অবস্থা দেখিতে লাগিলাম।

দূরে অন্ধকারে আবৃতা গঙ্গা; সম্মুখে ব্রহ্মানন্দের অতলস্পর্শী গভীরতায় নিমগ্ন স্বামী ব্রহ্মানন্দ! চারিদিকে জমাটবাঁধা এক মৌন গাম্ভীর্য যেন থমথম করিতেছে। এই অনির্বচনীয় পরিবেশের মধ্যে নিজের মনের সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত গতি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিলাম। এই ভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিককাল কাটিয়া গেল। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার চাহিলেন। কোন কথা বলার সাহস বা শক্তি হইল না। শুধু একবার প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সেই দিনটির স্মৃতি আমার জীবনে অমর হইয়া আছে। আজও যখন ঐ সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে, তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্মৃতি মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে,—চোখের সামনে সেই ব্রহ্মানন্দ-ঘন মূর্তি আবার যেন জীবন্ত হইয়া উঠে!

পুরাতন পত্র*

স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ

Vedanta Ashrama
West Cornwall, Conn.
Nov. 14th 1918

To His Holiness
Swami Brahmanandajee

পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ,

প্রবুদ্ধ ভারতে এবং উদ্বোধনে দেখিলাম যে এবার ঠাকুর বাবুরাম ভায়াকে ডাকিয়া লইয়াছেন —এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমি দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি। একে ২ সকল ভাই ও ভগ্নিগণকে হারাইতেছি। এক্ষণে তুমি কেবল একমাত্র প্রাণের সখা রহিয়াছ। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি তোমাকে নীরোগ রাখিয়া চিরজীবী করুন। বহুকাল আমি এদেশে একলা পড়িয়া আছি; দেশে ফিরিয়া গিয়া তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা কবে পূর্ণ হইবে তাহা ঠাকুরই জানেন। ইউরোপীয় সংগ্রাম স্থগিত হইয়াছে। শীঘ্রই শান্তিরাজ্য বিরাজ করিবে। ভাই, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন অতি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইয়া তোমাদের সৎসঙ্গে এ জীবনের বক্রী অংশটা কাটাইতে পারি। প্রচারকার্য্য খুব করিয়াছি। আর ভাল লাগে না।

প্রকাশানন্দের কার্য্য বেশ চলিতেছে। গত মার্চ মাসে আমি তাহার Guest (অতিথি) হইয়া-হইয়াছিলাম এবং তাহার সভায় বক্তৃতাদি দিয়াছিলাম। প্রকাশ অতি সুন্দরস্বভাব, সচ্চরিত্র এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়। * * *

ভাই, তোমার পত্র বহুকাল হইল পাই নাই। তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। সকল ভ্রাতৃগণকে আমার ভালবাসা ও কোলাকুলি দিও এবং তুমিও গ্রহণ করিও। পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীকে আমার শত শত সাষ্টাঙ্গ দিও। হরি ভায়া কেমন আছে লিখিয়া সুখী করিও এবং তাহাকে আমার বিশেষ বিশেষ নমস্কার দিও। ইতি

দাস
কালী

গঙ্গাধর এখন কোথায় আছে?

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের নিকট প্রাপ্ত।

উপরোক্ত পত্রের উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

৫৭, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট
বাগবাজার (পোঃ আঃ)
কলিকাতা
১৬ই জানুয়ারী, '১৯

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

ভাই কালী, বহুদিন পরে সেদিন তোমার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ওই দিন আমি মঠে উপস্থিত ছিলাম এবং তোমার পত্রখানি মহাপুরুষকে দেখাইয়াছিলাম; তিনি উহা দেখিয়া তুমি এখানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ জানিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তোমাকে পূর্ব্বে অনেকবার কত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা না হইলে ত কিছুই হইবার নহে। যাহা হউক, তিনি যে এখন তোমার হৃদয়ে এইরূপ অভিপ্রায় জাগরূক করিয়াছেন ইহাতে আমরা কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। যাহাতে তুমি অচিরে সেখানকার সকল কাজ শেষ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিতে পার তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি। আবার তোমাকে এখানে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলে যে কি আনন্দলাভ করিব তাহা বলিবার নহে। ক্রমশঃ একে একে প্রভুর সন্তান সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। বাবুরাম ভায়া দারুণ ব্যথা দিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন। আমাদের শরীরও সব ভাল নহে। হরিভাই অনেক কষ্টে এবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই; এইখানেই আছেন। গঙ্গাধর তাহার আশ্রমে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিল। প্রায় মাসাবধি হইল এখানে আসিয়া চিকিৎসা ও পথ্যাদির গুণে এখন অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। শরতেরও শরীর ভাল নয়; বাতে কষ্ট পাইতেছে। শ্রীশ্রীমা তাঁহার দেশে ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এখান হইতে ডাক্তার যাইয়া দুইবার তাঁহাকে প্রায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছিল। যাহা হউক তাহার পর তিনি এখানে আসিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। সকলেই তোমার এখানে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইয়াছে জানিয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছেন। এখন তুমি সেখানকার সকল হাঙ্গামা সত্বর মিটাইয়া এখানে চলিয়া আইস ইহাই সকলের আন্তরিক ইচ্ছা জানিবে। প্রচারাদি কার্য্য প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হইবার হইয়াছে। এখন চিরদিনের যিনি আইস তাঁহাকে লইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কটা কাটাইয়া দেওয়া যাউক। ছেলেরা এখন প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহ করুক। প্রভুর কৃপায় তাহারাই এখন সকল কার্য্য চালাইয়া লইতে পারিবে। ভুলভ্রান্তি সকলেরই হইয়া থাকে। এইরূপেই সকলে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। প্রভুর কৃপায় এখানেও তাঁহার কার্য্য একরূপ মন্দ চলিতেছে না। আপনা হইতেই তাঁহার ভাব দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তুমি আসিলে ইহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই। যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। আমরা তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। অধিক আর কি বলিব। সাক্ষাতে সকল কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। সকলেই তোমাকে ভালবাসাদি জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে। তুমি আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে এবং অবিলম্বে দর্শন দিয়া সুখী করিতে অন্যথা করিবে না। ইতি

তোমার চিরসুহৃদ
রাখাল

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বাঁকুড়ায় মঠ ও মিশনের কার্য

বাঁকুড়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট শাখাকেন্দ্রগুলির ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণ নিম্নোক্ত প্রকার :

মঠ-বিভাগ

নিত্যনৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। মঠপ্রাঙ্গণে আলোচ্যবর্ষে ৫১টি ধর্ম-সম্বন্ধীয় ক্লাশ হইয়াছে। ১০টি সাধারণ বক্তৃতারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতি একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন হয়। শ্রীশ্রীকালীপূজা, সরস্বতীপূজা, বাসন্তীপূজা, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের জন্মতিথি উৎসব যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের কার্য নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৮৮৮। ৩০খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ২খানা দৈনিক পত্রিকা পাঠাগারে রক্ষিত থাকে।

১৯৫২ সালের শেষভাগে গঙ্গাজলঘাটী থানার অন্তর্গত আমাদের রামহরিপুর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে।

মিশন-বিভাগ

১। দাতব্য চিকিৎসালয় :—আলোচ্য বর্ষে তিনটি চিকিৎসালয়-কেন্দ্রের কার্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নে যথাক্রমে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা দেওয়া হইল :

(ক) বাঁকুড়া মিশনস্থিত চিকিৎসালয় :—

বহির্বিভাগে	অস্ত্রোপচার-সংখ্যা
নূতন রোগী—১৮৪৮৮	নূতন—২০৮
পুরাতন রোগী—৪৩০১৩	পুরাতন—৪৬৬
মোট—৬১৫০১	মোট—৬৭৪

অন্তর্বিভাগে : নূতন— ২৩৯
পুরাতন—১৭২৫

মোট—১৯৬৪

ঔষধাদি সাহায্য :—১০৫ জন নূতন রোগী ও ১৬০ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে ৫ আউন্স, ২ ড্রাম, ২ গ্রেন কুইনিন সাল্ফ বিতরিত হইয়াছে। ১৪৭ জন নূতন রোগী ও ২০৬ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে ১২০৯টি প্যালুড্রিন টেবলেট বিতরিত হইয়াছে।

(খ দোলতলা শাখা চিকিৎসা-কেন্দ্র

নূতন রোগীর সংখ্যা—১৯৬৫
পুরাতন রোগীর সংখ্যা—৪১২৬

মোট—৬০৯১

(গ) রামহরিপুর শাখা চিকিৎসা-কেন্দ্র

নূতন রোগীর সংখ্যা— ৪৫২১
পুরাতন রোগীর সংখ্যা—১৬১৯৫

মোট—২০৭১৬

শিক্ষা-বিভাগ

(ক) রামহরিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—ছাত্র ১০১ জন ও ছাত্রী ১৬ জন; মোট ১১৭ জন। আলোচ্য বর্ষে ১৬ জন প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল; ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

(খ) বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়—ছাত্রসংখ্যা ৭

(গ) সারদানন্দ ছাত্রাবাস—ছাত্র-সংখ্যা ২০

(ঘ) রামহরিপুর পরিবর্ধিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়—ছাত্রসংখ্যা ১৫০

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন

বেলুড় মঠে অনুষ্ঠান

গত ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, '৫৩) শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন-উপলক্ষে বেলুড় মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ ও উষাকীর্তন; তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি এবং নাটমন্দিরে ও অন্যত্র কালীকীর্তন এবং ভজনাদি নির্বাহ হয়। প্রায় দেড়লক্ষ নরনারী মঠে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দশ হাজার স্ত্রী-পুরুষকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। অপরাহ্নে মঠের সুবিস্তৃত প্রান্তরে বহুসহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর এক বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের আলোচনা হয়। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে তাঁহার শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। তিনি বলেন:—

"আজ শ্রীসারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন-উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত। এই শুভমুহূর্তে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তাঁহাদের শুভাশিস্ যেন আমাদের সকলের উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়।

"বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর অন্তরে জীবনের আদর্শ-সম্বন্ধে ঘোর সংশয় ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া লক্ষ্যভ্রষ্টের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তদনুযায়ী সমাজকে সুসংহত করাই আজ একান্ত প্রয়োজন। জীবনের সেই উদ্দেশ্য কি এবং কিরূপে উহা সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। এই দিব্য দম্পতীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবদনুভূতি। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তদীয় সন্তানগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগই ছিল উভয়ের জীবনব্রত। এইরূপ জীবনাদর্শই সমাজে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতি, সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। অন্য যে কোন আদর্শ—তাহা নিজের ক্ষেত্রে যত ভালই হউক না কেন, আপেক্ষিক মাত্র।

"শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ও ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা যে মহান আদর্শের প্রতীক, তদ্দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাই উহা সমস্ত জগতে এক মহতী বার্তা ঘোষণা করিতেছে। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী-চরিত্রের চরম উৎকর্ষস্বরূপা এবং বলিতে গেলে এক সার্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি, যাহা সমস্ত জাতি ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

"শ্রীসারদাদেবীর জীবনে আমরা একাধারে আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাঁহার দেবোপম স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী এবং জগতে তাঁহারই জীবনব্রতের পরিপূর্তির সহায়িকা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশই ছিল সারদাদেবীর জীবনের মহত্তম দিক। তাঁহার স্বার্থলেশহীন স্নেহ সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতির উপর সমভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। সারদাদেবীর

জীবন বর্তমান যুগের নারীজাতিকে আহ্বান জানাইতেছে নারীত্বের যথার্থ মহিমা বিকাশ করিয়া তুলিবার জন্ত—যে মহিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দিব্য মাতৃভাব। এই অমূল্য জীবনসম্পদের উত্তরাধিকার সর্বসাধারণের নিকট ধরিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সকলে উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণতার পথে পরিচালিত হইতে পারে। আসুন আমরা আজিকার এই পুণ্যতিথিতে জগতের শান্তি ও মঙ্গলের নিমিত্ত বিশ্বজননীরূপ শ্রীসারদাদেবীর নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করি।"

কালিদাস নাগ, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ এবং স্বামী বিমুক্তানন্দ ভাষণ দেন। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ একটি প্রবন্ধে মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ও মহতী শিক্ষা-সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন।

সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন যে, ৫০ বৎসরের জীবনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে কাজ শেষ করিতে পারেন নাই—শ্রীসারদা দেবী তাহা সম্পূর্ণ করার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহারা ভগবান্ বলিয়া জানেন, অতএব মাতা সারদা দেবীও মহাদেবী বা ভগবতী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সকলের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। অতি কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবন যাপন করেন। অপরের কল্যাণ কিভাবে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তা ও সাধনা। আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও তিনি অসাধারণ ছিলেন। আজিকার দিনে তাঁহার পবিত্র জীবনের ভাবধারা যত আলোচনা হয় এবং তাঁহার আদর্শ যতটা গ্রহণ করা যায় ততই দেশ ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

সভায় স্যার যদুনাথ সরকার, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আরও অনেক গণ্যমান্ত সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শত-বর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে ঐ দিন সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে একটি বেতার ভাষণ দেন।

১৩ই ও ১৪ই পৌষ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের কথা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী সৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী ওঁকারানন্দ। ১৮ই পৌষ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৯শে পৌষ, রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় সুসজ্জিত দুইটি দোলায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রমাল্যাদি ভূষিত করিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বিদ্যার্থী এবং ভক্তগণের একটি শোভাযাত্রা বেলুড়মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যায়। তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল এবং প্রায় ৫ সহস্র নরনারী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেকগুলি দলকর্তৃক গীত মাতৃ-সঙ্গীত শোভাযাত্রায় যোগদানকারী এবং পথিপার্শ্বস্থ নাগরিকগণের চিত্তে অদ্ভুত স্নিগ্ধ ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতেছিল। কালীবাড়ীতে পৌছিয়া শোভাযাত্রাটি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীসারদাদেবীর জীবনের বহু-স্মৃতি-জড়িত বেলতলা, পঞ্চবটী ও নহবতের পার্শ্ব দিয়া গিয়া অবশেষে মন্দিরের প্রশস্ত আঙিনায় প্রবেশ করে। দেবদর্শনাদির পর সমবেত প্রায় দশসহস্র নরনারীকে মঠ হইতে আনীত খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কলিকাতায় সভা

বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী শতবর্ষজয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে ১৫ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর), কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে একটি মহতী জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈল-কুমার মুখোপাধ্যায়। ডক্টর স্যর সি পি রামস্বামী আয়ার (ইংরেজীতে), শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু

(হিন্দীতে), শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (বাংলাতে) এবং স্বামী অবিনাশানন্দ (ইংরেজীতে) বক্তৃতা দেন।

ডক্টর আয়ার তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন—বিদেশীরা মনে করে ভারতের স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা, কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মানদণ্ড কি? লিখিতে ও পড়িতে না পারিলেই বিদেশীরা মনে করে অশিক্ষিত। প্রাচীন ভারতে জনসাধারণ জননী, গুরু, যোগী ও সন্ন্যাসীদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষালাভ করিত। সে শিক্ষাই ছিল প্রকৃত শিক্ষা। মাতা সারদামণি লিখিতে জানিতেন না, কিন্তু পড়িতে জানিতেন। সুতরাং বিদেশীদের কাছে তিনি ছিলেন অশিক্ষিতা। ভারতের আদর্শ দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে ভারতের যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সমস্তই মাতা সারদামণির মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত শিক্ষিতা। বিবাহের ৭।৮ বৎসর পর সারদামণি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে নিম্নের দিকে টানিবে, না উপরের দিকে তুলিবে? সারদামণি উত্তর দিয়াছিলেন—আমি তোমাকে নীচের দিকে টানিব না; ঊর্ধ্বের দিকে যাওয়ার সাহায্য করিব। সারাজীবন উভয়ে ভ্রাতা-ভগিনীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সারদামণিকে মাতৃত্বের সাধনায় সিদ্ধ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ষোড়শীরূপে পূজা করেন। সারদামণির জীবন ছিল সহজ, সরল ও সাদাসিধা। শ্রীরামকৃষ্ণের পরলোক-গমনের পর মাতা সারদামণি তাঁহার বাণী প্রচার করিতেন। তাঁহার করুণা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইত। ভক্তগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অপূর্ব শক্তি তাঁহার ছিল। প্রেম, ভক্তি ও সাহসের বাণী তিনি প্রচার করিয়াছেন। সেবা ও আত্ম-ত্যাগের প্রেরণা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাইয়াছিলেন।

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে বলেন, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার বেলুড়ে অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। সারাদিন ধরিয়া তিনি মাতৃপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অর্চনাদর্শনার্থী সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর অবিরাম জনস্রোত গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদের দীপ্ত চক্ষু ও আনন্দোজ্জ্বল মুখে এক নূতন যুগের অভ্যুদয়ের আভাস তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ মনে হইয়াছে যেন, যে রহস্যময় নৈঃশব্দ্য শ্রীশ্রীমাকে ঘিরিয়া ছিল তাহা যেন অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইয়াছে; যে অবগুণ্ঠন তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছিল তাহা যেন অকস্মাৎ উন্মোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আনন্দোৎসব

শ্রীশ্রীমা তাঁহার জীবনের শেষ ১১ বৎসর কলিকাতার যে গৃহটিতে বাস করিয়াছিলেন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই উদ্বোধন কার্যালয়ে ('শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'-নামে ভক্তমহলে অভিহিত) ১২ই পৌষ ভোর ৫টা হইতে রাত ১০টা পর্যন্ত আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, বেদ ও চণ্ডীপাঠ, ভজন, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অন্যূন ৫ হাজার নরনারীর মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান

১৮ই পৌষ (২রা জানুয়ারী, শনিবার) 'সারদা-মন্দিরে' শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ভোর বেলা মঙ্গল-আরতি ও বেদপাঠের পরে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং হোম নির্বাহ হয়। নিমন্ত্রিতা বহু ভক্ত-মহিলা, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রীগণ গভীর শ্রদ্ধার সহিত পূজা-হোমাদি দর্শন করেন। সকলকেই বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বিকাল ৩টার সময় প্রায় ৫ শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সুসজ্জিতা একখানি প্রতিকৃতির সম্মুখে দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার জীবনী আলোচনা এবং মাতৃসঙ্গীত গীত হয়। গম্ভীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর উৎসবটি সকলকে প্রভূত পরিতৃপ্তি দান করিয়াছিল।

জয়রামবাটীতে উদ্বোধন-উৎসব

অভূতপূর্ব উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে জননী সারদাদেবীর পুণ্যাবির্ভাবস্থান জয়রামবাটীতে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পূর্বদিন হইতেই দূর দূরান্তরের বহু ভক্ত নরনারী আশ্রমে (শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে) সমবেত হইতে থাকেন। আশ্রমের স্থায়ী অস্থায়ী সমস্ত গৃহগুলিই আগন্তুকগণের বাস-স্থানরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। গ্রামের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের আলয়ে বহুসংখ্যক ভক্তকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

তিথিপূজার দিন সকাল ৯টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের প্রাচীন সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অন্যতম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী কর্তৃক পরিচালিত একটি শোভাযাত্রা সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। ঐ পুণ্যদিনে এবং পরের দিবসও বিবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-সংযুক্ত পূজা, পাঠ, ভোগরাগ, হোম তথা ভজন-কীর্তন, রামায়ণগান উপস্থিত জনমণ্ডলীর চিত্তে অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তি উদ্রিক্ত করিয়াছিল। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রথমদিন সন্ধ্যারতির পর একঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীমায়ের পূতজীবনী ও অমৃতময়ী বাণী আলোচনা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। অনুমান ১২ হইতে ১৫ সহস্র নরনারী ঐ গ্রামে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠান

জন্মতিথির দিন প্রভাতে মঙ্গলারতি, বৈদিকমন্ত্র-আবৃত্তি, ভজন-সঙ্গীত, বিশেষ পূজা ও হোম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্তা নীলিমা আচার্যের সভা-নেতৃত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি সভায় স্বামী সত্যকামানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। শ্রীমার জীবন ও আদর্শ-সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করেন শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী নারায়নন্, শ্রীমতী সুদর্শন শর্মা, শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ, কুমারী নমিতা বসু, শ্রীমতা সরোজ প্রভু ও স্বামী সত্যকামানন্দ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বেগম সুফিয়া কামাল ও শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা। কবি শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর-রচিত কবিতা পড়েন শ্রীআনন্দহরি পাল। সমবেত প্রায় ছয় শত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত ছায়াচিত্রও দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্রেই শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দী-জয়ন্তীর উদ্বোধন যথাশক্তি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সকল উৎসবের খবর এবার প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। নিম্নে আমরা মাত্র কয়েকটি চুম্বক (পূজা-হোম-ভজনাদির উল্লেখ না করিয়া) দিলাম। আগামী সংখ্যায় বিস্তৃততর সংবাদ ছাপিবার সঙ্কল্প রহিল।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা)—আলোচনা-সভায় নেতৃত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীএম্ এন্ ঘোষ ও শ্রীমতী সুষমা দেবী বাংলায় এবং শ্রীএস্ এন্ রাওয়াল ও ডাঃ জে কে ওয়াডিয়া যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। চিত্তরঞ্জন (১০ মাইল দূরবর্তী) হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

মালদহ—কাটিহারের শ্রীমতী পুষ্পময়ী সিংহের

পরিচালনায় একটি সম্মেলনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা ও শিক্ষা-আলোচনা, পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী নমিতা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মীরা দাসবক্সী ও স্বামী পরশিবানন্দ (আশ্রমাধ্যক্ষ)।

বালিয়াটি (ঢাকা)—১২ই পৌষ স্থানীয় হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। শ্রীসারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করে। বেলুড় মঠের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মূল ইংরেজী অভিনন্দন-বাণীর মর্মানুবাদ স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ পাঠ করেন। স্কুলের ছেলেরা স্বামী বিবেকানন্দ রচিত কবিতাদি আবৃত্তি করে। শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা চারুবালা সাহা ও শ্রীযুক্ত সনদানন্দ চক্রবর্তী মহাশয় স্বরচিত শ্রীশ্রীসারদা দেবী-স্তব পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় চৌধুরী মায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন; সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। যদিও পল্লীগ্রামের সভা তথাপি প্রায় ৫০০ শত বালবৃদ্ধবনিতা তাহাতে যোগ দেন।

উক্তদিন সকালে শ্রীসারদামণি বালিকা-বিদ্যালয়ে একটি মহিলাসভা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষদর্শিনী শ্রীযুক্তা গিরীন্দ্রবালা রায়চৌধুরী সভানেত্রী হন। উপস্থিত মেয়েরা শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ করেন, সভায় গান ও বক্তৃতা হয়। অত্যন্ত আবেগের সহিত মায়ের কথা বলিয়া সভানেত্রী সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। প্রায় একশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

(1) Vivekananda—The Yogas and Other Works

স্বামীজীর জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, দেববাণী (Inspired Talks), মদীয় আচার্যদেব (My Master), ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট (Christ, the Messenger) এবং আরও কতকগুলি নির্বাচিত বক্তৃতা, কবিতা ও পত্রের সুসম্পাদিত সঙ্কলন। গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বামী নিখিলানন্দ-লিখিত স্বামীজীর বিশদ জীবনী সংযুক্ত হইয়াছে। কাপড়ে বাঁধাই; ২৫ খানি ছবি আছে; পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯৯২; মূল্য—১০ ডলার। প্রকাশক—Ramakrishna-Vivekananda Centre; 17E, 94th Street, Newyork 28, N. Y. U S. A.

(2) Thus Spake The Holy Mother

ইংরেজীতে অনূদিত শ্রীশ্রীমায়ের উক্তির সংগ্রহ। সঙ্কলয়িতা—স্বামী শুদ্ধাসত্ত্বানন্দ; পকেট সাইজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯০; মূল্য ।৵০ আনা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ—৪

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে বাবাজী মহারাজ—গত ১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) বরাহনগর পাটবাড়ীতে বৈষ্ণবকুলশিরোমণি ত্যাগ-বৈরাগ্য-প্রেমভক্তির প্রতিমূর্তি শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর মহাপ্রয়াণে ধর্মজগতে একজন যথার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষের অভাব ঘটিল। তাঁহার গভীর উদার আধ্যাত্মিক জীবন শুধু বৈষ্ণব-সমাজের নহে, সকল মতের ঈশ্বরভক্তগণের নিকটই আদর্শস্থানীয় ছিল। একনিষ্ঠ ভজনানুরাগ বাবাজী মহারাজের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও নিষ্কাম ভাগবত কর্মে তাঁহার উৎসাহ এবং অকুণ্ঠিত ব্যাপৃতি ছিল বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার। বহু লুপ্ততীর্থের উদ্ধার তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট কীর্তি। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে তিনি স্বকীয় সাধনা ও মনীষা দ্বারা প্রশংসনীয় ভাবে শুধু সংরক্ষণই করেন নাই, উহাকে পরিপুষ্ট এবং পরিবর্ধিতও করিয়াছিলেন।

বহু-সম্মানিত এই মায়ানির্মুক্ত ভক্তশ্রেষ্ঠের চিন্ময় আত্মার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর—১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম আজমীর ও রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে সাধ্যমত সেবাকার্য করিয়া আসিতেছে। ১৯৫২ সালে আশ্রম কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি গ্রন্থাগার ও একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি শনিবার শ্রীরামনাম-সংকীর্তন এবং রবিবার উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। আশ্রমের দাতব্যচিকিৎসালয় হইতে ২৫৯৪ জন ব্যক্তি চিকিৎসালাভ করিয়াছেন। গ্রন্থাগার দুইটিতে চারখানি দৈনিক এবং দশখানি মাসিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। পুস্তকের সংখ্যা ১৬৫৯ ছিল—তন্মধ্যে ১২৪৯ খানি পাঠার্থ সভ্যগণকে দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসর একটি ৩৬ ফুট উচ্চ মন্দিরসহ আশ্রমগৃহটির নির্মাণকার্য শেষ হয় এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি-দিবসে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। গতবৎসরের উদ্বৃত্ত ২৫৫৮৮/৩ পাই সমেত এই বৎসরের মোট আয় ৩৯২৩৩/০ এবং মোট ব্যয় ৫৪৩২৩/৬ পাই।

নানাস্থানে শ্রীসারদা দেবীর শতাব্দীজয়ন্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রসমূহ ছাড়া নানাস্থানে নানা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগিমণ্ডলীর ব্যবস্থায় ১২ই পৌষ এবং তৎসমীপবর্তী দিনসমূহে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। সংবাদপত্রে এই সকল অনুষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম:—

কলিকাতা ও হাওড়ায়—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ, বিবেকানন্দ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিট্যুট, বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুশন্ (খুরুট), হাওড়া শান্তি সঙ্ঘ, চেৎলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ, হাওড়া শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী জন্মোৎসব সমিতি।

কলিকাতার উপকণ্ঠে—দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির (দেশবন্ধুনগর), বাগুইআটি পল্লীকল্যাণ সঙ্ঘ, দক্ষিণ দমদম স্বামীজি সেবাসঙ্ঘ।

বাংলার বিভিন্ন জেলায়—ভাঙ্গামোড়া (হুগলী), খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনীপুর), সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জয়নগর-মজিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ইছাপুর প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ।

বাংলার বাহিরে—রামগড় ক্যাণ্টনমেণ্ট, আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পূর্ণিয়া), হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (কাছাড়), আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।



নমস্কার

যং পৃথগ্‌ধর্মচরণাঃ পৃথগ্‌ধর্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্‌ধর্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।
শান্তাঃ সংন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥
যুগেষ্বাবর্ততে যোঽংশৈঃ মাসত্ব য়নহায়নৈঃ।
সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ॥
যস্মিন্‌ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো দেবঃ তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭তম অধ্যায়)

পৃথক পৃথক ধর্মকৃত্যের ফলাভিলাষী হইয়া লোকে পৃথক পৃথক ধর্মচর্যার অনুশীলন করে, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন অনুষ্ঠান দ্বারা মূলতঃ যাঁহার আরাধনা করা হয়, সেই ধর্মস্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার।

পুণ্য ও পাপ উভয়েরই অবসান ঘটিয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি আত্মজ্ঞানের সামর্থ্যে সুশান্ত, জন্ম-মৃত্যুর ভয় দূরে—অতিদূরে তিরোহিত, তত্ত্বনিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের এই অবস্থার নামই মোক্ষ। মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম কাম্য এই মোক্ষ যাঁহার স্বরূপ সেই পরমপুরুষকে নমস্কার।

অবিচ্ছিন্ন কালপ্রবাহকে অংশে অংশে বিভক্ত করিয়া মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসররূপে যিনি অনন্ত যুগ ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা সেই মহাকালস্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার।

যাঁহাতে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, যাঁহা হইতে উদ্ভূত, যিনি সব দিকে সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন সেই সর্বময় সর্বস্বরূপ পরম দেবকে নমস্কার।

কথাপ্রসঙ্গে

বেদমূর্তি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়া এবার পড়িয়াছে ২২শে ফাল্গুন, শনিবার, (৬ই মার্চ)। যুগাবতারের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাঁহার জীবন ও শিক্ষা-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা আমরা সন্নিবেশিত করিলাম।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন 'বেদমূর্তি' বলিয়া। মুখ্যতঃ বেদ অর্থে বুঝায় জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অলৌকিক শাশ্বত জ্ঞানরাশি। যে শব্দসমূহ দ্বারা এই অলৌকিক জ্ঞানকে আর্য ঋষিগণ প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই শব্দ ও বাক্য-সমষ্টিকেও বেদ বলা হয়, অবশ্য গৌণতঃ। এই শব্দরূপ বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ডাদি-সংক্রান্ত কিছু কিছু লৌকিক অংশ রহিয়াছে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে উহাদের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিরন্তন সত্যের যাহা জ্ঞাপক, বেদের সেই অংশ সার্বলৌকিক এবং সার্বকালিক। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঐ অলৌকিক জ্ঞান বিপুল আকারে অতিশয় স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল; এই জন্যই স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'বেদমূর্তি', অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই বেদ-সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয়।

বেদমূর্তি না বলিয়া গীতামূর্তি বা অন্য কোন শাস্ত্রের মূর্তি বলা হইল না কেন? কারণ আছে। হিন্দুদের নিকট বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বেদ অপৌরুষেয়, অনাদি এবং অনন্ত, অর্থাৎ কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বুদ্ধি দ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া বেদ লিখিয়া যান নাই। ঋষিরা নিত্যবর্তমান বেদকে 'দেখিয়াছিলেন' মাত্র, বেদমন্ত্র তাঁহাদের শুদ্ধচিত্তে 'আবির্ভূত' হইয়াছিল মাত্র। শব্দের মাধ্যমে যেমনটি তাঁহারা পাইয়াছিলেন তেমনটিই তাঁহাদের পুত্র-শিষ্যাদি-পরম্পরা শুনিয়া শুনিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—এই জন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদের রচনায় ঋষিদের অপর কোন কর্তৃত্ব নাই, তাঁহারা শুধু সনাতন সত্যের পরিজ্ঞাপক মন্ত্রসমূহের 'দ্রষ্টা'।

অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ নয়। কোন নির্দিষ্ট কালে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা বলিয়া বা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তি-চিত্তের অনেক ছাপ ঐ সকল উক্তি বা রচনায় পড়িয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, গিয়াছেও। নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় একমাত্র অপৌরুষেয় বেদে। অন্যান্য শাস্ত্রে অলৌকিক জ্ঞানের কথা অবশ্যই আছে—কিন্তু বেদের ন্যায় বিশাল পরিমাণে নয়, বেদবাণীর ন্যায় অপ্রতিহত শব্দশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়াও নয়। বেদপ্রকাশিত জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া এই সকল পরবর্তী শাস্ত্র রচিত, তাই উহাদের অপর নাম স্মৃতি। বেদ যদি স্বয়ংপ্রভ সহস্রাংশু সূর্য হন তো অন্যান্য শাস্ত্র হইবেন তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জ্যোতিঃ-কেন্দ্র। এই তুলনা কিন্তু যুক্তিহীন অন্ধ একটা গোঁড়ামির কথা নয়, গভীর বিশ্লেষণমূলক একটি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিস্তারিত আলোচনার ইহা ক্ষেত্র নয়।

মানুষের গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, বিশ্বাস, সভ্যতা কালক্রমে বদলায়, ধ্বংস হয়, কিন্তু সৃষ্টির বিধাতা ঈশ্বর যেমন অবিনাশী তেমনি তাঁহার সনাতন জ্ঞানরাশি—বেদও রহিয়া যান অব্যাহত। হয়তো কিছুকাল চাপা থাকেন, অপর কোন উপযুক্ত ঋষি আসিয়া 'আবিষ্কার' করেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ অর্থাৎ সনাতন ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের ন্যায়ই মহিমান্বিত।

বেদের মর্যাদা অপর কোন শাস্ত্রের নাই—থাকা সম্ভবপরও নয়। বেদ-জ্ঞানের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র অন্যান্য শাস্ত্রে। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্র স্বকীয় গৌরবে যতই সম্মানার্হ হউক বেদবাক্যের গাম্ভীর্য, ঔদার্য, দুর্বার শক্তি উহাদের নাই। সনাতন ধর্ম বেদকে আশ্রয় করিয়াই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা দেখিতে পাইয়াছি সনাতন ধর্মেরই বিপুল অভিব্যক্তি। সনাতন ধর্মের মূল প্রদেশে যেন তিনি সঞ্জীবনী এক বিপুল প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ে বেদ-ধর্মের পরিচয় বিকৃত ও খণ্ডিত হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের মাধ্যমে সেই বিকৃতি ও বিচ্ছিন্নতা যেন নিরাকৃত হইয়াছে। নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—এই চারিটি অঙ্গসমন্বিত বেদধর্মের অখণ্ড রূপ সুস্পষ্টরূপে পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বেদজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন অর্থে সনাতন ধর্মে শক্তি সঞ্চার। উহার ফল কি? সনাতনধর্মের বিবিধ অভিব্যক্তি যে সকল বিভিন্ন পন্থা ও সম্প্রদায় আছে তৎসমূহেও বলাধান। আবার ধর্মের এই ব্যাপক অভ্যুত্থানে ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরেই নূতন গতিবেগ সংক্রমিত হইবে। অতীত ইতিহাসে যাহা অনেকবার ঘটিয়াছে—ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ ও শক্তির প্রভাব বিশ্বের বহুস্থানে পরিব্যাপ্তি, নববলে বলীয়ান ভারতবর্ষে পুনরায় ঐ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যাইবে পূর্বাপেক্ষা প্রখরতর, বিস্তৃততর ভাবে বর্তমান ইতিহাসের অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদমূর্তি বলিবার ইহাই সম্পূর্ণ তাৎপর্য।

"বেদাহমেতং......"

প্রাচীনকালে ঋষি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তমিস্রার পারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়াছি—জানিয়া জীবন-সমস্যার অন্তিম সমাধানের সন্ধান পাইয়াছি। ঋষি কল্পনা দ্বারা সত্যের রূপ খাড়া করেন নাই, তাঁহারই দর্শনের জন্য প্রতীক্ষমাণ চিরন্তন সত্যকে তিনি 'দেখিতে' পাইয়াছেন। এই আবিষ্কার তাঁহার একার ব্যক্তিগত অধিকার নয়—সকলেই সত্যকে দেখিতে পাইবে, যদি খোঁজে, পাইবার চেষ্টা করে। এই দেখা, খুঁজিয়া পাওয়ার জন্য প্রধানতঃ যে চাই ব্যাকুলতা, সরলতা, পবিত্রতা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ইহা নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে। বাহ্যিক উপকরণে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল বর্তমান মানুষের নিকট উহা প্রমাণ করার খুবই প্রয়োজন ছিল। অনুভূতির মর্যাদা যে বিদ্যা-বিভবের মর্যাদার অপেক্ষা অধিক, বর্তমান মানুষের চিত্তে ও হৃদয়ে বিশেষভাবে তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইলেই সে তাহার জটিল জীবনধারার দম্ভ হইতে নামিয়া আসিবে—নামিয়া না আসিলে তাহার কল্যাণ নাই, শান্তি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাদের বইতে কি আছে জানিনা—তোমাদের 'ফেলাজফি' পড়িনি কিন্তু মা আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন, বেদবেদান্তে কি আছে জানিয়ে দিয়েছেন। ইহাই 'বেদাহমেতং' এর মর্মকথা। এই মর্মকথাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষায় বার বার শুনিতে পাই। বহু-কর্ম-ব্যাপৃত অথচ আনুষ্ঠানিক জপতপের নিয়মরক্ষামাত্রে নিরত ঈশান মুখোপাধ্যায়কে মিষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, ঐরূপ লোকদেখানো সাধন করিলে চলিবে না। জীবন-ভোর তো কত কাজ করিয়াছ, এখন কাজ কমাইয়া তাঁহাতে ডুবিবার চেষ্টা কর। শুধু নিয়মরক্ষা নয়—ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকো। তবে প্রত্যক্ষানুভূতি, তবেই যথার্থ ধর্মলাভ।

এই ডুবিবার উপদেশ, খাটিবার আবেদন তিনি শম্ভু মল্লিককেও করিয়াছিলেন, অধর সেনকেও বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তগণকে বার বার বলিয়া তাঁহাদের প্রাণে ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহি-ত্যাগী, যুবক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী যাঁহারাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে

গিয়াছেন, বসিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই উপলব্ধি লইয়া ফিরিয়াছেন যে ঈশ্বর শুধু আছেন নয়, তাঁহাকে লাভ করা যায়, আমাকেই লাভ করিতে হইবে, এই জীবনেই, এখনই লাভ করিতে হইবে। প্রায় সত্তর বৎসর পরে আজ আমরা যাঁহারা তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার কথা পড়িতেছি, আমাদেরও প্রাণে তাঁহার উপদেশ ঐ ভাবই জাগাইয়া দেয়—ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইবে। নহিলে ভগবান শুধু কথার কথা মাত্র, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, শিশুরা যখন বলে 'ভগবানের দিব্যি' তখন তাহাদের ভগবান শব্দের মূল্য যতটুকু ততটুকু।

আমরা সকলেই যে এই জন্মে বলিতে পারিব "বেদাহমেতং", তাহা নয়—তথাপি, উহা বলিবার জন্য উদ্যম করা, অর্থাৎ ভগবদনুভূতির জন্য যথাসাধ্য সাধনা করাই বড় কথা। যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি সেখানে থাকিয়াই আমরা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিব। চেষ্টাতেও যে প্রভূত সার্থকতা, মহতী শান্তি শ্রীরামকৃষ্ণানুসারিগণকে তাহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার মর্মকে বলিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না করিয়াও কোন ব্যক্তি এই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। নাম করাটা মুখ্য জিনিস নয়, ভাব গ্রহণ করাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণভাবের অনুশীলনের দিকে জোর না দিয়া শুধু তাঁহার নাম লইয়া মাতামাতি—ইহা যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শোচনীয় অমর্যাদা তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

যিনি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন এক পথে চলিয়া ভগবানকে আন্তরিক ভালবাসিতে পারেন, সঙ্কীর্ণতা ও 'মতুয়ার বুদ্ধি' ত্যাগ করিয়া সকল সাধন-পন্থাকে শ্রদ্ধা করিতে জানেন, কাম-কাঞ্চনাসক্তি বর্জন করিতে পারেন, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পট ঘরে না রাখিয়াও, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম মুখে উচ্চারণ না করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের প্রচারক। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের বৈশিষ্ট্য বাক্যদ্বারা প্রচার নয়, জীবনদ্বারা। লক্ষণ—ঈশ্বরানুরাগ, অনাসক্তি, উদারতা, নিঃস্বার্থ মানবসেবা।

কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নাম-প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ সমালোচকদের ভয়ে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। স্বামীজীকে জনৈক একবার পত্রে লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের গুরুপূজা জিনিসটি যদি তাঁহারা উঠাইয়া দিতেন তাহা হইলে বহুলোক তাঁহাদের লোককল্যাণকর কার্যে সহায়তা করিত। বাস্তবিক যাঁহারা লোকসেবায় সমুৎসুক শ্রীরামকৃষ্ণের পটটি যে পথের কণ্টক হইয়া তাঁহাদিগের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে ইহা কিন্তু স্বামীজী বিশ্বাস করেন নাই। তাই তিনি শ্রীরাম-কৃষ্ণের পূজাও উঠাইয়া দেন নাই, হরি, রাম, কৃষ্ণ কালীর মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-নামও যদি কেহ করে তাহাতেও আপত্তি করেন নাই। মানুষের অনন্ত প্রকৃতি ও রুচি। কত মূর্তিই না সে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া উপাসনার জন্য কল্পনা করিয়াছে, কত নামেই না ভগবানকে ডাকিয়াছে। যে মানুষ অত্যদ্ভুত অধ্যাত্ম-জ্ঞান-সামর্থ্যে অহরহঃ ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্য বোধ করিতেন, যাঁহার দেহ-মন অভূতপূর্ব পবিত্রতা ও সংযমে স্বচ্ছ ও অতিলৌকিক মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছিল, যাঁহার চরিত্রের ঔদার্য ও প্রেম ছিল সর্বাবগাহী—সে মানুষকে যদি দেবতা বলিয়া চিন্তা করি, সে মানুষের নাম যদি দেবতার মন্ত্রের ন্যায় জপ-কীর্তন করি তাহা হইলে উহাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

কেন?

পাঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ করিলে তদনুষঙ্গী কষ্ট তো সহ্য করিতেই হইবে। ঈশ্বর কেন এই বন্ধন, এই যন্ত্রণাভোগ স্বীকার করেন? ইহার উত্তর—তাঁহার দৈবী করুণা। মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিয়া মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য মানিয়া লইয়া তিনি দেখাইয়া যান কিভাবে এই সব অতিক্রম করিয়া ভাগবত জীবন লাভ করা যায়। মানুষ মানুষকে দেখিয়াই শিখিতে পারে। পৃথিবীর দ্বন্দ্বসংঘাতের ঊর্ধ্বে যদি আদর্শ বসিয়া থাকে তো সেই আদর্শকে পাইবার জন্য উৎসাহ জাগে না, সাহস হয় না। সন্দেহ, ভয় মনকে করে আকুলিত। আদর্শের নিখুঁত মূর্তি লইয়া ভগবান তাই উঁচু হইতে নীচুতে নামিয়া আসেন আমাদের মধ্যে। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া শিখি, প্রেরণা পাই। মানুষ তাহার পরিচ্ছিন্ন জীবভাব ত্যাগ করিয়া অক্ষয় চিরন্তন ভগবদ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক এইটিই ভগবান দেখিতে চান। তাই নরদেহ-ধারণের কষ্টকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন ক্যানসার রোগে কী নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া গেলেন। তবুও তাঁহার মুখের হাসি কোন দিন এতটুকু মলিন হয় নাই। ভক্তেরা ভগবৎপথে আগাইয়া যাইতেছে ইহা দেখিয়াই তাঁহার ছিল পরম পরিতৃপ্তি।

মানুষ ও ভগবান

স্বামী প্রভবানন্দ

ঈশ্বর ও মানুষের স্বরূপ কি? উভয়ের সম্বন্ধই বা কি? প্রায় প্রত্যেক ধর্ম ও দর্শনে এই সমস্যাগুলির আলোচনা হয়েছে; আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর নানা ধর্ম এই বিষয়ে নানা উত্তর দিয়েছে। এই বিচিত্র ধারাকে মুখ্যতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ-মতে মানুষ সৃষ্ট ও ভগবান স্রষ্টা, তাই পরস্পর বিলক্ষণ, পৃথক। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভগবানকে গ্রহণ করেছেন অংশিরূপে, আর মানুষকে গ্রহণ করেছেন তাঁর সত্তার অংশরূপে। অদ্বৈতবাদীরা মনে করেন, মানুষ ও ভগবান অভেদ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জগতের প্রতি ধর্মশাস্ত্রে—বাইবেল, কোরান, উপনিষদ বা জেন্দ্‌ আবেস্তা, যাই হোক না কেন—এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটিতে নিহিত সত্যের সমর্থক পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীন উক্তি আছে।

আপাত-বিরোধী হলেও এদের সমন্বয় সম্ভব। তবে বিচারনিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এ ঐক্য আসবে না। কারণ, তাঁর প্রয়োজন হল কতগুলো বাঁধাধরা মতের, কতগুলো অপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের। যা দ্বারা স্বমত সমর্থিত হয়, এমন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উক্তিই তিনি চান। ঈশ্বরকে বোধে বোধ করতে চেষ্টিত মরমী সাধক যিনি, কেবল তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গীতে সমন্বয় সাধন হতে পারে।

ধর্ম মুখ্যতঃ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুধ্যান, অর্থাৎ ভগবান একটা অনুমানমাত্র নয়, মত মাত্র নয়, একটা ধারণা মাত্র নয়, বাস্তব কিছু। ভগবান বাস্তব সত্য। যদি তাঁর অস্তিত্ব থাকে তবে তাঁকে জানা ও অনুভব করা যায়। কেউ হয়ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে, যেমন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল যুক্তি দিয়ে এক নিরপেক্ষ সত্তার কথা বলেছেন। কিন্তু সেই নিরপেক্ষ সত্তা স্বয়ং তাঁর সম্বন্ধে ধারণার যে অনুরূপ, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা

কি ? আর তৎপ্রকাশ্য বস্তু কখনও এক নয় যেমন বই পড়ে কোন দেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। নিজে গিয়ে সেদেশ দেখলে কল্পিত বস্তু ও যথার্থ বস্তুর পার্থক্য কতখানি তা বুঝা যায়। তাই মরমী সাধক বলেন, ভগবানকে জানা ও অনুভব করা চাই।

তবে এটা ঠিক যে, এই চোখ দিয়ে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, এই কান দিয়ে কেউ তাঁর স্বর শোনে না, তবুও কিন্তু মরমীর দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর স্বর শোনা যায় ও তাঁর সঙ্গে একত্ব অনুভব করা যায়। অতএব দেখা গেল, যা স্বাভাবিক, ধর্ম তার পারে, ধর্ম অলৌকিক, অনৈসর্গিক ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবন-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ণ হবার একটা আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে, তা সে যে পথেই হোক না কেন। সেই জন্যেই অতীন্দ্রিয়তাবাদের সৃষ্টি। তথাকথিত ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বা স্বাভাবিক স্তরে সে পূর্ণতা অর্জিত হয় নি, এ গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে হয়। ইন্দ্রিয়াতীত চেতনায় ভগবানের অনুভূতি হয়।

ভগবদ্-উপলব্ধির উপায় কি ? আমরা জানি অনুভূতির স্তর বিভিন্ন। সর্বোচ্চ স্তর হল নির্বিকল্প সমাধি, এই অবস্থায় জ্ঞান সংহত, একাকার। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ যতক্ষণ, ততক্ষণ সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞেয়বস্তু তখনও অজ্ঞাত থাকে। আমরা কেমন করে বিষয়জ্ঞান লাভ করি ? বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে এসে আমাদের মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি করে, এইভাবে আমরা বস্তুসম্বন্ধে ধারণা তৈরী করি। সেই ধারণা ও বিষয়ববস্তু আলাদা থেকে যায়। এই পার্থক্য মুছে গেলেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। সাধারণ অর্থে এটা জানা যায় না, কিন্তু জীব সেই সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই পরিণতিতেই ভগবানের সঙ্গে একত্বজ্ঞান ; এই জ্ঞান এলে তবে বোধ করা যায়, নাম ও রূপের জগৎ তখন বিলুপ্ত। তখন দ্বিতীয় জ্ঞাতা বা অহংবোধ থাকে না, বা ভগবান বলে যে কোন জ্ঞেয় বস্তু আছে তাও থাকে না। স্রষ্টা-সৃষ্ট ভেদ সেখানে তিরোহিত ; কেবল থাকে একত্ববোধ। সেই দৃষ্টির কাছে এ বিশ্ব মায়িক।

ঐ সমাধি লাভ করে বড় বড় ঋষিমুনিরা নীরব হন ; কথা দিয়ে তাঁদের উপলব্ধ জ্ঞান তাঁরা ব্যক্ত করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'সবই উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম এখনও উচ্ছিষ্ট হননি ; কারণ কেউই তা ব্যক্ত করতে পারে না।' এত যে শাস্ত্র তারাও বাক্যের অভিব্যক্তি মাত্র ; আর কোন অভিব্যক্তিই চরম নয়। উপনিষদ বলেন, 'তত্ত্বমসি', খৃষ্ট বলেন 'আমি ও আমার পিতা এক', কিন্তু এ বাক্যদ্বারাও যথার্থ জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। কারণ বাক্যের মধ্যে "উহা" ও "তুমি" বা "আমি" ও "পিতা" বোধ তখনও রয়েছে। ঠিক ঠিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে বলতে হয় বুদ্ধ হলেন নিখুঁত এক দার্শনিক। কিন্তু লোকে এই জন্যেই তাঁকে ভুল বুঝেছে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—"আপনি কি বলতে চান ব্রহ্ম নেই ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি কি তাই বলেছি ?" অন্যে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি আমি এই বুঝব যে আপনি বলছেন ব্রহ্ম আছেন ?" বুদ্ধ উত্তর দিলেন—"আমি কি তাই বলেছি ?" ভগবান আছেন এ কথা বলাটাও তাঁকে সীমাবদ্ধ করা। এক বললেই দু'এর জ্ঞান থাকে। তাই অদ্বৈত-বাদীরা ভগবানের বিষয়ে নেতিবাচক উক্তি করে থাকেন ; যেমন "এ নয়, এ নয়।" এটা কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ বা শূন্যবাদ নয়। কোন 'বাদ'কেই স্বীকার করা চলবে না। বেদান্তীরা বলে থাকেন—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপ বলতে গিয়ে তাঁরা এই একমাত্র ইতিমূলক পথ নির্দেশ করেছেন। এর

অর্থ হল অবিনশ্বর অস্তিত্ব, শুদ্ধ জ্ঞান ও অফুরন্ত প্রেম এবং অসীম আনন্দ। অবশ্য এতে এটা বোঝাচ্ছে না যে ভগবান আছেন বা তিনি চেতন বা প্রেমময়; বরং বোঝাচ্ছে তিনি স্বয়ং সত্তা-স্বরূপ, চৈতন্য ও প্রেমস্বরূপ। আমাদের কাছে এসব কথার কথা মাত্র। মন এই সত্যকে ধরতে পারে না; একে নিজস্ব করে নিতে হবে, অনুভব করতে হবে।

অনুভূতির নিম্নস্তরও আছে। তখন ভগবানকে জানাও যায়, আবার অহংজ্ঞানও থাকে। "সেই ভগবৎপ্রীতি আমি জানি ও অনুভব করি—" মরমীর এই ভাবকে বলে সবিকল্প সমাধি। ঈশ্বর তখন সগুণ ব্যক্তিবিশেষ। উপনিষদে এই অবস্থার বর্ণনা এইরূপ আছে: 'মাকড়সা যেমন নিজের জাল বুনে তাতে থাকে ও আবার নিজের মধ্যে সেই জাল গুটিয়ে নেয়, ভগবানও তেমনি এ জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকেন এবং নিজের মধ্যেই আবার জগৎকে গুটিয়ে নেন।'

এই ব্যক্তিসত্তাকে আবার সাকার বা নিরাকার ভাবেও অনুভব করা যায়। মরমীরা ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ দেখে থাকেন। মানবমনের তা কল্পনা নয়, কিন্তু বাস্তব সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিতেন এই বলে যে, নিরাকার সমুদ্রের জল দারুণ শীতে জমে বরফরূপে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। মরমীরা আবার সাকার ভগবানকে অবতাররূপে দেখে থাকেন। খৃষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের রূপ আজও অমর হয়ে আছে। এসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের খৃষ্টদর্শন একটা আত্ম-সম্মোহন ব্যাপার নয়। ভগবান খৃষ্টরূপে এসেছিলেন; তাঁর এই রূপ দিব্য ও শাশ্বত। কৃশ্চিয়ানরাই যে কেবল খৃষ্টকে দেখেন তা নয়, অন্যান্য সাধুরাও তাঁকে দেখে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ খৃষ্টকে দেখেছিলেন। তেমনি একজন কৃশ্চিয়ানও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পারেন। মানুষ যখন সবিকল্পের রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে নানা মূর্তি দেখে থাকে। সেই জন্যেই যথার্থ মরমী যিনি, কৃশ্চিয়ান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা যে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হ'ন বা না হ'ন, তিনি কখনও ধর্মান্ধ থাকতে পারেন না। যথার্থ মরমীর কাছে ঈশ্বর-দর্শনের পথ হয় উন্মুক্ত এবং বহুভাবে তিনি তাঁর দেখা পান।

দার্শনিক পরিভাষায় এই সবিকল্প জ্ঞানকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়েছে, যার মূলকথা হল আমি ভগবানের অংশ, তাঁর থেকে বিশেষ কিন্তু পৃথক নয়। এই অবস্থায়ও সমাধি হয় এবং ভগবানের সঙ্গে প্রেম ও মিলন হয়, তাঁর বিভিন্ন রূপ ও গুণাবলী-সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। তখন মনে হয় ভগবান যেন যাবতীয় দিব্য গুণ ও সম্পদের ভাণ্ডার। খৃষ্ট এ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন—'আমি আঙ্গুর গাছ, তোমরা হলে তার শাখা।' সমুদ্র ও তার তরঙ্গের উপমাও দেওয়া যায়। তরঙ্গ কিছু সমুদ্র নয়, কিন্তু সম্মিলিত তরঙ্গেই সমুদ্রের সৃষ্টি। সেইরকম বহু নামরূপে বিশিষ্ট সমগ্র বিশ্ব মিলিয়ে হলেন ভগবান বা ব্রহ্ম।

মরমী ভগবানের এই সব বিবিধ রূপ দেখেন এবং আরও দেখেন এইসব রূপ রূপাতীতে গিয়ে মিলিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—"যখন জ্ঞান-সূর্যের উদয় হয়, তখন বরফ গলে যায়।" ভক্তের তীব্র ব্যাকুলতায় ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন। যেই জ্ঞানসূর্যের উদয় হয় অমনি রূপ অরূপে যায় মিলিয়ে।

এই সব অতীন্দ্রিয় অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে কোন সাধক যখন স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসেন, তখন তিনি এই বিশ্বকে বিভেদসমন্বিত দেখে ভাবেন যে, এগুলি ভগবানের লীলা। তখন তাঁর অহংএর আকারমাত্র থাকে। সময়ে সময়ে তিনি দ্বৈতবাদী হয়ে যান এবং কখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর কত না সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঈশ্বর তখন তাঁর কাছে আসেন পিতা মাতা বন্ধু প্রেমিক বা সন্তানরূপে। এও দেখা যায় যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এই সব

একাধিক সম্বন্ধও স্থাপন করতে পারেন। যথা, খৃষ্ট স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন "তোমরা আমার বন্ধু।"

রামচন্দ্র—যাঁকে অবতার বলে গণ্য করা হয়, একদা তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আমাকে তুমি কিভাবে দেখ?" হনুমান্ বড় সুন্দর ভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয় করে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"যতক্ষণ আমার দেহজ্ঞান থাকে ততক্ষণ মনে হয় তুমি প্রভু, আমি দাস। যখন আমি নিজেকে জীবাত্মা বলে ভাবি, তখন মনে হয় তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। আর যখন ভাবি যে আমি পরমাত্মা, তখন আমি আর তুমি এক বোধ হয়।" বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাব প্রবল হয়। বস্তুতঃ এই তিন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয়সাধন করতে হলে—সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছান চাই। নিম্নস্তরে থেকে—বিশেষ করে ধর্মশাসন ও মতবাদের আওতায় পালিত হয়ে—যদি কাউকে বলতে শোনা যায় যে "আমি ও আমার পিতা এক" তখন আমরা ভাবতে পারি যে, লোকটি ভগবানকে ছোট করছে। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক পথের সাধক একেবারে গোড়া থেকেই এই সব সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজতে থাকেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই তিনটি ভাবের অনুশীলন করেন।

জ্ঞানলাভ করতে হলে ঠিক যে নীতিটি অবলম্বন করতে হবে তা হল নিজেকে অহংমুক্ত করা। কোন জিনিসটা ভগবানকে দেখতে দেয় না?—স্বতন্ত্র অহংবোধ। যথার্থতঃ এই অহংএর মোটেই কোন স্বতন্ত্রতা নেই। এটা ছায়ামাত্র, আর ছায়া ভাবে যে সে সত্য। যে করেই হোক এই ছায়াকে তার আলোতে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হিসেবে লোক ভাবে যে ছায়া সত্য, তখন অহংজ্ঞানও আছে। বেশ, সেই অহং ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকুক। নিজেকে পবিত্র ও দেবভাবময় বলে ভাব, তারপর ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিজেকে সমর্পণ কর।

ভগবৎ-অনুভূতির পথে কয়েকটি কার্যকর উপায় আছে। ধ্যানে এই সব বিভিন্ন ভাব অভ্যাস করতে হয়। নিজেকে ভগবানের মন্দির বলে ভাব। ভগবান সকলের মধ্যে আছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র অন্তরাত্মা; সাকার বা নিরাকার যে ভাবেই হোক ভগবানের চিন্তা করা থাক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তিনিই সর্বব্যাপী সত্তা। অবশ্য আমাদের মধ্যে অহংভাব আছে। আমাদের প্রদীপ-শিখার মত জীবাত্মা সেই বিরাট আলোর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাক। একমাত্র ভগবানই আছেন এই বোধ হলে তবে বলা যায় "আমি ও আমার পিতা এক।" তারপরে ভাবতে হয় যে আমরা তাঁর থেকে বেরিয়ে আসছি, তাঁর পূজা করছি, তাঁর ধ্যান করছি। আবার যখন আমরা কাজ করি, খাই ও ঘুমাই তখন ভাবতে হয় যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। অহংজ্ঞানের ছায়া পরিত্যাগ করে এও ভাবা যায় "আমি ব্রহ্ম, তা' হতে অভেদ। আমি বিশ্বের সঙ্গে এক।"

জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির সংযোগ চাই। অন্তর ও ভাবকে ব্যবহার করা চাই। ভগবানকে ভালবাসতে শিখতে হবে ও সেই সঙ্গে অনুভব করতে হবে যে আমি ও তিনি অভেদ। ধ্যানাভ্যাস করবার সময় সব কটি সাধনবিধির একটা সংগত সমন্বয় করে নিতে হবে। তবেই ভগবানকে দেখার পথ খুলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুধীর চৌধুরী

পঞ্চবটীর তরুমূলে বসি কাহার অতল ধ্যানে
কাটাইতে কাল প্রতি পলে পলে পৃথ্বীচেতনা ভুলি ;
হাত তালি দিয়ে কখনো নাচিতে মায়ের
আরতিগানে ;
কালীমন্দিরে মাতৃপূজায় নিত্য উঠিতে দুলি।

এ ছিল শুধুই তব প্রার্থনা মাতৃকমলপদে ;
দাও না আমারে শুদ্ধা ভক্তি, আর কিছু নাহি চাহি।
মাতৃভাবের প্লাবন আনিলে তোমার চিত্তনদে,
জীবনাঞ্জলি পরাৎপরার তীরে নিয়েছিলে বাহি।

পারেনি রহিতে জগজ্জননী আঁখির অন্তরালে ;
তব আবাহনে মা যে দিলো ধরা তব অন্তর ভরি ;
পরালো জননী বিজয়ের টিকা তব প্রশস্ত ভালে ;
বিশ্বমাতার অমল অঙ্ক নিয়েছিল তোমা বরি'।

এক সত্যের বহুধা প্রকাশ সকল ধর্ম মাঝে ;
নানা রূপে ভাবে এক ভগবান দিয়েছে বিশ্বে ধরা ;
একই বীণার বহু মূর্চ্ছনা বিশ্বলীলায় বাজে,
এক সত্তার বিচ্ছুরণেতে সকল সৃষ্টি গড়া।

"যদি কেহ চাহ হৃদয় ভরিয়া আলোর আশীর্বাদ,"
ঘোষণা তোমার, "ছুঁড়ে ফেলে দাও মোহ-
আঁধারের খেলা।
মাতৃচরণে লহগো শরণ, লহ সাধনার স্বাদ,
মায়ের ধেয়ানে রহ নিমগ্ন জীবনের সারা বেলা।"

যুগে যুগে আসে গোলোকের হরি মানবের মূর্তি ধরি',
দুষ্কৃতজন বিনাশন তরে, হরিতে ভুবনভার।
তুমি এসেছিলে অধরার দেব নামরূপ মালা পরি',
করিলে নরক-পঙ্ক হইতে ধরণীরে উদ্ধার।

পরমহংস রাম ও কৃষ্ণ মিলনের অবতার,
ভারত অন্তরাত্মার চির জাগ্রত বিগ্রহ ;
তপোবলে তুমি নাশিয়াছ এই যুগের অন্ধকার,
হে তাপস, প্রেমঘন প্রশান্ত আলোর বার্তাবহ।

বিবেকানন্দ, ব্রজের রাখাল আরো কত যুগ-ঋষি,
তোমার মন্ত্রে উঠেছিল জেগে সাধনার মঠে মঠে ;
তোমার বাণীরে নিয়েছিল বহি দেশে দেশে
দিশি দিশি ;
হিন্দু ধর্ম সনাতন এযে অখিলে পড়িল র'টে।

নমো নমো নম শ্রীরামকৃষ্ণ সব সিদ্ধির মণি,
জন্ম তোমার আলো আঁধারের যুগসন্ধিক্ষণে।
যুগের নেতারা শুনেছিল তব চির উদাত্ত ধ্বনি ;
লভেছিল মহামুক্তি-দীক্ষা তব পদপরশনে।
ওগো বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ জগতের চিরগুরু !
ঝরাও তোমার কল্যাণধারা ধরণীর শুভ লাগি ;
তব আগমনে সত্য যুগের হইয়াছে যেন শুরু ;
তোমার দিব্য পরশের তরে রহিয়াছি মোরা জাগি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনায়নের এক অধ্যায়

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেতিহাস তাঁহার জন্মের ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার তিরোধানের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসরের তথ্যবহুল ঘটনাবৈচিত্র্যের পরিমাপেই সীমায়িত নহে, পরন্তু তাঁহার স্মৃতির সহস্র সান্নিধ্য, তাঁহার সমৃদ্ধ আখ্যাননিচয় অনাগত মানবসমাজের অনন্তশক্তি

ও প্রেরণার অনর্গল উৎস—চরমতম অধ্যাত্মদর্শনের নিদর্শন, যাহার সাহায্যে মানব আধ্যাত্মিক জীবন-সৃজনের সঙ্কেত পাইবে।

সনাতন ভারতের অবলুপ্তপ্রায় অতীত ও ভাস্বর ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে তিনি দ্যুতিময় 'বর্তমান',—মহাকালের ত্রিভাগ ইতিহাসের প্রয়াগক্ষেত্রে তিনি এক চৈতন্যময় একীভূত জমাট বিগ্রহ, স্বর্গীয় রসাস্বাদনের সঠিক স্বয়ম্ভু সমীকরণ।

বাংলার তথা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের সকল প্রকার সাধনসিদ্ধির দিগ্‌দর্শন তিনি। এই সাধনসমুদ্রে জীবনতরণী যখনই সীমাহীনতার মাঝে দৃষ্টিহারা হইয়া হাবুডুবু খায়, তখন তাঁহার সুমহান আদর্শ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয়ের অবসান ঘটাইয়া শাশ্বত-স্থির-অচল ধ্রুবতারার ন্যায় দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দিয়া ঊর্ধ্বমুখী ও পবিত্র জীবন-যাপনের সহায়করূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই কারণেই তাঁহার জীবন ও বাণী সমসাময়িক কালের ও জাতির নির্দিষ্টতার মাঝে সান্ত নহে, উহা মানবের নৈর্ব্যক্তিক ও নৈর্জাতিক দেবমানবতার প্রতীকরূপে মহাজাতি-সাধনার ব্যাপক ক্ষেত্রেও অবারিত। এইখানেই তাঁহার জীবনের যথার্থ সার্থকতা।

ভারতের ধর্মগত প্রাণ পরশক্তির চাপে যখন মুমূর্ষু, তাহার কৃষ্টি, তাহার সৃষ্টি যখন অনাত্মীয় পালনকর্তার অধীনে ধ্বংসোন্মুখ, তখন মধুমাসে দোললীলার পূর্বে রামকৃষ্ণদেবের এই বাসন্তিক আবির্ভাব যেমন রঙে ও রেখায় সঞ্জীবিত, তেমনি নূতন ফাগের নূতন চুতমঞ্জরীর রসঘন অবদানের তথা শাশ্বত প্রাণধারার দ্যোতক। ফাল্গুনের এই নির্মোহ অবদান ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়। শীতের হিমেল স্পর্শে স্খলিত পত্রের অবসানে প্রাচীন বৃক্ষদেহে যেমন নবপত্রের সবুজ কোরকদল বিচিত্র শোভায় নবতর তারুণ্যের ব্যঞ্জনায় মূর্ত হইয়া উঠে সেইরূপ ভারতের প্রাচীন, শুষ্ক-রিক্ত কলেবরে রামকৃষ্ণদেবের আবাল্য-ধর্মভাব-অনুপ্রাণিত জীবনরস নব প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে।

গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মের স্বপ্ন ও যুগীদের শিবের জ্যোতির্ময় আলোকের রহস্যময় মিলনের মাঝে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে দরিদ্র অথচ সত্যনিষ্ঠ পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতা শ্রীমতী চন্দ্রমণির ভাঙ্গা ঘরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব। এই তপোবহ্নিকে তাঁহার জন্মের পরক্ষণেই ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় ধাত্রী ধনী কামারনী আবিষ্কার করিলেন উনানের মাঝে। তাঁহার জন্মগৃহ ঢেঁকিশালও বোধ হয় তুচ্ছ তুষের অপসারণে তণ্ডুলরূপ সারবস্তু-গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাগ্রামের উদাস উন্মুক্ত ও উদার জীবন-যাত্রার মাঝে গদাধরের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। প্রাকৃতিক অজস্রতার সাহচর্যে, অনাবিল আকাশের অফুরন্ত দাক্ষিণ্যের মাঝে তাঁহার শৈশবপাঠ হইল সাঙ্গ। প্রকৃতিরূপ গুরুর অধীনে তাঁহার শিক্ষা যে কতদূর সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আমরা বুঝি যখন গ্রাম্যপথে চলিতে চলিতে একদিন মাত্র ছয়বৎসর বয়সে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘের পট-ভূমিকায় হংসবলাকার অবাধ সঞ্চরণ গদাধরের মনকে অধ্যাত্মানুভূতির অনাহত ঝঙ্কারের অধিকারী করিয়া তাঁহার নশ্বরদেহকে মূর্চ্ছাহত করিল। সেইদিন হইতেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইল। ভোগপ্রবৃত্তির সহায়ক 'চাল-কলাবাঁধা বিদ্যা'কে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন না। মহাবিদ্যার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আপাতবিচারে একপ্রকার নিরক্ষরই থাকিয়া গেলেন।

জীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টির এই নবভঙ্গী তাঁহাকে অধ্যাত্ম-সাধনার অমৃতাস্বাদনে ক্ষুধাতুর করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া" এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের

মাঝে সদানন্দে বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহার এই ধারণা তাঁহার পরবর্তী উদার জীবনযাত্রার পথে একটি সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন লাভের সহায়ক বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে। উপনিষদের মহাবাণীও এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়ঃ—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
　　আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
　　ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥" (কঠ)

অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ যে আত্মা তাহার তত্ত্ব জীবসমূহের অন্তরে নিহিত আছে। অকাম ও বীতশোক ব্যক্তি শরীরধারক মন আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থায় ঐ আত্মার মহিমদর্শন বা উপলব্ধি করে।

শীঘ্রই এক সুন্দর সুযোগও এই সিদ্ধপুরুষের অভিলিপ্সিত জীবনযাত্রার সহায় হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার গদাধরকে সংবাদ পাঠাইলেন—"কলিকাতায় আসিয়া আমার প্রাত্যহিক পূজারী-বৃত্তিসাধনে সহায়ক হও।" শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিলেন কিন্তু কলিকাতায় তাৎকালিক দ্বন্দ্বময় জীবন, বহির্ব্যাকুলতার তাণ্ডবময় লীলাখেলা ও আসক্তির মদিরায় মাতলামির মিছিল চলিতেছিল। এই পরিবেশের মাঝে তাঁহার মন হইয়া উঠিল রিক্ত, নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ। ইহা ব্যতীত দৈনন্দিন জীবন-ধারণের অভাব-অনটন তাঁহাকে অধিকতর নিস্পৃহ করিয়া তুলিল। জীবনের বৃহত্তম লাভের পূর্বে এ এক প্রশংসনীয় প্রস্তুতি। "Blessed are the pure in heart for they shall see God"—পবিত্রাত্মারাই ঈশ্বরলাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটিলেন সেই পথে যে পথে ত্যাগই একমাত্র পাথেয়, বৈরাগ্যই একমাত্র সহায়, আন্তরিকতাই একমাত্র উপায়—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" যে পথের আহ্বান—"Decline yourself, bear the Cross and follow me"—অর্থাৎ স্বার্থকামনায় ও লাভালাভে উদাসীন হও। জীবনের দুঃখবিপদাদি ধৈর্যের সহিত বহন কর ও আমার পথে অর্থাৎ ভগবানের পথে চল।

গঙ্গার পূর্বতীরে, দক্ষিণেশ্বরের সহজশ্রী ও গাছের জীবন্ত জটলার অন্তরঙ্গতায়, রাণী রাসমণির স্বপ্নাদিষ্ট দ্বাদশশিবমন্দিরযুক্ত কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ শেষ হইল। কলিকাতার নিকটস্থ শহরতলীর এই মুক্ত, নিরালা ও নিস্তব্ধ পরিবেশের অকৃত্রিম সখ্যের মাঝে অখণ্ডজীবনের আস্বাদস্পৃহা লইয়া গদাধর আসিলেন বিষ্ণুমন্দিরের পূজকরূপে। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি বিজয়মূর্তি ভবতারিণীর পূজারী নিযুক্ত হন। সাধনজগতের বিভিন্ন অনুভূতিলাভের অন্তর্লীন ব্যাকুলতা তখন তাঁহার মনে কালবৈশাখীর ঝড় তুলিয়াছে।

এক দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গতা তাঁহাকে পাইয়া বসে। হৃদয়ে এক বিত্রস্ত জ্বালাময়ী বেদনা মাতৃমিলনাকাঙ্ক্ষায় আপ্লুত হয়। এই অস্থিরতা যে প্রাণবস্তু একটা কিছু তাহা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে প্রমাণিত হয়। অঝোর ক্রন্দনে, অভি-মানের সুরে যখন তিনি চীৎকার করিতেন—"আমাকে দেখা দিবি না, মা?"—তখন তাঁহার ঐ গভীর-মিনতিপূর্ণ উতরোল আকুতি উপস্থিত সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিত। অবশেষে একদিন মায়ের জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি তখন সবকিছুই চিন্ময় দেখিতে থাকেন। মায়া-আবরণের 'আঁধার গহন ঠেলিয়া' অপরোক্ষ অনুভূতির উহা এক অতন্দ্র উদ্বেল অরুণোদয়। বুঝিলেন চেতন-রাজ্যের স্বপ্নপুরী কেবলমাত্র কল্পনাবিলাস নহে; ত্যাগ ও প্রেমের সুমহান প্রস্তরখণ্ডে তাহা গঠিত, সাধন-প্রচেষ্টার দুঃখ-বেদনার ভাস্কর্যেই তাহা উৎকীর্ণ, আন্তরিকতার অনুলেখায় তাহা রূপায়িত এবং অকম্প আত্মবিশ্বাসে তাহার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে নানা সাধনার আরম্ভ,

—"যতমত ততপথ" নির্দেশের যাহা ভিত্তিভূমি। পঞ্চবটীর ঘনগাছের সমারোহের মাঝে, রহস্যঘন আবেষ্টনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতানুভূতির চরম সাধনাও বাদ পড়িল না। তাঁহার ভাগবতী তনুতে তাই দেখিতে পাই অনাবিল প্রসন্নতা যাহার সাথে উপনিষদের কথার তুলনা মেলে:—

> "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
>
> —(শ্বেতাশ্বতর উপ)

সেই মহান আদিত্যবর্ণ তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের পরপারস্থ পুরুষকে আমি জানিয়াছি; তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ইহা ব্যতীত অমৃতত্বলাভের অন্য উপায় নাই।

ইহার পর ঐ "চাপরাস"প্রাপ্ত যুগ-প্রতিভূর আধ্যাত্মিক ভোজসভায় সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনি-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান, দ্বৈতবাদি-অদ্বৈতবাদী, সাকারবাদি-নিরাকারবাদী, গৃহি-সন্ন্যাসী, বালক-বৃদ্ধ সকলেই। এই জনতার ভিড়ে সকলেই তাঁহার উদারতায় বিমুগ্ধ হইয়াছে। সকলেই 'বাদশাহী আমলের টাকা' ছাড়িয়া 'নবাবী আমলের টাকা' সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সর্ব-সাধনার সিদ্ধিরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিতেন কাহার কি ভাব, কি তাহার পথ, কিসে তাহার সিদ্ধি। এই ধারণা তাঁহার বুদ্ধিগত কষ্ট-কল্পনার স্বেদ-মূল্যে ক্রীত অনিশ্চয়তা নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষানুভূতি। ভূ-বিদ্যা পুস্তকে লিখিত মেরু-রশ্মির বর্ণনাপাঠ নহে, ইহা স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবের উদারতা ও সকল-সাধন-রীতি-স্বীকারের ঔদার্য এক বিস্ময়কর সত্য। বহু-সাধনার শাখা-সম্বলিত ধর্মবৃক্ষের নীচে বাস করিয়া তিনি 'বহুরূপী'র সকল রূপতত্ত্বের সন্ধানই পাইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার মত ভুল ও তাঁহার নিজস্ব মতই অভ্রান্ত এই বলিয়া দলে টানিতেন না। প্রত্যেককে তাহার অবস্থাতেই একটু 'চিতাইয়া' দিতেন মাত্র। ব্রহ্মচারীকে সাধারণ কাষ্ঠ আহরণ করিতে দেখিলে তিনি কোন আপত্তি তুলিতেন না, কেবল তাহাকে অধিক অগ্রসর হইতে বলিয়া চন্দনকাঠ, রূপার খনি ও সোনার খনির সন্ধান বলিয়া দিতেন মাত্র। তিনি জানিতেন, "অনাদি অনন্ত অফুরন্ত শক্তির সীমাহীন প্রকাশ—দেশ ও কালের পরিধির মাঝে স্ফুরণ; ইহা নিষ্ক্রিয় হইয়াও সকল ক্রিয়ার উৎসস্বরূপ—সংখ্যা, গুণ ও রূপ বাধিত, অনির্বাচ্য ও অনির্দেশ্য; পরমার্থ সন্মাত্র ও বুদ্ধির অগম্য,—তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া উচ্ছিষ্ট করা যায় না। তথাপি সত্তা ও শক্তি, ভাব ও ভব (being and becoming), ব্রহ্ম ও জগৎ, শিব ও কালী অভেদ;—ইহা চিৎশক্তি ও চিদ্-বিলাসের লীলাখেলামাত্র।" অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, জল ও তাহার তরঙ্গলীলার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভেদাভাস-মাত্র। পাহাড়ে উঠিবার পূর্বে পৃথিবীর বস্তুনিচয় বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেও পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলে তাহা একাকার হইয়া একটিমাত্র বস্তুসত্তার প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি বিভিন্ন হইলেও ছাদে উঠিয়া দেখা যায় ছাদ ও যাহা দিয়া তৈয়ারী সিঁড়িও তাহা দিয়াই তৈয়ারী।

এই রহস্যময় চৈতন্য-সত্তা, লোকোত্তর চরিত্র, 'সর্বধর্মস্বরূপী' 'অবতারবরিষ্ঠ', 'নির্গুণ-গুণময়' পুরুষের জন্য মানবের আন্তরিক পাদ্য-অর্ঘ্য চিরকাল সজ্জিত থাকিবে। এই আগের সত্তার উদ্দেশে তাই স্বতই বলিতে ইচ্ছা করে:

> "শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
> করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।"
>
> —(রবীন্দ্রনাথ)

মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ

অতুলানন্দ রায়

ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূল কথা জীবে শিব-জ্ঞান। অখণ্ডব্রহ্ম-সত্তাবোধ। জীবে প্রেম, জীবের সেবা ঈশ্বরেরই সেবা।

দিব্যদর্শী ঋষি বলেছেন, "ত্বমেকোঽসি বহুতনুপ্রবিষ্টঃ"…তিনি এক হয়েও বহু তনুতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। এই অনাদি অনন্ত 'একে'র বহু বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও সেই 'একের'-ই অস্তিত্ব-বোধ অপরিসীম ভালবাসার নির্ঝর মুখ খুলে দেয়। ভেসে যায় তখন যোগ্যাযোগ্য-বিচার, থাকে না জাতি কুল মান মর্যাদা ভেদজ্ঞান। তখন ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, ভালো লাগে বলেই ভালবাসা। নির্বিচারে জীবে শিবজ্ঞানে অনুরাগ-নিবেদন করাই চরম সার্থকতা। তখনই মূর্তরূপে প্রকাশ পায় গীতার বাণী, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি"। অমৃতমধুর কণ্ঠে গীত শুনি পরম বৈষ্ণব চণ্ডীদাসের গান, "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এই মহান সত্যকেই প্রত্যক্ষ জীবনে রূপায়িত করে দেখাতে ও শেখাতে এসেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

জীবকে শিবজ্ঞানে অকপটভাবে ভালোবাসাই শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের মূল ভিত্তি। যে মতেই চল, যে পথেই এগোও, মানুষকেই যদি ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা কর, ভালবাস, পেতে চাও, মতেরও মত্ততা নেই, পথেরও পার্থক্যে যায় আসে না। মানুষ মানুষ। ছোট বড়, উঁচু নীচু, জাত বেজাত দেশ বিদেশ নিয়ে বিচার নেই, বিবাদ-বাদানুবাদ নেই। তখনই সম্ভব যুদ্ধ-বিবাদবিরতি। তখনই বিরাজ করে সাবলীল শান্তি সখ্য সাম্য। মৃন্ময় ইষ্টমূর্তি, দেববিগ্রহ প্রতীক তো! ওই প্রতীক মধ্যে ভগবানকে আরোপ করেই না পূজার্চনা। জীবও প্রতীক। এ প্রতীকে "ইহাগচ্ছ" বলা নেই। রয়েছেন-ই তিনি জীবস্বরূপে। সত্য সুন্দর শিব, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-সচেতন।

এই সচেতন দেবতার পূজাই সহজ-পূজা। গর্ভ-ধারিণী বৃদ্ধা জননী মনে কষ্ট পাবেন বলে বেদান্ত-সাধনকালেও শ্রীরামকৃষ্ণ চিরাচরিত বৈদিক প্রথা মেনে নামরূপত্যাগী সন্ন্যাসী সাজেন নি। অখণ্ডব্রহ্ম-সত্তাবোধ করার পরেও প্রত্যহ প্রভাতে প্রথম জননী চন্দ্রমণির পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে প্রশ্ন করতেন, "মা, কেমন আছ?" মায়ের মুখে, "বেশ আছি বাবা" শুনে তবে অন্য কাজ। "বেশ নেই" শুনলে যেন আর কোনও কাজ নেই। সাধন ভজন পূজার্চনা, দেবতার সান্নিধ্য সাধ সব-ই যেন জগন্মাতার প্রত্যক্ষ প্রতীক জননীর তুষ্টি-সাপেক্ষ। এ শ্রদ্ধা, এরূপ ভালবাসা শুধু রক্তমাংসের টানেই প্রকাশ পেত তা নয়। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে-ই প্রকাশ পেত প্রাণের টানে, নির্বিচারে "সবার উপরে মানুষ সত্য" স্বীকার করে, অপ্রত্যাশী অনুরাগে।

ধনী কামারের মেয়ে। গদাধরের ধাই মা। ব্রাহ্মণের ছেলে গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম)। ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রথম সংস্কার উপনয়ন। উপবীত-ধারণ করে ব্রহ্মচারী বেশে তাকে অন্নভিক্ষা করতে হয়। উপনয়নের প্রাক্কালে ধনী শিশু গদা-ধরকে বললো, পৈতের সময় আমি তোমাকে ভিক্ষা দেব, বাবা।… খেয়াল। অশিক্ষিতা পল্লীরমণী ধনী শিশু গদাধরের প্রতি অত্যধিক স্নেহে ভুলে গিয়েছে গদাধর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর সে নিম্নতর

জাতের মেয়ে। প্রথাপর্থায় ভুলে মানুষের মেয়ে ধনী প্রকাশ করে ফেলেছে অন্তরের দুরাকাঙ্ক্ষা। আত্মীয় স্বজন সমাজপতিদের প্রতিবাদ বারণ তিরস্কার গ্রাহ্যও করলো না গদাধর। করলোই সে সত্যপালন। ধনী কামারনীর হাত থেকেই গ্রহণ করলো অন্নভিক্ষা। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ গদাধরের সর্বাঙ্গ থেকে সহস্র মুখে ধ্বনিয়ে উঠলো শাশ্বত জীবনসত্যের স্বীকৃতি, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই বালক গদাধর শিহড়ে রাখালদের সঙ্গে বসে খেলো জলপান, চিনিবাস শাঁখারির হাতে খেলো মিষ্টান্ন, নির্ভীক মনে ছুতোরের মেয়ে খেতুর মার সাধ মেটাতে বসে খেলো ছুতোর মেয়ের দেওয়া ডালভাত।

হলোই বা রাখাল, হলোই বা শাঁখারি, হলোই বা ছুতোরের মেয়ে, মানুষ তো। জীবন্ত জীব। নিঃসংশয়ে ওদের সঙ্গে আপন অসমত্ব অস্বীকার না করলে হয় না যে ব্রহ্মসাধনা, ব্যর্থ হয় যে শাস্ত্রের বাণী; "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"···জীব তো ব্রহ্মই। অপর নয়। অভিন্ন তো।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীর মেথর রসকে। মায়ের পূজারী রামকৃষ্ণ। এতটুকু পার্থক্যবোধ নেই রামকৃষ্ণের। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। হাসিগল্প করেন ঠাকুর বাড়ীর মালিকদের সঙ্গেও, মেথর রসকের সঙ্গেও। অবশেষে তাকে একদিন কৃপা করলেন। মানুষ তো সেও। "বহুতনু প্রবিষ্টঃ" যে পরমেশ্বর তিনি তো রয়েছেন রসকের মধ্যেও। রসকের সেবা তাঁরই সেবা তো!

বৈদিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী। রামকৃষ্ণের বেদান্ত-সাধনের গুরু। পঞ্চবটীর তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন তোতাপুরী। পাশেই রামকৃষ্ণ। বৈদিক সন্ন্যাসীরা ধুনিকে শ্রদ্ধা করেন বহ্নিব্রহ্ম-জ্ঞানে। ধুনির আলোতে বসে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে বলছিলেন অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির কথা। ঠাকুরবাড়ীর একটা মালির সাধ হয়েছে তামাক খাবে। আর কোথাও সহজে আগুন না পেয়ে এলো তোতার জলন্ত ধুনি থেকেই একটু আগুন তুলে নিতে। মূর্খ মালী। জানে না তো সন্ন্যাসীরা ধুনিকে শ্রদ্ধা করে বহ্নিব্রহ্ম বলেন। আগুন আগুন। নিলই বা এক টুকরো। এলো। নিচ্ছিলও। দেখেই তোতাপুরী চটে লম্বা লোহার চিম্‌টা তুলে তেড়ে মারতে উঠলেন মালীটাকে। মালী তো দিল ছুট্। "দূর্ শালা দূর্ শালা" বলে হেসে গড়াতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। দেখে তোতা বললেন, "দেখলে কী অন্যায়? ধুনির আগুন নিয়ে তামাক খেতে চায়? তা তুমি হাসছো কেন? হাসির কি হলো এতে?"

রামকৃষ্ণ তখনও হেসে গড়াতে গড়াতে বললেন, "হাসছি তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টা দেখে। এই না তুমি বলছিলে, ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় সত্তা নেই। জগতে যা কিছু সবটাতে তাঁরই প্রকাশ। আর রাগের বশে সব ভুলে মানুষকে মারতে-ই তেড়ে উঠলে?"

মালীটাও মানুষ তো। অধ্যস্ত ব্রহ্মস্বরূপ। ক্রোধে স্বার্থে ভেদজ্ঞানে মানুষকে আঘাত করা ভগবানকেই আঘাত করা নয় কি? ভগবানকেই ক্ষুণ্ণ করা নয় কি?

ব্রহ্মানন্দে ডুবে আছেন রামকৃষ্ণ। বাহ্য জ্ঞান নেই। ক্ষুৎপিপাসা-বোধও নেই। নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন অটল অচল হয়ে আছেন মাসের পর মাস, ছয় মাস। এ ভাবে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকাই বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য। পূর্ণাঙ্গ সাফল্য। দেব-বাঞ্ছিত সচ্চিদানন্দ। সাধকজীবনে সব চেয়ে বড় পাওয়া। জগন্মাতা বললেন, নিজেই আনন্দে মেতে থাকবি কি? লোককল্যাণে নেমে আয়। আনন্দে মাতিয়ে দে সবাইকেও।

নিরুদ্বিগ্ন দেবদুর্লভ পরমানন্দ ছেড়ে নেমে এলেন রামকৃষ্ণ লোককল্যাণে, লোকসেবায়। আত্মদান করলেন মানুষের হিতসাধনে, পরমাত্মীয়-বোধে,

পরম ইষ্টজ্ঞানে। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের হিত সাধন করা, সেবা করা যেন ব্রহ্ম-সান্নিধ্যলাভের চেয়েও প্রিয়তর। পরম শ্রেয়ঃ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অসামান্য মানবপ্রীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর প্রাণপ্রতিম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। পরমপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব পূর্ণ মানব। কে এই পূর্ণ মানব? নিজের মতো প্রিয় ও শ্রেয়ঃ জ্ঞানে যিনি সবাইকে দেখেন, ভালোবাসেন, সেবা করেন। এ জ্ঞান আসে অখণ্ড একত্ববোধের ফলে। তখনই অনুভূত হয়, আমি আমিই নয় শুধু, আমি তুমিও। তুমিও আমি-ই। এই আত্মপ্রসাদের পরিণতি সচ্চিদানন্দে মগ্নচিত্তেই আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Never forget the glory of human nature! we are the greatest God...Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I Am"...মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মাধুর্যকে কখনও ভুলো না। আমরাই পরম ঈশ্বর। যীশু ও বুদ্ধরা এই শাশ্বত আমির অনন্ত ব্যাপ্তির তরঙ্গমাত্র।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে রোজ-ই প্রসাদী অন্ন বিতরণ করা হয়। চাঁদনীতে সারি দিয়ে বসে গরীব দুঃখী কাঙালীরাও প্রসাদ পায়। আপন খেয়ালে মায়ের পূজারী রামকৃষ্ণ এক এক দিন কাঙালীদের এঁটো পাতা তুলে নিয়ে ফেলেন। এঁটো প্রসাদের কণা খুঁটে খান। ঘৃণা নেই, গ্রাহ্যও নেই। রামকৃষ্ণের খুড়তুত ভাই হলধারী (শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজারী) একদিন দেখে তেড়ে এলেন: রামকৃষ্ণ, তুই কিরে? ছত্রিশজাতের এঁটো তুলছিস্, খুঁটে খাচ্ছিসও? বামুনের ছেলে না তুই? এঁটোমাখানো হাতটা চাটতে চাটতে রামকৃষ্ণ অনুদ্বিগ্ন আনন্দে বললেন, হলামই বা। এরাই বা কি কম? জীব-ই শিব তো। সবটাতেই শিব। মানুষে বিশেষ প্রকাশ। সচেতন।

মথুরের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন রামকৃষ্ণ। দেওঘরে এসে নেমেছেন ওঁরা। বৈদ্যনাথ দর্শন করে কাশী যাবেন। দেওঘরে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। পথের ধারে একটা ধূসর মাঠে জড়ো হয়ে পেটের জ্বালায় হাহাকার করছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত রিক্ত দীন দুর্গত একদল সাঁওতাল। সেই পথে যেতে তাদের দেখে তাদের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে ব্যথার্ত রামকৃষ্ণ মথুরকে বললেন, "সেজবাবু, তুমিতো মায়ের-ই দেওয়ান। এরাও মায়েরই ছেলেমেয়ে। ওদের একদিন পেট ভরে খেতে দাও, একমাথা তেল দাও, পরতে একখানা করে কাপড় দাও।" মথুর বললেন, "এখন এই পথের মাঝখানে এতটাকা কোথায় পাব, বাবা? তীর্থে চলেছি। কখন, কোথায়, কি খরচা লাগবে জানিনে। হাতের টাকা এখানে ওদের জন্য খরচা করে ফেললে হয়ত কত জায়গায় যাওয়া-ই হবে না। দেবদর্শনও হবে না।"

দরদী রামকৃষ্ণ ওই ক্ষুধার্ত নগ্ন-সাঁওতালদের মধ্যে বসে পড়ে বেদনাবিহ্বল আর্তকণ্ঠে বললেন, "তবে তোমরা যাও বাবু। আমি এদের সঙ্গেই থাকবো"...দুঃস্থ দরিদ্র উপবাসী জীব...এদের হাতেই তো দেবতা নেবেন সশ্রদ্ধ নিবেদন...পূজার নৈবেদ্য। কোন্ তীর্থে তুমি পাবে এমন সজীব দেবতার দর্শন? কোথায় আবার তীর্থ, কোথায় তুমি খুঁজবে দেবতাকে? এখানে এদের মধ্যেই তো তিনি। এরাই-তো দরিদ্রনারায়ণ।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

দেওঘরে দু'দিন থেকে মথুর অনশনে ক্ষীণ দুঃস্থ দীন সাঁওতালদের পেট ভরে খেতে দিলেন, ধূলিরুক্ষ মাথায় দিলেন তেল, নগ্ন দেহ ঢেকে দিলেন বসন। আনন্দে নাচতে লাগলেন রামকৃষ্ণ...এই-তো তীর্থ, এরাইতো নারায়ণ...এই-তো সহজ দেবদর্শন। প্রিয়বোধে শ্রেয়োজ্ঞানে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে মেখেই তো দেখতে পাওয়া যায় প্রিয়তমকে সবার মধ্যে...

সকল রূপে, সর্বত্র। তাই না শ্রীরাধা দেখেছিলেন কৃষ্ণময় বৃন্দাবন।

রাসমণির জানবাজারের বাড়ীতে এসেছেন রামকৃষ্ণ। আত্মভোলা তন্ময়। সর্বদাই সমাধির ভাব। কখনও কথা বলেন, আবার কখনও ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। মথুর, মথুর-পত্নী জগদম্বা এঁরা সবাই তখন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত ভক্ত। দেখে শুনে ওঁদের পুরোহিত হালদার ঈর্ষায় জলে যায়। ভাবে রামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই গুণতুক্ করেছে বাবুকে। রামকৃষ্ণের জন্যেই ওদের মানসম্মান পসার-প্রতিপত্তি কমে গেছে। সেদিন বৈঠকখানায় বসে আছেন রামকৃষ্ণ। একাই। তন্মনস্ক ভাব। সুযোগ বুঝে হালদার এসে শুধালো, "এই বামুন, কি করে বাগালি বাবুটাকে? বল্না। কি করে হাত করলি? বল না?"

রামকৃষ্ণ নীরব। বার বার প্রশ্ন করে কোনই উত্তর না পেয়ে হালদার চটে রামকৃষ্ণকে মেঝেতে ফেলে, "বলবিনে শালা" বলতে বলতে বারংবার পদাঘাত করে চলে গেল। গায়ের ধুলো ঝেড়ে রামকৃষ্ণ উঠে বসলেন। কিছুই বললেন না কাকেও, ঘুণাক্ষরেও বললেন না মথুরকেও। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণুভাব! অক্রোধ। অহিংস। প্রেমময়। কিছুদিন বাদে মথুর শুনে বললেন, আমায় বললেন না, বাবা। ওর মাথাই থাকতো না তাহলে। রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, তাইতো বলিনি সেজবাবু। যাই করে থাক হালদার, রাগের বশেই করেছে। রাগ পড়লেই বুঝবে। মানুষ তো। ও রাগলো বলে আমিও রাগবো কি?

রাগদ্বেষ হিংসার এতটুকু অবসর নেই। শত্রুমিত্রবিচার-সাপেক্ষ নয় মানুষ। মানুষ মানুষ। তাকে ভালবাসাই ধর্মকর্ম, সাধনাসাফল্য। বৈরীকেও বশ করতে হবে ভালবেসে। রাগকে দমন করতে হবে প্রেমে। "অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধম্" বলেছিলেন বুদ্ধ। অন্তিম মুহূর্তে প্রাণঘাতী চণ্ডালকে ও ক্ষমা করে আশীর্বাদ করেছিলেন পরমানন্দে। তেমনি।

নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে ভালবাসতেন । গিরিশ তখন মদ্যপ অনাচারী। থিয়েটারে একদিন মাতাল গিরিশ খুব গালাগাল দিলেন ঠাকুরকে। মারমুখো। ভক্তরা ভয়ে রামকৃষ্ণকে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরের দিনই রামকৃষ্ণ গিরিশের বাড়ী এসে হাজির। বললেন 'তোমাকেই দেখতে এলাম গিরিশ। এখন কেমন আছ বল।' পায়ে লুটিয়ে পড়লেন নাট্যকার। এতখানি ভালোবাসা কবির কল্পনাতেও আসে না যে!

রামকৃষ্ণকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে সপরিবারে এসেছেন বলরাম বসু। দেখে শুনে নৌকায় উঠলেন বাড়ী ফিরতে। দেখতে দেখতে ঝড় উঠলো খুব। ফুলে ফুলে উঠলো গঙ্গার তোড়। নৌকাখানাও দুলতে লাগলো উদ্বেল তরঙ্গাঘাতে। তীরে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণের কী কান্না! 'আহা! ওরা ডুববে নাকি ছেলেপুলে নিয়ে?' সবার মধ্যে আপনকে, আপনার মধ্যে সবাইকে এভাবে দেখতে পান যিনি, ভালবাসেন যিনি তিনিইতো মহামানব। সকল কালে সর্বত্র সবার প্রতি অহেতুক প্রেমেই তো তাঁর প্রকাশ। তাঁর পরিচয়।

বেড়াতে বেরিয়ে পথের ধারে পতিতাদের দেখে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলেন রামকৃষ্ণ। এদের মধ্যেও তো রয়েছেন তিনিই—"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—যে দেবী সবার মধ্যে মাতারূপে বিরাজ করছেন।

রামকৃষ্ণ দেখালেন, শেখালেনও, পতিতাকেও মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা যায়। করতেই হয় সর্বভূতে জগন্মাতার অখণ্ড সত্তা স্বীকার করে।

অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরের বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে একদিন রামকৃষ্ণ দেখলেন, যেন ওঁর দেহের ভিতর থেকে আর একটা দেহ

খোলস্ ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতো বেরিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ালো। পিঠে অনেকগুলো ঘা। ঘা কেন? কিসের ঘা! ভাবাবিষ্ট হ'য়ে জান্‌লেন ওগুলো হয়েছে পাপীদের স্পর্শে।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন কথা-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছিলেন যে, মানুষের হিতব্রতে যদি তাঁকে অসংখ্য কোটী বারও জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাও করবেন। আজও আবার তাই ব'লে পিঠে ঘা দেখার প্রসঙ্গে বল্‌লেন, "দেখলুম পিঠময় ঘা হ'য়েছে। ভাব্‌ছি কেন এমন হল? আর মা দেখিয়ে দিলে, যা তা কোরে এসে যতলোক ছেঁায় আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়—ওদের দুষ্কর্মের ফল নিতে হয়। সেই সব নিয়ে নিয়েই তো পিঠময় ঘা হয়েছে। গলায় ঘা হয়েছে। তা কি করব বলো! মানুষই তো, যাই করে থাক, দূর করে কি দিতে পারি?" বিস্ময়ে আতঙ্কে ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলেন, আর অপরিচিত কাকেও ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেও দেবেন না, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেও দেবেন না। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বল্‌লেন, "যতই বল, চেষ্টা করে দেখ, পারবে না শেষ পর্যন্ত। ঠাকুর এসেছেনই তো পাপি-পতিতকে উদ্ধার করতে।"

নাট্যকার গিরিশ ঘোষের থিয়েটারের অভিনেত্রী বিনোদিনী, খুব তার খ্যাতি। অভিনয়ও করে অপূর্ব। শ্রীচৈতন্যলীলা নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রশংসা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিয়ে ছিলেন। পদস্পর্শেই বিনোদিনী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলো। সে দিন থেকেই বিনোদিনী ঠাকুরের ভক্ত। দেবতাজ্ঞানে নিত্য ঠাকুরের নাম করে। শ্যাম-পুকুরের বাড়ীতে ঠাকুর অসুস্থ শুনে বিনোদিনী দেখতে অধীরা হ'লো। যাবে, ঠাকুরকে দেখবে, আবার একবার ঠাকুরের পদধূলি মাথায় মেখে জীবন ধন্যজ্ঞান করবে। গিরিশ ঘোষকে জানাতেই তিনি বললেন, "এখন আর উপায় নেই। ঠাকুরের ঘরে এখন যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তোমাদের তো নয়ই।"

বারণবাধার কথা শুনে বিনোদিনীর ব্যাকুলতা বাড়লো শত গুণ। যাবেই সে দেখ্‌তে। মানবে না কারও বারণ, কোনও বাধাই। এমনি জেদ্। একাগ্র আগ্রহ। উপায়ান্তর না পেয়ে থিয়েটারের কর্মচারী কালীপদ ঘোষকে চেপে ধরল সে। কালীপদ ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। ভক্তরা সবাই জানেন। খাতিরও করেন। কালীপদর পরামর্শে ইংরেজ যুবকের বেশে ঠাকুরকে দেখতে গেল বিনোদিনী। খাস্ বিলাতি সাহেব ভেবে ভক্তরা বাধা দিলেন না যেতে। ভাবলেন, ইংরেজ যুবক ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে না তো? স্পর্শ করবে না, দেখ্‌তে এসেছে, যাক্, দেখে যাক্।

রামকৃষ্ণ শুয়েছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যা। আবছা আলোয় কালীপদর সঙ্গে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো ছদ্মবেশিনী অভিনেত্রী বিনোদিনী, সঙ্কোচে ভয়ে কাঁপছিল তার নারীহৃদয়। রোগজীর্ণ রামকৃষ্ণকে দেখে পতিতারও শাশ্বত মাতৃহৃদয় আর্তনাদ করে উঠল, "এ কি হয়েছে বাবার!"

ইংরেজ যুবকের মুখে নারীকণ্ঠে স্পষ্ট কাতরোক্তি শুনে রামকৃষ্ণ চকিতে উঠে বসে বললেন, "কে? বিনোদিনী না?" সলজ্জ বেদনায় অবশ বিনোদিনী, "আমিই বাবা!" বলে কাঁদতে লাগলো অঝোরে।

অশ্রুজলে সিক্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণের দু'চরণ।

কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সকালে বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন। গিরিশ,

মহেন্দ্র, রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তরা বসে আলাপ করছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে। মায়ের মতো স্নেহার্দ্র চোখে বার বার ভক্ত সন্তানদের পানে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, "কি জানো গিরিশ, আজ বেশ আছি। তোমরা সবাই বসে আছ, স্পষ্ট দেখছি ঈশ্বরই বসে আছেন। এটাতেও তাই।" রামকৃষ্ণ নিজের অঙ্গ নির্দেশ করে বললেন, "সবাই তিনি; বাড়ী, ঘর, দোর, বাগান, বসন, বাসন সব। রোগ শুধু দেহটারই। পাপ, পতন, কলঙ্ক সব শুধু এই খোলটারই। স্পষ্ট দেখছি, তিনিই ঘাতক, তিনিই বধ্য, তিনি হাড়ি-কাঠটাও।"

ভক্তরা পরম শ্রদ্ধায় শুনছিলেন ঠাকুরের কথামৃত। একটু বাদে ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণ বললেন, "জানো মহেন্দ্র, এই খোলটা (নিজ দেহ) যদি আরও কিছুকাল টিকে থাকতো আরও অনেককে জাগান যেত, এতটা মা চান না। সোজা সরল পেয়ে অনেকেই ঠকিয়ে আদায় করে নেয় দুর্লভ সাধনা-শক্তি। কিছুতেই মানুষকে ফেরাতে পারিনে তো। মা তাই এবারকার মত টেনে নিচ্ছেন। যুগটাও চলেছে এমন, সাধন-ভজনের পথে চলতেও লোকে ব্যাজ বার্তা চায়।"

মাথা ঘুরে সজল চক্ষু লুকিয়ে ভক্তরা ভাবতে লাগলেন, সত্যই তো সংশয়ের ঘোর মেটে কই? ঠাকুরের অকুণ্ঠ ভালবাসাকে অকপট বলে ভাবে কয় জন? ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে দেখে এখনও কতজন ঢং বলে তো!

রামকৃষ্ণের অসুখ বেড়েছে। ভক্তরা উৎ-কণ্ঠায় অধীর। অন্যতম ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে আসেন, সেবা করতেন।

মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে নাগ মহাশয় এসে পায়ের কাছে বসতেই রামকৃষ্ণ বললেন, "ও দুর্গাচরণ, ডাক্তাররা তো পারলে না কেউ। তুমি পার না এ রোগটা সারাতে?"

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন নাগ মহাশয়। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ডাক্তারদের পয়সা অপবিত্র। সেদিন থেকে নাগমহাশয় লোক-কল্যাণে চিকিৎসা করতেন, পয়সা নিতেন না। চিকিৎসা করতেন ভাল, হাতযশও ছিল। ঘরে অন্যান্য ভক্ত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ভাবলেন, ঠাকুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কথাই বলছেন। ভগবানের কথা ভক্তই বোঝেন তো! নাগ মহাশয়ের মনে পড়লো যযাতির নবযৌবন-লাভের পৌরাণিক কাহিনী। মনে পড়লো মোগল বাদশা বাবরের আত্ম-দানে পুত্র হুমায়ুনের আরোগ্যের ঐতিহাসিক ঘটনা। মুহূর্তকাল চোখ বুজে ভেবে নাগমহাশয় অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, "পারি। আপনার কৃপায় অবিলম্বেই এ রোগ সারাতে পারি।"

ভক্তরা সোৎসাহে সমস্বরে বলে উঠলেন, "পারেন?"

"নিশ্চয়ই পারি,"—বলে নাগমহাশয় সসম্ভ্রমে শয্যাশায়ী রামকৃষ্ণের বুকের পাশে এসে বসলেন। চোখে মুখে তার ফুটে উঠলো ঋষির আত্ম-প্রত্যয়, তেজ, অপরূপ আত্মশক্তির প্রতিভা, বিপন্ন প্রিয়তমের কল্যাণে অকুণ্ঠ আত্মদানের আনন্দ!

অন্তর্যামী ঠাকুর চকিতে উঠে বসে নাগ মহাশয়কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিভোর আনন্দে বললেন "ওরে না, না, না, দুর্গাচরণ, তাকি হয়! জানি তুই এ রোগ সারাতে পারিস আত্মবলি দিয়ে। তা কি দিতে পারি? নিতেই তো আসা তোদের সব জ্বালা, সব দুর্ভোগ। মানুষকে ভালবেসে তাদের সর্বসন্তাপ হরণ করে নিতেই তো এবারকার আসা।"

মহাপূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু

নবীন যুগের পুণ্য লগনে
ধন্য করিয়া মানব-বংশ
মহা মিলনের মন্ত্র গাহিলে
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।
দেব-মানবের ছন্দ মিলাতে,
গড়িলে জীবন অমিয় বিলাতে,
বঙ্গ-ভুবন-অঙ্গনে প্রেমে
পূর্ণ হইল জীবের অংশ।
মন্ত্রমুগ্ধ মানব গাহিল
জয় ভগবান পরমহংস॥

গঙ্গার নীরে জাগিল সেদিন
পুণ্য লহরী নব তরঙ্গ,
ভরি' নিল ঝারি শান্তির বারি
নিঃস্ব পূজারী গড়িল সংঘ।
বিত্তহীনের চিত্ত স্নিগ্ধ
প্রেমে হলো তনু অপাপবিদ্ধ,
মর্ত্ত্যের গৃহে অমর্ত্ত্য লীলা
অমিয়মাধুরী নবীন রঙ্গ,
সে মহা-ছন্দে লভি' আনন্দ
অন্তরঙ্গ পেল যে সঙ্গ।

ক্ষুদ্র সে দিন উচ্চে তুলিল
ধূলি-লুণ্ঠিত মলিন শীর্ষ,
শূদ্র পেয়েছে ব্রাহ্মণ-পদ
চকিতে হেরিল বিপুল বিশ্ব।
মাটির কুটিরে নব গরিমায়
জাগে কল্যাণ ভরিল বিভায়,
নত জানু হয়ে বিলাইল প্রেম
মহাপূজারীর মন্ত্র-শিষ্য;
অগ্নি-সমান করিল দীপ্ত
কার জ্ঞানরাশি গগন-শীর্ষ।

মহাভারতের নব যৌবন
তড়িতের তেজে ভরিল চিত্ত।
গঙ্গা-কাবেরী সিন্ধু-লহরী
উত্থান যুগে করিল নৃত্য।
সকল ধর্ম হাতে হাত ধরি
হিন্দু-গর্বে উঠিল শিহরি,
গৈরিক পরি সাথে সন্ন্যাসী
বিশ্বজনের মিলন কৃত্য;
নিন্দিত হলো ভণ্ড জনের
কূপমণ্ডুক সমান নৃত্য।

সাগরপারের কন্যা আনিল
সেবার যজ্ঞে জীবন-অর্ঘ্য,
তাপসীর বেশে ফিরি দেশে দেশে
চাহিল গড়িতে ধূলির স্বর্গ।
গুরুর চরণ করিয়া স্পর্শ
করে তপস্যা বর্ষ-বর্ষ,
কহিল ডাকিয়া, মিলনযজ্ঞে
সবাকার হাত সকলে ধরগো,
তাপসী উমারে আবার দেখিনু
শিবের পূজায় দানিতে অর্ঘ্য।

মহা পথিকের পদধূলি লয়ে
কত মহাজন চরণ বন্দে,
ভবতারিণীর মন্দিরে যিনি
নাচেন সন্ধ্যা-আরতি ছন্দে।
নানা পথে পেয়ে পায়ের চিহ্ন,
দেখিলেন, 'তিনি' এক অভিন্ন,
'যত মত তত পথ' এ সত্য,
ঘোষিল বারতা মহা আনন্দে,
ভারত আবার ভরে ভবানীর
পুণ্য পূজার পুষ্প-গন্ধে।

মহা-অন্বেষণে

অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ

জীবনে দু'টি পথ, ভোগ ও ত্যাগ, বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও অন্ধকার। পতঙ্গ আলোর আকর্ষণে ধাবিত হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আলোর বিকিরণে মানুষ প[illegible]জে নেয়, অন্ধকার তার মৃত্যু।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বললেন, "পতি যে জায়ার কাছে প্রিয় তার কারণ পতি নয়, পতির ভিতর জায়া নিজের স্বরূপ দেখে। জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভিতর পতি নিজের স্বরূপ দেখে। আত্মাই পরম প্রিয়।

আত্মাই পরমাত্মা, প্রেমাস্পদ। আত্মার বিশ্বরূপ বিশ্বপ্রীতি। বিশ্ব আত্মারই রূপ। আনন্দ-সত্তার বিকাশ। পরমানন্দ বিশ্বসত্তার বিকাশ।

সেই আলো, সেই পথ। সেই পথ বেয়ে যেতে হবে। ভোগে ত্যাগ, সে আলো সে মানুষেই চিনতে পারে। স্রষ্টা সার্থক মানুষে।

মানুষের সার্থকতা তাই অরূপের রূপদর্শনে; সৃষ্টির সৌরভের মায়াপথ বেয়ে ফুলের অন্বেষণে। তাই "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। মায়াকুজ্ঝটিকার আবরণে স্রষ্টার জনকসুলভ আনন্দ, লুকোচুরির অন্তরালে প্রেম ও প্রেমিকের পরম প্রকাশ। শুদ্ধানন্দ।

তাই মানুষের অবচেতন মন নিরালায় যেন প্রশ্ন করে "আমি কি ও কে? কোথায় আমার পথ?" জীবের এক দুর্বল মুহূর্তে এমনই একটা প্রশ্ন তার চিত্তকে আকুল ক'রে তোলে "আমি কি সেই?" অজানিতে অচকিতে সে যেন ছুটে চলে এই প্রশ্নের মীমাংসার অন্বেষণে। বিরাট সে অন্বেষণ।

ভোগ তার দূরে চ'লে যায়। মৃৎপাত্রের মত ভোগকে পায়ে ঠেলে ফেলে অলক-মেঘের পুঞ্জস্তরের বিন্যাসের মত দ্রুতগতিতে সে যাত্রা করে এক অনির্দিষ্টের পথে। তবু সে দেশ যেন পরম নির্দিষ্ট তাই সে যাত্রা-পথ যেন আনন্দে সুন্দর। ভোগের বিনাশ দেয় শক্তি। শক্তি দেয় কর্মে প্রেরণা। কৃচ্ছ্রসাধন যোগায় আনন্দ।

দুর্গম পথযাত্রী, তবু সে আনন্দরসাপ্লুত। আপনার গন্ধে সে বনে বনে ফেরে কস্তুরীমৃগসম। এ তার চিত্তের অভিযান, প্রাণের অভিযান, অন্তরীক্ষ হতে সে পায় বাণী, তার প্রশ্নের উত্তর। পার্বতী পেলেন তপেশ্বরকে, তপস্যা বিনা পাওয়া যায় না।

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

পার্বতী তপস্যা করলেন, কৃচ্ছ্রসাধন করলেন, তপেশ্বরের অন্তরে পার্বতী লীন।

শ্রীরাধিকার অভিযান।

কিশোরী রাধিকা জলকে যেতে যমুনার কূলে কদম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন, অমনি—

"পহিলাহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল,
অনুরাগ বাঢ়ল অবধি না গেল।"

"যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব আছে,
তাতে চরে সে কোন দেবতা,
তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা।"

শ্রীরাধিকা আপনার ভোগ, কামনা-বাসনা সব দূরে ফেলে দিলেন। কুলবালা আপন-হারা রাধিকা জীবন বিপন্ন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কামনা-বাসনা সব-কিছু।

"তুঁয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইতে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই, তুঁয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে লীন।

বাংলার এক পল্লীপ্রান্তে গদাধর করলেন এমনই অভিযান, অন্তর্যামী অন্তর-দেবতার অন্বেষণে। গদাধর পাগল, অন্তর্যামী বিনা জীবন কই? নাচেন, কাঁদেন, গান করেন, কিন্তু কই? আলো যেন দেখা যায়, আলোর স্পর্শ ত মেলে না। পথ যেন আছে, কি ভীষণ! সংগ্রাম করলেন গদাধর, ভক্তির পথে ভক্তের সংগ্রাম। শিশু যদি তেমন করে চায়, মা দেখা দিবেনই। শিশু যদি তেমন করে কাঁদে মা কি না দেখা দিয়ে থাকতে পারেন? তিনি সব ত্যাগ করলেন, মায়ের কাছে কত কাঁদেন।

মায়ের চরণ-স্পর্শ বিনা সমস্ত বুক শূন্য। 'যেন বিরহ অগ্নি অন্দর জারে'। মায়ের চরণ স্পর্শ বিনা এ আগুন নিভবে না। কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তপস্যা করেন, মাকে ডাকেন, কাঁদেন।

God is both a principle and a personality.

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি,
বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম,
আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

আনন্দের নির্যাস রস। তিনি লীলারস আস্বাদন করেছেন। প্রেমের সাধনে ভগবান লীলাবিগ্রহ গ্রহণ করেছেন।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে বশ॥

তিনি 'শুদ্ধা' ভক্তি অর্জন করেছেন। তাই প্রেমরসে নিমগ্ন। তাই তিনি সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেছেন, ভগবানে সর্বভূতকে দর্শন করেছেন।

বদ্ধজীবের প্রতি তাঁর হৃদয়ে বিচরণ করছে গভীরতম দয়া।

একদিন প্রশ্ন হ'লো—'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন কি?' উত্তর এলো—'হ্যাঁ দেখেছি। তোকে যেমন আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে তাঁকে আমি দেখতে পাই। আমি তোকেও ঈশ্বর দেখাতে পারি।'

প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ, উত্তর দিলেন পাগল গদাধর, শ্রীরামকৃষ্ণ।

বদ্ধজীবের প্রতি কী গভীর সমবেদনা! তাই নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, রামকৃষ্ণের আর জুড়ি নেই,......সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া এ জগতে আর নেই। রামকৃষ্ণ, the latest and the most perfect. রামকৃষ্ণ শিব, শক্তি। হিন্দুধর্মের সকল পথেই নিজে চ'লে ধর্মসাধন করেছেন। সে কঠোর তপস্যার কথা, সে প্রতিপদে ভগবানের সাথে একত্র বাস; সে অদ্ভুত প্রীতি, সে লোকাতীত কামকাঞ্চন ত্যাগ, সে অহেতুকী নিষ্ঠার কথা ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যায় না। সমুদ্র পূর্ণ হলে সে কখনও বেলাবদ্ধ থাকতে পারে না নিশ্চিত।

তাই রামকৃষ্ণের বদ্ধজীবের প্রতি অপার করুণা, প্রীতি। জীবের মুক্তির জন্য তাঁর অন্তর কাতর।

স্বামীজী বলেছেন, বেদ, বেদান্ত আর অবতার যা কিছু করে গেছেন তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁর লীলা না বুঝলে বেদ, বেদান্ত, অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছিলেন, সে দিন থেকে সত্যযুগ এসেছে, এখন ভেদাভেদ উঠে গেল। আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ, ধনিনির্ধন ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান্ ভেদ, ব্রাহ্মণচণ্ডাল ভেদ, সব তিনিই দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন; হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি সব চলে গেল। * * * যে তাঁর

পূজা করে সে নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান্ হবে, মেয়ে বা পুরুষ।

আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা সার্থক হবে যদি আমরা মহাপুরুষের মহা-অন্বেষণের বাণী আমাদের জীবনের কর্মে মূর্ত করবার প্রেরণা সঞ্চয় ক'রতে পারি, তা নইলে নয়। ক্ষুদ্র মানুষের পরম মানুষের পূজার আয়োজন এই জন্তেই। কর্মে তাকে মহান্ হ'তে হবে। কর্মই তার জীবনবেদ। বিনা কর্মে মৃত্যু।

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেবতা ইন্দ্র সখা হ'য়ে তার সঙ্গে চলেন। আর যে চলতে চায় না, শ্রেষ্ঠতম হলেও সে নীচাভিমুখী হয়ে পাপে পতিত হয়।

আজিকার দিনের সঙ্কীর্ণমনা ভারতবাসী যেন হয় মুক্তমনা। তাতেই হবে ভারতের সমস্যার সমাধান। তাতেই আসবে শান্তি।

সমন্বয়বিধানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী
(ধর্মাঙ্কুর বিহার)

প্রাচীন ভারতে ধর্মান্ধতা ছিল না একথা বলা চলে না। কিন্তু তা মানুষের চিত্তকে আচ্ছন্ন করেনি, তার চিন্তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করেনি। সবার উপরে বিচারবুদ্ধিকে রেখে সংস্কার-মুক্তভাবে সে যুগের ভারতবাসী আলোর সন্ধান করেছে। তাই বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রবর্তনে, বিভিন্ন ধর্ম-উপধর্মের উত্থানে ভারতে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তার তুলনা নেই। তজ্জন্য রক্তপাতে ভারতের কোন অংশ কলঙ্কিত হয়নি। তবে বাধাবন্ধ নূতনের পথকে সর্বদাই যে কণ্টকিত করে তুলত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা তর্কযুক্তির সীমা ছাড়িয়ে কখনও বাহুবলকে আশ্রয় করেনি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারত আপনার রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলে তার অতুল সহিষ্ণুতা, উজ্জ্বল বিচার ও চিন্তার স্বাধীনতা। বস্তুতঃ তখন হতেই তার জ্ঞানমার্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, ক্ষুদ্র আচার-অনুষ্ঠানের বালুরাশি তাকে শুষ্কমরুভূমিতে পরিণত করে।

যে ধর্মান্ধতাকে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত যুগ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তা মারাত্মক ব্যাধির মত ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করে। ধর্মান্ধতা তার মজ্জাগত সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। যে যে ধর্মের উপাসক, সে সেই ধর্মকে এমনি ভাবে আঁকড়ে ধরে যে, ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। ধর্মের লক্ষ্য হতে ধর্মই তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এ বিকৃত দৃষ্টিতে মানুষ নিজের অবলম্বিত ধর্মকে পৃথিবীর সারধর্ম বলে মনে করে। তার মতে একমাত্র সে অনুসরণেই সত্যোপলব্ধি হয়, অন্য কোন ধর্মাবলম্বনে নয়। যেখানে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায়, সেখানেও মৌলিকতা নিজের ধর্মেরই কল্পিত। তাই অপর ধর্মকে উপহাস করতে সে কুণ্ঠিত হয় না।

মানুষ এভাবে আপনার সংকীর্ণতার জালে আপনি বদ্ধ হয়ে আপনার বিচারবুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলে এবং চিন্তাশক্তিকে খর্ব করে তোলে। এজন্য ধর্মের নামে ধর্মান্ধ ব্যক্তি ধর্মবিগর্হিত কার্যে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি ধর্মের নামে তার অমানুষিক আচরণ বনের পশুর ক্রিয়াকেও নিষ্প্রভ করে।

ধর্মান্ধতারও ঘৃণ্যতম পরিণতির প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতের অন্তরাত্মা যেন নিপীড়িত হয়ে উঠে। তারই আর্তকণ্ঠের আহ্বানে যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সকল ধর্মের ধারা তাঁর জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যিনি ধর্মাধর্মের অতীত, তাঁর ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? সুতরাং তাঁর ধর্মসাধনা লোকশিক্ষার জন্যই। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সাধনপন্থাবলম্বনে তিনি জগৎকে দেখিয়ে দেন—সকল ধর্মের লক্ষ্য এক এবং সকল ধর্মের ভিতর দিয়ে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে একই ভগবানের আরাধনা চলছে মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়।

ধর্মশাস্ত্রসমূহ যেমন ভগবানের বর্ণনামুখর, তেমনি এ বিশ্বপ্রকৃতিও ভগবানের মহিমাকীর্তনরত। ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড্‌ জিহোভা প্রভৃতি বহুনামে উচ্চারিত একই ভগবানকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এ বিশ্ব-প্রকৃতির খোলা পুঁথিতে অদ্বিতীয় বলে দেখিয়ে দিয়েছেন। সকল শাস্ত্রই তাঁর জীবনে এক হয়ে গেছে।

বিভেদ বিশ্ববিধানের এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম। বৈচিত্র্য এরই নামান্তর। বৈচিত্র্যের মধ্যে ধ্বনিত এক সুরের সঙ্গে সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণের অন্তর গাঁথা বলে দেশ-কাল-পাত্রভেদ সত্ত্বেও তাঁদের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এ সামঞ্জস্য পণ্ডিতম্মন্যদের অন্ধবিচারে একের কাছে অপরের ঋণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মূলে যেন কুঠারাঘাত করে প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য তাঁর শ্রীমুখ হতে বাণী নিঃসৃত হয়—"সব শেয়ালের এক রা।" এ উদার বাণী অন্তরের সংশয়-গ্লানিকে মুছে দিয়ে ইঙ্গিত দেয়, সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন বিভ্রান্ত জনসঙ্ঘকে সত্যের গোপন পথ প্রদর্শনের জন্য, বাইরের সকল পার্থক্যের মধ্যেও তাঁদের মূল সুর এক। এর উপর তাঁদের নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ কোথায়?

বাইরের বৈচিত্র্যকে নিয়ে যারা বাদানুবাদের পাহাড় রচনা করে, তারা সত্যের সন্ধান পায় না। তাদের প্রতি অনুকম্পায় পরমহংসদেবের অন্তর হতে বাণী উত্থিত হয়—"আমবাগানে এসেছিস্, আম খেয়ে যা, ডাল গুনে আর পাতা গুনে তোর কি হবে?" তর্কযুক্তির মধ্যে ভগবান্ নেই, ভগবানকে পেলে তর্কযুক্তির অবসান ঘটে। তাই তর্কযুক্তির গোলোকধাঁধার মধ্যে না ঘুরে অনুকূল পন্থা অবলম্বনে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টাই তাঁর নির্দেশ।

কামারপুকুরে উৎসব-দর্শনে

শ্রীসুধীরচন্দ্র নন্দী

শ্যামা মায়ের স্নেহের দুলাল, বাংলা মায়ের মুকুটমণি
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা, ধন্য মোদের জন্মভূমি।
শ্যামা মায়ের পূজার তরে বেলের পাতায় ভরতে সাজি—
তাইত হেথা পল্লীপথে তোমার চরণ চিহ্ন খুঁজি!

রিক্ত তুমি মুক্ত পুরুষ, ভক্তি তোমার বিল্বদল
দুর্যোগেরই আঁধার রাতে চিত্ত তোমার অচঞ্চল।
আপন মনের গহন গুহায় মহাজ্ঞানের মশাল জ্বেলে—
অবহেলায় করিলে জয় কামনাক্রূর সর্পদলে।

শাস্ত্র দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের বর্ত্ম টাকে রুদ্ধ ক'রে—
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে—দম্ভভরে অহঙ্কারে।
জীবন তোমার শাস্ত্র হল তাইত তুমি নিরক্ষর,—
ব্রহ্মজ্ঞানের আদি নিধান দীপ্ত তুমি তেজস্কর !

বিবেক তোমার বাণীর বাহন, তোমার জ্ঞানের বার্তাবহ—
তাইত আজি জগৎ জুড়ে তোমার পূজার সমারোহ।
অন্ধ যত বিজ্ঞ জনে করিয়া গেলে দৃষ্টি দান—
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায়, হে রামকৃষ্ণ মহাপ্রাণ।

মাটির ধরায় স্বর্গ নামাও, ধন্য তোমার মানব প্রেম—
বিবেকে তা' শিক্ষা দিলে, সেইত নিকষিত হেম !
ভেদাভেদের গণ্ডী মুছে করলে সবই একাকার
প্রণাম তোমায় সাম্য-সাধক হে রামকৃষ্ণ যুগাবতার।

অবতারের মর্মকথা*

সার সিঁ পি রামস্বামী আয়ার

ভারতের মূল মনোভাব যে সব নীতিতে গঠিত সে বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে কেউই ভারতীয় চিন্তাধারা ও মনের গতি কোন দিকে তা ঠিক ঠিক বুঝতে বা ধারণা করতে পারে না। উপনিষদের অভীঃ বাণীটি তাদের মধ্যে প্রথম। এই অভীই বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের ও আপন চৈতন্য-নিহিত সত্যসমূহকে নির্ভীকভাবে খুঁজে বার করবার আহ্বান দেয়। বস্তুতঃ একটি উপনিষদে এই গুণকে স্বয়ং ঈশ্বরপর্যায় বলে দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে—'অভীই ব্রহ্ম।'

এই অভী থেকে অনিবার্যভাবে আসে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি। আমি সাহসভরে বলতে পারি যে, এটাই হল ভারতীয় চিন্তার এবং বিশেষ করে বেদান্তের বিশিষ্ট পরিচিতি। ভগবান বুদ্ধ যখন বললেন, "আমার উপদেশ অনুসরণ কর, আমার কথা শোন, কিন্তু কেবল ভক্তিভাবে না করে যুক্তি দিয়েও কর" তখন তিনি এই ভাবটার উপরেই খুব জোর দিয়েছিলেন। বেদান্ত-দর্শনের আধুনিক বিভাবের রূপদাতা শংকরও একদা তাই বলেছিলেন: অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রত্যক্ষ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সুষ্ঠুভাবে লভ্য হতে পারে, কেবলমাত্র বিশ্বাস দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করলেই প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না।

এই দৃষ্টি দিয়ে অবতারতত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে, এই উপলব্ধির পটভূমিকা হবে নির্ভীকতা ও অনুসন্ধিৎসা। দ্বিতীয় কথা হল, কোন দর্শন, কোন ধর্ম-বিশ্বাস ও কোন মতবাদ সম্বন্ধে পরের মুখে

* Vedanta and the West (May-June 1953) পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়।

ঝাল খাওয়া চলবে না। সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হবে; হতে হবে অনুভূতিসম্পন্ন; যতটা বোধ করা সম্ভব জ্ঞাতার পক্ষে ততটাই বা ততদূরই সত্য। সেই জন্যই অবতারতত্ত্ব বা অন্য কোন ভারতীয় ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সব সময়েই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির দৃঢ়প্রত্যয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সে প্রত্যয় কি এসেছে? বেশ, তাহলে সেটি বিশ্বাস করা চাই। যদি ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধানের সাহায্যে, স্বজ্ঞার (অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসার এক রহস্যময় পন্থার) সাহায্যে, কেউ কোন সত্যে, কোন বিশ্বাসযোগ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বে উপনীত হয় তখন তা স্বীকার করা উচিত। এই হল তৃতীয় তত্ত্ব এবং এই তিনটি চরমে যেখানে যায়, প্রাচীনরা তাকেই ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন। এখানে ধর্ম মানে স্বমিতি, একটা শ্রেষ্ঠতর মান, যাকে লক্ষ্য করে বিশ্বে জীবন যাপিত হয় এবং তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। "রাইচিয়াস্‌নেস্" অর্থাৎ আচার নিয়ম নিষ্ঠা পালনরূপ ধর্মজীবন, ধর্ম শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ নয়। ধর্ম বলতে বোঝায় বিশ্বসত্তার সনাতন নিয়ম। এ বিষয়ে ভারতীয়রা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তারা মানে এর ব্যতিক্রম নেই, এতে কোন রহস্যও নেই। জীবনে এই ধর্মকে এই অতিমানস স্বমিতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুভব করতে হবে।

কোন ধর্মকে মোটেই যথাযথ বোঝা যাবে না যদি না সঙ্গে সঙ্গে তা বিকাশ করা যায়, সর্বদা সে বিষয়ে চেতন না থাকা যায়, একটা বিশ্বপ্রাণের ভাব যদি না থাকে। সংস্কৃত ভাষায় একে আত্মা বলা হয়েছে। তাই আত্মাই হল চরম, সর্বব্যাপক বিশ্বজনীনতা। এই আত্মার অস্তিত্ব যে অঙ্গীকৃত হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই, যাই হোক এটা কোন অজ্ঞতার উপর নয়, পরন্তু অবশ্যম্ভাবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূলে রয়েছে জিজ্ঞাসার যুক্তি ও ভয়শূন্য চিন্তা এবং সৃষ্টির অত্যাবশ্যকতা।

এই প্রকল্প আমাদের কাছে সত্তার অন্যতম রহস্য এনে দেয়—সেটা স্বয়ং এই জীবন—তা সে পাহাড়, গাছপালা জীবজন্তু, মানুষ, অর্ধ দেবতা, অতিমানব প্রভৃতি যারই হোক না কেন, কিন্তু মানুষ স্বয়ং যতখানি দৈবভাবাপন্ন, প্রয়োজনগতভাবে এসব ততখানি নয়। এই সব অবয়বীতে জীবনের যে চিহ্ন দৃষ্ট হয় তা হল সৃষ্টির আর একটি দিক, একেই লীলা বলা হয়। ভারতীয়ের ধারণা অনুযায়ী পুরুষ মায়াবলম্বনে প্রকৃতিকে সহায় করে কাজ করে থাকেন। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হলেই হয় জীবনের জন্ম।

এবার আমরা অবতারবাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টি রহস্যের আলোচনা করব। গীতার সেই অদ্ভুত শ্লোকটির কথা আবার চিন্তা করা যাক:—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
　　নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
　　সংযাতি নবানি দেহী॥

জগতের মূলে যে তথ্য আছে তার সমগ্র অংশটি এই কথাগুলিতে নিহিত। ভারতীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস যে শরীর কেবল একটা বহিরাবরণ, একটা পোষাক, একটা দৈবাৎ সৃষ্টি, একটা ঘটনামাত্র এবং এটা জীবনের সারবস্তু নয়।

সত্যি এটা খুব মজার যে আমেরিকার ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার গতি এখন আমাদের প্রাচীনরা যে সত্য বুঝেছিলেন তাই অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। "সায়েন্স এণ্ড পারসোনালিটি" গ্রন্থে অধ্যাপক উইলিয়ম ব্রাউন বলেছেন যে, আইনষ্টাইনের আপেক্ষকিতাবাদ-মতে বিশ্বমনের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে অসঙ্গত নয়। এটা যে পৃষ্ঠপোষকতার একটা ভঙ্গী তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং যাঁরা দয়া করে এই বিশ্বমনের অস্তিত্বকে একটু দাঁড়াবার স্থান দিয়েছেন আমরা তাঁদের কাছে অনায়াসেই কৃতজ্ঞ

হতে পারি। কিন্তু এই সব সূচনা উল্লেখযোগ্য এবং প্রায়ই খুব বেশী বেশী দেখা যায় যে রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিকদের মতে কতকটা শক্তি— সমাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শক্তিই সম্ভবতঃ এই বিশ্বের মূল কারণ।

সেই সমাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শক্তি যাকে ভৌতিক বা জড়ভাবে বোঝা যায় না, অথচ যেটা একটা আভ্যন্তর ভাব তাকেই আত্মা বলে বলা হয়েছে। এই পরম সত্তা নানাবিধ নামরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। বেদান্ত বিশ্বাস করে যে, অবতার—অর্থাৎ সেই পরমাত্মার প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করে অবতরণ—মানুষদেহ ধারণ করেন, এক অর্থে আমরা প্রত্যেকেই অবতার। জগতের ইতিহাস হল ভাবের ইতিহাস, কিন্তু সেটা সেই ভাব যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। কার্লাইল যেমন তাঁর 'হিরোজ এ্যাণ্ড হিরোওয়ারসিপ্' বইএ তার উপায় দেখিয়েছেন এবং ইমার্সনও তা লক্ষ্য করেছিলেন। জগতের ইতিহাস বিভিন্ন ছাঁচের অবতারের ইতিহাস। অবতাররা যথার্থ ও ভ্রান্ত দু' শ্রেণীরই হতে পারেন। এটাও সৃষ্টির অন্যতম রহস্য। একজন হিটলার মন্দ প্রকৃতি, দমননীতি ও হিংসার এক বিশেষ ধরনের অবতার এবং তাকে জয় করতে হলে অন্য অবতারের প্রয়োজন।

আমি এখন নির্দিষ্ট অবতারদের কথা ভাবছি না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই পরমা শক্তির অবতরণের ইতিহাসই হল জগতের ইতিহাস। প্রত্যেক অবস্থায় কতকটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বিশ্বনীতিকে পরিপূর্ণ করা চলে। আমরা প্রত্যেকেই একটা পূর্ণরূপ, আমরা প্রত্যেকেই আবার ভবিষ্যতের ছবি। আমাদের কেন্দ্র করে যে সব বিশ্ব-প্রয়োজনীয়তা কাজ করছে সে সবের পূর্ণতা ও ভবিষ্যৎরূপ আমরাই ঠিক ঠিক বুঝলে বিশ্বমনের সেই তাগিদই তথাকথিত হিতকর ফলসমূহের দিকে আমাদের প্রধাবিত করে। ভুল বুঝলে, ভুল অভ্যাস করলে ও ভুল প্রয়োগ করলে এটাই আমাদের বিভিন্ন মন্দভাবে চালিয়ে নেয়।

যদি কেউ ইতিহাস পড়ে—উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস ধরা যাক—তাহলে দেখা যাবে যে ষোড়শ শতাব্দীতে ছোট বড় সব কিছুতেই দৈব পরিকল্পনার প্রভাবটাই প্রবল ছিল। তখন সেটা ছিল দৈবের দ্বারা পরিচালিত হবার যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এল যুক্তির যুগ। তখন প্রায়ই নিরর্থক ও অন্ধ-যুক্তিকেও বিচার করা হত। সে সময় এই ভাবটাই প্রবল হওয়াতে এইভাবে ভাবিত ভল্‌টেয়ারের মত কয়েকজন অবতারের আবির্ভাব হল। উনবিংশ শতাব্দীর অবতারের বেশীর ভাগই বৈজ্ঞানিক ও জড় উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিংশ শতাব্দীর ভাবের প্রাধান্য অর্থাৎ অবতাররা সকলেই নিরাপত্তার দিকটাতেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁরা ভয়, অভাবের হাত থেকে নিরাপত্তা চান। এখন আমরা সেই অবস্থায় এসেছি, যে অবস্থায় নির্ভীকতার ঠিক বিপরীত গুণকে সম্মান করা হয়। আমরা ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাই। এখন এই আদর্শটাই চালু, আর তাই আমাদের চারদিকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরাপত্তার ভাবটা রূপান্তরিত হতে চলেছে।

কিন্তু অন্যান্য অবতারও আছেন এবং ইতিহাসের নির্ধারিত সময় ও যুগে যুগে সেই পরব্রহ্মেরও অবতরণ হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে, আর দেশ-দেশান্তরে বেশ একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। গীতাতে এ বিষয়ে কি লেখা আছে?

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

* * *

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

এই হল গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি। কিন্তু কেন?

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ভগবান ত ইচ্ছা করলে সহজেই একমুহূর্তে জগতের মন্দকে ভাল করতে পারেন। তবে কেন তিনি যন্ত্র সহায় করে কাজ করেন? এ জন্যে অবতারদের আনার কি দরকার? অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ বা প্রাচ্য চিন্তা ও দুর কল্পনায় স্বাধীন ইচ্ছার অভাব-সম্বন্ধে নির্বোধের মত যে সব প্রশ্ন কল্পনা করা হয় তার মীমাংসা এই প্রশ্নের উত্তরে নিহিত আছে। অবতারের আবির্ভাবে অস্মিতার রক্ষণ হয়। মানবীয় অস্মিতা হল বংশগতির ফল, পূর্ব পূর্ব জীবনের প্রচেষ্টা উদ্যম, পতন ও সাফল্যের প্রভাব হতে যে উপলেপ হয় এ তার ফল। সমস্ত যুগের পিতৃ-পিতামহের, মাতা প্রমাতামহের ও পিতা মাতার বংশধর হয়ে প্রত্যেকেই জগতে জন্ম নেয়। তার নিজের কর্মেরও সে উত্তরাধিকারী। ইচ্ছাশক্তি সহায়ে অতীত জীবনের গতিকে সে এই পৃথিবীতেও এখুনিই মোড় ফিরিয়ে দেবার স্বাধীনতা রাখে। ভাল বা মন্দভাবে তা সে করেও থাকে। কিন্তু অবতারের উদ্দেশ্য হল মানুষকে সত্যের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবনকে উদাহরণরূপে স্থাপিত করা—তিনি বিশ্বমনের নীতি পূর্ণ করতে মানুষকে জোর করেন না, বরং তার সামনে একটা উদাহরণ রেখে যান। অবতারের লক্ষ্য এই এবং আমাদের শাস্ত্রে এই জিনিসটাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

এই ধরনের অবতাররা হয়ত বা আংশিক কিংবা অল্প বিস্তর পূর্ণাংগ হতে পারেন এবং হয়ত বা তারা জাতি, দেশ ও যুগগণ্ডীতে আবদ্ধও থাকতে পারেন। বিশেষ বিশেষ অবতারের, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দৈবী শক্তির, আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন বিভিন্ন যুগ চেয়েছিল, বিভিন্ন দেশ দরকার মনে করেছিল, এবং তাই আরবের মরুভূমির নির্জনতায়, যাযাবর জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে যখন মহাসংশয় উপস্থিত হল, তখন তাদের আলো দেখাতে মহম্মদ এলেন প্রেরিতপুরুষরূপে ও যথার্থতঃ তিনি হলেন এক অবতার। তেমনি আবার প্যালেষ্টাইনে বিশেষ এক দেশের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে, দয়া ও প্রেমের নূতন নিয়ম প্রবর্তন করবেন বলে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম নিলেন। ভারতীয় ত্রিশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এঁদের যে কোন একজনের সঙ্গে ভারতের অবতাররা সাধারণতঃ সম্বন্ধিত।

আমি কয়েকজন ভারতীয় অবতারের উল্লেখ করে দেখাব যে তাঁদের প্রত্যেকের আসার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কি ছিল। বলিরাজার গল্পে আছে যে তিনি একজন বড়, বিজ্ঞ ও ন্যায়বান্ শাসক ছিলেন। তিনি অতি বড় অহংকারী, অত্যধিক বাসনাপ্রবণ ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জগৎকে জয় করবেন এবং তা করলেনও। এবার চাইলেন জগৎ ছাড়া অন্য রাজ্য জয় করতে। তখন সব জগদ্বাসী বিষ্ণুর কাছে আবেদন করলেন যেন তিনি বলির অধিকার থেকে বিশ্বসাম্যকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু তখন দু' ফুট উঁচু এক বামনবেশে হাতে ভিক্ষা ও জলপাত্র নিয়ে বলির দ্বারে এসে উপস্থিত। রাজা যখন সকালে দান করতেন তখন বিষ্ণু প্রতিদিন তার কাছে যেতেন। একদিন বললেন তিনি "বলি রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

রাজা—"কি চাও তুমি?"

বামন—"আমার তিন পায়ে যতটা জমি পড়ে শুধু ততটুকু।" তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে যতটুকু জমি মাত্র এই।

গর্বভরে হেসে নিয়ে বলি বললেন—কি নির্বোধ তুমি। চাইবার মত একটু কিছু চাইলে না কেন? তুমি আমাকে ঠাট্টা করতে চাইছ?

বামন—না আমি ঐটুকুই চাই।

বলি—বেশ, তুমি তিন পাদ জমি নিতে পার।

তখন সেই বামন ফুলতে লাগলেন এবং বিষ্ণুরূপ গ্রহণ করে এক পা দিয়ে সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেললেন এবং দ্বিতীয় পা দিলেন স্বর্গে, তারপর তৃতীয় পদ কোথায় রাখবেন জিজ্ঞেস করে বললেন—এবারে কোথায় পা দেব ?

সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তখন নিজের মাথা পেতে দিয়ে বললেন—"এ ছাড়া আমি আপনাকে আর কিছুই দিতে পারি না। আমার মাথাটি ছাড়া সবই আপনি নিয়েছেন, আপনার পা আমার মাথায় রাখতে পারেন।" মাথায় পা রাখতেই বলি পাতালে চলে গেলেন। নীচে গিয়ে বলি বললেন—"হে প্রভু, আমি ভালভাবে এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রজা-পালন করেছি। আমার অহংকারের শাস্তি হয়েছে আপনি কি সে জন্যে দয়া করবেন না ?"

ভগবান বিষ্ণু উত্তর করলেন—হ্যাঁ, আমি তোমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে মান্য করি, সেই জন্যে তুমি পাতালের রাজা হয়ে থাকবে চিরকাল। আরও পৃথিবীর অধিবাসীদের দেখতে আসার জন্যে, তারা ভালভাবে দিন কাটাচ্ছে কিনা তা জানতে, আমি তোমায় দু'বার এখানে আসবার অনুমতি দিচ্ছি।" আজও বিশেষ কোন দিনে বলিরাজা তাঁর প্রিয় প্রজাদের দেখতে এসেছেন বলে আমরা উৎসব পালন করে থাকি।

বিষ্ণু একজন অবতার এবং উপরের কাহিনী থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি এসেছিলেন দুষ্টের দমন করতে, ভাল ও মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সাম্য আনতে। বিষ্ণুর আগমনে বোঝা গেল যে, অহংকার হলে তার কি দশা হয়।

রামচন্দ্রের কাহিনী এমনিই এক অবতারের কাহিনী যিনি সত্যরক্ষারূপ ব্রত পালন ও পিতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃপ্রেমরূপ কর্তব্য পালন করতে এসেছিলেন। রামায়ণের কথা বলতে চাই না, কিন্তু এটা ঠিক যে তখন রামের জীবন ও কাজ দিয়ে ঐ ভাবের উপরেই খুব জোর দেওয়া হয়েছিল।

তারপর এলেন শ্রীকৃষ্ণ। রাজা তিনি তবুও কিন্তু সখা ও শিষ্য অর্জুনের প্রতি ভালবাসার বশে তাঁর রাজত্বকে দূরে রাখলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে তিনি গীতার বাণী শোনালেন। শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অর্জুন ভড়কে গেলেন, তাঁর মনে সন্দেহ এল, তিনি সাত্ত্বিকতার ভান করতে লাগলেন, যা করতে যাচ্ছেন সেটা ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে পারলেন না—এ যুদ্ধ ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে পারলেন না। হিংসার পথ গ্রহণ করছেন বলে তাঁর মনে যে ভ্রান্ত যুক্তি এল, তাতে তিনি দয়া বোধ করতে লাগলেন এবং তখন কৃষ্ণ তাঁকে বললেন বাসনাশূন্য হয়ে, নিস্পৃহ হয়ে, নিজে অধিকার করব এটা না ভেবে, ভক্তি ও আত্ম-সমর্পণের ভাব নিয়ে যদি যুদ্ধ কর তা হলে কিছুই ভয় নেই। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্যই হল মনের দ্বন্দ্ব নাশ করে ভ্রান্ত যুক্তির নিরসন করা। কাজের মধ্যে নিষ্ক্রিয় থাকার অবস্থা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এরই প্রতীক।

ভগবান বুদ্ধকেও অবতার বলা হয়। যজ্ঞ, কৃত্য ও পূজার বহিরঙ্গ-সাধন-যুগের পরেই এলেন বুদ্ধ। তিনি এলেন ঘোর সন্দেহবাদিরূপে, সাধন-জগতে শুধু বহিঃকৃত্য-দমনকারিরূপে। তিনি যেন একটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু তখন সেই প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল তাই বুদ্ধকে অবতাররূপে গণ্য করা হয়।

আরও উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু এখন আমি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে বলব। তাঁদেরও অবতার বলা যায় এবং বলাও উচিত। কেন ? রামকৃষ্ণ এমন এক সময়ে এলেন, যখন জড় উন্নতি ও জাগতিক সুখকে মানুষ শ্রদ্ধা করত ও তার পেছনে ছুটত এবং বাহিরের সুখের সামান্য মাত্র পেলেই তাতে মুগ্ধ হত ও তাকে বড় করে তুলত। ভারত তখন তামসিকতা, অজ্ঞতা ও জাড্যমগ্ন। সে তখন বিদেশী ভাবের দিকে চেয়ে

থাকত, সে ভাব তার অতীত জীবনের যোগ্য নয় বা ভবিষ্যতেরও উন্নতিবিধায়ক নয়। এর দ্বারা এটা বলতে চাইছি না যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যন্ত্রপাতি সহায়ে মানব-উপকারার্থে সেই জ্ঞানের প্রয়োগের আমি বিরোধী বা তার প্রয়োগকে ছোট করছি। মানবমনের উন্নতির জন্যে এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষকে ছোট করে যদি যন্ত্রের পূজো করা হয় এবং তাতে যদি দাসমনোভাব বেড়ে যায়—সে দাসত্ব, ভাবের দিকেই হোক বা যন্ত্রপাতির দিকেই হোক—তা হলে কিন্তু বলতে হবে আমরা আত্মপ্রতারণা করছি। ভারত তখন এই অবস্থায় এবং আরও কি তখন সে যথার্থ অতীন্দ্রিয়তা ভুলে নৈসর্গিক দর্শন অধ্যয়নে ব্যস্ত এবং এই করে সে তার বংশগতি ও প্রাচীন সম্পদকে অস্বীকার করতে চলেছিল।

তাই রামকৃষ্ণ এলেন, অতি সাধারণ এক ব্যক্তি, ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি কোন বিশেষ দাবীকে অবলম্বন করলেন না। সত্যি বলতে কি ভারতে আমরা ত্রাণকর্তা বা মধ্যস্থ বলে কাউকে তত বেশী বিশ্বাস করি না—হ্যাঁ, অবশ্য গুরুকে বিশ্বাস করি, কিন্তু মানি যে চরম দায়িত্ব নিজের মধ্যেই নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এবং তাঁর মনে প্রথম যেটা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বলে মনে হল সেটা হল মিথ্যা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান ও তন্ত্র সব সাধনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ও প্রচারও করেছিলেন যে, এ সবই সমন্বয়সাপেক্ষ—খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ও তন্ত্রের মৌলিক মতবাদ যা সত্য সে সবকে গ্রহণত করেই বরং সে সবের ভেতরে যা আছে তাকেও ছাপিয়ে যায়। ধর্মমত ও ভাবকে স্বার্থপূর্ণ প্রয়োজনে না লাগিয়ে বরং সে সবের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন আনাই হল রামকৃষ্ণের শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দ যেটা জনসমাজে প্রচার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তাই বিশেষ বিশেষ অবতারদের কথা বলে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, তাঁরা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের জন্যে জন্ম নেন, নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় ও নির্দিষ্ট পশ্চাদ্‌ভূমি নিয়ে। যার প্রয়োজন সার্বজনীন নয় তাকে সার্বজনীন করে লাভ নেই। অবশ্য সার্বজনীন অবতাররাও আছেন এবং একজন যিনি সর্বযুগে ও সর্বকালে জীবিত আছেন তিনি হলেন গীতা-ব্যাখ্যাতা। আমি এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, এঁদের সম্বন্ধে যে সব আখ্যান আছে, সেগুলিকে নিছক গল্প বা উপকরণ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না বরং এগুলি অভিজ্ঞতার ও কত উদ্বেগপূর্ণ গভীর চিন্তার পরীক্ষায় টিকে গেছে। তা হলেই হল যে, সেই পরব্রহ্ম কোন কোন সময়ে বিরাট ও স্থায়ী বিশ্বপ্রয়োজনে অবতীর্ণ হন।

গান

শ্রীজগদিন্দ্রচন্দ্র বসু

প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
　　প্রণাম লহগো মোর।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া খুলেছ
　　অজ্ঞানতার দোর।
ওগো সন্ন্যাসী, মুক্তিসাধক তাই
বিশ্বের মাঝে তুলনা তোমার নাই
　　তুমি ছিলে তাই মানবমনের
　　কেটেছে তন্দ্রা ঘোর॥

চিত্তরে তুমি করিয়াছ জয়
　　বিত্ত করেছ দান।
ধরার ধূলিতে হে যুগমানব
　　তুমি চির মহীয়ান্॥
মানবাত্মার দরদী বন্ধু প্রিয়—
স্মরণস্তম্ভে রবে তুমি স্মরণীয়
　　তোমার স্মৃতির প্রতিমা স্মরিয়া
　　দুঃখনিশি হবে ভোর॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভোগবাদ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

Of the Imitation of Christএ বলা হয়েছে :

> বেশী কথা বলা ঠিক নয়, নির্জনে থাকো, তোমার ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ করো : কারণ তিনি তো তোমারই আছেন, আর সারা জগতের ক্ষমতা নেই তোমাকে তাঁর থেকে বঞ্চিত করে।'

এই পৃথিবীতে আর কিসের উপরে আমরা আনন্দের জন্য নির্ভর করতে পারি? স্ত্রী, পুত্র, পার্থিবসম্পদ, সর্বোপরি স্বাস্থ্য—কার উপরে নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায়? ফরাসী মনীষী মঁতেন (Montaign) বলতেন :

> 'Why should we, contrary to the laws of reason and nature, make our contentnent subject to another's power? We should have wife, children, worldly goods, and above all, health, if we can; but not be so strongly attached to them that our happiness depends upon them.'

আমাদের আনন্দ আর একজনের খুসীর উপরে নির্ভর করবে কেন? আমাদিগকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা মূঢ়তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? আনন্দের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা প্রকৃতির নিয়মেরও বিরোধী। স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ঘড়-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, সর্বোপরি শরীরে স্বাস্থ্য থাকলে তো ভালোই। কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের আসক্তি এমন গভীর হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের আনন্দ নির্ভর করবে তাদের উপরে।

ঠাকুরও আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করতে বলেন নি। ত্রৈলোক্যকে বলেছিলেন, সারে মাতে থাকার কথা। সদরওয়ালাকে বলেছিলেন :

> 'যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এসবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না! তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগকে ব'লেছিল, আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চল্লুম। মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের জন্য দশঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভালো।'

মণিমল্লিককে ঠাকুর বলেছিলেন : 'তোমাদের কর্তব্য কি?—তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বলতে পার না।'

ঠাকুরের কথা : 'ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, আর একহাতে কাজ ক'রবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দু'হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে। তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।'

ঠাকুর ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব পড়েন নি, কিন্তু তাঁর পড়বার কোন দরকার ছিল না। মা তাঁকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন।' নারীকে ভোগ করবার কামনা পুরুষের মনে কত প্রবল—একথা বুঝবার জন্য বই পড়বার কোন দরকার নেই। ঠাকুর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোতে দেখতে পেয়েছিলেন, মানুষের স্বভাবে যৌনক্ষুধার মত প্রবল ক্ষুধা আর

নেই। বলতেন মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে আচার তেঁতুল। বলতেন, 'যেঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন ক'রে?' তাই নির্জনতার উপরে বারংবার ঠাকুর এত জোর দিয়েছেন। সংসার ত্যাগ করতে বলেননি একথা ঠিক। সংসারের মধ্যে নিশিদিন ডুবে থাকতে বলেননি—একথাও ঠিক। মনে ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কিন্তু অনাসক্তি কি সহজলভ্য? মনকে নির্লিপ্ত ক'রে সংসার-জলের উপরে মাখনের মত ভাসিয়ে রাখা কি যা'তা কথা? বলেছেন নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রথমভাগ থেকে পঞ্চমভাগ পর্যন্ত পাতায় পাতায় নির্জনতার উপরে বারংবার জোর দেওয়া হয়েছে। সংসারত্যাগের প্রয়োজন নাই ঠাকুরের এই কথা সত্যের অর্ধেকটা মাত্র। অপর অর্ধেক—খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। আধা-সত্য নিয়ে থাকতে গেলে নিজেকে ঠকাবো। মনকে গেরুয়ারঙে না রঙিয়ে বাইরে গৈরিক পরলে কি হবে? মনে যদি ত্যাগ না আসে বাইরের ত্যাগ ঈশ্বরের পাদপদ্মে কখনো পৌঁছে দিতে পারবে না। নিজের সঙ্গে নিজের অনবরত যুদ্ধ চল্‌তে থাকবে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধে মন ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই যদি মনের সারাশক্তি ব্যয় হ'য়ে যায় তবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দেবার সময় পাবো কখন? আনাতোল ফ্রাঁস্ 'থাইস' উপন্যাসে এবং ফ্রয়েড তাঁর মনোবিকলন তত্ত্বে বলতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে জোর ক'রে অবদমন করতে যাওয়া ঠিক নয়। ঠাকুর Repressionএর থিয়োরী না প'ড়েও বলেছিলেন:

> 'যাদের প্রথম মানুষজন্ম তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।' বলেছিলেন, 'সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই।'

কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই—একথাও কি তিনি বলেননি?

> 'দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘসলেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে রসে থাকলে কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাক্‌লে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না! হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়!'

একথাও কি ঠাকুরের কথা নয়?

তাইতো ঠাকুর ভোগের কথাই শুধু বলেননি—অনাসক্ত হ'য়ে ভোগ করবার কথা বলেছেন, একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থেকে কাজ করবার কথা বলেছেন। 'দিনকতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই।' কতরকম ক'রে কত উপমা দিয়ে কত বিচিত্র ভাষায় তিনি আমাদিগকে ব'লে গেছেন, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করতে কোন দোষ নেই। বলে গেছেন, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বারবার একথাও বলেছেন:

> 'সংসার করনা কেন, তাতে দোষ নাই! তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো সে বাড়ীঘর পরিবার আমার নয়; এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে।'

বলেছেন সংসারে বড় মানুষের বাড়ীর দাসীর মত থাকতে। 'আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে সে হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

তিনি আমাদের বলেছেন স্ত্রীপুত্র, বিষয়-বৈভবের প্রতি যেন এতটা আসক্ত না হই যে তারা না হ'লে আমাদের সমস্ত আনন্দ চলে যাবে। তিনি বলেছেন সংসারের সমস্ত সাজসজ্জা-জাঁকজমকের পিছনে হৃদয়ের নিভৃতে একটি মন্দিরদ্বারকে নিয়ত খোলা রাখতে। সেই নির্জন মন্দিরে আর কেউ নেই,

কেবল তিনি আর আমি। সেইখানে তাঁর পাদপদ্মে আমাদের চরম আশ্রয়, আমাদের পরম সান্ত্বনা। অনাসক্তি! অনাসক্তি!! অনাসক্তি!!! এই কথাই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মের কথা। এই কথাই ভগবদ্‌গীতার কথা, উপনিষদের কথা, আর ঠাকুরের জীবন ও বাণী তো ভগবদ্‌গীতারই ভাষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপমা

শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস

ভাবরাজ্যের যে সকল উচ্চতত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় নাই সেইগুলি কোন সুপরিচিত বস্তুর সহিত উপমা সহযোগে ব্যাখ্যাত হইলে, সেই সকল তত্ত্বের কিছুটা আভাস যেন মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও উপমার মধ্যে একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দর্যবোধ ও রসবৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অপরদিকে দরদী মনের আভাস পাওয়া যায়। সত্যগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াও জীবন-উপত্যকার প্রতিটি ধূলিকণার উপর তিনি কিরূপ প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—তাহা ভাবিয়া মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়।

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সমুদ্রের কাণ্ডারী। যখনই শিষ্যের মনে সন্দেহ উঠিয়াছে প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন তিনি গ্রামাঞ্চলের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়াছেন।

"তীব্র বৈরাগ্য হয় না কেন—তার মানে আছে। ওদেশে মাঠে জল আনে, চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেড়িয়ে যায়। কিন্তু কাদার আলের মাঝে মাঝে ঘোগ, গর্ত। প্রাণপণে ত জল আনছে। কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাসনাই ঘোগ।"

শিষ্যদের মনে যাহাতে ইষ্টের উপর একটা অচলা-নিষ্ঠা স্থায়ী ভাবে থাকিয়া যায়, তাহার জন্য তিনি জলন্ত উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; অজস্র উপমা সহযোগে সেই আদর্শ নিষ্ঠার বেগ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বুঝাইয়া দিতেন। নষ্ট মেয়ে সংসারের কাজ করিলেও তাহার মন থাকে উপপতির দিকে, পাকা জেলে ছিপ ফেলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকে, নিষ্ঠা বেড়ার অভাবে ভক্তি চারাগুলি কাম-ক্রোধরূপ পশু-আদির দ্বারা উৎসাদিত হইয়া যায়, সার্কাসে ঘোড়ার উপর এক পায়ে দাঁড়ানোর কৌশল যেন কত নিষ্ঠায় আয়ত্ত করেছে—এইরূপ প্রচুর দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি নিষ্ঠার আদর্শস্বরূপটি শ্রোতার মনে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিতেন।

সাধকের পক্ষে একটি বিঘ্নকর বস্তু "আত্মাভিমান" যাঁহাকে তিনি বলিতেন অহংভাব। ঠাকুর কি সুন্দর উপমাসহযোগেই না এই অহংভাব-বিনাশের প্রেরণা যোগাইয়া ছিলেন :

"গরু হাম্বা (আমি আমি) করে; আর কত দুর্গতি দেখ। লাঙ্গল টানতে হচ্ছে, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, হয়ত কসাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে, ছাল চামড়া হবে, অবশেষে কিনা নাড়ীভুঁড়ি দিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় তুঁহু, তুঁহু বলে। তবেই নিস্তার, তবেই মুক্তি" অর্থাৎ "আমি'র স্থলে "তুমি" হইলেই যথার্থ আত্মাভিমান ত্যাগ এবং তখনই মুক্তি লাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধারা

সমূহের দুইটি প্রবাহকে বিশেষ বেগবান্ করিয়া গিয়াছেন—মাতৃভাবের সাধনা আর সর্বধর্মের সমন্বয়। সুতরাং এই দুইটি বিষয়েই যে তাঁহার উপমা-সৌষ্ঠবের মাধুর্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

জগন্মাতাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া দিবেনই দিবেন—ভক্তের এই বিশ্বাস প্রবল করিবার জন্য তিনি সুন্দর উপমা, সুন্দর গল্পের আশ্রয় লইয়া ছিলেন :

"ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না; বলে 'উনি বারণ করে গেছেন, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে কি একটা কাণ্ড বাধাবি।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের 'রোস মা, এ ছেলেটাকে শান্ত করে আসি' বলে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।"

আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, বিচারমার্গে নেতিবাদেরই প্রাধান্য, তখন বেল বলতে শাঁসই বস্তু, শাঁসই আসল। কিন্তু বস্তুলাভের পর সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ, তখন শাঁস নিয়ে থাকলে পুরো বেলটাকে বোঝানো যায় না, কেননা "ওজনে কম পড়ে যাবে।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিষয়বস্তু যত উচ্চস্তরের ও কঠিন হইয়াছে, তাঁহার উপমাগুলি তত সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া চলিয়াছে।

তাঁহার দিব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সর্বধর্মসমন্বয়-সাধন। "সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জল ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে বরফ হইয়া যায়" এই সামান্য কথায় তিনি দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদের সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। সাপের স্থির অবস্থা শিবের এবং সাপের চঞ্চল অবস্থা শক্তির পরিচায়ক। এই উপমার পর শিব ও শক্তির বিভিন্নত্ব-সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবার কোন কারণ থাকে না।

ঠাকুর জীবনে যদি কিছুর শত্রুতা করিয়া থাকেন তাহা হইল গোঁড়ামির বা "মতুয়ার বুদ্ধি"র। ঘণ্টাকর্ণের গল্পে বিশেষতঃ নিম্নোক্ত "কানার হাতী দেখা" গল্পে গোঁড়ামিকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন :

"কতগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। কানাদের জিজ্ঞাসা করা হল—হাতীটা কিরকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে এগিয়ে এল। একজন পা স্পর্শ করেছিল। সে বলল হাতী একটা থামের মত। আর একজন কানে হাত দিয়ে বলল "কুলোর মত।" তেমনি ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, "ঈশ্বর এমনি আর কিছু নয়।" একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাট থেকে একই বস্তু জল নিয়ে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বিবাদ করে, সেই বস্তু জল না পানি, না water—এই গল্পেও ঠাকুর বিভেদবুদ্ধির উপর চরম আঘাত হানিয়াছেন।

পূর্ণজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত যে এই দুঃখময় সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে হইবে এই কথা বেদ-বেদান্ত, সকল শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরের বাণী ছাড়া আর কোথায় দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাই?

"কুমোরেরা হাঁড়ি শুকুতে দেয়, কখনও গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে দেয়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে, সেগুলো আবার ঘরে এনে, জল দিয়ে মেখে, চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ি তৈয়ার করে। যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, ঈশ্বরদর্শন হয় ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে।"

এই সকল উপমা-নির্বাচনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটা সংস্কৃত চিত্ত, একটা বিদগ্ধজনোচিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কোন পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না বলিলেই চলে। তাহা সত্ত্বেও এই সকল

ব্যবহৃত উপমারাজির মধ্যে যে সকল আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিলে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। পূর্ণজ্ঞানীর আর মরজগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে না এইটি বুঝাইবার জন্য ঠাকুর পূর্ণজ্ঞানীর সহিত সিদ্ধধানের সাদৃশ্য দেখাইতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না, জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাহলে তাকে দিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। * * তুমি ত পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বল্‌লে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাঁড়িমুখ থাকবে তা নয় (সকলের হাস্য)।

এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁহার সাধনজাত সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে রসবোধের এমন একটি উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিলেন যেখানে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কৌশল বড় একটা খাটিত না।

তবে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল রসাস্বাদন। "চিনি হব না চিনি খাব" এইটিই ছিল তাঁহার মনের ইচ্ছা। লীলাবৈচিত্র্যের মাঝে সাধকের উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধিজনিত আনন্দ উপভোগ তাঁহার মত সাধারণ জীবও যাহাতে করিতে পারে ইহার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না।

উপমা-সহযোগে কোন দুরূহ বিষয় বোঝাবার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর করুণামাখা হৃদয়ের পরশ পেয়ে মন কৃতার্থ হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বগুলি তিনি যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বদ্ধজীবের পক্ষে সেইরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবু যাহাতে সাধারণ জীবের ঐ সকল উচ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হয়, আর সেই অনুপ্রেরণায় ধর্মপথে সে অগ্রসর হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বাণীর মধ্যে উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহার ব্যাকুল মন যে নব নব উপমা, নব নব দৃষ্টান্ত-প্রয়োগের জন্য কত ব্যগ্র ছিল তাহা একদিনের ঘটনা-উল্লেখে স্পষ্ট হইবে।

ঠাকুরের ভক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের একটি ছবি তুলাইয়াছেন। ঐ উপলক্ষে ঠাকুর photograph তোলার কৌশল কিছুটা বুঝিয়াছেন। ছবি তোলার কাঁচে কালি (সিলভার ব্রোমাইড) মাখান না থাকিলে যে ছবি উঠে না, ঠাকুরকে এই কথাও বলা হইয়াছে। সেই দিনই ঠাকুর ভক্তকে উপদেশ দিতেছেন:

"আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম, শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালী মাখিয়ে দেয় তবে ছবি থাকে, তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছ তাতে কিছু হয় না যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালীমাখান না থাকে।"

এইরূপে কৃষক থেকে সম্রাট, পতিতা নারী থেকে করুণাময়ী মাতা, বেদের হোমাপাখী থেকে বর্তমান যন্ত্রযুগের photography ও টেলিগ্রাফের তার—সকল স্তরের বস্তু, জীবন ও ঘটনা তাঁহার উপমারাজির মধ্যে স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

তাঁর বাণীর এই সকল উপমারাজির মধ্য দিয়া তিনি স্বর্গমর্ত্যের মিলনসাধন করিয়া গিয়াছেন, উপমাসঙ্গমে বিশ্বপ্রকৃতি ও চৈতন্যপ্রকৃতি গঙ্গাযমুনার মত অপরূপ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে।

ইংরেজী অলঙ্কারশাস্ত্রে 'parable'র একটা সংজ্ঞা পাওয়া যায় "earthly story with a heavenly meaning"। এই দিক দিয়া রামকৃষ্ণদেবের অমর উপমাগুলিকে parable এর সমগোত্রীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সত্যই তিনি মাটির কুটিরে স্বর্গের দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বাণী ও আমরা

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যে সত্যকে ধরিয়া থাকে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সকলেরই সত্যের প্রতি গভীর আঁট থাকা একান্ত উচিত। ত্যাগী সন্ন্যাসীই হউন আর গৃহস্থই হউন, সত্যের উপর গভীর আঁট না থাকিলে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন হয়। নিজের জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, সত্যের উপর এমন নিষ্ঠা হইয়াছে যে, ঝাউতলা যাব বলিলে প্রয়োজন না হইলেও গাড়ু লইয়া ঝাউতলা যাইতে হইবে। কে যেন ঠেলিয়া দেয়।

যাঁহারা তপস্যা করেন,—লোক-দেখান ভাবে নহে,—প্রকৃতই যাঁহারা সাধনশীল, তাঁহারা এই সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন বলিয়াই জীবন-যাত্রায় উৎরাইয়া যান। অসাধন জীবন আমাদের, ইহার বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, মুখে একরূপ বলিয়া কার্যতঃ অন্যরূপ করিতেছি। নিজেকে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মনে করিয়া কার্যতঃ যাহা করিতেছি, তাহাতে অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা হইতেছে। এই যে ফাঁকি, ইহাতে অন্যের অপেক্ষা নিজেরই অনিষ্ট হইতেছে অধিক। চতুরতায় দুচার দিন বঞ্চনা করা যায়, কিন্তু অধিক দিন এ ব্যবসা চলে না। শেষে এমন ঠকা ঠকিতে হয় যে, পরিণামে ইহার প্রতিকার করিবার সুযোগ পর্যন্ত থাকে না। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতই আমরা সত্য হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছি। যদি আমরা সত্যই সাধুজীবন যাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের সত্যকে একান্ত ভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। ভিতরে কত মলিনতা, বাহিরে শুধু মনোমোহকর আবরণে অন্যকে ঠকাইতেছি, নিজেকে অধোগামী করিতেছি। এ অপরাধ আমাদের মোহপ্রযুক্ত নহে, সম্পূর্ণ জ্ঞানকৃত। অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জনা আছে, কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা মানুষেই করে না, আবার ভগবান?

বিষয়-বাসনা, ভোগের পিপাসা—নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা ভিতরে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, উহা কি মালা-তিলকে ঢাকা পড়িবে? বৃথা চেষ্টা! সরল মনে ডাকিলে নাকি যাঁহাকে পাওয়া যায় তাঁহাকে পাটোয়ারীর কৌশলে ফেলিয়া কি নিগ্রহই করিতেছি! নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই রচনা করিতেছি! মিথ্যা—ভান—কপটতার আশ্রয় লইয়াই জীবন কাটিয়া গেল! সত্যের সন্ধান মিলিল না!

স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষে প্রদত্ত বাণীই আমাদের অধঃপতিত জীবনে একমাত্র অবলম্বন: 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ এবং মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।'

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কাক খুব চতুর, কিন্তু পরের বিষ্ঠা খেয়ে মরে। মানুষের ভিতরেও এই চতুরস্বভাবাপন্ন কাকের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাকের উপমা দিয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন।

আমরা যদি নিজেদের জীবন আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমরা নিজেকে খুব চতুর বলিয়া মনে করি, নিজেকে অন্য অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা করি ও সেই মত প্রচার করি। একথা খুবই সত্য যে, আমরা হীনবুদ্ধি

অথবা অল্পবুদ্ধি একথা কিছুতেই স্বীকার করি না। এমন কে আছেন যিনি নিজেকে এইরূপ মনে করেন ?

অতি বুদ্ধিমান অথবা চতুর হইয়া আমরা কি করিতেছি ? শুধু অপরকে ঠকাইবার বুদ্ধি দ্বারাই চালিত হইতেছি ; অপরকে ঠকাইতেছি, অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতেছি। ধর্মের ভানে সরল মনের উপর আধিপত্য করিয়া নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু ভুলিয়া যাইতেছি,—আঘাতের প্রতিঘাত আছে, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে।

ধর্মজীবন যাঁহাদের আদর্শ, তাঁহাদের পক্ষে এই ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবনপথে কতটুকু সহায় অথবা বিঘ্নকর, তাহাই ভাবিবার বিষয়। প্রকাশ্য দস্যু বরং বরণীয়, কিন্তু ছদ্মবেশী তথাকথিত সাধু হইতে সতর্ক হওয়া সকল সময়ই দরকার। অথচ আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না, কে সাধুভাবসম্পন্ন, কে অসাধুতায় পূর্ণ। রাবণের চরিত্রে সর্বত্রই বীরত্বের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একস্থলে তাহার দুর্বলতা। রাবণের দুর্বলতা সাধুর বেশে সীতাহরণ। এইখানেই রাবণের 'ভাবের ঘরে চুরি' ধরা পড়িয়াছে।

আমাদের প্রতিপদে এই দুর্বলতা, এই নীচাশয়তা আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, অথচ আমাদের হুঁশ নাই। ধর্মজগতে যাঁহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের' এই দুর্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চেষ্টা করাই কাম্য ; তাহা না হইলে মলিনচিত্তে, কপট হৃদয়ে সেই পরম বস্তুর সন্ধান সুদূরপরাহত। মন আমাদের মলিন, অথচ বাহিরে উচ্চতত্ত্বের কথা আলোচনা করি। নিজের ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, তবুও বাহিরে ধর্মব্যাখ্যা করিয়া অন্যকে তাক লাগাইতেছি। আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অন্যকে প্রতারণাই করিতেছি। এই ক্রমবর্ধমান প্রতারণার ফলে আমাদিগের যে অধঃপতন হইতেছে, তাহার অনুভূতি পর্যন্ত নাই। যখন ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন বুঝিতে পারিব, শ্রেয় হইতে আমরা কত দূরে সরিয়া গিয়াছি। সারা জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—সকলকেই ঠকাইয়াছি, ফলে নিজেরই লোকসান হইয়াছে অধিক।

কেন এমন হয় ? আদর্শভ্রষ্ট হইলে জীবের নাকি এইরূপই হইয়া থাকে—মহাজনগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। সেই শ্রেষ্ঠ চতুর, যিনি আদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবনতরী চালাইয়া যান। ইহলোক এবং পরলোকের কল্যাণকামী হইয়া যিনি চলিতে জানেন, তাঁহার সেই চাতুরীই চাতুরী।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে : "সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বাছিয়া লও, সেই আদর্শ লাভ করিবার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন একটা মহান আদর্শের জন্য জীবন পাত করা অপেক্ষা বড় কিছুই নাই।"

জীবন কতদূর অগ্রসর হইল তাহা যাচাই করিতে গেলে নিজেদের অক্ষমতায় নিজেরাই লজ্জিত হই। দৈনিক গীতাচণ্ডী-পাঠ, স্তবস্তোত্র-আবৃত্তি, মালাতিলক-ধারণ, কথায় কথায় শ্লোক আওড়ান ঠিক নিয়মমত চলিতেছে ; কিন্তু জীবন অগ্রসর হইল কৈ ? ভিতরের যদি সংস্কার না হইল, মন যদি চঞ্চলই রহিয়া গেল, চিত্ত যদি অশুদ্ধ ভাবেই পূর্ণ রহিল, তাহা হইলে বাহিরের অনুষ্ঠান শুধু অন্যকে এবং নিজেকে ঠকাইবার উপায় হইয়া ।

'যত্র জীব তত্র শিব' একথা মুখে শুধু উচ্চারিত হইল, অথচ নিজের স্বার্থ-সংরক্ষণে, অন্যের ত দূরের কথা, নিজের ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিতে একটুও পশ্চাৎপদ হই না। অসত্যভাষণের ভিত্তির উপর

দাঁড়াইয়া অসত্য জীবন যাপন এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, উহা ছাড়িতে গেলে নিজের অস্তিত্বই থাকে না।

যাঁহারা সাধনশীল তাঁহাদের জীবন কতদূর অগ্রসর হইল, তাহার নিরিখ হইবে তাঁহাদের জীবনে কতটুকু স্বার্থহীনতার বিকাশ হইয়াছে তাহা দেখিয়া। ত্যাগের মহিমা যেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, স্বার্থ সেখান হইতে বিদায় লইতেছে। নিজের সুখের জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাই স্বার্থনামে অভিহিত। নিজেকে যিনি অধিক পরিমাণে বিলাইয়া দিতে পারিতেছেন, তাঁহার পরার্থবোধ তত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। নিজের স্বার্থের জন্য যতটা ক্লেশ স্বীকার করি, তাহার সিকির সিকিও যদি পরার্থের জন্য করি, তাহা হইলে জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে।

সাধনার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়,—সাধক কি ভাবে নিজেকে বিলাইয়া নিজে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রকৃত ভোগ করেন, যিনি ত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন। গীতা-চণ্ডী তখনই সার্থক হইবে, যখন 'সর্বভূতে নারায়ণ' আমরা ঠিক ঠিক দেখিব, অনুভব করিব। কর্মের অনুষ্ঠান ও মুখের কথায় অনেক তফাৎ। পুঁথিপড়া বিদ্যায় লোককে ঠকান যাইতে পারে, অনভিজ্ঞকে তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধনার নিরিখে উহার কোন মূল্যই নাই, যদি তার মূলে না থাকে আন্তরিকতার প্রেরণা।

আমরা দিনরাত্র মন দ্বারা যে সকল অপরাধ করিতেছি, যদি প্রকৃতই সেইগুলি কার্যে পরিণত করি, তবে আমাদের কি শাস্তি হইতে পারে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠি—জেল হয়, ফাঁসি হয়, শূল হয়, তুষানল হয়। মনের এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি কি আমরা পাইতেছি? কখনই নহে। ভগবান মাঝে মাঝে একটু খোঁচা দিয়া চেতনার সাড়া দেন, তাহাতেই আমরা অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়ি। জীবের উপর তাঁহার করুণার সীমা নাই। তিনি যে কত ভাবে জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা সাধক ভিন্ন অন্যের বুঝা অসম্ভব। অসাধন জীবনে, মলিন মনে সে সাড়া জাগে না। মন-দর্পণে কত ময়লা আবর্জনা জমিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাই উহাতে শিবের ছায়া পড়িতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের এই দীন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে বারবার বলিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি ঠিক ঠিক ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে পারি—মুখের কথায় নহে—পুঁথির ভাষায় নহে, অন্তরে অন্তরে,—তাহা হইলে আশা হয় যে, অসাধন জীবন হেলায় অতিবাহিত হইলেও তাঁহার মন্দির-দুয়ার আমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। কিভাবে যে তাঁহার করুণায় মানুষ কৃতার্থ হয়, তাহা কেহই জানে না। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা শুধু বলেন—করুণা—করুণা—করুণা! তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন:

"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
(আমায়) এনেছ তোমার দুয়ারে।"

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা

শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্মকার, কবিশ্রী

ফাল্গুনে এলো ঋতু-বসন্ত এলো পূর্ণিমা-তিথি,
স্নিগ্ধ-আলোয় হাসিয়া উঠিল পুলকে কুঞ্জবীথি।
আবীরের রাগে সাজায়ে যুগলে
গোপীগণ গাহে মিলিয়া সকলে
নূতন ছন্দে পরমানন্দে মিলনের প্রেম-গীতি,
ফাল্গুনে এলো ঋতু-বসন্ত এলো পূর্ণিমা-তিথি॥

লাল রঙে রাঙা যমুনার জল করিতেছে আজি খেলা,
শুভ্র চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় হেরি অভিসার-মেলা।
হোলি-উল্লাসে শুক্‌সারি মাতে
কোহেলা গাহিছে ফাগুনের রাতে
কলগুঞ্জনে ঋতুর রাজারে অলিরা জানায় প্রীতি,
গোপীগণ গাহে ঋতু-বসন্তে কতনা মধুর গীতি॥

গৌর-গীতি

শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌

লীলাকীর্তন-সঙ্গীতের প্রবর্তক শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কেন্দ্র করিয়াই এ দেশের কেবল পদাবলীই নয়, অন্য নানা শ্রেণীর গান রচিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের সংগীতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রেমলীলার আবরণেই নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের গান হিন্দুস্থানীতে রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের গান সংসার-বৈরাগ্য ও অনাসক্তির গান। বাংলার গানে লৌকিক অপেক্ষা পারমার্থিক তত্ত্বই প্রাধান্য পাইয়াছে, ইহজীবন বা গৃহজীবনের কথা ইহাতে নাই বলিলেই হয়।

এককালে বাংলাদেশের সংগীতের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাই প্রধান উপজীব্য ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে দেশবাসীর অন্তরের উষ্ণ স্পর্শ থাকিত না। বৈষ্ণব গান ধীরে ধীরে গৌরকে যখন তাহার নায়ক করিল, সারা বাংলাদেশ সেদিন কীর্তনে মাতিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গদেবকে লোচনদাস, নরহরিদাস প্রমুখ কবিরা 'নদীয়া-নাগর' করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নাগরী ভাব লইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার মধুর সম্বন্ধ লইয়াও কিছু কিছু গান রচিত হইয়াছে। এইগুলিতে গৃহজীবনের কথা আসিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও গৃহজীবনের প্রতি ঔদাসীন্যের সুরই ধ্বনিত

শ্রীচৈতন্য ত্যাগের প্রতীক। কবিদের কাব্যে তাই বৈরাগ্যের সুরই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বা দ্বারকালীলা লইয়া গান রচিত হয় নাই, সেইরকম শ্রীচৈতন্যদেবকে গৌরনাগরী ভাবের সাধক কবিরা নবদ্বীপের লীলারঙ্গেই দেখিয়াছেন। তাঁহারা পুরীধামে তাঁহার সন্ন্যাসজীবন লইয়া গান রচনা করেন নাই। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বে'র বা 'সাধ্যসাধনতত্ত্বে'র প্রচারক গৌরচন্দ্রকে তাঁহারা 'গৌর-চন্দ্রিকা' গানে রূপদান করেন নাই।

সদ্যস্নান করিয়া সুরধুনী তীর হইতে পট্টবস্ত্রপরিহিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ নিমাই টোলে ফিরিতেছেন, তাঁহার গলায় শ্বেত উপবীতের গোছা দুলিতেছে, ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পশ্চাতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখে

তাঁহার বুদ্ধির ঝল্‌কানি, মুখে মৃদুস্মিত হাসি—সারা নবদ্বীপের তরুণীরা এইরূপ দেখিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

সন্ধ্যায় তাঁহার আর একরূপ—রাঙাপাড় ধবলপাটের জোড় পরনে, পায়ের নখ স্পর্শ করিয়া কোঁচা দুলিতেছে, পায়ে বাঁকমল, সোনার নূপুর, চুলে চাঁপাফুল, সম্মুখের চুলে ঝুঁটিবাঁধা—তাহাতে কুন্দমালতীর মালা। সর্বাঙ্গে চন্দন, কপালে শ্বেতচন্দনের লম্বা ফোঁটা। লোচনদাসের পদে আছে :

ধবল পাটের জোড় পরেছে রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোঁচা।
বাকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিলে ভুবন মূরছা ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় দিয়েছে চাঁপাফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা।
চন্দনমাখা গোরা গায়, বাহু দোলায়ে চলে যায়
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা ॥

গোরের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের গৃহজীবন তুচ্ছ হইয়া গেল। সংসারে অনাসক্তি জাগিয়া উঠিল। নদীয়া-নাগরীভাবের গানও সেজন্য বৈরাগ্যের গান। এই যে নদীয়া-নাগরীর দল ইহারা নদীয়ার কুলবধূরা নয়।

নরহরিদাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ নদীয়ানাগরী-ভাবের সাধক কবিরাই নদীয়া-নাগরীদের অভিনয় করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের গৌরগীতিতে গৃহস্থঘরের কুলবধূদের মুখের জবানী ব্যবহার করিয়াছেন :

হলুদ বাটিতে গৌরী বসিলা যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে ॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সেই ছটফটানি প্রাণে ॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা ॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে খারে ॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারও একদিন অবসান হইয়াছিল, গোপীরা তাহাদের প্রেমডোরে, মা যশোদা তাঁহার স্নেহডোরে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। 'নদীয়ানাগর'ও একদিন মথুরাযাত্রা করিলেন, কুঞ্চিত কেশপাশ মুড়িয়া ফেলিলেন, পট্টবস্ত্র কৌপীনে পরিবর্তিত হইল, কমনীয় রূপ রূপান্তরিত হইল, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ মলিন হইয়া গেল। কবিদের এত যে ফলাও করিয়া তাঁহার রূপের বর্ণনা, সেরূপ হেলাভরে তিনি ত্যাগ করিলেন।

নবদ্বীপের লীলা সাঙ্গ করিয়া গৌর লইলেন সন্ন্যাস। সারা নদীয়া শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে অশ্রু মিলাইল, কবিরা সে বেদনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন গৌরপদাবলীতে।

বাসুদেব ঘোষের পদে—

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
এমত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥

যুবতী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বল রইল না কিছুই। তবু নবদ্বীপের সেই পর্ণ কুটীরের আঙিনায় তাঁহাকে যুগ যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে, ঋতুর পর ঋতু আসিবে নব নব ফুলপাতার ডালি সাজাইয়া, আবার চলিয়া যাইবে। কতবার নব নব ফাল্গুন-দিনে কোকিল ডাকিবে, পূর্ণ চন্দ্রের মায়ায় আকাশ ভরিয়া যাইবে, বর্ষা নামিবে, সারারাত ধরিয়া দাদুরী ডাকিবে, সম্মুখের পথ দিয়া কতবার কত পথিক যাইবে, কিন্তু তিনি আর ফিরিবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহের আর অবসান হইবে না।

কবিরা বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে নিজেদের প্রাণের আর্তি, আকুলতা ও আকুতি আরোপ করিয়া 'বারমাস্যা'র গানগুলি লিখিয়াছেন—

বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে॥

শ্রাবণে বর্ষাবাদলে তাঁহার দুশ্চিন্তা শচীনন্দনের ভাষায়—

এ দুরদিনে প্রিয়া দেশে দেশে ফিরত
ভিঙত সোনার কাঁতিয়া।
হাম অভাগিনী কৈছে রহব গেহ
এ হেন পিয়াক বিছুরিয়া॥

গৌর-পদাবলীর অন্তে কবিদের নাগরী ভাবের ভণিতাগুলি উপভোগ্য। নরহরি দাস বলিতেছেন—

নদীয়া বসতি আর না করিব ডুবিয়া মরিব জলে।
জীবনে মরণে না ছাড়িবে গৌর দাস নরহরি বলে॥

বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্যের মানে উন্নীত এ সকল পদগুলি ছাড়াও কত যে বৈরাগী বাউল তাঁহার লীলাগান রচনা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এই সব 'inglorious Milton'দের গানের সুরে সেদিন-কার নদীয়াবাসীদের চোখের জলের ধারা সমানে বহিয়া আসিতেছে। বৈরাগী বাউলরা সংসারবিবাগী গানে নিমাইয়ের সংসার-ত্যাগের চিত্রটি নিজেদের মনের মাধুরী মিশাইয়া নানাভাবে আঁকিয়া লইয়াছেন।

কেবল গৌর নন, নিতাইও আছেন। নদীয়ালীলায় গৌর একা সম্পূর্ণ নন, নিতাইয়ের সম্মিলনে তাঁহার পূর্ণরূপ; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলরামকে তো থাকিতেই হইবে। গ্রাম্য কবিরা নিতাইকেও ভোলেন নাই—

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার এক্‌লা নিতাই
আমার নিতাই যদি মনে করে, (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে)
নামে পাষাণ গলাইতে পারে।
এক্‌লা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)॥

একদিন জগাই-মাধাই মোহবশে তাঁহার গায়ে আঘাত করিয়াছিল, তাহার পর কত রূপান্তরই ঘটিয়াছে। তাহারা নিজেরাই মহাভক্তে পরিণত হইয়াছে। শত শত প্রণামে তাঁহার দেহের আঘাতজনিত পাপ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কত দিন তাহার পর কাটিয়াছে—কিন্তু গ্রাম্য কবিরা আজও জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করেন নাই, বারবার দিনান্তে তাহাদের দুষ্কৃতের কথা স্মরণ করাইয়া ধিক্কার দিয়া চলিতেছেন—

তারে মার্‌লি কেনে ওরে জগাই, ওরে মাধাই,
হরিনাম বল্‌তে ছিল রে।
হরির নাম বল্‌তেছিল, কইতেছিল লইতেছিল রে
যে নাম পাপীর সম্বল, দরিদ্রের ধন (সে নাম বল্‌তেছিল রে)।
যে নাম শুন্‌লে পাপীর পরাণ জুড়ায় বলতেছিল রে॥

দাশরথি-নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যুগ পর্যন্ত গৌরগীতি সমানে রচিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী কবিরা এতো ঢঙে, এতো ভাবেও সেদিনের সেই নিশীথ রাতের সংসারবিবাগী নীলাচল-যাত্রী, রাঢ় বঙ্গের সেই তরুণ সন্ন্যাসীর কথা আজও বলিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলুড় মঠ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

পুণ্য বেলুড় মঠ—
শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা বিকাশি শোভিছে গঙ্গা তট।
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ-কীর্তি ভাতিছে হেথা,
চিন্ময় দেহে ব্রহ্মানন্দ সদা জাগ্রত যেথা।
শ্রীগুরু-প্রসাদে গৈরিক লভি ধন্য হইল যারা,
বেলুড় মঠের আকাশ বাতাস তাহাদের তপে ভরা।

বেলুড় মঠের পথে—
শ্রীরামকৃষ্ণ-গরিমা ঘোষিছে বিদ্যাভবন সাথে।
শ্রীগুরু-দেউল রচিল যাহারা মহান কর্মযোগে,
বেলুড় মঠের পরতে পরতে তাদেরো মহিমা জাগে।
পথ হ'তে হেরি রম্য দেউল স্বর্গে তুলেছে শির—
চলিতে চলিতে মূক হয়ে যাই, গতি হয় মোর স্থির!

বেলুড় মঠের কথা—
মন্দিরদেহে পুণ্য-লিখন, মুখে ত যায় না বলা।
নরদেহ ধরে নেমেছিলে দেব, ভবানী মায়ের ছেলে,
ধন্য বাঙলা, রাম ও কৃষ্ণ এক দেহে যেথা এলে।
হিন্দুধর্মকাণ্ডের মূল জগতে করি প্রমাণ,
বিশ্বধর্ম বেদ-উদ্ভূত—দিয়ে গেলে এই জ্ঞান।

বেলুড় মঠের প্রভু—
অবতার তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমি জগতের বিভু।
বিবাহ করিয়া জায়া সাথে ছিলে সন্তানভাব ধরে;
'ষোল টাং' করে শিখালে, মানুষ 'এক টাং' যেন করে!
ওগো ভগবান! তব নামে খসে ভব-ভয়-বন্ধন,
তব মহিমায় যুবক নরেন বিশ্ববিজয়ী হন।

বেলুড় মঠের নাম—
মানব-হৃদয়ে ধর্মের জ্যোতি বিতরিবে অবিরাম
গুরুমন্দিরে নরেন, রাখাল, মহেন্দ্রাদি ঋষি—
শরৎ-শশি-বাবু-তারকাদি সবাই রয়েছে বসি!
মহান্ তাহারা গুরুকর হ'তে গেরুয়া পাইল যারা;
ধন্য গিরীশ, চরণ নেহারি হয়ে গেল মাতোয়ারা!

বেলুড় মঠের বাণী—
আমার মর্মে বাজিয়া উঠিলে ঘুচিবে চিত্তগ্লানি।
ব্যথা পাশরিতে আমার বুকেতে রয়েছে দেবনিবাস—
সর্বব্যাপ্ত প্রাণের ঠাকুর সদাই করেন বাস।
মূর্তিস্মরণে মনের কালিমা মুছিয়া যা'বে সবার,
সকলধর্মী শান্তি লভিবে চরণ ধেয়ানে তাঁর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীস্বামীজী

(কেরলের দুই মহাত্মার শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রী পি শেষাদ্রি আয়ার

কেরলের বিখ্যাত দুইজন আধুনিক আচার্য—শ্রীনারায়ণ গুরু ও শ্রীচট্টম্পী স্বামীর শতাব্দী জয়ন্তী এই বৎসরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা জানিতে ভক্তদের কৌতূহল হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনারায়ণ গুরু অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পবিত্র জীবন, অদম্য অধ্যবসায় এবং আন্তরিক শ্রদ্ধার বলে ধর্মের রহস্য বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার জাতির অবিসংবাদিত আচার্যপদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য গৃহী এবং কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্যও আছেন।

এক সময়ে আর কোন পরিচয় না দিয়া তাঁহাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি দেখান হইয়াছিল। তখন ঠাকুরের বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ছবি দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "যদি পরব্রহ্ম কোন মূর্তি ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা এই রূপই হইবে।"

আর এক সময়ে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ হইতে কিছু কিছু শুনিতে চাহিলেন। শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অনুভবসম্পন্ন মহাপুরুষগণ এইরূপই বলিবেন। বা! বা! বড়ই সত্য কথা।"

তাঁহার জনৈক শিষ্য মহাকবি কুমারন্ আশান্ মালয়লম্ ভাষায় স্বামীজীর 'রাজযোগ' অনুবাদ করিয়াছেন। সেই অনুবাদে পরমপূজনীয় শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) আশীর্বাদ-পত্রও তিনি দিয়াছেন।

শ্রীনারায়ণ গুরুর যোগমার্গের শিক্ষক শ্রীচট্টম্পী স্বামী এক আশ্চর্য পুরুষ। সংগীত, চিকিৎসা প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ও গঠন করিয়াছেন। তাঁহার একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন, "শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী এবং আমার মধ্যে তুলনা করিলে বলিতে হয়, তিনি অতুলনীয় গরুড় এবং আমি অতি ক্ষুদ্র এক মশক।" এমনই ছিল স্বামীজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা!

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী-সম্বন্ধে নারায়ণ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুধর্মের একান্ত বিলোপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনিই আমাদের ধর্মের পুনঃস্থাপন করিয়াছেন।"



যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

(বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে)

শ্রীহুবলাল মাহাতা, এম্‌-এ

কি পেখলুঁ প্রেম নব-ছন্দ।
সুরধুনীতীরে গো   ভকত গদাধর
পুলকভাব-অনুবন্ধ॥

গিরিবর শির জিনি'   উন্নত কলেবর
হেমকান্তি মৃদুরাগ।
আয়তলোচনযুগ   উর্ধ্বযুগলভুজ,
সঘনে মগন অনুরাগ॥
কুঞ্জ পঞ্চবটী   করত কঠোর তপ
ভূমি পর হোত শয়ান।
বিমল ভকতি প্রীতি   বঢ়ত সো নিতি নিতি
অভিমানে ফুলত বয়ান॥

কোমল ছয়েলা জনু   মৃদু মিঠী বোলী
মাতুচরণ অবলম্ব।
কতহুঁ মাঁগত প্রীতি   নীতি কভু পুছত
শুদ্ধা ভকতি দেহুঁ অম্ব॥
কাঞ্চন-কামিনী   সুখ সো ছোড়ল,
কলিযুগ শিক্ষা-আধার।
ভাবসমাধিসুখ-   অমৃত পদ লাগি
হরি সো মনুজ অবতার॥

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

শ্রীবি জি খের

[লণ্ডন বেদান্ত-কেন্দ্রের সাম্প্রতিক একটি সভায় লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বি জি খের কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সার-সংকলন। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত]

ইংলণ্ডে আসা অবধি এই সর্বপ্রথম অনুভব করিতেছি, আমি যেন ঠিক নিজের বাড়ীতে আছি; লণ্ডন বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিবেশই আমার মধ্যে এই সুখানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছে। যদিও কবি এবং মনীষিগণ 'বৃক্ষে ভাষা, প্রবহমাণ স্রোতস্বতীতে গ্রন্থ, প্রস্তরে উপদেশ এবং সর্ববস্তুতে শুভ' দেখিতে সমর্থ হন, তথাপি সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-পুষ্টির জন্য আশ্রম, গির্জা বা মন্দিরের পরিচিত আবেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠটি দর্শন করিয়াছি। সকল ধর্মই সত্য এবং সকল মতপথেরই স্থান আছে—এই শিক্ষার উপলব্ধি ও প্রচারই জগতের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। ধর্ম প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়—কেবল মন্দিরে বা গির্জায় গমন করিলেই ধর্মলাভ হয় না। অতীতে ধর্মের নামে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় একই সত্য প্রচার করে। তেরশত বৎসর পূর্বে হজরৎ মহম্মদ প্রচার করিয়াছিলেন—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র খোদার রসুল। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি স্বয়ং আচরণ করিয়া সকল ধর্মের সমন্বয় ও ঐক্য প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ কোন সাহায্য ও পরিচিতি-পত্র ব্যতীতই আমেরিকার শিকাগো নগরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান এবং পাশ্চাত্ত্যে তাঁহার কার্য আরম্ভ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে যুগ্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও শক্তি, কৃতিত্ব ও সাফল্য ছিল অনুপম। প্রতীচ্যে বেদান্ত-প্রচারের প্রতিভূ-রূপে তিনি বাস্তবিকই একটি বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার তিরোভাবের পর অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

পাশ্চাত্ত্যে বিশাল ভবন ও বিপুল ঐশ্বর্যে বাস করিয়া মানুষের পক্ষে যাবতীয় উপাদেয় ভোগ্য-বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু এই সকল ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্ত থাকিলেই তাহাকে পরিপূর্ণ মানুষ বলা যায় না। পশু হইতে মানুষের বিশেষত্ব ঈশ্বরলাভের জন্য তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়। দুই প্রকার জীবনধারা আছে। এই বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং আমি জীবনে বিভিন্ন পথ আশ্রয় করিয়াছি। আমি বিবাহ করিয়াছি এবং আমার পুত্র-পৌত্রাদি আছে। কিন্তু এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসি-পরিচালক স্বামী ঘনানন্দজী যৌবনেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক—ত্যাগ ও শ্রেয়ের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে সত্য-উপলব্ধি এবং অপর সকলকে তদনুভূতিলাভে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

ভারতের কয়েকটি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত আমার পরিচয় আছে। কিন্তু অপরিচিতদের মধ্যে বিদেশে একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা নিঃসন্দেহে অধিকতর দুরূহ কার্য। এই বেদান্ত-কেন্দ্রটি গড়িয়া তুলিতে স্বামী ঘনানন্দকে তাঁহার ছাত্র ও সাহায্যকারীদের প্রত্যেককে তিনটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইয়াছে: প্রথমতঃ, তিনি তাঁহাদিগের নিকট ধাপ্পাবাজি বা বুজরুকি করিতে আসেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজের জন্য কিছুই চাহেন না; তৃতীয়তঃ, তিনি ব্রিটিশ জাতিকে হিন্দুতে পরিণত করিতে আসেন নাই। অন্যান্য অনেকের মতো আমিও দুঃখ অনুভব করিতাম যে, স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডন-ত্যাগের পর অনেক বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে কোনও বেদান্ত-কেন্দ্র ছিল না। আজ আমি দেখিয়া আনন্দিত যে, দীর্ঘকাল পরে অবশেষে লণ্ডনে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

ধ্যান

শ্রীআশুতোষ দাস

শান্ত সুবিমল, সৌম্য সমুজ্জ্বল, কান্ত-কোমল-দেহধারী,
জগ-জন-শরণ, যুগল শ্রীচরণ, শোক-পাপ-তাপহারী ॥
স্থিত সুখাসন, পরিহিত-বসন অঞ্চল গলদেশ পাশে,
কাঞ্চন-বরণ, লাঞ্ছনা-বারণ কুঞ্চিত সঞ্চয়-ত্রাসে ॥
আধ-নিমীলিত নয়ন-কমলে আবরিত করুণারাশি,
শ্মশ্রু-সুশোভিত রক্তিম অধরে ক্ষরিত সুমধুর-হাসি ॥
অঙ্গুলি-সংযুত উরুদেশ চুম্বিত আজানু-লম্বিত পাণি,
নাতি স্থূল-কৃশ, হেমতরু সদৃশ, প্রেমঘন মূরতিখানি ॥
মূর্ত-পবিত্রতা, আর্ত-অধমত্রাতা, পার্থসারথি-সীতাপতি,
নবযুগ-ইষ্ট, তারক-বরিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-পদে নতি ॥

জ্ঞান ও প্রেম

[সন্ত প'লের পত্র ; কোরিন্থিয়ান ১।১৩]

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত)

মানুষের ভাষাতেই কথা বলি আর দেবতার ভাষাতেই বলি, প্রেম যদি প্রাণে না থাকে, তবে আমার কথা কাঁশরের বাদ্য, ঘণ্টার আওয়াজের সমতুল্য।

হই না কেন আমি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটয়িতা, সকল জ্ঞানের অধিকারী, বিশ্বাসের জোরে পর্বতপ্রমাণ বাধা দূর করিতে সমর্থ, তবু প্রেম যদি না থাকে, ধিক্ আমাকে।

দরিদ্রের পোষণের জন্য যথাসর্বস্ব দান করি না কেন, নিজের দেহটাকেও পোড়াইবার জন্য বিলাইয়া দি, তবু যদি প্রেমের সঙ্গে এ কাজ না করি, তবে সমস্তই বৃথা। প্রেম নীরবে সহিয়া যায়, করুণা করে, দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করে, নিজের গুণকীর্তন করে না, আত্মশ্লাঘা করে না। উদ্ধত ব্যবহার বর্জন করে, স্বার্থ খোঁজে না, সহজে বিচলিত হয় না, মন্দ চিন্তা করে না। অন্যায়ে উৎফুল্ল হয় না, সত্যের জয়েতেই উল্লসিত হয়। প্রেম সমস্ত সহ্য করে, বিশ্বাস রাখে, আশা ত্যাগ করে না, তিতিক্ষা ত্যাগ করে না। প্রেম সর্বজয়ী হয়। ভবিষ্যদ্দর্শন ভুল হয়ে যায় ; বাক্‌পটুতা একদিন নীরব হয় ; পাণ্ডিত্যের অবসান হয় ; কিন্তু প্রেম অবিনাশী। মানুষ পরিপূর্ণভাবে জানিতে পারে না, সম্পূর্ণ-ভাবে ভবিষ্যদ্দর্শন করিতে পারে না। যখন সম্পূর্ণতার আবির্ভাব হয় তখন আংশিক জ্ঞান স্বতঃই বসিয়া পড়ে। যেমন, যখন বালক ছিলাম তখন বালকের ন্যায় কথা বলিয়াছি, বালকের ন্যায় বুঝিয়াছি, বালকের ন্যায় ভাবিয়াছি —আবার কালক্রমে যখন পরিণতবয়স্ক হইলাম, তখন বালকভাব আপনা হইতেই চলিয়া গেল। তেমনি, এখন যাহা কাচের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট দেখিতেছি, একদিন তাহা মুখোমুখি দেখিব ; এখন যাহা আংশিকভাবে জানিতেছি, একদিন তাহা নিজেকে নিজে যেমন ভাবে জানি, তেমনি ভাবেই জানিব। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম—এই তিনবস্তু কালজয়ী। এ তিনের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

দিনের শেষে

শ্রীঅনিলকুমার রায়

ফুরায় দিন সন্ধ্যা নামে—ক্ষণেক আছে বাকি
অ-বলা মোর যে কথা হায় হারানো দিনে-রাতে
তাহারে আজ কেমনে প্রভু গোপন ক'রে রাখি
হৃদয় মম ব্যাকুল তাই তোমারি মালা গাঁথে।

নয়ন ঝরে কি কথা ভেবে বলগো কতকাল
রইবো আর তোমার লাগি গাইবো আশাবরী
হে প্রভু মোরে কর গো কৃপা, জ্যোতির্ময়জাল
ভরায়ে দাও হৃদয়ে মম ভাসাই খেয়াতরী।

তোমাকে মনে পড়ে গো মোর তোমাকে মনে পড়ে
দুঃখঝরা করুণ দিনে হে ঘুম-ভাঙানিয়া
মাটির আঙিনাতেই যতো চাঁদের সুধা ঝরে
তোমার স্নেহ-আশিস আর তোমার বাণী নিয়া।

আকাশে যতো ছড়ানো ছবি বাতাসে যতো গান
তোমারি সে তো রূপের ছড়া সুরের নির্ঝর
সাগরে যতো নাচিছে ঢেউ গাহিছে অফুরান্
তোমারি সে তো বন্দনা হে করুণাশঙ্কর।

জীবন মম তীর্থ হোক তোমারি শতনামে
মুক্তি দাও এবার প্রভু অনন্তের ধামে।

সমালোচনা

বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত; অনুবাদক—ঋষিদাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; ২৮৪ পৃষ্ঠা; মূল্য: ৬৲ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীসম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel নাম দিয়া প্রথম ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় (অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া)। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর উদ্যোগে উহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দবোধ করিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর শক্তি, উপযোগিতা এবং সর্বজনীনতা কোথায় এই সম্বন্ধে মনীষী রোলাঁর বিশ্লেষণ বাস্তবিকই অপূর্ব। মূল গ্রন্থটি ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট মর্যাদালাভ করিয়াছে এবং এই জন্যই ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় উহা অনূদিত হইয়াছে। ইংরেজী বইটির অনেকগুলি সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বাংলা সংস্করণে ঋষিদাস তাঁহার অনুবাদ-কার্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। রোলাঁর ভাব-ব্যঞ্জনা ও বাক্য-বিন্যাস বহুপরিমাণে অক্ষুণ্ণই আছে, তবে কোন কোন জায়গায় নির্বাচিত শব্দ কিছু কঠিন এবং শ্রুতিকটু মনে হইল। কাগজ এবং ছাপা ভাল। বাঙালী পাঠকপাঠিকার নিকট রোমাঁ রোলাঁর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের এই বঙ্গানুবাদ সমাদৃত হউক ইহাই প্রার্থনা। প্রকাশক এবং অনুবাদককে অভিনন্দন জানাইতেছি।

মন্দাকিনী (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীরবি গুপ্ত (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)-প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮বি, ব্রজেন্দ্র ঘোষ লেন, কলিকাতা—১০; ৯৬ পৃষ্ঠা; মূল্য: ৩৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ৬২টি কবিতা ও গান স্থান পাইয়াছে। সুদীর্ঘ প্রথম কবিতা 'মন্দাকিনী'তে সমগ্র গ্রন্থের সুর অভিব্যঞ্জিত। মন্দাকিনী—মানুষের চরম ও পরম কাম্য সত্য-শিব-সুন্দরের স্নিগ্ধ সঞ্জীবনী-সুধা-ধারা সোল্লাসে সাগ্রহে মর্ত্য-জীবনকে প্লাবিত করিতে ছুটিয়া আসিতেছে:

"অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে",

কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষ, সে যে বসিয়া আছে—"শূন্যতার নিপ্রান্ত-সৈকতে।" তাহার "উষর মরুর বুকে সবুজের কোন রেখা নাই।" তাই:

"দূরে বহুদূরে দূর দিগন্তের সীমান্ত-সীমায়
স্বপন মিলায়,—"

কিন্তু তবুও তাহার আশা ছাড়িতে পারি না। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তাহারই মিলনের আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। জানি যোগ্যতা নাই, প্রস্তুতি নাই—তথাপি তাহাকে চাই:

"অনন্ত গগনে জাগা অপলক ধ্রুবতারা সম
ওগো অনুপম!
জাগে দুটি আঁখিতারা, মূর্ত তব সুর-সন্দীপন
লভে এ-চেতন।
তোমারি প্রতীক্ষারত মর্ম-বীথিকায়
প্রভাত-প্রসূন-লগ্ন বুঝি বা ঘনায়!
আমি তব আলোকের অনন্ত-পিয়াসী
পরিপূর্ণ সবিতার চির অভিলাষী
অন্তর-আকাশে।
অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
তরঙ্গ-উল্লাসে।"

জানি, একদিন প্রতীক্ষা সফল হইবে। 'জীর্ণ কারাগারের' 'তমোবক্ষ' উদ্ভাসিত করিয়া সূর্যের

উদয় হইবে, 'শোণিতের প্রতি অণুতে অণুতে' 'অনাহত মন্ত্রের সম্বিৎ' জাগিয়া উঠিবে :

"বিপুল বিস্ময়ে হেরি অঙ্গে অঙ্গে রাজে
স্নিগ্ধ শ্যামলিম আভা, নৃত্যতালে বাজে"
* * *
"দুর্বার চরণে নামে আত্মহারা তরঙ্গ প্রোজ্জ্বল
লভিতে সকল
সত্তার সাম্রাজ্য মোর বিসারিয়া মর্ম-অমরার
সুবর্ণ-সম্ভার।
প্রভাত-কিরণে খোলে শত শতদল
আনন্দ-সলিলে জাগে সূর্য সুনির্মল..."

গ্রন্থের পরবর্তী কবিতা ও গানগুলির মধ্যেও একটি ব্যাকুল সাধক-প্রাণের প্রতীক্ষা, আত্ম-নিবেদন, বিশ্বাস ও তৃপ্তি অতি সরসভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অনিরুদ্ধ'

ছোটদের সারদামণি—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ-প্রণীত ও প্রকাশিত; ৭সি, গোখেল রোড, ১ নং ফ্ল্যাট, কলিকাতা—২০; পৃষ্ঠা : ৬৭; মূল্য : ৷৶০ আনা।

ছোটদের জন্য চরিতকথা রচনায় সিদ্ধহস্ত কাননবাবুর সহজ সরল ভাষায় শ্রীসারদাদেবীর এই ক্ষুদ্র জীবনীটি যে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার মত বই হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রীমা সারদামণির জীবনের প্রধান প্রধান অনেক কথাই এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা—শ্রীঅজিত কুমার সেন-প্রণীত। প্রকাশক : দাশগুপ্ত য্যাণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—৫৫; মূল্য : দশ আনা।

সাবলীল ভাষায় বর্ণিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কাহিনী ও ভাবালেখ্য। পাঠক-পাঠিকার চিত্তে বইখানি একটি বিশুদ্ধ গম্ভীর উদ্দীপনা আনয়ন করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। কিছুকিছু মুদ্রণ-প্রমাদ লক্ষিত হইল।

কামাখ্যায় কুমারীপূজা—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ও শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট—কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; 'দক্ষিণা—ষোল আনা'।

পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থের তথ্যপূর্ণ ভূমিকা-সম্বলিত আলোচ্য পুস্তকখানিতে কামাখ্যাপীঠ ও কুমারীপূজা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আছে। পুস্তকের প্রথমাংশ গদ্যে ও দ্বিতীয়াংশ পদ্যে লিখিত। কুমারীপূজা-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইখানি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাসী লেখকের নির্মল চিত্তের ভাবমাধুর্য রচনায় একটি স্নিগ্ধ আবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-সঞ্চয়ন—সঞ্চয়ক ও সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক : স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী, সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ (যোরহাট), আসাম। পৃষ্ঠা—১৬৬; মূল্য—দুই টাকা।

ধর্মজগতে শ্রীগুরুর স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে। গুরুর মাধ্যমেই ইষ্টের সন্ধান মিলে। ভারতের অনেক ধর্মাচার্যের (শঙ্করাচার্য, নানক, তুলসীদাস, জ্ঞানেশ্বর, রামদাস স্বামী প্রভৃতির) গুরুতত্ত্ব-বিষয়ে ধারণা এবং বিভিন্ন শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের গুরুভাবের পরিচয় সহজ ভাষায় আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। বাংলার ধর্ম-সাহিত্যে গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান সংযোজন বলিয়া মনে করি।

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

সব-হারাদের গান—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। প্রকাশিকা : শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়, নবজীবন-সংঘ, লোকসেবা-শিবির, পোঃ বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া। প্রাপ্তিস্থান—৫এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩; পৃষ্ঠা : ১১১; মূল্য : আড়াই টাকা।

আটাশটি কবিতার সমষ্টি এই বইটি একসঙ্গে

ভাবের আবেশে পড়িয়া ফেলিয়া লক্ষ্য করিলাম ইহা চতুর্থ সংস্করণ। তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ জনচিত্তে যে দোলা লাগিয়াছে তাহার শেষ হয় নাই। তাই অনবসিত উৎসাহের নব-উদ্দীপন।

ইংরেজ কবি Rupert Brooke নামগোত্রহীন দেশদরদী সৈনিকদের গান গাহিয়া অমর হইয়াছেন; Owen'ও ঠিক ঐরূপ দুঃখীর সমব্যথী। জীবনে যাহারা কিছু পাইল না, কাঁদিয়া ও খাটিয়া মরিল, অভাব-অভিযোগ যাহাদের নিত্যসহচর, অথচ যাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে সভ্যতার আকাশচুম্বী ইমারত তৈরী, তাহাদের পক্ষে ওকালতির লোক কোথায়? মানবমিত্র স্বামী বিবেকানন্দ 'ত্রৈলোক্যকম্পনকারী' সর্বংসহ এই সর্বহারাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি—সংবেদনশীল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। আসিলেন 'কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' গান্ধীজী, আবার নিষ্পিষ্ট মানব-সমাজ আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাইল। কবি বিজয়লাল—উৎসবে ব্যসনে সবহারাদের নিত্যসঙ্গী বিজয়লাল—বিবেকানন্দ-গান্ধীর ঐতিহ্যকেই রূপদান করিতে বদ্ধপরিকর। কৃতকার্যও হইয়াছেন বিপুল-ভাবে। 'পার্থ' কবিতায় কবির আহ্বান—

'হর্ম্য ছেড়ে বেরিয়ে এস, বর্ম পরে দাও দেখা,
লুপ্ত কর অধর্মের এই শর্বরী;
কৃষ্ণ যাহার বন্ধু—সে তো বিশ্বে কভু নয় একা,
কপিধ্বজের চক্র উঠুক ঘর্ঘরি।'

Leviathan-সদৃশ মৃতকল্প নিপীড়িত মানব-জাতির নবজাগৃতির গান। ইহাদের 'নির্বাসন,' 'ক্ষুধার জ্বালা,' 'কাঁটার বন,' 'ফাঁসির রশি,' 'শিকল-হার'—সবই বিরাট মনুষ্যসংহতির অপরিহার্য উপকরণ। বিজয়-কবির অমোঘ আশ্বাস:

'সকল দেশই তোদের হবে, আপন হবে সকল ঘর,
থাক্‌বে না কো বর্ণবিচার, থাকবে না কো
আপন পর।
থাকবে শুধু একটি জাতি—সে জাত হবে
মানুষ-জাত—
তার উপরে থাকবে নাকো রাজা-উজির
কারো হাত।'

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে বেশী আলোচনার উপায় নাই। তবে এইটুকু বলা যায়, যাঁহাদের নিকট প্রাণের মূল্য সর্বাধিক, মানবসেবায় যাঁহাদের পরম তৃপ্তি, প্রেমেই যাঁহারা কৃতার্থম্মন্য তাঁহারা এই কবিতাবলী-পাঠে বিমল আনন্দ ও প্রকৃত প্রেরণা লাভ করিবেন। কবিকে সাদর অভিনন্দন জানাই।

গীতাতত্ত্ব-প্রকাশ—শ্রীবসন্তইন্দু মুখোপাধ্যায়-অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবসন্তইন্দু মুখোপাধ্যায়, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, অথবা নিচিৎপুর কোলিয়ারী, পোঃ বাঁশজোড়া, জেলা মানভূম। পৃষ্ঠা: ৩৩০। মূল্য: পাঁচ টাকা।

লেখক 'বহু বৎসর ধরিয়া গীতা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া যে চিত্তপ্রসাদ' লাভ করিয়াছেন তাহার একটি বিস্তৃত পরিবেশন এই গ্রন্থখানি। গীতা-শাস্ত্র যুগ যুগ ধরিয়া একক আপন মহিমা বিস্তার করিয়া আসিতেছে; ইহার মধুপানমত্ত কত ব্যাখ্যাতৃমধুপ নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন, বিচিত্র ব্যাখ্যান দ্বারা জনচিত্তকেও বিমল আনন্দে আপ্লুত করিয়াছেন। আলোচ্যমান গীতাব্যাখ্যা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের গীতাভাষ্য-অব-লম্বনে লিখিত। লেখক আলোচনাকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীর্ঘ পরিশিষ্ট জিজ্ঞাসু পাঠকদের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। শ্লোকের অন্বয় দিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (অধ্যাপক)

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা-প্রসঙ্গ—শ্রীরাজবালা দেবী-প্রণীত ও প্রকাশিত; ১৯৪, গণেশ মহল্লা; পৃষ্ঠা: ১৪২; মূল্য: ২॥০ টাকা।

ব যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে আনুমানিক ১২৯২ সালে কাত্যায়নী দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই উত্তরকালে কাশীধামে সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল ভগবৎসাধনায় অতিবাহিত করেন এবং শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা-নামে পরিচিতা হন। তাঁহার দেহত্যাগ হয় ১৩৫০ সালে।

আলোচ্য বইখানি তাঁহারই জীবনকথা এবং উপদেশ-সঙ্কলন। যে বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী মাতাজী প্রকাশ করিয়াছেন উহার নাম 'কায়াভেদী বাণী'। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার পূতসঙ্গধন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় উহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও উহা যথাযথ ধারণা করা সুকঠিন। পুস্তকে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কতকগুলি এতই অলৌকিক যে, উপকথার ন্যায় শুনায়। যেমন—

"একদিন মা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'অশ্বত্থামার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। দেখিলাম তাঁহার মস্তকে ঘা'র চিহ্ন রহিয়াছে।' তাঁহার সঙ্গে মার যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল তাহা তিনি গোপন রাখিলেন। মাত্র বলিলেন— 'তোমরা তেল মাখিবার পূর্বে 'অশ্বত্থামা স্বাহা' বলিয়া তিনবার তেল ছিটাইয়া দিও।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ইহা করিলে কি হয়?' মা বলিলেন, 'অশ্বত্থামার ক্ষতের স্থান ঠাণ্ডা হয়।'

……মহাত্মা দুর্বাসা মুনি মার কাছে আসিয়া সাতদিন ছিলেন।* * বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব মার নিকট আসিয়া বসিতেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মাকে হরিনাম কীর্তন করিয়া শুনাইয়াছিলেন। * * পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মধ্যে মধ্যে মার নিকট আসিতেন। মা যোগের বিষয় কিছু জানিতে হইলে পরমহংসদেব ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মীমাংসা করিয়া লইতেন। * * শঙ্করাচার্য মাকে যোগ ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ মাকে হরিনাম শুনাইতেন, বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠ শুনাইতেন এবং ব্যাসদেব মাকে পুরাণপাঠ শুনাইতেন। * * পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত আসিয়া মাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। * * মহাত্মা শুকদেবের সঙ্গে মার দেখা হইয়াছিল। শুকদেব মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। মা সময় সময় শুকদেবকে কোলে বসাইতেন।"

অন্তরাগে আলাপন—স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ৪০এ, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা—২৩২; মূল্য—৩৲ টাকা।

গ্রন্থকার ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ সালের গোড়া পর্যন্ত বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সহিত ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ করিয়াছেন প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহাদেরই কতকগুলি নির্বাচিত সঙ্কলন বর্তমান গ্রন্থের রূপ লইয়াছে। আলোচ্য প্রসঙ্গগুলির বিষয়বস্তু অতি ব্যাপক, প্রকাশভঙ্গী সতেজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিবিধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর বহুশ্রুত বক্তার মৌলিক আলোকসম্পাত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাস্ত্রীয় আলোচনার পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাব বইখানিতে আগাগোড়া বিকীর্ণ। এই সুখপাঠ্য সরস পুস্তকখানি তত্ত্বামোদিগণের ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। সেই অনুপাতে মূল্য খুব কমই বলিতে হইবে।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন্‌ পত্রিকা—(শ্রীশ্রীসারদাদেবী শতবার্ষিকী সংখ্যা)—হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের (১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া) এই বিশেষ বার্ষিকী পত্রিকায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের রচিত শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে রচনাগুলি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কয়েক জন বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রবন্ধ ও কবিতা পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী এই সংখ্যায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ হইল।

স্বামী অম্বিকানন্দজীর দেহত্যাগ

গত ১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণ ৫-৩৫ মিঃ এ বেলুড় মঠের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অম্বিকানন্দজী (নীরদ মহারাজ) ৬৯ বৎসর বয়সে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছেন। তিনি পূর্বাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ গৃহী ভক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। নবগোপাল বাবুরই হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বসত বাড়ীতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া ঠাকুরের পটবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং পূজার আসনে বসিয়াই মুখে মুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত প্রণাম-মন্ত্রটি (স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥) রচনা করিয়াছিলেন। নীরদ মহারাজ ১৯০২ সালে ১৮ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে যোগদান এবং ১৯১৪ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিশুকালে মাতৃ-অঙ্কে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শ ও আশীর্বাদ এবং কৈশোরে স্বামী বিবেকানন্দেরও পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

ধ্যানভজনে একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি পাঞ্জাবে কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিয়া যকৃতের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। স্বামী অম্বিকানন্দজী সুদক্ষ গায়ক এবং চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তাঁহার সুললিত গম্ভীর কণ্ঠের ভজনসঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। বেলুড় মঠে এবং অন্যান্য বহু শাখাকেন্দ্রে গীত কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভজনসঙ্গীতের সুর অম্বিকানন্দজীরই দেওয়া। তাঁহার অঙ্কিত অনেক গুলি তৈলচিত্র মঠে রক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ—গত ২৬শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) কলিকাতা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন কার্যালয়) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সেক্রেটারী পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসব প্রচুর উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রত্যুষ হইতে বেদ, উপনিষদ ও চণ্ডীপাঠ এবং পূজা-হোমাদি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। সমাগত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যারতির পর বাগবাজারের একটি দল দুই ঘণ্টাব্যাপী কালীকীর্তন দ্বারা সকলকে তৃপ্তিদান করেন।

প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫৩) সন্ধ্যায় বেলুড়মঠে, উদ্বোধন কার্যালয়ে এবং অন্যান্য অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হইয়াছিল।

১লা জানুয়ারী (১৯৫৪) ‘কল্পতরু উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে। উভয় স্থানেই বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটী সারাদিন-

ব্যাপী পূজাপাঠ, ভজন-কীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৈকালে ডক্টর শ্রীরাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে একটি সভারও আয়োজন করা হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী জপানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা এবং বিশেষ করিয়া 'কল্পতরু'র ঘটনাটি অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাপতি মহাশয়ের তুলনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) স্বামী বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মতিথি উৎসব বেলুড় মঠে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা ও হোম, কঠোপনিষৎ-পাঠ, কালী-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়া স্বামীজীর মন্দির ও তাঁহার আবাসকক্ষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পরিদর্শন করেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে বসাইয়া খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির-সংলগ্ন ভাগীরথীতীরে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্রীসন্তোষকুমার বসু উহাতে পৌরোহিত্য করেন এবং অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ, শ্রীবিমল ঘোষ, স্বামী গম্ভীরানন্দ বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী বলেন, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পূজারী এবং ভারতের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতেছেন বর্তমান নেতৃবৃন্দ। স্বামীজী বহু পূর্বে বেদান্তের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে, গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বেদান্তের সঙ্গে জড়িত।

শ্রীবিমল ঘোষ বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সাধনার আদর্শ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকচ্ছটার ন্যায় আপন প্রভাবেই প্রসারিত হইয়াছে। আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুদূর রুমানিয়ায় যেখানে ঈশ্বর-চিন্তার স্থান নাই সেখানকার বহু লোক স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানে। স্বামীজী সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয়তার বীজ বপন করেন এবং তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সৈনিকগণ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমার সম্পর্কবর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীমার চোখে স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ইংরেজীতে তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজীর উভয়বিধ বাণীর সামঞ্জস্য কোথায় তাহা প্রদর্শন করেন।

সভাপতি শ্রীবসু বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ভারতকে নৈতিক বলে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। স্বামীজী ভারতবাসীর প্রতি স্তরেই প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশের অন্তর দর্শন করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতকে নূতন ভাবধারায় চালিত করিয়া জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি জাতিগঠনের কার্যে বেদান্তকে সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বরাহনগর বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটীর উদ্যোগে বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ৯২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যূষে মাঙ্গলিক স্তোত্র ও উষাকীর্তন এবং সকাল আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর জীবনাদর্শ বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্বামী মাধবানন্দজী বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রতীক। ভারতের অবস্থা, ভারতবাসীর অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তিনি

সর্বাগ্রে ভারতের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। মাধবানন্দজী একটি চিত্র-প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। স্বামী জপানন্দ স্বামীজীর জীবনদর্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ কমলাকান্ত গাঙ্গুলী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। মৃদঙ্গ-বাদনে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপঞ্চানন পাল। অসংখ্য নরনারী উক্ত ধর্মসভায় যোগদান করেন।

২৭শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে অপরাহ্নে এক কিশোর-সভায় প্রায় ছয় শত কিশোর যোগদান করে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং এগারো বৎসরের কিশোর শ্রীমান সুশান্ত সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ২৮শে জানুয়ারীর সভায় স্বামীজীর জীবনদর্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ডাঃ সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা বিশ্লেষণ করেন। অপর দুই জন বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং স্বামী সাধনানন্দ। অতঃপর সংগীতের আসরে যোগদান করেন খেয়ালে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষাল, শ্রীমহাদেব ঘোষাল ও ডাঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, যন্ত্রসংগীতে জনাব মুস্তাক আলী সুরসাগর, তবলা-সংগতে শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল দত্ত ও শ্রীবিশ্বনাথ বসু। শ্রীঅমলকুমার দত্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকানাইলাল ঢোল প্রমুখ সুদক্ষ কর্মীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, ভজন, ৮টা হইতে বিশেষ পূজা, ১০টায় গীতা পাঠ এবং ১২টায় হোম হয়।

অপরাহ্ণ ৩৷৷০ ঘটিকায় বিবেকানন্দ শিশু সঙ্ঘের বালকবালিকাদিগের ব্রতচারী নৃত্য ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকায় স্থানীয় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমিহিরকুমার দত্তের একটি প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীপ্রণবকুমার চক্রবর্তীর আবৃত্তি হয়। সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর পবিত্র জীবনকথা ও বাণী এবং অবদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতি ও বর্তমান জগতে তাঁহার অবদান-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতকে আজ জগতের পথপ্রদর্শক-রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতের নব জাগরণের বিপ্লবী নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের অধিকতর প্রচার হওয়া দরকার। পরিশেষে স্থানীয় স্কুল-কলেজের প্রবন্ধ ও ক্রীড়া-প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ হয়। সন্ধ্যারতির পর অধিক রাত্রি পর্যন্ত আশ্রমটি ভজন ও কীর্তনে মুখরিত ছিল।

বালিয়াটী (ঢাকা) কেন্দ্রে স্বামীজীর জন্মতিথি বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদবিতরণাদি সহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। অপরাহ্ণে স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ ও স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগামী জন্মতিথি—আগামী ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, শনিবার) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম পুণ্যাবির্ভাব তিথি সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি সহ উদ্‌যাপিত হইবে। 'সাধারণ উৎসব' অনুষ্ঠিত হইবে ৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ, রবিবার)।

শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী—বিগত ১২ই পৌষ হইতে ২১শে পৌষ পর্যন্ত দশদিবস-ব্যাপী

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই পৌষ প্রাতে সাড়ে সাতটার পর শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ তৈলচিত্র সহ শোভাযাত্রা মঠ হইতে বাহির হইয়া বাঁকুড়া শহরের কয়েকটি প্রধান রাস্তা ঘুরিয়া পরিক্রমা সাঙ্গ করিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় মঠে প্রত্যাবর্তন করে। প্রাতে ৮ ঘটিকা হইতে মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোমাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনাদির পর শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ১৩ই পৌষ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনান্তে সন্ধ্যারতির পর রামায়ণগান ও কীর্তন হয়। ১৪ই পৌষ হইতে উৎসবের পরবর্তী দিবসগুলিতে প্রত্যহ প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে কিছু সময় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৬ই পৌষ অপরাহ্ণে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সঙ্গিগণ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে 'শ্রীশ্যামসুন্দর অপেরা পার্টি' কর্তৃক যাত্রা অভিনীত হয়। ১৭ই পৌষ অপরাহ্ণে মঠের সাধু ও সহকর্মিবৃন্দ 'শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন' গান করেন। ১৮ই পৌষ অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীগৌর শাস্ত্রীর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯শে পৌষ সুবিন্যস্ত মুক্ত প্রাঙ্গণে পঁচিশ সহস্রাধিক নর-নারায়ণের সেবাকার্য রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত চলিয়াছিল। ২০শে পৌষ অপরাহ্ণে রায় বাহাদুর শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদের নেতৃত্বে একটি জনসভা হয়। স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২২শে পৌষ রাত্রিতে বাংলা সবাকচিত্র 'শকুন্তলা' প্রদর্শিত হয়।

ত্রিচূড় (কোচিন রাজ্য) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সারদামন্দিরে ২৭শে ডিসেম্বর প্রায় দেড় সহস্র পুরুষ এবং মহিলা ভক্তের উপস্থিতিতে সারাদিনব্যাপী পূজা-পাঠ-ভজনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্বামী বিমলানন্দ (মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শন-পাঠচক্রের পরিচালক) শ্রীমা সারদাদেবীর শুচিশুভ্র উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-সম্বন্ধে হৃদয়াকর্ষী আলোচনা করেন। সায়াহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, রাত্রে বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণ-বিষয়ক কথকতা এবং পরবর্তী দিন (২৮শে) সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কতিপয় চিত্রকে অবলম্বন করিয়া বালিকাগণের একটি নাট্যাভিনয় সমবেত জনমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছিল।

কইম্বাটোর (মাদ্রাজরাজ্য) শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে শতবার্ষিকীর উদ্বোধন-উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর একটি জনসভা (কুন্‌ড্রাকুড়ির মঠাধীশের নেতৃত্বে) এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ দিন আশ্রমে প্রায় ২৫,০০০ নরনারীর সমাগম হয়। ২৭শে ডিসেম্বর (শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন) 'অখণ্ডপূজা', 'সহস্রনাম অর্চনা' (১৩৬ জন অংশ গ্রহণ করেন) এবং ৩০০ গায়ক কর্তৃক ভজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ঐ দিনকার আলোচনা-সভায় ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ইংরেজীতে ভাষণ দেন। বক্তৃতাটি ত্রিরুচি বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচার করা হয়। সভাপতি ছিলেন ডক্টর আলাগাপ্পা চেট্টিয়ার। শহরের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গণ্যমান্য সুধী উপস্থিত ছিলেন।

রেঙ্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে ২৭শে ডিসেম্বর পূজা-হোম-ভজন-কীর্তন-উপনিষদাবৃত্তি-প্রসাদবিতরণ-পুরঃসর উৎসব সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমার জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে মিসেস্ আউঙসান্ কর্তৃক পরিচালিত একটি মহিলা-সভায় ইংরেজি, বাঙলা, হিন্দী এবং বর্মী ভাষায় বক্তৃতাদি হয়।

কালাডি (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় সারাদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে। পূজাপাঠাদির ভিতর একঘণ্টাব্যাপী আশ্রম ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক 'ললিতসহস্রনাম-পারায়ণম্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় মহিলাবৃন্দ ব্রহ্মানন্দোদয়ম্ উচ্চবিদ্যালয়ে সুচারুভাবে সজ্জিত একটি রথে জননী সারদাদেবীর বৃহৎ তৈলচিত্র স্থাপন করিয়া পূজাপাঠাদির অনুষ্ঠান করেন। বৈকালে সংস্কৃত মধ্য-বিদ্যালয়ের হলঘরে অধ্যাপিকা এ পি সারদার নেতৃত্বে একটি সভা আহূত হয়। শ্রীমার মহান্ নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন অধ্যাপিকা কে সাবিত্রী এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা কুঞ্জাম্মা। তাঁহারা ভারতীয় নারীগণকে শ্রীশ্রীমার জীবনাদর্শ যথাসাধ্য অনুসরণ করিবার প্রার্থনা জানান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড বেদান্তকেন্দ্রে মায়ের জন্মতিথিতে পূজা এবং হোমের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রায় একশত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টার সময় স্বামী প্রভবানন্দজী এবং স্বামী অশেষানন্দজী শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সমবেত সকলেই ঐ দিন আশ্রমে মধ্যাহ্নভোজনে প্রসাদগ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির সময় একঘণ্টা-ব্যাপী একটি বিশেষ উপাসনায় বহুসংখ্যক নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্টলুই বেদান্ত সমিতি শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন করেন ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর। সমিতির নেতা স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সমিতির উপাসনালয়ে একটি সম্মিলনে 'ধ্যান' এবং 'পাঠ' নির্বাহের পর সারদা দেবীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট গায়কগণ ওড়িয়া এবং বাংলা ভজনসঙ্গীত করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তীর উদ্বোধন তমলুক-কেন্দ্র এই ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন:—ভোর পাঁচটায় মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন; সকাল সাতটায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পত্রপুষ্পে সজ্জিত প্রতিকৃতি সহ একশত শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি ও কীর্তন-সংযোগে সমস্ত শহরে শোভাযাত্রা; বেলা আটটা হইতে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং তৎপরে প্রসাদ-বিতরণ; বেলা ২টায় আন্দুলের কালীকীর্তন; বেলা ৪৷৷০টায় সভা এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন।

মনসাদ্বীপ (সাগরদ্বীপ, ২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের নদী-মেখলা উদার পল্লী-পরিবেষ্টনীতে জননী সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভ সমারম্ভের স্মরণ—অনাড়ম্বর পূজা এবং আদর্শ-বিক্ষুব্ধ জগতের শান্তির জন্য সমবেত নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রসেবক স্বামী নিরাময়ানন্দ বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত জনগণের নিকট মায়ের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

দিনাজপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শত-বার্ষিকীর উদ্বোধন-উৎসবে একটি বিরাট মহিলাসভা হয়। সভায় শ্রীতরু সেন লিখিত প্রবন্ধে বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সহধর্মিণীরূপের উচ্চতম প্রকাশ দেখাইলেন শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী। সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি প্রাচীন যুগের মহীয়সী নারীগণ আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছিলেন গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া। সারদা দেবী আদর্শ দেখাইলেন আধ্যাত্মিক ধর্মসাধনা, সন্ন্যাস ও নির্লিপ্ত গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা ধর্মসাধনার পথে উভয়ে উভয়কে সহায়তা করিতেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা ছিল—কিন্তু সমস্তই নির্মল, নিষ্পাপ ও স্বার্থশূন্য। সংসারে নিত্য সংসারী সাজিয়াও মনকে যে কতখানি ঊর্ধ্বে উঠাইতে পারিলে মাতা সারদাদেবীর ন্যায় নির্লিপ্ত হইতে পারা যায় তাহা সর্বসাধারণের কল্পনাতীত।

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই মাঘ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় উৎসব-মণ্ডপে বেলুড়মঠের

স্বামী অবিনাশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন, তৎপরে শান্তিপাঠ হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় স্বামী অবিনাশানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ-অবলম্বনে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় হাওড়া অভয় সঙ্গীতপরিষদ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকীর্তন হয়। ১৭ই মাঘ রবিবার সকাল ৮টায় আশ্রমপ্রাঙ্গণ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার প্রতিকৃতি সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়া শেষ হয়।

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতিতে গত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রত্যূষে মঙ্গলারত্রি, ঊষাকীর্তন; তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর নূতন প্রতিকৃতি স্থাপন পূর্বক বিশেষপূজা, হোম ভোগ-রাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিন শতাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর সভায় অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট জগতের শান্তি ও মঙ্গলের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করেন ও পরে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রীমার আদর্শ-জীবনের ভাবধারা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও মাতৃসঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব দুই পর্যায়ে মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১২ই পৌষ হইতে চারিদিন-ব্যাপী উৎসবে প্রথম দিন বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভজন, সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণ এবং বক্তৃতা হয়। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে স্বামী সুশান্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিন শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ চণ্ডীর গান কীর্তন করেন। চতুর্থ দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন হয়।

জয়ন্তী-উৎসবের দ্বিতীয়পর্যায়ে ৩০শে জানুয়ারী স্বামী আদিনাথানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শ-সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ পাঠ ও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান-গুলিতে সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করেন।

শিলং-কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানে সমবেত প্রার্থনা, ধ্যান ও ভজন-কীর্তনে সকলের মনঃপ্রাণ অপূর্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। পঞ্চ হইতে দশ বৎসর বয়স্কা ১০১টি কুমারীকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করান হয়। ১০১টি চন্দনলিপ্ত জবাবিল্বদলে অঞ্জলি-প্রদান, ভক্তিগদগদকণ্ঠে চণ্ডী-পাঠ, ১০১টি আলোর মালায় উদ্ভাসিত মন্দিরাভ্যন্তরে ভক্তিমতী পুররমণীগণের হুলুধ্বনি অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ মাধুর্য দান করিয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম (আবির্ভাব), শৈশব, সাধনা, সেবা ও মাতৃত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যাহাতে জনসাধারণের একটি পরিষ্কার ধারণা হয় সেই উদ্দেশে প্রথিতযশা শিল্পী-দিগের অঙ্কিত আলেখ্যদ্বারা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীহট্ট-কেন্দ্রে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যথারীতি ষোড়শোপচারে পূজা, পাঠ, হোম, ভোগরাগ এবং ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও কয়েক জন বিশিষ্ট সুরশিল্পীর ভজনদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শিলচর (কাছাড়) সেবাশ্রমে আট দিনব্যাপী (১২ই পৌষ—১৯শে পৌষ) সাড়ম্বরে বিবিধ কার্যক্রম-সংযুক্ত শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এতদঞ্চলে সর্বত্র প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। স্বামী পুরুষাত্মা-নন্দের আলোকচিত্রের মধ্য দিয়া শ্রীমার জীবনালেখ্য প্রদর্শন ও বক্তৃতা শত শত ভক্ত নরনারীর আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে বিশিষ্ট ভক্তদ্বয়—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুজরাটী ভক্তগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীডাহয়া ভাই রামচন্দ্র মেহেতা গত ২৭শে নভেম্বর, ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১২ সনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও উপদেশ গুজরাটী ভাষায় সর্ব প্রথম প্রকাশ করিয়া গুজরাটী ভক্তদিগের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। সর্বসমেত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার ১৫০ খানি বই লিখিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিতে করিতে মেহেতাজী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী বি কে সাহা এণ্ড ব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবসন্তকুমার সাহা গত ১০ই পৌষ ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিজের সততা, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের বলে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গৌরবস্থানীয় হইয়াছিলেন। বসন্তবাবু অমায়িক চরিত্র, বদান্যতা এবং ধর্মানুরাগের দ্বারা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি-বিধান করুন এই প্রার্থনা।

নানাস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী—

গত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে কটকে সারাদিন-ব্যাপী পূজাপাঠ, কীর্তনাদি এবং স্থানীয় নারীসঙ্ঘ সদনে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র, আবৃত্তি ও প্রার্থনা-সঙ্গীত হয়। এতদ্‌ভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ হইতে পাঠ, ভজন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাণীর ব্যাখ্যাও হয়। বিকাল ৪½ টায় সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সাধারণ সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে ১০০টি প্রদীপ জ্বালাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের আরতি হয়। পরে একটি সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভাপতি ছিলেন উড়িষ্যার সর্ববরেণ্য নেতা ড়াঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব।

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শত বার্ষিকী জয়ন্তী দিবস বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারতির পর ভজন, বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগের পর ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরের অধ্যক্ষ স্বামী অপর্ণানন্দের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খাতড়া (বাঁকুড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১২ই পৌষ প্রাতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা ও কীর্তন, পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পৃথক ভাবে ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি, দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ, সন্ধ্যায় আরতি ও তৎপরে বালিকাবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীকালীকীর্তন হয়। ২২শে পৌষ এক সভায় বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আনন্দদান করেন।

হাফলং এ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-শতবর্ষ মহিলা সমিতির উদ্যোগে এক অভূতপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ ও আনন্দোল্লাসের মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণে মহিলাসমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা গিরীন্দ্রবালা দাস মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করেন।

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে ১২ই পৌষ শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগর হাটখোলা নিবাসী শ্রীনিতাই চরণ মোদক মহাশয় এই আশ্রমে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। বৈকালে একটি সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচিত হয়। সভাপতি ছিলেন রায় সাহেব শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সাহা। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।



ধ্যান

ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ।

তস্মাদ্ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি। অথ যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তে।

অথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি। ধ্যানমুপাস্স্বেতি।

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।৬।১

[বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গূঢ় মহান রূপটি কখনো উপলব্ধি করিয়াছ কি? সে রূপ তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশান্তিতে, তাহার গম্ভীর মৌনে, অচঞ্চল আত্ম-স্থিতিতে।] চাহিয়া দেখ, সুবিস্তীর্ণা এই বসুন্ধরা যেন নিস্পন্দ ধ্যানের আসনে বসিয়া আছেন, অন্তরীক্ষও যেন ধ্যানমগ্ন, আবার অন্তরীক্ষের উর্ধ্বে যে দ্যুলোক—তাহাও যেন এক স্তব্ধ একাগ্রতার মূর্তি। জলে যেন ছাইয়া আছে স্তিমিত শান্তি, পর্বতসমূহ যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অপ্রকম্প্য ধ্যানের বিগ্রহরূপে, দেবতুল্য মনুষ্যগণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যেন অবিচলিত ধ্যানেরই মহিমা।

অতএব পৃথিবীতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহারা ধ্যানসিদ্ধির কণামাত্র পাইয়া ঐরূপ শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহাদিগকে আমরা ক্ষুদ্র বলি তাহারা ক্ষুদ্র কেন? ধ্যানকে তাহারা গ্রহণ করে নাই বলিয়া। তাইতো তাহাদিগকে দেখিতে পাই কলহশীল, পরছিদ্রান্বেষক এবং অপরের দোষ-দুর্বলতার প্রচারকারী। সর্বশক্তির উৎস ধ্যানেরই কিঞ্চিন্মাত্র ফল আয়ত্ত করিয়া মানুষের যত শক্তি, যত কীর্তি, যত প্রভাব। শ্রেয়স্কামীদের ধ্যানই তাই হউক পরম অবলম্বন।

কথাপ্রসঙ্গে

বৃক্ষশাখায় ধর্ম

কলিকাতা হইতে রাণাঘাট এবং বহরমপুর হইয়া পাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত উত্তরাভিমুখ যে প্রশস্ত রাজপথ কয়েক বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে তাহারই কোন এক অঞ্চলে, রাস্তা হইতে চার পাঁচ হাত দূরে অশ্বত্থ গাছটি দাঁড়াইয়া। দুই ফার্লং পূর্বে রেল লাইন —তাহারও প্রায় এক মাইল পূর্বে গঙ্গার উন্নত বাঁধ। পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। রাজপথে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে, আবার দক্ষিণ হইতে উত্তরে কৃষক, শ্রমিক, শহরের চাকুরে, দোকানদার পুরুষ স্ত্রী, তরুণ বয়স্ক। বাঁধের উপর দিয়াও নর-নারীর সারি আসিতে দেখা যায়, উহারা রেল লাইন ডিঙ্গাইয়া শস্যক্ষেত্রের আল ধরিয়া অশ্বত্থ গাছের গা ঘেঁষিয়া রাজপথে আসিয়া পড়ে। সমস্ত পথচারীই অশ্বত্থকে লক্ষ্য করে, তাহার বহুশাখায় বিপুল আয়তনের জন্য নয়, নিদাঘরৌদ্রে সুশীতল আশ্রয়ের জন্যও নয় লক্ষ্য করে বৃক্ষটির কাণ্ডে উপকাণ্ডে মানুষ নানা রংএর অসংখ্য কাপড়ের টুকরা দিয়া তাহার যে অভিনব শৃঙ্গার করিয়া দিয়াছে তাহারই জন্য। কতকাল হইতে কি বিশ্বাসে গাছটির শাখা-প্রশাখায় কত লোকে এই কাপড়ের নিশানা টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিতেছে তাহা কেহ বলিতে পারে না, জানিতেও চাহে না। কিন্তু নূতন পুরাতন যাহারাই যায় তাহারাই এক টুকরা কাপড় বাঁধিয়া দিয়া যায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে ইহা তাঁহাদের একটি ধর্মকৃত্য, অহিন্দুরা টিটকারি দিয়া যায়, 'হিঁদু'র ধর্ম কী অদ্ভুত!

পাথরপূজা ও গাছপূজা মানবসমাজের অতি আদিম কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তখন ঐ পূজার প্ররোচক ছিল অজ্ঞাত প্রাকৃতিক শক্তির ভয়। ব্যাধি-আরোগ্য, পুত্র-বিত্ত-খাদ্যশস্যাদি লাভ —এই সকল কামনাপূরণের জন্য মানুষ 'দেবতা'র তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করিত। তাঁহারা রুষ্ট হইলে তাহার নানা অনিষ্ট হইবে এই ভয় সর্বদা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। কিন্তু দেবতা সম্বন্ধে তাহার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না নদীর খরস্রোত, মেঘের গর্জন, অশনিপাত, রৌদ্র, বৃষ্টি, উন্নত পর্বত, বিশাল মহীরুহ এক কথায় যেখানেই শক্তির অভিব্যক্তি সেই সব কিছুতেই মানুষের নিজের অপেক্ষা শক্তিধর কাহারও সত্তা ও কার্য অস্পষ্টভাবে সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। বহু শক্তি বহু দেবতা। বহু তাঁহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তাই তাঁহাদের তোষণরীতিও ছিল বিচিত্র।

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেবতার ধারণা বহু রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। পৃথক পৃথক দেবতার সংখ্যা কমিয়া বৃহত্তর ব্যাপকতর অখিল বিশ্বনিয়ামক এক দেবতার ধারণা আসিল। প্রাকৃতিক শক্তির অপেক্ষা আত্মিক শক্তির মূল্য অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। জ্ঞানময়, প্রেমময় আনন্দময় ভগবানকে তাহার নিজের চৈতন্যসত্তাকে ক্রমশঃ মানুষ আবিষ্কার করিল।

ধর্মের স্বরূপ, প্রয়োজন, ক্রিয়া ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেকার ইতিহাসকে আজ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবুও সে তাহার আদিম 'দেবতা-তোষণ'-সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। প্রমাণ মুর্শিদাবাদের রাজপথের ঐ অশ্বত্থবৃক্ষ। যাহারা গাছের ডালে নেকড়া ঝুলাইয়া উহাকে এখনও ধর্মকৃত্যের সম্মান দেয় তাহাদের ধর্ম কোন্ পর্যায়ে? খুব উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চিতই নয়। তথাপি কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে না, ঐ গাছটিকে এখনই কাটিয়া উড়াইয়া দাও, শাখা-প্রশাখা

হইতে লম্বমান নানা বর্ণের মলিন বস্ত্রখণ্ডগুলি টানিয়া, ছিঁড়িয়া জ্বালাইয়া দাও। মানুষ পৃথিবীরই মানুষ। অনেক তাহার কামনা, অনেক তাহার বিপদ বেদনা দুঃখ-অশান্তি। দৃষ্ট জগতের পরীক্ষিত সম্ভাবনাগুলি লইয়াই সর্বদা সে থাকিতে পারে না। অদৃষ্ট, অজ্ঞেয়ের জন্য তাই মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল হয়। ভাবে, লৌকিক উপায়ে যে সকল বাসনা মিটিল না, হয়তো অলৌকিক উপায়ে তাহা পূর্ণ হইতে পারে। তাই সে রাজপথে চলিতে চলিতে এক টুকরা নেকড়া অশ্বত্থের ডালে বাঁধিয়া করজোড়ে অজানা শক্তির উদ্দেশে আকুতি জানাইয়া চলিয়া যায়। দুর্বলতা! – কিন্তু হিন্দুধর্ম জানে, মানুষকে সবল হইতে সময় দিতে হয়।

কয়েক শতাব্দী পূর্বেও দেশের পল্লীতে পল্লীতে মানুষ গাছ-পাথরে সিঁদুর যেমন মাখাইত, তেমনি ধর্মজীবনের উচ্চতর সাধনা-সম্বন্ধেও সজাগ থাকিত। কথকতা, যাত্রা, নানাপ্রকার পূজা অর্চনা কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে পল্লীর নরনারী ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইত। আজ সেদিন নাই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজের যেমন মর্মান্তিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় - অতি-দরিদ্র ও অতি-ধনী একই সমাজে পাশাপাশি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঐরূপ শোচনীয় বৈপরীত্য প্রকট -বিচারহীন অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী বৃক্ষশাখায় নেকড়া ঝুলাইয়া ফিরিতেছে, আবার সুসংস্কৃত বিদ্বন্মণ্ডলী ধর্মের কথা, দর্শনের কথা বিদগ্ধসমাজে আলোচনা করিতেছেন, প্রচার করিতেছেন। কোথাও একেবারেই অন্ধকার, আবার কোথাও উজ্জ্বল আলো! অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে বৈষম্য ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঐরূপ উদ্যম আনা প্রয়োজন। হিন্দুধর্মের মূল সত্যগুলি সহজ করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করা আবশ্যক আগেকার দিনের কথকতা, পাঁচালী, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতির মধ্য দিয়া - যাহাতে হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও গভীর হয়। তখন যদি অশ্বত্থগাছে সে কখনো নেকড়া ঝুলাইয়া দেয় তো, উহার যথার্থ মূল্য বুঝিয়াই করিবে উহাই ধর্মের সব এই অজ্ঞান তাহার থাকিবে না। তখনই সে সমালোচকদের টিটকারি সচেতনভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু তৎপূর্বে নয়। তৎপূর্বে রাজপথচারী শত শত সাধারণ হিন্দু নর-নারীর হিন্দুত্বের মান ঐ 'বৃক্ষশাখায় ধর্ম' পর্যন্তই।

বিশ্লেষণ

কুম্ভমেলার মর্মান্তিক ঘটনার কথা সহজে ভুলিবার নয়। সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে উহা একটি গভীর শোক ও বেদনার রেখাপাত রাখিয়া গিয়াছে। কাহার ত্রুটিতে কি ধরনের অব্যবস্থায় শত শত নরনারীকে এমন অপ্রত্যাশিত প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ তথ্য-নির্ধারক কমিশনের অনুসন্ধান শেষ হইলে জানিতে পারা যাইবে। ইতোমধ্যে নানা সাময়িক ও সংবাদপত্রে, তথা নানা সম্মেলনে লোকের মুখে বহু প্রকারের আলোচনা, বিতর্ক, অনুযোগাদি পড়িতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, নাগা সন্ন্যাসীরা কোন বিশেষ আচরণ দ্বারা প্রথম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিলে পরে অন্যান্য কারণে উহা বৃদ্ধি পায়। বহু প্রত্যক্ষদর্শী নাগাদিগের উপর কোন দোষারোপ করিতেছেন না। কেহ কেহ শুধু নাগা নয় সমগ্র সাধুসমাজ এবং সাধুদের শোভাযাত্রা ব্যাপারটিরই উপর দুর্ঘটনার জন্য পরোক্ষভাবে অনেকটা দায়িত্ব চাপাইতেছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে লক্ষ লক্ষ নরনারী একটা যুক্তিহীন আবেগের বশবর্তী হওয়ার দরুনই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল এবং ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা থাকিবে। এই সমালোচকগণ চান দেশের লোকের জীবন-দর্শনেরই সংশোধন - এমন একটা জীবন ধারার সৃষ্টি যাহাতে লোকে একটা অনুষ্ঠান-

মূলক ধর্মকৃত্যকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ মাতামাতি না করিতে পারে।

কোন বিশেষ দিনক্ষণে, কোন বিশেষ তীর্থসলিলে স্নান করিয়া বা সাধু মহাত্মাদের চলিয়া যাওয়ার পথের ধূলি স্পর্শ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় পুরাণে বা স্মৃতিতে বা অন্য কোন ধর্মপুস্তকে লেখা থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুধর্মের উহাই যে একটি বড় কথা নয় তাহা উপনিষদ্ গীতাদি শাস্ত্র যাঁহারা পড়েন তাঁহারাই জানেন। প্রকৃত ধর্মজীবন এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত কৃত্যে গড়িয়া উঠিতে পারে না, উহার জন্য যে চাই বহু ত্যাগস্বীকার, সংযম, বহু সদ্‌ভাবনা ও বৃত্তির অনুশীলন তাহা প্রত্যেক হিন্দুশাস্ত্রে ঘোষিত। তবে এমন লোক আছে, হয়তো লক্ষ লক্ষই আছে, যাহাদের জন্য ঐরূপ আনুষ্ঠানিক কৃত্য প্রয়োজন—তাই হিন্দুধর্ম এই সকলকে উৎসাহ দিয়াছেন। হিন্দুধর্ম মনুষ্যমনের বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এক এক মানুষ ধর্মসংস্কৃতির এক এক ধাপে দাঁড়াইয়া আছে—ওখান হইতেই তাহাকে তুলিতে হইবে, উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। তাই কুম্ভমেলায় যাহারা স্নান ও সাধুদর্শন দ্বারা পুণ্যার্জন করিতে সমবেত হইয়াছিল শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণতম আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের ঘোষয়িতা ঋষিগণেরই সমর্থন তাহাদের সহিত আছে। তবে ঋষিগণ কখনো একথা বলেন নাই যে, ঐ স্নান করিয়াই থামিতে হইবে, উহাই ধর্মের সবটা। প্রকৃত ধর্ম যে উহা হইতে অনেক দূর তাহা তাঁহারা অবিসংবাদিত ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখাইয়াছি 'বৃক্ষশাখায় ধর্ম' ধর্মের মর্ম না জানিয়া করা যায় (শত সহস্র পথের লোকের মতো), আবার জানিয়াও করা যায় [নিজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল (?) মুহূর্তে]। কুম্ভস্নানের ক্ষেত্রেও এই দুই শ্রেণীর লোক আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। উভয় শ্রেণীর প্রতিই আমাদের সহিষ্ণুতা থাকা উচিত—তবে যাঁহারা হিন্দুজাতিকে ভালবাসেন, হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য কিছু করিতে চান তাঁহাদিগের একটি কর্তব্য সুস্পষ্ট। অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট ধর্মের মূল সত্য তাহাদের মতো করিয়া উপস্থিত করিতে হইবে যাহাতে কুম্ভস্নানার্থীদের মধ্যে যাহারা পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোক কোন উচ্চ আদর্শ বা ভাববিহীন গতানুগতিক একটি আচারকেই ধর্ম বলিয়া যাহারা মনে করে তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়া আসে।

কুম্ভস্নানার্থী জনগণের কোন দল একটি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন কি ? যাঁহাদের কুম্ভমেলা দর্শন ও কুম্ভকৃত্য নিছক একটি লোকাচার নয় অথবা যাঁহারা এমন লোকের মধ্যেও পড়েন না যাঁহাদের ধর্মের উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা-সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পুণ্যলাভের আকর্ষণ যায় নাই ? হাঁ, এমন একটি শ্রেণীরও অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যে সকল সাধুসন্ত বা গৃহস্থ ভক্ত সাধনমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, জীবনে জ্ঞান-ভক্তি কিছুটা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতই 'পাপক্ষালন' বা 'পুণ্যার্জনে'র কথা ভাবেন না। তাঁহারা কুম্ভে যান ভগবদ্ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনার জন্য। সাধুসন্ত ও ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন ও সান্নিধ্য নিষ্কাম অধ্যাত্ম-সাধনারই অন্তর্গত। সহস্র সহস্র লোক যেখানে ভগবানের নামে ও চিন্তায় একত্র হইয়াছে সেখানে জীবন্ত তীর্থের আবির্ভাব ঘটে।

যাঁহারা পুণ্য বা সাধুসঙ্গ বা জ্ঞান ভক্তি বা 'ধর্ম' লইয়া মাথা ঘামান না, তাঁহাদেরও কুম্ভসম্মিলনে যাওয়ার একটা সার্থকতা আছে। ভারতের নানা অঞ্চল হইতে নানা ভাষাভাষী, নানা আচারব্যবহার-যুক্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী একটি জায়গায় মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে জমা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের একটা অন্তরপরিচয়, অর্থাৎ সরল ভাষায় ভারতের নাড়ীর পরিচয় ঐ স্থানে পাওয়া যায় না কি ? যদি কেঁচো খুঁড়িতে সাপই বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যদিই ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই

বিরাট জন-সম্মিলনের একটা বৃহৎ অংশের মন ধর্ম-নামক কুসংস্কারকে ভীষণ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে তাহা হইলেই বা ভয় কি ? স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতার (Angels Unawares) এই পঙক্তিগুলির কথা মনে পড়িবে -

** The 'Sages'
Winked, and smiled,and called it
'Superstition.'
But he did feel its power and peace
And gently answered back—
'O Blessed Superstition !'

[ভাবার্থ : 'বিজ্ঞ' লোকেরা ভুরু কুঁচকাইয়া, চক্ষু মিট্‌ মিট্‌ করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া রায় দিলেন, উহা 'কুসংস্কার'। সে কিন্তু উহার শক্তি ও শান্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল। বিজ্ঞদের কথার জবাবে মৃদুস্বরে শুধু এই টুকু বলিল,—'অহো! পরম ঈপ্সিত কুসংস্কার !']

বঙ্গসংস্কৃতি

বাঙ্গালী ভারতীয়, আবার বাঙলার মাটির লোকও। বৃহৎ ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শের সহিত যেমন তাহাকে তাদাত্ম্য বোধ করিতে হইবে তেমনি বাঙ্গালী চরিত্র, ভাব ও জীবনধারা হইতে কোন সময়েই তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না বাঙ্গালী ভারতীয়ত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়াও কোথায় যথার্থ বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ও অনুভূতি রাখা প্রয়োজন, বিশেষতঃ জীবনের বহুক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এই দুঃখকর অপমান ও পরাভবের দিনে। প্রাদেশিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ যে 'প্রাদেশিকতা' নয় তাহা দেশের অনেক নেতা এবং বুধমণ্ডলী স্বীকার করিতেছেন।

গত ২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী) হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্যন্ত এগারো দিন কলিকাতার মহম্মদ আলী পার্কে যে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন হইয়া গেল উহার উদ্দেশ্য এবং কর্মধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ বাঙ্গালীত্ব-বোধ প্রকাশ পাইয়াছে। আজকাল 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' অর্থেই কিছু নাচ, কবিতা আবৃত্তি ও কান্নার সুরে কিছু 'মডার্ণ' সঙ্গীত পরিবেশন বুঝায় বাঙ্গালীর সুচিরলব্ধ জীবন-সংস্কৃতির কতটুকু পরিচয় ঐ সকল অনুষ্ঠানে মিলে তাহা বলা কঠিন। আলোচ্য বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। উদ্যোক্তারা তাঁহাদের বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সত্যই বঙ্গসংস্কৃতির একটি ব্যাপক রূপ দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই, বাঙলাদেশ মানে শুধু কলিকাতার শহর নয়, আর সংস্কৃতি মানে শুধু নৃত্য আর গীত নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম এ সকলই সংস্কৃতির এক একটি প্রকাশ। বিশিষ্ট মনীষিগণ বিভিন্ন দিনে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার মধ্য দিয়া এই এক একটি দিকের সরস শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি শহরের বাঙ্গালীদের নিকট বাঙলার একটি অভিনব প্রাণ-পরিচয় উপস্থিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সম্মেলনে অবশ্যই অনেক ত্রুটি ছিল (এই প্রথম বর্ষের প্রচেষ্টায় তাহা স্বাভাবিকই)। বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয় বলিতে পরিকল্পিত কর্মসূচি ছাড়া আরও অনেক কিছু বুঝায়। তবুও উদ্যোক্তৃগণ এবারকার প্রচেষ্টায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

টুকরা স্মৃতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্‌-এ

খ্রীঃ ১৯১০ সালে জয়রামবাটীতে প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাই। চার বন্ধুতে এক সঙ্গে গিয়াছিলাম। এই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ অন্য একটি লেখায় * ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। এখানে কয়েকটি টুকরা স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া প্রায় তিন রাত্রি অনিদ্রার পর আমার গভীর নিদ্রা হইল এবং আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখিলাম যাহা এই বিয়াল্লিশ বৎসর পরেও আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত আছে সুস্পষ্টভাবে। কত স্বপ্নই তো দেখিয়াছি ও ভুলিয়াছি, কিন্তু এ স্বপ্ন আজও ভুলিতে পারি নাই। দেখিলাম (বোধ হয়) একটি লাল বর্ণের মেজেতে, একটি দ্বিতল কক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসিয়া আছেন ও দুইজন সন্ন্যাসীও আছেন। ইহার পূর্বে আমি মাতাঠাকুরাণীকে চর্মচক্ষে কখনও দেখি নাই। এই গাঢ় নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শনের কালে আমার শরীর ও মন যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল - সব পুঞ্জীভূত ক্লেশ ও অবসাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। তাহার পর জয়রামবাটী আসিয়া দেখি সেখানে বাস্তবিকই দুই জন সাধু শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী এবং পূজনীয় নির্মল মহারাজ উপস্থিত আছেন। এ ব্যাপারটিকে অলৌকিকের পর্যায়ে হয়তো ফেলা চলে।

জয়রামবাটী আসিয়া আমরা শ্রীমার সঙ্গে যেরকম স্বাধীনতা নিয়াছি, এরূপ অসঙ্কোচ ব্যবহার পরে উদ্বোধনের বাটীতে সম্ভব হয় নাই। আমার সঙ্গিত্রয়ের একজন ৺প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় যতদূর মনে হয় ৺রামলাল দাদার নিকট হইতে ঠাকুরের একটি ভুবন-মনোহর নৃত্য-ভঙ্গী শিখিয়াছিলেন। প্রফুল্ল সুকান্তি সুপুরুষ ছিলেন; তখন তাঁহার বয়স মাত্র সাতাস কি আটাস হইবে। তাঁহার মনেরও আনন্দ অতুলনীয়-প্রায়। তিনি মায়ের সেই বহিঃপ্রকোষ্ঠে ঠাকুরের সেই ত্রিলোক-অভিরাম নৃত্য এমন মোহন ঠামে অভিনয় করিলেন যে সকলেই একেবারে অবাক! আর ভানুপিসী সরলা বিধুরা ভানুপিসি এই অদৃষ্টপূর্ব আনন্দনৃত্য দর্শনে আনন্দবিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধভাবে বলিলেন, "ওমা, এমন আনন্দ তো দেখি নি।" তাঁহার সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি এবং সমাহিত-প্রায় ভাব আমার মনে এখনও জাগিয়া আছে।

ভানু পিসী! এই দুইটি কথার ভিতরে কত না মাধুরী, কতনা স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। যেন মন্ত্রপূত এই নামটি! শ্রীরামচন্দ্রের শবরীর মত, শ্রীকৃষ্ণের ফল-বিক্রয়িণীর মত এই অশিক্ষিত-পটীয়সী, আক্ষরিক বিদ্যায় গরীয়সী না হইয়াও অমল ভগবৎপ্রেমে মহীয়সী এই গ্রাম্য মহিলা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর লীলাসহচরীরূপে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশেষ কৃপা পাত্রীরূপে চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন। বয়সে অধিক হইলেও 'রসেশ্বরীর' প্রসাদে ইনি ছিলেন একটি ভগবৎ-প্রেমিকা রসিকা বালিকা। ছোট-খাটো মানুষ, চোখে চশমা, আমাদের ভানুপিসী কত কথাই না অনর্গল বলিয়া যাইতেন ঠাকুরের কথা। ব্রহ্মানন্দ যে কি তাহা শতবাসনাবাসিতচিত্ত মানবের কল্পনাতীত। কিন্তু এই যে ভানুপিসী যিনি একরকম সর্ববিধ পার্থিব সম্পদ হইতে বঞ্চিতা, পতিহীনা, কন্যাহারা, দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিতা, বর্তমান শিক্ষার আলোক অপ্রাপ্তা, যেন বিধাতা কর্তৃক সর্বতোভাবে অভিশপ্তা এই যে সদ্গোপ বরললনা, তাঁহার এই অপার্থিব প্রেম, পরা ভক্তি,

* উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৯—'একটি ভাগবত জীবন'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আসিল কোথা হইতে ? শত শত শাস্ত্র অপেক্ষা কি এই রকম জলন্ত দৃষ্টান্ত 'দৈবীসম্পদ' ও ভগবদ্ভক্তিযোগের মহিমার অস্তিত্ব প্রকটিত করে না ? এই রকম অনেক ভগবদ্ভক্ত নারী ও পুরুষ অলক্ষিতে এখনও ভারতে বাস করিতেছেন ও করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নানাবিধ বাদবিতণ্ডার মধ্যেও ভারত-ভারতী এখনও জীবিতা আছেন। জাতিতে সদ্গোপ হইলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই নর্মসখী সমস্ত জাতির গণ্ডীর পারে। আমি গান গাহিতে জানিতাম। শ্রীশ্রীমাকে শুনাইয়া বোধ হয় এই দুইটি গান গাহিয়াছিলাম: 'আদর করে হৃদে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' আর 'করুণানয়নে চাও গো মা।' সঙ্গীত সমাপ্ত করিবার পর বোধ হয় মা আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার কানের কাছে আঙুল লইয়া (এমন স্পর্ধা আমার !) জিজ্ঞাসা করিলাম,—"(এই গান) কানে কি ঢোকে ?" সুপ্রসন্নবদনা মাতাঠাকুরানী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "হৃদয় ভেদ করে যাচ্ছে। তুমি গানে সিদ্ধ হবে।" আহা! শুনিয়া যে কি আরাম পাইলাম তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। কথা দুইটি অক্ষয় কবচের মতো আমার বুকে এখনও (পঁচাত্তর বৎসর বয়সে) গাঁথা আছে।

ইহার পর আরও অনেকবার মাতাঠাকুরানীকে উদ্বোধনে দেখি। কিন্তু সেখানে শ্রীশ্রীমাতা রাজেশ্বরী—দ্বারপাল ও দ্বারপালিকাদ্বারা সতত বেষ্টিতা! সেখানে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার বা কথা কহিবার সুযোগ ঘটে নাই। মাতাঠাকুরানী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া পদকমল অনাবৃত রাখিয়া দ্বিতল কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিয়া থাকিতেন। আমি প্রণাম করিয়া এই ভাবে নিবেদন করিতাম "মা, কিছু যে হচ্ছে না।" অভয়া অভয় দিতেন "হবে! হবে।" এই পর্যন্ত। তাহার পরেই নামিয়া আসিতাম, কেন না একাধিক জানা অজানা লোক সর্বদাই বর্তমান। আমার সহধর্মিণী শ্রীমার নিকট দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্বোধনে যাই ও শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, "মা, এ কি বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?" উত্তরে তিনি বলেন,—"বিদ্যেশক্তি! তা নইলে কি তোমাদের ঘরে এসেচে ?" আরও সামান্য একটু কথাবার্তা হয়, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

অনেক বৎসর পূর্বে যখন বেলুড় মঠে ৺দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়—যতদূর মনে পড়ে সেবারে মাতা-ঠাকুরানী মঠে পদার্পণ করেন। সন্ন্যাসী ও ভক্ত-পরিবেষ্টিতা মা এখানে রাজরাজেশ্বরী। মনে হয়, সেইবার দেখিলাম পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আনন্দোচ্ছ্বাস। তাহা বোধে বোধগম্য—কিন্তু অবর্ণনীয়। বাবুরাম মহারাজের সেই রক্তিমাভ গৌরবর্ণ ভাবসমুজ্জ্বল মনোহর বদনমণ্ডল ও রক্তাক্ত নেত্রযুগল যেন আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেছিল। শরৎ মহারাজ আসিয়াছেন উদ্বোধন হইতে—ধীর, স্থির, গজেন্দ্রসদৃশগম্ভীর। তিনি সবে স্বামীজীর ভবনের এক তলায় পশ্চিম দিক হইতে পদসংলগ্ন করিয়াছেন, অমনই কোথা হইতে যেন ছুটিয়া আসিয়া বাবুরাম মহারাজ টিপ করিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার মন ও বাক্য যেন সম্মিলিত হইয়াও অন্তরের উদ্বেল আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। যতদূর মনে আছে, তিনি আনন্দ-মণ্ডিত চঞ্চল হাস্যে একেবারে বালকের মত বলিলেন —"দাদা! কি আনন্দ অ্যাঁ!" কথা সামান্যই ও স্বল্পই, কিন্তু বস্তু অসামান্য ও অনল্প—বর্ণনাতীত। গম্ভীর শরৎ মহারাজেরও সেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগিল; কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তি অন্যবিধ। বাবুরাম মহারাজের এই উচ্ছলিত আনন্দে তাঁহার জলধিতুল্য ভাবগম্ভীর আনন একটা দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সংলাপশূন্য দিব্যানন্দের ছবি ধ্যানের বিষয়, বর্ণনার নহে।

শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দজী) কিন্তু নানাবিধ ভক্তের এই যে "মা" "মা" করিয়া নানা

আবদার, তাহা তেমন পছন্দ করিতেন না। তিনি একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম এই : স্বামী বিবেকানন্দ মাঠাকরুনের সামনে সসম্ভ্রমে হাত জোড় ক'রে থাকতেন। আর সব আদুরে বুড়ো লোকের দল "ম্যা" "ম্যা" বোলতে অজ্ঞান! হয়তো এই শ্লেষের মধ্যে কিছুটা সত্য ছিল; কিন্তু এ কথা সত্য যে, জয়রামবাটীতে মাতাঠাকুরানী প্রায় সব শ্রেণীর ভক্তকেই যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের মনপ্রাণ চিরজনমের মত কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

একটি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া এই টুকরা স্মৃতি শেষ করি। আমার অনিদ্রা রোগ আছে। এমন অনেক রাত্রি গিয়াছে যখন কিছুতেই নিদ্রা আসে না। তখন "মানসোদ্ভেদতীর্থের" মতন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর স্নিগ্ধ মূর্তিটি ভাবিতাম—আর ভাবিতেই নিদ্রা আসিত।

শ্রীশ্রীসারদা সরস্বতী

(পাঁচালী)

শ্রীমতী সুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ্রী

জয় মা সারদা মাতা তুমি বাগ্‌দেবী,
পূজিলে তোমায় হৃদে ফোটে জ্ঞানরবি।
অবিদ্যা আঁধারে ডুবে আছে এ সংসার,
জ্ঞানালোক দানি সবে করহ উদ্ধার।
জ্ঞানের অভাবে লোকে দুঃখ কষ্ট পায়,
তোমার না হলে কৃপা কি হবে উপায়।
না পড়িয়া বই পুঁথি অনায়াসে হাসি,
ঢালিলেন রামকৃষ্ণ জ্ঞান রাশি রাশি।
তুমি মা সঙ্গিনী তাঁর হয়ে অধিষ্ঠান,
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর করি কৃপা দান।
ঠাকুর কহেন তোমা "ও যে সরস্বতী,
রূপ ঢাকি জ্ঞান দিতে এল বুদ্ধিমতী।"
জ্ঞানের আশায় সবে আসি দলে দলে,
কৃপাকণা মাগি লয় পড়ি পদতলে।
যাগ যজ্ঞ করি যাহা পাওয়া নাহি যায়,
তোমার কটাক্ষে তাহা অনায়াসে পায়।
সরস্বতী-রূপে মাগো আস ধরণীতে,
দেশময় সাড়া জাগে তোমারে পূজিতে।
আমের বউলে যবে ঘেরে চারিধার,
কুল পাকি গাছে গাছে হয় একাকার।
মাঠে মাঠে পাকা ধান কাটা রাশি রাশি,
প্রকৃতির মাঝে ফোটে মা তোমার হাসি।
পলাশের গাছে গাছে রাঙা রাঙা ফুলে,
তোমার চরণ যেন দোলা পরে দোলে।
ঘরে ঘরে ও চরণে "নমোঽস্তুতে" বলি'
রাশি রাশি গাঁদা ফুলে দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
স্বরূপ লুকায়ে এবে এলে যে ধরায়,
যে ডাকে একান্তে তোমা সে তোমায় পায়
তোমার চরণ যেবা করেছে স্মরণ,
ধন্য হয়ে গেছে তার এ নর-জীবন।
তোমারে স্মরিয়া আজি কত শত নারী,
হইতেছে দিন দিন জ্ঞানের ভাণ্ডারী।
দিনে দিনে হইতেছে অবিদ্যার নাশ,
আঁধারে হেরিছে সবে আলোর প্রকাশ।
শাস্ত্র আদি ভুলি করে অশাস্ত্রীয় কাজ,
বিশৃঙ্খলা এসেছিল সমাজের মাঝ।
তুমি মা করিলে রক্ষা ধরাতে আসিয়া,
তোমার আদর্শে সব উঠিছে গড়িয়া।
মহাবিদ্যা তুমি মাতা আদ্যাশক্তি মানি,
সুখদা বরদা বাণী দেবী বীণাপাণি।
শ্যামবর্ণা স্মিতহাসা মধুরভাষিণী,
সারদা জননী তুমি কলুষনাশিনী।
অবোধ সন্তান তব না চিনে তোমায়,
শতেক-জয়ন্তী দিনে রাখ দু'টি পায়।

চিত্তের প্রশান্তি*

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

বর্তমানের বিপদ-সংকেত

আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা দেশবিদেশের দূরত্ব কমাইয়া দিয়াছে এবং পৃথিবীর নানা লোক ও জাতিকে অভূতপূর্বভাবে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে। এইজন্যই কোন একটি দেশের বা মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যকার আলোড়ন হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী অপর দেশের অধিবাসীদিগকেও আজকাল দ্রুত বিচলিত করিয়া তুলে। বর্তমান কালে নানাপ্রকার বিরোধ ও সংঘর্ষ তাই, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ভয়ঙ্কর উত্তেজনা বা উগ্র মানসিক চাপের সৃষ্টি করিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে ক্যানসার রোগের অপেক্ষাও ভীষণতর বলিয়াছেন। এই উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান গতিতে বিশ্ববাসীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মনকে ধরিতে হইবে

জীবনে কোন কাজ সম্পন্ন করিতে গেলে কিছু পরিমাণে স্নায়বিক উত্তেজনার প্রয়োজন হইতে পারে। এমন কি, আমাদের দেহে ও মনে স্নায়বিক রোগের ঝোঁকগুলিও যাহাতে সুশোধিত হইয়া পরিণামে আমাদের কল্যাণকর কাজে লাগে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনাগুলিকে কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে রূপান্তরিত করা যায় তাহার যথাযথ জ্ঞানের অভাব আমাদের সমসাময়িক বাতিকগ্রস্ত সমাজে ভাব-প্রবণ অস্থিরচিত্ত লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে। জনৈক মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক বলিয়াছেন, আমরা যে আমাদের মনকে প্রয়োজনমত শান্ত ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিনা—এই অক্ষমতাই ক্রম-বর্ধমান মানসিক ব্যাধির নিদান। আর মানসিক ব্যাধি হইতেছে "আমাদের সভ্যতার সর্বাপেক্ষা অধিক-প্রসারী কিন্তু সর্বাপেক্ষা কম-স্বীকৃত ব্যাধিগুলির মধ্যে অন্যতম।" যে বায়ু-পরিমণ্ডলে আমরা বাস করিতেছি, উহা যেন আমাদের দেহ, স্নায়ু ও মনের পক্ষে অনিষ্টকর স্পন্দনসমূহে পরিপূর্ণ! তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, বহুসংখ্যক ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানী 'শ্লথন' (Relaxtion) বা মনকে আলগা করিবার অভ্যাসের দ্বারা মানসিক চিকিৎসার আবশ্যকতা ক্রমেই স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ধ্যানেরও মূল্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজের মতো করিয়া কোন না কোন প্রকারের ধ্যান অভ্যাস করা, কেন না, ধ্যানই চিত্তের সজীবতা ও বিশ্রাম আনে, ভাবী প্রয়োজনের নিমিত্ত শক্তিকে সঞ্চিত রাখে এবং জীবনকে সুসমঞ্জস ও স্থিতিস্থাপক রাখিতে সহায়তা করে।

কিন্তু অশান্ত মনকে সংযত করা খুবই কঠিন। মনে পড়ে, আমাদের একজন তাঁহার ছাত্রাবস্থায় পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার মন এখনও বড় চঞ্চল। কি উপায়ে একে শান্ত করা যায়? প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমি যেন একটুও এগুতে পারছি না। সব চেষ্টাই ভুয়ো মনে হচ্ছে।" মহারাজজী উত্তর দিলেন, "তাতে দুঃখের কিছুই নেই। ধ্যানের ফল অবশ্যম্ভাবী। যদি তুমি ভগবানের নামজপের সঙ্গে নিয়মিতভাবে

* Vedanta for East and West পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত।

একটি সহজ ধরনের ধ্যান অভ্যাস করতে থাক, তা হ'লে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। প্রথম প্রথম ধ্যান তো মনের সঙ্গে যুদ্ধের মতোই মনে হবে। * * * প্রথম দিকে লক্ষ্য রাখবে, যেন ধ্যান করতে গিয়ে মস্তিষ্ককে অতিমাত্রায় পীড়ন না কর। চেষ্টাকে ধীরে ধীরে বাড়াতে থাক, তা হলে দেখতে পাবে ক্রমে মন শান্ত হয়ে আসছে। তারপর অনেকক্ষণ ধ্যানে বসে থাকলেও ক্লান্তি অনুভব করবে না। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে এবং গাঢ় ঘুমের পর শরীর ও মনে নিজেকে যেমন সজীব অনুভব কর, সেইরূপ করতে থাকবে। কিছু দিন পরে তীব্র আনন্দের অনুভূতি আসবে। * * * শরীর ঠিক না থাকলে মনও চঞ্চল হয়। কাজেই, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। রিপুগুলিকে আয়ত্তে রাখতে হবে। ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। মন স্থির হলে ধ্যান করব, এইরূপ ভাবলে আর কখনও ধ্যান করা হবে না।"

মন কি ? —পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী

মন কি? এক সময়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী বৈজ্ঞানিক মনে করিতেন যে, মন জড়েরই একটি প্রতিভাস, মস্তিষ্কের এক স্পন্দনবিশেষ। যকৃৎ হইতে যেমন পিত্ত-ক্ষরণ হয় —মস্তিষ্ক হইতেও তেমনি চিন্তা 'নিঃসৃত' হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শরীরের উপর মনের প্রভাব বিষয়ে অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। মন মস্তিষ্কের সহোৎপন্ন পদার্থমাত্র—এই মতকে তাঁহারা অপ্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের যোগ মাত্র নয়, কিন্তু একত্র-সংহত দেহচিত্তাত্মক।

যে সকল মনোবিজ্ঞানী কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতিরেকেও মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত যন্ত্রণা লাঘব করিতে সমর্থ, আমরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহারা যে সকল সমস্যা লইয়া কারবার করেন, তাহাদের বেশীর ভাগই যে প্রকৃত পক্ষে অধ্যাত্ম-সম্পর্কিত, এ কথা বিখ্যাত মনোবিদ্ ডাক্তার জাং (Jung) স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই সুখের বিষয় যে, জীবনে যাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম-দৃষ্টি নাই এমনও কতকগুলি মানসিক পীড়াগ্রস্ত লোককে শারীরিক ও মানসিক সামঞ্জস্যে ফিরাইয়া আনা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান মনঃসমীক্ষার প্রণালী দ্বারা সম্পাদিত এই সামঞ্জস্য অহং-কেন্দ্রিক—ইহার কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই এবং উহা স্থায়ী না হইবারই সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর পূর্বে ডাক্তার জাঙ্ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকগণের পারস্পরিক সহযোগিতায় মানুষের মানসিক ব্যাধি লাঘবের চেষ্টা করা উচিত

হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী

হিন্দুরা মানব-ব্যক্তিত্বকে সংহত দেহ-চিত্তাত্মক রূপে দেখেন না। তৎপরিবর্তে, তাঁহারা দেহকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আধার বা যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন চক্ষু দর্শনের, নাসিকা ঘ্রাণের ও কর্ণ শ্রবণের যন্ত্র বিশেষ। উপনিষদে আছে,—"আত্মাই বিজ্ঞাতা", "চিত্ত ভাগবত চক্ষু"—জ্ঞানের যন্ত্র-স্বরূপ। মানুষের ব্যক্তিত্ব জিনিসটি বস্তুতঃ বড়ই জটিল। মানুষ যথার্থ-স্বরূপে আত্ম-চেতন আধ্যাত্মিক সত্তা, পরম পুরুষের শাশ্বত অংশ-বিশেষ। এই ব্যষ্টি-আত্মা বা জীবাত্মা মন- ও ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-শরীরে অবস্থিত এবং স্থূল দেহে আবৃত; কিন্তু বিশ্ব-আত্মা বা পরমাত্মা এতদুভয় হইতে স্বতন্ত্র।

মন স্পন্দনাত্মক সূক্ষ্ম পদার্থ। ভগবদ্গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন যে, মন চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্ ও দৃঢ়। এই মনের নিগ্রহ বায়ুর নিগ্রহের মতোই সুদুষ্কর। শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, মন চঞ্চল এবং ইহাকে সংযত করা কঠিন, সন্দেহ নাই;

কিন্তু ইহাকে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তে আনা যাইতে পারে, আর ইহার মূল উপায় বৈরাগ্য বা অনাসক্তি।

দেহকে জলাবর্ত ও মনকে ঘূর্ণিবায়ুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অথবা, পতঞ্জলির ভাষায়, একটি স্থিরবক্ষ সরোবরে ঢেউ উঠিলে যেরূপ হয় চিত্তেরও তাহাই রূপ। বাহিরের দ্রব্য বা ভাব বহিরিন্দ্রিয়গণকে উদ্রিক্ত করে, এই ইন্দ্রিয়গুলি আবার অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ ও জীবাত্মাকে প্রভাবিত করে। তারপর তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে পরস্পর পৃথক্ করা যায় না। প্রত্যেক চিত্ততরঙ্গে এই তিনটি অংশের সব কয়েকটিই কম-বেশী বর্তমান থাকে। মোট তরঙ্গটির স্বরূপ উহার প্রধান অংশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তরঙ্গগুলি প্রবলতরভাবে মস্তিষ্ককে আঘাত করিলে চিন্তা এবং হৃদয়কে আঘাত করিলে অনুভূতি উদ্ভূত হয়। ইচ্ছার বেলায় প্রতিক্রিয়াটি এই দুইয়ের মাঝামাঝি সীমাবস্থায় থাকে। চিত্ত-গুহাশায়ী আত্মা প্রতিনিয়তই এই চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার তরঙ্গ-পরম্পরার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন। কতিপয় আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতেছেন যে, তাঁহাদের রোগীদের গোলযোগের কারণ সাধারণতঃ এই সকল চিত্ত-তরঙ্গের সহিত একাত্মতাবোধ। কিন্তু এখনও তাঁহাদের অধিকাংশই মনকেই মূল বলিয়া ধরিয়া আছেন এবং মনকে স্ব-চেতন সত্তা বলিয়া মনে করেন।

পক্ষান্তরে, হিন্দু-মনীষীরা আত্মিক চৈতন্যকেই মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, মনও একটি 'কোষ'মাত্র এবং ইহা আত্মাকে আবৃত করে। অথবা, মনকে আত্মার পরিধেয় বস্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অপ্রবুদ্ধ অবস্থায়, আত্মা নানাপ্রকারের গোচরীভূত ও অনির্জ্ঞাত সংস্কারের সহিত ঐক্যবোধ করিয়া থাকে, আর এই সংস্কারগুলি চিত্তসরোবরকে কলুষিত ও আলোড়িত করে। আত্মাকে সব সময়ই অশান্ত তরঙ্গমালার সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হয়। আমাদের জাগ্রদবস্থায় এই তরঙ্গগুলি সর্বক্ষণই উঠিতে থাকে। কল্পনার জগতেও আমরা আবেগ ও স্মৃতির মাধ্যমে তাহাদের সহিত তাদাত্ম্য বোধ করি। এই সমুদয় চিত্ত-তরঙ্গ হইতে নির্মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিতে ও উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, কিন্তু ইহা অতি দুঃসাধ্য কার্য।

কখনো কখনো সম্ভবতঃ জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা-বশতই, মন এক ধরণের নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, বেশীর ভাগ সময়েই, মন বানরের ন্যায় কোন না কোন নূতন বস্তুর পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ছুটাছুটি ও লম্ফঝম্প করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "মানুষের মন বানরের মতো স্বভাবতই অবিশ্রান্ত চঞ্চল; আবার, ইহা বাসনা-সুরায় মত্ত হইয়া আরও অস্থিরভাব ধারণ করে। মন বাসনাধীন হইবার পর অপরের সাফল্য দেখিয়া ঈর্ষ্যার বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করে। সর্বশেষে, মনের মধ্যে অহংকাররূপ পিশাচ প্রবেশ করায়, মন নিজেকেই সর্বপ্রধান বিবেচনা করে। এরূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!" আমাদিগকে এই সকল উন্মাদনা, বিষ ও অসুরের কবল হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করিতে হইবে

আবার, মনকে একটি ক্ষিপ্ত দুষ্ট হাতীর সঙ্গে অথবা মেঝের উপর ছড়ানো এক রাশি সর্ষপ-বীজের সঙ্গেও তুলনা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু, যে সকল আলোক-রশ্মি কোন বস্তুতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনকে তাহাদের সহিতও তুলনা করা চলিতে পারে। দিবা-রাত্রির প্রতিক্ষণে আমাদের প্রচুর পরিমাণে মানসিক শক্তির ক্ষয় হইতেছে। সময় সময়, যখন আমরা

শক্তির অভাবের ভযোগ করি, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ফলে এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মনের যথেচ্ছ ছুটাছুটির দরুণ আমাদের মানসিক শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছি। ধ্যান বা উহার অনুরূপ কোন নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে মনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিতে না শিখিলে আমাদের মানসিক শক্তির ক্রমশঃ অপচয় হইবেই,— আর তাহার ফলে, তেজ ও শান্তি, উভয়ই নষ্ট হইবে।

মানুষ নিজের টাকা পয়সা খরচ সম্বন্ধে কত সাবধান অথচ যে সকল মানসিক ক্ষমতা ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে এতটা উদাসীন!

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে মানসিক ক্ষমতার অপচয় বিষয়ে এই বলিয়া নিষেধ করিতেন, "মনের রাশ ছেড়ে দিওনা, ওকে তোমার সঙ্গে ও আয়ত্তে রেখো।"

কোন ভদ্রলোক একবার তাঁহার পীড়িতা পত্নীর চিকিৎসার জন্য জনৈক মন-সমীক্ষকের শরণাপন্ন হন। জিজ্ঞাসাবাদের পর চিকিৎসক বলিলেন, -- "দেখছি, এঁর মন বলে আর কিছু নেই।" ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন,—"আমি তাতে একটুও আশ্চর্য হচ্ছি না। উনি এই কুড়ি বছর ধরে টুকরো টুকরো করে মনের বাজে খরচ করে এসেছেন।"

এই ভাবেই আমরা মনের ক্ষমতাগুলিকে হেলায় ফেলায় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। এতই বেপরোয়া আমাদের এই মানসিক অপচয় যে, আমরা সকলেই যে কেন উন্মাদাশ্রমে যাই নাই, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এখন হইতেই আমাদের মধ্যে আরও অধিক সংখ্যক লোকের এই অপচয় ও ক্ষতি এবং এই শক্তির অপপ্রয়োগের কথা বুঝিতে শেখা উচিত। আমরা ঠিক যে ভাবে কর্ষিত জমি হইতে সেচের জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে সেজন্য সমস্ত মূষিকের গর্তগুলি বন্ধ করিয়া থাকি, ঠিক সেইভাবেই আমাদিগকে মনের অপচয় নিবারণের উপায় বাহির করিতে হইবে এবং আমাদের মানসিক শক্তি-সমূহকে আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত করিতে হইবে।

নোঙর ফেলিয়া নৌকা টানা

এই অপচয় নিবারণের নিমিত্ত পরিকল্পিত সকল প্রকার অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম সোপান হইতেছে অনাসক্তি অভ্যাস করা। জনৈক মহিলা কিছুতেই উপাসনায় মন স্থির করিতে পারিতেন না, কেননা, সহোদরা ভগিনীর উপর ছিল তাঁহার বিষম ঘৃণা; অর্থাৎ মহিলার মনটি ছিল যেন নোঙরা-ফেলা নৌকার মতো।

কোন সময়ে একদল মাতাল নৌকা বিহার করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল। প্রাণ ভরিয়া মদ্য পান করিবার পর তাহারা একখানি নৌকায় আরোহণ করিল এবং নেশা ছুটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত্রি ধরিয়া একই ভাবে দাঁড় চালাইয়া গেল। তাহার পর, উষার আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহারা সেই একই জায়গাতে আছে, এক ধাপও অগ্রসর হইতে পারে নাই, কেননা তাহারা নোঙরটি তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল! ঠিক সেই রকম, নৈতিক পরিশীলন ভিন্ন কোনও আধ্যাত্মিক সাধনাতেই আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। এইজন্যই, যে গুরু যোগবিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি আসন, প্রাণায়াম বা ধ্যানের রূপ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবার পূর্বে, অন্তত ন্যূনতম মানসিক শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। এই চিত্তশুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন 'উদ্‌গতি' (Sublimation) আর মরমীরা (mystics) বলেন 'পাপক্ষালন' (Purgation)।

লক্ষ্য

এই অত্যাবশ্যক প্রথম ধাপ পার হইলে তবেই আমরা অধ্যাত্ম-সাধনার বিবিধ প্রণালী অনুসরণ

করিতে পারিব। আর, এই সাধনার ফলে, আমাদিগের যথাসময়ে আসিবে পরমসত্যের উপলব্ধি। এমন একটি সাম্য ও স্থিতিলাভ আমরা তখন করিব যে, জগতে কোন কিছুই আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কিন্তু, মেষশাবকের কিংবা শিশুর, অথবা নিদ্রিত বা মৃত ব্যক্তির শান্তভাব আমাদের ঈপ্সিত নহে। আবার, যে আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তি কিয়ংপরিমাণে স্থিতিসাম্যপ্রাপ্ত ও সংযত, তাঁহার স্থিরতাও আমাদের কাম্য নহে, কেননা, তাঁহার স্থিতি-সাম্য নিরাপদ নয়, যে কোন মুহূর্তেই উহা বিপর্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু যিনি অনন্ত চৈতন্যের সহিত যোগ-যুক্ত হইয়াছেন এবং বদ্ধজল ক্ষুদ্র একটি ডোবায় পড়িয়া না থাকিয়া অসীম মহাসাগরে অবগাহন করিয়াছেন, সেই প্রবুদ্ধাত্মা পুরুষের প্রশান্ত চিত্তই আমাদের কাম্য। হাতী ছোট জলাশয়ে নামিলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং উহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, কিন্তু মহাসাগরে অবতরণ করিলে এ সকল কিছুই ঘটে না। যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি ক্ষুদ্র চৈতন্যকে পরম-চৈতন্যের সহিত যুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি মহাসমুদ্রের তুল্য। এইরূপ ব্যক্তি প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যেও স্বয়ং শান্ত ও অবিক্ষুব্ধ থাকিয়া প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারেন। অধ্যাত্মজগতের সমস্ত আচার্যই পরম একাগ্রতা রক্ষা করিয়া এবং শক্তিকে সুসংহত করিয়া একটি অপ্রকম্প স্থিতির মধ্যে জীবনযাপন করেন।

যদি কোন বয়াকে একটি ক্ষুদ্র নোঙ্গরের সহিত বাঁধা হয়, তাহা হইলে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় রশিটি ছিঁড়িয়া গেলে নোঙ্গরটি নষ্ট হইতে ও বয়াটিও ভাসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি বয়াটি শক্ত শিকল দিয়া গুরুভার নোঙ্গরের সহিত বাঁধা হয়, তাহা হইলে ঝড়ের সময়ও ইহা নিরাপদে ঢেউয়ের উপর ভাসিয়া বেড়াইবে। এইরূপ, যাহাতে আমরা ইচ্ছা করিলে বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিতে পারি, তাহার জন্য আসুন, আমরা সচেষ্ট হই। আমাদের শান্তি হউক দিব্য পবিত্রতার শান্তি, ভাগবত উপলব্ধির সুগভীর শান্তি।

আহ্বান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সুখের সময় তোমার কথাটি সহজে ভুলিয়া যাই।
সুখ-সম্পদ যত পাই, তত চাই।
তখন দিবস রাতি,
ধনজন নিয়ে করি শুধু মাতামাতি।
ভাবি চিরদিন এম্‌নি ক'রেই দিনগুলি যাবে চ'লে,
উৎসব কলরোলে।

দুঃখের দিনে তোমারে স্মরার কথা।
তোমা হ'তে হই বিমুখ ততই যত পাই প্রাণে ব্যথা।
ভাবি তুমি বুঝি করিতেছ অবিচার,
আমারে দিয়াছ মুষ্টি-ভিক্ষা, অন্যেরে ভাণ্ডার।

বিপদ যখন ঘটে,
তোমারে তখন ডাকার সময় বটে।
তখন আবার ভাবি,
কোন দিন তোমা ডাকে নি যে তার
ডাকার নেইক দাবি।
লজ্জা তখন চিত্ত আমার ভরে
তোমারে ডাকার আগ্রহটুকু হরে।
করি প্রতীক্ষা অনিবার্যেরই তরে।

অবাক হইয়া ভাবি শুধু প্রভু, এতও তোমার সয়,
মিথ্যা বলে না, লোকে যবে বলে তোমারে করুণাময়।
কোন দিন ভুলে করি নাই আহ্বান
তবু কতবার সঙ্কট হ'তে করেছ পরিত্রাণ।
বিভীষিকা মাঝে হেরি কতবার তোমার অভয় পাণি
এত দয়া যদি কর নিরবধি কেন লগুনাক টানি ?

রোহিণী

(পুরাতন জৈন কথিকা)

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

সেকালের—সে সময়ের কথা।

রাজগৃহ নগরে ধন্য নামক এক সমৃদ্ধিশালী ও বুদ্ধিমান সার্থবাহ (বণিক) ছিলেন। তাঁহার ভদ্রা নামক স্ত্রী, ধনপাল, ধনদেব, ধনগোপ ও ধনরক্ষিত নামক চারি পুত্র এবং উজ্ঝিকা, ভোগবতী, রক্ষিকা ও রোহিণী নামে চারিজন পুত্রবধূ ছিল।

একদা ধন্য শ্রেষ্ঠীর মনে উদিত হইল যে আমার গৃহের সমস্ত কার্য আমার আদেশ ও পরামর্শ-অনুযায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু কোন সময়ে আমি যদি গৃহে অনুপস্থিত থাকি বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে অন্য স্থানে গমন করি বা যদি রোগ-গ্রস্ত হই, অথবা আমার যদি মৃত্যু হয় তবে গৃহের কার্য কাহার পরামর্শে পরিচালিত হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি তাঁহার নিজের ও পুত্রবধূগণের আত্মীয়-স্বজনগণকে এক সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং নানাপ্রকার ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করাইয়া সকলকে পরিতৃপ্তি-সহকারে আহার করাইলেন। আহার-সমাপনান্তে সকলে উপবেশন করিলে ধন্য শ্রেষ্ঠী একে একে তাঁহার পুত্রবধূগণকে আহ্বান করিয়া সকলের সমক্ষে প্রত্যেককে পাঁচটি করিয়া পরিপুষ্ট ধান্যের দানা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন—তোমরা এই ধান্যগুলিকে যত্নের সহিত রাখিবে ও আমি চাহিলে এইগুলি প্রত্যর্পণ করিবে।

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ উজ্ঝিকা পাঁচ দানা ধান্য গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিল, আমাদের বাড়ীতে বহু গোলা ধান্য রক্ষিত আছে. শ্বশুর মহাশয় যখন চাহিবেন তখন রক্ষিত ধান্য হইতে পাঁচ দানা লইয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দিব। এইরূপ বিচার করিয়া সে শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত পাঁচ দানা গোপনে ফেলিয়া দিল।

দ্বিতীয়া পুত্রবধূ ভোগবতী চিন্তা করিল, শ্বশুর মহাশয়ের গোলায় বহু ধান্য রক্ষিত আছে, যখন তিনি চাহিবেন তখন পাঁচ দানা আনিয়া প্রদান করিব. কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত ধান্য ফেলিয়া দেওয়াও উচিত নয়। অতএব স্বস্থানে গমন করিয়া ধান্যের খোসা ছাড়াইয়া পাঁচ দানা চাউল সে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

তৃতীয়া রক্ষিকা মনে করিল, শ্বশুর মহাশয় যখন যত্নের সহিত রক্ষা করিতে বলিয়াছেন তখন তাহা সুরক্ষিত রাখাই উচিত। এইরূপ বিচার করিয়া সে ধান্যগুলিকে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বন্ধন করিয়া নিজের অলঙ্কার রক্ষা করিবার রত্ন-পেটিকায় রাখিয়া দিল এবং প্রতিদিন তাহা যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে লাগিল।

চতুর্থী রোহিণী বিচার করিল, শ্বশুর মহাশয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাঁচ দানা করিয়া ধান্য প্রদান করিয়াছেন, নতুবা বাড়ীতে এত ধান্য থাকিতে মাত্র পাঁচ দানা করিয়া দিবার কোন সার্থকতা থাকে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিজের পিতৃগৃহ হইতে কর্মচারীকে ডাকিয়া সেই পাঁচ দানা ধান্য প্রদান করিল এবং সেই ধান্য কয়টিকে বর্ষার সময় যত্নের সহিত বপন ও রোপণ করিয়া যখন ধান্য পরিপক্ক হইবে তখন তাহা কর্তন করিয়া আনিয়া তাহাকে প্রদান করিতে আদেশ করিল।

সেই পাঁচটি মাত্র ধান্য বপন করিয়া উহা হইতে যত ধান্য হইল তাহা সে নূতন মাটির হাঁড়িতে রাখিয়া যত্নের সহিত হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল এবং দ্বিতীয় বর্ষার সময় পুনরায় সেই ধান্যগুলি বপন করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত ধান্যসমূহ পূর্ববৎ

কয়েকটি হাঁড়িতে রক্ষা করিল এবং তৃতীয় বর্ষায় তৎসমস্ত বপন করিয়া বহু ধান্য প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সে প্রতিবর্ষে সমস্ত ধান্য বপন করিয়া বহুগুণ ধান্য উৎপন্ন করিতে লাগিল। পাঁচটি ধান্য হইতে ক্রমে বৃহৎ একটি গোলা ভরিয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ধন্য শ্রেষ্ঠী পুনরায় তাঁহার ও পুত্রবধূগণের আত্মীয় স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানা প্রকার উপাদেয় ভোজ্যে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আহারান্তে সকলে উপবেশন করিলে তিনি একে একে পুত্রবধূগণকে সকলের সমক্ষে আহ্বান করিলেন।

প্রথমে উজ্‌ঝিকা আসিলে শ্রেষ্ঠী তাহাকে তাঁহার প্রদত্ত ধান্য ফেরত দিতে বলিলে সে বাড়ীতে রক্ষিত ধান্য হইতে পাঁচটি দানা আনিয়া দিল। শ্রেষ্ঠী এই ধান্যগুলি তাঁহার প্রদত্ত দানা কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, বাড়ীতে রক্ষিত ধান্য ভাণ্ডার হইতে সে এই দানা কয়টি আনিয়া দিয়াছে, তাঁহার প্রদত্ত দানাগুলি ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় ভোগবতীও গৃহে রক্ষিত ধান্য আনিয়া দিল এবং বলিল, আমি আপনার প্রদত্ত দানাগুলি ভক্ষণ করিয়াছি। তৃতীয় রক্ষিকা তাহার রত্নপেটিকা আনিয়া তাহাতে সযত্নে রক্ষিত ধান্যের দানাগুলি তাঁহাকে প্রদান করিল। রোহিণী সর্বশেষে আসিয়া বলিল যে, ঐ পাঁচটি দানা হইতে এত ধান্য হইয়াছে যে এখানে আনয়ন করিতে কয়েকটি গাড়ীর প্রয়োজন হইবে। তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বলিতে বলিলে সে কিরূপে ধান্য কয়টির দ্বারা এত অধিক ধান্য উৎপন্ন করিয়াছে তাহা বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিল।

রোহিণীর কথায় শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলের সমক্ষে তাহাকে গৃহের সমস্ত কাযের কর্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারেই সমস্ত কার্য পরিচালিত হইবে। রক্ষিকাকে গৃহের সমস্ত ধনসম্পত্তির রক্ষিকা, ভোগবতীকে রন্ধনশালার কর্ত্রী ও উজ্‌ঝিকাকে গৃহাদি পরিষ্কার রাখিবার তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করিলেন।

গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন—হে শিষ্য, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া যে উজ্‌ঝিকার ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করে সে ইহলোকে কুখ্যাতি ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যে ভোগবতীর ন্যায় মহাব্রত গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র জীবিকা-নির্বাহের উপায় স্বরূপ তাহা বাহ্যিক ভাবে পালন করে এবং আহারাদিতে আসক্ত হয় সে পরলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যে রক্ষিকার ন্যায় গৃহীত মহাব্রত যত্নপূর্বক পালন করে সে ইহলোকে সুখ্যাতি ও পরলোকে সুগতি প্রাপ্ত হয়, আর যে মহাব্রত ধারণ করিয়া রোহিণীর ন্যায় তাহা জীবনে অধিকাধিকরূপে বিকাশ করে সে ইহলোকে শান্তি, কীর্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আয়ুক্ষয়ে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

উৎকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায়

স্বামী জগন্নাথানন্দ

উৎকল ও উড্র ব্যক্তিদ্বয়ের নামে উৎকল ও ওড়িশাদেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মহাভারতে, পুরাণাদিতে উৎকল ও উড্রের নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ওড়িশাভাষা লিখিত-সাহিত্য আকার ধারণ করে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাদলাপাঞ্জি নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে। উহাতে জগন্নাথ মহাপ্রভুর পূজাপদ্ধতি, ভোগরাগ, রাজাদের বংশাবলী ও কীর্তিকলাপ বর্ণিত আছে। কেহ কেহ

উহা হইতে উৎকলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন। উহা গঙ্গাবংশীয় রাজগণের রাজত্বের সময় লিখিত।

শূদ্রমুনি সারলাদাস উৎকলের প্রাচীন কবি। তিনি সার্ধচতুর্দশ শতাব্দীর লোক। সারলাদাস জাতিতে শূদ্র ছিলেন। বিশেষ কিছু লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহার বাড়ী ছিল কটকজিলান্তর্গত ঝঁকড় গ্রামে। তিনি সারলাদেবীর উপাসনা করিতেন, পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্র শুনিতেন। আরাধনার ফলে দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন, 'তুই কবি হবি।' সেই সারলাদেবীর কৃপায় তিনি ওড়িশাভাষায় পদ্যে বিশাল মহাভারত রচনা করেন। তাঁহার রচিত পদ্যগুলি অতি মনোহর, হৃদয়গ্রাহী। উহাতে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা অতি সরল ; উপমা, উপমেয়গুলি সরস

উহা হইতে কয়েকটি পদ্য উদ্ধৃত হইল :

পর্বত তুটে কি নাথ টেলারে মাইলে,
সমুদ্র পোতি হুত্র কি ধূলি পকাইলে।
মৃগরবলে কাঁহি যে সিংহ জিণি হুত্র,
তুলাদ্বারা পিটিলেকি লুহা তুটি যায়।

ঢেলাতে কি পর্বত ভাঙ্গে, ধূলা ফেলিলে কি সমুদ্র ভরিয়া যায়, মৃগের মত বল লইয়া কি সিংহকে জয় করা যায়, তুলার আঘাতে কি লৌহ চূর্ণ করা যায় ইত্যাদি। অনেকস্থলে সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে মিল নাই। সারলাদাসের রচিত মহাভারতকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। উহাতে বহুবিষয় তাঁহার নিজের কল্পিত। জগন্নাথ মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও বিশদ বিবরণ উহাতে পাওয়া যায়।

তদবধি ঝঁকড়গ্রামে সারলাদেবী পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। দেবীর ভোগরাগাদির সুব্যবস্থার জন্য রাজারাও জমি, বাড়ী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। কবি, বাদক, গায়ক হওয়ার মানসে অনেকে দেবীর কাছে হত্যা দিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবীর নিকট হইতে নিজের অভীষ্টবর লাভ করিয়া থাকে। সেখানে পুরাণপাঠ, বিশেষতঃ সারলাদাসের মহাভারত, চণ্ডীপাঠ, যাত্রা, মেলা সর্বদাই লাগিয়া থাকে। উৎকলে ঝঁকড়বাসিনী সারলাদেবী প্রসিদ্ধা।

যখন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীধামে আসেন, তখন ওড়িশার স্বাধীন রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। প্রভুর দিব্য অলৌকিক প্রেমে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ও বৈরাগ্য রাজাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি প্রভুর একান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। সেই সময় উৎকলের অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দিব্য সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। রায় রামানন্দ, শিখী মাইতি, তাঁহার ভগিনী মাধবী, ইঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। প্রভুর যে মধুর ভাব হইত তাঁহারা ইহার মর্ম বুঝিতে পারিতেন।

অচ্যুতানন্দদাস, বলরামদাস, অনন্তদাস, যশোবন্ত-দাস ও জগন্নাথদাস—ইঁহারা মহাপ্রভুর পঞ্চসখা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অচ্যুতানন্দ প্রধান কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জাতিতে গোপাল। তাঁহার পিতার নাম দীনবন্ধু খুন্টিয়া, মাতার নাম পদ্মাবতী। মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। স্বরচিত গ্রন্থে সুদামা বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ও পরে তিনি অনেকগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহাদের উপাধি প্রথমে খুন্টিয়া ছিল, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর দাস উপাধি হয়।

অচ্যুতানন্দের রচিত গ্রন্থ—জ্যোতিসংহিতা, অনাহত-সংহিতা, বীজ-সংহিতা, অনাকর-সংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ। তিনি নিজরচিত অনাকর সংহিতাতে স্বরচিত গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। ৩৬টি সংহিতা, ৭৮টি গীতা, ২৭টি হরিবংশাদি চরিত, ১২টি উপবংশ রচিত, পুরাণ মালিকা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

কেহ কেহ বলেন অচ্যুতানন্দ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে নিরাকার নির্গুণের বর্ণনা অধিক দেখা যায়; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার রচিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ ও বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণের উল্লেখ আছে। উৎকলের প্রত্যেক নরনারী তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন।

বলরামদাস—ইনি একজন ওড়িয়া সাহিত্যিক ছিলেন। ওড়িশা ভাষায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অতি সহজ সরল ওড়িশা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মহা উপকার করিয়াছেন। তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি যে বেদবেদান্ত-পারদর্শী ছিলেন ইহা সহজে বোঝা যায়। বলরামদাস মহাপ্রভুর ভক্ত পঞ্চসখার মধ্যে একজন। তিনি পরমভক্ত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, জগন্নাথ মহাপ্রভুর রথযাত্রা-সময়ে তিনি রথে উঠিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সেবকেরা তাঁহাকে তিরস্কার করে এবং রথে উঠিতে দেয় নাই। উহাতে বলরামদাস মনে আঘাত পান। বাঁকি মুহাণের নিকট আসিয়া বালির উপর পথ তৈরী করিয়া জগন্নাথদেবকে উহাতে বসাইয়া তিনি তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হন। এদিকে বড়দাণ্ডেতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ—সকলে জগন্নাথদেবের রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে, কিন্তু কোন প্রকারে আর রথ চলিতেছে না। পাণ্ডা, সেবক ও উচ্চকর্মচারীরা সকলেই হতাশ; রথ টানিবার আশা তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই চিন্তিত, প্রভু জগন্নাথের কাছে বোধ হয় কোন অপরাধ হইয়াছে; সেইজন্য রথ এমনভাবে অচল। রাত্রে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, সেবকেরা আমার ভক্তকে অপমান করিয়াছে, আমাকে বালিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি আর এ রথে নাই। যদি তুমি সসম্মানে আমার পরমভক্তকে আনিতে পার তবে আবার রথ চলিবে। স্বপ্নাদেশে রাজা পরদিন সম্মানের সহিত তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। ইহার পর রথ ভালভাবে চলিল।

বেদান্তসার, গুপ্তগীতা, বিরাট গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি সহজ সরল ওড়িশা ভাষায় প্রায় ২৮খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ, ব্রহ্মপুরাণ, কান্তকোইলি, লক্ষ্মীপুরাণ, ভাবসমুদ্র, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মাণ্ডভূগোল, শরীরভূগোল, ভগবদ্‌গীতা, গুপ্তগীতা, ছত্তিশগীতা, গরুড়গীতা, বিরাটগীতা প্রভৃতি। পাঠশালায় তাঁহার রচিত গান ছেলেরা গান করিয়া থাকে। বলরামদাস বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি পণ্ডিতদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থও রচনা করেন।

তাঁহার পিতার নাম সোমনাথ, মাতার নাম মনোমায়া। পিতা সোমনাথ ওড়িশা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তির অভাব ছিল না। বলরামদাস বিবাহিত, কিন্তু সারা জীবন ধর্মপ্রচারে ও গ্রন্থপ্রণয়নে রত ছিলেন।

অনন্তদাস—ইঁহার নাম অনন্ত মহান্তি। ইনি সন্ন্যাসী হওয়ার পরে দাস উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিও মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অন্যতম। ইঁহার পিতার নাম কপিল মহান্তি। ইনিও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—শূন্যনামভেদ, হেতু-উদয়, ভাগবত ইত্যাদি।

যশোবন্ত দাস মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে একজন। তিনিও ওড়িশা ভাষায় অনেক পারমার্থিক ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, যাহা অদ্যাবধি এদেশের নরনারীরা গান করিয়া থাকে।

জগন্নাথ দাস—ইনি উৎকলে সুপরিচিত। উৎকলের আবালবৃদ্ধবনিতা, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই তাঁহার রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। ওড়িয়া ভাগবত তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। সহজ সরল ওড়িয়া ভাষায় শাস্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। পুরী জেলার কপিলেশ্বর শাসন

তাঁহার জন্মস্থান। জগন্নাথ দাসের পিতার নাম নারায়ণ দাস, মাতার নাম পদ্মাবতী। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠে মনোযোগী হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব ছিল। সর্বদা ভাগবত-পাঠ ও ভগবানের গুণানুকীর্তনে রত থাকিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। পুত্র পাছে সন্ন্যাসী হইয়া যায় সেইজন্য বাল্যকালেই পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু জগন্নাথ দাস পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সংসারে আবদ্ধ হইতে চান নাই এবং পিতাকে বলেন: এ কার্য হইতে বিরত হউন, যে গুণের জন্য আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন, বিবাহ দিলে সে গুণ আমাতে দেখিবেন না। সংসারে আবদ্ধ হইলেই সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

তিনি বিবাহ না করিয়া সংসারত্যাগ পূর্বক পুরী জগন্নাথ ধামে চলিয়া আসেন। যে সময় চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে আসেন, তখন জগন্নাথ দাস পুরীধামে ভাগবত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেম ও ত্যাগ দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইলেন। সেইদিন হইতে জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গলাভে কখনও বঞ্চিত হন নাই। যতদিন মহাপ্রভু নীলাচলে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহার কাছেই অবস্থান করিতেন। প্রভুর জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। জগন্নাথ দাসের ত্যাগবৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে সম্মান করিতেন ও তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন সেই মঠ এখন ওড়িয়া মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জগন্নাথ দাসের রচিত ওড়িয়া ভাগবত প্রত্যেক গ্রামে পঠিত হয়, উৎকলের প্রত্যেক গ্রামে ভাগবতের মন্দির বা কোন নির্দিষ্ট ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা সারাদিন কাজকর্ম শেষ করিয়া রাত্রে সেই নির্দিষ্ট মন্দিরে বসিয়া ভাগবত-পাঠ ও আলোচনা করিয়া থাকে। অধিকাংশ বাড়ীতে ভাগবত গ্রন্থ পূজিত এবং ইহার পারায়ণ হয়। মুমূর্ষুর সদ্‌গতির জন্য ভাগবত পাঠ করিয়া শুনান হয়। পাঠশালায় বালকেরা ভাগবত পাঠ করিয়া থাকে। যে বালক ভাগবত পাঠ করিতে পারে তাহার বিদ্যা যথেষ্ট বলিয়া অভিভাবকেরা মনে করিয়া থাকেন। লোকের কথায় কথায় ভাগবতের উদাহরণ দেয় ও ইহার আবৃত্তি করিয়া থাকে। উৎকলের যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই ভাগবত গান হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য চাষীরা জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় ভাগবত গাহিতেছে। বালক পাঠশালায় ভাগবত পাঠ করিতেছে; ধনী, দরিদ্র সকলেই ভক্তিভরে ভাগবত গান করিতেছে। উৎকলের জনসাধারণের উপর ভাগবতের যথেষ্ট প্রভাব।

ভাগবত ব্যতীত আরো কতকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন—যথা গুপ্ত ভাগবত, দারুব্রহ্ম-গীতা, গজস্তুতি, তুলাভিণা মনশিক্ষা, রাসক্রীড়া।

পঞ্চদশ শতাব্দীকে উৎকলে পঞ্চসখার যুগ বলা হয়। পূর্বোক্ত পঞ্চসখাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যও অনেক। দীন কৃষ্ণদাস, সুদর্শন দাস, দিবাকর দাস, ঈশ্বর দাস, গোবিন্দশরণ দাস, বনমালী দাস, রামদাস প্রভৃতি ওড়িয়াতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উপেন্দ্র ভঞ্জ—ইনি প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে সম্রাট্‌ বলিয়া অভিহিত। ওড়িয়া কবিদিগের মধ্যে ইনি প্রধান। তাঁহার রচনাপ্রণালী ও নানাবিধ ছন্দের ব্যবহার বাস্তবিকই অতুলনীয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত লেখাকেই আদর করিতেন। প্রাকৃত ভাষায়

লিখিত গ্রন্থকে তাঁহারা গ্রাহের মধ্যেই আনিতেন না। তাঁহাদের গর্ব খর্ব করিবার জন্য উপেন্দ্র ভঞ্জ তাঁহার রচিত গ্রন্থে ওড়িয়া ভাষায় কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ এমন ব্যবহার করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন, তথাপি তাঁহার রচিত পদাবলী লোকেরা আবৃত্তি করে এবং কবি গায়কেরা গান করিয়া থাকেন। এক একটি পদের বত্রিশ প্রকার অর্থ। কবিরা তাঁহার রচিত পদাবলীর নানাপ্রকার অর্থ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

গোগজবাহন-ভোজন-ভক্ষভুদ্ভবপক্ষবিপক্ষজশত্রোঃ।
আসনবৈরীকৃতাসনা তুষ্টা মামিহ পাতু জগত্রয়ত্রষ্টা ॥

—গো অর্থাৎ ষণ্ডের উপরে যিনি গমন করেন তিনি গোগ—শিব, তাহা হইতে জাত গোগজ—কার্তিকেয়, তাঁহার বাহন - ময়ূর, তাহার ভোজন—পবন, উহা হইতে জাত হনুমান্—সে যাঁহার পক্ষে তিনি রাম, তাঁহার বিপক্ষ রাবণ, তাহা হইতে জন্ম যাহার—ইন্দ্রজিৎ, তাহার শত্রু ইন্দ্র, তাঁহার বাহন হাতী, তাহার বৈরী সিংহ, উহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন— দুর্গা, তিনি আমাকে রক্ষা করুন।

কবিতাতে এমন অক্ষরের নিয়ম অন্যত্র দেখা যায় না। উপেন্দ্র ভঞ্জ-রচিত 'বৈদেহীবিলাস' শ্রেষ্ঠ কাব্য। উহাতে তিনি সীতারামের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি বিশাল। কিন্তু এত বড় বিরাট গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কবিতার প্রত্যেক পদের আদ্য অক্ষর 'ব' রাখিয়াছেন। কবিতাতে যে সব ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন উহা মধ্যে মধ্যে দুর্বোধ্য ও অতি জটিল।

তিনি যে সব কাব্য রচনা করিয়াছেন, উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত—গীতিকা, পৌরাণিক কাব্য, কাল্পনিক কাব্য, আলঙ্কারিক কাব্য ও বিবিধ রচনা। সর্বশুদ্ধ তিনি ৬৮টি গ্রন্থ রচনা করেন।

উপেন্দ্র ভঞ্জ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ গঞ্জাম জেলান্তর্গত ঘুমুষর-এ করিতেন। ইঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ ভঞ্জ। তিনিও ঘুমুষরে রাজা ছিলেন। উপেন্দ্র ভঞ্জ রাজা হন নাই। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ; কিছুকাল পরে পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় তিনি সমস্ত মনপ্রাণ সাহিত্য-রচনায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক আরো অনেক কবি উৎকলে জন্ম গ্রহণ করেন ; যথা—ঘন ভঞ্জ, নীলাম্বর ভঞ্জ, গোপাল, ভূপতি পণ্ডিত ইত্যাদি। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিশ্বনাথ খুন্টিয়া, কৃষ্ণ-সিংহ, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণের উড়িয়া ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া অমর হইয়াছেন।

কবিসূর্য বলদেব রথ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে কিশোরচন্দ্রানন্দ-চম্পূ এবং ওড়িয়াতে চন্দ্রকলাকাব্য রচনা করেন। তাঁহার এই পুস্তক উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এর পাঠ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফকিরমোহন সেনাপতি, মধুসূদন রাও, শ্রীরামশঙ্কর রায়, গঙ্গাধর মেহের ও রাধানাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ওড়িয়া ভাষায় পদ্যে গদ্যে বহুবিধ পুস্তক রচনা করিয়া ওড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

হণ্টর সাহেব বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ওড়িয়া ইতিহাস রচনা করেন। উহাতে তিনি ৭৯ জন প্রধান কবি ও সাহিত্যিকের নাম দিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থগুলি বর্তমানে কতক ছাপা হইয়াছে, আরো অসংখ্য পুঁথি তালপাতায় লিখিত আকারে রহিয়াছে।

প্রাচীন উৎকলের সাধক, ভক্ত ও সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধদেবের নিরাকার নির্বাণ—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা, সীতারামের গুণাবলী, প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জগন্নাথদেবের মহিমাবর্ণন করাও হইয়াছে। সর্বত্রই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য পরিস্ফুট।

জগন্নাথদেবে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি যাবতীয় অবতারেরও আরোপ করা হইয়াছে।

এই উৎকল দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া কথিত। প্রাচীনকাল হইতে এখানে বহু ভক্ত, সাধক, সিদ্ধ-পুরুষ বসবাস করিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কি বেদান্তী, কি বৈষ্ণব, সকলেই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর এখানে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবাহ দেখা দেয়। জৈনদিগের প্রভাব যে এখানে কম ছিল তাহা বলা চলে না। বর্তমানে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি উহার নিদর্শন। খণ্ডগিরি জৈনদের, উদয়গিরি বৌদ্ধদের। উৎকলের সম্রাট খারবেল প্রথমে জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

একসময়ে এখানে যে বেদান্তের ডিণ্ডিম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিদর্শন শঙ্করাচার্যের গোবর্ধন মঠ। এতদ্ব্যতীত শৈব এবং শাক্তেরও ইহা লীলাভূমি ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরসমূহ দেখিলে তাহা মনে হয়। সর্বোপরি ভাগবত ধর্মের ত কথাই নাই। মহাপ্রভুর ওড়িশা আসার পূর্বেও ছিল, পরেও তাহার বিস্তার হইয়াছিল।

উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের সময় জগন্নাথদেব বুদ্ধ, বেদান্তের প্রাধান্যসময়ে জগন্নাথদেব নিরাকার নির্গুণ দারুব্রহ্ম। রামানুজের সময় তিনি নারায়ণ, বৈষ্ণবদের সময় রাধাকৃষ্ণ এবং শৈবদের সময় শিব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই শ্রীজগন্নাথ বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের প্রাচীনতা-বিষয়ে ঋগ্বেদে দারুব্রহ্মের কথা আছে:

'আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্
তদালভস্ব দুর্দানোতেন যাহি পরমস্থলম্'।

দারুময়-পুরুষোত্তমাখ্য দেবতার উপাসনা করিলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়—ইহা সায়ণাচার্য তাঁহার ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে নিম্নলিখিতরূপে পুরুষোত্তমের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার পরে বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভো! প্রাণীদিগের মোক্ষের উপায় কি?' তখন বিষ্ণু বলেন 'আমি নিজে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নীলগিরিতে নীলমাধবরূপে বিরাজ করিব, যাহারা আমাকে দর্শন করিবে তাহারা মুক্ত হইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে যমের আর অধিকার থাকিবে না।' সকলেই মুক্ত হইলে যমের অধিকার থাকিবে কি প্রকারে? যম এই কথা নিবেদন করায় বিষ্ণু বলেন, 'আমি কিছুকাল পরে অন্তর্ধান করিলেও এ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবে না এবং যমের অধিকারও এখানে থাকিবে না।'

সত্যযুগে সূর্যবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক রাজা অবন্তীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, শাস্ত্রজ্ঞ, আচারনিষ্ঠ এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য রাজা ব্যাকুল হন। একজন তীর্থপর্যটক তপস্বী আসিয়া রাজাকে বলেন, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান পুরুষোত্তম বিরাজমান, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজের পুরোহিত বিদ্যাপতিকে পাঠাইলেন উৎকলে অনুসন্ধান করিবার জন্য। তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া এক শবরপল্লীতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বিশ্বাবসুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বিদ্যাপতি বলেন, আমি না যাওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন উপবাসী থাকিবেন। নীলমাধবকে যাহাতে আমি দর্শন করিয়া শীঘ্র ফিরিতে পারি উহার ব্যবস্থা করুন। বিদ্যাপতির নিকট রাজার ঐরূপ ভক্তি ও ব্যাকুলতা শ্রবণ করিয়া শবররাজের করুণা হইল। তখন সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তিনি বিদ্যাপতির হাত ধরিয়া এক সংকীর্ণ পথ দিয়া নীলগিরির উপরে

অবস্থিত নীলমাধবকে দর্শন করাইলেন। তিনি দর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ইতোমধ্যে নীলমাধবমূর্তি বালুকারাশি দ্বারা প্রোথিত হইল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব-মূর্তি দর্শনলালসায় কালবিলম্ব না করিয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। কত পর্বত পাহাড় নদনদী অতিক্রম করিতে হইল। ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, দেহের কষ্টবোধ নাই ; স্বয়ং ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা, একমাত্র তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই অনুধ্যান ! পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের অনতিদূরে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র নারদ রাজাকে সংবাদ দিলেন, নীলমাধব অন্তর্হিত হইয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার আর দর্শন ঘটিবে না। এই নিদারুণ বাক্যশ্রবণ করিয়া রাজা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। এত আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া গেল, তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি ধৈর্যহারা হইবেন না, অচিরে স্বয়ং ভগবান চতুর্ধা প্রকট হইবেন ; তখন তাঁহাকে আপনি দর্শন করিতে পারিবেন। ঋষির বাক্যে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং কি উপায়ে দর্শন করা যায় তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদের পরামর্শে রাজা গুড়িচা বাটীর নিকট প্রথম নৃসিংহমূর্তি স্থাপন করেন। পরে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞসমাপনে অবভৃত স্নান করিতে হয় ; সেজন্য সমুদ্রের ধারে স্নানাগার নির্মিত হইল। স্নানাগারের নিকটে সমুদ্রের উপর ভাসমান চারিশাখাযুক্ত এক বৃক্ষ দেখিয়া রাজা নারদকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ঋষি বলেন—ইনি শ্বেতদ্বীপবাসী বিষ্ণু। ইনি বৃক্ষদেহ ধারণ করিয়াছেন। এই বিষ্ণুরূপী বৃক্ষ আনিয়া মূর্তি গঠন কর। রাজা মহাসমারোহের সহিত বৃক্ষ আনিলেন। মূর্তিগঠন-সম্বন্ধে দেবর্ষির সহিত পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল—এই বৃদ্ধ বার্ধকী যাইতেছেন, ইনি মূর্তি গঠন করিবেন।

গঠনকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাহিরে নানারূপ বাদ্যের ব্যবস্থা কর, কারণ এই গঠন ধ্বনি যদি কেহ শ্রবণ করে তাহা হইলে সে বধির বা অন্ধ হইয়া যাইবে। সেজন্য এই বৃদ্ধ বার্ধকীকে মণ্ডপের ঘরে প্রবেশ করাইয়া পনর দিন বন্ধ রাখিবে। তাঁহার কার্য কেহ যেন না দেখে, অথবা কেহ যেন মণ্ডপে প্রবেশ না করে। দেখিলে মহাবিপদ উপস্থিত হইবে।

দৈববাণী-অনুযায়ী রাজা বৃদ্ধ বার্ধকীকে মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহিরে নানারূপ বাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন, পনরদিনের পর দ্বার খুলিয়া দেওয়ায় দেখা গেল বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সুদর্শন চতুর্ধামূর্তি গঠিত হইয়াছে এবং সেই বৃদ্ধ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। রাজা এই চারিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্দির নির্মাণ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। মন্দির-নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে ব্রহ্মা আসিয়া উহাতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মা মন্দির ও মূর্তিচতুষ্টয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করেন—বৈশাখ শুক্লা অষ্টমীদিনে।

পুরুষসূক্তে জগন্নাথ, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে বলভদ্র এবং দেবীসূক্তে সুভদ্রা পূজিতা হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণেও মোটামুটি ঐরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে সামান্য কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

শূদ্রমুনি সারদাদাস-লিখিত মহাভারতে জগন্নাথ-দেবের বর্ণনা নিম্নোক্ত প্রকারে আছে :

দ্বাপরযুগের শেষে যখন যদুবংশ ধ্বংস হইল এবং জারাশবর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিতেই শ্রীকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দেহের সৎকার করিবার জন্য অর্জুন ব্যাকুল হইলেন। জারাশবর অগুরু কাষ্ঠ আনিবার জন্য বনে গেলেন। বনের মধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও অগুরু বৃক্ষ পাইলেন না। অগুরু বৃক্ষ দ্বারা বন পরিপূর্ণ থাকিলেও সেদিন তাঁহার দৃষ্টিতে একটিও পড়িল না। অর্জুনকে ঐকথা জানাইলে

তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীর-সংকার হইল না বলিয়া ভাবিয়া আকুল হইলেন। পুনরায় খুঁজিতে খুঁজিতে অদূরে একটি অগুরু বৃক্ষ দেখা গেল। সেই বৃক্ষ কাটিয়া আনিলেন। শব দাহ করিবার জন্য উহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। অগুরু বৃক্ষ শেষ হইল, কিন্তু শব দগ্ধ হইল না! অর্জুন শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দৈববাণী হইল, এই শব অগ্নিতে পুড়িবে না। এই দেহ নীল সুন্দর পর্বতে থাকিয়া পূজা পাইবে। তুমি অগ্নি নির্বাপন করিয়া এই দেহকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দাও।

সেই দেহে আগুন ধরায় দুই হাত, দুই পদ, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তক পুড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ধড়টি দগ্ধ হইল না। সেইটি অর্জুন সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। ইহাই দারুমূর্তি জগন্নাথ। সারদাদাসের মহাভারতেও অন্যান্য পুরাণাদির ন্যায় ইন্দ্রদ্যুম্ন, গালমাধব, জায়াশবরের নাম উল্লেখ আছে।

উৎকলীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে নানা তত্ত্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেহ ত্রিমূর্তিকে প্রণবরূপী অ-কার, উ-কার, ম-কার; কেহ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; কে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু; কেহ বা রাম, কৃষ্ণ; কেহ বা জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম এবং সুদর্শনকে প্রদ্যুম্নাদি চতুর্ব্যূহরূপে অথবা চার বেদরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

কানিংহাম প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা পূর্বোক্ত ত্রিমূর্তিকে বুদ্ধদেবের ত্রিরত্ন-ত্রিমূর্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে (যামলে) বিমলাদেবী ভৈরবী এবং জগন্নাথ ভৈরব বলিয়া বর্ণিত। যথা:

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা চ মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

উৎকলে শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম এই চারিটি ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। নীলাচল বা পুরী শংখ, ভুবনেশ্বর চক্র, যাজপুর গদা, কোনার্ক পদ্মক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত। বিষ্ণু গয়াসুরকে নিহত করিবার পরে তাঁহার হস্তস্থিত শংখ, চক্র, গদা ও পদ্মকে পূর্বোক্ত চারিটি স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই হেতু স্থানগুলি ঐ সকল নামে পরিচিত।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান,
বিপুল-বিত্ত লুকায়ে কোথায়—দীপ্র বিবস্বান!
দিলে তুমি অধিকার,—
অবদান করুণার
স্ফুরিত বিভব নিশীথ-বংশী—তুলিলে অতুল তান,
অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান।

জানি নি জীবনে র'য়েছে ঘিরিয়া সকল সুদূরতম,
মানি বিস্ময় নিহারি' গহনে সহসা পরমরম।
যায় দূরে আবরণ
এ কী সুধা আহরণ,
আঁধার গভীরে এ কী উদয়ের প্রদীপ্তি অম্লান,
অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান।

সুচির মেঘের অন্তরালের বন্ধন করি' ক্ষয়
আনিলে মুক্ত ঊষা-অঙ্গনে সবিতা জ্যোতির্ময়।
সুগোপন-সম্বিতে
জাগে তব ইঙ্গিতে,
বহিলে তটিনী মরু-অন্তরে মুখরিয়া কলগান,
অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান।

সুখের সন্ধানে

বেলা দে

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব-কাল থেকে মানুষ সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ চিরকাল বলে আসছে যে সুখ পৃথিবীতে নেই, যদিও থাকে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পৃথিবী মানুষের কান্নায় ভরা। মানুষ বলে ভগবান মানুষের অদৃষ্টে সুখ লেখেন নি, দুঃখই লিখেছেন। তাই মানুষ চিরকার দুঃখের কান্নাই কাঁদছে! ধর্মযাজকেরা সর্বদেশে সর্বসময়ে বলে থাকেন যে পৃথিবীতে সুখ নেই, সুখ স্বর্গে—এ জন্মে সুখ নেই, সুখ মৃত্যুর পর পরলোকে। এ পৃথিবীতে সুখ নেই। যাঁরা ধর্মযাজক নন, এমনি আমাদের মত মানুষ, তাঁরা সুখ খুঁজে বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুখ কোন স্থানে বা কোনো জিনিসে লুকানো আছে। কিন্তু প্রকৃত কথাটা কি? সুখ কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে নেই? কবি বলেছেন "তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" তাই মনে হয় এই সামান্য কথাটি একটি অতি বড় দার্শনিক সত্য, যার ওপরে ভিত্তি করে এই গোটা জগৎটাই দাঁড়িয়ে আছে। এ জগতে সুখের প্রত্যাশী সবাই আমরা, কিন্তু সুখী আর কয়জনে? তবু সুখ যদি জীবনে নাও পেয়ে থাকি, অন্ততঃ সুখের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এ বিশ্বাসটা থাকলেও আমাদের খুব বড় একটি তৃপ্তি থাকে। সে যে কত বড় তৃপ্তি তা শুধু সেই জানে সব সুখের আশা যার ঘুচে গেছে। সুখের আশা আমাদের জীবনের মূল উৎস। সুখী হবো বলেই আমরা বড় হতে চাই, বিদ্বান হতে চাই, অর্থ চাই, প্রেম চাই, জীবনে মহৎ আদর্শের প্রেরণা ও পরিণতি চাই। এ সংসারে কি এমন আছে যা আমরা চাই কিন্তু সুখের জন্য চাই না? যখন আপাতদৃষ্টিতে আমাদের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের বস্তুকে বিসর্জন দিয়ে অপ্রিয় নীরস হলেও মঙ্গলকে বেছে নিই তখনো আমরা আমাদের সুখবোধের তৃপ্তিকেই পরিতৃপ্ত করি। আমাদের সেই ত্যাগের দুঃখদহন অশ্রুঢাকা আগুনজ্বালা কষ্টবোধকে লঙ্ঘন করে কোথা থেকে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হতে থাকে একটা সূক্ষ্ম অমৃতময় সুখের বোধ, যা আমাদের সব দুঃখকষ্ট সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি দেয়। সুখ পাব এই ভরসাই তো আমাদের সমস্ত কর্মের উৎস, আমাদের জীবনের মূলভিত্তি। কিন্তু সেই সুখ বস্তুটি কি, যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবকে এমন করে টেনে নিয়ে সংসারের ঘানিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা তো সহজ কথা নয়! মানুষের মনে তখন কত প্রশ্নই ভিড় করে। কোনটা সত্যি সুখ—happiness না pleasure? মনের আনন্দমিশ্রিত তৃপ্তিঢালা প্রাণ শীতল করা সুখ, না শরীর ও বাইরের মনের ক্ষণিক সুখ? কিন্তু জগতে সত্যি শ্রেয় এবং প্রেয় এর মধ্যে কাকে বলব? যে সুখ রক্তের অণুপরমাণুতে শিরায় শিরায় আগুন জ্বেলে মনকে মাতাল করে তোলে, সমস্ত বিশ্বজগৎ এক অদ্ভুত তীব্র আনন্দের নেশায় গলিয়ে মিশিয়ে এক করে দেয়, তার আকর্ষণী শক্তি মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু এই অপরূপ রূপ আর ঐশ্বর্যে টলটল রক্তরাঙ্গা শতদল চোখে দেখেও মানুষের মন কি এক অদম্য টানে টানতে থাকে স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত, শ্বেত শতদলের মত রিক্ততার ঐশ্বর্যে গৌরবময় সুখের আর একটি মূর্ত্তির দিকে। সেখানে সমস্ত জীবন অঞ্জলি দিয়ে নিজেকে বিকিয়ে দেবার সুখের লোভে মন বার বার ভিখারী হয়ে ওঠে। অথচ মানুষ জানে আর তার অন্তরনিবাসী

বিধাতাও জানেন, যতক্ষণ কি সে সত্যিকার চায় তা নির্ধারিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সুখের সন্ধানে পাগলের মত ছুটে বেড়ালেও সুখলাভ তার ভাগ্যে কিছুতেই নেই। মনের ভেতর যে মন রয়েছে আমাদের সে সত্যিকারের জহুরী, তার নিক্তির মাপ নির্ভুল। নিজেকে সে কিছুতেই ঠকাতে দেবে না। বাইরের জগৎ কত ঐশ্বর্যের ডালি সাজিয়ে আমাদের সামনে প্রতিক্ষণ তুলে ধরছে। গ্রহণ করা বা উপেক্ষা করা সে আমাদের হাত। কিন্তু সুখবোধ করা না করার শক্তিটা তো মনের। তাকে জোর করে কোনো পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় নিজেকে চিনতে ভুল ক'রে কাম্যসুখ বেছে নিতে ভুল করে ফেলা। তাই সব চেয়ে বড় কথা—সুখ অকৃত্রিমতায়, নিজেকে না ভোলানোয় নিজের কাছে নিজে খাঁটি থাকায়। তাহলে জীবনে অনুতাপ আসবে না, ভুল করলেও সে ভুল সত্যের দিকে আমাদের অগ্রসর করে নিয়ে যাবে। নিজেকে চেনার পথ সহজ হবে, আর সেই চিনতে পারাতেই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। ভেতর বার প্লাবিত করে দিয়ে কোথা থেকে আসবে একটা অপূর্ব পরিতৃপ্তি যাতে মনে হবে আর ভয় নেই—ঠিক স্থানটিতে এবার পৌঁছে যাওয়া গেছে, দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ নেই। তরী মুখ ফিরিয়েছে বন্দরের দিকে, নাবিক ফিরবে গৃহে, শিকারী ফিরবে শিকার সন্ধান সমাপ্ত করে। অন্তর আর বহির্জীবন কোণায় কোণায় মিশে গেছে, উদ্ধত হয়ে কোন কোণ আর জেগে নেই। এই পরিতৃপ্তি-বোধই কাম্য সুখলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

অমৃতের পুত্র আমি, সুন্দরের দৃপ্ত উপাসনা,
জীবনে-মরণে আমি অনন্তের নিত্য পরিচয়,
কত যুগ যুগান্তের বেদনার তপ্ত অশ্রু-কণা,—
পথভ্রষ্ট অমর্ত্যের—ধরিত্রীর অসীম বিস্ময় !

আপনার গতিবেগ উদ্দাম-উৎসাহ পেল কবে,
যাত্রা মোর কবে সেই আদিম প্রভাতে হেথা সুরু,
শিরায় শিরায় মত্ত রক্তধারা নৃত্যের উৎসবে,
মুহূর্ত ফুটিল সেই মৃদু মন্দ বক্ষে দুরু দুরু।

প্রথম সে দৃষ্টিপথে প্রবাহিত বোধশক্তিধারা,
প্রথম সে জাগরণে কি আনন্দ অন্তরে অন্তরে !
ফিরিয়া পেলাম শেষ বাক্স্ফূর্তি আমি বাক্যহারা,
এলো কত স্নেহ-প্রীতি, দুঃখ-সুখপ্রবাহ মন্থরে।

শিখিলাম বনে বনে ধনুর্বাণ ধনুতে যোজনা,
জীবন-সংগ্রামে হাতে ধরিলাম অসি আর মসী,
তাম্র ও প্রস্তর যুগে করিলাম বস্তুর ভজনা,
সোঽহং মন্ত্রপূত টানিলাম ওঁ ব্রহ্ম-রশ্মি।

অন্তহীন যজ্ঞধূমে প্রধূমিত করিনু আকাশ,
জীবনের শিক্ষাকল্পে খুলি হৃদি পৃথিবীর বুকে,
ধর্ম-মোক্ষ-কামপথে ধরিত্রীর সার্থক প্রকাশ,
দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম তাই মোর ফেরে মুখে মুখে।

সাধনার শেষ নাই—শেষ নাই তবু জীবনের,
মৃত্যু মোর মৃত্যু নয়, জীবনের সে ত পরাগতি,
ক্ষণিক বিশ্রাম তরে আসা-যাওয়া শুধু ক্ষণিকের,
সমুদ্রের নীলে যথা জলবিন্দু মেশে নিরবধি।

জীবনের জয়গানে আজি তাই প্লাবি দিগন্তর,
বঙ্কিম-সরল গতি মৃদু-মন্দ চলিয়াছি ছুটি',
চলনে বিরাম নাহি, ক্ষান্ত নহে অভিযান মোর,
অশান্ত-চঞ্চল কভু অমৃতের তরে ঝরি-ফুটি।

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

একদিন বেলুড় মঠের বর্তমান মন্দিরের পূর্বদিকে মাঠে আমরা ভাঁটুই তুলছি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন কাজ বিশেষ এগোয়নি, কেবল গল্পই চলছে। তিনি আমাদের কাজে যোগ দিয়ে বল্লেন, "স্বামীজী আমাদের একবার লিখেছিলেন, 'কূর্মস্তারকাচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। তোমরা ত দেখছি চোরকাঁটাগুলোও তুলতে পার না।" একবার আমি যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) প্রভৃতি নানান রকমে ভুগছি। স্বামীজী লিখলেন, 'ওদের ঐ সব দীনা হীনা ভাবের জন্যই এত ভোগে। ক্ষীণাঃ স্মো দীনাঃ—এ সব দেহাত্মবাদ। আত্মার আবার ব্যাধি কি! আমি দীনহীন এই সব নাস্তিক মত আত্মাকে ছোট করে দেয়। রোজ একঘণ্টা কোরে ধ্যান করা উচিত যে, আমি আত্মা অজর অমর অভয়।' আমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান আমার আবার ব্যাধি কি! ভয় কি! এই সব। নাস্তি ভাবটা স্বামীজী একেবারে সহ্য করতে পারতেন না—'জানি না', 'পারি না', 'কি জানি', 'কি দরকার'—ইত্যাদি এ সব কথা শুনলে তিনি জ্বলে যেতেন। ঠাকুর গাইতেন, 'মা আমি কি আটাসে ছেলে আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।'" বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে ওজস্বিতার সহিত তাঁর দণ্ডটি হাতে কোরে বলতে লাগলেন, "ঠাকুর গাইতেন, কী বীর ভাব! কী তেজ!—

মন কেনরে ভাবিস এত।
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
তুই কি ক'রস কালের ভয় হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত।
মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত॥ ইত্যাদি

"দীন হীন ভাব, মন্দ বৈরাগ্য এ সব ঠাকুরও একেবারে পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'রোক চাই', 'ভক্তির তমো ভাল', 'ডাকাতে ভক্তি জোর কোরে আদায় কোরে নেয়'। দাঁড়িয়ে তাল ঠুকে গাইতেন—'আয় মা সাধন সমরে'—সে কী বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তি, ঠিক যেন বোধ হতো যেন সাক্ষাৎ জগদম্বা সামনে দাঁড়িয়ে, আর তিনি তাঁকে সমরে আহ্বান করছেন—

আয় মা সাধন সমরে।
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি দিব্য পুণ্য রথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসে আছি ধরে॥
এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন।
আমার রসনা ঝঙ্কারে তারানাম হুংকারে কার সাধ্য আমার সনে রণ॥

বারে বারে তুমি দৈত্যরণজয়ী, এবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ি।
দ্বিজ রসিকচন্দ্র বলে মা তোমারি বলে জিনিব আমি তোমারে॥

"মাতৃভাবের এ একটা লক্ষণ, ছোট ছেলে জিনিস না পেলে মাকে মারে, ঝগড়া করে, জোর কোরে কেড়ে নেয়, মা মুখে শাসন করে, কিন্তু ভেতরে আনন্দ। আর চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। শুধু কৃত কর্মের অনুশোচনা কোরে কোন লাভ নেই। শুধু হায়! হায়! আমি মহা পাপী! এ সব তমোগুণের লক্ষণ। একজন পুত্র শোকে কাতর হয়ে অনুশোচনা করছে, দেখেই মালকোঁচা মেরে হুহুংকার করে গান ধরলেন—

'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তূণ রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান কোরে॥
আর এক যুক্তি, চাইনা রথ রথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥

"সরল ও বিশ্বাসী হলে তিনি মহাপাতকীকেও স্থান দিতেন। একজনের খাবার থেকে তুলে খেলেন, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'মশাই করেন কি! করেন কি! আমি অখাদ্য খেয়েছি!' বললেন 'তা হোক তুমি সরল, সব খাদ্যই পঞ্চভূতে তৈরী।' পাপীদের তিনি 'পাপী পাপী' করতেন না এবং তারাও নিজেদের 'পাপী পাপী' বলে, এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের উৎসাহ দেবার জন্য গাইতেন—

'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করি॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥
(যদি দুর্গা দুর্গা বলে মরি)।' "

এই সবগান গাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুকরণ করে হাত, পা চোখ নেড়ে নানান্ রকমে ঠাকুরের হাবভাব দেখাতেন। খুব উচ্চস্তর থেকে একজন পরমহংসের সহিত কিরূপ অদ্ভুত ভাবে কথাবার্তা হয়, তাও অনেকবার দেখাতেন। বলতেন, সে ভাষা সাধারণের বোঝবার উপায় নেই। লোকে অবাক হয়ে ভয়ে বিস্ময়ে শুনত।" এরই নাম লীলানুকরণ, যা ভক্তির সাধন, ব্রজ-গোপীদের ভেতর দেখা যেত।

* * * *

স্বামী প্রেমানন্দজী ধর্ম সম্বন্ধে এক একদিন এক একটি অদ্ভুত সংজ্ঞা দিতেন। একদিন নিমগাছ তলায়, ঠিক ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের সামনে (তখনও মন্দির হয় নি ; ওখানে আম, গুলচি এবং কলকে ফুলের গাছের বেশ ঘন ছায়া) বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, (তখন বেলা প্রায় ৮৷৯টা ভাদ্র মাস, ১৯১৪) "ধর্ম কি জানিস্? যখন মানুষ সংসারের ঝালাপালায় বিরক্ত হয়ে পরমানন্দে বিশ্রাম করবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম। মানুষকে সেই পরমানন্দ পেতে হলে জাগতিক

লাভ লোকসান ভুলতে হবে, থাকবে শুধু অহেতুকী ভালবাসা সেই সত্যং শিবং পরমপ্রেমাস্পদের প্রতি। এ ছাড়া ধর্মসম্বন্ধীয় আর যা কিছু জানবি সব সাংসারিক নানান রকমের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা। তবে ঠাকুর একটু নেমে প্রাকৃত লোকদের জন্য বলতেন, 'খাদ নইলে গড়ন হয় না'—শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম সাধারণের পক্ষে নেওয়া বড় কঠিন।"

আর একদিন বল্লেন, "ধর্ম জিনিসটা কি জানিস? যা শক্তিপ্রদ, দেহে ও মনে বল সঞ্চার ক'রে। যখন মানুষ বুঝতে পারে, আত্মা অবিনাশী, সুখ দুঃখ মানাপমান আকাশে ধূলোর মত আসে যায় তখনই মানুষ নির্ভীক হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে, 'আমি রামদাস, তখনই সে সত্য ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। 'আমি রামদাস', 'আমি শুদ্ধসত্ত্ব, অবিনাশী আত্মা' এইটে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী মনমুখ এক ক'রে কাজ করার নামই ধর্ম। এই ধর্ম না থাকলেই মানুষ উঠতে বসতে কেবল ভয়ে মরে;—দেহকষ্টের ভয়, লোকের কথার ভয়, মানাপমানের ভয়। কিসের ভয়! অসত্যের সঙ্গে কখনও compromise (আপোষ) করা চলে না। দলের ভয়? ঠাকুর বলতেন, গেঁড়ে ডোবায় দল বাঁধে। অসত্য দল জিতলেও পরিণামে তাদের নরক, আত্মার অধোগতি; সত্যের জন্য পরাজয় ও লাঞ্ছনাও মানুষকে কত বড় করে দেয়, কত শক্তিই না তার ভেতর স্ফুরিত হয়। এইটে জানবি, মনে রাখবি।"

সব পেয়েছি'র স্বপ্ন

কানাই সামন্ত

স্বভাবে ফিরে আত্মদর্শনই মানবজীবনের সুচির-বাঞ্ছিত আদর্শ। স্বভাব জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চ, জীবনযজ্ঞের বেদী, চিরদিন স্বভাবই জীবধাত্রী। মানবজীবন ভাগবত জীবনেরই ভূমিকা। মানুষের আত্মপরিচয়ের সম্পূর্ণতা থেকেই ভাগবত সত্তার পরিচয়ও সহজ এবং সম্ভবপর।

মানুষের অন্ন, বেশ, বাস, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, আচার, উৎসব, ধ্যানধারণা, কৃষি, বাণিজ্য, বিচার-ব্যবস্থা এমনকি সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি— সবই আজ যুগসন্ধিক্ষণে অভাবনীয় রূপান্তর অভিমুখে চলেছে। ভাবুকের মানস আকাশে আজ যা স্বপ্নরূপে বিলসিত কাল তাই বাস্তব সত্য হয়ে মানুষের মুখোমুখী হয়ে যে দাঁড়াবে না কে জানে?

জীবজগতে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে জীবনসংগ্রাম। এতদিনে সময় হল মানুষ প্রবর্তন করবে জীবনলীলা অর্থাৎ, এতদিন বিরোধের দ্বারাই সংসার যাত্রা চলছিল, এখন চলবে মৈত্রী ও প্রীতির দ্বারা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি মিলিত হোক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মিলন হোক; সেই অশেষ মিলনে প্রেমের বা আনন্দেরই গৌরব পরম ও চরম। প্রেম বা আনন্দের চেয়ে বল নেই, নব যুগের এই নূতন বেদ।

ব্যক্তি সমস্ত সমাজের জন্য, সমস্ত সমাজ ব্যক্তির জন্য। প্রেমের বা আনন্দের রহস্য এই যে দেওয়া-নেওয়ার প্রভেদ নেই; এমনকি সব দেওয়াই সব চেয়ে বেশি ক'রে পাওয়া। ঐশ্বর্য বাড়ে কেবল আনন্দের বাণিজ্যে। ব্যক্তি আনন্দে জ্ঞানে শক্তিতে

বা শ্রমে যা কিছু অর্জন করে, উৎপাদন করে, নিঃশেষে সব সমাজকেই দান করুক, আর আপন দেহমনবুদ্ধির বিকাশের প্রয়োজনে, আনন্দের প্রয়োজনে যা কিছু অপরিহার্য সবই সে অনায়াসে ও অবাধে গ্রহণ করুক নিখিল সমাজ থেকে। অন্ন, পরিচ্ছদ, আবাস, বিলাসের ও বিকাশের করণ-উপকরণ, কিছুই কোনো ব্যক্তির জন্য সঞ্চিত হওয়ার ঔচিত্য কোথায়? ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে কিছুই নেই, অথচ প্রতি ব্যক্তি সমস্ত সমাজের ধনে ধনী। স্বভাবের অপরিসীম ঐশ্বর্য সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও অভাব কেবল মানুষের লোভ মোহ অহমিকা প্রভৃতি অন্ধ প্রবৃত্তিরাজির জন্য, সঞ্চয়ের জন্য। জড়বস্তু স্তূপীকৃত করতে গিয়েই মানুষ আজ এই মনুষ্যসমাজে আপনার ও পরের সকল অশান্তি আর অসুবিধা ঘটায়।

দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন, যে বস্তু একজন সঞ্চিত করলে অপরজন বঞ্চিত হয় মানুষের কোনই কল্যাণ নেই তাতে; কিন্তু একজনের যে সম্পদ স্বতঃই অন্যজনকে সমৃদ্ধি দান করে তা থেকেই মানুষের অশেষ কল্যাণ ঘটে। পরিমিত জড়বস্তুর বেলাতেই সঞ্চয় ও বঞ্চনা অবিচ্ছেদ্য, এককালীন। অপরিমিত চিদ্‌বস্তুর বেলায় যা গ্রহণ তাই দান; সঞ্চিত হওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ, সঞ্চারিত হওয়াই তার প্রকৃতি। অতঃপর বলাই বাহুল্য, কিরূপ সঞ্চয়-প্রবৃত্তি থেকে সমাজে সকল অশান্তি ও অসুখের উদ্ভব আর কোন্ সঞ্চয়েই বা আশা ও আহ্লাদ ভিন্ন আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

ভাবী আনন্দিত ও মুক্ত মানবসমাজ স্বভাবের বনে প্রান্তরে গিরিতটে নদীতটেই গড়ে উঠবে। গ্রামে বা নগরে মানুষের যে ঘরবাড়ি এখন দেখা যায় তা স্বভাবের সুষমাময় রূপের ছন্দে কিছুমাত্র মেলে না। কেবলমাত্র বিরল মঠে মন্দিরে, কুঁড়েঘরখানিতে, নদীবক্ষের নৌকাটিতে মানুষের দৃষ্টির ও দরদের অল্প-স্বল্প পরিচয় পাই; স্বভাবের সৃষ্টি আর মানুষের নির্মিতি কিছু যেন আত্মীয়ের সত্যে মিলেছে, মিশেছে। বনের গাছপালা, পাহাড়ের চূড়া, সমুদ্রের ঢেউ, প্রান্তরের অবাধ প্রসার, এসবের সঙ্গে মানুষের আপন বাসগৃহের ভাবভঙ্গী ও আকৃতি মিলিয়ে নেওয়া কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য নয়; সে দৃষ্টি চাই, সে বোধ চাই, সে ইচ্ছা চাই কেবল। আর গৃহ আঁকড়ে পড়ে থাকবার জিনিসও নয়। জীবনের বেশির ভাগ কাটুক নীলাকাশের তলে, অরণ্যের ছায়ায়, সরিৎসিন্ধুর আন্দোলনে, পাহাড় পর্বতের সানু-উপসানুতে। গৃহ, পথ, উভয়কে নিয়েই মানুষের জীবনযাত্রা। বহু যুগ ধরে মানুষ পথের চেয়ে গৃহকেই বেশী আপনার ব'লে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছে। এখন গৃহ পথ তুল্যমূল্য ব'লে কেন, মানুষ গৃহের তুলনায় পথকে বরং অমূল্য ব'লেই বরণ করবে, করতে চলেছে, এই আমাদের বিশ্বাস। প্রকৃতির রূপরাজির সঙ্গে মিলিয়ে কোনো মানুষ বা কয়েক জন মানবমানবী যে বাসগৃহ গড়ে তুলল তাতে রইল বাসিন্দা জনের করের স্পর্শ, হৃদয়ের স্পর্শ। তবু পাখির সঙ্গে তার খড়কুটার বাসাখানির যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে তার স্বরচিত বাসগৃহেরও সেই একই সম্বন্ধ। হয়তো বা তার চেয়ে বেশি বন্ধনহীন সম্বন্ধ। যখন খুশি ঘরে এল, যে খুশি ঘরে এল, যেদিন খুশি গৃহকে পিছনে ফেলে দিগন্তরে দেশান্তরে চলে গেল অচেনা-অজানার আহ্বানে। নানা মানুষের রচিত নানাবিধ আলয় বা নিবাসমন্দির, স্বাভাবিক গুহাগৃহ, তরুতলবাস, পথে পথে, পদে পদে। দেশে দেশেই মানুষের সমাজ। কোথাও কারও যাওয়া-আসার, অর্থাৎ ঘরবাঁধার বা 'ঘরের লোক' হওয়ার, পথ খোঁজার বা পথের সঙ্গী হওয়ার কোনো বাধা নেই।

পথ—বাঁধা পথ শুধু নয়। পায়ে চলার পথ, আবার চিহ্নহীন অপূর্ব পথ। আজকের রাজপথকে অরাজক পথ বলাই উচিত; সেখানে প্রতিনিয়ত গতি-উন্মাদ ধনীর রথচক্রে দরিদ্র নরনারী ও নিরীহ

শিশুকে বলি দেওয়া হয়। রেলপথ তেমনি। বিজ্ঞানের প্রসাদে আকাশে যে বিমানপথের ব্যবস্থা হচ্ছে সেও কম বিপজ্জনক ও প্রাণস্পর্শহীন নয়। এ সবেই শক্তির পরিচয় আছে। কিন্তু সুষমার অবকাশ নেই। অথচ স্বভাবের সর্বত্র দেখি শক্তিকে সুষমারূপে প্রকাশের অপরূপ কৌশল। যন্ত্র যতক্ষণ সুন্দর হয়ে উঠল না, আর শক্তির মদে মানুষের প্রাণবলি দাবি করতে থাকল নানাভাবে, যন্ত্রকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে চলাই ভালো—নয়তো যন্ত্রকে ভেঙে নূতন করে সৃষ্টি করতে হয় নূতন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে। সৃষ্টির মানেই হল শক্তিতে ও সুষমায়, সত্য ও সুখে একান্ত মিলন। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির পরিণামে মানুষ সুন্দর অথচ শক্তিমান দুটি যন্ত্রের ডানা তৈরি ক'রে আকাশপারাবারের স্বচ্ছন্দচারী বিহঙ্গের মতো পারাপার করতে পারবে না কেন তা তো বুঝতে পারিনে।

মানুষের অশন-বসনের জটিলতা দূরীকৃত হয়ে সেও সহজ শোভন হওয়া দরকার। গ্রীক পুরাণে বলে প্রমীথ্‌স মানুষকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছেন ব'লে জিউসের আদেশে হিংস্র শ্যেনেরা তাঁর অন্ত্রতন্ত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। প্রমীথ্‌স কি সমষ্টিমানবেরই প্রতীক বা প্রতিভূ? অন্নপাকের জন্য অগ্নির যে ব্যবহার তার ফলে মানুষ অন্ত্র-তন্ত্রের নানা জটিল ও মারাত্মক রোগে ভুগে থাকে এ কথা সত্য। আর, অনেক যুগে, অনেক দেশে, নারীজীবনের প্রধান সার্থকতা হয়ে পড়েছে রন্ধন ও পরিবেশন; 'রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা' কলুর বলদের মতো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হয়ে তার শরীর-মনের বিশেষ বিকাশ-সাধনের অবকাশ অতি দুর্লভ। শারীরিক গঠন ও সহজ প্রবৃত্তি-অনুযায়ী মানুষকে মাংসাশী প্রাণী বলা চলে না; ফলমূলভোজী অন্যান্য প্রাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষের শারীরিক ও নৈতিক উভয়বিধ কল্যাণই আশা করা যায়। স্বাভাবিক জীবনে মানুষের পরিধানটিও বিরল ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু সব সময় বসন-ভূষণের অভাবকেই অলজ্জ্য বিধিও বলা যায় না। শুধু বলা যায়, প্রকৃতির বৈদ্যুতিক স্পর্শেই প্রাণ থেকে প্রাণ সঞ্চারিত হয়; সুতরাং সর্ব অঙ্গে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে, সর্ব মনে মানুষ সেই স্পর্শের বুভুক্ষু থাকবে, সেই স্পর্শেই সুখী হবে। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝখানে—সত্যকার কোনো বাধা বা ব্যবধান থাকবে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নব নব পরিচয়ে মানবসভ্যতা নব নব সমৃদ্ধি লাভ করবে।

নিখিল পরিবর্তনপ্রবাহে মানুষের চারিত্র বা নীতি কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। নীতি-শাস্ত্রের দশ বা দশ শত বিধিনিষেধের স্থানে একটি বিধিই চিরস্মর্তব্য মনে হয়: To thy own self be true. অর্থাৎ, আত্মাই কবির মতো সতত সকল চেষ্টার সলীল ছন্দ রচনা করুন। মানুষ নিজের বাসনা ও অহম্‌ নিরাকৃত করলেই ছন্দপতনের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যথার্থ বিচিত্রতা এ সংসারে কী বা দেখা যায়, জটিলতার তবু অন্ত নেই। গুরু পুরোহিত রাজা শাস্ত্র ও লোকাচার মিলে গ্রন্থী যত খোলে ততই নূতন গ্রন্থি বেঁধে যায়। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ শতগুণে বিচিত্র হোক এবং সে সম্বন্ধ বাসনা ও অহমিকার বদলে আনন্দ ও চৈতন্যে ভ'রে ভ'রে উঠে, সম্যক্‌ বন্ধন নয়, সম্যক্‌ মুক্তি হয়ে উঠুক, যার-পর-নেই সরল ও গভীর হোক।

সাম্যবাদ বা সমূহবাদ (Socialism, Communism) যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করে তা বাইরের প্রতীক, বাইরের আয়োজন। আর, ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদ যে চিত্তশুদ্ধির আদর্শ প্রচার করে তা আন্তরিক সত্য, আন্তরিক হেতু। বাহিরের আয়োজন ও ভিতরের সত্য এরা পরস্পরের অপেক্ষা রাখে; পরস্পর সহযোগিতা থেকেই মানুষের জীবনে ভাবান্তর ও রূপান্তর এনে দিতে সমর্থ। সমূহবাদ জোর দিয়ে বলতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই; অধ্যাত্মবাদ

ততোধিক জোর দিয়ে বলুক, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নেই। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলনের ঐশ্বর্য হবে অজস্র। বাসনা-পরিহারের পরিণামে মানুষ বাঁধন থেকে পিছোয় না, মুক্তি থেকেও পিছোয় না, ভোগ থেকে পিছোয় না, ত্যাগ বা কর্তব্য থেকেও পিছোয় না; কিছুই তার সন্তর্পণে লুকোনো থাকে না, সবই প্রকাশধর্ম বরণ করে।

সৃষ্টির ভিতরে মানুষের স্বতন্ত্র সৃষ্ট হচ্ছে কাব্য-কলা। কাব্যকলার শৈশবে গিরিগুহার অরণ্যে পল্লীতে ছড়ায় ও ছবিতে কোথাও স্রষ্টা বলে মানুষ-বিশেষের কোনো পরিচয় নেই। সে সবই মানব-সাধারণের সম্মিলিত প্রাণ থেকে, প্রেরণা থেকে বিকাশ পেয়েছে। তার পর বহু শতাব্দী ধরে কাব্যে কলায় সৃষ্টিতে এক-একজন মানুষ নিজের পরিচয়, এক-একজন মানুষ নিজের নামের মুদ্রাঙ্কন দিয়ে গেছে; যেন বা সত্যই তা একটি মাত্র মানুষের রচনা! ধনী, বিলাসী, বিদ্বান্, এঁরা প্রধানতঃ আপন আপন ভোগ-দখলে লাগিয়েছেন তা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে; যেন তা সত্যই ভাগ ক'রে ভোগ করা যায়। কবিতায় ছবিতে নাচে গানে যে মানুষ সৃষ্টি করে সে জানুক নিজে সে স্রষ্টা নয়, স্রষ্টার প্রতিনিধি—পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই স্রষ্টা চৈতন্যময় সর্বগত এক সত্তা ও সর্বমানব। কবি বা শিল্পীর তাই কোনোরূপ অভিমান নেই, অক্ষয় আনন্দ আছে। আবার এক-একজন বিচ্ছিন্ন মানবকেই যে শিল্পসৃষ্টির উপলক্ষ্য হতে হবে তারও কোনো মানে নেই। ব্যষ্টির মতো সমষ্টিও আপন অন্তর-উৎস থেকে রসসৃষ্টির ধারা উৎসারিত করে দেবে না কেন? স্বভাবের মুক্ত অঙ্গনে উৎসবমিলিত নরনারী সকলে মিলে বিনা আয়াসে যা রচনা করবে বিনা অভ্যাসে তারই অভিনয় করবে; বাইরে থেকে কোনো কবি চিত্রকর গায়ক বা গুণীকে আহ্বান অপরিহার্য হবে না। আর, এই রচনা কখনো লিপিবদ্ধ হবে না হয়তো, বিধিবদ্ধ হবে না; যে ইচ্ছা বা যে আনন্দ থেকে এই কলাসৃষ্টির উদ্ভব তার নেই সঞ্চয়, তার নেই ক্ষয়। সঞ্চয় তেমনি আবশ্যিক নয় ব্যষ্টির রচনার; ক্ষয় নেই ব্যষ্টি রচয়িতারও ইচ্ছায়, আনন্দে। এই যে আমরা এত আয়াস ক'রে, পদে পদে এত সংস্কার ক'রে কবিতা বা ছবি বা মূর্তি রচনা করে, তবু নিজের রচনাতে নিজে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারি নে, তার কারণ আর কিছুই নয়—রচয়িতার অভিমান রচনা নিয়ে আমাদের সহজে খুশি হতে দেয় না, তা ছাড়া আন্তরিক ভাব অনুভূতি ও বাহ্যিক প্রকাশ উভয়ের মাঝখানে ভুল অভ্যাস, ভুল উপলব্ধি ও ভ্রান্ত জ্ঞানের বহু আবরণ ও বহু বাধা রচনাকে সহজেই সুন্দর হতে দেয় না, খুঁত লেগেই থাকে। চিত্তশুদ্ধির ফলে স্রষ্টার অন্তর থেকে সব বাধা, সব আবরণ অপসারিত হলে আর সমাজশুদ্ধির ফলে সামাজিকেরা সার্থক সৃষ্টিকে বরণ করে নিতে সদাই উদ্‌যুক্ত থাকলে মানুষের আশ্চর্য রচনা সব আশ্চর্য-ভাবেই সহজ হবে; তারপর নিজের স্বাধীন জীবন নিজেই যাপন করবে। কবি জর্জ রাশেল বলেন, সত্যকার সমষ্টিজীবনের অসদ্ভাবে এ যুগে মহাকাব্য সম্ভব হল না, হবারও নয়। কিন্তু আমাদের ধ্যানের ভুবনে এমন কি খণ্ড কবিতা-গানগুলিও ভিতরে ভিতরে এমন অটুট ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে থাকবে তাতেই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত নিখিল মানবের মহাজীবন প্রতিভাসিত হবে। অনেক কবিপ্রাণকে অথবা সমস্ত জাতির প্রাণকে সবলে আকর্ষণ করে নূতন নূতন মহাকাব্যের সম্ভাবনাও স্বপ্ন নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ সার্থকতা কী? অধুনা আমরা 'বিজ্ঞান' কথাটি এক অর্থে ব্যবহার করছি, আর প্রাচীন ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। এই শব্দটির পৃথক ব্যবহার থেকেই প্রাচীন সংস্কৃতির ও আধুনিক সভ্যতার মর্মগত পার্থক্য ধরা যায়। প্রাচীনেরা জীবনের সর্ববিষয়ে

সর্বস্তরে চলেছিলেন অন্বয়ের মুখে; ধ্যানে প্রথমেই সমগ্রকে ধারণা করা তাঁদের জ্ঞানের মার্গ ছিল। আধুনিক চলেছে বিশ্লেষণের মুখে, প্রথমেই বিচার ক'রে, বিতর্ক ক'রে, ভগ্নাংশকেও ভাগ ক'রে ক'রে; পরে সেই অংশগুলিকে পুনরায় একত্র ক'রে পূর্ণকে অবধারণ করবার ক্লেশসাধ্য অথচ ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়। প্রাচীন ঋষি বুঝতেন পূর্ণকে ধ্যানের দ্বারা ধারণা করাই জ্ঞানলাভের প্রথম ও শেষ কথা; অশেষ বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ কেবল মাঝখানে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অন্য ভাবে জ্ঞানের সাধনা ক'রে অবশেষে আভাসে ইশারায় বুঝেছেন—অথবা আজও বোঝেন নি কি?—সমগ্রের সঙ্গেই জীবের প্রাণ-বাণিজ্য; অতএব সমগ্রকে দেখাই, সমগ্রকে উপলব্ধি করাই জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজন; প্রাণহীন খণ্ডগুলির যোগে অখণ্ডের কাঠামো একটি পেলেও তার বিশাল প্রাণ পাই না, কাজেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রবল সাক্ষ্য অস্বীকার ক'রেও বলতে হয় যে অখণ্ড তার খণ্ডগুলির যোগফলের একান্তই অতীত। ছায়া ও কায়া এক নয়। কাজেই দেখি প্রাচীন বিজ্ঞান অতি অন্তরঙ্গ অপরোক্ষানুভূতি; আর আজও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মুখ্য প্রমাণ বাইরে, অধিকাংশ উপায় ও অবলম্বন বাহিরেই। মানুষ আজ বিজ্ঞানবলে বাহ্য জগৎকে জয় করতে গিয়ে ক্রমশঃ জ্ঞানে বিশ্বাসে ব্যবহারে চেষ্টায় বাহ্য জগতের ক্রীতদাস হয়ে পড়ছে। ধ্যানের অভ্যাসে ও প্রতিভার প্রেরণে মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাসের একান্ত পরনির্ভরতা ও জড়দাসত্ব মোচন করা প্রয়োজন। যন্ত্রকে যন্ত্রের স্থানে রেখে মানুষের চিন্তায় চেষ্টায় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা আসুক। বর্তমান যুগে যান্ত্রিকতার বাহুল্যে জীবনে শিল্পকারুর স্থান নেই বড় একটা; বড়বাড়ি, তৈজসপত্রে দরদের ও হাতের নিপুণ স্পর্শের অভাব হয়েছে, সৌন্দর্য ও বিচিত্রতাও বিরল। ফলে, শিল্পকলা মানুষের চিত্তবৃত্তি ও আচার-আচরণের যেভাবে সুন্দর বিকাশ ও সমূহ উৎকর্ষ সাধন করে তা থেকে মানবসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে। অতিরিক্ত যান্ত্রিকতার আর এক অশুভ পরিণাম, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যন্ত্র করে তুলেছে। মানুষের জন্য যন্ত্র না হয়ে যন্ত্রের জন্যই মানুষের মরণ-বাঁচন এর চেয়ে অস্বাভাবিক ও নির্মম নিয়তি আর কিছুই হতে পারে না। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি হলে শক্তিলাভে ও প্রয়োজনপূরণে মানুষের কল্যাণ হয় সন্দেহ নেই। যন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়া চাই। কিন্তু, সর্বাগ্রে মানুষ মানুষ হোক; মানুষ দেবতা হোক; মানবসাধারণ যন্ত্রের বশীভূত না হয়ে যন্ত্রই মানবসাধারণের সম্পূর্ণ বশে আসুক। বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন করে হীনসংখ্য শ্রেণীর নিরর্থক মুনফার আশায় আর মুষ্টিমেয় মানুষের শাসনাধীনে অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ সাধন সংগত হয় না। বিরল ক্ষেত্রে কল-কারখানার প্রয়োজন থাক্; আর অনেক মানুষের একই কাজে একত্র মিলিত হওয়ার এখন বিশেষ মূল্য আছে, ভবিষ্যতেও কিছু হয়ত থাকবে। কিন্তু, বিজ্ঞান যেন প্রত্যেক মানুষের হাতে হাতে কার্যোপযোগী নব নব যন্ত্র তুলে দেয়, মানুষ যেন কলের কাছে হৃদয়-দরদের ও হাতের নিপুণতার যে চমৎকারিত্ব তা আশা না করে এবং ইচ্ছা হলেই যন্ত্র তুলে নেয় আর ইচ্ছা হলেই তা সরিয়ে রেখে দশ আঙুলের লীলায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। কাজের বাহ্যিক দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে বলে কাজের সারল্য প্রয়োজন। শ্রম প্রত্যেক মানুষের করণীয়। বিনা শ্রমে কোনো সুস্থ দেহীর জীবিকায় অধিকার নেই। মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সেই শ্রমে নিযুক্ত থাকুক; একা একা নিযুক্ত থাকলেই বা ক্ষতি কি? যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে ও আনন্দে মিলতে পারে তাদের যন্ত্রদানবের তামসিক উপাসনায় মিলতে হয় না।

আপন আপন যথার্থ পরিচয় পেলে বিজ্ঞান ও কবিতাকলা পরস্পরের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উচিয়ে রাখবে না; ভাই-ভগিনীর মতোই মিলিত হতে বাধ্য। সমগ্রকে ধ্যানের দ্বারা জানা বিজ্ঞানের

উদ্দেশ্য। সমগ্রকে প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা ও মুক্তি দেওয়া কবিতাকলা বা জীবনেরও অভিলাষ। জ্ঞানযোগে আর প্রেমযোগে একই তীর্থদেবতার পদতলে উপনীত হওয়া যায়। বিতর্ক কোথা থেকে? তা ছাড়া, জ্ঞানেও প্রেম থাকে, প্রেমেও জ্ঞান না থাকলে অশেষ লীলার যে অপরিসীম মুক্তি তা তো মেলে না।

বলপ্রয়োগ এবং শাসনের উপর যা দাঁড়িয়ে আছে তাই রাষ্ট্র। ইচ্ছায়, আনন্দে, সর্বসাধারণ প্রয়োজনের সম্মিলিত বোধ থেকে যে সমবায় সংস্থিতি সেই হল সমাজ।

নিখিল মানবজাতিকে নিয়ে নিখিল মানবসমাজ, এক মানবপরিবার। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন প্রতিভা, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, পৃথিবীব্যাপী সবেরই স্থান আছে। কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে নয়, পরস্পর মিলিত হয়ে। এক পরিবারের অন্তর্গত স্ত্রীপুরুষ যখন পরস্পরকে লক্ষ্য করে অহর্নিশ ছোরা শানায় না বা বন্দুকে গুলি ভরে রাখে না, তখন উৎকট ভয়ে বা উৎকটতর লোভে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ বা জাতিগুলি সর্বদা রণসাজে সজ্জিত থাকবে, এক শ্রেণীর মানুষকে হত্যার যন্ত্র করে রাখবে, জাতীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের অর্ধেকের এইভাবে অপব্যয় করবে, মনের শান্তি বা প্রাণের প্রীতি কী জিনিষ জাতিগত ভাবে স্বপ্নেও তা জানবে না, এর চেয়ে অকল্যাণকর অস্বাভাবিকতা আর কী হতে পারে? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন প্রীতিসম্বন্ধ, জাতিতে জাতিতে তেমনি হওয়াই তো শোভন ও সংগত। ভাবী যুগে সকল মানুষের অন্তর থেকে হিংসা ভয় লোভ দূরে গিয়ে সহযোগিতা সাহস মৈত্রী বিরাজ করবে; ফলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ও যুদ্ধসজ্জার সমস্ত জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে। মানুষের যা কিছু দুর্বল মনোবৃত্তি তা থেকেই যুদ্ধাদির উদ্ভব এবং মনুষ্যত্বকে অঙ্গহীন ও দুর্বল করেই যুদ্ধের সৈনিক তৈরি হয়ে থাকে ভবিষ্যতের মানুষ স্বভাবসবল সর্বাঙ্গীণ বললাভই সর্বাঙ্গীণ জীবনলীলার সাধন সব জাতি ও সব সমাজ যদি দেহ প্রাণ হৃদয় বুদ্ধি ও চেতনার স্বাভাবিক বলে বলীয়ান হন, তবে জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, মিলন ও মিশ্রণের ফলে সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতি বৈ অবনতি হবে না এবং একই মানবধর্মের অন্তর্গত বিবিধ মানবসংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ হতে থাকবে।

কবে গো!

ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু, স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় মানুষ তপস্যায় প্রবৃত্ত না হলে, সাধনায় উদ্‌যুক্ত না হলে। স্বপ্ন আর সাধনা এক নয়। স্বপ্ন যেন ফুল—আকাশ ও ধরণীর, স্বর্গ ও মর্ত্যের, সত্য ও বাস্তবের, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝখানে খুসি হয়ে ফুটে উঠেছে। উভয়ের মিলনস্থল সে; উভয় ভুবন উভয় কাল থেকে মধুপগুলিকে গন্ধবেদন পাঠিয়ে ডেকে আনাই তার কাজ। পরে যখন মধুপপঙক্তির আনাগোনায় ফুলের গোপন ফল জাগতে থাকে তখন দলে দলে শেষ হাসি হেসে দীর্ণ হয়ে কীর্ণ হয়ে পথগুলিকে বিচিত্র করাই তার ভাগ্য। স্বপ্ন দিয়ে বেশী কিছু সম্ভব হয় না, অথচ সবকিছুরই সূচনা হয়। ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে যদি মানুষের মনের মতো করে গড়তে হয় তবে সভাসমিতি বিধিব্যবস্থা যন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা কিছুতেই তা সম্ভব হবে না; যেটি মনের মতো তারই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মানুষের সব মনটি বদলে ফেলা চাই। খুব সংক্ষেপে বলি, সাধনায় মানুষ যদি বিশ্বের সর্বভূতে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরে সর্বভূতকে দেখতে শেখে, আপনাতে নিখিল ও নিখিলেশ্বরকে আর ঈশ্বরসনাথ নিখিলে আপনাকে লাভ করে, তবেই সকল অসম্ভব স্বপ্ন সম্ভব হবে, মর্ত্যজীবনই দেবজীবনে উত্তীর্ণ হবার শেষ সোপান হয়ে উঠবে।

চাওয়া-পাওয়া

(এক)

শ্রীমতী পুষ্প বসু

তোমার মাঝে হারিয়ে ফেলা,
সেই ত আমার চাওয়া।
তোমার পথে এগিয়ে চলা,
সেই ত আমার যাওয়া ॥
তোমার দান দুঃখ বেদন,
সেই ত আমার সওয়া।
তোমার সাধ রিক্ত-জীবন,
সেই ত আমার বওয়া ॥
তোমার কাছে হৃদয় বলি,
সেই ত আমার দেওয়া।
তোমার পায়ে প্রণাম করি,
সেই ত আমার পাওয়া ॥

(দুই)

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

যেথা কিছু নাই
সেথা তোমা পাই
তুমি তাই তুমি তাই গো ;
যেথা সব আছে
তুমি তার মাঝে
আঁখি মেলে যেথা চাই গো
রূপে ও অরূপে
তুমি চুপে চুপে
রহ আপনায় মগ্ন,
তবু আমি আমি
কেন দিবা যামী
দিয়েছো মায়ার স্বপ্ন ?

হারা গান

‘বৈভব’

হয়ত বা এ জীবনে
হবে নাকো শেষ—
হয়ত রহিয়া যাবে
ক্ষীণ তার রেশ !
জীবনে জীবনে পুন
উঠিবে বাজি
সে দিনের প্রিয় গান
স্বপ্ন আজি !
কত শত গান মোর
জাগালো পরাণ
জ্বালায়ে চলিয়া গেল
সুদূরের টান,

সে দিনের হারা গান
উঠিবে জাগি
কবে মোর পরাণের
মুক্তি লাগি ?
কত শত হারা গান
আকুলে বাজে—
সুদূরের অতীতের
জীবন মাঝে,—
তারা কিগো আসিবে না
হৃদয়ে ফিরে—
আঁধারে লুকালো যারা
আকাশে ধীরে ?

রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

বেদান্ত তন্ত্র পুরাণাদি গ্রন্থে বহু তত্ত্ব কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে—কিন্তু সেগুলি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করেন এমন ভক্ত সাধকের সংখ্যা অল্প। সাধক রামপ্রসাদ একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যখন তিনি স্বগৃহে বসিয়া ভজনপূজন করিতেন। তিনি তখনই সাধনায় ডুবিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই মায়াপাশে বাঁধা থাকার দরুন (মায়াপাশে আছি ঘেরা)। এইরূপ পাশ ছেদন করা, বন্ধন ছিন্ন করা বীরের যথার্থ কার্য। যাঁহারা এ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহারাই 'বীরাচারী'।

প্রসাদ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী স্তরবিভাগ-অনুসারে আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে প্রশস্ততর মার্গ অবলম্বন করিয়া, সকল কর্তব্য সমাধা করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। আমাদের গৌরবময় অধ্যাত্মভ্রমণপথের স্তরবিভাগ সাধারণভাবে এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরা। প্রসাদের পক্ষে প্রযোজ্য প্রথমের অন্তর্গত বাহ্য পূজা, অন্তরে মুণ্ডমালী-দর্শন, কল্পবৃক্ষতলে দেবীদর্শন ও শবসাধনা; দ্বিতীয়—অন্তর্মার্গাদি, ষট্চক্রসাধনা প্রভৃতি, ষড়রিপুর বিদায় (গানে—মনরসনা কালীর নামে দল বাঁধিয়াছে, ষড়রিপু ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে), মহাপুরশ্চরণ মন-রসনা ও আমিত্ব বা অহঙ্কার-ত্যাগ (ঘর ভেদি যে দুজন ছিল—মন ও রসনা—তাদের পরাজয় করেছি; ডঙ্কা মেরে বসে আছি); তৃতীয়—যোগসূচনা, ব্রহ্ম-সাধনা। রামপ্রসাদ পরমব্রহ্মের মাতৃভাবের সাধনা করিয়াছিলেন—"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীকে স্থানে স্থানে এলোকেশী আখ্যা দিয়াছেন। পরমকারণ স্বপ্রকাশ পরমশিব (পরমব্রহ্ম) স্বয়ং অগণিত বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন যে শক্তির দ্বারা তাহারই নাম এলোকেশী। শিব দ্রষ্টা, শক্তি দৃশ্য; শিব স্থির, শক্তি চঞ্চলা; উভয়যোগে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিব-শক্তির আকর্ষণ-বিক্ষেপণের যোগা-যোগের ফল, চৈতন্যের সান্নিধ্যে চঞ্চলার চাঞ্চল্যের ফল। নৃত্যপরায়ণা চঞ্চলা ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভ্রান্তি মায়া মোহ উৎপাদন করিতেছেন, প্রাণপুরুষ পরাণপুতলী শিবকে অন্তরালে রাখিয়াছেন। এই অদ্বিতীয় মহাশক্তির প্রভাব ঐ যোগাযোগের প্রবর্তক ও নিয়ামক, অনাদিকাল হইতে অনাগত চির ভবিষ্যৎ এই শক্তির অধীন। রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী ঐ মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী এলোকেশী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে অভিধেয় বিভিন্ন শক্তির মাঝে (বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা) ষড়রিপু মন· রসনা অহঙ্কারের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া উহাদের কেন্দ্রস্বরূপ সনাতনী জ্যোতির্ময়ী আদ্যাশক্তি এলোকেশীর দিব্য সৌম্যমূর্তি রামপ্রসাদ দেখিয়া-ছিলেন। করালবদনা কালীমূর্তির মধ্যে নিহিত তিনি অনন্ত স্নেহমণ্ডিত জননীর সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এতটাই আপন করিয়া লইতে পারিয়া-ছিলেন যে, যাবতীয় প্রসাদী রচনা (গান) এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। প্রসাদের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত যে বিরাগের সুর তাহা বিরাগ নহে,

অনুরাগের ছদ্মরূপ "অভয় পাবার আশে।" সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার শেষ সম্বল 'ঝুলি কাঁথা'—তাহাও বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তুত। ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া আকুলভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়াছিলেন—"ঠাঁই দে মা তোর চরণতলে।" এই কান্না থামিয়াছিল যখন স্নেহময়ী জননী আপন ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

দুঃসহ দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও রামপ্রসাদ দৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন, "সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন! সুখের আশে বড় কসা।" প্রসাদ ঐ দয়ালাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিয়াছেন, "আমি কি দুঃখেরে ডরাই। * * * দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই।" দুঃখের মাঝে তিনি জননীর উপর রাগ-অভিমান যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমুদায় মায়ের দুরন্ত, আদুরে ছেলের কথা। নতুবা আবার কেন অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিবেন—

"পুরাও মনস্কাম, জপি তারানাম,
তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভববন্ধন কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥"

রামপ্রসাদ অরণ্যে রোদন করেন নাই। এই সকল উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাস্তব সংসারের যাবতীয় কথা-ব্যথা অভাব-অভিযোগ তৎসমুদয় ব্রহ্মময়ী জগন্মাতাতে নিজ গর্ভধারিণীর মত আপনি করিয়া লইয়া নিজ সংসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়াছেন—"ওমা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে। ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥" আরও লক্ষ্য করিতে হইবে গানগুলি হইতে যে তিনি আধ্যাত্মিক জগৎকে অতি বাস্তবের সহিত একাকার করিয়া দিয়াছিলেন, নিসর্গকে ঘরোয়া করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন একমাত্র মায়ামোহ-বিরহিত বিশ্বাস-ভক্তিপ্রধান নির্ভরশীলতার বলে—"মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত, দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, তুমি কি ছাড়া জগৎ॥" মায়ের সাড়া না পাইয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়া বলিলেন—

"কেন মিছে মা মা কর, মা কি আর আছে ভাই।
থাকলে আসি দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই॥"

কে তাঁহার ইষ্টদেবীকে বলিতে পারেন—"গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছ কালী"—(পুং কালা, স্ত্রীং কালী)।

প্রসাদের গানগুলির পর্যালোচনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে শাস্ত্রের উপদেশ ও শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দার্শনিক উক্তির আপন কর্মজাত জ্ঞানের সহিত সমন্বয় করিয়া গানে তাহার রূপ দিয়াছেন। যে কোন বস্তু-সামগ্রী প্রসাদের দৃষ্টিতে পড়িত, যে কোন দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে আসিত, সংসার বা সমাজের যে কোন ঘটনা তিনি লক্ষ্য করিতেন, তখনই উহা উপলক্ষ্য করিয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেন; উহাদের মধ্যে অধ্যাত্ম-বিষয়বস্তু যথেষ্ট ভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়। নদীবক্ষে ভাসমান তরী দেখিয়া নদী বা ভবসাগরকে সংসার ও জীবনকে তরী বলিয়াছেন, দাঁড়িমাঝির স্থানে মনমাঝি কর্ণধার ও "দাঁড়ি রিপু ছয় জন।" কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া মানবদেহকে জমীনের সহিত তুলনা করিলেন—

"দেহজমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তায় সকল চষি,
হৃদয়মধ্যেতে আছে পাপরূপ তৃণরাশি॥"

পুনরায় বলিলেন—"মনরে কৃষিকাজ জান না। এমন মানবজমি রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।" ওঝা ব্যাধ প্রভৃতিও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—

"মনরে তোর বুদ্ধি একি।
ও তুই সাপধরা জ্ঞান না শিখিয়ে তালাস করে
বেড়াস ফাঁকি।
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মনরে ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে
নাকি।
জাতি ধর্ম সর্পখেলা, এই মন্ত্রে করো না হেলা। * *
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায় তার চেয়ে কে অবোধ
ধরায়॥"
প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকতে শিখে রাখি॥

জেলের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে, ভবে আবার কি হইবে গো মা। পালাবার পথ নাইকো জলে পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে। রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥" দোল ও চড়ক উৎসবের দুটি গান সর্বজনবিদিত, (কুমারহট্ট গ্রামে দোল ও চড়কপূজা বহুদিন হইতে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শিবের গলিতে অদ্যাপি চড়কপূজা হইয়া থাকে)। তদ্ভিন্ন আদালত, কলুর বলদ, দাবা, পাশা, ঘুড়ি, ডাণ্ডাগুলিও উল্লেখযোগ্য (কবাটি ও মার্বেল খেলা হয়ত তখনও প্রচলিত হয় নাই)। এই সমুদয় হইতে রামপ্রসাদ শিক্ষা সংগ্রহ করিতেন ও গানের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন; যেমন—

"তনুর তরী ভবের চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে
বেয়ে চলে যারে রে॥"

বাহ্যতঃ সংসারসমাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের সমক্ষে তিনি দায়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ইষ্টদেবীর উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে তৃতীয় ব্যক্তির মত উপলক্ষ্যমাত্র থাকিয়া মায়ের আদেশ-নির্দেশ পালন করিতেন—"তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।"

কোন বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান ছিল না, তিনি "উপলক্ষ্যমাত্র, মায়াপাশে ঘেরা।" চাকরি করিয়াছেন, চাষ-আবাদ করেন নাই তাহাও নহে, আবার কাব্যাদি রচনাও করিয়াছেন, পরন্তু এ সমুদয় মায়ার কার্য—"মায়ার এ পরম কৌতুক। মায়া বদ্ধজনে ধাবতি, আবদ্ধজনে লুটে সুখ।" কিন্তু সাধনমার্গে কিছু অগ্রসর হইয়া যখন বুঝিয়াছিলেন যে মায়ার অধীনে থাকিয়া তাঁহার পরাগতি লাভ হইবে না, তখনই কালীনাম-তীক্ষ্ণখড়্গে মায়াপাশ কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি মুক্ত, পুনরায় চাকরি প্রভৃতি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হন নাই, সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনায়াসেই বলিতে পারিয়াছিলেন—

"তুমি পরের আশা আর করো না।
* * সুদিন দেখে অধীন জনে
করবে কত উপাসনা।
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে
সেদিন অধীন কেউ রবে না॥"

তিনি কর্মকে জয় করিয়াছিলেন কর্মের ভিতর দিয়া, সংসার ও ধর্মসাধনা এই উভয় ক্ষেত্রেই। কোন কিছুতেই কোন দিন তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না একমাত্র জননীর চরণকমল লাভ ব্যতিরেকে—"কাজ কি মা সামান্য ধনে। * * আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ও চরণে॥" রাজসম্মান-প্রলোভনাদিও উপেক্ষা করিয়া প্রসাদ দিন কাটাইয়াছিলেন 'হয়ে কালীর শরণাগত॥'

রামপ্রসাদ কর্মকে হেয়জ্ঞান করেন নাই, পক্ষান্তরে শ্রেয় বলিয়াছেন—"কর্মে কেন হওরে চাষা।" চাষা অশিক্ষিত, চলিত কথায় বোকা। সংসারপালন ও ধর্মসাধনা উভয় পক্ষেই এই উক্তি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে "মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা" এ বাক্যও স্পষ্ট বোঝা যাইবে। এ সম্পর্কে "প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চল রে।" নতুবা "কালের

বশে কাজ হারালে * * * আমশী থাবে আম ফুরালে।” কাল আলস্য, জড়তা। ধর্মসাধনা-সম্বন্ধে জোর দিয়াই বলিয়াছেন—“তনুর তরী ভবের চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে। যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥” এখানে গুরু শব্দের ব্যবহার হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অশিক্ষিতের পক্ষে ধর্ম ও কর্মসাধনা-সংক্রান্ত উভয়বিধ শিক্ষা-গ্রহণের এবং ‘বাদাম দিয়ে’ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। “তুমি দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও” বাক্যের ‘দমসামর্থ্য’ শিক্ষা ও অভ্যাসের কথা। নচেৎ “অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে উভয়েতে কূপে পড়ে। কর্মীকে কি কর্ম ছাড়ে তার কি প্রসঙ্গ॥” ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহযুক্ত জীবকে কর্ম করিতেই হইবে এবং “যার যেম্নি কর্ম তেম্নি ফল” নিশ্চিত থাকায় ইন্দ্রিয়াদি সুনিয়ন্ত্রিত ও অনুষ্ঠানাদি-সম্পর্কে সতর্কতার আবশ্যকতা আছে, কেন না “ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার।” ইহাও ঠিক যে “কর্মসূত্রে যা আছে কেবা পাবে তার বাড়া॥” অতএব ইহাও অভিপ্রেত যে, সংসার-সমাজ ও ধর্মসাধনা উভয় পক্ষেই বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন। রামপ্রসাদ সকল রকম কর্মেরই শুদ্ধতা রক্ষার পরামর্শ দিয়া কপটাচারের নিন্দা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, “ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা।” কিন্তু “যখন দণ্ডপাণি লবে টেনে কি করবে ও বাবাজী” তখন “(ওরে) কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে?” সুতরাং কপটতা ত্যাগ কর। তিনি স্বভাবতঃ স্পষ্টবক্তা ছিলেন, তাঁহার কথা হইল “লোকে মন্দ বলে বলবে তায় কিরে তোর বয়ে গেল। আছে ভাল মন্দ দুটা কথা যা ভাল তাই করা ভাল।” ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই রকম ভালমন্দ-বিচারের সময় তিনি কোন দিক উপেক্ষা করেন নাই। স্বয়ং উপলক্ষ্যমাত্র হইয়া অকপট হৃদয়ে যত্নের সহিত কর্তব্যপালন করিতে হইবে ইহাই তাঁহার অভিমত এবং ভজনপূজন-সম্বন্ধে গৃহী লোকের পক্ষে বলিয়াছেন, “অষ্টযামের অর্ধ যাম আনন্দেতে সুখে থাক।”

রামপ্রসাদ সকলের মধ্যে থাকিয়াও সকলের বাহিরে ছিলেন। সংসার প্রতিপালন করিয়াছেন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া কর্তব্যানুরোধে। সকল ভার জননীর উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজের কর্মময় জীবন লইয়া তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। জীবনের প্রথমাবধি প্রসাদ তাঁহার জননীর অনুরাগী ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা কুসুমিত হইয়াছিল ভক্তি-বিশ্বাস-নির্ভরশীলতায় এবং অন্তে এইরূপ পুষ্পস্তবকের অঞ্জলি দিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—“আমি আর কি ভুলি, অভয় পদে জন্মের মত ডুবেছি রে॥” পরিশেষে তাঁহার যাবতীয় কর্ম ও কর্মফল জননী ব্রহ্মময়ী এলোকেশীর চরণে সমর্পণ করিয়া সকল অভাবের মোচন করিয়াছিলেন ব্রহ্মময়ীর সাক্ষ্যে শিবরাজ্যে বসতভিটার পাট্টা হস্তগত করিয়া। আয়াসসাধ্য সাধনার শেষে শিবশক্তির মিলন ঘটাইয়া গাহিলেন—

“আমার নাই অবকাশ হল সব কাজ
　　জন্ম-মৃত্যু দুটো অশৌচ ঘটেছে।
চিন্তা ভার্যা বন্ধ্যা ছিল,
　　সে ভার্যা প্রসব করেছে॥
কাল অনুক্রম সুসঙ্গমে
　　জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে।
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল
　　সেও আমায় ত্যাগ করেছে।
সেই পিতার লাগি হয়ে বিরাগী
　　মায়া নামে আমার মা মরেছে॥
　　*　　*　　*
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে
　　যত বিপদ গৃহবাসে
এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে
　　জয়কালী বলে বেড়াই নেচে॥”

কর্মে যোগ

শ্রীক্ষেত্রমোহন নাথ, বি-এল্

কর্মাকর্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের জন্য একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হাতে লইয়া আমাদিগকে পথ চলিতে হইবে। যে কর্মে জীবের অবনতি ঘটে তাহা অকর্ম এবং যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হয় তাহাই কর্ম—এই মাপকাঠিই হইল দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। ইহা দেখিবার অর্থাৎ যন্ত্রটি ব্যবহারের কৌশলও জানা প্রয়োজন, এই কৌশলই হইল যোগ—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (গীতা ২।৫০)।

বিভিন্নরূপ বিভ্রান্তিকর কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি অনুসরণ করিলে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না, হইলেও নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছান যাইবে, তাহা কৌশলের সহিত নির্ধারণ করিতে হইবে। কৌশল আয়ত্ত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কি ব্যবহারিক জীবনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বত্রই এই কৌশল জানা দরকার। একজন ডাক্তার রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করিবেন। রোগীর বলাবল, দেহের গঠন, স্থানীয় শিরা-উপশিরা, মাংসপেশী, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিচয়, ক্ষতের প্রকৃতি প্রভৃতি যেমন জানা প্রয়োজন হস্তের নিপুণতাও সেইরূপ প্রয়োজন। লাঠিয়াল লাঠি চালায়, প্যাঁচে প্যাঁচে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে এবং নিজকে রক্ষা করে, এসমস্তই হস্তের নিপুণতা। নিপুণতার অভাব হইলে লাঠি প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিবে না, পরন্তু নিজের লাঠিই নিজের মাথা ভাঙ্গিবে। ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের নিপুণতা, লাঠিয়ালের লাঠি পরিচালনার নিপুণতাই কৌশল।

কৌশল অবলম্বন পূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া কর্ম করার নাম কর্মযোগ। যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করেন তিনিই কর্মযোগী। যোগ একটা উন্নত মনের অবস্থা-বিশেষ। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম ও অকর্ম নিরূপণের কৌশল আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান হইল মনকে কোন স্থির লক্ষ্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট করা। ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল বস্তুতে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বস্তুতে বিরাগ স্বাভাবিক। অনুকূল বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ যখন কোন ইন্দ্রিয় সেই বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য মন কর্তৃক নিয়োজিত হয় তখন যোগী চেষ্টা করিবেন সেই বিষয়ে উদাসীন থাকিতে। তাঁহাকে মনে করিতে হইবে, 'গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।" (গীতা, ৩।২৮)—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি নহি। এই মনে করিয়া যোগী ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত বা মগ্ন হইবেন না। এই রকম অভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া আসিবে এবং ধীরে ধীরে মন সংযত হইয়া স্থির লক্ষ্য বস্তুতে নিবিষ্ট ও বিক্ষেপবিহীন হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রাগদ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, স্তুতি বা নিন্দা দ্বারা মন চঞ্চল হয় না। ইহা মনের একটা উন্নত অবস্থা। এই অবস্থায় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে, ব্যবহারিক জীবনও অতি সুসমঞ্জস হয়।

যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই তাহার বিষয়ভোগ, আর যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে তাঁহার বিষয়ভোগ বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে একই রকম, কিন্তু অযুক্ত ব্যক্তির ভোগের দ্বারা উত্তরোত্তর আসক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় ভোগ্যবস্তুর অভাব হইলেই তাহার মনে শান্তি থাকে না। পরন্তু যুক্তব্যক্তির বিষয়ে আসক্তি না থাকায় ভোগ্য বস্তুর ভোগ বা অভোগের জন্য মনের কোন স্থৈর্যই

নষ্ট হয় না। তখন সাংসারিক কাজকর্ম করিতেও কোন বাধা হয় না। রাজর্ষি জনক যোগস্থ হইয়া রাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহামুনি ব্যাস ও বশিষ্ঠ গৃহীই ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাজাই ছিলেন। মহাভারতের ধর্মব্যাধ সাধারণ দোকানদারের মতই দোকনদারী করিয়া জীবিকার্জন করিয়াছেন। পরমহংসদেব একদিন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, ওরে দু পয়সা দিয়ে একটা হাঁড়ি কিনলেও তিনবার বাজিয়ে নিবি। দোকানদার বোকা পেলে তোকে ঠকিয়ে দেবে; ভক্ত হবি ত, বোকা হবি কেন? ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধিরও তাঁহার অভাব ছিল না। তাঁহার ধর্মপত্নী শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীকে তিনি সাংসারিক কাজকর্মে যে উপদেশ দিতেন তাহাতেই তাহা বেশ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রের বড় বড় কথা আওড়াইয়া তিনি কখনও উপদেশ দিতেন না। সাংসারিক লোক কিভাবে জীবন যাপন করিবে ভক্তগণকে তাহার উপদেশ দিতেছেন:

"সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হরি', কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে; তেমনি সংসারে সব কর্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না, অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।১৫) গীতার চরম উপদেশ— অনাসক্ত ভাবে জীবন যাপন করা—এই সাধারণ উপমাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যোগপ্রাপ্তি হইল গীতার মুখ্য সাধন। কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি যে পথেই যাই না কেন, সমস্তই—যোগযুক্ত হইয়া করিতে হইবে। গীতাশাস্ত্র-প্রণেতা গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে বস্তু-নির্দেশক বচন দিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" ইত্যাদি কথা আছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, গীতার প্রতিপাদ্য বস্তু হইতেছে 'ব্রহ্মবিদ্যা'। যোগের সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বস্তু লাভ করিতে হইবে। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তিরূপ করণ বা উপায়ের সঙ্গে 'যোগ' মিশ্রিত করিয়া পরম তত্ত্ব লাভের সাধন করিতে হইবে, এই ইঙ্গিতটুকুই ঐ ছোট বচনটির মধ্যে নিহিত আছে।

স্ব স্ব অধিকারে ও ক্ষেত্রে স্বভাবনিয়ত পথে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনকে এক উন্নত অবস্থায় রাখিবার জন্য যোগাভ্যাসও প্রয়োজন। কৌশল অবলম্বন পূর্বক কর্মের গতি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে কর্মের মধ্যে অকর্ম আসিয়া না পড়ে তদ্বিষয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। কোন কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিতে নাই। কর্মের সমস্ত ফল ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত কর্ম করিয়া যাইতেছি জীবের এইরূপ বুদ্ধি সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। ইহাই হইল গীতার কর্মযোগ। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বমানবের প্রতি এই কর্মযোগ প্রযোজ্য।

বিবেকানন্দ-আবাহন

অনুরাধা দত্ত

দিগ্‌দিগন্ত মুখর আজিকে তব বন্দনাগানে,
আঁধার-যাত্রী চেয়ে আছে যেন নেত্রপলকহীন ;
আশাভরা মহা আশ্বাসে ঐ অরুণ-অচল পানে,
প্রতীক্ষা করে উদয়-লগ্ন আঁধারের চির লীন।

হে মহাসূর্য, জাগো হে আবার রাঙ্গায়ে পূর্বাচলে
বিজয়-তূর্য নিনাদে তোমার ডাক দিয়া সবাকারে ;
নিখিল প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য লুটিবে চরণতলে
জাগিবেযে জড় তব আহ্বানে নবপ্রাণ সঞ্চারে।

পিছনের পানে চাহিবে না তারা দ্বিধা-সঙ্কোচে ত্রাসে,
চলিবে ছুটিয়া সমুখের পানে বাধা না মানিবে তারা ;
জীবনপথের অভিযাত্রীরা ধ্বজা তুলি নীলাকাশে,
ভাঙ্গিবে সবলে যতেক আগল যতেক বন্ধ কারা।

ভারতাত্মার হে বাণীমূর্তি অতীত ভবিষ্যের
কম্বু নিনাদে ধ্বনি তোল তব মহান মাভৈঃ গীতি :
অসীমের মাঝে আসন তোমার সীমা ছাড়ি বিশ্বের
কালের অঙ্কে চির-অঙ্কিত তব জীবনের স্মৃতি।

পর্যটকের হিমালয়—মুক্তিনাথ

স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ পুরী

মুক্তিনাথ বা মুক্তিনারায়ণে যাত্রার প্রাক্কালে প্রয়াগে খ্রীঃ ১৯৪২ সালের পূর্ণকুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে স্নানত্রয় এবং মাঘের কল্পবাস সমাপনান্তে তখনও হাতে যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া আরও দুই মাসাধিক কাল প্রয়াগেই থাকিয়া গেলাম। পূর্ব বৎসরের যাত্রিগণের নিকট শুনিয়াছিলাম পথ কঠিন নহে। তাহাতে আমি সাহস পাইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণপূর্বক বৈশাখ মাসের ১২ই যাত্রা আরম্ভ করিলাম। যদি তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী চৈত্রমাসের শেষাশেষি বাহির হইয়া বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে দর্শন শেষ করিতে পারিতাম তাহা হইলে ফিরিবার পথে ঝঞ্ঝাবাতাদিতে যে সকল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা ভোগ করিতে হইত না।

এলাহাবাদ হইতে প্রথমতঃ গোরক্ষপুর ও পরে তথা হইতে শাখা রেলপথে নৌতনউয়া (Nautanwa) পৌঁছিলাম। স্টেশনের পরেই নেপালরাজ্য আরম্ভ। নৌতনুয়া হইতে ২৪ মাইল উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের পাদদেশে গণ্ডকীনদীকূলবর্তী বুট্‌ল (Butwal) মণ্ডী পর্যন্ত মোটর পথ আছে।

নেপালরাজ্যের অভ্যন্তরে বিদেশীয়গণ মাউড়া পর্যন্ত ৫ মাইল মাত্র প্রবেশ করিতে পারেন ; এখানে পুলিস ফাঁড়িতে অনুমতিপত্র দেখাইলে তবে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয়। ইহার ১ মাইল পরেই তহশিলের প্রধান নগর ভৈরোয়া (Bhairowa)। ভৈরোয়া হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবস্থান—লুম্বিনী উদ্যান ; তথায় বেষ্টনীর মধ্যে সুন্দর এক স্তম্ভ আছে, উহার গাত্রে ক্ষোদিত অনেক পালি লেখ দেখিলাম। বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর ধর্মশালা ও চত্বর। রক্ষক বলিলেন, বৌদ্ধ জগতের সর্বস্থান হইতেই এখানে যাত্রী আসিয়া থাকেন। নৌতনুয়া স্টেশন হইতে লুম্বিনী-উদ্যান পর্যন্ত আলাদা একটি রাস্তা আছে।

বুটল হইতে ১৮ মাইল দূরে পর্বতোপরি তানসিন অবস্থিত। গণ্ডকীর কূলে কূলে ক্রমাগত চড়াই-

উৎরাই করিয়া মুক্তিনাথের রাস্তা গিয়াছে। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে পোখ্‌রা হইয়া ছোটবড় অনেকগুলি পাহাড়ের মাথা দিয়া আরেকটি পথও আছে। আমি প্রথমোক্ত পথেই গিয়াছিলাম। তানসিন পাল্লাজেলার অন্তর্গত। এখানে একজন বিভাগীয় শাস্তা থাকেন। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুইরাত্রি বিশ্রামের পর তানসিন হইতে নির্গত হইলাম। তথা হইতে তিন অবতরণ-পথে রাণীঘাট। রাণীঘাটে নৌকায় গণ্ডকী পার হইতে হইল। এখান হইতে বীর্ঘা ৭ মাইল, অতঃপর ৯ মাইল দূরবর্তী আন্দিঘাটে গিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম লইলাম।

পরদিন ৬ মাইল দূরে শেতিবেনী এবং পরে বিহাদি (৬ মাইল) ও (২য়) বিহাদি (৪ মাইল) পর্যন্ত চলিয়া থামিলাম। পথে ধবলগিরির তুষারশিখা কয়েকবার দেখা গিয়াছিল। পরদিন পরপর বাচ্ছা (২½ মাইল), বারাখানি (২½ মাইল), কর্ণাস (½ ক্রোশ) ও পরে আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিয়া গোধূলিবেলায় ফলেবাস (=ফলেওয়াস) পৌঁছিলাম। পথিপার্শ্বে এক বাটীর বাহিরের বারান্দায় কম্বল পাতিলাম। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে গৃহস্থ প্রকাণ্ড একটি থালিতে ভুটার খই আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিলেন। লবণ-গোলমরিচচূর্ণের সাহায্যে ইহার দ্বারা উদর পূরণ করিয়া লওয়া গেল।

বারাখানি ও কর্ণাসের মধ্যে দুইটা পথ আছে। তন্মধ্যে যেটি নিম্নতরস্থান-বাহী উহা গণ্ডকী-উপত্যকাস্থিত জৈমিনিঘাট হইয়া গিয়াছে। জৈমিনিঘাটে অতিপুরাতন 'কাজিকী ফুলউয়ারী' অর্থাৎ কাজির পুষ্পবাটিকা বিদ্যমান। ইহার অপর নাম 'কাজিপাউয়া' (কাজির ধর্মশালা)। কোনো কাজি বা বিচারপতি বানপ্রস্থজীবন যাপন করিবার জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রারব্ধ সদাব্রত এখনও চলিতেছে, উদ্যানেও কয়েকটি সাধারণ পুষ্পবৃক্ষ দৃষ্ট হয়; অধুনা ইহা মহন্ত গিরিবর দাস বৈষ্ণবের আশ্রম। প্রত্যাবর্তনকালে একরাত্রি এখানে কাটাইয়াছিলাম। নীলবর্ণ নদীতীরে অবস্থিত নানাবর্ণ পুষ্পশোভিত উদ্যানসহ এই আশ্রমটি উপরের পথ হইতে ছবির ন্যায় দেখায়। কথিত আছে পুরাকালে জৈমিনি ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন।

ফলেবাস হইতে বাহির হইয়া পরদিন প্রথমেই ডমাহডুঙ্গা গ্রাম পাইলাম। তথায় রামদাস নামে এক বৈষ্ণব ত্যাগী[1] থাকেন। উহার চার মাইল পরে মাদিবেনী। এখানেও এক ত্যাগীর আখড়া বা আশ্রম আছে। নদীতটভূমির শুষ্কাংশের উপর দিয়া আরও সাত মাইল গিয়া থানিয়াঘাটে রাত্রির জন্য আশ্রয় লইলাম। আরেকটি পথ নদীতল হইতে অন্ততঃ ৫০০ ফুট উচ্চে কুম্মা নামক গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। উহা উক্ত মাদিবেনী ও থন্যাঘাটের মধ্যে অবস্থিত। প্রতিযাত্রাকালে অত্রত্য নারায়ণ-মন্দিরে দ্বিপ্রহরে মহন্ত শরণগিরির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। নেপালের এই খণ্ডে সর্বত্র লোকে 'মন্দিরের' পরিবর্তে 'স্থান' শব্দ ব্যবহার করে, যথা নারায়ণ-থান (=স্থান), গণেশ-থান ইত্যাদি। আমি কুম্মার নিকটে এক ব্যক্তিকে নারায়ণ-মন্দির কতদূরে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে সে আমার প্রশ্ন বুঝিল না, পরে থান-শব্দ উচ্চারণ করায় বুঝিল এবং ভবিষ্যতে কখনও মন্দির শব্দ ব্যবহার না করার উপদেশ দিয়া তবেই আমার কথার উত্তর দিল।

থন্যাঘাট হইতে বেণী ৮ মাইল। রাণীঘাটের ৭০ মাইল পরে আজ পঞ্চম দিনে দ্বিতীয়বার নদী পার হইতে হইল- তবে এবারে আর নৌকায় নহে, লম্বমান সেতুর উপর দিয়া। বেণী হইতে ২ মাইল পরে জলেশ্বর নামক ক্ষুদ্র গিরিনদী আসিল, উহা কাষ্ঠসেতুবদ্ধ। নিকটেই জনৈক ব্রহ্মচারীর বাস।

১ রামায়েৎ বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ পরস্পরকে ত্যাগী অভিহিত করিয়া থাকেন।

আরও ৩ মাইল পথ চলিয়া রাখু-গ্রামের মহারাণী পাউয়ায় (ধর্মশালায়) আসিয়া উঠিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে কিব্রিয়াং পর্যন্ত ৪ মাইল চলিবার পর লৌহরজ্জুর সেতু পাইলাম। তথা হইতে তাতাপানি ৪ মাইল। নিকটেই হয়ত তপ্ত-জলের কোনও ধারা আছে, পথিপার্শ্বে নাই। হিমালয়ে যেখানে যেখানে উষ্ণ ধারা আছে গ্রাম না হইলে অথবা গণ্ডগ্রাম হইলে সেই সেই স্থানের তাতাপানি বা এই জাতীয় নাম হইয়া থাকে। তাতাপানি হইতে প্রথমে ৪ মাইল কঠিন আরোহণ-শেষে দানায় পৌছিলাম; শীতানুভব হইতে লাগিল, বুঝিলাম স্থানটির উচ্চতা যথেষ্ট। কঠিন আরোহণের পর আর সেদিন চলিতে ইচ্ছা হইল না। দানায় পদার্পণ করিয়া মনে হইল এক নূতন রাজ্যে আসিয়াছি। অত্রত্য অধিবাসিগণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার হিন্দু-বৌদ্ধের মিশ্রণ। ইহারাই ভোটীয় বা ভুটিয়া। আলমোড়া, গাড়োয়াল, টেহ্রি-গাড়োয়াল জেলাসমূহের এবং কাশ্মীর-সীমান্তাবধি হিমাচল প্রদেশের উত্তরপ্রান্তবর্তী সমস্ত সুদীর্ঘ হিমালয়খণ্ড ইহাদের বাসস্থান। মুক্তিনাথ হইতে ফিরিবার পথে এই দানা-তাতাপানির মধ্যে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীভগবান্ যে আর্ত ভক্তকে সত্যই রক্ষা করেন উহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঘটনাটি এখানেই বর্ণনা

সেদিন সকাল হইতেই আকাশে কতকগুলি মেঘ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু তাহাতে আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। কেননা, মুক্তিনাথে থাকিবার সময় জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই দুই দিন যাবৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত ও দূরে চতুর্দিকে শিখরগুলিতে তুষারপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। পূর্বাহ্ণে ২॥০ ক্রোশ পথ অবতরণ করিয়া দানার নিত্যক্রিয়া ও বিশ্রাম-সমাপনান্তে উঠিয়া দেখিলাম মেঘের বিকীর্ণ খণ্ডগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া সূর্যকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরেও সায়ংকাল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং ইতস্ততঃ বড় বড় জলের ফোঁটাও পড়িতেছে। যাহা হউক, বিনা কালক্ষেপে অবতরণ আরম্ভ করিলাম। ক্রমেই বর্ষণবেগ বর্ধিত হইতে হইতে অবিরল মুষলধারে পরিণত হইল; বায়ুও বিপরীতমুখে বহিয়া উভয়ে একযোগে আমার অবতরণে বাধা সৃষ্টি করিল, কিন্তু বৃথাই। দুর্যোগের মধ্যে দ্রুতগতির আশা করা যায় না। অর্ধেক পথ নামিবার পর লক্ষ্য করিলাম, সম্মুখে একটি বিরাট গাছ মড় মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পড়িয়াই পথের অর্ধাংশ বিধ্বংস তথা আমার পথেরও গতিরোধ করিল। একহাতে ছাতা অন্য হাতে জলপাত্র ও পীঠে ভার লইয়া অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিলাম। অনন্তর নিরুপায় হইয়া কখনো তরুতলে ৫।১০ মিনিট অপেক্ষা করি, কখনও বা গিরিগাত্রের গুহাবৎ স্থানে অর্ধঘণ্টা বসিয়া লই। একেত এইরূপ অবস্থা, অপর দিকে পথে প্রবহমাণ বৃষ্টিজলের খরস্রোতের উপর দিয়া পিচ্ছিল পথে সাবধানে চলিতে হইতেছে। অবতরণ শেষ করিতে বহুক্ষণ লাগিল, সৌভাগ্যবশতঃ ইতোমধ্যে ঝঞ্ঝার উপশম হইয়াছে। তখনও সন্ধ্যাগমের কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু সম্মুখেই বৃষ্টিজলে স্ফীতা খরস্রোতা এক পার্বত্য তটিনী। দূর হইতে যখন ইহার গর্জনরব কর্ণগোচর হইয়াছিল তখনই অভিজ্ঞতাবশে মনে হইয়াছিল অদ্য অদৃষ্টে বিপদ আছে, কারণ উর্ধ্বাভিমুখে যাত্রাকালে যে শান্ত নীরব সূত্রবৎ ক্ষীণ ধারা পিপাসু পথিকের বিশ্রামস্থান ছিল এবং অনেকের অলক্ষ্যীভূত থাকিয়া গিয়াছিল, অদ্য তাহারই বিস্ফুরণ ও বিস্ফূর্জন হেতু মূর্তি প্রচণ্ড হইয়াছে। পার হওয়া কঠিন।

অনন্যোপায় হইয়া বিপদ্‌ভঞ্জনকে স্মরণ করিতেছি। অকস্মাৎ দেখি মধ্য নদীতে আমারই তুল্য চারিজন খর্বকায় পুরুষ (বলা বাহুল্য সকলেই নেপালী) ওপারের দিকে যাইতেছে পরস্পর হাত-ধরাধরি

করিয়া। তাহাদিগকে দেখিয়া সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধারণা হইল যে, নদীটি ভীষণদর্শনা ও দুস্তরা হইলেও মাঝখানে অগভীর। উহারা এপারে থাকিতে থাকিতে যদি উহাদের সঙ্গ বা সহায়তা লইতে পারিতাম তবে উত্তম হইত। আমি একাকী লঙ্ঘন করিতে সাহস করি না। আবার এই ভাবিয়া হতাশ হইলাম যে, একবার ওপারে গিয়া পড়িলে উহারা সহস্র ডাকেও পুনরায় এপারে আসিবে না। মনোমধ্যে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় তাহারা পরপারে গিয়া পৌঁছিল। যদিও আমার মন ও নয়নদ্বয় সাগ্রহে তাহাদের অনুগমন করিতেছিল, তথাপি 'ডাকিলেও আসিবে না' এই ধারণাবশতঃ আমি নীরব ছিলাম। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই, অথবা তাঁহার ইচ্ছায় কি না হয়, অতএব আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে উক্ত ব্যক্তিগণের হঠাৎ যখন এপারে দৃষ্টিপাত হইল তাহারাও বিস্মিত হইয়া পরস্পর কি পরামর্শ করিল দেখিলাম। অনন্তর নদী পুনর্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। অনতিবিলম্বে তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঙ্গিতে সঙ্গে যাইবার অনুরোধ জানাইল। দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিলাম। আবার হাত হইতে তাহারা স্বতই ছত্র ও জলপাত্রটিও গ্রহণ করায় চলিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইল। স্রোতোবেগ যথেষ্ট আছে, অধিকন্তু লুক্কায়িত, বিষমাকার উপলখণ্ডগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল, অবহিত-চিত্তে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে; তথাপি অনভ্যাস-হেতু দুই একবার পদস্খলন হওয়াতে আমার উপকারী সুহৃদগণকেও টলাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, অবশেষে এই তটিনীটি নিরাপদে পার হইলাম।

এইবার ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার বিবরণে ফিরিয়া আসা যাক। দানা ত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে পূর্বাহ্নে বহুক্ষণ পরে এক সেতু আসিল। বহু পুরাতন ও জীর্ণ সেতু। অগ্রসর হইয়া ইহাতে পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম তলদেশে কয়েকটা কাষ্ঠখণ্ডের বহুলাংশ নষ্ট হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কয়েকটা খণ্ডের অস্তিত্বই নাই। সেতুটি ভীষণ দুলিতে লাগিল। পার না হইলে চলিবে না; সুতরাং ছত্র-পাত্রকে পৃষ্ঠালম্বী কম্বলাদির সহিত একত্র বাঁধিয়া লইয়া রজ্জু ধরিবার জন্য হস্তদ্বয়কেও মুক্ত করিলাম। এইবার অগ্নি-পরীক্ষা। বহুনিম্নে গর্জনরতা ফেনিলা হিমাঙ্গী গণ্ডকী প্রবাহিতা। চাহিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। পড়িলে রক্ষা নাই। যাহা হউক, শ্রীনারায়ণ-কৃপায় সাহসবলে একাকীই সেই দোদুল্য-মান জীর্ণ সেতুর উপর দিয়া এই বৈতরণী উত্তীর্ণ হইলাম। অনন্তর কৃতজ্ঞচিত্তে রক্ষাকর্তার চিন্তা করিতে করিতে ঘাসা পর্যন্ত পথ অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে আরেকবার এইভাবেই এই ভয়াবহ সেতুটিকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল। আশা হয় এতদিনে নেপালরাজ ইহার সংস্কারসাধন করিয়াছেন।

ঘাসা উক্ত সেতুর নিকটেই দানা হইতে ৫ মাইল এখানে একজন সদ্‌গৃহস্থ যাত্রীদিগকে যবের ছাতু প্রদান করেন। উহা ভোজনান্তে বিশ্রাম লইবার জন্য ধীর আরোহপথে আরও ৫ মাইল গিয়া লেটায় আসিলাম। ইহার নিকটে যে সেতুটি আছে তাহা দারুনির্মিত দেখিলাম, রজ্জু ধরিবার আবশ্যকতা হয় নাই, কারণ গণ্ডকী এখানে ক্ষীণা। আমাদের ত্যক্ত রাখু-গ্রাম পর্যন্ত পথের দুইধারে মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, তজ্জন্য পথিকের পার্বত্যপথে ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের অত্যন্ত সুবিধা।

এযাবৎ উচ্চস্থানসমূহে প্রত্যহ প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই পথে বহির্গত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু ২।১ দিবস হইতে তাহা আর পারা যাইতেছে না; কারণ শৈত্যবশতঃ পার্বতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত ধর্মশালাসমূহ এরূপভাবে রুদ্ধ থাকে যে, বায়ুরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব আভ্যন্তরীণ অন্ধকার সামান্য অপগত হওয়ার পর বাহিরে আসিলে দেখা

যায় অনেক বেলা হইয়াছে। পরদিন প্রাতে সূর্যোদয়ান্তে নির্গত হইলাম। দুই বা ততোধিক ক্রোশ গিয়া দেখিলাম পথ উপলাস্তীর্ণ গণ্ডকীগর্ভের শুষ্কাংশের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরেও ইহা বহুদূর পর্যন্ত উর্ধ্বগ সমতলভূমি ধরিয়া গিয়াছে। এই পথে আমি টুকুচে বা থাক্‌পর্যন্ত আসিলাম—৭ মাইল লেটা হইতে। এখানে আসিয়া মনে হয় যেন মুক্তিনাথের বায়ু গাত্র স্পর্শ করিতেছে। ক্ষেত্রের যতই সন্নিধানবর্তী হইতেছি শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে লাগিল। থাক্ ভুটিয়াদের শেষ গ্রাম। আগামী কল্যই দর্শনের দৃঢ়সংকল্প, তাই অপরাহ্নে ভোটসীমা অতিক্রমপূর্বক আরও ৪ মাইল আগে গিয়া ঝুঁসুম্মার ধর্মশালায় উঠিলাম। ইহা হূণীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। দূরে-নিকটে কেবল হূণীয় বসতি। এই হূণ-খণ্ড নেপালরাজ্যের অন্তর্গত; তিব্বতীয় হূণ আরও উত্তরে। রাত্রি আসিল, আমিও প্রাপ্ত সদাব্রতের সদ্ব্যবহারপূর্বক শয়ন করিলাম।

ঝুঁসুম্মা হইতে পরদিবস একটু সকাল সকালই নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কাঠের সেতু লঙ্ঘনের পর গণ্ডকীধারাকে ডান দিকে রাখিয়া চলিতে চলিতে ১ মাইল পরে কাকবেণী প্রাপ্ত হইলাম। অদ্য যেন তেন প্রকারেণ এই দীর্ঘ যাত্রার পরিসমাপ্তি করিতেই হইবে বিবেচনা করিয়া এখানে আর বিশ্রাম বা অপেক্ষা করিলাম না, ঐ পথ ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর আসিয়াছি এমন সময়ে দূর হইতে এক হূণিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার পথভ্রান্তির কথা জ্ঞাপন করিল। অগত্যা, তন্নির্দিষ্ট পথ ধরিবার জন্য পুনরায় কাকবেণীতে আসিতে হইল। এই পর্যন্ত আসিয়া পথ অকস্মাৎ দ্বিমুখী হইয়াছে, গন্তব্য পথটি অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট এবং কোনো ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল না, তজ্জন্য প্রথমে ইহার নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছিলাম। হায় অদৃষ্ট, যতই শীঘ্র পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছি ততই বিলম্ব হইতেছে! যাহা হউক, অনন্তর একাদশদিবস-সঙ্গিনী ক্ষীণা ত্রিধাবিভক্তা গণ্ডকীর বিমুক্তা ধারা এই শেষবার উল্লঙ্ঘন করিয়া পাহাড় চড়াই করিতে করিতে এক সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকায় উপস্থিত হইলাম। এ ভূমিতে গুল্ম-বৃক্ষাদি কিছুই নাই, চতুর্দিকে কয়েক ক্রোশাবধি দৃষ্টি অবাধ। কেদারনাথ, বদরীনাথ প্রভৃতি স্থানে ক্রোশাধিক দূর হইতে মন্দিরচূড়া দৃষ্ট হয়। এখানেও তৎপ্রতীক্ষায় পথ অতিবাহিত করিতেছি। সুখের বিষয় অধিক দূর না যাইতেই, অনুমান এক ক্রোশ দূর হইতে চূড়া লক্ষিত হইল। এখন মনের আনন্দে পথের অন্তিমাংশ অতিক্রমপূর্বক সর্বাগ্রে নারায়ণের দর্শন-প্রণামাদি সমাপন করিলাম। কাকবেণী হইতে মুক্তিনারায়ণ ৪ মাইল।

মুক্তি-অধিত্যকা বহুদূরবিস্তৃত ও হূণীয়াধ্যুষিত; বদরীনারায়ণের ন্যায় বৈশাখমাসে এখানে তুষার থাকে না বটে, কিন্তু চলিতে ফিরিতে যে শ্বাসকষ্ট হয় তাহা ইহার উচ্চতাধিক্যের পরিচায়ক। ইহারই পূর্বধারে পর্বতের নিকটে দক্ষিণমুখী মন্দির; চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রস্তরবিগ্রহ। উক্ত পর্বত হইতে আগত তুষারগলিত এক ঝরণাকে মন্দিরের পার্শ্বেই পতনশীল ধারাসমষ্টিতে পরিণত করা হইয়াছে। শুনিলাম শীতের চারিমাস প্রাত্যহিক পূজা (কে জানে বৌদ্ধদেবতার অথবা নারায়ণের ?) স্থানীয় হূণীয়দের দ্বারাই হইয়া থাকে। হিন্দুপূজকদের বাসস্থান প্রায় ৪০ মাইল দূরে—রাখু বা তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহে।

পশুপতিনাথের মন্দিরের ন্যায় মুক্তিনাথ-মন্দিরও বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন; ইহার একাধিক-সংখ্যক চাল দেখিলে মনে হয় চতুর্ভুজাকার কয়েকটা কাষ্ঠ ছত্র উপর্যুপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ইহার নিম্নাংশ প্রস্তরনির্মিত, গর্ভগৃহ অপ্রশস্ত, মর্মর-প্রস্তরের গৃহতল জল ফেলিতে ফেলিতে সদাই সিক্ত থাকে, তদুপরি কাষ্ঠাসন ও কম্বলখণ্ডাদি পাতিয়া উত্তরমুখে পুরোহিত পূজায় বসেন।

এইস্থানে আগমনকালে মন্দিরের দুই পরাব্যাধ[১] পশ্চিমে রাজকীয় ধর্মশালা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। কৃত্যসমূহ সমাপনান্তে তথায় ফিরিবার পথে ১০।১২ পদ অগ্রসর হইয়া একটি বস্তির পার্শ্বে আসিয়াছি, এমন সময়ে তদভ্যন্তর হইতে একজন 'ত্যাগী' আমাকে ডাকিয়া ঐ বাটীতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শুনিলাম ইহা তাঁহার আশ্রম, বৎসরে ৬ মাস কাল এখানে থাকেন। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধর্মশালা হইতে সদাব্রতে দিবসত্রয়-প্রাপ্ত তণ্ডুল দাল ঘৃত লবণাদি আমার নিকট হইতে লইয়া স্বকীয় পাকের সহিত একত্রে পাক করিয়া দিতেন। ঐ কালের পরেও চারিদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে ছাড়েন নাই। শাস্ত্রালোচনায় সময় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইত জানিতে পারিতাম না। ইতোমধ্যে বহু ত্যাগী দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ধুনী, সদাব্রত ও অনুরোধ সত্ত্বেও কেহই এক রাত্রির অধিক থাকেন নাই। অনন্তর অষ্টমদিবসে আমাদের প্রথমোক্ত ত্যাগী যখন চারিজন সন্ন্যাসিসহ পূর্ণ-কুম্ভমেলা উপলক্ষে কৈলাস-যাত্রায় বহির্গত হইলেন, দলের সকলে আমাকেও তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্বেই ১৯২৮ সালে একবার যাত্রা হইয়াছিল বলিয়া এবার আর যাইতে ইচ্ছা হইল না।

নারায়ণ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণে হূণীয়দের এক মন্দির বিদ্যমান। ইহার আকৃতি পূর্বোক্তেরই অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে কতকগুলি কাঠের থামের উপরে দণ্ডায়মান। মন্দিরের নিম্নতলের চতুর্দিক্ বস্ত্রাবগুণ্ঠিত। পয়সা না দিলে অভ্যন্তরে কি আছে কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না। আমি গিয়া বলাতে বৌদ্ধ-পূজয়িত্রী আমার সহিত উহাদের মন্দিরগৃহ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং বিনা দক্ষিণায় অবগুণ্ঠনের এক বস্ত্রখণ্ড উন্মোচনপূর্বক দেখিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন। দেখিলাম ইতস্ততঃ দ্বাদশাধিক নীলবর্ণ জলন্ত জিহ্বা নড়িতেছে ও তৎসঙ্গে ঘনীভূত গন্ধকলবণ-বাষ্পের উগ্রগন্ধ। শিখাগুলি চট্টগ্রামের নিকটস্থ সীতাকুণ্ড বা পাঞ্জাব-হিমালয়ের কাংড়া-উপত্যকাস্থ জ্বালামুখীতে দৃষ্ট অনুরূপ অগ্নিশিখা হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর এবং সংখ্যাতেও অধিকতর।

মুক্তিক্ষেত্র যে সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকার উপর অধিষ্ঠিত তাহা সমতলপ্রায় হইলেও ইহার প্রান্ত-প্রান্তান্তরে গমনাগমন সুকঠিন ব্যাপার। কারণ, উচ্চতাধিক্যবশতঃ শ্বাসকষ্ট ও মধ্যে মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধিশীল গিরিনদীর অস্তিত্ব। দিনমানের প্রথম প্রহরে ইহাদের ধারা অতিশয় ক্ষীণ থাকে, তাহার পরেই বৃদ্ধি। এই ক্ষেত্রেই অবস্থিত সুলক্ষণ শালগ্রামশিলা-বহুল দামোদর কুণ্ড মন্দিরের ৩ ক্রোশ উত্তরে—জল দেখা যায় না বটে, কিন্তু উচ্চ তীরভূমি স্পষ্টই দৃশ্যমান।

এক সপ্তাহ বাসের পর প্রতিযাত্রায় নিম্নপ্রবণ পথ পাইয়া অক্লেশে থাক্ (টুক্‌চে) পর্যন্ত ৯ মাইল নামিয়া আসিলাম। তথায় হিন্দুগৃহ দেখিয়া সুব্বা হিতমানের অতিথি হইলাম। ইঁহার অপর ভ্রাতার নাম সুব্বা মোহনমান শেরচন্দ্। ধনী ও গণ্যমান্য বলিয়া লোকে ইঁহাদিগকে সুব্বা কহে, ইহার আরেক অর্থ কালেক্টর। ইঁহারা কথাবার্তার মত হিন্দি মন্দ জানেন না; প্রতিবেশ মিশ্র—ভোটীয় ও হূণীয় উভয়ই। হূণীয় হইতে ইঁহাদের ভাষাগত, পরিধেয়গত ও ভক্ষ্যগত পার্থক্য যথেষ্ট আছে। ভাষা নিজস্ব, নাম হিন্দুদের ন্যায়। হূণীয়গণ খদিরবর্ণরঞ্জিত বহিঃ-পরিধেয় ব্যবহার করে, ইঁহারা তাহা করেন না। আলমোড়া জেলার ধার্চুলায় শীতকালে তিব্বতাগত হূণীয়দিগকে রোগে মৃত প্রোথিত মহিষকে মৃদ্গর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া উহার মাংস খাইতে দেখিয়াছি। আমাদের সুব্বাভ্রাতৃগণ কিন্তু এরূপ নহেন যদিও তাঁহারা মাংসাশী। প্রাতঃকালে হিত-মানকে বোধ হয় পালি ভাষায় শাস্ত্রীয় প্রবচন আবৃত্তি

১ লোষ্ট্র-নিক্ষেপ ব্যবধান।

করিতে শুনিয়াছি। স্বকীয় গৃহচ্ছাদ কৃষ্ণলেখাঙ্কিত দীর্ঘ শ্বেতপতাকাবলীর দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এগুলি ইঁহাদের ধর্মপতাকা - তুণ ও এদিক্‌কার ভোটভূমিতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

গৃহচালের উপরে মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘ দণ্ড থাকে, ঐ দণ্ড হইতে বাটীর বাহিরে কিঞ্চিদ্ ব্যবধানে চতুষ্কোণে ভূমির উপরি দণ্ডায়মান চারিটি উচ্চ স্থূণা পর্যন্ত অথবা বৃক্ষশাখা পর্যন্ত দীর্ঘ রশ্মিচতুষ্টয় বিলম্বিত থাকে এবং পালিভাষায় শাস্ত্রীর প্রবচনাঙ্কিত বহু পত্রখণ্ড বহু পতাকাকারে প্রত্যেকটি রশ্মির সহিত সংলগ্ন থাকে। কোথাও ঐ নেপাল-প্রস্তুত পত্রখণ্ডসমূহ শিরঃপাদভাবে সংযোজিত থাকায় এক একটি রশ্মিতে এক একটি দীর্ঘ পতাকা সৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ধর্মপতাকা তুণীয় মন্দিরেই দৃষ্ট হয় বলিয়া দুর হইতে দেখিলে গৃহস্থাবাসও মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। কোনো কোনো গৃহে কোণস্থ প্রত্যেক স্থূণা পার্শ্ববর্তী স্থূণাদ্বয়ের সহিত পতাকাবলীর দ্বারা সংযোজিত থাকায় বাটীর চতুর্দিক্ শোভাসম্পন্ন হয়। কেহ কেহ কেবল বাটীর সম্মুখদ্বারের দুই পার্শ্ব মাত্র ঐরূপে সজ্জিত করে। দুর্জয়লিঙ্গ পতনের এক সানুস্থিত মন্দিরে (Darjeeling Observatory Hillএ) ধর্মপতাকার নিদর্শন আছে, অনেকে হয়ত দেখিয়া থাকিবেন।

থাক্ হইতে ১৭ মাইল দূরে দানা। ইহা ত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ অবতরণকালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা উপরেই লিখিয়াছি। জয় মুক্তিনাথ!

বৎসর বিদায়

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

চৈতি হাওয়ার ঘূর্ণি লেগেছে বরষের শেষ সাঁঝে,
ঝরাপাতা তার মৃদু গুঞ্জনে গাহিয়া চলেছে কাজে,
বিদ্রোহ সুর প্রকৃতি-মেলায় আনেনিত তো বৈশাখী,
ত্বরা তিরোভাব কেন তর্পণ?—এখনো সময় বাকী।
এখনো গাহিছে কুহুডাকা দূতী বসন্ত-বীথিকায়,
এখনো নিথর চূত-কিশলয় মধুপের মদিরায়।
এখনো আসেনি ঈশানের তীরে ধূমল মেঘের স্তূপ,
নটরাজ তার নৃত্যের পায়ে তোলেনি ধ্বংসরূপ;
এখনো দহিয়া বহ্নির তাপে সবুজের কমদেহ
জীবনের মাঝে আনেনি নিদাঘ মরুর তৃষিত লেহ।
এখনো প্রহর ক্ষণ গুনি গুনি তোমার কাছেতে আসি,
নিয়ে যায় তব দান অফুরান, তোমারেই পরকাশি।
এখনো রয়েছ স্মরণেতে ভরি মঞ্জুমোহন রূপ
এখনো মানব আশাপথ চাহি জ্বালায়ে রেখেছে ধূপ
এখনো মায়ার ফুলঝুরি ঝরা নিঃশেষে নহে শেষ,
এখনো জাগে যে তব বিদায়েতে অভিমান-ভরা রেশ
বিস্ময়মাখা তব জীবনের শ্রেষ্ঠ নিমেষগুলি,
ইতিহাস তার স্বর্ণ আখরে এখনো রাখেনি তুলি!
অগুরু সুবাস রাখা ছিল যত দিনের শিশিতে বন্ধ,
শিশি ভেঙ্গে যায়, চারিদিকে তাই ভাসে অপরূপ গন্ধ।

সমালোচনা

স্তবকুসুমাঞ্জলি—সম্পাদক : শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী; প্রকাশক—মুকুল দে, চিত্রলেখা, শান্তি-নিকেতন ; পৃষ্ঠা : ২০৭ ; মূল্য : পাঁচ টাকা।

ডুমুরদহ (হুগলী) শ্রীরামাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বহুমানিত সাধু শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঁকারনাথের উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথিতে অনুরাগী ভক্ত এবং মনীষিগণের লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলির (কয়েকটি পদ্যে, বাকীগুলি স্মৃতিকথার আকারে) সংকলন।

শ্রীমৎ সীতারামদাসজীর অনেকগুলি চিত্র ও পত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধু ভক্ত ও ধর্মানু-রাগিগণকে পুস্তকখানি সাধন-প্রেরণা এবং আনন্দ দান করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি—সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা—৩২ ; পৃষ্ঠা —২৪ ; মূল্য : তিন আনা।

এই পুস্তিকাখানি চাণ্ডিল সর্বোদয় কর্মি-সম্মেলনে আচার্য বিনোবার ৭।৩।৫৩ তারিখের ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীবীরেন্দ্র-নাথ গুহ। সর্বোদয় সমাজভূদান ও সম্পত্তিদান যজ্ঞসম্বন্ধে বিনোবাজীর বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই ভাষণটিতে পাওয়া যায়।

রং ও ছাপ—শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন শর্মারায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ গাঙ্গুলী, ইষ্টার্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫৮বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ ; পৃষ্ঠা : ২৪২ ; মূল্য : ৩৸০ আনা।

রঞ্জনশিল্প-সম্বন্ধে এরূপ ধরনের কার্যকর বৈজ্ঞানিক বই বাংলা ভাষায় নাই। ইংরেজীতে যে সব পাঠ্যপুস্তক ছাপা আছে তাহার মূল্য ১০।১২ টাকার নিম্নে নয়। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের অথচ আধুনিকতম আবিষ্কার সহ পৃথিবীর সকল প্রস্তুতিকারিগণের সকল রকম রং ও রাসায়নিক একই সঙ্গে পরিবেশন করা হইয়াছে বলিয়াই পুস্তকখানি ছাত্র, কারিগর, শিক্ষক ও তাঁত-শিল্পিগণের নিকট বিশেষ উপকারী হইবে আশা করি। ভাষা সহজ ও সরল। পরিভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি বুঝাইতে গেলে ছাত্রগণ বা অল্পশিক্ষিত তন্তুবায়গণ বুঝিবেন না বলিয়াই যথাসম্ভব বৈজ্ঞা-নিক পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল ভাষায় উহাই কিছুটা ঘুরাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। রঞ্জনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গ্রন্থকার এই তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া রং ও ছাপ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

Book of Daily Thoughts and Prayers—স্বামী পরমানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আনন্দ আশ্রম ; ২১এ, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ ; পৃষ্ঠা : ৪০৮ ; মূল্য : ৬৷০ আনা।

বর্তমান পুস্তকটি পরলোকগত গ্রন্থকারের বহুবর্ষ-পূর্বে আমেরিকায় প্রকাশিত গ্রন্থের ভারতীয় সংস্করণ। স্মরণ-মনন, ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও শক্তিগুলি চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠে। আলোচ্য গ্রন্থে বৎসরের প্রতি দিনটির জন্য এক একটি অনুধ্যান ও প্রার্থনা সরল প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধক-সাধিকা-গণ পুস্তকখানি পাঠে প্রকৃত উপকার ও শান্তি লাভ করিবেন।

আশ্রম—(অষ্টম বর্ষ, ১৩৬০)—রহড়া (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বার্ষিকী। বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে নানাবিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলি বালকাশ্রমের কিশোর বিদ্যার্থিগণের সুষ্ঠু রুচি, আদর্শনিষ্ঠা এবং বিদ্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। জাতির

ভবিষ্যৎ এই তরুণ বন্ধুগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীমৎ স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতীজী মহারাজ—সঙ্কলক: স্বামী শান্তানন্দ ভারতী; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী; ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা: ১০৫; মূল্য: ১৲ টাকা।

ধর্ম ও দর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থপ্রণেতা ৮২ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ সন্ন্যাসীর (পূর্বাশ্রমে শ্রীদুর্গানাথ তত্ত্বভূষণ নামে পরিচিত) সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তত্ত্বনিষ্ঠ সাধক-জীবনের কাহিনী পড়িলে ভক্তি-বিশ্বাস-বৈরাগ্য উদ্বুদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবা—শ্যামলাতাল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (পোঃ সুখীঢাং, জেলা আলমোড়া) ১৯৫২ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৪ সালে হিমালয়ের সৌন্দর্যের একটি লীলানিকেতনে স্থাপিত। সেবাশ্রমটি গত ৪০ বৎসর যাবৎ পার্বত্য অধিবাসীদিগের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে। এই অঞ্চলে অন্য কোন চিকিৎসালয় না থাকায় বহুদূর হইতেও রোগাক্রান্ত দরিদ্র অসহায় নরনারীগণ চিকিৎসার জন্য এই সেবাশ্রমে আসে। আলোচ্যবর্ষে ৭৯০৭ জন (নূতন ৫০৯০) রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হইয়াছেন। সেবাশ্রমের ১২টি শয্যা-সমন্বিত একটি অন্তর্বিভাগও আছে। এই বিভাগে রোগিসংখ্যা ছিল—১৩২। সেবাশ্রমে একটি পশু-চিকিৎসালয় আছে। উহাতে আলোচ্যবর্ষে ২৮০০ গবাদি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। পার্বত্য প্রদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি বদান্য ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম সমগ্র ব্রহ্মদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান এবং গর্বের বস্তু। ১৯৫২ সালে ইহার বহির্বিভাগের ছয়টি কেন্দ্রে মোট ২২৫, ৬৭৮ জন এবং ১৩৫টি শয্যা-সমন্বিত অন্তর্বিভাগে মোট ৫৬৮৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। Physiotherapy, Clinical Laboratory, রঞ্জনরশ্মি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কার্যকুশলতা উল্লেখযোগ্য। সেবাশ্রমে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগেরও সুচিকিৎসা করা হয়। ১৯৫২ সালে সেবাশ্রমের মোট আয় ৩,০৫,৪৮৭৷৶১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৩,০৭,২৮১৷৷১১ পাই।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫০-৫১-৫২ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সেবাশ্রমের প্রচেষ্টা তিন ভাগে বিভক্ত—ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার ও আর্তসেবা। আলোচ্য বৎসরগুলিতে সমস্ত বিভাগেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হাসপাতালে বর্ষত্রয়ে যথাক্রমে ৬২৭৩, ৬০০৩ ও ৮৪৩৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ভগবদ্‌ভক্তগণের ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা, সরস্বতীপূজা ও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি অবতারগণের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের জন্মতিথি প্রতিবৎসরই পালন করা হইয়া থাকে। ১৯৫০সালে ময়না থানায় বন্যায় সেবা এবং তমলুক শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কলেরায় সেবা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কার্য।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি—১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা ষ্টুডেণ্ট্স্ হোম : ৭, হরিনাথ দে রোড ; শাখা—সোদপুর, পোঃ শুকচর, ২৪ পরগনা) ৩৩ বর্ষ পূর্ণ হইল। আলোচ্য বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসনীয় কর্মধারার প্রতি চিত্ত স্বতই আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা কোনও রকমে গতানুগতিক ভাবে 'পুস্তকে স্থাপিতা বিদ্যা' গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষা পাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। কি স্কুলে কি কলেজে সর্বত্রই প্রায় এই অবস্থা। বাস্তব বৃহৎ জীবনের সহিত প্রায়শই তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না, তথা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিও তাহাদের কোন শ্রদ্ধা গড়িয়া উঠে না। ছাত্রগণকে সত্যকার 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্য যে আদর্শ শিক্ষা-প্রণালীর ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দ দিয়া যান, তাহারই প্রতিরূপ এই বিদ্যার্থী আশ্রম—অতীতের এবং বর্তমান প্রগতিমূলক শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ মিলন-ক্ষেত্র। এই বিদ্যার্থী আশ্রম একাধারে আধুনিক কলেজ হোষ্টেল ও প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রম; ছেলেরা একদিকে কলেজে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসে, অপরদিকে আশ্রমপরিবেশে অভিজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের দ্বারা পূর্বতন গুরুকুল-ধারার ধর্মকেন্দ্রিক কর্মময় জীবনাদর্শে তাহারা পরিচালিত হয়। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত উপাসনা, স্বাবলম্বনসূচক গৃহকর্ম, ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, পীড়িতের সেবা, উৎসবাদি সমষ্টিগত অনুষ্ঠান, হস্ত-লিখিত পত্রিকা-পরিচালনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পর্যটন এই সকল হইতেছে আশ্রম-শিক্ষার কতকগুলি ব্যবস্থা। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের পরিচালনকালে তাহাদের ভাবগত বৈশিষ্ট্যের উপর যথাযথ দৃষ্টি রাখা হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৮ জন; তন্মধ্যে বিনা খরচে ২৫জন, ৮জন আংশিক খরচে ও বাকী ১৫জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়া ছিল। ১৭টি আই-এ ও আই-এস্সি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬জন (সকলেই প্রথম বিভাগে) উত্তীর্ণ হইয়াছে ৪জন সরকারী বৃত্তি পাইয়াছে এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ৪টি ছাত্র বি-এস্সি (দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ) এবং একজন বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাহিরের ৫৩টি ছাত্রকে 'ভানু দাশগুপ্ত স্মৃতি তহবিল' হইতে ৬৮০৲ টাকা পরীক্ষার ফি বাবদ সাহায্য করা হইয়াছিল।

বিদ্যার্থী আশ্রমের দমদমস্থ (গৌরীপুর) আবাস ১৯৪১ সালে গত যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়। বর্তমানে শিয়ালদহ হইতে ৮ মাইল দূরে বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট ৩৫ একর জমির উপর একটি সুপরিকল্পিত স্থায়ী আশ্রমাবাস গড়িয়া উঠিতেছে। কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এখানে থাকিবে একটি ঝিল (১০০০´×১৫০´), ছোট পুষ্করিণী (৩টি), খেলার মাঠ, ফুল বাগান, তরিতরকারীর ক্ষেত, গোচারণ-ভূমি, ব্যায়ামাগার, উপাসনা-মন্দির, ৯৬টি ছাত্রের থাকিবার উপযোগী চারটি একতলা এবং দুটি দ্বিতল গৃহ, শিল্প-বিভাগ ইত্যাদি। সমগ্র পরিকল্পনাটির (জমি, জমি-উন্নয়ন, গৃহাদি এবং সকল সাজসরঞ্জাম সহ) আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ১২ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৬লক্ষ ৭০হাজার টাকা (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দান ১ লক্ষ টাকা লইয়া) সংগৃহীত হইয়াছে। বাকী অর্থের জন্য কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের

১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া বাস্তবিকই আনন্দ হইল। আলোচ্য বৎসরে ১৯৯ জন বিদ্যার্থী আশ্রমস্থ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের পূত পরিবেশে পাঠাভ্যাস করিয়াছে। বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য বিভিন্নমুখী—তন্মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য, উন্মুক্ত প্রশস্তমাঠে আধুনিক বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলা, নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলন, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা, ছাত্রগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধ, প্রার্থনা-ভজনাদি, গণতন্ত্রসম্মত প্রতিনিধি-সমিতি, সেবকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত বিচারালয়, আলোচনা ও বিতর্কসভা, হস্তলিখিত 'বিবেক'ও 'কিশলয়' পত্রিকা, ছাত্রগণ-পরিচালিত নৈশবিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক ও সমবায় ভাণ্ডার, সব্জী ও ফুলবাগান, সঙ্গীত ও কলাভবন, সুন্দর গ্রন্থাগার এবং গোপালন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ ও ছাত্রগণের উৎসাহ ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লক্ষ্য করিলে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ রূপায়িত হইতেছে ইহার মধ্যে।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দিরের (৫, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩) ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

বিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগ : (১) প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক (৩) শিল্প। প্রথম দুটি বিভাগে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬৪৬ ও ৬৬১। শিল্প-বিভাগের শিক্ষার্থিনী-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও ৪৫। বিদ্যালয়-সংলগ্ন আশ্রমে (সারদামন্দিরে) ৩০ জন ছাত্রীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যায়তনটির উত্তরোত্তর উন্নতি ইহার ত্যাগব্রতধারিণী পরিচালিকা-বৃন্দের কর্মকুশলতা ও ঐকান্তিকতারই পরিচায়ক। ১৯৫২ সালে বিদ্যালয়ের ভগিনী নিবেদিতা সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিস্তারিত বিবরণ ১৩৫৯ সালের মাঘ সংখ্যার উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, কইম্বাটোর ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫২-৫৩ সালের বিবরণী আমরা পাইয়াছি। বিভিন্ন বিভাগ প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৭২ জন ছাত্রীর জন্য একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ইন্‌জিনিয়ারিং স্কুল, চিকিৎসালয়, গবেষণাগার ইহার প্রধান প্রধান অঙ্গ। ত্রিচুরাপল্লী, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম, মাদ্রাজ, তিরুপতি প্রভৃতি স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রগণের ভ্রমণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচয় প্রদান করে।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির (১৯৪৬-৫২) সনের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া জানা গেল এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বিপুলায়তন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ে বক্তৃতা, সবাক্‌চিত্রের মাধ্যমে জনশিক্ষা, ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠচক্র ও আলোচনা-সভা এবং উৎসবাদির মধ্য দিয়া ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় মূল্যবান্ ১০,০০০ পুস্তক আছে। বক্তৃতা-সভায় বর্তমানে ৮০০ হইতে ১০০০ লোকের সমাগম হয়।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫২ সনের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : ৪টি উচ্চ, ৩টি মধ্য, ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২টি ছাত্রাবাস সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা সত্যই প্রশংসনীয়। আলোচ্য বৎসরে অধ্যয়নরত বালক-বালিকার সংখ্যা মোট ৩৩২৫, প্রধান গ্রন্থাগারের

পুস্তক সংখ্যা ১৭৫৫। নানা উৎসবাদির মধ্য দিয়া ধর্মভাবপূর্ণ আবহাওয়ায় বর্ধিষ্ণু বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় অধিবাসীদিগের গর্বের বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (জানুয়ারী ৫২ হইতে জুন ৫৩)—সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত আশ্রমটি একটি সাধনার স্থান। সাধুব্রহ্মচারিগণের তপস্যার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার স্থাপনা। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ ধর্ম ও কৃষ্টি-সম্বন্ধে আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ২৬০টি আলোচনা-সভা পরিচালনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনায় ধর্মপিপাসু ভক্ত নরনারী-মাত্রই আনন্দলাভ করিয়াছেন। আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ৯৬৬২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। দারুণ গ্রীষ্মে যখন পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয় তখন শতশত পিপাসার্ত পথচারীর মধ্যে কিঞ্চিৎ গুড় ও ছোলাসহ জলদান এই আশ্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য। আশ্রমস্থ গ্রন্থাগারটির পাঠকসংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। বর্তমানে ইহাতে ৪৮৮ খানি পুস্তক আছে। গ্রন্থাগারটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ফিজি রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) ভারত মহাসাগরস্থ ফিজি দ্বীপের রামকৃষ্ণ মিশন-কেন্দ্রের বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে টাইলেভু-নামক স্থানে একটি নূতন মিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ফিজির কৃষি-অধিকর্তা মিঃ সি হার্ভে ইহার উদ্বোধন করেন।

উৎসব-দিবসে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও ভজন হয়। দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাঁচশতাধিক ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অপরাহ্ণে আহূত এক জনসভায় ফিজি মিশন-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রুদ্রানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময়ী বাণীর গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নহে; সকল ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন অনুপম সাধনা দ্বারা সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ হইল ত্যাগ ও সেবা। এই উপলক্ষ্যে শ্রী এ ডি প্যাটেল, মিঃ হার্ভে ও মিঃ এলিয়ট মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। মিঃ হার্ভে মনে করেন, মিশনের প্রচেষ্টায় কৃষিপ্রধান ফিজি দ্বীপের উন্নতি সাধিত হইবে। মিঃ প্যাটেল ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেবাদর্শের ব্যাখ্যা করেন। মিঃ এলিয়ট ইউরোপীয়গণকে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, মিশনের উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষেই অনুসরণীয়। শ্রী কে বি সিং এবং শ্রীভাস্করন্‌ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন।

২রা অক্টোবর ফিজিদ্বীপস্থ নাদি শ্রীবিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব এবং গান্ধী-জয়ন্তীর পৌরোহিত্য করেন শ্রী এ ডি প্যাটেল। সুসজ্জিত বিদ্যালয়-গৃহে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়। পশ্চিম ফিজির শিক্ষা-অধিকর্তা মিঃ ডব্লিউ এফ রিড সমাবর্তন-ভাষণ প্রদান-পূর্বক উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সার্টিফিকেট দান করেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী পি এন্ দামোদরন্ মোসাদ প্রারম্ভে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব-সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ নবভারত-সৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব অবদানের উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয় কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ-সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। মিঃ রিড, স্নাতক ছাত্রগণকে জীবনের পক্ষে কার্যকর উপদেশ দেন। স্বামী রুদ্রানন্দ ছাত্রগণকে আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক ফিজিদ্বীপে মাধ্যমিক শিক্ষার অপরিহার্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীলোধিয়ার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 'গান্ধীজীর ছাত্রজীবন'। শ্রীভাস্করন্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

হইতে গান্ধীজীর প্রিয় আঠারটি শ্লোকের আবৃত্তি করেন। শ্রীসুন্দরজী মহাত্মাজী-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও মহাত্মাজীর জীবনীতে প্রদত্ত কয়েকটি ভজন গান করেন। শ্রী কে এস্ রেড্ডি কর্তৃক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

নিউইয়র্কে প্রচারকার্য—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী গত অক্টোবর মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে যথাক্রমে 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি', 'ধর্মসাধনারূপে কর্ম' 'ঈশ্বরের মাতৃত্ব', 'জগতের মহান আচার্যগণ'—ডিসেম্বর মাসের রবিবাসরীয় বক্তৃতা হিসাবে 'আত্মার সন্ধানে মানুষ' (মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে), 'পবিত্রতার শক্তি', 'মানবে দেবত্ব', যীশুখ্রীষ্টের শৈলোপদেশ ও ইহার আধুনিক ব্যাখ্যা', 'ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ শ্রীমা' এবং জানুয়ারী মাসের রবিবারগুলিতে 'আত্মসংযমে আত্মজ্ঞান', 'আধ্যাত্মিক জীবনের নীতি', 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ', 'জগতের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ', ও 'মানবপ্রস্তুতিতে বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। প্রতিশুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্তসমিতির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী নিউইয়র্কের এই আশ্রমটির উপাসনালয়ে 'ভগবৎপ্রেমের অনুশীলন'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী— শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বোধন-উৎসব মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সাড়ম্বরে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি ও ভজনে এই শুভদিনের কার্যারম্ভ হয়। তৎপরে গীতা ও উপনিষৎপাঠ এবং ৭।৪৫ হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিশেষ পূজা, দুর্গাসপ্তশতী পাঠ ও হোম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে কীর্তন সমবেত ভক্তবৃন্দের চিত্তে অপার আনন্দ দিয়াছিল। সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পাঠ এবং শ্রীবালসুব্রহ্মণ্য আয়ার তামিল ভাষায় শ্রীমার পুণ্যচরিত আলোচনা করেন। স্বামী কৈলাসানন্দ ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও তাঁহার সহজসরল অনাড়ম্বর আদর্শ জীবনের অনুধ্যান করিতে বলেন। ১৯শে পৌষ (৩রা জানুয়ারী) রবিবার অপরাহ্নে একটি বিরাট জনসভায় তামিল তেলেগু ও ইংরেজীতে বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং পুরস্কারবিতরণ হয়। মাদ্রাজের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা সুব্রহ্মণ্যম্ সভায় নেত্রীত্ব করেন। সভার উদ্বোধনে সারদা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের সঙ্গীত, অভয় নিবাস ও শ্রীনিবাস গান্ধী নিলয়ম্ এর ভজন অতি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। ডক্টর মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন,—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর যাঁহারা দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালিকাকেই শ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের ভাব উপলব্ধি করিতে ও তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করিতে হইবে। ভগিনী শুভলক্ষ্মী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। সভানেত্রী তাঁহার ভাষণে বলেন, সীতা-সাবিত্রীর মত আদর্শ-জীবন ছিল শ্রীশ্রীমার, তাই তিনি আজ সর্বত্র সকলের পূজা পাইতেছেন। শ্রীমতী কৃষ্ণারাও তেলেগু ভাষায় শ্রীশ্রীমার জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীমার জীবন ছিল ঐশ্বরিক ভক্তিতে পূর্ণ এবং মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত। প্রতিটি কর্মে তাঁহার দেবভাব ফুটিয়া উঠিত। বর্তমান জগতের নারীজাতির শ্রীমার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রীমতী নাগলক্ষ্মী চিন্নায় পিল্লাই তামিল ভাষায় বলেন, শ্রীসারদাদেবীর বাল্যজীবন ছিল অপূর্ব।

এরূপ ঈশ্বরানুরাগ ও আত্মবিলুপ্তি বিরল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর আধ্যাত্মিক বিবাহ শ্রীমতী লক্ষ্মী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগন্মাতৃত্ব অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। আজ তিনি জগতের মা—শ্রীমা। ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন শ্রীমতী রামসুব্রহ্মণ্যম্। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজগতে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে। গীতার কর্মযোগের দেবীমূর্তি ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁহার অফুরন্ত ভালবাসা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে আপামর সকলে সমভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহার ভালবাসায় কোথাও একটুও কার্পণ্য ছিল না। বক্তৃতা-সমাপ্তির পর শ্রীমতী পালনী বিজয়লক্ষ্মীর যন্ত্রসংগীত, তৎপর আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারবিতরণ হয়। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য শেষ হয়।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব ৯ দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতি মনোহর সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের মধ্য ভাগে শ্রীশ্রীমায়ের জয়রাম বাটীকুটিরের অনুকরণে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করা হয়। মায়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি ও তৎসহিত তাঁহার অমূল্য বাণীগুলি বিভিন্ন ভাষায় ঐ কুটিরের ভিতরে ও বাহিরে টাঙ্গাইয়া দেওয়ায় উহা আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উৎসব ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হয় ও ২১শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয়। প্রথম দিনে বিশেষ পূজা পাঠ হোম ও ভজনাদি, দ্বিতীয়দিনে শ্রীযুক্তা এস ভি সোহানা কর্তৃক মহিলাদিগের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও সাধারণসভা, তৃতীয় দিনে মহিলাদিগের প্রবন্ধপাঠ ও কীর্তনাদি, চতুর্থ দিনে শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাকসারের সভানেত্রীত্বে মহিলাসভা, পঞ্চম দিনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিত লইয়া ভজনাদি সহযোগে একটি কথকতার অনুষ্ঠান, ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম দিনে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র-সহযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিষয়ে বক্তৃতা ও শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। সাধারণ সভা পরিচালনা করেন স্থানীয় হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস কে দাশ। উহাতে বিচারপতি এস সি মিশ্র, স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, শ্রীবিনয় রায় ও বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মহিলা-সভায় অধ্যাপিকা অরুণা হালদার, অধ্যাপিকা অদিতি দে, শ্রীমতী শকুন্তলা শুক্লা ও শ্রীযুক্তা এস ভি সোহনী ভাষণ দেন। দরিদ্রনারায়ণ সেবার দিনে প্রায় ২৫০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ-সহকারে খিচুড়ি, তরকারী মিষ্টাদি খাওয়ানো হয়।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১২ই পৌষ পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহ্নে আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। মহিলাগণও বক্তৃতা এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরিত ও বাণীপাঠ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। খেজুরী গ্রামে গঠিত উৎসব সমিতির উদ্যোগে অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-উৎসবের একটি প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্বামী অন্নদানন্দ, অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, খেজুরী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা এবং অন্যান্য শিক্ষক ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ৫ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) হইতে ৫ দিন তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষপূজা, সপ্তশতী হোম,

ভজনকীর্তন, চণ্ডীর গান, নরনারায়ণ নাটিকা অভিনয়, শোভাযাত্রা, চণ্ডী ও ভাগবতপাঠ, কথকতা, প্রসাদ-বিতরণ প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবস শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ-চন্দ্র দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। চতুর্থ দিবসের বক্তা ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। শ্রীভূপতিচরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভাগবতপাঠ ও কথকতা করেন। কয়দিনে দশ সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতি অনুষ্ঠানে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিগত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন হয়। বোষ্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির নেতা স্বামী পবিত্রানন্দজী এবং এই কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী নিখিলানন্দজীর সহযোগিতায় বিশেষ পূজা ও হোমাদি সুসম্পন্ন করেন। নিউইয়র্কের দুইটি কেন্দ্রের বহু ভক্ত এই পূজা দর্শন করিতে আগমন করিয়া-ছিলেন। বিবিধ কুসুমসম্ভারে সুসজ্জিত মন্দিরা-ভ্যন্তর অপূর্ব দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। উষা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পূজানুষ্ঠান চলে। পূজান্তে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপর ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার একটি সাধারণ উপাসনা-সভা হয়। স্বামী নিখিলানন্দজী 'ভারতীয় নারীগণের আদর্শ শ্রীমা'-বিষয়ক বক্তৃতায় দেখান কিভাবে সারদাদেবী তাঁহার অপূর্ব সারল্য পবিত্রতা ত্যাগ ও প্রেমমণ্ডিত জীবন দ্বারা জগতের সকল নারীগণেরই অনুকরণীয় একটি মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বক্তা বলেন, উহার আংশিক মাত্র জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলে পাশ্চাত্ত্য নারী-সমাজে এক গৌরবোজ্জ্বল নবযুগের আবির্ভাব হইবে। বক্তৃতা এরূপ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, উপস্থিত সকলেরই মনে হইতেছিল যেন প্রত্যেকেই একটি পবিত্রতার রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন। বিচিত্রবর্ণের উজ্জ্বল পুষ্পমাল্যে সুশোভিত সভামণ্ডপস্থ বেদির উপর শ্রীশ্রীমার বিরাট প্রতিকৃতি-দর্শনে বোধ হইতেছিল যেন বেদিতে সমাসীনা শ্রীমা শ্রোতৃ-বৃন্দের উপর শুভাশিস্ বর্ষণ করিতেছেন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রের উপাসনা-গৃহে ১৯শে ফেব্রুয়ারী আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন আমেরিকাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত জি এল মেহ্‌তার পত্নী শ্রীমতী সৌদামিনী মেহ্‌তা। স্বামী অখিলানন্দজী এবং স্বামী পবিত্রানন্দজীও সভায় বক্তৃতা করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল, রাষ্ট্রদূত শ্রী জি এল মেহ্‌তা, ভারতের কনসাল্ জেনারেল শ্রীআর্থার এস্ লাল এবং তাঁহার পত্নী অন্যতম। স্বামী নিখিলানন্দজী পবিত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার শুভ উদ্বোধন করার পর সংক্ষেপে শ্রীমার জীবনী বিবৃত করেন। বাংলার একটি নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন সাধারণভাবে জীবন যাপন করিলেও শ্রীসারদাদেবী আজ জগতের পূজার্হা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে কিভাবে তিনি নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁহার তিরোভাবের পর কি ভাবে রামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী-রূপে শত শত সন্তানের পথপ্রদর্শিকা হন—বক্তা আবেগময়ী ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। শ্রীমতী সৌদামিনী মেহ্‌তা শ্রীশ্রীমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ এবং স্ত্রীধর্ম-সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেন। স্বামী অখিলানন্দজী ও স্বামী পবিত্রানন্দজী শ্রীশ্রীমার মধুর স্মৃতিকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন, এরূপ দয়া নম্রতা সরলতা শুচিতা

ক্ষমা, মাতৃস্নেহ নিজে না দেখিলে ধারণা করাও কঠিন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের পূর্ণতম অধীশ্বরী হইয়াও সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাব কি ভাবে যে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিতেন তাহা কল্পনারও অতীত। স্বামী নিখিলানন্দজী বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বেদের একটি আশীর্বাণী পাঠ করিলে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

বোম্বাই নগরে ও এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব' ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হইয়াছে। খার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমার ১০১ তম জন্মতিথি-দিবসে প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি, তৎপরে বিশেষ পূজা, ভজনগান, দ্বিপ্রহরে হোম, ভোগরাগ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে আশ্রমস্থ বিবেকানন্দ হলে একটি বিরাট সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মহিলাসঙ্ঘের সহাধ্যক্ষা শ্রীমতী তারাবেন প্রেমচাঁদ সভানেত্রী হন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ 'নারীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শ শ্রীমা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রী এস্ সি দাশগুপ্ত ইংরেজীতে, শ্রীমতী ববীবেন মুলজী দয়াল (অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) গুজরাটীতে, শ্রীমতী এম্ এস্ এইচ্ ঝাবওয়ালা (অখিল ভারত মহিলা-সম্মেলনের অধ্যক্ষা) হিন্দীতে এবং শ্রীমতী কুসুমবাঈ পাসটেকর মারাঠীতে শ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী) একটি মহিলা-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাতে সভানেত্রীত্ব করেন বোম্বাই রাজ্যপালপত্নী শ্রীযুক্তা বাজপেয়ী। সভানেত্রী মহোদয়া অসুস্থতাবশতঃ কোন ভাষণ দিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার উপস্থিতিতে সভার কার্য সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খ্যাতনামা সুরশিল্পিগণের সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করে।

প্রাচীন সন্ন্যাসি-দ্বয়ের দেহত্যাগ— শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী মোক্ষদানন্দজী (মুদ্দাপ্পা বা 'ব্রাদার' মহারাজ নামে পরিচিত) গত ১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৬৪ বৎসর বয়সে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে তিনি উদরে ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। কুর্গদেশবাসী মুদ্দাপ্পা ১৯১৫ সালে মঠে যোগদান এবং ১৯২৩ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার শান্ত অমায়িক ব্যবহার এবং সেবাপরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। বহুবৎসর তিনি আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটিরে ধ্যানধারণা এবং আশ্রম-সেবা লইয়া কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহবিমুক্ত আত্মার পরমা শান্তি কামনা করি।

গত বুধবার ৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ৩টা ১৫ মিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী অমেয়ানন্দজীর (মোক্ষ মহারাজ) নশ্বর দেহ পরম পদে বিলীন হইয়াছে। ইনি ১৯১৮ সালে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের পুতসংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান ও পরে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সংঘে আসিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে যোগদান করিবার বহুপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আর্তত্রাণাদি সেবাকার্য হইতেই তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় ও পরে সন্ন্যাস জীবনে গড়বেতা চণ্ডীপুর ও তমলুকে তাঁহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে ইঁহার জন্ম হয় এবং এই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই জেলার নানা জনহিতকর কার্যে অতিবাহিত হয়। এই জেলার বহু গৃহী নরনারী ও ধর্মপ্রাণ যুবক তাঁহার চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাব গ্রহণের অধিকারী হইয়াছেন এবং এই সকল যুবকের কেহ কেহ আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান

করিয়াও জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রায় শেষ ছয় বৎসর কাল তমলুক আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে নানা জনহিতকর কর্মদ্বারা তিনি যে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর যে বিরাট শোভাযাত্রা হয় তাহার দ্বারাই সূচিত হয়। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি করোনারী থম্বোসিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন ও নিজের অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শুভ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। তবে জয়ন্তী-উৎসব আরম্ভ করিয়া আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃভক্ত বালক 'মা মা' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার বিদেহ আত্মা মায়ের অভয় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই জগদম্বার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

জামসেদপুরে অনুষ্ঠান—জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত ১১টি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভাও হয়। সভায় আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, কলিকাতাস্থ জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং জামসেদপুরের শ্রীমতী বীণারাণী দত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ছাত্রছাত্রীগণের আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির খুব প্রশংসা করেন। স্বামীজীর উৎসব উপলক্ষ্যে দুইটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। একটি বিষ্টুপুর সোসাইটিতে অপরটি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উভয় সভাতেই বিরাট জনসমাগম হয়। সুবক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিয়া তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯ তম জন্মতিথি গত ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ) শনিবার, বেলুড়মঠে সারাদিনব্যাপী পূজা, হোম, পাঠ, কীর্তনাদি সহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বহুসহস্র নরনারী এই উপলক্ষ্যে মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রায় দশহাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে সন্ধ্যায় শত শত স্ত্রীপুরুষ ভক্তিতদ্‌গতচিত্তে ঠাকুরের আরতি দর্শন করেন। আরতির পর গভীর রাত্রি পর্যন্ত মূল মন্দিরে দশমহাবিদ্যার পূজা সম্পন্ন হয়। শেষ রাত্রে সমবেত সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে ও যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ৭ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং ১২ জন ব্রতীকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দান করেন।

অপরাহ্নে মন্দিরের পূর্বদিকের প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ-স্বামী মাধবানন্দজীর পরিচালনায় একটি মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী ইংরেজীতে এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার বাঙলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী মাধবানন্দজী বলেন যে, রামকৃষ্ণদেব শুধু বাঙলা দেশের নন, সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। তিনি জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও বাণীর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। ঠাকুর সমগ্র জাতিকে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বর্তমানে বহুমুখী উন্নত বৈজ্ঞানিক জগতে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরম শান্তির পথ দেখা যায় না। সেইজন্য রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধনার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মপথে শান্তির আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে প্রাচীন ভারতীয় পাণ্ডুলিপি—লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে যে প্রাচ্য পুস্তকাবলী এবং পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ঋগ্বেদ এবং রামায়ণের ন্যায় পুরাতন ভারতীয় পাণ্ডুলিপিগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচ্য সভ্যতা এবং মধ্যপ্রাচ্য, ভারত এবং দূর প্রাচ্যসম্বন্ধে পরিচয় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫০টি বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডুলিপি এবং পুস্তকাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাদ্বারা ভারতের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের একটি সুষম চিত্র লাভ করা যায়। ঋগ্বেদ এবং রামায়ণের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মপুস্তক এবং মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি যেমন এই প্রদর্শনীতে আছে তেমনই আছে বিভিন্ন যুগের বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য। তালপত্র, স্বর্ণথালি, তাম্র, কাঠের বোর্ড এবং অন্যান্য বহুবিধ উপকরণের উপর লিখিত অহমিয়া, বর্মী, হিন্দী, মারাঠী, সিন্ধী, সিংহলী, তামিল প্রভৃতি ভাষার পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

ইহা ছাড়া প্রদর্শনীতে আছে পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন বৌদ্ধ পালিপুঁথি। এই সঙ্গে আছে ভারতীয় ভাষায় এবং বিশেষ ভাবে দক্ষিণী ভাষায় অনূদিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি। (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস)

ফলতায় (২৪ পরগনা) জনসেবা

বিগত ১৯৫০ সালে অশিক্ষিত, দরিদ্র ফলতা অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কলিকাতার কতিপয় উদারচেতা ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা ও বদান্যতায় এই সেবাশ্রমের সেবা, শিক্ষা ও প্রচার-কার্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যালয় নামে জুনিয়ার হাই স্কুল চলিতেছে এবং উহা গভর্নমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন সেবাশ্রমে রোগীর সেবা, বস্ত্রাদি দান, দুগ্ধবিতরণ, ঔষধ বিতরণ, ক্ষুধাতুর বালক, বালিকা ও প্রসূতিদের সাধ্যমত অন্নদান প্রভৃতি সেবাকার্য হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর মহাপুরুষদের জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৺মানবেন্দ্রনাথ রায়—গত ১১ই মাঘ সোমবার বঙ্গমাতার সুসন্তান ও বিশ্বের একজন অন্যতম বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্র রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ছিল প্রখরতম যুক্তি ও অসামান্য সাহসিকতায় সমুজ্জ্বল। বর্তমান প্রগতিশীল জীবনে তাঁহার চিন্তাধারার মূল্য অনেকখানি। মানবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, কর্মনিষ্ঠা ও আদর্শ যুবসমাজের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়—গত ১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) ৺জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং সলিসিটর শ্রীরতনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে একজন বরেণ্যা আদর্শ মহিলার অভাব ঘটিল। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, সেবাপরায়ণতা ও সামাজিক সৌজন্যের জন্য তিনি সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও লেখিকা বলিয়াও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 'উদ্বোধনে'ও তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার

ঊর্ধ্বগতি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী—গত ১২ই পৌষ আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ভোর ৬টায় মঙ্গল-আরতি, প্রার্থনা ও ভজনগান হইয়াছিল। অতঃপর বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। বৈকাল চার ঘটিকায় এক জনসভার অধিবেশন হয়। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বহু মহিলা এবং দিল্লী হইতে আগত অন্যতম উপমন্ত্রী শ্রীজয় সুখলাল হাথী এই সভায় যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মবার্ষিকী-উপলক্ষ্যে ১৭ই পৌষ দেওঘর নাগরিকবৃন্দ স্থানীয় রাজনারায়ণ বসু পাঠাগারে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। ধূপের সৌগন্ধ্য, শঙ্খধ্বনি ও সঙ্গীতের পবিত্র পরিবেশে মায়ের পূজা ও অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অবসরে হুগলী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্মের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী, ভাগবতভারতী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-অবলম্বনে স্বরচিত মাতৃভাগবত পাঠ করেন। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, মহকুমা হাকিম শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনন্দন সহায় বক্তৃতা দেন।

দরং তেজপুর (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১২ই পৌষ পূজাপাঠ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও প্রসাদ-গ্রহণাদির মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাঁদপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ১৮ই এবং ১৯শে পৌষ (২রা ও ৩রা জানুয়ারী) শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হয় পূজা পাঠ হোম শাস্ত্রাবৃত্তি নগরকীর্তন নাট্যাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্বামী রামেশ্বরানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্বামী শর্মানন্দ, পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত আলোচনাসভায় ভাষণ দেন।

বাগুইআটি (২৪ পরগনা) পল্লীকল্যাণ সংঘের উদ্যোগে ১লা জানুয়ারী হইতে ৩রা জানুয়ারী তিনদিনব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান যথাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই পুণ্য উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে সকালে বাগুইআটি হরিসভা ও নেতাজী কিশোর সংঘ কীর্তনসহকারে পল্লী পরিভ্রমণ করে। তৎপরে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, হোমাদি ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দের ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, কথামৃত-পাঠ ও কীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে। উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশনে অপরাহ্নে হিন্দু বিদ্যাপীঠ ছাত্রসংসদের পরিচালনায় সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'ছোটদের আসর' বসে। সন্ধ্যায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভক্তিরত্ন কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কীর্তন হয়। উৎসবের শেষদিন তৃতীয় অধিবেশনের অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। স্থানীয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আলোচনায় যোগদান করেন।

বলরামপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে ১২ই পৌষ রবিবার দিন পূর্বাহ্নে গ্রামের বালক, বালিকা ও মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া সমবেত কণ্ঠে মাতৃসংগীত সহ শোভাযাত্রায় সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হোম যথাবিধি সম্পন্ন হয় ও পরে প্রায় দুই হাজার নরনারী মায়ের প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হন। অপরাহ্নে একটি মহিলাসভা হয়। সন্ধ্যারতির পর ভজনগান খুব উপভোগ্য হইয়াছিল।

দেবগ্রামে (নদীয়া) গত ১২ই পৌষ শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও নামকীর্তনান্তে "জয়ন্তীসঙ্গীত" সহ প্রভাতফেরী গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর শোভাযাত্রা ৺সতীমায়ের ভিটায় আসিয়া শেষ হয় এবং সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐদিন পূজাগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপর প্রসাদ-বিতরণ ও নর-নারায়ণের সেবামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ৺সতীমায়ের ভিটাতেই একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপধামবাসী পরম ভাগবত শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াশী, এম্.এ মহোদয় জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের দমদম (২১এ, দমদম রোড) এবং টালিগঞ্জ (১১, অর্চনা এভিনিউ, নাকতলা) এই উভয়কেন্দ্রে ১লা ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার পর্যন্ত সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

১লা ফাল্গুন, শনিবার : সমস্তদিনব্যাপী পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ। প্রায় সাত শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২রা ফাল্গুন, রবিবার :—দমদম আশ্রম হইতে সকাল ৮॥ টায় পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্যা ও অন্যান্য মহিলা ভক্ত পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত একটি দোলায় শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে কীর্তন, জয়ধ্বনি ও শাস্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে বরাহনগর ও আলামবাজার হইয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সেখানে পূজা সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পবিত্র স্থানসকল দর্শনান্তে শোভাযাত্রা পুনরায় দমদম আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে। এই শোভাযাত্রা পথিপার্শ্বে অপেক্ষমাণ জনগণের, বিশেষতঃ আশ্রম-কন্যাদের অন্তরে বিপুল আশা, আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ৩রা ফাল্গুন, সোমবার অপরাহ্নে দমদম আশ্রমে বেলুড়মঠের স্বামী জপানন্দজীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সভায় শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার একটি সুলিখিত প্রবন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন। তৎপরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে ভাষণ দেন।

অনুরূপ ভাবে ৫ই ফাল্গুন বুধবার টালিগঞ্জ নাকতলা আশ্রমে সমস্তদিনব্যাপী পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন ও সহস্রাধিক লোকের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ হয়। ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার নাকতলা আশ্রম হইতে পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্যা সুসজ্জিত দোলায় শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের প্রতিকৃতি বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে কুসুমকাননস্থিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর মন্দিরে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর বিশেষ অভ্যর্থনা ও ভোগরাগের দ্বারা পূজিত হইলে শোভাযাত্রা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে। ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্নে স্বামী জপানন্দজীর পরিচালনায় এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী জপানন্দ এবং আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দ আশ্রমের উভয়কেন্দ্রে প্রতিবেশী মায়েদের লইয়া মাতৃমঙ্গল সমিতির উদ্বোধন হয়।

গত ২৬শে পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ধীপুরের স্বর্গত সুরেন্দ্রকান্ত সরকার মহোদয়ের বসত বাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিক্রমপুর অঞ্চলের সর্বপ্রথম সাধারণ উৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণমঠের স্বামী সত্যকামানন্দ ও স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ এবং বিভিন্ন গ্রাম হইতে অন্যূনাধিক ছয় হাজার লোক উক্ত বাটিতে সমাগত হন। প্রত্যুষে সন্ন্যাসিদ্বয়ের পরিচালনাধীনে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও

মায়ের প্রতিকৃতি পুরোভাগে লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগরকীর্তন করিতে করিতে রাউংভোগ, ধীপুর ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে সুশোভিত মণ্ডপে স্থিত উক্ত পটের সম্মুখে কীর্তনীয়াদল মধুর কীর্তনগান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। দ্বিপ্রহরে স্থানীয় ব্রাহ্মণভিটা উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে স্বামী সত্যকামানন্দ বক্তৃতা এবং স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ ঠাকুর ও মায়ের পূজা সম্পন্ন করেন। ভক্তপ্রবর সরকার মহোদয় যে ঘরে থাকিতেন সেই কক্ষে বসিয়া প্রবীণ ভক্তেরা শ্রীশ্রীমায়ের ও তাঁহার সহচরী শ্রীশ্রীযোগীন মার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্ণে একটি জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি ভাষণ দেন। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে কুমিল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকবৃন্দ ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শন করিলে পর রামায়ণগান হয়। রাউংভোগ ধীপুর ইউনিয়নের অধিবাসিগণের সমবেত চেষ্টার ফলে এবং উক্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় শ্রীসুনীল কুমার বসু, শ্রীরাধামাধব দাস, শ্রীঅনন্তকুমার ঘটক, শ্রীশৈলেন্দ্রকান্ত সরকার এবং শ্রীনরেশচন্দ্র দাস মহোদয়গণের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১২ই পৌষ সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার্চনা, বেদমন্ত্র ও দেবীমাহাত্ম্য-পাঠ, ভজনসঙ্গীত; অপরাহ্ণে সমবেত প্রার্থনা এবং সন্ধ্যায় ধর্মসম্মেলন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল— "পৃথিবীর মহীয়সী মহিলাগণের জীবনী আলোচনা ও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অবদান"। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জমিদার ও বিশিষ্ট উকিল শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় এবং বক্তৃতা করেন মৌলবী আমির আলী জোয়ারদার মুন্সেফ, মৌলবী সিরাজুদ্দিন আহাম্মদ মুন্সেফ, রেভারেণ্ড সুরেশচন্দ্র দাস এবং অধ্যাপক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ও শতবার্ষিক-জন্মোৎসব

৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, (বাং ৫ই চৈত্র) শুক্রবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব ও মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই পুণ্যস্থানে ৭ই হইতে ৯ই এপ্রিল (বাং ২৪শে হইতে ২৬শে চৈত্র) তীর্থযাত্রীদের খুব ভিড় হইবে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু জয়রামবাটী একটি ছোট গ্রাম, সমাগত যাত্রীদের সুখ-সুবিধা ও স্থানসংকুলান করার জন্য সাময়িক যাত্রিনিবাস নির্মাণ করা হইতেছে।

এই সব কার্যে সময় এবং অর্থ দুইই প্রয়োজন। অতএব যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন ২০শে মার্চের মধ্যে নীচে লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহ পত্র আমাদের নিকট লিখেন এবং আসিবার সময় বিছানা, মশারি ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনেন।

উৎসবের তিন দিনের প্রতিদিন প্রায় ৪০,০০০ ভক্ত যাত্রী প্রসাদ পাইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত যে কোন দান সাদরে গৃহীত হইবে।

জয়রামবাটী যাইবার সহজ পথ ঃ

কলিকাতা হইতে ট্রেনে বিষ্ণুপুর ও সেখান হইতে বাসে জয়রামবাটী।

ট্রেনের সময় ঃ—

যাইবার	১।	হাওড়া	ছাড়ে	সকাল ৭টা	বিষ্ণুপুর	পৌঁছায়	২-১১ বিকাল
	২।	"	"	রাত্রি ৯-১০	"	"	২-২৯ রাত্রি
ফিরিবার	১।	বিষ্ণুপুর	"	সকাল ১১-৫৩	হাওড়া	"	৭টা সন্ধ্যা
	২।	"	"	রাত্রি ১০-১৩	"	"	৪-১০ ভোর

বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী ২৮ মাইল, বাস সব সময় পাওয়া যাইবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ ১। নাম ও ঠিকানা..................................

২। যাত্রিসংখ্যা (শুধু বয়স্কেরা আসিবেন) পুরুষ ....মহিলা.........

৩। পৌঁছানর তারিখ.......... ...... ৪। অন্যান্য কিছু জানাইবার থাকিলে................

স্বামী মাধবানন্দ (সাধারণ সম্পাদক)— শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)



প্রিয় ও অপ্রিয়

মা পিয়েহি সমাগচ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং।
পিয়ানং অদস্‌সনং দুক্‌খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্‌সনং ॥
তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়াপায়ো হি পাপকো।
গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিয়াপ্পিয়ং ॥
পিয়তো জায়তী সোকো পিয়তো জায়তী ভয়ং।
পিয়তো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং ॥
পেমতো জায়তী সোকো পেমতো জায়তী ভয়ং।
পেমতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং ॥

—বুদ্ধবাণী (ধম্মপদং, পিয়বগ্‌গো, ২-৫)

[পরমশ্রেয়পথের যাত্রীকে প্রিয় এবং অপ্রিয় রূপ দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। দুইটাই মনকে সংসারে টানিয়া রাখে, দুইটাই বন্ধন। দুইটির প্রতিই অভ্যাস করিতে হইবে বিবেক-প্রখর উদাসীনতা।]

যাহা প্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার সহিত কখনও নিজেকে জড়াইয়া ফেলিও না, আর যাহা অপ্রিয় তাহারও সংস্পর্শে গিয়া দুঃখ ডাকিয়া আনিও না। প্রিয়ের অদর্শনে দুঃখ, অপ্রিয়ের দর্শনে দুঃখ। (প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় হইতে চিত্তকে বিমুক্ত রাখিয়া দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।)

কোন কিছুকেই অতএব, প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিও না, কেননা একদিন প্রিয়ের বিচ্ছেদ আসিয়া নিদারুণ দুঃখভার মাথায় চাপাইয়া দিবে। প্রিয়-অপ্রিয়কে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রিয়-বুদ্ধি হইতেই আসে শোক, প্রিয়-চিন্তা হইতেই তো উদ্‌বুদ্ধ হয় শঙ্কা। প্রিয়-ভাবনা হইতে যিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাঁহার কোন সন্তাপ নাই। তাঁহার ভয়ই বা কিসের ?

আসক্তি-মলিন ভালবাসার পরিণাম ক্লেশ, ঐরূপ ভালবাসা আবার, ভয়েরও জনক। অনিত্য বৈষয়িক প্রীতি হইতে যিনি বিমুক্ত তাঁহার কখনও চিত্ত-বিকলতা আসে না। ভয়ই বা তাঁহার কাছে আসিবে কেমন করিয়া ?

কথাপ্রসঙ্গে

বৈশাখে

নূতন বর্ষের প্রথম প্রভাতে দেশ-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও মৈত্রী নিয়োজিত হউক। বাহিরের বিচিত্র পরিবেশ মানুষের অন্তরের মিলনকে যেন প্রতিহত করিতে না পারে। মানুষ যে জায়গায় এক, সেই জায়গাটির দিকে সে চোখ বুঁজিয়া থাকে বলিয়াই তো তাহার এত দ্বন্দ্ব, এত সংঘর্ষ। বৈশাখের প্রখর কিরণ আমাদের নয়নের জড়তা দূর করুক, আমরা চোখ খুলিয়া নিজের দিকে তাকাই, বিশ্বের দিকে তাকাই, নিজের মধ্যে বিশ্বকে, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করি। সেই আবিষ্কার আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্কলুষ করুক, আচরণকে নিঃস্বার্থ করুক, হৃদয়াবেগকে উদার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করুক!

* * *

বৈশাখীপূর্ণিমা তিথি স্বতই আমাদের স্মরণপথে আসিতেছে। মানবের পরম মিত্র ভগবান বুদ্ধদেব এই পুণ্যতিথিতে জন্মগ্রহণ, তথা সম্বোধি- ও নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া তাঁহার দেবচরিত্র এবং মুক্তি ও সেবার বাণী পৃথিবীর নানা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শান্তি ও শক্তি দিয়া আসিতেছে। মানুষ যদি জিতেন্দ্রিয়, দ্বেষ-লোভ-মোহ-বিমুক্ত, শান্ত এবং নিঃস্বার্থ জীব-প্রেমিক হইতে পারে তাহা হইলেই সে প্রকৃত ধার্মিক, তবেই সে প্রকৃত মহান। পুঁথিপত্রের বড়বড় তত্ত্বকথা, লোকাচার, দেশাচার, এবং অন্ধ গতানুগতিকতার মধ্যে ধর্ম নাই, ধর্ম মানুষের আত্মিক উৎকর্ষে—গৌতম বুদ্ধ এই কথাটিই তাঁহার জীবন ও সরল উপদেশের মধ্য দিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন। সত্য যে মতের অপেক্ষা বড়, বেদের এই সর্বোত্তম শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অনুসরণকারী হেঁয়ালীর মতো শুনাইলেও বলিতে বাধা নাই—ছিলেন বেদেরই নিন্দাকারী ভগবান শাক্যমুনি। নিন্দা তিনি করিয়াছিলেন বেদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগকে, বেদ-সত্যকে নয়। বেদের প্রকৃত মর্ম তাঁহার জীবনে যেমন মূর্তিগ্রহণ করিয়াছিল এমন লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর এক-জনের মধ্যে কচিৎ দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধ বেদ-সত্যেরই অভিব্যক্তি। সনাতন ভারতবর্ষ তাই তাঁহাকে অবতার বলিয়াই পূজা করে। আমরা এই সংখ্যায় তাঁহার স্মৃতিপূজা হিসাবে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ ও কবিতা সন্নিবদ্ধ করিলাম।

* * *

বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ভগবান শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজে এই মহামনীষীর বলিষ্ঠ চিন্তা ও ভাবধারা একদিন প্রচুর শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। এখনও উহার ক্রিয়া চলিতেছে। 'সর্বংখল্বিদংব্রহ্ম'—ক্ষুদ্র বৃহৎ চেতন অচেতন যাহা কিছু দেখিতেছ সকলই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—বহু-বৈচিত্র্যময় জগতে প্রকৃতপক্ষে বিভেদ কিছু নাই, সব কিছুই চৈতন্যসত্তায় দেদীপ্যমান—উপনিষদের এই একত্বের বাণীই শঙ্করাচার্য প্রচার করিয়াছিলেন। এই একত্বের শিক্ষা মানুষের হৃদয়-মন হইতে সকল দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দেয়, নিজের অজর অমর আত্মস্বরূপে আস্থা আনিয়া তাহাকে নির্ভীক, সবল ও নিঃস্বার্থ করে। আচার্যের অদ্বৈতবাদ পরাজয়ের, পলায়নের দর্শন

নয়—বিশ্বপ্রকৃতির মর্মোপলব্ধির দর্শন—জগৎ ও জীবনকে বৃহত্তমরূপে গ্রহণের দর্শন।

* * *

বাঙলায় এবং বাঙলার বাহিরে শিক্ষিত বাঙ্গালী ২৫শে বৈশাখ তারিখটিকে একটি জাতীয় উৎসব-দিন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কবিতায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে তথা স্বাদেশিকতা ও দেশসেবায় যিনি বাঙ্গালীর প্রাণে এক অভিনব উদ্দীপনা ও শক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন ২৫শে বৈশাখে সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী তাহার জাতীয় গৌরবেরই পূজা করে। বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোথায়, শত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও তাহার জীবনের ঐক্য কোথায়, এই বোধটি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন অতি নিবিড়ভাবে। তিনি যে একজন সত্যকারের বিশ্বমানব ছিলেন, সর্বদেশের সকল মানুষের হৃদয়মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আহরণ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে বোধ করি এই জিনিসের অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান কবির বাঙ্গালীত্ব-চেতনা। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী বাঙলার মাটিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহার সামাজিক ঐতিহ্যের উপর গভীর অনুরাগ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহার ভাষা ও জীবনধারার প্রতি একটি নূতনতর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। তবুও কিন্তু কবির মধ্যে একটুও প্রাদেশিকতা ছিল না। বাঙ্গালীর যাহা কিছু সুন্দর তাহার সহিত ভারতের যাহা কিছু সুন্দরের একটুও বিরোধ নাই—এই সত্য কবির জীবনে ও রচনায় কী স্পষ্টভাবেই না আমরা দেখিতে পাইয়াছি! তাঁহার জীবনের ও বাণীর এই দিগ্দর্শন আজ বাঙ্গালীকে সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। সমকালে তাহাকে হইতে হইবে পূর্ণ বাঙ্গালী এবং পূর্ণ ভারতীয়।

পূজা-আরতির স্বপক্ষে

"এই যুগের ঠাকুরকে ও তাঁহার মন্ত্রদীক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে তাঁহার অনুবর্তীরাই বুঝিল না। বুঝিল না যে, এ যুগপ্রবর্তক ঠাকুর পূজারতির ঠাকুর নয়, মঠ-মন্দিরের চারটি দেয়ালের ঠাকুর নয়, এ দরিদ্রনারায়ণের জাগরণকারী ঠাকুর কাঙ্গালী ভোজনের তুচ্ছ ঠাকুর নয়। * * * ঠাকুরের পাষাণ মূর্তি ঘিরিয়া তোমাদের শঙ্খঘণ্টা পূজারতির ম্লান দীপ এমনই ব্যর্থতায় ডুবিয়া যাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের দেওয়া অজস্র সাধনসম্পদ তোমরা পাইয়াও হিন্দুত্বের বাণী কতটুকু দিকে দিকে বহিয়া লইলে! * * * তোমাদের ব্যর্থতার মূলে আছে অন্ধপূজা আর ব্যর্থ ভোগলোলুপতা। যুগের ঠাকুরকে, বিশ্বের ঠাকুরকে, নবযুগের ঠাকুরকে গৈরিক, দণ্ড, কমণ্ডলুর মাঝে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া তোমরা ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছ।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ২২শে ফাল্গুনের দৈনিক বসুমতীর 'যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ'-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে লওয়া। উদ্ধৃতির কঠিন কথাগুলির লক্ষ্য কাহারা—লেখায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু কথাগুলির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এক ধরনের আচরণের অর্থাৎ পূজা-আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানমূলক শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। লেখকের মতে এই সকল বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা ঠাকুরের যুগকার্যকে ব্যাহত করা হইতেছে।

পূজা-আরতির প্রতিবাদ—উহাদের যিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ—তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই শুনিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিয়াও তাঁহার অনুবর্তীদের পূজারতি বন্ধ করিতে বলেন নাই। ঠাকুর যে মন্দিরের ঠাকুর নন্, বিশ্বের ঠাকুর, ইহাও আবার, তাঁহারই সতর্কবাণী। কিন্তু এই সতর্কবাণীর অর্থ নিশ্চিতই ইহা ছিল না যে, যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিতে চায় তাহারা ভয়ানক অন্যায় করে। তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণই বা তাঁহার নিজের ফটোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 'কালে ঘরে ঘরে এর

পূজা হবে'—ইহা বলিয়া যাইবেন কেন? স্বামী বিবেকানন্দই বা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটের পূজার প্রবর্তন করিয়া যাইবেন কেন? তাঁহার দেহত্যাগের দিনও তিনি ঠাকুরঘরে গিয়া বেলা ৮টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যগণও এই পূজা-সেবার ব্যবস্থাকে সমর্থন ও পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সত্য, স্বামীজীর 'ঠাকুরঘরে' 'ভয়' ছিল; স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৪ সালে আমেরিকা হইতে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all (সর্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসনের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (ঝোঁক) আছে, আমার তাই ভয়।"

বলা বাহুল্য, এই 'ভয়' শব্দবণ্টা চামরের বাড়াবাড়িরই ভয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার গভীরতর, ব্যাপকতর বাস্তব প্রয়োগকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহ্যিক মাতামাতির ভয়। স্বামীজীর উক্ত আশঙ্কা যদি কোন ক্ষেত্রে সত্য হইয়া থাকে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রধান অঙ্গ ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবার কথা ভুলিয়া যদি কেহ শ্রীরামকৃষ্ণ-পটের সম্মুখে পূজারতিকেই সার করিয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই উহা সমর্থন করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনের সর্বাঙ্গীন আদর্শকে সর্বদা পুরোভাগে রাখিয়া যাঁহারা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির জন্য মন্দিরে পূজা পাঠ আরতি হোমাদিতে কয়েকঘণ্টা কাটাইয়া বাকী সময় অতন্দ্রিত লোকহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদিগকে নিশ্চিতই কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বলা চলে না। আদর্শকে ভাবুকতা দ্বারা দূর হইতে নিরীক্ষণ করা এক কথা আর উহাকে শরীর মনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিশাইয়া ফেলা স্বতন্ত্র কথা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বহু ত্যাগ স্বীকার, বহু ধৈর্য-অধ্যবসায়-উদ্যমের প্রয়োজন হয়, অনেক 'খূন ঔর পসীনা' (রক্ত ও ঘাম) ফেলিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁহাদের 'অনুবর্তী'গণ বহুতর বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও যে অবিচলিত বিশ্বাস, অকুণ্ঠিত আদর্শনিষ্ঠা, সাহস ও চরিত্রবল লইয়া দিগ্-দিগন্তরে যুগপুরুষদ্বয়ের বাণীর প্রচার ও নানাভাবে বাস্তব রূপদান করিয়া আসিয়াছেন তাহা দেশে ও বিদেশে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইয়া থাকেন। অনেকে অবশ্য দেখিতে পান না, কারণ তাঁহাদের দেখিবার ইচ্ছা নাই।

চরিত্রের শক্তি, সেবার শক্তি আকাশ হইতে নামিয়া আসেনা—আসে তদ্গত আত্মসংযম, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মত্যাগ, অন্তর্মুখীনতা হইতে, গভীর ভগবদ্বিশ্বাস এবং ভগবৎপ্রেম হইতে। এইগুলি অনুশীলন করিতে হয়, দিনের পর দিন—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় 'ত্রেকেটে তাক্' তবলায় তুলিতে গেলে দীর্ঘকাল হাত সাধিতে হয় সেইরূপ। এই অনুশীলনের পথে মঠ-মন্দিরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে পাষাণ-প্রতিমা, পূজারতির দীপ, শঙ্খ-ঘণ্টা, দণ্ড-কমণ্ডলু যদি আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলে আঁৎকাইয়া উঠিবার কিছুই নাই। এগুলি পথের প্রয়োজন, শতকরা ৯৫ জনের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন; কিন্তু ইহারা পথের চির-সাথী নয়, এগুলিকে ডিঙ্গাইয়া পথ যে আরও বহু বহু দূর চলিয়া গিয়াছে—সে তথ্য সমালোচকগণের ভ্রূকুটি-লক্ষিত 'অনুবর্তিগণে'র হয়তো ভাল করিয়াই জানা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য কে কতটা বুঝিয়াছে, বুঝিতে কে কোথায় কতটা ভুল করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে রায় দেওয়া সহজ নয়। এ কথা নিশ্চিতই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে তাঁহারা শুধু ভারতের নন, সারা বিশ্বের; শুধু

মঠ মন্দিরের নন, মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রের ; শুধু সন্ন্যাসী ও ভক্তের নন, সমাজের ও দেশের সর্বস্তরীয় নরনারীর। তাঁহাদিগের বাণীর মধ্যে যিনি যেরূপ প্রেরণা পাইবেন উহা লইয়াই চলিতে তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 'অনুবর্তী'রা যদি তাঁহাদের নিজেদের দিক দিয়া সেই বাণীর পরিপালনে কখনো একটুখানি শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়াই থাকেন তাহাতে তাঁহাদের এতটুকুও লজ্জিত হইবার নাই, কারণ তাঁহারা জানেন পূজা-আরতি ছাড়াও তাঁহারা অনেক কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিতে চাহিতেছেন। সবটা মিলিয়া তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিশক্তি-অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যে ভাবে অনুসরণ করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয়।

দেশে এবং বিদেশে যুগাবতারের প্রভাব ও কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তে কোন ব্যর্থতার নৈরাশ্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা চোখের সম্মুখে এবং অন্তরালে অভাবনীয় ভাবে মানুষের মনে ও কর্মে কিরূপ ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে ইহা নিত্য দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহারা সর্বদাই আশায় বুক বাঁধিয়া চলেন। তবে তাঁহারা কাহাকেও অনাবশ্যক কটূক্তি না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলেন,—যাহা করিয়াছ বেশ করিয়াছ, আরও ভাল কর, যতদূর আসিয়াছ বেশ আসিয়াছ, আরও সম্মুখে আগাইয়া চলো।

তাঁহাদের মন্দিরকোণে পাষাণ-প্রতিমার সম্মুখে দীপালোক ঐরূপই জ্বলিয়া চলিবে, পার্থিব আলোর ম্লান রশ্মি ধরিয়া ভাস্বর চৈতন্যের জ্যোতিষ্মান্ প্রভাকে আবিষ্কার করিবার জন্যই—তাঁহাদের বাহ্যপূজায় শঙ্খঘণ্টাও ঐরূপই বাজিয়া চলিবে, অন্তরলোকে সঞ্জাত মহাপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান সারাবিশ্বে ধ্বনিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই—দণ্ড কমণ্ডলু গৈরিক রুদ্রাক্ষও তাঁহাদের ভূষণ থাকিয়াই যাইবে, সকল দেশের সকল মানুষের সহিত তাদাত্ম্যবোধ করিবার নিমিত্তই, অকিঞ্চন হইয়া শ্রেষ্ঠবিত্তের সন্ধান দ্বারা ঐশ্বর্য-গর্বিতগণের হৃদয়ের দৈন্য ঘুচাইবার জন্যই।

শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষা

কয়েকমাস পূর্বে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্তন-উৎসব হইয়া গেল তাহাতে চ্যান্সেলার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ সংস্কৃত ভাষায় দিয়াছেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের এবং ভাইস্‌চ্যান্সেলারের বক্তৃতা ব্যতীত অনুষ্ঠানের অন্যান্য কার্যসূচীও সংস্কৃতভাষাতেই নির্বাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। একথা সত্য যে, দেশের শিক্ষিত সর্বসাধারণ বুঝিতে পারিবে সংস্কৃতের প্রচার সেই স্তরে পৌঁছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে এবং এই কারণেই উপরোক্ত সমাবর্তন উৎসবে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কিছু বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছিল—কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি উচ্চ কল্যাণকর আদর্শকে বাস্তব রূপদানের যে নির্ভীক মনোভাব নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উক্ত প্রচেষ্টায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অভিনন্দিত করি। অন্তর্জাতীয়তা, আধুনিকতা, বৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতি বড় বড় শব্দ যিনি যতই বলুন ভারতীয় জাতির আত্মসম্বিৎ যথাযথভাবে ফিরিয়া পাইতে হইলে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ও প্রচার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনিতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'হইলেও চলে, না হইলেও চলে' এইরূপ মনোভাব প্রযোজ্য নহে। ইহা কোন গোষ্ঠী-বিশেষের কাজ মনে করা ভুল, ইহা জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ। অতএব যাহাদিগকে আমরা যথার্থ ভারতীয় বলিয়া দেখিতে চাই তাহারা যাহাতে ভারত-ঐতিহ্যের সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারে সেই আয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই থাকা

প্রয়োজন। সংস্কৃতভাষাকে দূরে রাখিয়া ঐ আয়োজন সফল হইতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন :—

"সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্ন জাতিগণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহান্ আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিসমূহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ তিনিও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। * * * জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববুদ্ধি' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না।"

যোগসিদ্ধা ভারতীয় নারী

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে দুই একজন মাত্র জীবনের সম্যক্ কৃতার্থতালাভের নিমিত্ত প্রযত্নশীল হয়, এবং যাহারা প্রযত্নশীল হয়, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই সিদ্ধিলাভ করে; যাহারা বিশেষ বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যেও কচিৎ কেহ ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সম্যক্‌সিদ্ধ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্যের সংখ্যা মানবসমাজে চিরকালই খুব কম। তাঁহারা অসাধারণ। আবার, এই অসাধারণ মনুষ্যদের মধ্যেও অনেকেরই নাম ও চরিত শাস্ত্রে, ইতিহাসে, সাহিত্যে জনশ্রুতিতে স্থান পায় না। ভগবদ্‌বিধানে সমাজের ভিতরে যাঁহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ নিরভিমান অনাসক্ত সর্ববন্ধন-বিনির্মুক্ত 'উদাসীনবদাসীন' হইয়াও ভাগবতী বিদ্যা-শক্তির প্রেরণায় লোককল্যাণার্থে উপদেশপ্রদান সম্প্রদায়-সংগঠন প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই স্মৃতি মানবসমাজ বহন করিয়া থাকে, তাঁহাদেরই চরিতকথা ও অনুভূতির বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাঁহারা বিশেষভাবে অসাধারণ।

ভারতীয় শাস্ত্র সাহিত্য ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থে এইরূপ যেসব অতি-অসাধারণ সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ তত্ত্বোপদেষ্টার বিষয় বর্ণিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে মহাপুরুষও যেমন আছেন, মহানারীও তেমনি আছেন, ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলের নরনারীও যেমন আছেন, সমাজের নিম্নস্তরে সঞ্জাত নরনারীও তেমনি আছেন, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীও যেমন আছেন, গার্হস্থ্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীও তেমনি আছেন। এই সব গ্রন্থের প্রামাণ্যে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, মানবজীবনের সম্যক্ কৃতার্থতালাভ,— সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্ ভক্তি, সম্যক্ যোগসিদ্ধি — কোন বর্ণ বা আশ্রমের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, পুরুষ-জাতির মধ্যেও আবদ্ধ নয়। মনুষ্যমাত্রই জীবনের পূর্ণত্বলাভে অধিকারী; অথচ এরূপ পূর্ণজীবন সকল যুগে, সকল দেশে, সকল শ্রেণীর মধ্যেই অতি বিরল। সর্বত্রই তাঁহারা অসাধারণ,— বৈদিক যুগেও যেমন, বর্তমান যুগেও তেমনি। আবার,

কোন যুগেই,— বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এরূপ অসাধারণ নর ও নারীর অভাব হয় না। ধর্মশাস্ত্রে, সমাজ-বিধানে, সাম্প্রদায়িক উপদেশে, যে সব অধিকারভেদ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ নরনারীর জীবন গঠনের জন্যই বিহিত এবং সমাজসংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। অসাধারণ মহাপুরুষ ও মহানারীর অসাধারণ অধিকার তদ্দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না। তাঁহারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারে আপনাদের জীবনকে বিকসিত করেন।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তিনটি যুগের তিনজন মহাসিদ্ধা ভারতীয়া মহানারীর পবিত্র মূর্তি ধ্যানপথে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি।

সর্বপ্রথম স্মরণ করি অতি প্রাচীন যুগের অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবীকে। তাঁহার জীবনকথা কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁহার অনুভূতির পরিচয় পাই ঋগ্বেদের অহংসূক্তে বা দেবী-সূক্তে, তাহার পর আর অন্য কোন পরিচয় আবশ্যক হয় না। সারা ঋগ্বেদেও এরূপ অন্য একটি সূক্ত দুর্লভ। বাক্দেবী এই সূক্তের ঋষি-দ্রষ্ট্রী। যোগের চরম ভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ না হইলে, এই প্রকার সর্বাত্ম-ভাব অনুভূত হয় না। সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বান্তর্যামী বিচিত্র ভাববিলাসী এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বাগ্দেবীর অনুভূতিতে কেবল 'তৎ'-শব্দবাচ্য নহে, 'অহং'-শব্দ বাচ্য,—অহং-ভাবে অনুভূত। তাঁহার 'আমি' সর্ববিলক্ষণ সর্বাতীত সর্বোপাধিবর্জিত সর্বভেদবিরহিত আত্মা মাত্রই নয়; তাঁহার 'আমি' সর্ববিলক্ষণ হইয়াও সর্বভাববিলাসী, সর্বাতীত হইয়াও সর্বময়, সর্বভেদবিরহিত হইয়াও বিচিত্র ভেদের মধ্যে লীলায়মান। তিনি দেখিতেছেন জগতে বিচিত্র শক্তির খেলা, বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ, বিচিত্র জড়-চেতনের, স্থাবর-জঙ্গমের, ক্ষুদ্র-বৃহতের, ভোগ্য-ভোক্তার সমাবেশ, বিচিত্র শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের প্রবাহ; আর সকলেরই মধ্যে আস্বাদন করিতেছেন নিজেকে। সবই তাঁর আপনার আনন্দময় প্রকাশ। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ,—মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,—সোম, ত্বষ্টা, পূষণ, ভগ,—সবরূপে সবভাবে তাঁর 'আমি'ই বিচিত্র খেলা খেলিতেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি,—কর্ম, কর্মফলভোগ, কর্মফলপ্রদান,—সবই তাঁর 'আমি'র বিলাস। তাঁর 'আমি'ই সর্বরূপ, সর্বনিয়ন্তা, সর্ব-ভোক্তা। মানুষের আমিত্বানুভূতির পূর্ণতম উৎকর্ষেরপরিচয় বাক্-দেবীর এই আটটি মাত্র মন্ত্রে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ভাগবত-আমিত্বের বিশদ কবিত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূল বেদোক্ত এই মহামানবীর মহাযোগানুভূতিতে। মানুষ আপনাকে বিশ্বরূপে, বিশ্বাতীতরূপে, বিশ্ব-নিয়ন্তারূপে, পূর্ণনিষ্ক্রিয়রূপে ও পূর্ণসক্রিয়রূপে, কেমন ভাবে আস্বাদন করিতে পারে, তাহার প্রথম সুস্পষ্ট নিদর্শন বাক্দেবীর বৈদিক মন্ত্রে!

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বচক্নুর কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মচারিণী গার্গী জ্ঞানযোগের মহিমার একটি সমুজ্জ্বল মূর্তি। বিদেহরাজ জনকের সভায় ব্রহ্মবিদ্যার বিচারসময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সমান আসনে সমাসীনা। তৎকালে ব্রহ্মবিদ্গণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসনের অধিকারী কে, এক সভায় তাহার বিচার হইল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মুখে আপনাকে ব্রহ্মবিদ্গণের দাস বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াও প্রকারান্তরে এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপস্থিত করিলেন। সভায় তাহার পরীক্ষা হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ একে একে তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বাচক্নবী গার্গী দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন,— আমি মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যকে দুটিই মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; তিনি যদি এই দুইটি প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি যে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ, ইহা নিঃসংশয়ে সকলেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার

চরম অনুভূতি পরিব্যক্ত করিলেন। গার্গী সন্তুষ্ট হইয়া যখন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, তখন তাঁহার পূর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে কার্যতঃ সকলেই নিঃসংশয় হইলেন। তাৎকালীন ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্কের পরেই যে গার্গীর স্থান, তিনিও অক্ষয়ব্রহ্মানুভূতিতে দেদীপ্যমানা, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে বর্ণনা আরো অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শিনীরূপে এই মহীয়সী নারীর পবিত্র স্মৃতি ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসু সমাজ চিরকাল শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অন্তরে পোষণ করিতেছে।

অতঃপর মহাভারতে বর্ণিত এক যোগসিদ্ধা মহানারীকে স্মরণ করিব। তিনি মহাযোগিনী সুলভা। এই অনিকেতা স্থিরমতি তত্ত্বদর্শিনী যোগৈশ্বর্যবিভূষিতা মহানারী লোককল্যাণকল্পে বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি রাজর্ষি জনকের সভায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। লজ্জা ঘৃণা ভয় সঙ্কোচ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না; নারী ও পুরুষের ভেদবুদ্ধি তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত; সর্বজীবে এক অদ্বয় পরমাত্মারই বিচিত্র প্রকাশ তিনি দর্শন ও আস্বাদন করিতেন। রাজর্ষি জনকের প্রতি সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোগবলে তিনি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—নারী হইয়া আপনি এই পুরুষের দেহে প্রবেশ করিলেন কেন? মহাযোগিনী যে জবাব দিলেন, তাহার মর্মার্থ এই:—আমি স্বদেহ ও পরদেহের কোন ভেদ মানি না, নারীদেহ ও পুরুষদেহেরও কোন ভেদ জানি না। আমার নিজস্ব কোন দেহ নাই; যখন যে দেহে খুশী, একটু আরাম করি। সব দেহই ত এক পরমাত্মারই দেহ,—এক পরমাত্মারই বিলাসক্ষেত্র। সব দেহেই জীবাত্ম-ভাবে পরমাত্মার বিলাস। বিদেহরাজের দেহটি সুন্দর পবিত্র একটি বিলাসক্ষেত্র দেখিয়া, আমিও তাহার মধ্যে একটু বিশ্রাম ও আরাম অনুভব করিবার জন্য প্রবিষ্ট হইলাম। তাহাতে তোমার আপত্তির কারণ ত দেখি না। সকলেই বলে,—জনক পূর্ণ-জ্ঞানী, তিনি বিদেহ, তাঁহার কোন দেহাত্মবোধ নাই। তাহাও একটু পরীক্ষা করিতে কৌতূহল হইল। এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ, স্বদেহ-পরদেহ-ভেদ,—ইহা কি দেহাত্মবোধের নিদর্শন নয়? অজ্ঞানের লক্ষণ নয়? এততুপলক্ষে রাজর্ষি জনক ও মহা-যোগিনী সুলভার যে সব প্রশ্নোত্তর হইল, সুলভা দেবী পরম তত্ত্ব ও সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জনককে যে সব উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাভারতের মধ্যে তাহা একটি মনোহর পঠনীয় ও বিচারণীয় অংশ। এই মহাযোগিনী প্রকারান্তরে রাজর্ষি জনকের গুরু-পদে অধিষ্ঠিতা হইলেন;—অন্তরে বিদেহ হইয়া, দেহাভিমান হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া, কিভাবে দেহে অবস্থান ও কর্তব্যসম্পাদন চলে, তাহার আদর্শ দেখাইলেন।

ক্ষতিপূরণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ইন্দুর শোকে কাঁদিতেছি যবে, আঁধারে লুপ্ত সবি,
পূর্বগগনে সহসা চাহিয়া দেখি উদিতেছে রবি।
গেল ফুলে ভরা বসন্ত বলি' করিনু অশ্রুপাত,
নিদাঘ অমনি বাড়াইয়া দিল ফলভরা দুটি হাত।
অশোকের দিন ফুরাল বলিয়া যখনই করিনু শোক,
হাজার হাজার চম্পক ফুটি জুড়াইয়া দিল চোখ।

কৈশোর-সখা সব দূরে গেল, বক্ষে বাজিল ব্যথা,
একটি বন্ধু প্রিয়ারূপে আসি ভুলাল তাদের কথা।
চারিদিকে এবে সকলি নীরস বিস্বাদ বিষময়,
জীবনে আমার আসিবে না নামি এসময় রসময়?
সকল ক্ষতির পূরণ হয়েছে নিরাশ হইনি কভু,
তুমি ছাড়া আর শেষ ক্ষতিটার পূরণ কে করে প্রভু?

জীবন-মৃত্যুর রহস্য *

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষের চিন্তাজগৎকে যা সর্বাধিক আলোড়িত করেছে তা হচ্ছে মানুষ নিজেই। ইতিহাসের আদিম প্রত্যুষ থেকে কত রহস্যের উদ্ঘাটনে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, কিন্তু তার নিজের প্রকৃতির রহস্য যেন আজও নিতান্ত দুর্বোধ্যই রয়ে গেছে—এ সমস্যা যেন সকল সমস্যাকে ছাপিয়ে তার মনকে ঘিরে রয়েছে। তাই স্বামীজী তাঁর 'পুনর্জন্ম' (Reincarnation)-নামীয় বক্তৃতায় বলেছেন, মানুষের জ্ঞান, অনুভূতি আর কর্মের উৎস এবং আধার যে মানব-প্রকৃতি, তা' থেকে মাথা ঘামানোর বিরাম কোন দিনই মানুষ পাবে না।

বংশানুক্রমে এই রহস্য একের পর অন্যের চিন্তায় আশ্রয় নিচ্ছে—জীবন-মৃত্যুর রহস্য দুর্জ্ঞেয় থেকে যাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কখনও কখনও ক্ষণজন্মা আত্মানুসন্ধানী মানবও এ লোকে আবির্ভূত হন,—আত্মোপলব্ধির দ্বারা এই রহস্য-ভেদের প্রয়াস পান। এঁদের পদাঙ্ক বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করলে, এঁদের সাধনপদ্ধতিকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করলে হয়ত বা এই দুরূহ সমস্যার দ্বার আমাদের সামনেও খুলে যেতে পারে। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ,—কিন্তু সত্য সত্যই আমাদের ক'জন এই তত্ত্বটি নিয়ে চিন্তা করেন? তবু স্বল্পসংখ্যক লোকের চিন্তাধারায় এই রহস্য আলোড়ন জাগিয়ে আসছে,—তাঁদের মনে জাগছে এই প্রশ্ন: কোথা থেকে আমাদের সৃষ্টি? চারিদিকে আর যে শত সহস্র রকমের জিনিস, আমাদের সৃষ্টিও কি তাদেরই মত? এই জগতে জন্মগ্রহণের আগেও কি আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল,—মৃত্যুর পরেও তা থাকবে কি? যুগ হ'তে যুগান্তরে এই প্রশ্নই বারংবার এসব অনুসন্ধিৎসু মনকে তোলপাড় করে এসেছে।

হুইট্‌ম্যানও তাই এক জায়গায় বলেছেন, যে দুটি অতি পুরাতন সাধারণ সমস্যা নিতান্ত দুরূহ, দুর্ভেদ্য অথচ নির্মম সত্যের রূপে পুরুষানুক্রমে আমরা পেয়ে আসছি এবং দিয়ে যাচ্ছি উত্তর-পুরুষদের, এ-দুটিই হচ্ছে সেই সমস্যা।

জীববিদ্যা-বিশারদগণ জীবদেহের বিকাশ ও বিবৃদ্ধির পাঁচটি স্তর নির্ণয় করে থাকেন,—যার শেষ স্তর হচ্ছে মৃত্যু। অধিকাংশ জীববিদের মতে জীবদেহের যে যন্ত্রকৌশল আর তার রকমারি বিশিষ্টতা, বংশানুক্রমিক তার ধারা। এঁদের মতে ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশেষের অমরত্বের কোন স্থান নেই: অমরত্ব যা কিছু, সে শুধু বংশ-পরম্পরায়, পুরুষানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যে। যে জীব-জগৎ এই বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক ধারায় অনুসরণ করে না, তা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দু অধ্যাত্মবিদ্গণ কিন্তু একেবারে পৃথক একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করে এসেছেন। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক জীবের জৈবিক অস্তিত্বে ছয়টি স্তর-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: যথা, (১) জন্ম (২) কিছুকাল এই অস্তিত্বের স্থিতি (৩) বহুবিধ পরিবর্তন (৪) বার্ধক্য (৫) জরা এবং (৬) মৃত্যু। 'মৃত্যু' অর্থে, জীবের জৈবিক অস্তিত্বই শুধু লোপ পায়, অস্তিত্ব লোপ পায় না, এক অদৃশ্যলোকে জীবনের গতি চলমান থাকে,—সে লোক সৃষ্টিমূলের অতি নিকটে।

* Prabuddha Bharata (September, 1953) পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ 'The Mystery of Life and Death' হইতে শ্রীমদনকুমার সেন কর্তৃক সঙ্কলিত।

ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে বেদান্তবিদ্‌গণ আমাদের বলেন, আত্মা বা আধ্যাত্মিক যে সত্তা, নিজে তা শাশ্বত,—শুধু বারবার জৈবিক জীবনের প্রবাহকে সে স্বীকার করে নেয়। জন্মের আগেও এ বিদ্যমান ছিল, পরেও অনন্তকাল ধরে থাকবে—হয়ত বা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রপথে বারবার তার গমনাগমন চলবে। উপনিষদের ঋষি বলছেন, দৃশ্যতঃ দেহের সঙ্গে অভিন্ন বোধ হলেও আত্মা স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুংলিঙ্গও নয়, ক্লীবলিঙ্গও নয়। পরমসত্তার উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত তার এই জাগতিক রূপ বর্তমান থাকে মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের যত রকমের তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, তন্মধ্যে আত্মার অবিনাশী পৃথক সত্তার ধারণাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং যাঁদের এই বিশ্বাস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে চিন্তাশীল অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তি আত্মার পূর্ব অস্তিত্বেও বিশ্বাসবান। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, এই দেহের বন্দিশালায় আসবার আগে আত্মার পৃথক সত্তা ছিল,—কেননা আত্মা শাশ্বত। একমাত্র আত্মজ্ঞানের ফলেই জীবাত্মা দেহের এই বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। এই জ্ঞানও নূতন কিছু নয়, পুরাতন; বিস্মৃত সত্যেরই পুনঃস্মরণমাত্র। শুধু প্লেটোই নয়, প্রাচীনকালের বহু চিন্তানায়কই আত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও নিত্যতা-সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। যেমন প্লটিনাস বলতেন, মানবাত্মা বৃহত্তর জগদাত্মারই অংশ। বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়াতেই আত্মিক অবস্থা হতে তার পতন হয়। বস্তুজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তাকে সংগ্রাম করতেই হবে; এই সংগ্রামে যখন সে ব্যর্থ হয়, তখন মৃত্যুর পরে দেহান্তরে সে প্রবেশ করে। এমনিভাবে বারবার জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলে তার সংগ্রাম, যতদিন না বস্তুজগতের অশুদ্ধ পরিবেশ থেকে তার মুক্তিলাভ ঘটে। বারংবার শোধন ও পরিশোধন-প্রক্রিয়ায় জীবাত্মার যখন পূর্ণ শুদ্ধতা লাভ হয়, তখন জগদাত্মার সঙ্গে এবং অবশেষে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে। ডারুইনের অনুগামী টমাস্ হাক্সলী বলছেন, প্রত্যেক প্রাণী—যে যেমন কর্ম করেছে, এ জন্মে তেমনি ফল পাচ্ছে, কিংবা এ জন্মে না হলেও পূর্বের কোন না কোন জন্মে পেয়েছে। বিজ্ঞানী রূপে তিনি বলছেন, কারণ ছাড়া কোন কার্য হতে পারে না। এমার্সন ও নব্য-ইংলণ্ডে তাঁর সমসাময়িক বহু মনীষীও অনুরূপ মতবাদ পোষণ করতেন। এমার্সন নিজে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন, যেখানে আমরা আরোহণ করেছি তার নীচে যেমন সিঁড়ির ধাপ আছে, তেমনি আছে উপরেও—ক্রমে তা ঊর্ধ্বদিকে উঠে গেছে—দৃষ্টির অন্তরালে।

কবির জীবনে আত্মার অনুভূতি অত্যন্ত নিবিড়—তাই কবির দৃষ্টিতে যা সত্য, তা-ই তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশলাভ করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাই বললেন, 'আমাদের জন্ম—এ এক অচেতন, বিস্মৃতির অবস্থামাত্র। আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, অন্তর্লোকের যে আত্মায় রয়েছে আমাদের স্থিতি, তার নিজের স্থিতি রয়েছে অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে; বহু দূর থেকে আগত সে।' টেনিসনের মতে নিম্নতর বহু পর্যায় আত্মা অতিক্রম করে এসেছে—যা তার স্মরণ নেই। যোগগুরু পতঞ্জলি বলেন, মানুষ যখন লোভ-বিনির্মুক্ত হয় অর্থাৎ মন শুদ্ধ হয়, পূর্ব জীবনের সকল তত্ত্ব তখন যোগীর জ্ঞানগোচর হয়ে থাকে। নিজের মনের শিলালিপিতে বিস্মৃত দিনের ইতিহাসের অক্ষরগুলি তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

অনন্যমনা হয়ে, বিশুদ্ধ মনকে আধার করে যদি অনুসন্ধান করি, তাহলে অতীতের অন্তত একটা অস্পষ্ট ছবিও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর তাই দিয়ে বর্তমানে উপলব্ধি

করা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া সহজ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "আমি যেমন বহু জীবন অতিক্রম করে এসেছি, তেমনি তুমিও। এই অতীত জীবন-সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত, কিন্তু তুমি জ্ঞাত নও।" যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, 'এব্রাহাম যখন ছিলেন না তখনও আমি ছিলাম।' ঈশ্বরকল্প পুরুষগণ এমনিই বলে থাকেন। এক অনন্ত জ্ঞানের অধিকার নিয়ে তাঁরা আবির্ভূত হন, যা অতীত-সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত রাখে, আর তারই জন্য এই সব মহাপুরুষের পদচিহ্ন সার্থক জীবন-পরিক্রমায় প্রোজ্জ্বল। বুদ্ধ কখনও নিজেকে অবতার বলে দাবী করেন নি, কিন্তু পরে তাঁর অনুগামিগণ তাঁকে তাই মনে করতেন। বুদ্ধ-বাণী পড়লেও মনে হয়—বার বার জন্ম-পরিগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি পরিশুদ্ধির বহু পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন,—অবশেষে তাঁর নির্বাণ বা পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটল। রাজার ছেলে ছিলেন তিনি,—সত্যের সন্ধানে সব কিছু পরিত্যাগ করলেন। বোধিলাভের পর তিনি সর্বজনের মধ্যে তাঁর সেই অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে চাইলেন; দ্বারে দ্বারে তাই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলল তাঁর পরিক্রমা। পুত্রের এই কাণ্ড দেখে রাজা কুপিত হলেন,—বুদ্ধকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'রাজ-পরিবারের কারুর পক্ষে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা অনুচিত।' কিন্তু এতে বুদ্ধকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করা গেল না: উত্তর করলেন তিনি, 'মহারাজ, আপনি রাজবংশজাত বলে দাবী করেন,—আমার জন্ম কিন্তু বুদ্ধসমাজ থেকে; তাই তাঁরা যেমন পরার্থপর ব্যক্তিদের কাছ থেকে খাদ্য চেয়ে নিতেন আমিও তাই করছি, অন্যথা করতে পারব না।'

সাধারণের থেকে তাঁর চৈতন্য ছিল ভিন্নরূপ। আত্মার অনন্ত অধিকারকে তিনি পরিবারের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নিকট খর্ব হতে দেন নি।

* * *

প্রশ্ন হতে পারে, এই সব মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আগেও বেঁচেছিলেন যদি ধরেও নেওয়া যায়, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের অবস্থা? বেদান্ত-মতে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে যে আত্মা (spirit), তা জন্ম-মৃত্যুর অতীত কিন্তু অজ্ঞানতা আর অজ্ঞানতাজনিত কামনার বন্ধন আত্মাকে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বোধিপ্রাপ্ত যাঁরা নন, জীবনে হঠাৎ যখন ছেদ পড়ে, দেহের তাঁদের শেষ হয়ে যায় বটে, কিন্তু দেহ হতে দেহান্তরে তাঁদের আত্মার পরিক্রমা চলতে থাকে যতদিন না তার মোহমুক্তি ঘটে—এবং তদনন্তর জীবন-মৃত্যুর অতীত পূর্ণবোধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের পূর্বাচার্যগণ বলেন, মানবজীবন দুর্লভ জীবন। এই জীবনেই পূর্ণতালাভ এবং সত্য-প্রতিষ্ঠ হবার শ্রেষ্ঠতম সুযোগ পাওয়া যায়। কেন না, শুধু অবতারকল্প, বোধিপ্রাপ্ত পুরুষগণই নন, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারাও সেই একই ভগবৎসত্তা হতে উদ্ভূত: মূল সত্তা থেকে প্রকাশিত সত্তার অংশগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে— যেমন রয়েছে মহাসমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গ-মালা, আবার রয়েছে বুদ্বুদও—অথচ উভয়েরই সৃষ্টিমূল এক— তেমনি আমাদের মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলগত ঐশী প্রেরণা একটিই। স্বামীজীও বারংবার বলেছেন, প্রত্যেক আত্মাই বস্তুতঃ ঐশী-শক্তিসম্পন্ন,— অন্তর্লোকে প্রসুপ্ত এই শক্তিকে প্রকাশ করাই মনুষ্য-জন্মের লক্ষ্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা বন্ধনহীন ও শাশ্বত; সেটা দেহ নয়, মনও নয়। দেহ তো প্রতিমুহূর্তেই ক্ষয়ে যাচ্ছে, মনেরও অবি-রাম পরিবর্তন চলছে। বহু কিছুর সমষ্টিতে দেহ, মনও তাই: সুতরাং এরা কখনই পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু এই দৃশ্যমান বস্তুজগতের বাইরে মনের সূক্ষ্ম-লোকেরও অন্তরালে রয়েছে আত্মা, মানুষের প্রকৃত

সত্তা— যা শাশ্বত, সদা-বন্ধনবিহীন। এই সত্তাই প্রতিনিয়ত আমাদের গতি-প্রকৃতি চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে, নাম ও রূপের বিচিত্রতায় ভ্রূক্ষেপ না করে' আপনাকে প্রকাশিত করতে চাইছে। অজ্ঞানতার ঘোর তমিস্রার মধ্যেও এরই মৃত্যুহীন, বন্ধনহীন, স্বচ্ছন্দ দৈবীগতি আলোক বিকিরণ করছে। ভয়হীন, মৃত্যুহীন, বন্ধনহীন মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব এইখানে। এর কোন পরিবর্তন নেই,— তাই জন্ম কিংবা মৃত্যুও নেই। তাই এই মানবাত্মা সনাতন, শাশ্বত। বিশ্বাস, ভক্তি আর সাধনা এই তিনে এক হ'লে আত্মার উপলব্ধি ঘটে। আমাদের তথা সমুদয় জীবের আত্মাতেই এই একই আত্মার আলোক উৎকীর্ণ হচ্ছে। এই এক ও অভিন্ন অবিনাশী সত্তাই বিভিন্ন ব্যক্তি-সত্তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যক্তিক আত্মা যে মৌলিক আত্মারই অংশ— এই অনুভূতিই হচ্ছে আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হ'লে অজ্ঞানতার সব অন্ধকার ভয়ে পলায়ন করে; কামনা-বাসনার অন্তর্ধান ঘটে, কণামাত্র আর থাকে না। তাই আমরা বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমাদের আত্ম-সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে পারি। বোধিলাভের পরেও হয়ত আমাদের ফিরে আসতে হ'তে পারে এই লোকে,— কিন্তু সে শুধু মানুষের মধ্যে ঐশী শক্তির এই যে প্রেরণা এবং প্রকাশ তার উপলব্ধিতে অন্যকে সাহায্য করবার জন্যই।

মুক্তি

(বৌদ্ধ-কাহিনী)

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

নর্তকী অলকানন্দা শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী রূপসী
তাম্রলিপ্তি নগরীর একমাত্র যেন সে উর্বশী।
যৌবনের সর্বৈশ্বর্যে ভরা তা'র তন্বীদেহতীর
কৃষ্ণায়ত আঁখিযুগ কী সুন্দর, মায়ায় মদির!
তনু-তনিমায় নিতি নবরূপ লীলার হিল্লোল,
চটুল চরণে কিবা নিত্য নব ছন্দের হিন্দোল!
নিত্য নব স্বপ্নজাল রচিতো সে নিবিড় নয়নে,
প্রচ্ছন্ন যাদুর স্পর্শ ছিল তার নূপুর-নিক্কণে।
বসন্ত-উৎসবময়ী সন্ধ্যা এক আছিল সেদিন:
পশ্চিমের মেঘ-মাখা অস্তরাগ হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পূর্বাশার পূর্ণিমার তরলিত সোনালী ধারায়
ধীরে ধীরে ক্রমে-ক্রমে আঁখি-পুটে স্বপ্নাবেশ-প্রায়।
নগরী-উপান্তে দূরে পূর্ণ ইন্দু নীলিমার বুকে
লজ্জা-রাগ-জড়া নববধূ সম জেগে ওঠে সুখে।

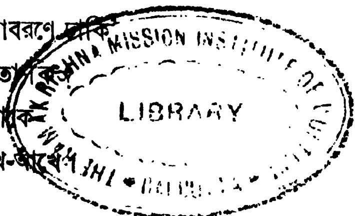
নৃত্যের আসর জমে নর্তকীর রম্য নিকেতন,
কক্ষতলে সমাস্তৃত মখমলী রক্ত আস্তরণ।
ভিত্তিগাত্রে পুষ্পাধারে স্তবকিত পেলব পুষ্পিকা,
মহার্ঘ আলোকাধারে সমুজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা।
সমাগত নগরীর যত ধনী ভকতপ্রবর,
স্বয়ং আসর-পতি ধনিশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী পুরন্দর।
মোহ রচি নাচে নটী ভঙ্গিমার নব ব্যঞ্জনায়,
যন্ত্র খেলে সর্বগ্রামে তালে-মানে সুরের লীলায়।
ক্রীড়াপদ্ম নটী-করে, বর অঙ্গে রক্ত পট্টবাস,
শিরে কেশরের চূড়া, বালকুন্দে বন্ধ বেণী-পাশ,
অশোকের কর্ণভূষা, পদ্মমালা পীন বক্ষে দুলে,
নর্তকী নাচিয়া চলে, মুগ্ধ মূক দর্শকেরা ভুলে।

হেনকালে দ্বার-প্রান্তে অসঙ্কোচে দাঁড়াইল আসি',
মুণ্ডিত-মস্তক, সৌম্য, গৌরকান্তি, দীর্ঘাঙ্গ সন্ন্যাসী।
পীত প্রাবরণ, বাস, চক্ষে জ্ঞান-প্রতিভার জ্যোতি ;
কহিল : "নর্তকি, ভিক্ষা দাও মোরে"—কম-কণ্ঠে অতি।
নর্তকী থামিয়া গেল চমকিয়া নৃত্যের মাঝারে,
থামিল বিস্মিত যন্ত্রী, ভুলে গেল সুর-উৎস-ধারে।
চাহিল দর্শকদল অসন্তোষে তুলিয়া নয়ন ;
কহিল গম্ভীর স্বরে : "ভিক্ষা দাও"—আবার শ্রমণ।
রুষ্ট শ্রেষ্ঠী ভিক্ষু প্রতি বিষদৃষ্টি কহিল হানিয়া :
—"হেথা কেন ? ভিক্ষা মেলে গৃহি-দ্বারে, লহ সেথা গিয়া।"
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পুরন্দর আহ্বানিয়া শুধা'লো দাসীরে :
—"কে দিল আসিতে হেথা ? এই গৃহ ভিক্ষা-সত্র কি রে ?"
নিরুত্তর ভয়ে দাসী ; শ্রমণও না উচ্চারিল বাণী,
চেয়ে র'ল নর্তকীর পানে মেলি' শান্ত দৃষ্টিখানি।
নিরুত্তেজে নটী কহে : "ভিক্ষা দাও ভিক্ষুরে বিনতা !
আসিতে দিও না কা'রো, আর কভু মনে রেখো কথা।"
দাসী যায়। প্রশ্ন করে বিস্মিতা-সে অলকানন্দাই :
—"ওকি, গেলে না যে তুমি ?" ভিক্ষু কয় : "অর্থ নাহি চাই।"

—"তবে ? অলঙ্কার চাও ? ল'বে মোর হীরক কঙ্কণ ?"
উত্তরিল ভিক্ষু : "নয়"—মুখে তা'র কৌতুক-স্ফুরণ।
—"কি তবে তোমার চাই ?"—কহে নটী : "মোতির এ মালা ?"
হুঙ্কারিল পুরন্দর, কণ্ঠে তা'র তীব্র ক্রোধ-জ্বালা।
বিমূঢ়া নর্তকী বলে : "মুক্তাহার ল'বে কি সন্ন্যাসী ?"
সন্ন্যাসীর মুখে ফোটে পুনরায় কৌতুকের হাসি।
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠী ; ভাষা, স্বর ক্রোধেতে বিকৃত :
—"অলকা, ও যাহা চায় দিয়া তাই কর বিতাড়িত।
ওর দৃষ্টি বিঁধিতেছে মোরে তপ্ত শলাকার মত।"
সন্ন্যাসী সে মৃদু হাসে ; তিক্ত হয় চাটুকার যত।
কৌতুহলী নটী বলে : "জানো না, কী মহার্ঘ এ হার,
পাবে না এমন রত্ন খুঁজি কোন রাজার ভাণ্ডার।
এ রত্ন পা'বার লোভ প্রতি রাজা পোষেন হৃদয়ে,
বিশাল রাজত্ব মেলে অনায়াসে এর বিনিময়ে।"
ভিক্ষু কয় : "চাহি ভিক্ষা···রাজ্যে লোভ নাই।"
—"ভিক্ষা যদি"—শ্রেষ্ঠী ফুঁসে : "বিচারের কেন এ বালাই ?"
প্রতিটি কথায় ঘৃণা, বর্ণে বর্ণে তীক্ষ্ণ শ্লেষরাশি ;
স্তাবকের মুখে মুখে খেলে যায় অবজ্ঞার হাসি।
গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে নটী হাসে : "কি চাহিছ তবে ?"
শ্রমণ : "তোমারে ভিক্ষা চাহি আমি"—কহে শান্ত রবে।
—অপূর্ব দৃঢ়তা মুখে, চক্ষে তা'র বিজয়ীর বিভা।
উন্মাদ ভিক্ষুক ভিক্ষু ! সারা সভা বজ্রাহত কিবা !
লক্ষ মুদ্রা-বিনিময়ে ক্ষণতরে যে নহে সুলভ,
ফুটা'তে যাহার হাসি শূন্য হয় রাজার বিভব,
নগণ্য ভিখারী এই সন্ন্যাসীর—তা'রে অভিলাষ !
মূর্খ বামনের যেন ইহা চন্দ্র-ধারণ-প্রয়াস !
উচ্চে হাসে পুরন্দর ; হাসি-স্রোত দর্শকের দলে,
নর্তকীও হাসে : "মোরে—কেন চাও ?"—তথাপি সে বলে।
ভিক্ষু কয় : "কেন ? চাহি—ভগবান্ বুদ্ধের আদেশ।"
নর্তকী : "কে তুমি ভিক্ষু ?"—মুখে তা'র বিস্ময়ের লেশ।

সন্ন্যাসী : "সুদত্ত আমি, ভগবান্ বুদ্ধের সেবক।"
নটী : "কিন্তু, ভোগসুখত্যাগী তুমি প্রব্রজ্যা-বাহক।"
—"তবু আমি তোমা' চাই নটি!"—ভিক্ষু কহে পুনর্বার।
নর্তকী : "নর্তকী আমি, সত্যধর্ম কোথায় আমার ?
বিলাস আমার অঙ্গ, নিলাজতা আমার ভূষণ,
মোরে নিয়া হে সন্ন্যাসী, হ'বে তব ক্ষতির কারণ।"
ভিক্ষু : "মোরা যে শ্রমণ! লাভ-ক্ষতি-হিসাব না ধরি,
কর্মে শুধু অধিকার, ফল-আশা মোরা নাহি করি।"
—"কিন্তু, মোরে গ্রহণিলে ধর্মচ্যুতি তোমার ঘটিবে।"
—"ধর্ম নহে কাঁচখণ্ড যে সামান্য আঘাতে ভাঙিবে।
ধর্ম যে শাশ্বত, সত্য, অনশ্বর, ধর্ম চিরন্তন,
তাহারে লভেছি, নাহি ভয়"—বলি' হাসিল শ্রমণ।
ভিক্ষুর জ্ঞানের আর বিশ্বাসের গভীরতা হেরে
বিস্মিতা নর্তকী : "কোথা' যা'ব আমি"—শুধে শ্রমণেরে।
ভিক্ষু কহে : "ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধ-পদতলে।"
নর্তকী : "কি লাভ তাতে ?" "মুক্তি"—ভিক্ষু স্থির কণ্ঠে বলে।
নর্তকী কহিল : মুক্তি! "মুক্তি আমি চাহি না সন্ন্যাসী!
অতৃপ্ত এখনো মোর জীবনের কামনার রাশি,
অপূর্ণ বাসনা আজো। এই খ্যাতি, ঐশ্বর্য, সম্ভোগ—
ইহা ছাড়ি—ক্ষিপ্তা নহি জীবনের হারাব সুযোগ।
স্বেচ্ছায় চাহি না আমি জীবনে এ ঘটাতে প্রমাদ।"
—নর্তকীর কণ্ঠস্বরে যেন এক চাপা আর্তনাদ।

কী ভাষা ফুটিয়া ওঠে সন্ন্যাসীর দৃষ্টির ভিতরে!
সারা মুখ ভ'রে যায় বিশ্বজয়ী হাসির লহরে।
ঘৃণা নাই, শ্লেষ নাই—সে হাসিতে হ'য়ে গেছে হারা,
সে হাসিতে আছে শুধু ক্ষেম, ক্ষমা, করুণার ধারা।
ভিক্ষু কয় : "বিলাসিতা, সম্ভোগের আবরণে ঢাকি
রাখা যায় হে অলকা, অন্তরের গূঢ় দীনতাকে
তুষানল সম জ্বলি' জ্বালাইয়া দেয় চিত্তটাকে
মানুষের দৈন্য-ছায়া জাগে তাই তার মুখে-আঁখে



বঞ্চনা করেছ নিজে সেইভাবে তুমি নিজেরেই ;
মিথ্যা আবরণ দেবি, কামনার শেষ কভু নেই।
ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সম কামনা যে ক্রমপুষ্টি লয়,
হে অতৃপ্তা ব্যর্থ নারি, ত্যাগে তৃপ্তি, ভোগে তৃপ্তি নয়।"
নর্তকী নির্বাক স্তব্ধা, অশ্রু-বাষ্প জমে আঁখি-ছেয়ে,
সন্ন্যাসীর তেজোদীপ্ত মুখপানে শুধু রহে চেয়ে।
রুষ্ট স্তাবকেরা করে কোলাহল নিস্ফল আক্রোশে ;
ভ্রূক্ষেপ না করি ভিক্ষু কহি' চলে মনের সন্তোষে :
—"দুঃখ, ব্যথা, অশ্রুভরা কেন তুমি চাও এ জীবন ?
এস মোর সাথে দেবি, আমি দিব জীবন নূতন।
সে জীবনে দুঃখ নাই, ব্যথা নাই, নাহিক বিষাদ,
আছে শুধু সীমাহীন হাসি আর আনন্দ অগাধ।
ইহা তো আনন্দ নয়, সুখ নয়, দুঃখের এ ফাঁসি,
সুখভ্রমে নিজ গলে পরে'ছ তা' বড় ভালবাসি।
এ তব সম্ভোগ নয়, নহে খ্যাতি—আত্মহত্যা এ যে ;
তুমি তব সত্যপথ হারা'য়েছ ভোগ-ব্যসনে যে !
খুলে ফেল বিলাসের উপচার বস্ত্র-আভরণ,
মুছে ফেল আঁখি হ'তে কামনার রঙীন্ অঞ্জন।
পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছি ত্যাগের দীক্ষায়,
লহ প্রাবরণ মাতঃ দেখ তৃপ্তি, শান্তি কত তা'য়।"
অলকা পারে না আর, লুটে পড়ে ভিক্ষুর চরণে :
—"তোমার বাণীই প্রভু, সত্য হোক্ এ মোর জীবনে।"
সন্ন্যাসী মায়ের স্নেহে ধূলি হ'তে তুলে তারে লয় ;
কী আনন্দ ভিক্ষু-আঁখে, কী সে গর্ব সারা মুখময় !
অকুণ্ঠিতে ভিক্ষুবর নিজ হাতে অঙ্গ হ'তে তার
উন্মোচিয়া একে-একে ফেলি' দিল রত্ন-অলঙ্কার।
আপনার প্রাবরণে চারু অঙ্গ দিল তা'র ঢাকি',
চন্দনের শুভ্র ফোঁটা দিল তার ললাটেতে আঁকি।
থামিল সন্ন্যাসী তবে পূর্ণভাবে অলকায় জিনি' ;
সাজিল রিক্তার বেশে নগরীর, শ্রেষ্ঠা বিলাসিনী।

প্রণয়ী সে পুরন্দর করি' উঠে ক্ষুব্ধ হাহাকার :
—"অলকা, যেওনা ছাড়ি' তাম্রলিপ্তি করিয়া আঁধার।"
—"ফিরায়ো না বন্ধু মোরে"—উত্তরিল অলকা আহ্বানে :
"জীবনে পাইনি যাহা, চলিলাম তাহার সন্ধানে ;
আমার যাত্রার পথে আর পিছু ডেকো না আমায় "—
—বলি' ভিক্ষু-সাথে আসি' রাজপথে অলকা দাঁড়ায়।

বুদ্ধদেবের দর্শন

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

বস্তুতঃ বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। তিনি এক নূতন ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তক। জগতের আদি ও অন্ত আছে কি ? ভগবান্ আছেন কি ? আত্মা কি ? মৃত্যুর পর মানুষের গতি কি ? বুদ্ধদেব দর্শনের এই সকল মূল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু তিনি মনে করিতেন যে, এই সকল প্রশ্ন নিরর্থক। দর্শনের এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে, এই জন্যই নানা দার্শনিকের নানা মতবাদ। তিনি দেখিলেন,— মানবজীবন দুঃখময়। মরণান্তং জীবিতম্। মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তিনি দেখিলেন,—ব্যাধির কবলে পতিত হইয়া মানব আর্তনাদ করিতেছে। জরা মনুষ্য-জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। মৃত্যু মানব-সংসারকে শোকাগারে পরিণত করিতেছে। আর্তমানবের ক্রন্দন গৌতমের কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে মানবকে ব্যাধি ও জরামরণের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পথের সন্ধানে বাহির হইলেন।

তিনি নানাস্থানে নানা পণ্ডিতের সহিত আলোচনা করিলেন, নানা শাস্ত্র তিনি গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু পথের সন্ধান মিলিল না। তিনি কঠোর তপস্যা করিলেন, কিন্তু পথ পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, কঠোর তপস্যা দ্বারা বা কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। অবশেষে তিনি গয়ার নিকটে নিরঞ্জনা নদীর তীরে যখন সমস্যা-সমাধানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি মুক্তি-পথের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার নাম হইল বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

গভীর চিন্তার ফলে তিনি নিম্নলিখিত চারিটি সত্য (চত্বারি আর্যসত্যানি—four noble truths) আবিষ্কার করিলেন :

১। জরামরণাদি দুঃখ আছে। জীবন যে দুঃখময় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ব্যাধি, জরা ও মরণের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। শরীর থাকিলেই ব্যাধি, জরা ও মরণ থাকিবে। ভোগলালসা বা ইন্দ্রিয়সুখ পরিণামে দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে।

২। দুঃখসমুদয় অর্থাৎ জরামরণের কারণ আছে। বুদ্ধদেব দেখিলেন, জগতের কোন বস্তুই স্বয়ম্ভু নহে। কোন ঘটনাই কারণ ব্যতীত ঘটে না।

জরামরণও কারণভূত। তিনি জরামরণের নিম্নলিখিত কারণকার্য-পরম্পরা প্রদর্শন করিলেন। জরামরণের মূল বা আদি কারণ (১) অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যাহেতু মানুষ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার জন্মে। অবিদ্যা-প্রভাবে মানুষ যে যে চিন্তা বা কর্ম করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাদের সংস্কার মনকে এইরূপভাবে গঠিত করে যে, এই সংস্কারগুলি পরবর্তী জীবনের চিন্তা ও কার্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। পূর্ববর্তী জীবনের সংস্কার বর্তমান জীবনে (৩) বিজ্ঞানরূপে প্রথমে মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয় এবং এই বিজ্ঞান বা চেতনা হইতে (৪) নামরূপ অর্থাৎ দেহ ও মন আসিয়া থাকে। নামরূপ হইতে (৫) ষড়ায়তন (ইন্দ্রিয়সমূহ) আবির্ভূত হয়। ষড়ায়তন হইতে (৬) স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। সংযোগহেতু (৭) বেদনা বা ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয় এবং এই বেদনার জন্য (৮) তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা জন্মে। তৃষ্ণাহেতু (৯) উপাদান অর্থাৎ বিষয়ানুরক্তি এবং বিষয়ানুরক্তি হইতে (১০) ভব অর্থাৎ আমাদের সত্তা। বিষয়ানুরক্তিই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে এবং বিষয়ানুরাগহেতু আমাদের (১১) জাতি অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া (১২) জরামরণের কবলে পুনরায় পতিত হইতে হয়।

উপরোক্ত কারণকার্য-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অবিদ্যাবশতঃ আমরা জগতের প্রতি আসক্ত হই এবং ইন্দ্রিয়সুখকেই পরমসুখ বলিয়া মনে করি। ইন্দ্রিয়সুখে ভোগের স্পৃহা বাড়িতেই থাকে। এই ভোগতৃষ্ণার জন্য আমাদের বারবার জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। অজ্ঞানহেতুই নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনকে নিত্য বলিয়া মনে করি এবং পার্থিব সুখে নিমগ্ন থাকি।

৩। দুঃখনিবৃত্তি বা নির্বাণ। বুদ্ধদেব নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। দুঃখই জীবনের চরম পরিণতি, তিনি ইহা স্বীকার করেন নাই। জীবন দুঃখময় সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তিও মানুষ নিজের চেষ্টাতেই লাভ করিতে পারে। তিনি আশাবাদী ছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন—দুঃখ থাকিলেও দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। তিনি দুঃখ-নিবৃত্তিকেই নির্বাণ-আখ্যা দিলেন। নির্বাণ-সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন—নির্বাণের অর্থ চির-বিলুপ্তি, ইহা একটি নিষ্ক্রিয় শূন্য অবস্থা। কিন্তু নির্বাণের এই অর্থ অনেকেই স্বীকার করেন না। নির্বাণং শান্তম্ ইহা একটি স্থিতিশীল আনন্দ-পূর্ণ শান্ত অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্তের কোন ক্ষোভ থাকে না। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে লোক ক্লেশের হাত হইতে চির মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। তাহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া জরামরণের কবলে পতিত হইতে হয় না।

জীবন দুঃখময় হইলেও এবং লোকে দুঃখকষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহিলেও কেহই জীবনের চির-বিলোপ চাহে না। চিরবিলুপ্তি কাহারও কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং চির-বিলুপ্তিকেই জীবনের কাম্য বলিয়া বুদ্ধদেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। লোকে নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে—ইহাও ঠিক নহে। বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করিয়াও জীবের কল্যাণের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করিয়া শূন্যতাপ্রাপ্ত হন নাই। আনন্দপূর্ণ শান্ত, মুক্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থাই নির্বাণ।

৪। দুঃখনিবৃত্তি-মার্গ। মোক্ষ কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহার সন্ধানও বুদ্ধদেব প্রদান করিলেন। তিনি নিম্নলিখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করিলেন।

(১) সম্যগ্‌দৃষ্টি :—মুমুক্ষু ব্যক্তি দুঃখ এবং

ইহার উৎপত্তি ও বিলোপ-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অবশ্য লাভ করিবে। যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত নির্বাণলাভ সম্ভবপর নহে।

(২) সম্যক্‌সঙ্কল্প :—মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই পার্থিব বস্তুর প্রতি অনুরাগ এবং জীবের প্রতি হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার সকলকে ভালবাসিতে হইবে। সকলের দুঃখকষ্ট নিজের দুঃখকষ্ট—ইহা মনে করিয়া নিজের কল্যাণের সহিত অপরের কল্যাণও সাধন করিতে হইবে। হিংসা, দ্বেষ ও আসক্তি চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, এবং পরিণামে দুঃখই প্রদান করে।

(৩) সম্যক্ বাক্ :—যে দুঃখত্রাণ চাহে, সে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না। সে কখনও অপরের নিন্দা করিবে না। সে অপরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ এবং অসার কথাবার্তায় কালক্ষেপ করিবে না।

(৪) সম্যক্‌কর্মান্ত :—জীবের প্রতি হিংসা এবং অসার ইন্দ্রিয়-সুখভোগ অবশ্য বর্জনীয়।

(৫) সম্যগাজীব :—অসৎ জীবন ত্যাগ করিয়া সৎ জীবনলাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকে সেই কেবলমাত্র নির্বাণলাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম :—যে মুক্তিপথের পথিক, সে মন হইতে সর্ববিধ কুচিন্তা পরিহার করিবে এবং সকল সময় মনকে সুচিন্তায় ব্যাপৃত রাখিবে। যাহাতে মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৭) সম্যক্‌স্মৃতি :—শরীরমন যে পরিবর্তন-শীল, ইহা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে। অনিত্য দেহ ও মনকে অনিত্য বলিয়া ভাবিতে হইবে। ইহাদিগকে নিত্য বলিয়া ধারণা করা অজ্ঞানতার পরিচয়।

(৮) সম্যক্‌সমাধি :—সমাধির প্রথম পর্যায়ে মন হইতে হিংসা, দ্বেষ এবং কুপ্রবৃত্তিসমূহকে অপসারিত করিতে হইবে। মনকে চিন্তা ও বিচারের উপর নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মন যখন সর্ববিধ চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে, তখন যে শান্তি ও আনন্দ চিত্তে অনুভূত হয়, সেই আনন্দ ও শান্তির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। সমাধির তৃতীয় পর্যায়ে সমাধি হইতে যে শান্ত অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে হইবে। শেষ পর্যায়ে পরম নির্বাণলাভ হইয়া থাকে।

বুদ্ধদেব এক নীতির ধর্ম প্রচার করিলেন· এই ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বর আছেন কি নাই—এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর নহে। কিরূপে জরামরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, ইহাই জীবনের বড় সমস্যা। তাঁহার মতে তিনি যে নীতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথে নিষ্ঠার সহিত চলিলে মানব দুঃখত্রাণ লাভ করিতে পারে; পূজা, প্রার্থনা ও যাগযজ্ঞাদি বা কঠোর-তপস্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যদিও বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই, তাঁহার ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের মূলে একটি দার্শনিক মতবাদ রহিয়াছে। এই দার্শনিক মতবাদটি হইল—সর্বম্ অনিত্যম্। জগতের কোন জিনিস নিত্য বা স্থায়ী নহে। প্রত্যেক জিনিস পরিবর্তন-শীল এবং প্রত্যেক ঘটনাই কারণকার্য-সম্পর্কে আবদ্ধ। কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনারই উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয় ও লয় রহিয়াছে। প্রত্যেক জিনিস যখন পরিবর্তনশীল, তখন প্রতিক্ষণেই ইহার পরিবর্তন হইতেছে। কাজেই যৎ ক্ষণিকং তৎ সৎ। যদিও প্রতি জিনিসের ক্ষণের জন্য সত্তা রহিয়াছে তথাপি প্রতি জিনিসের অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে—অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্ সৎ। তাহা না হইলে কারণকার্য-সম্পর্ক থাকে না। প্রতি ঘটনাই

ক্ষণের জন্য আবির্ভূত হইয়া অপর একটি ঘটনার উৎপত্তি ঘটাইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই সংসার।

বুদ্ধদেবের মতে সর্বম্ অনাত্মম্। তিনি কেবলমাত্র জগতের পশ্চাতে ঈশ্বর বা শাশ্বত চেতনাশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তিনি আত্মার সত্তাও অস্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু সর্বম্ অনিত্যম্, সেই কারণে স্থায়ী আত্মা থাকিতে পারে না। নিত্য পরিবর্তনশীল মানসিক ঘটনাসমূহের স্রোত বা প্রবাহই আত্মা। যদিও বুদ্ধদেব আত্মার সত্তা স্বীকার করেন নাই, তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যে পর্যন্ত না জীব নির্বাণ লাভ করিতে পারে, সে পর্যন্ত সুখদুঃখ, চিন্তাভাব, প্রবৃত্তি প্রভৃতির স্রোত অনবরত চলিতে থাকে।

বুদ্ধদেব কার্যকারণবাদ অনুসরণ করিয়া কর্মবাদের প্রবর্তন করেন। প্রতি কর্মই ফলপ্রসূ। যে যেরূপ কর্ম করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে। কর্মফলের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ভোগজনিত কর্ম করিয়া জীব বার বার সংসারে আসিয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অনাসক্তভাবে কর্ম করাই নির্বাণলাভের একমাত্র সোপান :

"Commit no wrong, but good deeds do,
And let thy heart be pure,
All Buddhas teach this truth
Which will for age endure."

প্রাচীন গৌড় ও বর্তমান মালদহ্ জেলা

স্বামী পরশিবানন্দ

উত্থানপতন প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। এই এক জাতি তার গৌরবের চরম সীমায় উন্নীত হলো, আবার দেখতে দেখতে কিছু কালের মধ্যেই অবনতির নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছল। বিশেষ বিশেষ স্থান, দেশ ও ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই এই উত্থান-পতনের সূচনা হয়। পার্থিব জগতে যদিও কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবুও মা বসুন্ধরা এমনিতর বহু উত্থান-পতনের স্মৃতিকে সযত্নে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠীর জন্য রেখে গিয়েছেন ও রেখে যাচ্ছেন এক অভিনব অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা। এই সব প্রাচীন সুখদুঃখ, যশ-অপযশ, জয়পরাজয়-চিহ্নিত স্মৃতিগুলি দুর্বল মানবমনে আনয়ন করে অসীম শক্তি ও সাহস, আর অহংকারী অভিমানীদের হৃদয়ে এনে দেয় শান্তি, প্রীতি ও জ্ঞানের আলো।

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলে ঐরূপ প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শনগুলি ভ্রমণকারীকে মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই। ভারতমাতা কত দেশী বিদেশী নরনারীর স্মৃতিকেই না বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন! পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মালদহ জেলা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হলেও বহু প্রাচীন কীর্তি তাকে ঘিরে রেখেছে। এখানেই ছিল বাংলার সেই প্রাচীন গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী নগরী। দীর্ঘ এগার শত বর্ষব্যাপী এস্থানে বহু রাজা বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন। তন্মধ্যে পাল ও সেনবংশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু নরপতিগণ প্রায় ৬০০ বৎসর এবং পাঠান বাদশাহগণ ৫০০ বৎসরের অধিক কাল এখানে রাজধানী স্থাপন করে এস্থানটিকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে গেছেন। সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি লক্ষ্মণ সেন এই মালদাতে লক্ষ্মণাবতী নামে এক সুবিস্তৃত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে এই

নগরীটি গঙ্গা ও মহানন্দার সংযোগস্থলে প্রায় ১৪।১৫ মাইল ব্যেপে বিস্তারলাভ করেছিল। এখন অবশ্য উভয় নদীর খাতই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেন আমলের এই লক্ষণাবতী নগরীকে অবলম্বন করেই তুর্কী সুলতানগণ গৌড়ের বাদশাহরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গৌড় ও লক্ষণাবতীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান থেকে প্রাচীন নগরের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করছে।

কাহারো মতে এস্থানে রাজনীতি, সমাজনীতি, ন্যায়দর্শন, শিল্পবাণিজ্য, স্থাপত্য প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যার সহিত সঙ্গীতচর্চারও বিশেষ ব্যবস্থা ও সমাদর ছিল বলে গৌড় সারঙ্গ, গৌড়ী প্রভৃতি রাগরাগিণীর সহিত মিল রেখে এই নগরীর নামকরণ হয় গৌড়। স্কন্দপুরাণে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার এই গৌড়ের সমৃদ্ধিদর্শনেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই নামে নগর স্থাপিত হয়েছিল বলেই অনুমান। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন— বঙ্গদেশীয় গৌড়, সারস্বত গৌড় (পাঞ্জাবের পূর্বভাগ), কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল এই পাঁচটি দেশই গৌড় আখ্যা পেয়েছিল। সপ্তম শতকে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে ছিলেন। সুতরাং তাঁরই সময় হতে কিংবা ধর্মপালদেবের সময় হতেই বা এঁদের পূর্বেই এই নামের উৎপত্তি হয়— বলা কঠিন। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশকেই গৌড় রাজ্য বলা হত এবং পরবর্তী কালে মালদহ জেলায় গৌড়নামে রাজধানী স্থাপিত হয়। সপ্তম হতে অষ্টম শতকে বাংলার এই গৌড়নগরের এত উন্নতি সাধিত হয়েছিল যে, গৌড়ীয় রীতি বলে একটি কাব্যরচনার ধারা প্রবর্তিত হয় এবং উহা সর্বভারতে পরিচয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে।

ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে তিনি তাঁর রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মালদহ জেলায় খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসনের একটি মাত্র শ্লোকে জানতে পারা যায় —"তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সামন্ত নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ, চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলে কীর্তন করাতে করাতে হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃন্দ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করে কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করেছিলেন।" এই শ্লোকে বর্ণিত গন্ধার, মদ্র, কুরু, ও কীর দেশ যথাক্রমে—পঞ্চনদের পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব ও উত্তরে অবস্থিত। যবনদেশ সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের তীরবর্তী মুসলমান-অধিকৃত কোন রাজ্য হবে। অবন্তি মালবের এবং মৎস্যদেশ আলোয়ার ও জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। ভোজরাজ্য বোধ হয় বর্তমান বেরার এবং যদুরাজ্য পাঞ্জাবে অথবা সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে ধর্মপালদেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন এবং তাঁহার রাজত্বকাল প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী ছিল। বাঙ্গালীর ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি এই ধর্মপালের সময়েই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ইহাকেই বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ বলা যায়। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস—যাঁর কীর্তি ধনিনির্ধন ও আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলে একবাক্যে ঘোষণা করত, তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এবিষয়ে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—এই মহাশয়ত্রয়ের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী। তাঁরা বহু কষ্ট স্বীকার করে বাংলার এবং বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা উদ্ধার করেছেন।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুদের প্রতি

বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁহার কীর্তি মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। বহুস্থানে নারায়ণের জন্য মন্দির নির্মাণোদ্দেশ্যে তিনি নিষ্কর ভূমিদান করেছেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার তাঁরই নির্মিত বলে অনুমিত হয়। এতবড় বৌদ্ধ বিহার ভারতে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে বহু ভিক্ষু বিদ্যাভ্যাস করতেন। বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি মূর্তি গৌড়ে এবং মালদহ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত মালদহ জেলার পূর্বসীমানার সন্নিকটে পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার গাবগাছি নামক গ্রামে বটবৃক্ষের গাত্রে জড়িত কষ্টিপাথরের একটি নিখুঁত সুন্দর মূর্তি এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে

বর্তমানে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪।১৫ মাইল এবং প্রস্থে ৩।৪ মাইল ছিল বলে অনুমিত হয়। এই নগরীটিকে বন্যা এবং শত্রুর হস্ত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ৪।৫টি সু-উচ্চ বাঁধ এবং পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত করা ছিল। এখনও ঐ বাঁধ এবং পরিখাগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নগরীর প্রায় চারিদিকেই নদী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকারের সুবিধা এই এখানে ছিল। নগরী-প্রবেশের পথে বর্তমানেও তিনদিকে তিনটি দ্বাররক্ষাদেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্বে জহরা-দেবী, উত্তরপশ্চিম কোণে দ্বার-বাসিনী, এবং পশ্চিমে পাতালচণ্ডী অবস্থিতা। এই তিনটি দেবীর কাহারো প্রতিকৃতি বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এখনও বেদীতেই অর্চনা হয়ে থাকে। বেদী প্রস্তরনির্মিত। প্রতি বৈশাখ-মাসে শনিমঙ্গলবারে জহরা মায়ের নিকট পূজা ও বলি প্রদান করা হয় এবং মেলা বসে। দ্বার-বাসিনীতেও ভক্তেরা পূজা-অর্চনা দিয়ে থাকেন। এখানে মন্দিরসংলগ্ন একটি বড় পুকুর আছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নরনারী উহাতে স্নানাদি করে থাকেন। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটি দণ্ডায়মান থেকে ইহার প্রাচীনত্বকে এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করে চলেছে। এতদ্ব্যতীত গৌড়ের রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথ সু-উচ্চ প্রাচীরসংলগ্ন একটি দেবী-মন্দির (গৌড়েশ্বরী) ছিল বলে অনেকের ধারণা। এস্থানে কোন মন্দির বা বিগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না। কয়েক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর শুধু সাক্ষি-স্বরূপ পড়ে আছে। আমাদের মনে হয়, মুসলমানগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রাচীন গৌড় নগরকে দখল করেন, তখন হয় হিন্দুগণই তাঁদের উপাস্য দেবীকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন অথবা বিজেতৃগণই উহাদের অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছেন। গৌড়স্থিত মুসলমান বাদশাহদের তৈরী মসজিদ এবং অন্যান্য ইমারতাদিতে এখনও অনেক হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি-বিশিষ্ট-প্রস্তর দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান বাদশাহগণ হিন্দুরাজগণের নির্মিত প্রাসাদাদির মালমসলা দিয়েই তাঁদের মনোমত ইমারতাদি নির্মাণ করিয়ে ছিলেন।

পঞ্চদশ শতকে আলাউদ্দিন হুশেন শা এই গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৈষ্ণব ভক্ত চূড়ামণি রূপ ও সনাতন গোস্বামী—রাজস্ব মন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী—সাকর মল্লিক ও দবীর খাশ রূপে এই গৌড়ে বাস করতেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে গৌড় নগরে উপনীত হয়ে রূপ ও সনাতনকে কৃপা করেন। অদ্যাপি মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান—রামকেলী গ্রামের তমাল ও কেলীকদম্বমূলে নির্দেশিত হয়ে আসছে। মহাপ্রভুর প্রস্তর খোদিত পদচিহ্নও তথায় রক্ষিত আছে। কথিত আছে রূপ গোস্বামী যখন

বৃন্দাবনে চলে যান বাদশাহের এই উচ্চ পদ পরিত্যাগ করে, তখন সনাতন গোস্বামীও রূপ গোস্বামীরই পদাঙ্কানুসরণে স্থিরসংকল্প হয়েছেন জেনে বাদশাহ বহু অর্থব্যয়ে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে রামকেলী গ্রামে বৃন্দাবনের অনুরূপ একটি দেবস্থান নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখনও শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দির, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি বিদ্যমান থেকে বাদশাহ এবং সনাতন গোস্বামীর কীর্তি ঘোষণা করছে। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এই স্থানে মহাপ্রভুর আগমন-উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষে কীর্তন, মহোৎসব বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হয়ে আসছে। বহুদূর দেশ থেকেও ভক্ত সমাগম হয়; ৬৷৭ দিন ব্যাপী মেলা থাকে। এস্থানটিকে বৈষ্ণবভক্তগণ গুপ্ত বৃন্দাবন আখ্যা দিয়ে থাকেন।

সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এই প্রাচীন গৌড় নগরটি ম্যালেরিয়াতে ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি ইহা জঙ্গলাকীর্ণ ও নানাবিধ বন্যপশুর আবাসস্থলে পরিণত হয়। বহু বড় দীঘি এবং পুষ্করিণী এই নগরে ছিল। উহার নিদর্শন এখনও বর্তমান। বর্তমানে নগরের অধিকাংশ স্থানই চাষোপযোগী করা হয়েছে।

প্রাচীন কীর্তির মধ্যে দ্রষ্টব্য:—রামকেলী গ্রামে গুপ্তবৃন্দাবন, বারদুয়ারী, রূপ-সাগর, দখিল-দরজা, ফিরোজ-মিনার, রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে সু-উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, চিকা-মজজিদ, লুকোচুরী গেট, লোটন ও তাঁতী পাড়া মসজিদ, বড় ও ছোট সাগর দীঘি ও মিউজিয়ম্। পাঁচশত বৎসরের পূর্বেকার এনামেল করা ইট এখনও কয়েকটি মসজিদ গাত্রে বিদ্যমান থেকে দর্শককে মুগ্ধ করে থাকে। গৌড়ের সীমানার মধ্যে সরকারী রেশমের নার্সারীটিও দ্রষ্টব্য। ইংরেজ বাজার সহর থেকে মোটরে বা ঘোড়ার গাড়ীতে গৌড়ে যাওয়া যায়; যাতায়াতে ২৫।২৬ মাইল রাস্তা।

দমাদিত্রয় সাধনা

আচার্য শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শান্তিনিকেতন

গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে 'অভয়' প্রভৃতি দৈব সম্পদ্ এবং দম্ভাদি আসুর সম্পদের নির্দেশ করিয়াছেন। মুখ্যার্থে দৈব সম্পদ দেবতারই, আসুর সম্পদ্ অসুরেরই। কিন্তু গীতায় এই সম্পৎসমূহ গৌণার্থক—অর্থাৎ দৈব সম্পদে অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, দেবতার কার্য হেতু দেবভাবাপন্ন মনুষ্য; এইরূপ, আসুর সম্পদে অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, অসুরের কার্যহেতু অসুরপ্রকৃতি মনুষ্য। অর্জুন দৈব সম্পদে অভিজাত দেবোপম মনুষ্য, কংস প্রভৃতি মনুষ্য হইলেও, অসুরপ্রকৃতি হেতু পুরাণে কংসাসুর (কংস-অসুর) ইত্যাদি 'অসুর' বিশেষণ বিশিষ্ট-ভাবে অভিহিত, বস্তুত অর্জুন ও কংস উভয়েই মনুষ্যজাতি ক্ষত্রিয়, দৈব ও আসুর সম্পদ্ হেতুই একের দেবত্ব ও অন্যের আসুর স্বভাব। পূর্বোক্ত দৈব সম্পদের মধ্যে যে দম দান দয়া এই সম্পৎত্রয়ের গণনা আছে, বৃহদারণ্যকে সেই দমাদিত্রয়ের সাধনা পরবর্তী আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রজাপতির পুত্র দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ

পিতার নিকটে ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিলেন এবং শিষ্যভাবে প্রজাপতিকে বলিলেন—"পিতঃ, যাহা অনুশাসন, তাহা আমাদিগকে বলুন।" তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যে উপদেশাক্ষর 'দ' উচ্চারণ করিলাম, তাহা তোমরা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই?" দেবগণ উত্তর করিলেন,—"বুঝিয়াছি।" প্রজাপতি বলিলেন যদি বুঝিয়া থাক, বল আমি কি বলিয়াছি। দেবগণ বলিলেন—"আপনার অনুশাসনাক্ষর বুঝিয়াছি 'দাম্যত' অর্থাৎ তোমরা দমন কর, তোমরা স্বভাবত অদান্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমরহিত বা অজিতেন্দ্রিয়, অতএব দান্ত বা জিতেন্দ্রিয় হও, ইহাই আমাদিগকে উপদেশ দিলেন।" তখন পিতা বলিলেন,—"ওম্" অর্থাৎ দেবগণের বাক্য স্বীকার করিয়া বলিলেন—"হাঁ ঠিকই বুঝিয়াছ।"

মনুষ্যেরা বলিলেন,—"পিতঃ, আমাদিগকে অনুশাসন করুন।" তাঁহাদের এই প্রার্থনায় প্রজাপতি আবার 'দ,' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যে 'দ' বলিলাম তাহা তোমরা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই।" মনুষ্যেরা বলিলেন—"আমরা আপনার উপদিষ্ট অক্ষর বুঝিয়াছি।" প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—" 'দ' কারে কি বুঝিয়াছ বল।" মনুষ্যেরা উত্তরে বলিলেন—"'দ' দত্ত, তোমরা দান কর। তোমরা স্বভাবত লুব্ধ বা লোভপরায়ণ, অতএব যথাশক্তি লোভ সংবরণ কর, দান কর।"

গীতায় ভগবদুক্তি—লোভ, তমোদ্বার, অর্থাৎ নরকে প্রবেশের পথ, আত্মজ্ঞাননাশক। ইহা হইতে বিমুক্ত মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধন করিয়া পরমগতি বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬।২১-২২)।

অসুরগণ প্রার্থনা করিলেন,—"পিতঃ, আমাদিগকে উপদেশ দিন।" প্রজাপতি পুনর্বার 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"আমি যে 'দ' বলিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই?" অসুরগণ উত্তর করিলেন,—"বুঝিয়াছি" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বুঝিয়াছ বল।" অসুরগণ বলিলেন,—"'দ' অর্থাৎ দয়ধ্বম্, তোমরা দয়া কর। তোমরা ক্রূর, হিংসাপরায়ণ পরধন হরণাদি কুকার্যে আসক্ত, অতএব তোমরা সকল প্রাণীর প্রতি দয়া কর—এই উপদেশ দিলেন।" প্রজাপতি বলিলেন,—"ওম্", অর্থাৎ "হাঁ, ঠিকই বুঝিয়াছ।"

প্রজাপতি, দেবগণ মানবগণ ও অসুরগণকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। এখনও মেঘগর্জনরূপে দৈববাক্য অনুশাসন করিতেছেন;—'দাম্যত' 'দত্ত' 'দয়ধ্বম্', অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর, দান কর, দয়া কর। অতএব এই দমাদিত্রয় শিক্ষা করিবে। এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য দমাদিত্রয়ের সাধন-বিধান। গীতায় যে দৈবী বা সাত্ত্বিকী সম্পদের বর্ণনা আছে, দম দান দয়া তাহাদের মধ্যে মুখ্যতম। এই তিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে, দেব মানব বা অসুর সকলেই বস্তুত জিতেন্দ্রিয় লোভ-পাশমুক্ত ও হিংসাদি-পরিশূন্য হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে দমাদিসিদ্ধিবিহীন অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় দেবতা, নামমাত্র দেবতা লোভপরায়ণ মনুষ্য বা হিংসাপরায়ণ অসুরের ত কথাই নাই।

আখ্যায়িকায় প্রজাপতির কথিত অনুশাসন চিরকালই সুফলপ্রসূ। ইন্দ্রিয়দমন, দীনে দান, জীবে দয়া—ইহা কার্যত অনুষ্ঠিত হইলে, মানব চারিত্রপূজায় দেবতারও ঊর্ধ্বে পদলাভের অধিকারী হয়। বর্তমান ভারতে এই অনুশাসনত্রয়ের পরিশীলন ও পরিপালন অত্যাবশ্যক মনে হয়।

"আসবে তুমি ইচ্ছা যবে"

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্-এ

আসবে তুমি ইচ্ছা যবে হবে তোমার মনে ;
—হয়তো বিনা আমন্ত্রণে, হয়তো অকারণে !
আমার শুধু রাখতে হবে খোলা সকল দ্বার ;
পথের ধূলা আমায় হবে করতে পরিষ্কার ;
আঁধার রাতে জ্বালতে হবে প্রদীপ সযতনে !

হয়তো কভু আসবে তুমি, হয়তো রবে ভুলে ;
চলার পথে হয়তো কভু চাবে না চোখ তুলে !
আমায় তবু রাখতে হবে রচি বরণডালা ;
সকাল সাঁঝে গাঁথতে হবে হৃদয়রাগে মালা ;
নয়ননীরে ভাসতে হবে বিয়োগবিধুর ক্ষণে !

একটি জাতকের গল্প

শ্রীফণীন্দ্রমোহন মিত্র

জাতক-কাহিনীগুলি ভগবান বুদ্ধের পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত। তিনি এখানে বোধিসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, ইত্যাদি নামে পরিচিত, এবং শুধু মনুষ্যরূপেই নহে, ইতর পশুপক্ষী সরীসৃপাদি যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে তাঁহার অভিনীত ভূমিকাগুলিও অতি অপূর্ব। কখনও তিনি রাজা—মনুষ্যরাজ বা পশুরাজ ; কখনও রাজপুত্র বা রাজমাতা, কখনও ঋষি, বৃক্ষদেবতা, বা আচার্য, আবার কখনও ব্রাহ্মণ, ভূম্যধিকারী, পণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠী, কখনও শক্র (ইন্দ্র), কখনও ব্রহ্মা, এমন কি কোন কোন জাতকে বোধিসত্ত্বকে চোর, ধূর্ত ইত্যাদি ভূমিকাতেও দেখা যায়। বিচিত্র জগৎ সংসারের অগণিত মনুষ্যপশুপক্ষি-বৃক্ষপতঙ্গ-সংবলিত বিরাট অভিব্যক্তির (evolution) চেহারাটিই যেন এই বিরাট ধর্মসাহিত্যে ধরা পড়িয়াছে, আর ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে সংখ্যাতীত নায়ক-নায়িকার বহুরূপ লীলা-বৈচিত্র্য। এই কাহিনীগুলিতে আমরা পাই একাধারে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও লোক-নীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির এক মনোরম সমাবেশ। এককথায় জাতক-কাহিনীগুলিকে বলা যায় আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিষয়গুলি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস, অহিংসা, ক্ষান্তি, শান্তিপ্রিয়তা ইত্যাদির যে বিশেষ প্রাধান্য জাতকে থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জাতক-গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এইগুলিতে শুধু উক্ত নীতিগুলিই পরিস্ফুট হয় নাই, পরন্তু বহুস্থানে বহুবার বহুরূপে ও আকারে উহাদের বিপরীত বহুনীতি ও তত্ত্ব স্থান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। শুধু অহিংসা নয়,—হিংসা ও অহিংসা, শুধু ক্ষমাধর্ম নয়,—দণ্ড, শাস্তি ও ক্ষমা, শুধু শান্তিসর্বস্বতা নয়,—যুদ্ধোদ্যম ও শান্তি, এইরূপ বিরুদ্ধনীতিতত্ত্বের সংঘাত ও মিলনে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় এই বিরাট বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক জগতের এক পূর্ণ বাস্তব সমগ্র উজ্জ্বল চিত্ররূপে ! পাশাপাশি চলিয়াছে সাম ও দণ্ড, সত্য ও হত্যা, সন্ন্যাস ও রাজধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রতেজ, ত্যাগ ও ভোগ, যতিধর্ম ও বৈশ্য-ঐশ্বর্যরূপ ! বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধজগৎ ও বৌদ্ধসাহিত্য এককালে এই পরিপূর্ণ সমঞ্জস

বাস্তবতার (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই বৌদ্ধবিজয়-বৈজয়ন্তী এককালে সমগ্র এশিয়ার দূরদূরান্তরে উড্ডীন হইয়াছিল এবং দেশ নগর জনপদ রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। রাজনীতি ধর্মনীতি ও সমাজনীতির সমন্বয়ের অপূর্ব সুফলরূপে শিল্পকলা বাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বিশ্বজগৎকে চমকিত করিয়াছিল, আজও যাহা বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু। আর যখন বৌদ্ধজগৎ এই অপূর্ব বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি হারাইয়া শুধু হিংসা-অহিংসার কূটতর্কে জড়াইয়া গেল, একতরফা শান্তিসর্বস্বতার চোরা বালিতে আটকাইয়া গেল, একতরফা সন্ন্যাসধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তনে মস্‌গুল হইল,—ইতিহাস আজ পরিষ্কার কণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছে যে, তখন হইতেই শুরু হইল বৌদ্ধজগতের অবনতি ও অধঃপতন।

সজীব প্রাণবন্ত (Dynamic) প্রাচীন বৌদ্ধ-জগতের বাস্তবতার কোন্ রূপটি জাতকগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, তাহাই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

আমাদের আলোচ্য জাতকটি হইতেছে মহাশীলবানজাতক।* পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুস্তকে দেখা যায়—'শাস্তা', অর্থাৎ বুদ্ধদেব, "জেতবনে কোন বীর্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন" (১০৯ পৃঃ)। উক্ত ভিক্ষু নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে উৎসাহ ও ধর্মের গৌরব শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও অদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্ট সৌভাগ্য পুনঃ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

*পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত জাতক-গ্রন্থমালার ১ম খণ্ড, ১৩২৩

এখানে গল্পটির মুখবন্ধেই আমরা দুইটি তত্ত্বের পরিচয় পাইতেছি :—

(১) বীর্যমহিমা—নিরুৎসাহ বা নিষ্ফল হইলে চলিবে না। "অদম্য উৎসাহবলে" বারবার চেষ্টা করিতে হইবে, বীর্য অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব, তবেই "প্রনষ্ট সৌভাগ্য পুনর্লাভ" সম্ভব। বীর্যের এইরূপ মহিমা-কীর্তন বহুজাতকে দেখা যায়। যেমন ১ম খণ্ডের ৫২ নং চুলজনক-জাতক; ২য় খণ্ডের ২৬৫ নং ক্ষুরপ্র-জাতক।

বর্তমান কাহিনীটির উপসংহারে আমরা পুনরায় উৎসাহ, "অদম্য বীর্য" ইত্যাদির পরিচয় পাইব।

(২) রাজগৌরব—রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া রাজার পক্ষে গর্হিত কাজ, রাজধর্মবিরুদ্ধ সুতরাং নষ্ট রাজ্য পুনর্লাভ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, উহাই রাজধর্মসম্মত।

এই সঙ্গে আর একটি অত্যাশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, রাজধর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সন্ন্যাসী ভিক্ষুকে বুদ্ধদেব শিক্ষা দিতেছেন!

যে রাজপুত্র রাজ্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন, তিনি কেন সেই রাষ্ট্রজগতেরই নজির দিয়া সন্ন্যাসীর মোহভঙ্গ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।

এইবার আসল গল্পটিতে আসা যাক্—

"পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।" (১০৯ পৃঃ) বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কে ছিলেন, কখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। এখানে আমাদের শুধু লক্ষ্য করিবার বিষয় এইটুকু যে—

রাজধর্মের পটভূমিকায় বৈরাগ্যধর্মী কাহিনীর । রাজার নাম লইয়াই ধর্ম-কথার সূত্রপাত। রাজা ও রাজপ্রতাপ নহিলে

ধর্মের কাহিনীই আরম্ভ হইতে পারে না! দেশে যখন "যথাধর্ম প্রজাপালনকারী মহাশীলবান্" কোন রাজা রাজতক্তে আসীন, তখনই কোন ধর্মের কাহিনীতে কান দেওয়া জনগণের পক্ষে সম্ভব। বৈরাগ্যই বল, আর অহিংসাই বল, অরাজক দেশে ইহাদের কোন কথাই আরম্ভ হইতে পারে না। সর্বাগ্রে চাই "সর্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত" "যথাধর্ম"-শাসনকারী একজন রাজা।

এক্ষণে গল্পটির অনুসরণ করা যাক্—বোধিসত্ত্ব যোড়শ বৎসর বয়সেই "সর্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত" হইয়া উঠেন এবং পিতার মৃত্যুর পর "মহাশীলবান্" নামে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম প্রজাপালনপূর্বক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গল্পের শেষে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন, "আমি ছিলাম রাজা মহাশীলবান্"। এখানে স্বতই এই প্রশ্নটি উঠে :

বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার শ্রীমুখকথিত কাহিনীটিতে দেখা যায়, পূর্ব জন্মে তিনি মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন, এবং রাজসিংহাসন ত্যাগ করা দূরে থাকুক, নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত বীর্যপ্রকাশে বিরত হন নাই বলিয়া গিয়াছেন ও এইরূপ দৃষ্টান্তই উপস্থাপিত করিয়াছেন।

রাজা মহাশীলবানের এক অমাত্য অবৈধ প্রণয়ের অপরাধে রাজাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া কোশলরাজ্যে গমন করেন এবং সে রাজ্যের রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। একদিন তিনি কোশলরাজকে বলেন, "'মহারাজ, কাশীরাজ্য মক্ষিকাবিহীন মধুচক্রসদৃশ; তত্রত্য রাজার প্রকৃতি অতি মৃদু; সহজেই উহা অধিকার করিতে পারা যাইবে।' তাহার কথা পরীক্ষা করিবার জন্য কোশলরাজ কতকগুলি লোক পাঠাইয়া কাশীরাজ্যের একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম (border village) আক্রমণ করাইলেন।" (১১০ পৃঃ) এখানে দেখা যাইতেছে :

দুর্বল মৃদুপ্রকৃতি রাজার রাজ্য সহজেই শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ মৃদুতা, দুর্বলতা ইত্যাদি রাজদোষই রাজ্যের বিপদ ডাকিয়া আনে। গল্পটিতে আছে—প্রত্যন্ত (border) গ্রাম আক্রান্ত হইয়াছিল। আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের দুর্গত পরিস্থিতির সহিত কি অপরূপ মিল এখানে দেখা যাইতেছে!

রাজ্যের প্রত্যন্তগ্রাম শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইল। কিন্তু রাজা মহাশীলবান কি করিলেন? আক্রমণকারিগণ ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে রাজা মহাশীলবানের প্রশ্নে তাহারা বলিল যে, জীবিকানির্বাহের উপায়াভাবেই তাহারা এই দুষ্কার্য করিয়াছে। শুনিয়া মৃদুপ্রকৃতি বিশ্বাসপরায়ণ রাজা দুঃখে গলিয়া গিয়া মিথ্যাবাদী ভণ্ড আক্রমণকারীদিগকে উপযুক্ত ধন দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্', ঘৃতে আগুন নিভে না, বাড়িয়াই যায়। সুতরাং পররাজ্যলোভী কোশলরাজ এবার কাশীরাজ্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিবার জন্য পুনরায় লোক পাঠাইলেন। উদারহৃদয় ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ ইহাদিগকে পূর্বের ন্যায় ধন দিয়া বিদায় করিলেন। তারপর কোশলসেনারা আসিয়া বারাণসীর রাজপথসমূহে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এবারও তাহারা শাস্তি বা নিগ্রহের পরিবর্তে ধনরত্ন পুরস্কার পাইল। দেখা যাইতেছে, বারবার, তিনবারেও কাশীরাজের শিক্ষা হইল না। তাঁহার অদৃষ্টে নিতান্তই দুর্ভোগ আছে।

কোশলরাজ এইবার নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, "কাশীরাজ অতীব নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ," (১১০ পৃঃ)। কাশীরাজের যে সৈন্যবলের অভাব ছিল, তাহা নয়। "এই সময়ে কাশীরাজের এক সহস্র মহাযোদ্ধা ছিল। তাহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ বীর্যবান্ ।...মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহারা জম্বুদ্বীপের, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য জয় করিতে সমর্থ ছিল।" (১১০ পৃঃ) আর এই

বীরপুরুষেরা কাশীরাজকে যুদ্ধার্থ অনুমতি দিবার জন্য প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমাপরায়ণ কাশী-রাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য যেন অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। মহারাজের রাজ্যলোভ আছে, তাহারা ইচ্ছা করে ত আমার রাজ্য অধিকার করুক।"

এদিকে কোশলরাজ কাশীরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলে অমাত্যেরা কাশীরাজের নিকট যুদ্ধ করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ইত্যোমধ্যে কোশল-রাজ রাজধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দূতমুখে কাশীরাজকে জানাইলেন, 'হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও।' ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ উত্তর দিলেন তিনি যুদ্ধ করিবেন না, কোশলরাজ ইচ্ছা করিলে রাজ্যগ্রহণ করিতে পারেন। অমাত্যেরা তখনও যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, শেষ অনুমতি। কিন্তু রাজা মহাশীলবান্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নগরদ্বার খুলিয়া দিয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

হায় রাজা মহাশীলবান্! একতরফা ক্ষমা ও অহিংসাধর্মের মাহাত্ম্যে অন্ধ হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি কিরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন না ক্ষমা ও অহিংসারও বাড়া-বাড়ি আছে এবং সকল বাড়াবাড়িই সর্বনাশের কারণ। এখানে আমরা জাতকগ্রন্থমালার আর একটি প্রধান শিক্ষার পরিচয় পাই। সেটি এই—

"কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন;
শিখিবে অত্যন্ত সর্ব করিতে বর্জন।
(৫৯ নং ভেরীবাদ জাতক, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃঃ;
৬০নং শঙ্খধ্ম-জাতক, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

বাড়াবাড়ির যে কী ভীষণ পরিণতি তাহাই এখন দেখা যাইবে।

এদিকে কোশলরাজ নির্বিবাদে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া কাশীরাজ ও তাঁহার অমাত্যগণকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার আদেশে বন্দিগণকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া শ্মশানে গর্ত খুঁড়িয়া গলা পর্যন্ত মাটিতে পোতা হইল শৃগাল-কুকুরের খাদ্যের জন্য। সকলে চলিয়া গেলে মহাত্মা শীলবান্ (তিনি আর এখন রাজা নহেন) আকণ্ঠ প্রোথিত অমাত্য-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ কর; অন্য কোন ভাবকে স্থান দিও না।" (১১১ পৃঃ)

মনুষ্যমাংসের গন্ধে শীঘ্রই একপাল শৃগাল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। "তাহাদিগকে দেখিয়া 'রাজা' ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট চীৎকার করিলেন যে, শৃগালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল।" (১১১ পৃঃ)

একি! মৈত্রীভাবনা কোথায় গেল? একমুহূর্ত আগে যে 'মৈত্রীপোষণে'র চমৎকার গালভরা কথা হইতেছিল! এক মুহূর্তেই তাহা উঠিয়া গেল? শৃগাল কর্তৃক ভক্ষিত হইবার ভয়ে না কি? তবে কি এতদিন মহাত্মার কাণ্ডজ্ঞানের উদয় হইল? একেবারে রসাতলে যাইবার মুখে কি শুভবুদ্ধির উদয় হইল?

মহাত্মা ও তাঁহার অমাত্যগণ তিন তিনবার 'বিকট চীৎকর' করিয়া দুর্ভাগ্য শৃগালগণকে মৈত্রীর অপূর্ব রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিলেন। তৎপরও যখন শৃগালেরা দেখিল যে কেহই তাড়া করিতেছেন না, "তখন তাহাদের সাহস বাড়িল" ও তাহারা আবার মহাত্মাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। শৃগাল-দলপতি যেমন কাশীরাজকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, "উপায়-কুশল কাশীরাজ" "অমনি তাহারই গ্রীবা দংশন করিয়া ধরিলেন।" (১১১ পৃঃ)

একি অহিংসাবিরুদ্ধ আক্রমণ! "মহাশীলবানের একি দুঃশীলতা! কিন্তু দেখা যাইতেছে মহাশীলবান্ একেবারে মহামরণের অন্ধগর্তে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে-ক্রমে উপায়কুশল হইয়া উঠিতেছেন, এবং "মৈত্রী-পোষণ" আপাততঃ মুলতুবি রাখিয়া আত্মপোষণার্থে

আক্রমণাত্মক উপায়কুশলতা অবলম্বন করিতেছেন, end এর মোড় ঘুরাইয়া দিয়া তদুপযুক্ত means আবিষ্কার করিয়া লইতেছেন। এখানে জাতক-মালার আর একটি প্রধানতত্ত্বে আমরা উপনীত হইতেছি। সেটি হইতেছে—

উপায়কুশলতা, মূর্খতা-পরিহার :—বহু জাতকের গল্পে নানারূপে এই উপায়কুশলতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, মূর্খতার দোষ ও তাহাতে যে কী ভীষণ সর্বনাশ হয় তাহা দেখান হইয়াছে, জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা কিভাবে স্বার্থসিদ্ধি করেন ও বাস্তবজগতের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া টিকিয়া থাকেন, তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন ১ম খণ্ডের ২০নং কুরঙ্গজাতকের পরিশেষে কাহিনীর সমাধান-রূপে বুদ্ধদেব কহিতেছেন, "আমি ছিলাম সেই উপায়কুশল বানররাজ।" (৪৯ পৃঃ) তৃতীয় খণ্ডের ৩৪২নং বানরজাতকের শেষে বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন—

"আকস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায়
যে না পারে নির্ধারিতে অবিলম্বে হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে,
পাইবে যাতনা মূঢ় অনুপাতানলে।"

(জাতক, ৩য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ)

১ম খণ্ডের ৪৫নং রোহিণী-জাতকে বোধিসত্ত্ব এই গাথাটি বলিতেছেন :—

"হিতে করে বিপরীত মূর্খ যদি মিত্র হয়"...

তার পরেই আছে "এই গাথাদ্বারা পণ্ডিতজনের প্রশংসা করিয়া বোধিসত্ত্ব ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন।" (১ম খণ্ড, ১০১ পৃঃ) ধর্মোপদেশের মধ্যে তখন বীর্যস্তুতি, উপায়কুশলতা-কীর্তন ইত্যাদিও থাকিত।

গল্পটি এবার ধরা যাউক— কাশীরাজ শৃগাল-পতির গলা দংশন করিয়া ধরিলেন। "তাঁহার হনুতে যন্ত্রের মত এবং দেহে হস্তীর মত বল ছিল, কাজেই শৃগাল তাহার দশনপঙ্‌ক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া মরণভয়ে বিকট রব করিয়া উঠিল।" (১১১ পৃঃ) তাহার চীৎকারে অন্যান্য শৃগাল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এদিকে শৃগালপতির লাফালাফিতে চারিদেকের মৃত্তিকা শিথিল হইয়া যাওয়ায় 'রাজা' শৃগালকে ছাড়িয়া দিলেন এবং "গজোপম বলপ্রয়োগপূর্বক" বিবর হইতে নিজেকে বাহির করিয়া আনিলেন এবং অমাত্যগণকেও উদ্ধার করিলেন।

এক্ষণে এই চমৎকার প্রশ্নটি উঠিতেছে—

সেই যদি মৈত্রীভাবনাই পরিত্যাগ করিতে হইল, সেই বীর্যপ্রকাশ, আক্রমণ, উপায়-কুশলতা, "গজোপম বলপ্রয়োগ"ই যদি করিতে হইল, তবে প্রথমেই এসব করিতে বাধা কি ছিল? একেবারে প্রথমে না হউক বারবার দুইবার শত্রুকে মৈত্রীভাবনাগুণে ক্ষমা করিয়া তৃতীয়বার যখন আক্রমণ হইল, তখন বীর্যপ্রকাশ, পাল্টা আক্রমণ 'গজোপম বলপ্রয়োগ' ইত্যাদি করিলে কি মৈত্রী-পোষণ, অহিংসা, ক্ষমাগুণ ইত্যাদি অশুদ্ধ হইয়া যাইত, বিশেষতঃ যখন একটু পরেই এ সকল মৈত্রী-বিরুদ্ধ ক্রিয়া অপরিহার্য হইয়াছিল?

আমাদের মনে হয় জাতক-কথক এইখানে উভয়-রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিকে বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া অন্যদিক্ বজায় থাকে নাই। "কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না যখন," ইহা ত জাতকেরই শিক্ষা। অহিংসা, মৈত্রীপোষণ, ক্ষমাধর্ম ইত্যাদির কি বাড়াবাড়ি নাই? আছে বলিয়াই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রচলিত লোকনীতি বিধান দিয়াছে—বারবার দুইবার, তিনবার না।

তাহার পর গল্পটি এই— উক্ত শ্মশানে বহু যক্ষ থাকিত। সেইদিন এক ব্যক্তি একটা শব দুই যক্ষের সীমার উপর ফেলিয়া যাওয়ায় ঐ শবের অধিকার লইয়া ঝগড়া করিতে করিতে যক্ষদ্বয় 'রাজা' শীলবানের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইল। কিন্তু শীলবান তখনও অশুচি। সুতরাং যক্ষদ্বয় "প্রভাববলে" কোশলরাজের জন্য সংগৃহীত

সুবাসিত জল, পরিচ্ছদ, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, 'নানারস-সমন্বিত অন্ন'-পান-তাম্বুলাদি লইয়া আসিয়া তাহা দ্বারা মহাশীলবানকে শুচি-শুদ্ধ করিল। এখানে দেখা যাইতেছে—

অদত্তাদান* বৌদ্ধশাস্ত্রের বিখ্যাত দশ-শীলবিরুদ্ধ কার্য। কোশলরাজের দ্রব্যাদি বিনাদানে মহাশীলবানের গ্রহণ নিশ্চয় শীলবিরুদ্ধ কার্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে— মহাশীলবান রাজার পক্ষে দশ-শীলবিরুদ্ধ কার্যও কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধশাস্ত্র-সম্মত বটে। তাই রাজা মহাশীলবান অনায়াসে শৃগালের গ্রীবা দংশন করিতে পারিয়াছিলেন।

শুচিস্নাত হইয়া মহাশীলবান্ আপনার খড়্গ আনাইলেন এবং উহা দ্বারা শবটির "মস্তকে আঘাত করিয়া সমান দুই ভাগে চিরিয়া যক্ষদ্বয়কে এক এক অংশ দিলেন এবং খড়্গ ধুইয়া কোষের মধ্যে রাখিলেন। যক্ষেরা মনুষ্যমাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল।" (১১২ পৃঃ)

তারপর রাজা মহাশীলবান (তিনি তখনও পুনরায় রাজা হন নাই) যক্ষপ্রভাববলে স্বীয় রাজপ্রাসাদমধ্যে নীত হইলেন। চোররাজ অর্থাৎ তস্কর কোশলরাজ, নিদ্রা যাইতেছিলেন। "কাশীরাজ খড়্গতলদ্বারা তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন।" (১১২ পৃঃ) এই আর একটি অহিংসাবিরুদ্ধ কার্য, রাজার পক্ষে তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র-সম্মত। তারপর যাহা হইল, তাহা সহজেই বুঝা যায়— পরাভূত কোশলরাজ কাশীরাজের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার খড়্গাস্পর্শপূর্বক শপথ করিলেন যে, তিনি আর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শুধু তাহাই নয়। তিনি তখনই "কাশীরাজকে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে একটি সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিলেন।" (১১২ পৃঃ) শুধু তাহাই নয়। পরদিন প্রাতে "কোশলরাজ ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত সৈন্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে সমবেত করাইয়া তাহাদের সমক্ষে" মহাশীলবানের গুণকীর্তন করিলেন এবং "সভামধ্যে পুনর্বার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্ব-রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, অদ্যাবধি এই রাজ্যের বিদ্রোহীদের দমন করিবার ভার আমি লইলাম; আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি প্রজাপালন করুন।"

এখানে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিবার— শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ও অনুগত সেবকে পরিণত না করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রকার ক্ষান্ত হন নাই। শুধু পরাজয় নয়, শুধু মৌখিক আনুগত্য-স্বীকারও নয়— বিজয়ীর খড়্গাস্পর্শপূর্বক শপথ-গ্রহণ; দুই দুইবার ক্ষমাপ্রার্থনা, তন্মধ্যে একবার সর্বজনসমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা, সর্বজনসমক্ষে বিজয়ীর গুণকীর্তন ও বিজয়ীর অনুগত সেবকত্বগ্রহণ, শত্রুকে এই সব করাইয়া তবে বুদ্ধদেব বা জাতক-কথক তাহাকে রেহাই দিয়াছেন। শত্রুতা এমনই সাংঘাতিক জিনিস, শত্রুকে এইভাবে বশে না আনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধধর্মের ন্যায় নির্বিরোধ ধর্মশাস্ত্রে পর্যন্ত এককালে এইরূপ রাষ্ট্রনীতিই কীর্তিত হইয়াছিল।

এইবার গল্পের উপসংহার করা যাক্— সালঙ্কার শীলবান্ রাজা মৃগপাদযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিমা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,— 'উৎসাহ-বলেই আমি আবার রাজপদ পাইলাম, অমাত্য-দিগেরও প্রাণরক্ষা হইল। অহো! উৎসাহের কি অদ্ভুত ফল!' 'অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে এই গাথা বলিলেন:—

ছাড়িও না আশা, মন, কর চেষ্টা অবিরাম;
অদম্য বীর্যের বলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।

(১১৩ পৃঃ)

* অর্থাৎ পরদ্রব্য দত্ত না হইলেও গ্রহণ

রাজা বা রাষ্ট্রপতির কর্তব্যাকর্তব্য কি, কি তাহার বর্জনীয় দোষ, কি তাহার গ্রহণীয় গুণ, কিসে তাঁহার ও তৎপক্ষীয়দিগের দণ্ডনিগ্রহ, কিসে তাহাদের নিষ্কৃতি ও জয়,— এসকলের যে অপূর্ব চিত্র অহিংসাসর্বস্ব নির্বিরোধ একটি ধর্মশাস্ত্রে পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্তমান কালে আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

স্রষ্টা ও

শ্রীতারাকালী বসু, এম্‌-এ

ফেলিয়া কোমল দিঠি পৃথ্বী আছে চেয়ে—
রোমাঞ্চিত বক্ষে যেন অভিমানী মেয়ে।
মৃত্তিকার শ্যাম অঙ্গে নব তৃণ জাগি—
জিজ্ঞাসিনু,—'কে গো তুমি? আছ কার লাগি?
ভাবিল সে,— 'আমি সৃষ্টি, না জানি সন্ধান
স্রষ্টা কোথা, তুমি কবি, গাহ তাঁর গান।'

নীল সিন্ধু উর্মিমালা দুলে দুলে চলে,
ফেনায় ফেনায় তার উচ্ছল যৌবন;
আপনি প্রমত্তা সে যে রত্নপ্রসবিনী,
শত প্রাণ প্রবাহের ফুল্ল উপবন।
ডাকিয়া শুধানু তারে— 'হে রহস্যময়ি,
জানি না রহস্য তব, কেগো তুমি অয়ি?'
'মোরা সৃষ্টি, তুচ্ছ মোরা, নহি স্রষ্টা, কবি,
দূরের সন্ধানে তুমি আঁকো তাঁর ছবি।'

চঞ্চল দখিনা বায়ু পুষ্পবাস বহি,
মৃদুমন্দ নবছন্দে চলে রহি রহি,
পুছিয়া জানিনু শুধু সৃষ্টির বিস্ময়—
'স্রষ্টা,— সে অনেক দূরে,' কহিল মলয়।

জলভরা ছল ছল চক্ষে চাহে তারা,
নীরব আকাশ মাঝে আলোর ইশারা।
শুভ্র লঘু মেঘরাশি বলাকার মত
চকিতে ছুটিয়া চলে, যেন দিশাহারা
ডাকিনু, ক্ষণেক থামি বলে গেল তারা—
'খুঁজিছ স্রষ্টারে কবি, সৃষ্টি যে আমরা।'

বিস্মিত মৃত্তিকা পানে তাকানু আবার
ডাকিনু সিন্ধুর নীরে দক্ষিণা সমীরে—
বলিনু গ্রহেরে ডাকি পুঞ্জনীহারিকা,
তোমাদেরই মাঝে আছে স্রষ্টা ভগবান।
উত্তরিলা পুনঃ সবে 'মোরা তাঁর দান।'
বুঝিনু আমার প্রশ্ন, রহস্য এ নয়
স্রষ্টা যে সৃষ্টির মাঝে হয়ে আছে লয়।

বুদ্ধ-ধর্ম

ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জন

যদি নীতি আর ধর্মের মধ্যে একটা সীমারেখা টানবার চেষ্টা করা যায়, তাহ'লে বুদ্ধদেব যে ধর্ম-প্রচার করে গেছেন, অনেকেই তাকে ধর্ম বলতে কুণ্ঠিত হবেন। ঈশ্বর বা আত্মা বা ব্রহ্ম বা অতি-মানব কোন সত্তার স্থান যেখানে নেই তাকে ধর্ম বলতে দ্বিধা বোধ করা নিতান্তই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব যা প্রচার করলেন, আসলে তা হ'লো কতকগুলি নীতি। কিন্তু সেই নীতিই ধর্ম ব'লে

বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং শত সহস্র মানবের শান্তির উৎস হ'য়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধ-ধর্ম ধর্ম হোক বা নাই হোক, একটু অনুধাবন করলেই এ কথাটা বুঝা যায় যে—জগতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সমস্ত ধর্মের মর্মকে, সাধারণ ভিত্তিভূমিকে বুদ্ধধর্ম এত প্রাধান্য দিয়ে, এত শ্রদ্ধা-সমীহ ক'রে, এত পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করে জগতের সামনে ধরেছে, যা জগতের অন্য কোন ধর্ম করেছে বলে মনে হয় না। অন্যান্য ধর্মে নীতি একটা অঙ্গ, একটা অংশ, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সেই নীতি অঙ্গ-অঙ্গী দুইই। নিঃস্বার্থপরতা অন্যধর্মের একটা প্রধান সাধন। বুদ্ধধর্মে সেটাই প্রধানতম সাধন ও ঈপ্সিততম লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বার্থের নিঃশেষ বিলুপ্তি ও নির্বাণ সেখানে সমপর্যায়ভুক্ত। স্বয়ং বুদ্ধের জীবনই এই উক্তির প্রমাণ। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, চরম নিঃস্বার্থপরতা সমস্ত ধর্মের চরম লক্ষ্যের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। তবে বুদ্ধধর্ম তাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে।[১]

কোন অর্থে কোন দৃষ্টিতে বুদ্ধধর্ম[২] অন্য সমস্ত ধর্মের ভিত্তিভূমি এখন তা বিশেষ করে জানা দরকার। শুধু বুদ্ধকে বুঝবার জন্য নয়, নিজের ধর্মকে চিন্‌বার জন্যও বটে।

ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব'লে কেউ আছেন কি না, থাকলে তাঁর স্বরূপ, তাঁর কার্যকলাপ কিরূপ, তাঁর সাথে জীবের কি সম্পর্ক, তাঁকে লাভ করবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, প্রয়োজনীয়তা থাকলে উপায় আছে কি না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন কি না, করলে কি ভাবে করেছেন, কোথা থেকে,—তাঁর নিজের মধ্য থেকে না অন্য কোনখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন—কী উদ্দেশ্যেই বা এই সৃষ্টি করতে গেলেন—এ রূপ হাজার রকমের প্রশ্ন ও তার সমাধান মিলবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে। সোজা কথায় সব ধর্মই চায় যে, তাঁরা পারমার্থিক সত্য (Absolute Reality) কী সেটা আগে আমাদের ধারণা করিয়ে দেবেন। আমরা যেন বুদ্ধি দিয়ে সত্যসম্বন্ধে ধারণা করে সেই সত্যলাভের আশায় সচেষ্ট হই,—এটাই সে সব গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কোনও ধর্মশাস্ত্র হয়ত বলেন, ঈশ্বর যদি তোমার সত্যিকারের পিতা হ'ন, যদি তুমি সত্য সত্যই তাঁর অংশ হও, তবে তাঁর কাছে যা'তে তুমি যেতে পার, সেই চেষ্টা করাই তোমার উচিত। আর সেই চেষ্টা করা মানেই ধর্মকে মেনে চলা। কোন ধর্ম হয়ত স্বর্গ আছে প্রমাণ ক'রে সেই স্বর্গলাভের জন্য আমাদের ধর্মকার্যে প্রণোদিত করেন। ইন্দ্রিয়াতীত ও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য তত্ত্বের অবতারণা করলেও সব ধর্মই যে সব প্রাথমিক করণীয়ের নির্দেশ দেন, তার মধ্যে একটা বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ঈশ্বর, জীব, জগৎসৃষ্টি, মুক্তি—তত্ত্বের দিক দিয়ে এ সব বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু সব ধর্মই প্রবর্তক সাধককে বলবেন: সত্যকথা বল, সৎপথে চল, সাধ্যমত অপরের কল্যাণ কর, হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ চরম লক্ষ্যের স্বরূপ যাই হোক না কেন, তাকে লাভ করবার জন্য এই প্রাথমিক নীতিগুলির আবশ্যকতা সকল ধর্মই স্বীকার করেন কেনোপনিষদ্ ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁকে চিন্তা করার উপায় প্রভৃতি সব বলার পরে বল্লেন—'তস্যৈ তপোদমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা'—

১ "বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহা মনুষ্যকুলের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান কেহই এ ধর্মের বিরোধী নয়।" —'বৌদ্ধধর্ম', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬২

"যে দিন বিমল বোধিলাভ করিয়া তুমি ধন্য হইবে, সে দিন তোমার স্বার্থ বিশ্বজনের স্বার্থ হইবে, সে দিন তোমার কল্যাণ বিশ্ববাসীর কল্যাণ হইবে।"

'বুদ্ধের জীবনী ও বাণী,' শরৎকুমার রায়, পৃঃ ১১২ (৪র্থ সংস্করণ)

২ বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে পার্থক্য আছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যা প্রচার করে গেছেন তাকেই বলছি বুদ্ধধর্ম এবং পরবর্তী কালে বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা ও অন্যান্য সংযোজনের ফলে বুদ্ধধর্ম যে রূপ লাভ ক'রেছে তাকেই বলছি বৌদ্ধধর্ম।

তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম, এ সব হল যেন ব্রহ্মের ভিত্তিভূমি—অর্থাৎ তাঁকে লাভ করবার অপরিহার্য করণ। এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রেও। সর্বধর্মের এই সাধারণ জিনিসগুলিই বুদ্ধধর্মের মূল উপাদান।

বুদ্ধদেব যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও কয়েক প্রকার শীলের বিধান দিলেন, সেও এই একই নীতিকথা—(১) তোমার দৃষ্টি সাধু কর (২) সংকল্প সাধু কর (৩) বাক্য সাধু কর (৪) ব্যবহার সাধু কর (৫) জীবিকার্জন সাধু কর (৬) সর্ব চেষ্টা সাধু কর (৭) চিন্তা সাধু কর (৮) সাধু ধ্যানে তোমার চিত্ত সমাহিত কর।

"নির্বাণপথের যাত্রীকে বুদ্ধ বলিতেছেন—(১) তুমি যে পুণ্যলাভ করিয়াছ তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর, (২) নব নব পুণ্যলাভের চেষ্টা কর, (৩) পূর্বের সঞ্চিত পাপ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর, (৪) নূতন পাপ তোমাকে আক্রমণ না করে তজ্জন্য সতর্ক হও।" বলিতেছেন, কিসে জীবকুলের দুঃখমোচন ও সুখবর্ধন হয়, তাহার চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখ। উচ্চনীচ, শত্রুমিত্র, সকলের রোগশোক পাপতাপ বিমুক্তির চিন্তা দ্বারা নিখিল বিশ্বের সহিত আপনার মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় কর। কামনা কর:

দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা
যে চ বসন্তি অবিদূরে।
ভূতো বা সম্ভবেসী বা
সর্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা॥

"যাঁরা দৃষ্ট, যাঁরা অদৃষ্ট, যাঁরা নিকটে বাস করছেন কিংবা দূরে বাস করছেন, বর্তমানে যাঁরা আছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা হবেন তাঁদের সকলেই সুখী হউন।"

বুদ্ধদেব নীতিপ্রচার করেছেন সত্য, তবে নীতিতে মানুষকে প্রণোদিত করবার জন্য ব্রহ্ম, ভগবান্, আত্মা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অবতারণা মোটেই করেন নি। নীতির প্রয়োজন ও উপযোগিতা তিনি অন্য দিক থেকে দেখালেন। তিনি বল্লেন, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে না গিয়ে শুধু আমাদের এই জগতের জীবনটা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, মানুষের জীবনটা দুঃখময়। বিলাস-ব্যসন, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে যে কোনও সুখ নেই, তা' তিনি বলেন নি, বলেছেন—এই সব সুখ নিতান্ত সাময়িক ব'লে, পরিণামে তারা উদ্বেগ ও অবসাদ আনে বলে, বিশেষতঃ কোন সুখই মানুষকে জন্মজরামৃত্যুর হাত থেকে চরম নিষ্কৃতি দিতে পারে না ব'লে চিন্তাশীলের কাছে জগতের তথাকথিত সুখদুঃখ সবই একাকার—সবই অতৃপ্তিদায়ক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত এই যে দুঃখ এর হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা সবাই চাই। আমাদের এই দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা একটা বাস্তব সত্য,—যা প্রমাণের জন্য কোন জটিল তত্ত্ব অবতারণার প্রয়োজন হয় না। প্রমাণ শুধু নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। মানব-জীবনের এই যে সর্বজনীন একটা চাহিদা, তা' মেটাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা মানুষমাত্রেরই রয়েছে। বুদ্ধদেব এই স্বাভাবিক চেষ্টাকে সংশোধিত করবার জন্য দিলেন নীতির বিধান:—অষ্টাংগিক মার্গ ও শীলবর্গ, যেন বল্লেন—সম্পদ্‌বিভব বাড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের বেড়া দিয়ে প্রিয়তম অহংটাকে সর্বদা নিরাপদ রাখবার যে সহস্র প্রচেষ্টা আমরা করছি—আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে সে সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক। কারণ এরূপ কোন চেষ্টা দ্বারাই মানুষকে সম্পূর্ণ সুখী হতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি; যাবে না। সম্পূর্ণ সুখী হওয়া যাবে—অথবা বুদ্ধদেবের ভাষায় (যেহেতু সুখদুঃখ একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ) দুঃখকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা যাবে একমাত্র উপায়ে—অষ্টাংগিক মার্গ ও শীলবর্গের অনুশীলনে। বাসনাই যত দুঃখের আকর—নীতির অনুশীলনে বাসনার বহ্নি যখন নির্বাপিত হ'বে, তখন যে দুঃখোত্তর অবস্থা বিরাজ করবে—তাই নির্বাণ—জীবনের

অভীষ্টতম লক্ষ্য, নিখিল বিশ্বে চরম সত্য যদি কিছু থাকে তাও এই নির্বাণ।

দার্শনিকেরা পরবর্তীকালে—এই আধুনিক কালেও—বহু বিচার, বহু গবেষণা করেছেন নির্বাণের স্বরূপ নিয়ে। অনেকেই এই বিষয়ে একমত যে, বুদ্ধদেবের নির্বাণ এবং অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম মূলতঃ একই বস্তু। যে সত্যের অস্তিবাচক রূপ (Positive) হলো ব্রহ্ম, ঠিক সেই সত্যেরই নেতি-বাচক রূপ (Negative) হলো নির্বাণ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব'লে বেদান্ত তা'কে বলেন—শুধু সৎ, শুধু চিৎ, শুধু আনন্দ, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি জগতের লেশমাত্রও তা'তে নেই ব'লে বুদ্ধ তাকে বলেন শুধু নির্বাণ—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের শুধু নিঃশেষ বিলুপ্তি।

বুদ্ধদেব যে এ তত্ত্ব জানতেন না তা' নয়—বরং তিনি জেনেও তার প্রচার করেন নি, এরূপ মনে করবার সংগত কারণ আছে। কেন প্রচার করেন নি—সে আলোচনাও আজ অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ সে 'কেন'র মূলে পাওয়া যাবে এই বিশ্বদরদী, আপন-ভোলা মরমীর অফুরন্ত মানব-প্রেম, যে প্রেমের মূর্তবিগ্রহরূপে জন্মেছিলেন তিনি।

কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে বিশ্বের চরম সত্য-সৌধে উপনীত হবার জন্য বুদ্ধদেব দুঃখ-নিবৃত্তি-আকাঙ্ক্ষা-রূপ যে তোরণ দিয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষকে আহ্বান করেছেন, তার উপযোগিতা সম্পর্কে দু'এক কথা আলোচনা করা অসমীচীন হবে না। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি, এই তিন উপাদান দিয়ে মানবমনের গঠন—পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিক একথা বলেন, মানুষের মধ্যে প্রকৃতি-ভেদে কারু কারু মধ্যে এই তিনের কোন একটা শক্তি প্রবল থাকে। সত্যলাভের ইচ্ছা কারুমধ্যে প্রবল, ইচ্ছা ও কর্মশক্তি কারুমধ্যে অদম্য, সুখদুঃখের অনুভবশক্তি কারু কারু মধ্যে অতিতীব্র। সাধারণতঃ দেখা যায়, জ্ঞানশক্তি ও অনুভবশক্তি এই দুয়ের কোন একটার অথবা উভয়ের সম্যক্ বিকাশের দ্বারা মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, জ্ঞানার্থী মানব এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যলাভের চেষ্টায় নিষ্ফল হ'য়ে নিত্য সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে প্রয়াসী হন। আর অনুভবপ্রবণ মানব চিরস্থায়ী আনন্দ, পরমকল্যাণ ও সুন্দরতমকে অনুভবের আকাঙ্ক্ষায় ধর্মপথের পথিক হন, কিন্তু সত্যের খাতিরে ধর্মকে চাওয়ার অধিকারী জগতে বিরল—অধিকাংশ মানুষই অনুভবের তাড়নায় অস্থির। বুদ্ধবাণীর আবেদন—বিশেষ করে মানুষের এই দুঃখ-অনুভব এড়াবার প্রবৃত্তির কাছে—যা অধিকাংশ মানুষের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক। অবশ্য বুদ্ধদেব যে কৌশল ক'রে এই প্রবৃত্তির কাছে আবেদন করেছিলেন তা' নয়। তিনি আপনার অন্তরে মানবগোষ্ঠীর নিদারুণ দুঃখের জ্বালা অনুভব করেছিলেন—তাই তাঁকে এ-পথ বেছে নিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত করেছিল। জগতের ইতিহাসে ইনিই বোধ হয় একমাত্র মহাপুরুষ, মহানির্বাণ পর্যন্ত যাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এমনকি নিজের সাধনতপস্যা পর্যন্ত সজ্ঞানে কেবল মানুষের দুঃখমোচনের ইচ্ছা-দ্বারাই প্রণোদিত হ'য়েছে।

পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি তত্ত্বসম্বন্ধে বুদ্ধদেব উপলব্ধিমান্ পুরুষই ছিলেন, তবে এ সকল কথা তিনি তখনকার দিনে লোককল্যাণের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে প্রচার করেন নি। এ সমস্ত আছে কিনা প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অনেক সময় নীরব থাকতেন—হাঁ, না কিছুই বলতেন না। যে সকল দুরূহ সত্য মানববুদ্ধির অগম্য, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

এই নীরবতার, এই সত্যগোপনের কারণ বুদ্ধদেব নিজেই ইঙ্গিত ক'রে গেছেন। তাঁর শিষ্য মালুঙ্ক্য-পুত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ'লে তিনি তাঁকে যে উপাখ্যানটি ব'লেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "বুদ্ধদেব কহিলেন—'একব্যক্তি বিষাক্তবাণে আহত

হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত—আগে আমাকে বল, কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে? ফলে দাঁড়াইত এই যে, কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই বাণাহত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

হে মালুঙ্খ্য পুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। আমি তোমার আরোগ্যের উপযোগী ঔষধ বলিয়া দিয়াছি। **আমি যাহা প্রকাশ করি নাই তাহা অপ্রকাশিত থাকুক, যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক।'"**

মানুষের দুঃখ এত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই মানুষ যাতে সেই দুঃখ-মোচনে আগে অগ্রসর হয়, তাই ছিল বুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা।

কিন্তু সত্যকে জানালে কি মানুষের নীতিপালনে কোন অসুবিধা হোত? অন্ততঃ তখনকার দিনে ঐরূপ হবার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। বুদ্ধের সময়ে প্রাণহীন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে দেশ ভরে গেছে। শাস্ত্রের মর্ম ফেলে খোসা নিয়ে মহোৎসব আরম্ভ হ'য়েছে। অথচ উৎসব-উদ্যোক্তৃগণ মনে করতেন যে, তাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশিত পথেই চলেছেন। বুদ্ধদেব যদি শাস্ত্রের অপর একটি ব্যাখ্যা বের ক'রেছেন ব'লে দাবী করতেন তবে এই নিয়ে শুধু বাদবিচারই বাড়ত বেশী; সত্যকারের ধর্মপ্রচার কতখানি হোত বলা শক্ত। তা' ছাড়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, আত্মা ভগবান ও পরলোকের দোহাই দিয়ে পুরোহিতকুল সাধারণ মানুষকে যে অশেষ লাঞ্ছনা দিতেন এবং নিজেরাও আত্মহিতে প্রবঞ্চিত হ'তেন তার নিদারুণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেবের ছিল। সাধারণ মানুষ বেদ কি, আত্মা কি কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ বেদরূপ বিরাট একটা বোঝা তার ঘাড়ে চেপে তাকে চালাবে—তাকে এমন কল্যাণের দোহাই দেবে যার ফলে সে যে কি কল্যাণ তাই সে বুঝতেই পারবে না, রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধের জ্বালা তার বিন্দুমাত্র কমবে না!

এমনি ক্লিষ্ট, ব্যথিত, লাঞ্ছিত, গর্বিত—পুরোহিত-কুলের আভিজাত্য-দলিত মানবের সত্যিকারের দরদী ছিলেন ব'লেই বুদ্ধদেব বেদের একভাগকে—কর্মকাণ্ডের তথ্যকে—একেবারে অস্বীকার করলেন, আর জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধে নীরব রইলেন। ভাব যেন এই, ওতে সত্য থাকে থাকুক—তবে আপাততঃ তার প্রয়োজন নেই। যে সমাজের নৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে তত্ত্বকথা শুনিয়ে লাভ নেই। আগে ভিত্তি সুদৃঢ় করা চাই। বুদ্ধ বললেন—'হে মানুষ, কোন পুরাণো কথা, কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ভাঁওতা দিয়ে তোমায় ভুলাব না, পরের কথায় বিশ্বাস করবে ব'লে তোমার বিচার-বুদ্ধিকে কিংকর সাজাব না। তোমাকে যা বলব তা তোমার নিজের চোখ দিয়ে দেখে নাও, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ কর। এর সুফলের জন্য পরলোকের দিকে তোমায় চেয়ে থাকতে হবে না, হাতে হাতে এর ফল প্রত্যক্ষ করতে পারবে।'

অতীন্দ্রিয় সত্যের কাছে না গিয়ে বুদ্ধ বললেন, 'তোমার আমার সকলের জীবনে যে সত্য অনুভূত হয়, তারই ধ্যান কর, তাকেই ভিত্তি ক'রে অগ্রসর হও। সে সত্য এই—(১) জীবনে দুঃখ আছে, (২) এই দুঃখের কারণ আছে, (৩) কারণ নাশের দ্বারা এই দুঃখ অতিক্রম করা যায়, (৪) দুঃখ অতিক্রমের পন্থা হোল অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা।'

এই সাধনায় অগ্রসর হবার জন্য বুদ্ধদেব মানুষের

আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করলেন। কোন দৈবশক্তি, কোন গুরু, কোন কৃপা মানুষকে সাহায্য করবে না—নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে। এই রকম করার সামর্থ্যও সকলের আছে—এই হলো বুদ্ধের মত।

সূক্ষ্ম বিচার করলে এই তত্ত্বগুলি আংশিক সত্য ব'লে প্রতীত হতেও পারে এবং উত্তরকালে সেরূপ হয়ে নানা কুফলের সৃষ্টি করেছিলো, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই জটিলতায় ীদের সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক, বুদ্ধদেব সাধারণের জন্য যে পথ তৈরী করেছেন, তা যে তাদের পক্ষে রাজপথ, তাতে সন্দেহ নেই। স্নেহশীলা মা যেমন সন্তানকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল কথা না জানিয়ে তাকে ঠিক তার প্রয়োজনমত দু'চার কথা জানিয়ে কল্যাণের পথে চালান, মানব-জাতির মাতৃরূপী বুদ্ধও যেন আমাদের সেভাবে কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর বাণীর পেছনে রয়েছে—তাঁর স্নেহপ্রেমে উদ্বেল একটি মাতৃ-হৃদয়—বাণীর চেয়ে যা আরও মধুর, আরও স্নিগ্ধ, আরও একান্ত আপন!

বোধিসত্ত্বের হস্তীজন্ম

শ্রীবনমালী জানা

বোধিসত্ত্বের হস্তী জনম অপরূপ অবদান
ঘুচে যাহে ভেদ স্বার্থের ক্লেদ মুক্তির সন্ধান।

অতি বলবান উন্নতদেহ যূথপতি সুন্দর
কাটে বহুকাল সাথে সাথীপাল নয়নমুগ্ধকর।

বিরাগের বশে ত্যজি সম্পদ ভ্রমণে চলেন একা
রুক্ষ বনানী আর মরু দূরে দিগ্‌বলয়ের রেখা।

ভ্রমণের ক্রমে আর্তের স্বরে কাঁদিল তাঁহার প্রাণ
নির্বাসনেতে পাঁচশত নর রাজরোষে চাহে ত্রাণ।

মরু-বেষ্টনে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল অশ্রু ঝরে
অসহায় সবে কাঁদিয়া শুধালো 'পথ কোথা?' করি-বরে।

শুণ্ড তুলিয়া কন্ গজরাজ, 'সমুখে উচ্চ গিরি
তারি সানুদেশে স্বচ্ছ শীতল ঘননীল হ্রদ ঘিরি।

শান্তি পাইয়া ক্ষণেক তথায় আগুসরি পথরেখা
তুঙ্গ গিরির সদ্য-পতিত মৃত করী পাবে দেখা।

আহারীয় রূপে মাংসে উহার মিলিবে নবীন বল
হস্তী-অন্ত্রে আধার রচিয়া লবে নীল হ্রদ জল।

পার হবে মরু বাঁচিবে জীবন দুখ হবে অবসান'
পথ নির্দেশি ত্বরা করিরাজ দৃষ্টির পারে যান।

দূর পাশ ফিরি গিরিশিরোপরি আরোহি প্রান্তে তায়
নীচু শিলাতলে আছড়ি আপনা পরহিতে দিলা কায়।

ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের ঐতিহ্য

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

বর্তমান কালে কাপড়ের কল এদেশে বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও হাতে সূতাকাটা, বয়ন ও রঞ্জন হস্তশিল্পরূপে দেশে স্থিতি ও প্রসার লাভ করিতেছে। সকল ক্ষেত্রে অবশ্য হাতে কাটা সূতায় বয়ন হইতেছে না। অনেক স্থানেই কলের সূতায় তাঁত চলিতেছে। গৃহশিল্পে, কুটিরশিল্পে, পল্লীশিল্পে তাঁত আপনাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। সর্বশেষ ধাপে দেশের বিদ্যালয়েও তাঁত ও সূতা-কাটার প্রবর্তন বাড়িতেছে। স্বদেশী আন্দোলন এই শিল্প প্রবর্তনের প্রেরণা আনিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। এরূপ মনে করার যুক্তিসংগত কারণও আছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতার আমলে চরকা জাতীয় পতাকায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু কার্পাস শিল্পের পুনর্জীবন-লাভের মূলে অন্য একটি গূঢ় কারণ রহিয়াছে। আসলে সূত্র কর্তন, বয়ন ও রঞ্জন ছিল এদেশের অতি প্রাচীন নিজস্ব শিল্প এবং সাধারণের সৃজনী শক্তির বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজন-পূরণের একটি ব্যাপকক্ষেত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত বিপর্যয়ে এই শিল্পের চর্চা আট নয় দশক লোকজীবনে নিতান্ত সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল।

অতি প্রাচীন কালে এদেশে কার্পাস হইতে সূতা ও সেই সূতায় বস্ত্রবয়নপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশ হইতেই কার্পাসজাত শিল্পবিজ্ঞান ক্রমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত অন্যান্য দেশসমূহে বিস্তারলাভ করে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কার্পাস-শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কার্পাসী'। ভারতীয় কার্পাস-সভ্যতা দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করার সংগে সংগে ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও শব্দটি অপভ্রংশ হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

গ্রীকদের উপর কার্পাস-সভ্যতার প্রভাব

বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় কার্পাস ও কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় লাভ করে গ্রীকেরা। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরদটাস খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৫ সালে ভারতীয় কার্পাসের নিম্নলিখিত বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবর্ষে একপ্রকার বন্য গাছের ফলের রেশ হইতে যে সূতা হয়, তাহা গুণে ও সৌন্দর্যে পশম (মেষজাত লোম) হইতেও উৎকৃষ্ট। ভারতীয়েরা ইহার সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে।"* হেরদটাস কার্পাসের নাম উল্লেখ করেন নাই, একপ্রকার বন্যগাছ বলিয়াই কার্পাসের পরিচয় দিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশসমূহে কার্পাস-শিল্পের প্রসার

আরবেরা স্থলপথে ভারতবর্ষের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগস্থাপন করিয়াছিল। আরবদেশীয় ব্যবসায়ীরা খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় কার্পাসশিল্পের তথ্য খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচার করিয়াছিল।

* The wild trees in that country (India) bear for their fruit a fleece surpassing those of sheep in beauty and quality and the natives clothe themselves in cloth made therefrom. (Herodotus in 425 B. C.)

খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৯ অব্দে রচিত এক গ্রীকনাট্যে 'কারবাসিনা' (carbasina) শব্দের উল্লেখ আছে।

গ্রীকসাহিত্যে কার্পাসের অপভ্রংশ 'কারবাসিনা' শব্দের প্রয়োগ

ইহা সংস্কৃত 'কার্পাসী' শব্দের রূপান্তর মাত্র। সেই সময়কার গ্রীকসাহিত্যে কার্বাসা অর্থাৎ কার্পাসজাত সূতা, আর 'কারবাসাম,' অর্থাৎ তুলার রেশ, এই দুইটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ ঐতিহাসিক প্লিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ অব্দে কার্বাসামের তাঁবুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কার্পাস ও কার্পাস-শিল্পের আদি দেশ যে ভারতবর্ষ গ্রীকেরা তাহা ভাল করিয়াই জানিত।

'কটন' শব্দের উৎপত্তি

কিন্তু দক্ষ আরব-বণিকদের কল্যাণে কার্পাসশিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞান ইউরোপীয় দেশসমূহে বিস্তার লাভ করে।

মধ্যযুগে স্পেন দেশে কার্পাসশিল্প প্রচারের গৌরব মূরদের প্রাপ্য। আধুনিক 'কটন' শব্দের ব্যুৎপত্তিমূল আরবী শব্দ 'কটুন' (Kotn)। ইহা মধ্যযুগীয় ল্যাটিন 'কটনাম' (cotonum) শব্দের অপভ্রংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইটালীয় বণিকদের হিসাবের খাতায় 'কটনাম' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে 'কটনাম' শব্দ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অপভ্রংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে—যেমন ইংরাজীতে cotton, ইতালী ভাষায় coton, ফরাসী ভাষায় coton (কঁতো), জার্মান ভাষায় Kattum, রুশ ভাষায় Kotnja, রুমানিয়ান ভাষায় Kutnic ইত্যাদি।

প্রাচীন সংস্কৃত 'কার্পাসী' শব্দের অর্থ কার্পাস তুলার গাছ। বাংলা ও রাষ্ট্রভাষায় কার্পাসকে কাপাসও বলা হইয়া থাকে।

প্রাচীন ইতিহাসে কার্পাসসূতার বস্ত্র ও পরিধেয়

কার্পাস ভিন্ন অন্য রেশজ বস্ত্রাদি,—যথা সিল্ক, পশম বস্ত্রাদিও ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু কার্পাস-সূতায় তৈরী বস্ত্র আজ যেমন তেমনি অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও এদেশবাসীর দেহাভরণের কাজ করিত।

ভারত-অভিযানকারী আলেকজেণ্ডারের সেনাপতি নেয়ারচস খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এদেশবাসীর পোষাকপরিচ্ছদের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসীরা কার্পাস-সূতায় কাপড় বুনে, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা পরিধান করে, ভাঁজ করা কাপড়ের টুকরা (চাদর) গলায় জড়ায়, এবং মাথায় পাগড়ী পরিধান করে।" [১] গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এদেশে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শিরূপে এ দেশবাসীর পোষাকের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল বটে, কিন্তু তাহারা সূক্ষ্ম ও সুরুচিসম্পন্ন বস্ত্র ও অলংকারাদি ভালবাসে। তাহাদের পোষাকে জরির কাজ থাকে, বহুমূল্য পাথরও ব্যবহৃত হয় ; সূক্ষ্মতম মসলিনের রঙীন পোষাকও তাহারা পরিধান করিয়া থাকে।" [২]

নেয়ারচসের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সে সময় হইতে আজ পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেও

১ The native made linen (cotton) garments, wearing a shirt which reached to the middle of the leg, a sheet folded over the shoulders and a turban round the head—Nearchos in 300 B. C.

২ In contrast to the general simplicity of their lives, the Indians love finery and ornament. Their robes are worked in gold and ornamented with precious stones, and they wear also flowered garments made of the finest muslins.

ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক পরিবর্তন সামান্যই ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণনায় আমাদের পুরুষদের পোষাকই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অজন্তার গুহাচিত্রেও দেখা যায় প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের পোষাকের মৌলিক ধারা আজও অপ্রতিহত। প্রাচীনকালে পুরুষেরা পরনে ধুতি, গায়ে ঢিলা জামা অর্থাৎ পাঞ্জাবী ও গলায় চাদর পরিত, মাথায় পাগড়ী শোভা পাইত; পুরুষের অনুরূপ দেহাচ্ছাদন আজও প্রচলিত। প্রাচীনকালে মেয়েরা শাড়ী পরিত, আজও তাহারা পরিয়া থাকে। গোশকটের ন্যায় এতদ্দেশীয় পোষাকের ধারাও অতি প্রাচীন। বিজাতীয় শাসকদের প্রভাবও দেশীপ্রথা লুপ্ত করিতে পারে নাই।

গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে ধুতি, চাদর ও শাড়ীর ব্যবহার কত আরামদায়ক তাহা বুঝিতে অনুমানের সাহায্য লইতে হয় না। আমাদের বস্ত্রাদিতে, বিশেষ করিয়া ধুতি চাদর ও শাড়ীতে কাটা ছাঁটা—এক কথায় সেলাইয়ের কাজ একেবারেই নাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে ভারতীয় পরিচ্ছদ-প্রণালী দর্জীর কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সত্য বটে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ইদানীং আমাদের পোষাকে দর্জীর কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের মাতারাও ব্লাউস, গাউন বিশেষ পরিতেন না। বিগত দুই দশক মধ্যে ইহাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দর্জীর কাজ বৃদ্ধির সংগে আমাদের দেহাভরণের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা রুচির কথা এবং সেক্ষেত্রে কোন মতামত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থানকালে অবস্থাপন্ন লোকদের সংগেই বেশী মেলামেশা করিয়াছিলেন,—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এ দেশের সর্বসাধারণ হয়তো বা বহুমূল্য মসলিন কাপড় পরিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সূক্ষ্ম মসলিন, কাপড় রংগাইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কাপড়ে সূক্ষ্মতম জরীর কাজ তখন এদেশে প্রচলিত ছিল। আজকাল দেশের স্থানে স্থানে (যেমন বেনারসী শাড়ীতে ও কাশ্মীরী শালে) সোনা-রূপার সূত্রে যে জরির কাজ হয়, তাহা প্রাচীন প্রথারই ধারা,—উত্তরাধিকারীসূত্রে চলিয়া আসিয়াছে।

সূতা ও কাপড় রঙাইবার প্রথাসম্বন্ধে মেগাস্থিনিসেরও পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরদটাস খ্রীষ্ট পূর্ব-৪৫০ অব্দে লিখিয়াছেন—"তাহাদের দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) এমন একপ্রকার গাছ জন্মে, যার পাতার গুণ অদ্ভুত। সেই পাতাকে গুঁড়া করিয়া জলে মিশাইলে রং প্রস্তুত হয়; পোষাকের উপর সেই রঙের ছবি আঁকা যায়। এই রং এত পাকা যে ধুইলেও মুছিয়া যায় না, মনে হয় যেন বুনার সংগে এক হইয়া আছে। কাপড় যতদিন টেকে, রংও ততদিন অটুট থাকে।" [১] গ্রীক ঐতিহাসিক যে নীলের গাছসম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষে কাপড় রঙাইবার জন্য নীলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্ররঞ্জন

টেসিয়াস নামক জনৈক গ্রীক বৈদ্য খ্রীষ্ট পূর্ব-৪০০ অব্দে ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন-সম্পর্কে আর এক বর্ণনা

১ They have trees whose leaves possess a most singular property. They beat them into powder and then steep them into water. This forms a dye with which they paint figures of animals on a garment. The impression is so strong that it cannot be washed out and it appears to be interwoven in the cloth and wears as long as the garment.

রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, ভারতে তৈরী অপূর্ব রংগীন বস্ত্রাদি পারস্য দেশের সৌখীন রমণীগণ বিশেষ পছন্দ ও সমাদর করিতেন।[১]

সূতা ও কাপড় রংগাইবার বিভিন্ন প্রণালী এদেশে সে যুগেই দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছিল, এরূপ মনে করা মোটেই অসংগত নয়। ইহার অর্থ এই যে আরও প্রাচীন কাল হইতে বস্ত্ররঞ্জনের চর্চা এদেশে হইতেছিল। সেই সময় সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে হইলে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি খ্রীষ্টপূর্ব-৭০ অব্দে ইজিপ্টের রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন; সেই বর্ণনার সংগে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী যেসুইট কর্তৃক ভারতীয় কাপড় রঞ্জনপ্রণালীর অপরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।[২]

ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্রশিল্প-সম্পর্কে বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে কার্পাস বস্ত্রশিল্পের অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের সংগে ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত যোগাযোগ কমপক্ষে আলেকজেণ্ডারের সময় হইতেই সূচিত হইয়াছিল। আরব বণিকেরাই প্রধানতঃ স্থলপথে আন্তর্জাতিক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে। আরব বণিকেরা ইউরোপীয় পশম বস্ত্রাদি, গ্লাশ, প্রবাল, মদ, ইত্যাদি ভারতের বাজারে আমদানী করিত, আর এই দেশ হইতে সিল্ক, কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, মূল্যবান মণিমুক্তা, গুড়, চ্যাদি গন্ধদ্রব্য, আইভরি ইউরোপের বাজারে লইয়া যাইত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মার্কোপলো ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে করমণ্ডলে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তিনি মসলীপট্টমের রঙ্গীন ছাপের কাপড় ও অতুলনীয় মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।[৩]

মোট কথা, ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন তখনকার বিদেশীদিগকে মোহিত করিয়াছিল। প্রাচীন কালেই অন্ততঃ চারিপ্রকার কাপড় রংগাইবার প্রণালী এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এই চারিপ্রকার রঞ্জনের কাজের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে:—

(১) কাপড়ের উপর ছাপ করা ডিজাইন (২) হাতে আঁকা ডিজাইনের কাজ (৩) বাটিকের কাজ ও (৪) রাসায়নিক রংগের কাজ।

(ক) ছাপের কাজ:—কাঠের ব্লকে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন কাটিয়া ইহা দ্বারা কাপড়ের উপর রংয়ের ছাপ দেওয়া হইত। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। শুধু যে কাঠের ব্লকে খুদিয়াই ডিজাইন কাটা হইত এমন নয়, কাঠের গায়ে রিবণ বসাইয়াও ডিজাইন করা হইত। ছাপের ব্লকের গায়ে তুলি বা তুলার দ্বারা রং লাগানো হইত।

১ The Greek physician Ktesias in 400 B. C. mentions the flowered cottons emblazoned with glowing colours much coveted by the fair Persian women and exported from India.
(Crowford : Heritage of Cotton)

২ The art of resist dying spread among all the people, who came in contact directly or indirectly with Indian influence, and there is still a reminiscence of this among the peasants of Europe. These facts seem to establish India as the home, not only of cotton, but of certain processes of dyeing and printing cotton.

৩ Marco Polo (1256-1326), the famous Venetian traveller and explorer, who made journeys through China, India and other Eastern countries and published the record of his various wanderngs.........(Pear's Cyclopaedia)

(খ) বাটিক :—বাটিকও অতি প্রাচীন বস্ত্রশিল্পকলা, গলানো মোম অথবা কাদা দ্বারা কাপড়ের উপরের ডিজাইন চিত্রিত করা হইত; পরে কাপড় রঙে ভিজান হইত; মোম বা কাদার স্থানে রং লাগিত না। এই ভাবে মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। জাভাতে বাটিক প্রবর্তিত হইয়া ছিল। একই প্রথার অনুসরণে একটু ভিন্ন প্রণালীর বাটিকও প্রচলিত ছিল, তাহাকে গিঁট প্রথা (tie dyeing) বলা যাইতে পারে। এই প্রথায় মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা সহজ মনে হইলেও এই কাজে বিশেষ দক্ষ হস্তের প্রয়োজন হইত। এই প্রথা প্রাচীন কালেই তিব্বত, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও পশ্চিমে বলকান অতিক্রম করিয়া মধ্য ইউরোপে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

রাসায়নিক বস্ত্ররঞ্জনসম্বন্ধে বলা যায় যে, ডিজাইন-সম্বলিত ষ্ট্যাম্প অথবা তুলি দিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক তরল পদার্থ কাপড়ের গায়ে লাগাইয়া পরে কাপড় রংবিশেষে ভিজান হইত। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণে একই রং বিভিন্ন রঙে ফুটিয়া উঠিত। এই প্রথায় রং করিতে অবশ্য রসায়ন-সম্বন্ধে ব্যাবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হইত; সেজন্য হয়ত ইহা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইত না। ক্যালিকো প্রিণ্টিং এর ইতিহাসে রাসায়নিক প্রথা প্রাচীন, যদিও কার্য-কারণের সমাবেশে ইহার ক্ষেত্র পরে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। প্রাচীন বস্ত্রাদি সংরক্ষণের পক্ষে এদেশের জলবায়ু অনুকূল নহে। সে জন্য কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কালের বস্ত্রাদির নিদর্শন সামান্যই রক্ষিত হইয়াছে। ইজিপ্টের পিরামিডে সহস্রাধিক বৎসরের পূর্বেকার ভারতীয় মসলিন পাওয়া গিয়াছে। গোবি মরুভূমিতে প্রাচীন ছাপের রঙীন বস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের বস্ত্রকলার অভূতপূর্ব উন্নতির নিদর্শন প্রাচীন চিত্রকলা দেখিলে বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অজন্তাগুহার ফ্রেস্কোর উল্লেখ করা যাইতে পারে। তখনকার প্রচলিত বস্ত্রাদি ও পোষাকের ব্যবহারই সেখানে চিত্রিত হইয়াছে। এদেশে মুসলমান-অভিযানের পূর্বে বস্ত্রশিল্পকলা বিশেষ উন্নত স্তরে পৌঁছিয়াছিল। মুসলমান রাজা-বাদশাদের আমলে সৌখীন নবাবেরা শিল্পানুরাগী ছিলেন; নিছক শিল্পকলার দিক দিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমান রাজাদের আমলেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকলা নূতন ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত অম্বর শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি মনোরম প্রাচীন কার্পাসবস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে; সেগুলি এখন যত্নসহকারে আমেরিকার ব্রুকলিন শহরের মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের অধিকাংশই চিত্রিত এবং দেওয়ালের বস্ত্রাভরণ।

হিন্দু আইন ও অনুশাসন-প্রণেতা মনুর সময়ে এদেশে বস্ত্রশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; ইহার বহু প্রমাণ মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০ অব্দে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে মনুসংহিতা আরও প্রাচীন গ্রন্থ। সে যাহা হোক, মনুসংহিতা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পরিধেয় বস্ত্র সংক্রান্ত বহু অনুশাসন মনুসংহিতায় আছে। তাঁতিদের সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন—

মনুসংহিতা-রচনার কালে বস্ত্রশিল্প

"তন্তুবায় বস্ত্রবয়নপণ্য দশপলপরিমিত সূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে পিষ্টভক্তাদির অনুপ্রবেশ-হেতু একাদশ পল পরিমিত বস্ত্র ফিরাইয়া দিবে।"*

* "তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" (অষ্টম অধ্যায়ঃ, শ্লোক ৩৯৭)

পিষ্টভক্তাদি বলিতে 'মাড়' বা মাড়জাতীয় জিনিস বুঝায়। এ দেশের তাঁতিরা আজ যেমন টানার সূতায় মাড় দেয়, মনুর যুগেও সেই রীতিই বিদ্যমান ছিল। বরং উল্‌টাইয়া একথা বলা সংগত যে, মনুর যুগের প্রচলিত প্রথা আজিও বিদ্যমান। যাঁহারা আপন হস্তে সূতা কাটিয়া তাঁতিদ্বারা কাপড় বুনাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বয়নকালে হাতে কাটা সূতার শক্তির অসমতা হেতু অল্পবিস্তর অপচয় ঘটিয়া থাকে। এই অপচয় হয় না, যদি সূতা উত্তমগুণবিশিষ্ট হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে যুগে হাতে সূতাকাটার কৌশল, জ্ঞান ও দক্ষতা কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল। মনুর উক্ত বচন হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কার্পাসশিল্প তখন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহস্থেরা অবসরমত সূতা কাটিত আর তাঁতি কাপড় বুনিত। কর্মের এই জাতিগত শ্রেণীবিভাগ এদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। মনুর অনুশাসন হইতে আরও অনুমান করা যায় যে, একশ্রেণীর লোক বস্ত্রব্যবসায়ী ছিল। তাহারা গৃহস্থদের কাটা সূতা সংগ্রহ করিয়া তাঁতিদ্বারা বস্ত্র বুনাইয়া বস্ত্রের ব্যবসা করিত। কিন্তু সকল প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা চলিত না। এ সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন এই যে,—"কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রবিনির্মিত বস্ত্র,—রক্তবর্ণ না হইলেও শণ ও অতসী তন্তুময় বস্ত্র এবং মেষলোম-বিনির্মিত কম্বলাদি বিক্রয় নিষেধ।"[১] বিভিন্ন তন্তুজাত বস্ত্রাদির পরিষ্করণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও মনুর নির্দেশ আছে। যথা :—"কৌষেয় ও আবিক বস্ত্রাদি ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। কুতপ বস্ত্র অরিষ্ট অর্থাৎ রিঠাফলচূর্ণ দ্বারা, অংশুপট্ট—বিল্বফলের নির্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেত সর্ষপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়।"[২]

বস্ত্রনির্মাণে কোন্‌ কোন্‌ তন্তু সেই যুগে ব্যবহৃত হইত, তাহা উপরি-উক্ত শ্লোক দুইটি হইতে জানা যায়। যথা :—কার্পাসবস্ত্র, শণবস্ত্র, অতসীতন্তুময় বস্ত্র, মেষলোমজাত কম্বল, কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী বা সিল্কের বস্ত্র, অংশুপট্ট অর্থাৎ বল্কলবিশেষের বস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র।

জন্তুর লোম অর্থাৎ পশমজাতীয় গরম কাপড়ও বিভিন্ন প্রকারের বর্তমান ছিল। আবিক শব্দের অর্থ মেষলোমজাত কম্বলাদি বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। 'কুতপ' নেপালদেশীয় কম্বল। ক্ষৌমবস্ত্র বলিতে তিসির (শণ ?) তন্তুদ্বারা তৈরি বস্ত্র বুঝায়। বল্কলবিশেষের বস্ত্রকে অংশুপট্ট বলা হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের বস্ত্র ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বস্ত্র আজও তৈরি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ গাছের বল্কল যে পরিধানোপযোগী করার প্রথা এদেশে বর্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ধা শহরের সর্বভারতীয় পল্লীশিল্পাগারে (All India Village Industry Museum, Wardha) জাভায় তৈরি একটি বল্কলবস্ত্রের নমুনা রক্ষিত আছে।[৩]

জাভা ও সুদূর পূর্বদেশসমূহে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বহুকাল পূর্বেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণাদি ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও বল্কলবস্ত্রের উল্লেখ আছে।

১ "সর্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধীঃ॥"
(মনুসংহিতা : দশম অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক)

২ "কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥"
(মনুসংহিতা : পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক)

৩ ইহা কোন জাভাবাসী মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিয়াছিল, তিনি তাহা শিল্পাগারে দান করিয়াছিলেন।

মুনি-ঋষিরা বল্কলবস্ত্র পরিধান করিতেন। বল্কলবস্ত্রের অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে; অসভ্য আদিম মানুষের দেহাভরণ ভিন্নও জ্ঞানী, গুণী, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোনকালে বল্কল পরিধান করিতেন। এমন হইতে পারে তন্তু দ্বারা বস্ত্র তৈরির প্রথা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বল্কলবস্ত্রই প্রচলিত ছিল এবং তন্তুজ বস্ত্রাদি আবিষ্কারের পরেও বল্কলবস্ত্রের ব্যবহার বর্তমান ছিল। অন্ততঃ প্রাচীন সাহিত্য তাহাই নির্দেশ করে। জাভায় তৈরি যে বল্কলবস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শিল্প ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহা একটি মনোরম বস্তু।

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী 'জাপানভ্রমণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৪) বল্কলবস্ত্রের যে সন্ধান দিয়াছেন তাহা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। —"সিংগাপুরের র‍্যাফেলস মিউজিয়মে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ও গহনার চটক সহজেই চোখে পড়ে।" অন্য এক জায়গায়—"গাছের বাকলের পোষাকও অনেক রকমের আছে। এসব অন্য দেশে বড় দেখিনি। ······যারা নানা দেশের বিশেষতঃ প্রাচ্যের পোষাক সম্বন্ধে ভাল করে জানতে চান সিংগাপুর মিউজিয়মের পোষাকগুলি তাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত।"

ভিন্ন ভিন্ন রেশের তন্তু হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদি পরিষ্কারপ্রকরণ খ্রীষ্টজন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসীরা আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাও মনুর অনুশাসন হইতে জানা যায়।—"অনেক বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প বস্ত্র-স্থলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে হয়।"[১] যে সকল হিন্দুপরিবারে প্রাচীন শৌচাশৌচভেদ এখনও চিরাচরিত প্রথায় বর্তমান, তাঁহারা উক্ত অনুশাসনের অর্থ সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাভারত[২] প্রভৃতি গ্রন্থেও বস্ত্রসম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। প্রধান কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে এ দেশে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনে দেহাভরণের জন্য এই অতি প্রয়োজনায় বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর রুচি, কল্পনা ও সৃজনী শক্তির বিকাশের অংগরূপে ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্তির একটি বিশেষ আধারে পরিণত হইয়াছিল; সেই আধার এদেশবাসীর বস্ত্রস্বাধীনতাকে স্থায়ী রূপ দান করিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর এই প্রথা পরিবর্তনশীল কালের প্রগতি উপেক্ষা করিয়া প্রয়োজনপূরণের সংগে এদেশবাসীর সুরুচি ও শিল্প-জ্ঞানকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর পথে চালনা করিয়াছিল। ভারতবাসীর অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা ও নৈপুণ্য সর্বসাধারণের করায়ত্ত ছিল, বলাই বাহুল্য। ইহা কি উপায়ে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাছাড়া গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি মহাদেশের অধিবাসীদেরও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিস্ময়ের কারণ ছিল। প্রশ্ন এই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত এই অপরূপ শিল্পসাধনা ও বস্ত্রস্বাতন্ত্র্যের দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস হইতেই পাইতে হইবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

১ "অস্তিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্তবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে॥"
(মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক)

২ "যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুত্তলিকার জন্য বিচিত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো।" (মহাভারত, বিরাটপর্ব—রাজশেখর বসু)

অতৃপ্তি

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

আমারি নিভৃত চিতে
রহিছ তা জানি'
পেয়েও পাইনি যেন
সেই প্রীতিখানি।
পূর্ণ করিয়াছ যদি
আমার ভুবন,
অভাব মেটে না কভু
চাহি যতক্ষণ।

নাহিক তোমার শেষ
তাও বুঝি মনে;
তবু কেন খুঁজি দেব
নিশীথস্বপনে?
অক্ষয় ভাণ্ডার তব—
তুমি কল্পতরু,
তবু তো নিরাশ হই—
হে জীবনগুরু।

সুখ কি এবং কোথায়?

(এক)

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী

সবাই চায় শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি, কিন্তু অনেকেই তা চায় বিপথে। যাঁরা সে পথে চলেছেন, জেনে তার সন্ধান দিয়েছেন, তাঁদের অবজ্ঞা করে, না মেনে? তাই বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরান এবং সাধু-মহাপুরুষদের বাণীর সন্দেহাত্মক চর্চায় হীরা ফেলে কাচের জলুসে প্রলুব্ধ হয় তারা। ফলে যা চায় বলে, তা পায় না।

জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ কেন এই সন্দেহাত্মক বৃত্তিতে এত সব থাকতেও গুটিপোকার মতো বদ্ধতা ও আত্মসঙ্কোচনকেই জীবনসর্বস্ব করবে? কথা সেইটাই। যাতে আছি তাতে যদি শান্তি না পাই, তৃপ্ত না হই, তবে যা নই, তাই হবার সাধনা চাই। এখন যে কোন অনুপ্রেরণার মূলেই আছে কল্পনা, যা সর্বাগ্রে ধরে নিতে হয়। তাই সৃষ্টির প্রারম্ভেই দেখি, শিক্ষার গোড়াপত্তনই হয় অপরের দেখে শুনে,—আর তা পাকতে থাকে বয়সের আধিক্যে। নিজেকে এই দৃঢ় করাকেই বলে নীতি।

তাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন। যেখানে যা যত ভাল, তার সঞ্চয়ে প্রাণকে ভরে রাখাই হবে ভাল হবার বা পাবার প্রথম সাধনা। অবিরাম গেলাম-গেলাম, দুঃখের নাকে-কান্না, অপরের দোষত্রুটি দেখা, সন্দেহাত্মক ভেদবুদ্ধি আর প্রকৃতির দিন-মজুরী-করা পশু-জীবনের খাওয়া-পরার চাহিদায় নিজেকে বিকিয়ে দিলে কোথা হতে আসবে তার শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি? যার যা পথ, তাকে সেই পথেই চলতে হবে লক্ষ্য বস্তু পেতে হলে,—সংযম ও নিবৃত্তিতে মনের বিক্ষেপনাশই যার প্রধান কেন্দ্র (Power House); কারণ 'রোমান্স' চিত্তকে করে মোহ-গ্রস্ত,—তার ফলই দুঃখ।

যতই নীচে নামি ততই বিভেদ দেখি, কিন্তু বিমানে যতই উপরে উঠি, ততই সাম্য দৃষ্ট হয়। আর প্রকৃত দৃষ্টি বা জ্ঞান আমাদের বাহিরের নয় ভিতরের, কারণ সে-ই বস্তুকে রূপায়িত দেখে সত্যে। আর আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুকে স্থূল চোখে দেখাতেও যে অনেক সময় ভুল দেখা হয়, সেটা বুঝতে হবে। গাড়ীতে যেতে বাহিরের গাছপালাকে ছুটে যেতে দেখা, সূর্যকে পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যে দেখার ভুল, এ আসল জ্ঞান যেন না হারাই কখনও।

কেউ বলেন, সামান্য খাওয়া-পরার সমাধানই যাদের হয় না, তাদের এ চিন্তার সময় কোথা? তাহলে ব'লব, বেঁচে থাকার প্রশ্ন এটা আদৌ নয়। কেন এ জীবন? কি তার সার্থকতা? একটা অনেকদিনের শুকনো গাছের কাছে দু'এক দিনের রঙীন প্রজাপতি কি কিছু কম সার্থক? শুধু এইটুকুই চাই যে, সেইটুকুই যেন ব্যর্থতায় না কাটে। তাই মানুষের বাঁচা জন্তুর মত খাওয়াপরার কাড়াকাড়িতে নয়, ত্যাগের প্রয়োজনে মরেও।

আসলে মনকে ভরে রাখতে হবে সারা-ক্ষণের জন্যে এক বিরাট, অব্যক্ত, অসীম ও আনন্দময় পরিপূর্ণসত্তায়, চাইতে হবে ভূমাকে, যা অল্পে লভ্য নয়। সংযম ও নিবৃত্তির সুদৃঢ় বেড়ায় এই চাহিদার বীজকে বাড়িয়ে তুলতে হবে সর্বাগ্রে, তবেই তার শান্তির সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আর যা কিছু সবই পাওয়া সম্ভব হবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

(দুই)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্‌-এ, বি-এস্‌সি, এল্‌এল্‌-বি

সুখে দুঃখে ভরা এই পৃথিবী। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন—এই পৃথিবী শুধু দুঃখ-বিষাদে ভরপুর—এখানে সুখের লেশমাত্র নাই। আবার কেহ কেহ বলেন—পৃথিবীতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। এই শেষোক্ত মতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। মানুষ সুখদুঃখ উভয়ই ভোগ করে। উহারা যেন একবৃন্তে দুইটি ফুল।

এখন প্রশ্ন, সুখ কিরূপে লাভ করা যায়? সুখলাভের জন্য মানুষকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। বস্তুতঃ স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনই সুখ। অকর্মা নিষ্কর্মা ব্যক্তি কোনও দিন সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে—বিরুদ্ধ পক্ষে আপন আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া মহাবীর পার্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গাণ্ডীব তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে—হে পার্থ, ক্লীবতা ত্যাগ কর। এরূপ কার্য তোমার পক্ষে শোভন নয়। কর্তব্য-সম্পাদন কর। কর্তব্য-সম্পাদনই তোমার ধর্ম।

কিন্তু কর্তব্য-সম্পাদনের পূর্বে কর্তব্যসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অজ্ঞানে কাজ করিলে সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভের সম্ভাবনাই খুব বেশী। অতএব সর্বপ্রথমে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ছাতা লইয়াই বাহির হইবে। তাহার বৃষ্টিতে ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে অজ্ঞান সে হয়ত বিনা ছাতাতেই বাহির হইয়া পড়িবে ও অচিরেই জলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইবে।

যদি রোগীর শিয়রে একটি ঔষধের ও আর একটি এসিডের শিশি থাকে এবং সেবক যদি কোন্‌টি ঔষধের শিশি তাহা না জানে, তবে সে তো রোগীকে ঔষধের পরিবর্তে এসিডও খাওয়াইতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর রোগ প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার রোগ উত্তরোত্তর বাড়িবে—এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও ঘটিতে পারে। কাজ করা হইল ঠিকই। কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য এই দুঃখভোগ।

প্রাচীন কালে মানুষের যখন কোনও জ্ঞান ছিল না, তখন সে পাহাড়ে পর্বতে মাঠে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। শীত রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে নিজকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে শিখিল—ঝড়বৃষ্টির আর ভয় রহিল না, মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। এখনও যাহারা অসভ্য—যাহারা জ্ঞানের আলোক হইতে এখনও বঞ্চিত, অজ্ঞান-তিমিরে এখনও যাহারা আচ্ছন্ন, সেই সব মানুষ আজও সুখলাভে অসমর্থ। প্রতিনিয়ত কত দুঃখকষ্টে যে তাহাদের কালাতিপাত করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

জ্ঞানলাভের পর আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। জমি যদি যথাসময়ে যথা-নিয়মে কর্ষিত না হয়, তাহা হইলে ভাল ফসল হয় না। সেইরূপ যথারীতি কর্তব্য সম্পাদিত না হইলে সুখলাভ অসম্ভব। সমাজে প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি সমাজের প্রত্যেকে আপন কাজ করিয়া যায়, তবে আমাদের সমাজ অতি সুন্দর হইতে পারে।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—Ye are the salt of the earth.—তোমরা পৃথিবীর লবণ। লবণের তিনটি গুণ আছে। লবণ খাদ্যকে সুস্বাদু করে, উহাকে পচিতে দেয় না, উহার সমস্ত ক্লেদ দূর করে। সেইরূপ আমাদেরও তিনটি কাজ আছে। সমাজের ক্লেদ দূর করিতে হইবে। সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। উহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে যদি আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাই, তবে দুঃখ কোনও দিন আমাদের নিকট আসিতে পারিবে না। সুখলাভ তখন হইবেই।

সমালোচনা

নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম—স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং, ৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ আনা।

প্রসরণশীলতাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্ম। নানা ভাবে নানাজনের মাধ্যমে উহা সুপ্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি এই বিস্তারধর্মকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে স্বামী শঙ্করানন্দ (বিশ্বভারতী) আধুনিক যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিশ্বজনীনতা সংক্ষিপ্ত-ইতিহাসাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল আদর্শ ব্যক্তি ও ধর্মপ্রাণ পুরুষের দৌত্যে বিশ্বময় ভারতের ধর্ম ও মর্মবাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, স্বামী অভেদানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অপর কয়েকজন সন্ন্যাসীর মহান প্রয়াসের বৃত্তান্ত বইটিতে মনোজ্ঞরূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রবাসী ভারতীয়দের একটা মোটামুটি হিসাব এবং বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র-সমূহের নামধাম, পরিচালনা ও কর্মসূচীর বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Vivekananda—By Devaprasad Goswami, M. A. 14, Deshapriya park East, Calcutta-29, Price —/12/- only.

'হিন্দুস্থানের দ্বাদশ পুরুষ'—এই শিরোনামায় গ্রন্থাবলীর অন্যতম গ্রন্থরূপে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মধারার বিবরণ। স্বামীজীর বিরাট জীবনের অতি সামান্য পরিচয়ই অর্ধশত

পৃষ্ঠার মধ্যে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে, তবু গ্রন্থকার এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। মূল বক্তব্যের ধারা রক্ষা করিয়া রচনাটি গতিশীল করার প্রয়াস লক্ষণীয়। বিশেষরূপে গ্রন্থাগার-গুলিতে ও ইংরেজীজানা কিশোরদের নিকট বইটির সমাদর হইবে আশা করি।

ভিখারিণী রাজকন্যাঃ—শ্রীদিলীপকুমার রায়-প্রণীত, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ১৬৪ ; মূল্য আড়াই টাকা।

মেবারের মহারানী মীরাবাই—যিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইয়া ভিখারিণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন—তাঁহারই জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। নাট্যকারের লিপিকুশলতা সুপরিজ্ঞাত, তদুপরি তিনি নিজে একজন সাধকরূপে পরিচিত। সুতরাং ভক্তিমতী মীরাবাই-এর জীবনেতিহাসের নাট্যরূপ তাঁহার লেখনীতে সার্থক হওয়াই স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও। কিন্তু জীবন 'ইতিহাস' কথাটি এস্থলে ভিন্ন অর্থে আমরা ব্যবহার করিয়াছি। ভূমিকায় নাট্যকার বলিয়াছেন : "মীরা সম্বন্ধে আমি এ নাটকে যা যা লিখেছি, সে সব মূলতঃ তারই কাছ থেকে পাওয়া—সজাগ অবস্থায় শোনা, দিনের পর দিন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যা শ্রীইন্দিরা দেবী সমাধিস্থ অবস্থায় সশরীরী মীরার কণ্ঠস্বর হইতে যে বৃত্তান্ত পাইয়াছেন, তাহাও উপাদানরূপে এই নাটকে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত বা ঐতিহাসিক কাহিনী নহে, নাট্যকারের নিজস্ব বিষয়বস্তুই সমালোচ্য নাটকটির মূল অবলম্বন। অতএব সাধারণ ঐতিহাসিক বিচারে উহার সমালোচনা করা নিরর্থক। হয়ত নাট্যগুণ-সৃষ্টির জন্যই নাটকটির বহুস্থানে রং চড়াইতে হইয়াছে। নাটকরচনায় ইহা তেমন দোষের নাও হইতে পারে। কিন্তু রানীর ভগিনী উদয়বাই-এর চরিত্র-চিত্রণে আমরা খুশী হইতে পারি নাই। উদয়বাই মীরাবাই-এর সহমর্মিণী ছিলেন এবং রাণার অত্যাচারের কবল হইতে মীরকে বার বার তিনি রক্ষা করিয়াছেন ইহাই উদয়বাই-চরিত্রের বহুজ্ঞাত ও পরিণত ঐতিহাসিক রূপ। নাট্যকার তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এইরূপ পরিবর্তন না ঘটাইলেও চরিত্রটির নাটকীয়তার অভাব ঘটিত বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক, নাটকহিসাবে 'ভিখারিণী রাজকন্যা' সার্থক হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই।

শ্রীমনকুমার সেন

সত্যদর্শন—শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির-প্রণীত ; প্রকাশক—নালন্দা বিদ্যাভবন ; ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠা—১৮৫ ; মূল্য—৩৲ টাকা।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা ও সাধনসমূহকে একটি স্বাধীন যুক্তি-সবল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার ধারা তুলনা-মূলক। এই আলোচনায় তিনি বেদান্তদর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শনের ভাবগত দূরত্ব অনেকটা কমাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। লেখকের সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত বিচারপ্রণালী প্রশংসনীয়। বৌদ্ধ-ধর্ম ও দর্শনের ভূয়িষ্ঠ প্রচারের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। আজিকার বুধমণ্ডলীর মানসিক গঠন ও সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক রীতিতে বস্তুতে বস্তুতে, ভাবে ভাবে ঐক্য ও সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া বেড়ায় ; শব্দের জাল বুনিয়া মতপ্রতিষ্ঠার দিন এখন আর নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থখানি কালোপযোগী হইয়াছে বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই।

শ্রীমা সারদামণি—শ্রীতামসরঞ্জন রায়-প্রণীত ; প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়

লিমিটেড, ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—১৭৫ ; মূল্য—৩৲ টাকা।

লেখক গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছেন—'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানমানসী দেবী সারদামণির পূত চরিতকাহিনী নিয়ে আমাদের এ আখ্যায়িকা।' এই 'আখ্যায়িকা'টি পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সারদাদেবীর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির বর্ণনার সহিত লেখক তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল ভাষা এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের যে একটি মাধুর্যমণ্ডিত ভাবচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা হৃদয়কে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বইখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর।

পরমারাধ্যা শ্রীমা—মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত-প্রণীত ; প্রকাশক—ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার কলিকাতা-৯ ; পৃষ্ঠা—১৫৪ ; মূল্য—২৲ টাকা।

শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর অবসরে তাঁহার সম্বন্ধে অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন এবং নবীন—প্রখ্যাত এবং অখ্যাত বহু লেখক নিজ নিজ ভাব এবং শক্তি দিয়া এই মহীয়সী মানবী-দেবীর উদ্দেশে বাক্যপুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন ও দিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকটি এইরূপই একটি প্রচেষ্টা এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার ভূমিকায় নবীন লেখকের উদ্যমকে এই ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও করিলাম। তবে 'সারদা বলতে লাগল,' 'জিজ্ঞেস করে রামকৃষ্ণ' ইত্যাদি কর্তা ও ক্রিয়ার প্রয়োগ আমাদের কানে কটু লাগে। অনেক বানান ভুলও চোখে পড়িল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণ আরও সাবধানে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইবে।

মহিলা-মহল (শ্রীশ্রীসারদাদেবী শ্রদ্ধাস্মরণ-সংখ্যা)—অনেক বিশিষ্ট লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ মহিলা-মহল পত্রিকার (৭ম বর্ষ চলিতেছে) এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি। সব প্রবন্ধ এবং কবিতাই শ্রীমাকে অবলম্বন করিয়া। অনেকগুলি ছবি এবং একটি গানের স্বরলিপিও আছে।

মীরাবাঈ—শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার প্রণীত, প্রকাশক—সঙ্গীতপ্রচারণী, ৬১, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা—১২ ; পৃষ্ঠা—(রয়াল আট-পেজী) ৪২ ; মূল্য—২॥০ টাকা।

মীরাবাঈএর ১৬টি সুনির্বাচিত ভজনের এই স্বরলিপি-গ্রন্থ মীরার ভজনানুরাগী শিক্ষার্থিগণের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। গানগুলির অধিকাংশ সুর 'সঙ্গীতবিদ্যালঙ্কার' সুগায়িকা রচয়িত্রীর নিজেরই দেওয়া, অবশিষ্ট কয়েকটির সুর অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ গুণীর। পুস্তকের প্রারম্ভে ভজনগুলির একটি 'অভিজ্ঞান' দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানের পটভূমিকার মাধ্যমে সাধিকা মীরাবাঈ-এর জীবনকাহিনী সরস হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উহাতে বর্ণিত। বইএর শেষে প্রদত্ত হিন্দী উচ্চারণ এবং বাণীর অন্তর্গত বহু শব্দের বাঙলা অর্থ—ভজনগুলির উচ্চারণ ও রসোপলব্ধিতে সহায়তা করিবে। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া লেখিকা সঙ্গীতামোদিগণের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ভজনমালা—শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার প্রণীত ; প্রকাশক—উপরোক্ত পুস্তকের ; ৫০ , মূল্য—২॥০ টাকা।

১৬টি হিন্দী ভজন স্বরলিপিসহ সংগ্রথিত হইয়াছে। বইটি মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মরণে উৎসর্গীকৃত। ভজনগুলির কয়েকটি সুপরিচিত সন্ত মহাপুরুষদের, অপরগুলি ইদানীন্তন ভাব-রসিকগণের রচিত। সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গায়িকার এই গ্রন্থ সমাদৃত হউক ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রহড়া বালকাশ্রমে অনুষ্ঠান—৭ই চৈত্র, অপরাহ্ণে বালকাশ্রম-প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে নির্মিত একটি মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পুরস্কার বিতরণী সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানের অপর একটি অঙ্গ ছিল আশ্রমের কিশোর বালকগণ কর্তৃক আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা। আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সভাপতি মহাশয়কে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির অভিভাষণে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন, আজ এই রহড়া বালকাশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই আশ্রমে ২৫৩ জন ছেলের জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হইবে, এ আশা আছে। আমাদের দেশের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গেল, তাহাতে অনেকে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। আমাদের দেশের উপর দিয়া বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। যে বালকেরা এই আশ্রমে স্থান লাভ করিয়াছে তাহারা ভাগ্যবান।

অতঃপর আচার্য সরকার আশ্রমের বালকদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই আশ্রমে আছেন, তাঁহারা আরও সুন্দরভাবে তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন। এইস্থানে তোমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছ তাহা সুন্দর। তোমরা এই আশ্রমে স্থান লাভ করিয়া এই সুশিক্ষার সুযোগ পাইয়াছ। তোমরা এই আশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এমন সৎ ও মহৎ কার্য করিবে, যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

আচার্য সরকার আরও বলেন, এই সকল ছাত্র বড় হইয়া এক বিশেষ শ্রেণীর কর্মী হইবে, ইহাতে আমি নিঃসন্দেহ। চরিত্র মহামূল্যবান বস্তু। এই চরিত্র না থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও স্বামীজীদের শিক্ষা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে বিপুল সাহায্য করিবে এবং তাহারা অধিকতর শিক্ষালাভ করিবে। এইস্থানে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, বাড়ীতেও সেইরূপ শিক্ষাদান করা হয় না। শুধু ইহাই নহে, এই আশ্রমে কারিগরী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে।

আচার্য সরকার বলেন যে, বিনয়ের অপর নাম সংযম। ছেলেদের মধ্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলা-বোধ। এই স্থানে উহা আছে। বিনয়ের অভাবে আজ বাঙ্গালীদের দুর্নাম ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এই দুর্নাম না রটিতে পারে, তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এই আশ্রমের মত যদি শত শত আশ্রম গড়িয়া উঠিত, তবে দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। এই আশ্রমের ছাত্রেরা বড় হইয়া যে কার্য করিবে তাহা যেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। ছাত্রদের সব চাইতে প্রয়োজন চরিত্রগঠন। এই আশ্রম ও মিশনের কর্মিবৃন্দ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের ও আর্ত জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

উপসংহারে আচার্য সরকার ছাত্রদিগকে সর্বতোভাবে এই আশ্রমের উপযুক্ত হইতে আহ্বান জানান এবং আশ্রমের ছাত্রদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হউক বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠান—ঢাকা কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব ছয় দিনব্যাপী (২৬শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী) নানা অনুষ্ঠান দ্বারা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম, ধর্মগ্রন্থপাঠ এবং স্বামীজীর

জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ঐদিন প্রায় ছয়শত ভক্তের মধ্যে প্রসাদবিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা পাঠ এবং আলোচনা হয়। এই দুই দিন মিশন স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক 'কর্ণার্জুন' নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

চতুর্থ দিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আলহজ্জ্ খান বাহাদুর আবদর রহমান খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী কেইন, শ্রীমতী মমতা দাস প্রভৃতি কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে শ্রীসুবোধকুমার রায় স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় দর্শন স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রেমের আদর্শ ও দুর্গতের সেবাসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন শ্রীমতী সন্তোষ বালি। পাকিস্থান রেড় ক্রশ সোসাইটীর সেক্রেটারী জনাব এ হাফিজ সারা দুনিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের বহুবিধ জনসেবামূলক কাজের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীরামদাস (ভারতীয় হাই কমিশন) বলেন, স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষের অন্তরে যে দেবত্ব বিরাজমান তার উপলব্ধিই ধর্ম। কেন্দ্র-সেবক স্বামী সত্যকামানন্দও বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব স্বামীজীর জীবনদর্শন, দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি তাঁহার গভীর প্রেমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মানবপ্রীতি জীবনাদর্শ হওয়া উচিত। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য প্রতিভা ছিল। প্রেম ও সেবা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ। সভার শেষে জনাব আবদুল লতিফ ও শ্রীমতী কণিকার সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

সাধারণ সভার পূর্বে মিশন স্কুলের ছাত্রদের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের পঞ্চম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিবৃন্দের আনন্দ অপেরা কর্তৃক 'মুক্তি-যজ্ঞ' যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবের শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। প্রায় চার সহস্র দরিদ্র নরনারী ও শিশুকে ভোজন করান হয়। সন্ধ্যায় ভারতীয় প্রচারবিভাগের সৌজন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ভুবনেশ্বরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব—গত ২২শে মাঘ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের একনবতিতম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রাত ৪॥০ হইতে মঙ্গলারতি, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও স্থানীয় কীর্তনীয়াদের দ্বারা পালাগান ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪॥০ টায় মঠ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামিজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতিকৃতির সম্মুখে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী। স্বামী জগন্নাথানন্দ কর্তৃক বৈদিক শান্তিপাঠ ও তৎপর প্রারম্ভিক সঙ্গীত গীত হইবার পরে সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথমে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ওঁকারানন্দজী বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনী ও বাণীর তাৎপর্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ ও উহার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে বলেন। উড়িষ্যা মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কাশীনাথ মিত্র ওড়িয়া ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা পূর্বক দেশবাসীকে সেই সব আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য আহ্বান জানান। তৎপরে স্বামী জপানন্দ হিন্দীতে সংক্ষেপে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভাপতি

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁহার উদ্দীপনাময় ভাষণে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই আজ আমরা ধর্মকে সহজভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতেছি।

উৎসবদিনে মঠে সমবেত ভক্ত নরনারীগণ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজকে দর্শন ও তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণে বিশেষ আনন্দানুভব করেন।

পাথুরিয়াঘাটা শিক্ষা-কেন্দ্রে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—বিগত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র (২৭শে ও ২৮শে মার্চ) পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাঙ্গণে আশ্রম-হিতৈষীদের উদ্যোগে স্বামীজীর স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও সঙ্গীতাদির পর অপরাহ্নে মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী অনন্তানন্দ এবং শ্রীতামসরঞ্জন রায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভার পর আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' অভিনয় করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করে। ১৪ই চৈত্র, রবিবার আশ্রমের প্রাক্তনছাত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় আহূত ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। উৎসব-অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন বেতারশিল্পী শ্রীকিশোর ভড়, শ্রীদিলীপ ঘোষ এবং বারাণসী কালীকীর্তন দল। উৎসব-মণ্ডপের সজ্জা-সম্পাদন করেন আশ্রম-পরিচালিত 'বিবেকানন্দ-নৈশ বিদ্যালয়ে'র ছাত্রবৃন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে বিগত ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ) হইতে ১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ) পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দুই দিন সোসাইটি-প্রাঙ্গণে দুইটি জনসভার আয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ ব্যতীত শহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উহাতে যোগদান করেন। অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা) অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী (রাঁচী কলেজ) এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দজী তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৪ই চৈত্র সোসাইটী-প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ৪ ঘটিকায় শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দত্তরায়ের সভাপতিত্বে একটি মহিলা সভায় স্বামী জপানন্দ এবং শ্রীমতী স্নেহলতা দাশগুপ্তা মাতৃজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। উৎসবের বাকী তিন দিন বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয় (সাকচী), টিন্‌প্লেট্ সান্ধ্যক্লাব, কদমা মধ্য বিদ্যালয় এবং টেল্‌কো অঞ্চলেও পৃথক সভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের উদার শিক্ষার আলোচনা হয়। বক্তা ছিলেন শহরের কতিপয় সুধী ব্যক্তি এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ।

বিশাখাপত্তনমের সমুদ্রসৈকতস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবসূচি তিন দিন (৬ই, ৭ই এবং ২১শে মার্চ) ধরিয়া উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিবসে পূজা, বেদপাঠ, ভজন এবং প্রসাদবিতরণ; দ্বিতীয় দিনে কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত এবং তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে অন্ধ্রের রাজ্যপাল শ্রী সি এম্ ত্রিবেদী মহোদয়ের পরিচালনায় জনসভা। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক এস্ বেঙ্কটরমণ (ইংরেজী), শ্রী কে ভি রত্নম্ (তেলেগু) এবং শ্রী আই আর শাস্ত্রী (হিন্দী)। স্থানীয় জনসাধারণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পূর্বপাকিস্থানের বাগেরহাট কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি স্থানীয় ভক্ত এবং বন্ধুগণের উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভজন-সঙ্গীত

পরিচালনা করেন বাগেরহাটের কৃতী গায়ক ফণী বাবু, পাঠ ও আলোচনায় অংশ লইয়াছিলেন শ্রীভুবন মোহন চক্রবর্তী ও শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল হইতে বিশেষ পূজাদি সমাগত ভক্তগণকে প্রভূত আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দিয়াছিল

ঢাকা কেন্দ্রে তিথিপূজা উপলক্ষ্যে সারাদিন-ব্যাপী পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠাদি পরিনির্বাহ হয়। সন্ধ্যারতি ও ভজনের পর ঢাকেশ্বরী কটন মিলের (২নং) যাত্রাদল 'সমাজের বলি' অভিনয় করেন। ২৩শে ফাল্গুন রবিবারে শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় আশ্রম-সেবক স্বামী সত্যকামানন্দ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রী সর্বাধিকারী বাল্যজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণ সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ঐ দিন রাত্রে পূর্বোক্ত যাত্রাদলের অভিনীত আর একটি নাটক—'ফুল্লরা' সমবেত জনগণকে বিমল আনন্দ দিয়াছিল।

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১২ই চৈত্র এবং ১৪ই চৈত্র। প্রথম দিন ভোরে ভজন, মঙ্গলারাত্রিক, হোম ও পূজা এবং বৈকালে সমবেত পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শেষ দিন রবিবার বৈকালে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হয়। রাজেন্দ্র কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার আচার্য, শ্রীপৃথ্বীশ গুহরায়, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ রামকৃষ্ণ-জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীবিনোদলাল ভদ্র মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে পরমহংসদেবের বাণী বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যাখ্যা করেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকই উৎসবে যোগদান করেন।

দিনাজপুর শাখাকেন্দ্রে তিথিপূজা পরিপালিত হয় বিবিধ অর্চনা-কৃত্যের মাধ্যমে। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আশ্রমের শান্ত ভাবগম্ভীর আনন্দপরিবেশে ভক্ত এবং অনুরাগী বন্ধুগণের সমাগম চলিতে থাকে। উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে এবং কলেজে আংশিক ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। ভজন, জীবনী-আলোচনা এবং দেড়সহস্র নরনারীকে প্রসাদ দান উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

মালদহ আশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের শুভ ১১৯তম জন্মতিথি উৎসব সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে ভজন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, সমবেত হোম ও প্রসাদ বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিচালিত এক সভায় শ্রীপ্রতুলকৃষ্ণ গুপ্ত স্বরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী' পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখান যে, যেমন দেশশাসন ব্যাপারে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালিত হয়, তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গণতান্ত্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগ ও সেবার জীবন্ত আদর্শকে ভারতীয় জীবনে পরিস্ফুট করিয়া জগতের সামনে সকলকে ধরিতে বলেন। পর দিবস অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। এতদুপলক্ষ্যে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক একটি মনোরম আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই দিনকার অনুষ্ঠানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

পবিত্র গঙ্গাসাগর তীর্থের তিন মাইল দূরবর্তী মনসা-দ্বীপ পল্লীকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মোৎসব, তথা শ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী, সংযুক্ত ভাবে ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ; মধ্যাহ্নে শোভাযাত্রা; অপরাহ্ণে ধর্মসভা এবং

সন্ধ্যায় সঙ্গীতবাসর ও প্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রে যাত্রাভিনয় ছিল উৎসবের অঙ্গ। কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ ছিলেন ধর্মসভার পরিচালক। আশ্রম-সেবক স্বামী নিরাময়ানন্দ, প্রধান শিক্ষক, তিনজন সহকারী শিক্ষক ও স্থানীয় জেলা বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উৎসবে প্রায় ১০।১৫ মাইল দূর হইতে আগত আনুমানিক দুই হাজার নরনারায়ণের সেবা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণের 'দাসীপুত্র' যাত্রাভিনয় বিশেষ আনন্দপ্রদ হয়। পরদিন সন্ধ্যায় আশ্রম হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে রুদ্রনগর দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠে প্রায় পাঁচ শত নরনারীর উপস্থিতিতে স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও উক্ত বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী— শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ১৬ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) হইতে সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব মহাসমারোহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা, জনসভা, মহিলা সম্মেলন, ছাত্রদিবস, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কীর্তন, অভিনয়, সঙ্গীত-জলসা, ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া বিদ্যাপীঠ হইতে দেওঘর শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রী ব্যাণ্ডপার্টি সহ এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। বৈকালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহোদয়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। সভায় স্বামী জপানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, এবং দেওঘর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনন্দন সহায় বক্তৃতা করেন। ১লা মার্চ এক মহিলা সম্মেলনে মহিলাগণের মধ্য হইতে অনেকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও আবৃত্তি করেন। ৪ঠা মার্চ দেওঘরের এস-ডি-ওর পরিচালনায় এক ছাত্র-সভা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে—হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ভারতের মহীয়সী নারী ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৫ই মার্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ "অভিমন্যু বধ" অভিনয় দ্বারা দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। ৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। বৈকালে শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষের দ্বারা পরিচালিত এক জনসভায় শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), এবং বিদ্যাপীঠের কর্মসচিব স্বামী বোধাত্মানন্দ বক্তৃতা করেন।

১৪ই মার্চ বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সভানেতৃত্বে বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সভার পূর্বে ডাঃ সিংহ নবনির্মিত বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। তিনি বিদ্যাপীঠের প্রার্থনাগৃহ, উদ্যান, শিল্পকলা-প্রদর্শনী, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং ছাত্রদের আবৃত্তি, সঙ্গীত, ড্রিল প্রভৃতি দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। ২১শে মার্চ ভারত-বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের পরিচালনায় বহু দর্শকের সম্মুখে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত এক সপ্তাহ ব্যাপিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ধর্মসভা, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্তৃক কণ্ঠ ও

যন্ত্রসঙ্গীত, তরজা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর কথকতা, যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে পর পর দুইটি সভায় স্বামী জপানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ ।সারদা দেবীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী সুশান্তানন্দ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের সবাক চলচ্চিত্র সাহায্যে কেদার-বদ্রিনারায়ণ ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থাদির চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্থানীয় সাঁওতালগণ কর্তৃক তাহাদের মাতৃভাষায় "রামসীতা" নাটিকাখানি অভিনীত হয়। এতদুপলক্ষ্যে প্রায় চারি সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ পায় এবং প্রতি অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর শতাব্দী জন্মজয়ন্তী উৎসব ৭ই চৈত্র হইতে নয় দিন ধরিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎ-সব পালনের জন্য দুইটি দিন পৃথক নির্দিষ্ট ছিল। প্রথম দিনের সভার অধিবেশনে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ, মনসাদ্বীপ কেন্দ্রের সেবক স্বামী নিরাময়া-নন্দ এবং কলিকাতা বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অন্য একদিন উক্ত অধ্যাপিকা মহোদয়ার সভানেতৃত্বে উদ্‌যাপিত মহিলা দিবস অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্তা গ্যাটি ও শ্রীযুক্তা কৃষ্ণ-ভাবিনী দেবী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পরিচালনায় দুই দিন দুইটি সভায় অধ্যাপক সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। নবম দিবসের বিশেষ সভায় বক্তা স্বামী নিরাময়া-নন্দের বক্তব্য বিষয় ছিল, 'শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা।' অন্যান্য দিনে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, দেহসৌষ্ঠব-প্রতিযোগিতা, সূচী-শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও আলপনা-প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, সঙ্গীতবাসর, ৪০টি সম্প্রদায়ের হরিনাম সংকীর্তন এবং মহাসমারোহে নারায়ণ সেবা প্রভৃতি এই মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

মহিলা সম্মেলন—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের অঙ্গস্বরূপ গত ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) হইতে ২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) পর্যন্ত কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মাতা সারদা-দেবীর মহিলা ভক্তগণের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহূত হয়। দিল্লী, নাগপুর, কূর্গ, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। এই আরম্ভিক অধিবেশনে পুরুষভক্তগণেরও প্রবেশা-ধিকার ছিল। পরবর্তী অধিবেশনসমূহের কত-গুলি ছিল প্রতিনিধিবর্গের জন্য। চারটি মহিলা-সভা ছিল সর্বসাধারণের জন্য।

উদ্বোধনী-সভার দিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলের মঞ্চটি পুষ্পলতাদি দ্বারা নয়নাভিরামরূপে সাজানো হইয়াছিল। মধ্যস্থলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা-সারদাদেবীর সুসজ্জিত, বৃহৎ চিত্র। সভাপতি শ্রীমৎ শঙ্করানন্দজী মহারাজকে শঙ্খধ্বনির দ্বারা বরণ করিয়া মঞ্চোপরি লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তাঁহার মর্মস্পর্শী গভীরভাবদ্যোতক উদ্বোধনী ভাষণ (এই ভাষণটি উদ্বোধনের শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে) দিবার কিছু পরে শারীরিক অসুস্থতা হেতু চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ডাঃ রমা চৌধুরী মাতা সারদামণির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, শ্রীমায়ের আদর্শ অনুসারে আমরা নিজেদের জীবন গঠন করিতে পারিয়াছি কিনা সে বিষয়ে আজ চিন্তা করিতে হইবে এবং নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য— অর্ধাঙ্গিনীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা মাতা সারদামণি দেবীকে পাইয়াছি। তাঁহার দাম্পত্যজীবন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেও উচ্চতম ধর্মজীবন যাপন সম্ভব, ইহা মাতা সারদামণি নিজের জীবনে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, জগতে আর কেহ তাহা করেন নাই। মাতা সারদামণি দেখাইয়া গিয়াছেন, মাতৃত্বই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি ছিলেন নিষ্কাম কর্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও একাত্মবোধের মূর্ত প্রতীক। ধনী-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূর্খ-উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলকে তিনি করুণা বিতরণ করিয়াছেন।

স্বামী মাধবানন্দজী বলেন, মাতা সারদামণি নিজের দৈবীশক্তিকে সংযত করিয়া আমাদেরই মায়ের মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের মাতৃরূপ মাতা সারদামণির জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মাতা সারদামণি সাক্ষাৎ ভগবতী। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ করিয়া তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন ও এতটা সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বক্তা বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের দায়িত্ব হইতেছে— জগৎকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেওয়া। নারীজাতিকেও সে দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা সারদামণিকে পূজা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর মাতা সারদামণি তাঁহার কর্মভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাকসার ও শ্রীযুক্তা শুভলক্ষ্মী (মাদ্রাজ) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাতা সারদামণির জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিশ্বপ্রেম ছিল তাঁহার কর্মের উৎস এবং মাতৃত্বের প্রেরণায় নারীজাতিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার ও তাঁহার পাটি সঙ্গীত করেন।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা—

জয়রামবাটী 'শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে' জননী সারদা-দেবীর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল, বুধবার) হইতে ২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল, শুক্রবার) পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী আনন্দোৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভা-যাত্রা, পূজা, যজ্ঞ, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ঠাকুর ও মায়ের জীবনী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে আলোচনা, কথকতা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি কর্ম-সূচির অঙ্গীভূত ছিল। ৪ঠা এপ্রিল হইতেই সাধু ও ভক্তযাত্রীর সমাগম হইতে থাকে। ৬ই এপ্রিল, মঙ্গলবার রাত্রে হাওড়া হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভক্ত নরনারী বিষ্ণুপুর পৌঁছান। বিষ্ণুপুর হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী জয়রামবাটী যাইবার জন্য বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল। শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরের সমীপবর্তী বিশাল ধান্যক্ষেত্রকে সমতল করিয়া উৎসবভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ ও মহিলার জন্য খড়ের ছাউনি ও বেড়া দেওয়া অস্থায়ী বহু সংখ্যক কুটীর নির্মিত হয়। বাসস্থান, আহারাদি, স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই যত্ন, শৃঙ্খলা ও দক্ষতা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। ১৪টি নলকূপ বসাইয়া এবং আমোদর নদে বাঁধ দিয়া একটি কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করিয়া জল সরবরাহ

এবং ডায়নামো চালাইয়া বিদ্যুৎ-আলোকের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্র হইতে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মোটরলরি, ট্রাক, জিপ ও বাসে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে গোযানে, সাইকেলে ও পদব্রজে প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী উৎসবে যোগ দেন।

বুধবার (২৪শে চৈত্র) শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয় মন্দিরের সম্মুখবর্তী এক সুসজ্জিত যজ্ঞ-শালায় 'রুদ্রযজ্ঞ' আরম্ভের সঙ্গে। কাশী হইতে চারজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে এই জন্য আনা হইয়াছিল। আর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী-দের রচিত মৃত্তিকা-মূর্তি ও পরিবেশাদির মাধ্যমে শ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন-লীলার একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। রাত্রিতে মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তির অধিবাস হয়।

বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্তে ১০১ তোপধ্বনি দ্বারা শ্রীশ্রীমাতার শতবর্ষ জয়ন্তী ঘোষণা করা হয়। প্রাতে ৭টায় শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত পটমূর্তি লইয়া গীতবাদ্য সহযোগে সমাগত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং ভক্ত নরনারীদের এক শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। যজ্ঞশালায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও অন্নযাগ হয়। মূল মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীশঙ্করানন্দজী মহা-রাজের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমাতা সারদামণির প্রস্তর-মূর্তির প্রতিষ্ঠা, পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০ হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় কালী-কীর্তন, রাত্রিতে বাজি পোড়ান ও যাত্রাভিনয় এবং মন্দিরে দশমহাবিদ্যার পূজা ও হোম হয়। এই দিন প্রায় একলক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শুক্রবার প্রাতে সপ্তশতী হোম, রামায়ণগান অপরাহ্ণে বক্তৃতা ও রাত্রিতে নদের নিমাই অভিনয় হয়। এইদিন কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানেও এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। জয়রামবাটী হইতে বহু ভক্ত উহাতে যোগদান করেন। হাওড়া হইতে একটি স্কাউট দল এবং বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ এবং আশেপাশের আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ ছাত্র কয়দিন স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে সমাগত যাত্রিগণের সেবা করিয়াছে। বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্রীআয়েঙ্গার নিজে উৎসবস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সকল বন্দোবস্ত তদারক করেন। যাত্রিগণের প্রত্যাগমনের জন্য ৯ই এপ্রিল রাত্রে বিষ্ণুপুর হইতে হাওড়া পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। যাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক অদ্ভুত পবিত্র আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা ও আনন্দের স্মৃতি বহন করিয়া ফিরিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কটকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—

গত ২৭শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কটকে নারী সঙ্ঘ সদনে বৈকাল ৫টায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন কটকে এইবার বহু বৎসর পরে হইল।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ওড়িষ্যা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় পিঙ্গলরাজ পাণিগ্রাহী। বক্তৃতা করেন বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী রূপানন্দ এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যার সর্ববরেণ্য নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব।

প্রথমে শ্রীবৈদ্যনাথ রায় চৌধুরীর প্রারম্ভিক

সঙ্গীতের পর ডাঃ মহতাব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। পরে স্বামী জপানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন। শ্রীবিমল-কৃষ্ণ পালও ওড়িয়া ভাষায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে সকলকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আহ্বান জানান।

সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর সভার কার্য শেষ হয়।

পরলোকে ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার— গত ২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে কলিকাতা-বালিগঞ্জে স্বকীয় বাসভবনে ৬৯ বৎসর বয়স্ক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের পরলোক-গমনে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিকের তথা ঋষিকল্প ভারতীয় মনীষীর অভাব ঘটিল। গভীর পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং অমায়িক উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি ছাত্র এবং অধ্যাপক মহলে সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষা ও শিক্ষণ-জীবন দুইই গৌরবোজ্জ্বল। ডক্টর সরকারের প্রণীত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু বৎসর হইতে উদ্বোধনে তিনি নিয়মিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে আমরা পরমাত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। পুণ্যাত্মার ঊর্ধ্বগতির জন্য শ্রীভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা এবং তাঁহার সহধর্মিণীকে হৃদয়ের অকপট সমবেদনা জানাইতেছি।

স্মরণে—গত ১৬ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শচীন্দ্রভূষণ পাল মহাশয় প্রায় ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি মালয়দেশে মেণ্টাল হসপিট্যালের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন। সরল, অমায়িক, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। বিদেশে অনেক বিপন্ন বাঙালী ও ভারতীয় পরিবারকে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন এবং মালয়দেশে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগদানপূর্বক সাধুদিগকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত সৎকার ও সেবা করিতেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন এবং অতঃপর ভগবৎ চিন্তা ও চর্চায় কাল কাটাইতেন। শচীনবাবু পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালিয়াটী (ঢাকা) গ্রামের ভক্তগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যামিনী লাল রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২রা চৈত্র ৭১ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টের নাম করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের (খোকা মহারাজের) মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার মুক্তি কামনা করি।

পল্লীবঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্বসাতগেছিয়া গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে ফাল্গুন বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি, বিকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন হইয়াছিল। পরদিন রবিবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জীবনী আলোচনা ও ভজনগানাদি হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রায় ৭।৮ শত লোকের সমাগম হয়।

গত ৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ রবিবার) হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেলাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম শুভ জন্মোৎসব

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে নগর-কীর্তন, বিশেষ-পূজা, ভজন, স্তবপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ পাঁচটায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশে একটি বিরাট জনসভা হয়। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের নানাদিক অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। সভাপতিরূপে স্বামী বেদানন্দ (সম্পাদক, বিশ্ববাণী) মর্মস্পর্শী ভাবে ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা কাল তাঁহার অভিভাষণ দেন। শ্রোতারা সকলেই ধৈর্য ও আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত ১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ বুধবার) মাজু (হাওড়া) রামনারায়ণ বসু উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদানসম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। ছাত্রদের আবৃত্তি, কুমারী বীণাপাণি সাউএর ভজনসঙ্গীত এবং চংঘুরালীর শ্যামা সম্মিলনীর কালী-কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হয়।

যশোহর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে গত ২২শে ফাল্গুন ডাঃ শ্রীগিরিজাভূষণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে মহাসমারোহে অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মবার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে স্থানীয় সমবেত ভক্তবৃন্দ ও মহিলাদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবের জীবনী ও তদীয় লীলাকাহিনী পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। অতঃপর প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যাকালে যথারীতি আরাত্রিক ও স্তোত্রাদি আবৃত্তির পর উৎসবসূচির সমাধা হয়।

গত ২২শে ফাল্গুন খেপুত (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি পূজা নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় :— প্রভাতে—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া নাম-কীর্তন সহ প্রভাতফেরী। পূর্বাহ্নে—আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে পূজা ও ভোগ, সারাদিন ব্যাপী সমাগত ভক্ত নরনারী ও বালক-বালিকাগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। অপরাহ্নে—সভা। সন্ধ্যায়—আরাত্রিক— ভজন ও কথামৃত পাঠ।

বেলঘরিয়া দেশপ্রিয়নগরে গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন দুইদিনব্যাপী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও জননী সারদামণির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজার্চনা, শাস্ত্রাদিপাঠ, কালীকীর্তনাদি ছাড়াও দ্বিতীয় দিনে একটি মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পরিচালক ও মূল বক্তারূপে 'বিশ্ববাণী' সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনসাধনা বিবৃত করেন এবং পূর্ববঙ্গ হইতে ছিন্নমূল নগরের বার সহস্র নরনারীকে নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা অবলম্বনপূর্বক নবজীবনগঠনে আহ্বান জানান। এই উপলক্ষ্যে দেশপ্রিয়নগরে একটি দেবালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীগোপীনাথ মল্লিক।

ভদ্রকালী (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য বালিকাশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশ্রমে বালিকারা ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে সমবেত প্রার্থনান্তর প্রাঙ্গণে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করে এবং ঠাকুরের বৃহৎ প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাভক্তি সহ মাল্য এবং চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করে। ইহার পর পরমহংসদেবের ষোড়শোপচারে পূজার্চনা সম্পন্ন হয়। সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-কীর্তন ভক্তগণকর্তৃক ভক্তিভরে গীত হইয়াছিল। তিনশতাধিক বালকবালিকা ও ভক্তমণ্ডলী কীর্তন-শেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় রাত্রি ৮ঘটিকা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সুমধুর নামকীর্তন সকলকে

তৃপ্তি দিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীহরিপদ ভাগবতভূষণ উৎসব উপলক্ষ্যে দশদিবস বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবদ্দশায় একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে কোন্নগর নৌকাযোগে গমনকালে এই ভদ্রকালী গ্রামে আশ্রম-সন্নিকটস্থ বিশালাক্ষীর ঘাটে অবতরণ করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া কীর্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্রমের এই উৎসবকে ঠাকুরের সেই শুভ পদার্পণের স্মারকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মতিলাল (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ২২শে ফাল্গুন, যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠা ও শুভ জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ-পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহ্ণে সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক, ভজন এবং সমবেত গ্রামবাসিগণ কর্তৃক সুললিত হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

এ বৎসর বেহালা হইতে ২½ মাইল দূরবর্তী ১নং বাসুদেবপুর কলোনীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ও লেখক শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতিরূপে ঠাকুরের শিক্ষার নানাদিক সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পল্লীর নরনারীগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

২৪-পরগণার জয়নগর-মজিলপুরস্থ বোসপাড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একশত ঊনবিংশতিতম আবির্ভাব-উৎসব গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন নিষ্ঠার সহিত পালিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে বেলুড়মঠের স্বামী পূর্ণানন্দের পরিচালনায় একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীফণিভূষণ মিত্র, শ্রীকালীচরণ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি শ্রীকেশবলাল ঘোষ বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী পূর্ণানন্দ প্রায় দুইঘণ্টাকাল আবেগপূর্ণ ভাষণে সকলকে তৃপ্তিদান করেন।

মথুরাপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন, ৬ই ও ৭ই চৈত্র দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভজন গান, নগর সঙ্কীর্তন, পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ, এবং দরিদ্রনারায়ণসেবা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই চৈত্র অপরাহ্ণ ৫টা হইতে প্রায় ৩ঘণ্টা কাল জয়নগর মাজিলপুরের রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ সুমধুর 'গদাধর কথা-গীতি' পরিবেশন করিয়া সমবেত সহস্রাধিক নরনারীকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেন।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঝিখিরা গ্রামের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে গত ৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯-তম জন্মোৎসব এবং তদীয় লীলাসঙ্গিনী জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যথাসময়ে উষাকীর্তন, মঙ্গল-আরতি, পূজাপাঠ, হোম, হরিসংকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র চরিতকথা ও উপদেশাবলীর আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও রামনাম-কীর্তনান্তে উৎসব-কার্য সমাপ্ত হয়। পূজাহোমাদিসংক্রান্ত সমস্ত কার্য বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমরূপানন্দ সম্পাদন করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উপনিষদ্ ও চণ্ডীপাঠ এবং আলোচনা সভার পরিচালন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানাদিক আলোচনা করিয়া কিরূপে তাঁহাদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ দ্বারা সাধারণ সংসারী মানুষ তাহদের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, সন্ন্যাসি-দ্বয় তাহাই তাঁহাদের ভাষণে বলেন। গ্রামখানি সারাদিন উৎসবানন্দে মুখরিত ছিল।

ঘাটাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ) বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণাদি সহ উৎসব সমারোহের সহিত

সম্পন্ন হইয়াছে। সাধারণ সভায় মহকুমাশাসক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিশ্বদেবানন্দ ঠাকুরের অলৌকিক সাধনার বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ দেন।

কদমতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘে গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সংশুদ্ধানন্দের পরিচালনায় নগর-কীর্তন, এবং বিশেষ পূজাহোমাদি, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী ও অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী—বিগত ৭ই চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্যন্ত তিন দিবস ব্যাপী গোপীনাথপুর (মেদিনীপুর) মাতৃ-আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই চৈত্র সকাল ৬৷৷০টায় একটি সুদৃশ্য মঞ্চে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ, ধুনা, আরতি, কীর্তন ও ব্যাণ্ড বাদ্য সহ একটি শোভাযাত্রা তিন চারিটি গ্রাম পরিক্রম করিয়াছিল। বিশেষ পূজা, চণ্ডী-পাঠ, হোম, ভোগারতি এবং ভজনাদিও হয়। পূজান্তে ৩০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদগ্রহণ করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

৮ই চৈত্র একটি মহিলাসভা এবং ৯ই চৈত্র বৈকালে ঘাটাল মহকুমাশাসক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। স্বামী মহেশ্বরানন্দ, স্বামী রামেশ্বরানন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ স্ত্রীজাতির জাগরণে শ্রীশ্রীমার অবদান সম্বন্ধে বহুমুখী আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতির অভিভাষণান্তে সভার কার্য শেষ হয়। রাত্রি ৯টায় যাত্রাভিনয় হয়।

প্রতিদিন অগণিত নরনারী দলে দলে ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই তিন দিনে সর্বসমেত প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ১২ই পৌষ দেওঘর (কুণ্ডা) শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, স্থানীয় বালিকাগণ কর্তৃক নগরকীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ, ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-আলোচনা, কীর্তন, ভক্তসেবা প্রভৃতি সারাদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত-ব্যাখ্যা করেন হুগলী কলেজেরপ্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম; শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ ও ডক্টর ব্রহ্ম। ঐ দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রামরাজ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীবসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়, ন্যায়াচার্য শ্রীশ্যামাপদ শাস্ত্রী, জমিদার শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফকিরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দিল্লীতে অনুষ্ঠান—নয়াদিল্লী (বিনয়নগর) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২৩শে মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের যুক্ত-জন্মবার্ষিকী পালনার্থে লোকসভার সভ্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট জন-সভা আহূত হয়। ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগোপীনাথ আমন এবং নয়া দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা দেন।



বৈরাগ্য

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসমাগমাগতসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
সর্বং রম্যমনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ॥

রম্যং হর্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রব্যং ন গেয়াদিকং
কিং বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে?
কিং তু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৭৯-৮০

শুক্লা রাত্রির স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ কী আনন্দদায়ক, লোকালয়ের উপকণ্ঠে বনানীর সংলগ্ন প্রান্তরগুলি যখন সবুজ ঘাসে ঢাকিয়া যায় তখন উহাদের কী নয়নাভিরাম শোভা! বিদ্বৎ-সমাগমে চিত্তে যে নির্মল সুখ পাওয়া যায়, নানা কাব্যে রমণীয় বর্ণনাদি-পাঠে যে সাহিত্য-রস অনুভব করা যায় তাহাও কত অভিনন্দনীয়। আবার তরুণ যখন প্রিয়তমার কৃত্রিম কোপে অশ্রুবিন্দুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তখন সেই মুখচ্ছবি তাঁহার নিকট কতই না সুন্দর মনে হয়! জীবনের বিচিত্র গতিপথে, পৃথিবীর দিকে দিকে কত রূপ, কত রস, কত আনন্দ আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সত্য! কিন্তু এমনও সময় আসে যখন চিত্তে প্রবেশ করে এই সব কিছুরই প্রতি একটি দুরতিক্রম্য অনিত্যতা-বোধ। তখন মনে হয়, কোন কিছুরই যেন আর কোন আকর্ষণ নাই।

রমণীয় অট্টালিকায় বাস করিয়া সুখ হয় বই কি, উপযুক্ত স্থানে নিশ্চিন্ত মনে প্রিয়জনদের সহিত অবসর-সময়ে বসিয়া মধুর গীতবাদ্যাদি শুনিলে প্রাণে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় বই কি। প্রেমাস্পদা কান্তার সাহচর্যজনিত সুখও যে অত্যন্ত কাম্য তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? সত্য! কিন্তু এমনও সময় আসে যখন মনে হয়, সব কিছুই অতি অস্থির—যেন রূপমুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষালোড়ন-সঞ্জাত বায়ুস্পন্দনে চঞ্চল দীপশিখার একান্ত ক্ষণিক ছায়া! তাই তো দেখিতে পাই, এই অনুভূতির ফলে জীবনের সব আকর্ষণ পিছে রাখিয়া সন্তগণ অতি-জীবনের অপরিবর্তনীয় সত্য ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে গৃহ ছাড়িয়া বনের কৃচ্ছ্রতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

অতীন্দ্রিয়তার সুযোগে

কিছুদিন আগে বেথুন কলেজের প্রাঙ্গণকোণস্থিত গির্জায় জনৈক খ্রীষ্টান যোগীর আবির্ভাব হইয়াছিল। যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার জনরবে শত শত লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল—ভিড়-নিয়ন্ত্রণের জন্য নাকি পুলিসকেও নামিতে হইয়াছিল। পরে শোনা গেল যোগী নাকি একজন যোগ-ব্যবসায়ী মাত্র! কয়েক বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার গ্রামে 'নেপালবাবা'র আবির্ভাব ও তিরোধানের করুণ ঘটনা মনে পড়ে; করুণ—কেননা দূর-দুরান্তরের সহস্র সহস্র নরনারী বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায় মাত্র একটি অলৌকিক বিশ্বাসে চালিত হইয়া কতকগুলি দুষ্ট লোকের দ্বারা ধনে প্রাণে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পড়িলে নেপালবাবা-নাট্যের প্রযোজক-মণ্ডলীর উপর ক্রোধ অপেক্ষা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত 'বিশ্বাসী'গণের প্রতি মমতাই বেশী উদ্রিক্ত হয়। কূর্গের পল্লীবালা ধনলক্ষ্মীও তো সারা দেশ জুড়িয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিল—অবশেষে তাহার অলৌকিকত্ব-পরীক্ষার জন্য ভারত-সরকারের বেশ কিছু অর্থদণ্ড ঘটাইয়া যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ঘটনা সব দেশে, সব কালেই মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে, অলৌকিক উপায়ে অনেক সময়ে মানুষের বহু সাংসারিক কামনার পরিপূর্তিও যে না হয় তাহাও নয়। কিন্তু এগুলি বিশ্বাস করা এক কথা, আর এগুলিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অলৌকিক উপায়ে যদি কেহ রোগ সারাইতে পারেন বা নিঃসন্তানের পুত্র-জন্ম, বা বিপন্নের মোকদ্দমা-জয় প্রভৃতি অঘটন ঘটাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে এক ধরনের চিকিৎসক বা যাদুকরের সম্মান অবশ্যই দেওয়া উচিত এবং অনেক দেশে বোধ করি তাহাই দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা অন্য প্রকার। আমরা উক্তপ্রকার অলৌকিক শক্তিকে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি এবং ব্যতিরেকী ন্যায়ে যদি কোন সাধুসন্তের উক্ত ক্ষমতা না থাকে তাঁহাকে নিম্নস্তরের বলিয়া গণ্য করি। এই মনোভাব যে অশিক্ষিত জনসাধারণের তাহা নয়, শত শত 'উচ্চ'-শিক্ষিত ব্যক্তিও অতীন্দ্রিয়তাকে শুধু ম্যাজিকের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝিয়া থাকেন। ফলে মাঠে বাটে গাছতলায় অথবা গৃহ-প্রাঙ্গণে 'নেপালবাবা' এবং সাম্প্রতিক 'খ্রীষ্টান যোগী'র দলের আসর জমাইতে কষ্ট পাইতে হয় না। দু চার সপ্তাহ বা মাস 'বিশ্বাসী'দের চোখে ঠুলি দিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিলেও অনেক কিছু গুছাইয়া লওয়া যায়।

ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই অতীন্দ্রিয় বস্তু, উহাদের উপলব্ধির পথেও অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের আলোর প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়—কিন্তু এই অতীন্দ্রিয়তার সহিত সুনীতি ও সুপরীক্ষিত যুক্তির কোন বিরোধ নাই। যে অতীন্দ্রিয়তার লক্ষ্য ঈশ্বরানুভূতি উহা নিশ্চিতই বৈষয়িক স্বার্থের সহিত জড়িত থাকিতে পারে না। অতএব যদি কোনস্থলে দেখা যায় সাংসারিক লেন-দেনেরই আড়ম্বর বেশী, আচরণ ও কথা চিরপ্রচলিত নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধাইতেছে—যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে না, তাহা হইলে সেই 'অতীন্দ্রিয়তা' হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়।

আমাদের দেশে 'অলৌকিক ঘটনা'রও বিজ্ঞান (Science) একদিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে নানাবিধ বিভূতির আলোচনা আছে। চিত্তসংযমের ফলে এই সকল শক্তি যোগীর নিকট উপস্থিত হয় এবং কি কি বস্তুতে চিত্ত একাগ্র

করিলে কোন্ কোন্ শক্তির অধিকারী হওয়া যায় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এ কথা নাই যে, এই বিভূতিই আধ্যাত্মিকতা। সাধনার ক্রমে উহারা যোগীর নিকট উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু যোগী উহাদের কোন পারমার্থিক মূল্য দেন না। বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি জ্ঞান—এই সবগুলিই অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য—বিভূতি নয়। সত্য বটে, কোন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে কাতর হইয়া কখনও কখনও তাহার ব্যাধি বা অন্য কোন বিপদের মুক্তির জন্য যোগবিভূতি প্রয়োগ করিয়াছেন—কিন্তু উহাই তাঁহাদের মহাপুরুষত্বের পরিচায়ক নয়। দেখা গিয়াছে তাঁহারা নিজেরাই সঙ্কটত্রাণার্থীকে বলিয়া দিতেছেন যে, তাহাদের বিপন্মুক্তি বাস্তবিক পক্ষে শ্রীভগবানের দয়াতেই সম্ভবপর হইল, অতএব তাহারা যেন তাঁহাকে না ভুলে, তাঁহার নাম চিন্তা ধ্যান যেন অভ্যাস করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'সিদ্ধাই' (যোগবিভূতি)-কে বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণ্যই মনে করিতেন। সকল মহাপুরুষেরই এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রের যখন ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপন ছিল, ধর্মজীবনের প্রতি মানুষের যখন একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, তখন মানুষ কোনটি সার কোনটি অসার তাহা বুঝিত, কাহার দাম এক টাকা আর কাহার মাত্র এক পয়সা তাহা জানিত। সে বিচার করিত, পরীক্ষা করিত, তাহার পর কোন কিছুকে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিত। তাই অতীন্দ্রিয়তার অর্থ ছিল তখন সুস্পষ্ট। অতীন্দ্রিয়তার সুযোগে হীন স্বার্থ তখন মানুষকে ঠকাইতে পারিত না। তখন যোগী ছিল, ম্যাজিকওয়ালাও ছিল, কিন্তু ম্যাজিকওয়ালা যোগীর ছদ্মবেশে আসিলে ধরা পড়িয়া যাইত। আজ কিন্তু ধরা পড়ে না; পড়িলেও অনেক বিলম্বে অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়া পড়ে। কারণ আমরা শাস্ত্র পড়ি না, শুনি না—ধর্ম জিনিসটা কি তাহা তলাইয়া দেখি না, দেখিবার সময়ও নাই; ফলে হয় আমরা অতীন্দ্রিয় বলিতে যাহাকিছু সব (ভগবান, আত্মা, ধর্ম, পরলোক ইত্যাদিও) হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া পুরাপুরি নাস্তিক বনিয়া যাই, নয়তো সাধারণ বুদ্ধি যুক্তি পরীক্ষা প্রভৃতি তালাবন্ধ করিয়া বিচারহীন বিশ্বাসে 'বিরিঞ্চিবাবা'র শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করি। 'অতীন্দ্রিয়তার' বৃহৎ ধামা আমাদের চোখ হইতে অসংখ্যপ্রকার ছল চাতুরী দুর্নীতি প্রবঞ্চনা চাপা দিয়া রাখে।

সাহিত্যে সন্ন্যাসী

জর্জ ইলিয়ট্ তাঁহার 'রমলা' (Romola) উপন্যাসে বিশেষভাবে যে দুটি সন্ন্যাসীর (সাভোনারোলা ও ফ্রা লুকা; প্রথমোক্ত জন অবশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি) চরিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহাদের বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং চরিত্রবল পাঠকের হৃদয়কে অভিভূত করে। আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত 'থাই' (Thais) গ্রন্থের উপজীব্য সন্ন্যাসজীবনের উত্থানপতনের কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে সংসারত্যাগীদের কথা আছে—'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম গোস্বামী, 'সীতারাম'-এর 'পরমযোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী', 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দপ্রমুখ ত্যাগব্রতধারী 'সন্তানগণ'। 'অ সামাজিক' হইলেও ইঁহারা সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন, 'সামাজিক' নরনারীর সেবা করিতেছেন, তাহাদিগকে সুপরামর্শ দিতেছেন। 'বিষবৃক্ষে' 'ব্রহ্মচারী'র বর্ণনা ও কথোপকথনে গৃহত্যাগী তাপসের এই লোককল্যাণব্রত কী সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে!

পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন-রেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ—কতক কতক শ্বেতবর্ণ। একহাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। * * * পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময় হইল—পথিক কোথায় পথ,

কোথায় অপথ কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান।

শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ নেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাঁহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, তাঁহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারেন না।

* * *

সূর্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।" ব্রহ্মচারী।—আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' এবং স্পর্শমণি' কবিতাদ্বয়ে বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত এবং বৈষ্ণবসন্ন্যাসী সনাতনের কামকাঞ্চননিস্পৃহ ঊর্ধ্বতর জীবনসাধনার যে মহিমময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সত্যই অনুপম। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'ও এক সেবাব্রতী যুবক সন্ন্যাসীর সুন্দর ছবি দেখিতে পাই।

'বাঙলার মোঁপাসা' প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় কিন্তু সন্ন্যাসী জীবটিকে সিধাভাবে দেখিতে পারেন নাই। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নায়ককে প্রথমে সন্ন্যাসী সাজাইয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইয়াছেন। আর একখানি বইতেও সপরিবারে লঞ্চে ভ্রমণ-রত জনৈক ভদ্রলোক কর্তৃক ঝড়ে নৌকাডুবির ফলে জলমগ্ন এক সন্ন্যাসীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া অনূঢ়া কন্যার দ্বারা সেবাশুশ্রূষার পর সেই কন্যার সহিত পরিণয় ঘটাইয়া গল্পের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এই যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী বেচারীও উচ্চশিক্ষিত, শুধু তাহাই নয়, ইনি আবার বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী! উচ্চশিক্ষার সহিত ত্যাগবৈরাগ্যের একত্রাবস্থান যেন 'বাঙলার মোঁপাসা'র দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব।

উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাহিত্যের উপাদান হিসাবে সন্ন্যাসীও বাদ পড়েন না। কোন কোন সাহিত্যে তাঁহার জীবনাদর্শটি উজ্জ্বল করিয়া দেখানো হইয়াছে, কোথাও কোথাও তিনি শুধু পাঠকের ঘৃণা ও ব্যঙ্গরসের বস্তু হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গৌরব বা লাঞ্ছনা নির্ভর করিয়াছে সাহিত্যস্রষ্টার মানসিক এবং আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাস্তবিকপক্ষে সংসারবাসী শত শত নরনারীর কাছে এক বিরাট কৌতূহল বা উপেক্ষার পাত্র। তাঁহার জীবন-মর্ম অনেকেরই নিকট বোধগম্য নয়। অনেকেরই নিকট তিনি শুধু পরান্নভোজী নিষ্কর্মা 'সমাজের ভার'। সংসারের এই 'মেজরিটি'র মনোভাব তাহাদেরই চিত্ত-বিনোদনের জন্য সৃষ্ট সাহিত্যে যে প্রতিফলিত হইবে ইহা ইহা স্বাভাবিকই। আজকাল তাই দেখিতে পাই, বহু গল্পে উপন্যাসে আদিরস বা হাস্যরস সঞ্চার করিবার প্রয়োজনে কোন আশ্রম এবং আশ্রমবাসী সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র বাছিয়া লওয়া হয়। সেই আশ্রমে আশ্রমবাসিনীরও অবতারণা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বাঙলা কথাসাহিত্যের এই ক্রমবর্ধমান হাল্কা ধারাটির দিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পড়া উচিত। সু এবং কু জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আছে। একটি সুচিরপ্রতিষ্ঠিত বহু-গৌরবান্বিত আদর্শের বিকৃতির দিকটিকেই সাহিত্যের উপজীব্য করিয়া জনচিত্তবিনোদনের সহজ চেষ্টা নিশ্চিতই জাতির ঐতিহ্যরক্ষার অনুকূল নয়।

প্রেক্ষাগৃহের অভিজ্ঞতা

সমীর বাবু একদিনকার প্রেক্ষাগৃহের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন। শাসকরূপে সাহেবরা এই দেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে কিন্তু সাহেবিয়ানার

রূপ-রস-গন্ধ জায়গায় জায়গায় দৃঢ়মূল করিয়া বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই চৌরঙ্গীর প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বসিয়া বিদেশী ছবি দেখিবার ভিড় সমানেই লাগিয়া থাকে। সমীরবাবু সেদিন 'মেট্রো'তে গিয়াছিলেন আভিজাত্যের হাওয়া লাগাইবার মোহে নয়, খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রথম দিককার সুখ-দুঃখ আশা-সংঘর্ষের করুণ কাহিনী-সম্বলিত বহু-প্রশংসিত 'কোন্ পথে যাও' (Quo Vadis) চিত্রটি দেখিতে—ঐতিহাসিক এবং ধর্মানুরাগীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই। পর্দার ছবি দেখিয়া অবশ্যই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পর্দার সম্মুখে বৃহৎ হলঘরে সারি সারি সজ্জিত দর্শকবৃন্দের আসনে আর একটি যে চিত্র চোখে পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার চিত্তকে বিষম বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। যাঁহারা ছবি দেখিতে আসিয়াছেন —তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বাঙ্গালী-মাদ্রাজী-গুজরাটী-মাড়োয়ারী-পাঞ্জাবী-পার্শী-অ্যাংলোইণ্ডিয়ান —তাঁহারা সকলেই ভারতবাসী, কিন্তু সমীরবাবুর মনে হইল তিনি যেন ভারতবর্ষে বসিয়া নাই। তাঁহার আশে আশে সম্মুখে পিছনে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদের অনেকেরই জন্ম যেন ভারতের মাটিতে নয়। কি পোষাকে, কি চালচলনে, কি চাহনিতে, কথাবার্তায় একটি উগ্র বৈদেশিক গন্ধ যেন সবস্থানে বাহির হইতেছে! ভারত যখন বিদেশীর অধীন ছিল তখন এই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকমণ্ডলী যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বসিতেন এখনও ঠিক একই পরিবেশ। লোকগুলির গায়ের চামড়াই শুধু সাহেবী-সাদা নয়।

চকিতে সমীরবাবুর দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া যেন তাঁহাদের ভিতরকার মনকে দেখিতে সমর্থ হইল। সমীরবাবুর মনে হইতেছিল আজাদ্ হিন্দুস্থানের এতগুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রাদেশিক আচারব্যবহার সম্পন্ন নরনারী যাঁহারা প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ভারত-সংস্কৃতির কোন যোগসূত্র নাই, তাঁহাদিগকে এখানে এক করিয়াছে 'পাশ্চাত্ত্যরুচি।' প্রশ্ন জাগিতেছিল, আজ প্রেক্ষাগৃহে যাঁহারা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের রোমান রীতিনীতির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, খ্রীষ্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ, খ্রীষ্টীয় শহীদদের ত্যাগ ও বিশ্বাসের নিদর্শন ছবিতে প্রত্যক্ষ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ আবেগে 'আহা' 'আহা' করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ভাল করিয়া জানেন, কয়জন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত? ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট 'খানাপিনা ও ডেরা' দিবার একটি ভৌগোলিক ভূমিবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানকার ধর্ম, এখানকার ইতিহাস, এখানকার সমাজ-শিল্প-সাহিত্য, মঠ-মন্দির-দেবতা—এ সকলের সহিত গভীর তাদাত্ম্যবোধ এই প্রেক্ষাগৃহবিলাসীদের মধ্যে কয়জনের আছে? আমরা যখন পরাধীন ছিলাম তখন 'স্বাদেশিকতা' কথাটি লইয়া ভাবিতাম—দেশীয় রুচি, দেশীয় আদর্শ, দেশীয় পোষাক, দেশীয় খাদ্য, দেশীয় ভাবধারার মর্যাদা দিতাম। আজ কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়া সেই দৃষ্টি আমাদের নাই। স্বাদেশিকতার সাধনা যেন আমাদের শেষ হইয়াছে। ইংরেজরা রাষ্ট্রাধিকার হইতে সরিয়া যাক্ এই টুকুই যেন ছিল আমাদের আজাদীর লক্ষ্য। আজ যেন আমরা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারি। ভারতবর্ষে বাস করিয়া যেন তেন প্রকারেণ ছলেবলেকৌশলে একটা মোটা মাহিনার চাকুরী বা মোটা টাকার অন্য কোন রোজগারের পন্থা লইয়া পাশ্চাত্ত্যের ভোগ-বিলাস যতটা পারা যায় নিংড়াইয়া জীবনযাপন করিতে পারিলেই যেন স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা-গিরিতে কোন ফাঁক রহিল না। আর কোন দায়িত্ব নাই, আর কোন অন্বেষণ নাই, আর কোন কর্তব্য নাই। সমীরবাবু আরও ভাবিতেছিলেন, এই পোষাকে-সাহেব মনে-সাহেব ভারতীয়তাশূন্য ভারতীয় অভিজাতম্মন্যগণের মধ্যেই হয়তো এমন বহু

আছেন যাঁহাদের উপর সরকারীভাবে দেশবাসীর শিক্ষা ও সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের ভার আজ রহিয়াছে বা কাল থাকিবে। ইঁহারা এদেশের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে ভারতীয়ভাবে কতটা পরিচালিত করিতে পারিবেন ?

সমীরবাবুর অভিজ্ঞতায় যে নিরাশা এবং আশঙ্কার কালো ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কিছুটা হয়তো তাঁহার মনঃকল্পিত—কিন্তু ঐ চিত্রের মধ্যে যে অনেকখানি বাস্তবতা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা আলাদা জিনিস। দেহের গোলামি অপেক্ষা মনের গোলামি অনেক বেশী মর্মান্তিক নয় কি ?

সংস্কৃতশিক্ষা-প্রসঙ্গে

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সংস্কৃত সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু সংস্কৃতকে আবশ্যক (Compulsary) শিক্ষণীয় বিষয় করিবার বিপক্ষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন :—

"প্রাচীন ভারতকে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা কাজে লাগে বটে, কিন্তু ছাত্রগণের জন্য ঐ ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করিবার আগে উহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আটচল্লিশ-বৎসর পূর্বে আমি যখন ইংলণ্ডে পড়াশুনা করিতেছিলাম তখন লাটিন ও গ্রীককে আবশ্যক শিক্ষিতব্য বিষয় করা হইবে কিনা ইহা লইয়া ঐ দেশে একটি বিতর্ক উঠিয়াছিল। ইওরোপীয় সংস্কৃতির উপর ঐ দুটি ভাষার প্রভূত প্রভাব আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক মনীষী তখন মত দিয়াছিলেন যে, বিদ্যার্থিগণের উপর ঐ ভাষাদ্বয় জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নয়।"

আমাদের মনে হয়, ইওরোপীয় সংস্কৃতির উপর লাটিন ও গ্রীক্ ভাষার প্রভাব ও ভারত-সংস্কৃতির উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সমপর্যায়ের নহে। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার (লোকসভার সহকারী স্পীকার) যথার্থই বলিয়াছেন :—

"সংস্কৃত গ্রীক ও লাটিনের ন্যায় মৃত ভাষা নয়। শেষোক্ত ভাষাদুটির জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না, সংস্কৃত কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎসস্বরূপ।"

'ছাত্রদের উপর জোর করিয়া চাপানো'—নেহেরুজীর এই উক্তিতে একটি ফাঁক আছে। যে বয়সে বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে পড়ে, সেই বয়সে পাঠ্যনির্বাচনের যুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কতটুকু ধারণা থাকে ? কি পড়া উচিত, না উচিত এ বিচারের ভার কি বিদ্যার্থিগণের, না শিক্ষাধারার ব্যবস্থাপকগণের—যাঁহারা জাতির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণকে জাতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব লইয়াছেন ? দরকার হইলে জোর করিয়া তিক্ত ঔষধও রোগীকে খাওয়াইতে হয়, সামরিক প্রয়োজনে ভাল লাগুক, না লাগুক প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে আইন করিয়া সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া লইতে হয়। তেমনিই শিক্ষার মাধ্যমিক অবস্থায় তিন বা চার বৎসর যদি ভারতীয় বিদ্যার্থীর পক্ষে সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্যই করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে 'জোর করিয়া চাপানো' বলে না। উহা আদৌ সময় নষ্ট নয়, অত্যাচারও নয়। যদি পরবর্তী জীবনে ইস্কুলে অধীত সংস্কৃতের অধিকাংশই কোন ছাত্র ভুলিয়াও যায়, তাহাতেও ঐ ভাষাশিক্ষার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। সে তো রসায়নশাস্ত্রও ভুলিতে পারে, জ্যামিতি ভূগোলও ভুলিতে পারে। যেটুকু তাহার মনে থাকিবে তাহা দ্বারা তাহার সাংস্কৃতিক জীবনের বহুল উপকার সাধিত হইবে। সুযোগ ও অবসর মতো ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য নীতি সম্বন্ধে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীগুলির সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা তাহার থাকিবে। (অনুবাদ পড়িয়া গভীরে যাওয়া যায় না, সংস্কৃত শব্দের ও বাক্যের অন্তর্নিহিত রসের ও শক্তির উপলব্ধি হয় না।) এই পরিচিতি বিদ্যা-বিলাস নয়—ভারত-সন্তানের অবশ্য কর্তব্য।

কালবৈশাখী

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

বৈশাখ-শেষে উড়ায়ে আকাশে পিঙ্গল জটাজাল
রক্তনয়নে হানে সঙ্কেত, এল কি রে মহাকাল ?
ঈশানের কোণে বাজিছে বিষাণ দ্রিমিকি দ্রিমিকি রবে
মসীময় কালো আঁধার ঘনালো সহসা ঢাকিল সবে।
কালবৈশাখীবেশে ভৈরব আসে বুঝি ঐ আসে
স্তব্ধ ধরণী নির্বাক চায় অপলক-চোখে ত্রাসে।
দুলিছে হস্তে অতি প্রচণ্ড পিনাক ভয়ঙ্কর
সংহার-মাখা অট্টহাসিতে কম্পিত চরাচর।
বিদ্যুৎ ছোটে ত্রিনয়নকোণে স্ফুলিঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে
বিদীর্ণ ঐ গগন-প্রান্ত হতে নামে ধরাসনে।
প্রমত্ত ঝড় গরজিয়া ধায় শন্ শন্ মহাবেগে,
হাড়-মালা ছাল নরকঙ্কাল খসে পড়ে দশ দিকে।
তাথৈ তাথৈ দেন করতালি তাণ্ডবে ধূর্জটি
ডম্ ডম্ ডম্ ডম্বরু তালে নাচিছে চরণ দুটি।
অসংখ্য ধারা পড়ে আছাড়িয়া প্রলয়ের কলরোলে
নিঃশেষে বুঝি মিশে যাবে সব মহাকাল-পদতলে।
জীবন-মৃত্যু চরণে দলিয়া করিছ কি প্রভু খেলা ?
থামাও থামাও নৃত্য তোমার হে নটরাজ ভোলা।
প্রলয়-বিলাস হেরি শঙ্কায় চিত্ত মোদের কাঁপে
হর হর তব ভয়হর নাম রসনা সতত জপে।
রুদ্ররূপী হে কালবৈশাখী সম্বর ক্রোধ তব
আঁধার সরায়ে হও প্রকাশিত সুন্দর সৎ শিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ

(এক)

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজন্মজয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত।)

পুণ্যশ্লোকা শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীতে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভে আমি আনন্দিত। সকল যুগের সকল নরনারীর হিতার্থে যাঁহারা সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতে আমি আজ এখানে আসিয়াছি। বাস্তবিক, আমাদের বর্তমান সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীমার পবিত্র জীবনের বড়ই প্রয়োজন। আমরা এই যুগে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া লক্ষ্যহারার মতো পথ চলিতেছি। এইরূপ দুর্দিনে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। আমাদের সকলেরই এই বাণী শ্রবণ করা কর্তব্য। শ্রীমা সরলতা ও সত্যের প্রতিমূর্তি। আজিকার জগতে মানবজাতি যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, এগুলির যথার্থ মীমাংসার জন্য সরলতা ও সত্যেরই সর্বাধিক প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনও এখন বহুসমস্যাসংকুল। ইহা খুবই সত্য যে, সমস্যাসমূহের অনেকগুলি রাজনৈতিক। আমাদের জীবনকে অধিকতর সুন্দর ও শুভময় করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এমন কি, রাষ্ট্রনীতিও বহুলাংশে নৈতিক প্রশ্ন ও ধার্মিক বিচার-সাপেক্ষ। কতকগুলি নৈতিক মান পরিবর্জন করার ফলেই রাষ্ট্রিক সমস্যাসমূহ অনেকাংশে সমুদ্ভূত। বর্তমান সংকটকালে গভীর চিন্তা ও স্থৈর্যের সহিত আমাদিগকে সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যে-সকল যুগন্ধর মহামানব আমাদিগকে জীবনাদর্শ দেখাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাণী অনুসরণ করিয়াই আমরা আমাদের জীবনকে যথার্থ বুঝিতে পারিব। ভারত, সিংহল ও এসিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ পরম ভাগ্যবান যে, তাহাদের মধ্যে লোকোত্তর মহাপুরুষ ও বড় বড় নেতৃবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের বাণী আমরা উপেক্ষা করিয়াছি, কারণ তাঁহাদিগকে ধীর স্থির ভাবে বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। বর্তমান জগতের অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, কি ব্যষ্টির জীবনে অথবা সমষ্টির জীবনে কূটবুদ্ধিপ্রসূত উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কিছু কিছু ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাও উপর উপর। বস্তুর যথার্থ মূল্য-অবধারণার মূলে যে গভীর সত্য রহিয়াছে—উহা এবং প্রাত্যহিক জীবনে উহার ব্যাখ্যা—এই দুটিই কেবল আমাদিগকে পথের নির্দেশ দিতে পারে। যে-মুহূর্তে আমরা ইহা ধরিতে পারিব, স্বতঃই তখন আমরা আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া এক মহত্তর পৃথিবী গড়িয়া তুলিব।

এসকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা কর্তব্য। আমরা নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। আমরা অল্পে তুষ্ট, নিজেদের পারিবারিক সুখেই পরিতৃপ্ত। মানুষ আমরা, অতএব মানুষের মতোই আমাদের চিন্তাধারা থাকা উচিত। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে

ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে কেবল সংঘবদ্ধ বুঝাপড়া ও পারস্পরিক প্রেমই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে এইসকল নিহিত আছে, আর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন জগতের নিকট ইহা প্রচার করিতেছেন। যদি আমরা মুক্তি চাই, তবে আমাদের প্রয়োজন এই প্রেমের—যে প্রেমের বার্তা ভারতে ও সিংহলে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য মুনি-ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট বাণীগুলি যদি আমরা জীবনে অনুসরণ করি, তাহা হইলে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার এক সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে পারিব। আজকাল এরূপ বুনিয়াদের একান্তই অভাব। শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাসের উপযোগী অবস্থার পরিবর্তে আমরা পাইতেছি নিত্য নূতন নূতন মারণাস্ত্র-আবিষ্কারের ভীতিপ্রদর্শন। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এইসকল আবিষ্কার পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবে। আরও অধিকতর ধ্বংসকারী আণবিক অস্ত্র-আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, কারণ আমাদের ভয় এই যে, আমাদের শক্তিশালী আণবিক বোমা অপেক্ষা অন্যে অধিকতর বিধ্বংসী বোমা প্রস্তুত করিতে পারে। মানবজাতিকে বাঁচিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ প্রেম ও শুভেচ্ছার দরকার। আমরা এমন সময়ে বাস করিতেছি যখন আমাদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, যাহার ফলে ভারতের স্বাধীনতালাভ হইল। সেই সময়ে লোকে বলিয়াছিল—এত বড় ক্ষমতাশালী ব্রিটিশ জাতির সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমরা কি করিতে পারিব? কিন্তু ভারতের নরনারীগণ অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সাহায্যে জড়শক্তিতে বলীয়ান ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সেই সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণের ও ভারতীয় ঋষিগণের শিক্ষাই প্রচার করিয়াছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের প্রথম কাজ হইয়াছিল ব্রিটিশদের নিকট আমাদের বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করা।

বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই দৃঢ়তর অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে সচেষ্ট, কারণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো লড়াইয়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের দেশের ও পৃথিবীর যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারিবেন—এরূপ লোকদেরই দরকার। অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা সুসংগত অভিমত আছে যে, এই জড়জগতে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে মস্তবড় কিছু পাইবার আশা বৃথা। প্রথমতঃ আমাদিগকে এই আধ্যাত্মিক শক্তি কি তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, সেই শিক্ষাই অধুনা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান প্রচার করিতেছে, কারণ এই সংস্থা ন্যায় ও সত্যের পতাকাই বহন করে, আর এই শিক্ষাই আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের প্রেম থাকিবে। অন্যায় ও ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিলেই প্রেম জন্মিবে। স্বার্থচিন্তা না করিয়া চলুন আমরা নৈতিক উন্নয়নের কথা বেশী ভাবিতে থাকি। উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুসারে মানুষের জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেই মানবজাতি সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

(দুই)

অধ্যাপক এস্ বেঙ্কটরমণ

(অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়)

(বিশাখাপত্তনম্ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ; অনুবাদক—শ্রীনৃত্যগোপাল রায়)

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় দেবমানব সহস্র বৎসরে দেশে দু'একবারই মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

তুলনা পাই গৌতম বুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দু আধ্যাত্মিকতা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম বিধি ও সূত্রের গোঁড়ামির কলরবে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই সে সময়ে ইওরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু উপদেশ দ্বারা নহে— স্বীয় সাধনাদ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় এবং বিভিন্ন আদর্শবাদের ঐকতান আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও গোঁড়ামি ছিল না—তিনি প্রচার করিলেন যে, সকল ধর্মমতেরই সারাংশ সত্য। কঠোর নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত-অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনটি পন্থা অনুসরণ করিতে তিনি উপদেশ দেন— কখনও ঈশ্বরানুরক্তি মন্দীভূত হইতে না দেওয়া, ভগবদ্ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা, আর শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পথের আলো জ্বালিয়াছিলেন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যেরা সেই আলোকশিখা অনির্বাণ রাখিয়াছেন— ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নৃশংস লক্ষ্য যখন সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বশান্তির জন্য সেই জ্যোতিঃশিখা জগতের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া দেওয়াই একমাত্র অপরিহার্য পথ।

(তিন)

শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী

(বিশাখাপত্তনম্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতি অন্ধ্র-রাজ্যপালের ভাষণ হইতে সঙ্কলিত; অনুবাদক— শ্রীনিত্যগোপাল রায়)

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের পক্ষে হিন্দুসংস্কারের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির ধারা অধোগামী হইয়া নিম্নতম খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে—ফলে বহুবিধ অশুভ ও অনিষ্টকর সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ সুদীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্বের চাপে এবং পরে ব্রিটিশ প্রভুত্বের আওতায় মিশনারিগণের জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার বদ্ধপরিকর প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুগণ— তথা হিন্দুধর্ম নিতান্ত দীনহীনভাব পরিগ্রহ করে। এইরূপ অবস্থায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে কতিপয় প্রথিতযশা মনস্বীর জন্মগ্রহণ আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় এবং দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুধর্মকে অমঙ্গলকর বহুবিধ কুপ্রথার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ই কালক্রমে নিথর হইয়া পড়িল। উভয় সম্প্রদায়ই প্রভূত সার্থক ও মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিল, কিন্তু কালের বিচারে তাহাদের উপযোগিতা সেই সেই যুগের পরিসরের সীমানায়ই পর্যবসিত। পক্ষান্তরে দয়ানন্দ সরস্বতী ও রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে আমরা যাহা পাই না, শ্রীরামকৃষ্ণে আসিয়া আমরা তাহাই পাই— তাঁহার কাছ হইতে আমরা যে শিক্ষা ও বাণী পাইলাম আজও তাহা যেমন জীবন্ত তেমনি অমোঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে যে বাণী, যে জীবনবেদ প্রদান করিলেন, তাহা তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য দীপ্তি উজ্জ্বলতম। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শুধু আমাদের স্বদেশেই নহে— আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশবিদেশেও বহু আশ্রম ও মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্বে নাগপুরে আমার রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিবার প্রথম সুযোগ ঘটে। সেই সময় হইতে আমি পাঞ্জাব, ওড়িষ্যা, অন্ধ্র যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই এই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার যে দিকটা আমাকে সর্বাধিক আকৃষ্ট

করে তাহা হইল সেবার ভাব— যে ভাবের তন্ময়তায় তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন এবং যে ভাবটি তিনি প্রচার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু হইলে এবং কর্মী নিষ্ঠাবান হইলে কোন সৎকার্যই অর্থাভাবে ব্যাহত হয় না। রামকৃষ্ণ মিশনে যে সন্ন্যাসিবৃন্দ রহিয়াছেন তাঁহারা অনিন্দনীয় আদর্শকর্মী এবং আমি আশা করি তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা সহজেই পাইবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সৎকার্যে সাহায্য করা এবং অর্থাভাবে বা কর্মীর অভাবে সেইসব সৎকার্য যাহাতে কখনও প্রতিহত না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ নিজে যতই কর্মব্যস্ত হউক না কেন, মাঝে মাঝে অপরের ভাবনা ভাবাও তাহার কর্তব্য। শান্তি এবং চিত্তের নিরুদ্বেগ ভাব লাভ করিতে আত্মসমাহিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করা এবং ধ্যানাভ্যাস সততই কল্যাণকর। যে মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আজ আমরা সম্মান প্রদর্শন করিতেছি সেই মহাপুরুষের কোন কোন শিক্ষাও যদি আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে এবং অভ্যাসে রূপায়িত করিতে পারি, তবে আজিকার সান্ধ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যথার্থই অনেকাংশে সার্থক হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী মীরা সিংহ, এম্‌-এ

ভারতকে আপনার প্রকৃত সংস্কৃতি ও সত্তা, অর্থাৎ অধ্যাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং এই অপূর্ব শক্তিতে মহীয়ান হ'য়ে সুদূর ভবিষ্যতে একমাত্র ভারতই পারবে সমস্ত জগতের সমস্যার সমাধান করতে—এ কথা আজ আমাদের অনেক চিন্তাশীল মনীষীই বলে থাকেন। পৃথিবীর সকল দেশ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের শেষ সীমায় এসে এমন এক জায়গায় পৌঁছবে, যেখানে সকলে নির্বাক ও নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে। এই বিস্ময়ের সমাধান ক'রতে, এই বিরাট প্রশ্ন উপলব্ধির পথ দেখাতে, তখন এগিয়ে আসবে এই ভারত। সন্ধান দেবে এমন সত্যের যার পর নেই কোন জিজ্ঞাসা, নেই কোন বিক্ষোভ ও অতৃপ্তি। তার পর আছে কেবল পরম শান্তি ও বিশ্বাস। পরমহংসদেব ভারতের এই চিরন্তন সংস্কৃতির একটি রূপ ও পরিচয়। বিজ্ঞান যেখানে অচল, বিজ্ঞান যেখানে পঙ্গু, সেখান হ'তে শুরু হ'য়েছে ভারতের সাধনা। অজ্ঞতার তিমিরে ভারতের এই সাধনা লুপ্তপ্রায় হ'তে বসেছিল। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আসলেন অবিশ্বাস-সংক্ষুব্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগৃতি দিতে।

যে চরম ও পরম সত্যকে বিজ্ঞান প্রমাণ ক'রতে পারেনি, তা তিনি তাঁর জীবনমহাকাব্যে প্রত্যক্ষ ক'রে তুললেন। তিনি ধর্মকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে তাঁর কর্মধারা কবিতায় পরিণত ক'রলেন। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে ছন্দ, তা ছন্দ নয়; পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে সঙ্গীত, তা সঙ্গীত নয়;—কবিতা, ছন্দ ও সঙ্গীত ওতপ্রোত ভাবে পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে থাকবে, তবেই হবে তাদের প্রকৃত বিকাশ। ঠিক এই কারণেই সাধারণ জীবনযাত্রার সাথে অসাধারণের, লৌকিকের সাথে অলৌকিকের, সংসারের সাথে সন্ন্যাসের সংমিশ্রণে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিস্ফুটন হ'য়েছে। বিভিন্ন ভাবের ও বিপরীত রসের সমাবেশে তিনি এক মহাসম্পূর্ণতা এনেছেন। তাঁর এই মহাসঙ্গীতে তিনি জগতের সুন্দরতম সৃষ্টি নারীকে কোনমতেই বাদ দিতে

পারেন না। বুদ্ধদেব ও নিমাইয়ের সাধনা গোপা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে একপ্রকার বাদ দিয়েই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখি। তিনি স্বেচ্ছায় সারদাদেবীকে গ্রহণ ক'রলেন, দেহকে অবলম্বন ক'রে দেহাতীত হওয়ার সুকঠোর ব্রত অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর জীবন-মহাকাব্যে এমন এক আদর্শ-প্রতিষ্ঠা ক'রলেন যা নর-নারীর ইতিহাসে অভাবনীয় ও অশ্রুতপূর্ব। এতে নর-নারীর মিলনের মত্ততা নেই, কেবলমাত্র ভোগ ও লালসা নেই। এতে আছে পুরুষ ও নারীর Spiritual Union বা আত্মিক-মিলন। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই আমরা মুগ্ধ হই শ্রীমায়ের নীরব সহায়তা দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকে সুষ্ঠু করতে আমরা মায়ের অপূর্ব ধৈর্য, প্রেম ও মহত্ত্বপূর্ণ নারীত্বের পরিচয় পাই।

ষোড়শীপূজার দিন পরমহংসদেবের কাছ হ'তে শ্রীমা নারীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পেলেন। ইহা যথার্থ যে, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারবঞ্চিতা নারীকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঠাকুরের সারদাদেবীকে গ্রহণ ও ষোড়শীপূজা-কল্পনা। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃত্বে। সারদাদেবী ষোড়শীপূজার দিন, সকলের আধারভূতা এই মাতৃরূপে বিভূষিতা হ'লেন। সীতা সতীত্বের প্রতীক, রাধা প্রেমের আধার, কিন্তু সবকিছুর মিলিত সার্থকতা নিয়ে শ্রীমায়ের মাতৃরূপ ফুটে উঠল। এখানে তিনি অতুলনীয়া। "আমি পাতান মা নই, কথার কথা মা নই—আমি সত্যিকারের মা।" এই মাতৃত্বে ধনী, দরিদ্র, সজ্জন দুর্জন, দুর্বল ও শক্তিমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পরমহংসদেবের কাছে বাছবিচার আছে, কিন্তু শ্রীমায়ের কাছে পাপী তাপী যে কেউ 'মা' বলে ডেকে কখন ফিরে যায় নি। শ্রীমায়ের মাতৃত্বকে, এই 'ক্ষমারূপ তপস্যা' মাধুর্যে পূর্ণ ক'রেছে। তিনি ব'লতেন, "কারু দোষ দেখতে পারতুম না, ওটি শিখি নাই।"

র দিন ঠাকুর শ্রীমাকে সর্বগুণে ভূষিত ক'রলেন। কিন্তু মায়ের বিশেষত্ব এই যে তিনি অসাধারণ হয়ে রইলেন না, সাধারণের সাথে সুন্দরভাবে মিশে চললেন। দৈনন্দিন সংসারের কাজের কোন ত্রুটি রাখলেন না, অথচ তারই মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর অন্তঃস্থিত দেবীর পূজা করে যেতে লাগলেন। তাঁর জীবনে আমরা দেবী ও মানবীর অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই। এখানে সহজ ও অসহজের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সারদা-দেবীর সাধনা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়। পৃথিবীর শোকতাপ দুঃখকষ্টের সাথে নিজেকে জড়িয়েই তাঁর দেবীত্ব। সাধারণ বাঙ্গালী কুলবধূর মত তিনি সংসারের সকল কাজ করতেন। কিন্তু এইটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ এমন এক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সাথে ক'রতেন যে, তা পূজার অর্ঘ্যের মতই প্রতিভাত হ'য়ে উঠত। এমনিভাবে সব সাধারণ কাজের মধ্যেও ক'রতেন পরমসুন্দরের ধ্যান। তাই প্রতিটি কাজ তাঁর হ'য়ে উঠত পূজার ফুলের মত শুচিসুন্দর। প্রেম, স্নেহ, ত্যাগ ও সেবা তাঁর প্রতিটি ছোটখাট কাজের সাথে সুন্দরভাবে জড়িয়ে ছিল। সেবাধর্ম দিয়ে তিনি তাঁর নারীত্বকে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'সেবারূপিণী আনন্দময়ী'। স্বামিসেবা, অতিথিসেবা ও সন্তানসেবার মধ্য দিয়ে তিনি দেবী হয়ে উঠেছেন। শ্রীমায়ের মধ্যে আমরা এমন এক বিশেষত্ব দেখি যা উল্লেখ না ক'রে পারা যায় না। তাঁর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার কোনরকম চেষ্টা আমরা দেখি না। তাঁকে আমরা অল্পই ভাব-সমাধিস্থ হ'তে দেখেছি। চুপি চুপি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলত তাঁর সাধনা। তিনি সর্বংসহা মাতৃরূপে তাঁর সবকিছু ঢেকে রেখেছিলেন। মা ছিলেন যেন ছাইচাপা আগুনের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বাণী ও তাঁর আবির্ভাবকে সার্থক করবার জন্যেই সারদাদেবীর আগমন। শ্রীমা

ও পরমহংসদেব যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ব'লেছিলেন, "আমার শরীরটা চ'লে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে যেও না; শুধু কি আমার দায়? তোমারও দায়?" শ্রীমায়ের উপর সকল ভার দিয়ে পরমহংসদেব নিশ্চিন্তে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মা তাঁর অকৃত্রিম সেবা ও প্রেমে সন্তানদের অভয় দান করতে লাগলেন। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর তিনি সঙ্ঘের কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। স্বামীজী তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বিদেশে পরমহংসদেবের বাণী প্রচার করতে গেলেন। তাঁর মঙ্গলময় শুভেচ্ছা তাঁর সন্তানদের দিত সাহস, শক্তি, সান্ত্বনা, অনুপ্রেরণা ও পরমশান্তি।

নারীজাগরণের সন্ধিক্ষণে ঠিক এমনই এক নারীচরিত্রের একান্ত দরকার ছিল, যাকে আদর্শ করে নারী তার সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। পাশ্চাত্যের ভাবধারা অন্ধভাবে অনুকরণ ক'রে ভারতীয় নারীর রূপ হ'য়ে উঠবে অসুন্দর ও অসম্পূর্ণ। বৃক্ষের কাণ্ডকে বিনাশ ক'রে কোন প্রাণবন্ত ফল আশা করাই বৃথা। ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে নূতন ভাবধারার সংমিশ্রণ চাই। সারদাদেবীর মধ্যে আমরা এই সমাবেশ দেখতে পাই। পুরাতনের মাধুর্য ও নূতন যুগের ঐশ্বর্য নিয়ে শ্রীমায়ের রূপ। ভারতীয় নারী জাতির মূল আদর্শ মাতৃত্বকে অবলম্বন করেই ষোড়শীপূজা উদ্‌যাপিত হয়। আবার এই মূল আদর্শের সাথে মিলিত র'য়েছে শ্রীমায়ের বিশালতা, নব ভাবধারা গ্রহণের স্বীকৃতি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, "ভারতীয় নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা...... শ্রীশ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও নূতনের সার্থক সূচনা।"

এই নারীপ্রগতির যুগ এমন এক 'মাতৃতীর্থ' পেয়ে ধন্য।

জয়রামবাটীতে অবিস্মরণীয় উৎসব

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ইং ১৯২৪ সালে জয়রামবাটীতে ঠিক মায়ের জন্মস্থানের উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। পূজার জন্য বেদীর উপর মায়ের একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকদিন হতেই সাধু ও ভক্তদের বাসনা হয়, ঐ মন্দিরে মায়ের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৫১ সালের ১১ই মে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর ঐ ইচ্ছা আরও বলবতী হয় এবং মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ায় কাশীর এক সুদক্ষ ভাস্করের ওপর ঐকাজের ভার দেওয়া হয়। বর্তমান বছরে পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে, কাজেই মন্দিরে মূর্তিপ্রতিষ্ঠার এই বৎসরই সব থেকে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হয় এবং ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪ (বাংলা ২৫শে চৈত্র, ১৩৬০) বৃহস্পতিবার বাসন্তী সপ্তমীতিথিতে ঐ শুভকার্য সম্পন্ন হবে এইরূপ স্থির হয়। শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ঐ সময় জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর তীর্থযাত্রারও ব্যবস্থা করা হয়। এই উভয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রায় দুমাস পূর্বে যাত্রীদের আহার বাসস্থান ও উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করার জন্য দুইজন অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী জয়রামবাটী গমন করেন। জয়রামবাটী একটি ছোট

গ্রাম— মাত্র ৮০।৯০ ঘর সাধারণ গৃহস্থের বাস। কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন, প্রায় তিন সহস্র সাধু ও ভক্তের সমাবেশ হবে। ঐ ক্ষুদ্র গ্রামে তিন হাজার লোকের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে ওঁদের বিশ্বাস ছিল যে শ্রীশ্রীমায়ের কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন। মন্দিরের সামনে পূর্বে কোনও নাটমন্দির ছিল না— এবার মন্দির-সংলগ্ন একটি সুন্দর প্রশস্ত নাটমন্দির ও তদুপরি ছোট নহবৎখানা উৎসবের পূর্বেই নির্মিত হয়। এপ্রিলের ৭ই, ৮ই ও ৯ই এই তিনদিন উৎসব হবে স্থির হয়। উৎসবে যোগদানেচ্ছু ভক্তদের নিকট পূর্বেই ট্রেনের সময়, কি কি জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হবে তার তালিকা ইত্যাদি সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছিল। আগমনেচ্ছু ভক্তদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করে পাঠাবার জন্য একটি ফর্মও প্রেরিত হয়। ৬ই এপ্রিল হতে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত যাত্রীদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হবে একথাও জানানো হয়। উৎসবের কয়দিন পূর্বেই অনুসন্ধান অফিস, স্বেচ্ছাসেবক অফিস ইত্যাদি খোলা হয় এবং ৪ঠা এপ্রিল হতে ভক্ত ও সাধুসমাগম এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ চলতে থাকে।

গ্রামের লোকেরা সভা করে এই বৃহৎকাজে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করতে আশ্বাস দেয় এবং চালাঘর বাঁধবার জন্য জমি ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে। আমোদর নদী হতে মন্দির পর্যন্ত সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয়, তার দুপাশে দোকান, যাত্রামণ্ডপ, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। ভক্তদের থাকার জন্য রাস্তার দুপাশে মোট ২৮টি খড়ের লম্বা দোচালা কুটীর নির্মিত হয়—একপাশে ১৪টি মহিলাদের জন্য এবং অপর পাশে ১৪টি পুরুষ-ভক্ত ও সাধুদের জন্য। উহার নিকটেই টিউবওয়েল, সেফটি পায়খানা এবং সামনের দিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও খাওয়ার মণ্ডপ হয়েছিল। সাধুদের ঘর ছাড়া অন্য সবঘরে ইলেট্রিক লাইটের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন স্থান হতে চারিটি ডাইনেমো আনা হয় এবং আমোদর নদী হতে মন্দির পর্যন্ত প্রায় ২ ফার্লং রাস্তা, মন্দির, দোকান, বিভিন্নমণ্ডপ ইলেট্রিক আলোতে সজ্জিত করা হয়। স্থানীয় লোকরা এই প্রথম ইলেকট্রিক লাইট দেখে খুবই খুশী। উৎসবের কয়দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষুদ্র জয়রামবাটী গ্রাম একটি জনাকীর্ণ সুসজ্জিত শহরের রূপ ধারণ করত। স্নান ও পানীয়জলের বেশ ভাল বন্দোবস্ত ছিল। আমোদর নদীতে বাঁধ দিয়ে অনেক জল জমা করা হয়েছিল এবং মোট ১৪টি টিউবওয়েল বসেছিল। ধূলা বন্ধ করার জন্য রাস্তায় জল দেওয়ার বন্দোবস্তও করেছিলেন। উৎসবক্ষেত্রের সীমানা হয়েছিল প্রায় ২৫০০′ × ১২০০′ মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বাঁকুড়া, ঘাঁটাল প্রভৃতি স্থান হতে স্পেশাল বাস ও লরী নিয়মিত চলেছিল এবং কোতুলপুর হ'তে জয়রামবাটী ছয় মাইল এবং জয়রামবাটী হতে কামারপুকুর তিন মাইল রাস্তা এই উৎসব উপলক্ষে পাকা করা হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলাশাসক শ্রী ডি আয়েঙ্গার আই সি এস্ মহোদয়ের প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলেই সুদূর পল্লীগ্রামেও এইসব বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল

উৎসবের কয়দিন তিনি সদলবলে ক্যাম্প করে ওখানেই ছিলেন এবং যাত্রীদের সবরকম সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করায় সকলেই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

কুটীরগুলিতে বহিরাগত প্রায় এক হাজার পুরুষ ভক্ত ও আটশত মহিলাভক্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ প্রমুখ প্রায় দুইশত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং সুদূর ব্রহ্মদেশ হতেও অনেক সাধু ও ভক্ত আসেন। জয়রামবাটী গ্রামে এবং আশে পাশের গ্রামেও অনেক ভক্ত আতিথ্য-গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ প্রভৃতি

স্থানের এবং কলিকাতা ও হাওড়া হইতে আরও সর্বসমেত প্রায় পাঁচশত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক কয়দিন যাত্রীদের যথাসম্ভব সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ ছাড়া বয়েজস্কাউট, অস্থায়ী ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল, দমকল প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত ছিল। সংবাদ-আহরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, নিয়মিত সময়ে সমাগতদের জন্য আহার, মায়ের জীবনী-বিষয়ক প্রদর্শনী, ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা, গভর্নমেণ্টের ফিল্ম প্রদর্শন এবং চিত্তবিনোদের জন্য রাতে যাত্রা, ব্যায়াম প্রভৃতি সব বন্দোবস্ত অতি প্রশংসনীয় ছিল। ৬ই রাতে হাওড়া হতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনে প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী ও সাধু আগমন করেন। বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটী পর্যন্ত যাবার বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল।

মায়ের মন্দিরের সামনে একটি সুন্দর যজ্ঞশালা নির্মিত হয় এবং সেখানে মায়ের প্রতিকৃতিকে একটি ছোট কুঁড়ের মধ্যে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়।

কাশী হতে আগত চারজন বেদজ্ঞ পূজারী ব্রাহ্মণ ৭ই সকাল ৭টায় উপরোক্ত যজ্ঞশালায় 'রুদ্রযাগ' করেন। মাধবানন্দজী সকালে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীসম্বন্ধে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। স্বামী ওঁকারানন্দজীর তত্ত্বাবধানে পূজার ব্যবস্থাদি করা হয় এবং ব্রহ্মচারী গায়ত্রীচৈতন্য পূজা করেন। অনেক যাত্রী সকালে কামারপুকুর দর্শনে যান। ৮ই ও ৯ই এপ্রিল জয়রামবাটী হতে কামারপুকুর পর্যন্ত বাস চলাচল করেছিল। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দিরেও বেশ ভিড় হয় এবং বিশেষ পূজা-পাঠাদির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ এবং আরও দুএকজন প্রাচীন সাধু জয়রামবাটী হতে চার মাইল দূরে কোয়ালপাড়ায় শ্রীজগন্নাথ কোলের বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীযুক্ত কোলে মহারাজদের সুখ-সুবিধার প্রতি সব সময় যত্নবান ছিলেন।

৭ই সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মায়ের অধিবেশনান্তে ঘোষণা করা হয় যে, পরদিন ভোর ৬॥ টার সময় অধ্যক্ষ মহারাজের নেতৃত্বে একটি ছোট শোভাযাত্রা বের হবে—তাহাতে কেবলমাত্র সাধুরাই যোগদান করবেন। ভক্তদের রাস্তার দুধারে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়। আগের দিনই মায়ের মন্দির অতি মনোরমভাবে সজ্জিত করা হয়। ৮ই প্রতিষ্ঠাদিবস। সাধু ভক্তদের মন আনন্দে ভরপুর। ভোরে উঠেই সকলে তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে মন্দিরে সমবেত হন এবং ভোরের শান্তস্নিগ্ধ ও পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য রাস্তার দুপাশে দাঁড়ান। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ ঠিক ৬॥০ টায় আসেন। ছোট তিনটি সুসজ্জিত সিংহাসনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে বসান হয় এবং তিনজন প্রাচীন সাধু তাঁদের মাথায় করে নেন। গঙ্গাজল ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে দুজন সাধু তাঁদের অনুগমন করেন। তারপর ছিলেন অধ্যক্ষ মহারাজ। অন্য সাধুরা ধূপ, ধুনা, চামর, পাখা, শাঁখ ইত্যাদি নিয়ে অনুগমন করেন। পণ্ডিতরা বেদপাঠ করেন, অনেকে ভজনগান ও স্তোত্রাদি পাঠে রত ছিলেন। এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মায়ের মন্দির হতে শোভাযাত্রা বেরিয়ে প্রথমে মায়ের বাসস্থান পর্যন্ত এবং পরে মায়ের পৈতৃক বাসগৃহে যায় এবং সেখান হতে পুনরায় মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। মুহুর্মুহু মায়ের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয় এবং উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ভোরে ১০১টি তোপধ্বনি দ্বারা মায়ের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার বার্তা ঘোষিত হয়।

শোভাযাত্রা মন্দিরে ফিরে আসার পর পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠাকার্য আরম্ভ হয়। এদিকে আয়োজন চলতে থাকে, আর

একটি বড় শোভাযাত্রার। শ্রীশ্রীমায়ের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি একটি চতুর্দোলায় সুন্দরভাবে সাজানো হয় এবং শোভাযাত্রায় যোগদানেচ্ছু সকলকে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দিরের কাছে রাস্তায় সমবেত হতে বলা হয়। প্রথমে লাঠিধারিগণ অতঃপর ঢাকীর দল, পুরুষ ভক্তমণ্ডলী, কীর্তন পার্টি, মহিলা ভক্তবৃন্দ, বাউলদল, সাধুবৃন্দ, সাধুদের কীর্তন পার্টি, পূর্ণঘট-বহনকারিণী আটটি কুমারী, চতুর্দোলায় শ্রীশ্রীমা ও পেছনে ভক্তবৃন্দ চলেন। গ্রামের একপাশ পরিক্রমা করে উৎসব-প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে সেই বিরাট শোভাযাত্রা মন্দিরের সামনে আসে। অন্যূন পাঁচ হাজার লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। এ সময় যজ্ঞশালায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও অন্বযাগ সম্পন্ন হয়। পূজান্তে মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ভোগ ও তৎপরে হোম সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্ণ ১১॥০টা হতে অধিক রাত পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলতে থাকে এবং প্রায় বিশ হাজার নরনারী প্রসাদ পান। মা যেন অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে ভাণ্ডারে উপস্থিত ছিলেন এবং দুহাতে সমবেত সকলের মধ্যে অন্ন বিতরণ করছিলেন। ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত—কাজেই কাউকেই অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যেতে হয় নি। সন্ধ্যায় মন্দিরে বিবিধ বাদ্যোদ্যম-সহকারে মায়ের আরতি হয় তৎপরে কালীকীর্তন চলতে থাকে। অন্যদিকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ফায়ার ওয়ার্কস কোম্পনী' নানারকমের সুন্দর সুন্দর বাজি পোড়াইয়া যাত্রীদের আনন্দ বর্ধন করেন। এই সময় কামারপুকুর হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে চতুর্দোলায় সাজিয়ে এক শোভাযাত্রা জয়রামবাটী আসে। জনতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং চারদিকে মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সকলেই আশ্চর্য হয়ে যান যে, এই ক্ষুদ্র গ্রামে কি করে এত বড় জনসমুদ্র উপস্থিত হল। প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম ঐ দিন সন্ধ্যার পর হয়েছিল—সব পথই যেন ঐ দিন জয়রামবাটীর দিকে চলছিল। রাত সাড়ে এগারটায় যাত্রা সুরু হয় এবং 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' পালা অভিনীত হয়। ভোর ৫টায় যাত্রা শেষ হয়। তখনও বহু সহস্র লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। মায়ের মন্দিরে রাতে দশমহাবিদ্যা পূজা হয় এবং প্রায় ভোর পর্যন্ত পূজা চলে।

পরদিন ৯ই কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। এ দিকে যজ্ঞশালায় সপ্তশতী হোম আরম্ভ হয়। দারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করেও বহুলোক সেই হোম দর্শন করেন। যজ্ঞশালার সামনেই একদল লোক রামায়ণ গান করেন।

১০ই এপ্রিল স্পেশাল ট্রেন বিষ্ণুপুর হতে কলকাতায় যাবে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু সকলের সুবিধার জন্য উহা একদিন আগে ৯ই রাতে করা হয়। সন্ধ্যায় যাত্রিপূর্ণ অনেকগুলি বাস ও লরীর বিরাট 'কনভয়' জয়রামবাটী হতে বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হয়। আগের দুদিন সন্ধ্যায় দুইজন সাধু ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জীবনীর প্রধান প্রধান কাহিনী বর্ণনা করেন। দু'বছর আগে কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময় যে চলচ্চিত্র তোলা হয়েছিল তাহাও প্রদর্শিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারবিভাগ হতেও রোজ সন্ধ্যায় নানারূপ চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল। ব্যায়াম-প্রদর্শন ও নদের নিমাই অভিনয় সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করে। প্রদর্শনী দেখবার জন্যও লম্বা 'কিউ' হয়। প্রদর্শনীর পাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে মায়ের ছবিও বহুলোককে আকর্ষণ করে। পরদিন নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-পূজা হয় এবং ঐ দিনই উৎবের পরিসমাপ্তি হয়।

যাঁদের এই উৎসবে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা সকলেই অপার্থিব আনন্দ পেয়েছেন এবং এই মধুর ও পুণ্য স্মৃতি বহুকাল তাঁদের মনে জাগরূক থাকবে। জয় মা !!

ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের ঐতিহ্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা মিহি ঢাকাই মসলিনের যে ঐতিহাসিক কাহিনী পাই, সেই মসলিনের সূক্ষ্ম সূতা একটি অতি প্রাচীন—খুব সম্ভব প্রাচীনতম একটি সামান্য যন্ত্রসাহায্যে কাটা হইত। ইহারই নাম তকলি। চরকার জন্মও এদেশেই অতিপূর্বে ঘটিয়াছিল। মিহি সূতা কাটিবার জন্য তকলি ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ এই আদিম সহজ সরল যন্ত্রটি দ্বারা এদেশের বস্ত্রশিল্পী যে অনুপম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল, ইহার অনুরূপ কিছু বর্তমান তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক যুগেও এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর ঢাকাই মসলিনের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে একগজ চওড়া ও দশের গজ লম্বা কাপড়ের ওজন মাত্র ৯০০ গ্রেন্; অর্থাৎ প্রতি বর্গগজ মসলিনের ওজন মাত্র ৬০ গ্রেন্। ইওরোপের সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত তাঁতিরা যে মিহি কাপড় বুনিত, ইহার ওজন অন্ততঃ ৪।৫ গুণ বেশী। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি একসময় দেশে বিদেশে ছড়াইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এত সূক্ষ্ম সূতা অন্য কোন দেশের তাঁতে আজ পর্যন্ত বোনা সম্ভব হয় নাই। ঢাকার মসলিনশিল্প আট নয় দশক পূর্বেও সক্রিয় ছিল। যে তকলিতে মসলিনের সূতাকাটা হইত, ইহার চালনা-পদ্ধতির সংগে আমেরিকার ঐতিহাসিক ক্রোফোর্ড সাহেব সুদক্ষ বেহালাবাদকের সুরলহরী সৃষ্টির উপমা দিয়াছেন।*

তকলি ও চরকার জন্ম

তকলি-ব্যবহারের নৈপুণ্য অনুভূতিসাপেক্ষ—ইহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা অনুভব না করিলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়ে বা কলের মত তকলি চালাইয়াও তাহা বুঝা সম্ভব নয়। তুলার ন্যায় কোমলতম বস্তুদ্বারা একটি সরল যন্ত্র সাহায্যে এত সূক্ষ্ম বস্তু অর্থাৎ সূতাকাটার চর্চা শিল্প-জগতে একটি অভিনব ব্যাপার। তকলিসম্বন্ধে আমি যে সামান্য অনুশীলন করিয়াছি, তাহাতে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা একটি যোগবিশেষ এবং ইহার যথাযথ প্রবর্তন শিক্ষাজগতে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

ঢাকার মসলিন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া কাজ করিবার সময় স্বর্গীয় রসিকলাল গুপ্ত-রচিত 'রাজবল্লভ' নামক একটি ঐতিহাসিক পুস্তকের বিশেষ অংশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইখানা

* ক্রোফোর্ড স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—"One of the most romantic phases of the cotton story in India concerns the gossamer *muslins for which Dacca was once famous. There* are occasional references to these fabrics among the classical writers, but surer proof exists in Indo-Greco statuary of the first and second century of the Christian Era...... One significant feature of these statures is the way in which a fabric of incredible lightness has been perfectly draped *in natural folds on the human form. No artist could* model such a quality, unless familiar with it."

১৩১১ বংগাব্দে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর খাদি-আন্দোলনের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভের রাজত্বকালে রাজনগরের বর্ণনায় আছে—"কেহই উৎকট ধনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইত না, সকলেই সংযত জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়া কোন গৃহস্থের আলয় হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সমস্ত রাজনগরে একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাজবল্লভ ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ সেই সমাজের নেতা ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির ঝঞ্ঝাবাত কখনও এই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

"মধ্যাহ্ন-আহারের পর সকলেই বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। এই সময় রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মিলিত হইয়া চরকায় সূতা কাটিত এবং সংগে সংগে খোস গল্প করিয়া একে অন্যের চিত্ত-বিনোদন করিত। প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্র হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকের পূতকাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। যামিনীর প্রথম ভাগে বর্ষীয়সীরা নিজ নিজ গৃহকোণে বসিয়া চরকায় সূতা কাটিত এবং পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ উপকথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চরকার ধ্বনির সংগে সংগে উপকথা চলিতে থাকিত।

"বিধাতার নির্বন্ধে এই আনন্দধাম অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অতি অশুভক্ষণে অনন্ত কাল-সাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল সমাগত হইল। 'রথখোলা' নামে যে নদী এতদিন ক্ষুদ্র কলেবরে প্রবহমাণ হইতেছিল, তাহা সহসা বর্ষাকালে স্ফীত হইয়া ক্ষুধার্তা রাক্ষসীর ন্যায় করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের অধিকাংশ সৌধমালা অল্পকাল মধ্যেই রথখোলার কুক্ষিগত হইয়া গেল।"

'রাজবল্লভ' ঐতিহাসিক পুস্তক। ইহাতে ঢাকার রাজবল্লভের কাহিনী ও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহার লেখক প্রসংগান্তরে বাংলা দেশের একটি লুপ্ত নগরের সামাজিক পরিবেশে চরকার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা করিয়াছেন; রাজনগর ১২৭৬ সালে নদীবক্ষে বিলীন হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আট দশক পূর্বেও বাংলার স্থানে স্থানে চরকার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইহার পূর্ববর্তী কালে যে সূতা হাতে কাটিবার প্রথা আরও ব্যাপক ছিল সে প্রমাণ বহু বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রালফ্ ফিচ্ নামক ইংরেজ পর্যটক আকবরের সময় পূর্ববংগ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়—"তৎকালে সুবর্ণগ্রামে যে সূক্ষ্ম মলমল প্রস্তুত হইত, তাহা ভারতীয় কার্পাস শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ পেসর্সেট সোনার গাঁও-এ উৎপন্ন বস্ত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববংগ পর্যন্ত সমগ্র দেশ কার্পাসশিল্পের একটি বিরাট কারখানা-স্বরূপ ছিল। তথায় সকল গ্রামের ও নগরের অধিবাসিগণ কার্পাস ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিত।"

সেই সময়কার এক ফরাসী পর্যটকের বিবরণী হইতে জানা যায়, "প্রতি বৎসর অন্যূন পাঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত এবং তন্মধ্যে দশলক্ষ পরিমিত রেশমের বস্ত্র এদেশেই প্রস্তুত হইত।"

এখন প্রশ্ন এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের বস্ত্রশিল্পচর্চা আমাদের জীবন

হইতে তিরোহিত হইল কেন? শুধু কাপড়ের কলই কী এজন্য দায়ী? ইহার উত্তর এই যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত অনুকরণপ্রিয়তাই এই দুর্দশার মূল কারণ। আমাদের অপূর্ববস্ত্রশিল্প-সাধনার পথ আবার সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে প্রশস্ত করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনুসন্ধিৎসু হইয়া এ বিষয়ে বিচার করা প্রয়োজন। কাপড়ের কল মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টির মূল লক্ষ্য কী? সহজে সস্তায় সকলের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করাই কি কল ও কল-মালিকের লক্ষ্য? যে পথে কাপড়ের কল আবিষ্কৃতি ও স্থিতি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নৈতিক, আর্থিক পরাধীনতাকে জাতিগত ভাবে স্থায়ী করিয়া আমাদের অপূর্ব শিল্পকলা-সম্পর্কে স্মৃতিভ্রম ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের নিকষপাথরে যাচাই করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর আজ আবার পাইতে হইবে। কারণ, শিল্পবিকাশের উপর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-পতনের পূর্বাভাস

উদার মোগল রাজাদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশীয় আগন্তুক ও ব্যবসায়িগণ রাজদরবারে সমাদর পাইতেন। পরবর্তী সময়ে ইহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে। ভারতের অপূর্ব শিল্পকলা ও ঐশ্বর্যসম্বন্ধে পশ্চিমাগতদের ঔৎসুক্যের পরিসীমা ছিল না। স্থলপথ বন্ধ হইবার পর তাঁহারা জলপথ আবিষ্কারের পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কলম্বাস জলপথে ভারতবর্ষ খুঁজিতে যাইয়া আমেরিকা পৌঁছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদিগকে কার্পাসবস্ত্র-পরিহিত দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি ভারতবর্ষেই পৌঁছিয়াছেন। পরবর্তী আবিষ্কারক পর্তুগীজ ভাস্‌কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ভারত মহাসাগর সাফল্যের সংগে পাড়ি দিয়া ১৪৯৭ সালে ভারতবর্ষে পৌঁছেন। ভাস্‌কোদাগামার ভারতপথ আবিষ্কারের পর পর্তুগীজ বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভজনক ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় হল্যাণ্ডের বণিকেরা লিসবন শহরের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইত। ফলে হল্যাণ্ডের বড় বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে—আন্টওয়ার্প, বার্জেস, হারলেম প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় রংগীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকোর আমদানী হইতে থাকে। ইহার কারণ সেদেশবাসী এদেশীয় বস্ত্রাদি খুব পছন্দ করিত। বহু নাবিক ব্যবসায়ী তখন আইনকানুন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদির চোরাকারবার চালাইত এবং প্রচুর লাভ করিত। স্পেনীয় বণিকেরা প্রায় এক শতাব্দীকাল ভারত ও অন্যান্য পূর্বদেশের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। স্পেনের সমৃদ্ধিও এ পথে বৃদ্ধি পায়। স্পেনীয়রা মেক্সিকো ও পেরো বিজয় করিয়া গর্বে আরও স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু বিজয়মদে মত্ত স্পেন ১৫৮৮ সালে ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে হারিয়া গেল। ফলে স্পেনীয় বণিকদের ভারতীয় বস্ত্রসম্ভার ইউরোপে আমদানী করার পথ রুদ্ধ হইল। পূর্বদেশসমূহের বাণিজ্য-বন্দরসমূহ অন্য ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইল। হল্যাণ্ডের নাবিক-ব্যবসায়ীরা ১৬০২ সালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিল। ইহার পূর্বে ১৫৮৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক (Sir Francis Drake) নামক ইংরাজ পূর্বদেশজাত বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার বোঝাই পর্তুগীজ অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। ১৫৯২ সালে এরূপ আর একটি জাহাজ ইংরেজদের হস্তগত হয়। ইহা ক্যালিকো, সৌখীন বালিশ, কার্পেট অন্যবিধ মূল্যবান প্রাচ্যদেশীয় দ্রব্যসম্ভারে বোঝাই ছিল। ইংরেজ বণিক অভিযানকারীরা এই প্রথম ভারতীয় ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়; ভারতের সংগে যোগস্থাপন করিলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

১৫৯৯ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ফরাসী বণিকেরাও বৃটিশের পদাংক অনুসরণ করে; ১৬৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষও ঘটে। এই কোম্পানীসমূহের ইতিহাস-পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় পণ্যদ্রব্য—বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা ইউরোপীয় বণিককুলকে কতখানি প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের বাজারে উৎকৃষ্টতর অথচ সুলভ ভারতীয় পণ্য (বস্ত্র) সেই মহাদেশের বস্ত্রশিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ফরাসী, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের বাজারে তখন ভারতীয় রংগীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকো সেই দেশের শিল্পীদিগকে প্রায় বেকার করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, সেই সকল দেশের গবর্নমেণ্টসমূহ ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের উপর আইন প্রণয়ন করিয়া নানারূপ বাধানিষেধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনের নাগপাশ এড়াইয়াও ভারতীয় চোরাই বস্ত্রসম্ভার ইউরোপের বাজারে চলিতে থাকে।* প্রাশিয়াতে ভারতীয় 'বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন চালু করা হয়। ইংলণ্ডের পশম-ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। তখনকার দিনে ভারতীয় বস্ত্রাদির প্রভাবসম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারতীয় রংগীন কাপড়ের সমাদর বুঝিতে পারিয়া নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইতে থাকে। প্রাশিয়াতে ১৭৪১ সালে ছাপের কাপড় তৈরির কেন্দ্র বার্লিনে স্থাপিত হয়। ওবের কাম্পফ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থায়ী রংএর ছাপের পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৭৭৬ সালে ওবের কাম্পফ জন কয়েক অংশীদার লইয়া ফরাসী দেশের ভার্সাই শহরের নিকট Jony নামক স্থানে দৃঢ় রংয়ের ক্যালিকো শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেন। 'ভারতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন প্রয়োগের ফলে তাঁহারা যে সুযোগ লাভ করেন, সেই সুযোগে ভারতের অনুরূপ রংগীন বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে থাকেন। ফরাসী দেশের এই নবজাত শিল্প ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের মধ্যেও প্রেরণা যোগায়।

ফরাসী, পর্তুগীজ এবং ডাচ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের বণিককুলের ব্যবসাই বৃহত্তম আকার ধারণ করে। সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, কি ভাবে বস্ত্রনির্মাণের কল ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়, ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হয়। ইংলণ্ডের কাপড়ের কলকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশসাম্রাজ্য কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা কথা, কাজেই ইহার আলোচনা এ স্থানে নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা এই ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলার ধ্বংসের উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের পরাধীনতার এই ঐতিহাসিক কারণটি মহাত্মা গান্ধী সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্য বটে, মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথম স্বদেশী আমলে স্বদেশী শিল্পকে জাগ্রত করিবার উদ্যম দেখা দিয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বৈদ্যের ন্যায় এদেশের পরাধীনতার মূল কারণটি মহাত্মা গান্ধীই বিশেষ ভাবে আবিষ্কার করেন। সেই জন্যই দেখিতে পাই, অহিংসা-ধর্মের পূজারী হইয়াও বিদেশী বস্ত্রবর্জন, বিদেশী বস্ত্রের অগ্নিযজ্ঞের প্রচার তিনি করিয়াছিলেন।

* The introduction of painted calicoes and chintzes of the east met in France, in seventeenth century, a vigorous resistance from the manufactures of silk and wool. Stringent laws were passed and a measure enforced, and yet it is apparent that inspite of these prohibitions, there was a dangerous demand for the forbidden wares.

প্রাচীন ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও ইহার ধ্বংসের যে সকল কারণ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই ?

ইতিহাসের শিক্ষা ও বস্ত্রস্বাধীনতা-লাভের প্রয়োজনীয়তা

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর আমল পর্যন্ত এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কাটা সূতায় ও তাঁতির তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রশিল্প এ দেশবাসীর বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করিত।

(২) এ দেশের বস্ত্রশিল্পকলা অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

(৩) ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা ইউরোপীয়দিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

(৪) ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত।

(৫) এ দেশে তৈরী রংগীন কার্পাস বস্ত্র ইউরোপের বণিকদিগকে ক্রমে নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্পগঠনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

(৬) অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপাদন করিয়া লাভবান হইবার লোভ কাপড়ের কল নির্মাণের অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল। বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হয় নাই; পরন্তু কলের সাহায্যে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইয়া অল্পমূল্যের বস্ত্র দেশবিদেশের বাজারে চালু করিয়া বাজার বিস্তার ও অধিকার করিয়া বৈষয়িক জগতে আধিপত্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

(৭) কাপড়ের কলের আবিষ্কৃতি ও এ দেশে কলের বিস্তৃতির ফলে দেশবাসীর বস্ত্রস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে নাই; বরং বহুপ্রকারে তাহা খর্ব হইয়াছে। যে বস্ত্রশিল্পকলা একদা এদেশের জনসাধারণের করায়ত্ত ছিল, কাপড়ের কল সেই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশবাসীকে বাজারের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে।

ইংলণ্ডেই প্রথম কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হয়। অনুসন্ধিৎসুগণ সেই ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, লাভ ও লোভের মোহ কি ব্যক্তিগত বা কি জাতিগতভাবে কতদূর গড়াইতে পারে। ইহা হইতে আমরা বড় শিক্ষা লাভ করিতে পারি। মত ও পথ একই মানবিক সূত্রে গ্রথিত না হইলে পরিণামে মানবের কল্যাণ হয় না ;—ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতীয় বস্ত্রের বাজার অধিকার, ভারতে বৃটিশ সরকার কায়েম ও সর্বশেষ ধাপে ভারতে বৃটিশ বস্ত্র বর্জন, ল্যাংকাশায়ারের চরম দুর্গতি ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রথম মহাসমরের কালে ব্রিটিশ বস্ত্রের আমদানি এদেশের বাজারে হ্রাস পাওয়ায় এবং ঘটনাস্রোতে এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম প্রবল হইতে থাকায় এদেশে ক্রমে কাপড়ের কল স্থিতি ও বিস্তার লাভ করে। আজ দ্বিতীয় মহাসমরের পর ভারতে প্রচুর কলের কাপড় প্রস্তুত হইয়া বিদেশের বাজারেও চালান যাইতেছে, কিন্তু দেশবাসীর বস্ত্রসমস্যার সমাধান হইয়াছে কিনা বস্ত্রব্যবহারকারী নাগরিকমাত্রেই তাহা বলিতে পারেন। প্রশ্ন এই, এরূপ কেন হইল? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, কাপড়ের কল সর্বসাধারণের বস্ত্রস্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি? কল মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু দানবের ন্যায় কল আজ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং লোভ নামক বৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইতেছে। কলকে মানুষের সর্বসাধারণের মংগল-কাজে

নিয়োগ করার উপায় আজ বাহির করিতে হইবে। সকলেরই খাদ্যের ন্যায় বস্ত্রের প্রয়োজন আছে। বস্ত্রশিল্পে জনসাধারণের লোক-প্রতিভাকে আবার জাগ্রত করিতে পারিলেই ইহার সমাধানের উপায় আপনা হইতেই সর্বসাধারণই করিতে পারিবে। বস্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা বিশাল। তুলার চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নমুনার সূতা ও সকল রকমের বস্ত্র-শিল্পকৌশল লোকায়ত্ত হইলে আজিকার বহু সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। কলকে সর্বসাধারণের স্বার্থে মানুষের বশে আনিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

লোকপ্রতিভাকে জাগ্রত করিতে হইলে, একাধারে প্রাচীন ভারতের অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও যুগোপযোগী বস্ত্রশিল্পচর্চার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহার নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এক কথায় সাংস্কৃতিক শুভফল তখন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে।

কিন্তু বস্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত পথে লোকায়ত্তের পথে আনিবার, জনপ্রতিভাকে জাগ্রত করিবার একটি উপায় বস্ত্রশিল্পকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইহার শুভ পরিণতি সুদূরপ্রসারী হইবে।

মনোরম নক্‌সার সুরুচিসম্পন্ন বয়নশিল্পের উৎকর্ষের প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে দুই দশক যাবৎ চলিতেছে। এ পথে ব্যাপকভাবে সুরুচির মানকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বস্ত্রবর্জন, খাদি আন্দোলন ও সর্বশেষ ধাপে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্যে আগাগোড়া এক বিশাল সংগতি রহিয়াছে। খাদি-আন্দোলন দেশের রাজনীতির সংগে একীভূত হওয়ায়, খাদিকে অনেকে শুধু স্বাদেশিকতার চিহ্নস্বরূপ মনে করিত। ইহার লাভক্ষতি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার গুণাগুণ যাচাই করার দিন আসিয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় সূতাকাটা ও বয়ন প্রবর্তনের অন্তর্নিহিত বাণী অনুরূপ, অর্থাৎ ইহা রাজনৈতিক নহে; জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গেলে সর্বাগ্রে বস্ত্রশিল্পকে আবশ্যিক জনশিক্ষার অংগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সতর্ক গবেষণা প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর অপচয়ের সম্ভবনা রহিয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষাধারা দেশে বিস্তারলাভ করিলে দেশে তুলার চাষ ব্যাপকতর হইবে। বিভিন্ন তুলার গুণাগুণ-সম্বন্ধেও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মান আপনা হইতেই উন্নত হইবে। সূতা ও সূতা কাটিবার যন্ত্রাদির প্রগতিতে জনসাধারণের প্রতিভা সক্রিয় হইয়া উঠিবে। কাপড়ের কলের অতিকায় লোভ ও পরশোষণক্ষমতা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। ফলে কলও কালে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আপনার নৈতিক স্থান ও মান খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইবে।

যথাযথভাবে কোন কর্মের চর্চা করিতে হইলে ইহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞানচর্চা নিছক পুঁথিগত হইলে কর্ম-বিজ্ঞানটির সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না। অভিজ্ঞতা দ্বারা কাজের গুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পুঁথির জ্ঞানও আলোক প্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্মবিজ্ঞান ও পুঁথিজ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করিয়া প্রত্যক্ষ সমাজজীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিয়া তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে। কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতিসম্মত উপায়ে কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে আমাদের প্রাচীন কার্পাসশিল্পের ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃঢ় হইবে, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন নূতন আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

পুঁথিজ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান

তুমি

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বন্ধু তুমি, সুহৃৎ তুমি,
মিত্র তুমি ভক্ত্যাধার
প্রীতি তুমি, পুণ্য তুমি,
প্রণয় তুমি, শুদ্ধাচার।
শ্রদ্ধা তুমি, শান্তি তুমি
সুপ্তি তুমি, স্বপ্ন মোর
দীপ্তি তুমি, তৃপ্তি তুমি
ক্ষান্তি, ভালবাসার ডোর।

বৃদ্ধি তুমি, ঋদ্ধি তুমি
শক্তি তুমি, আমার ক্ষেম
সাধ্য তুমি, সাধনা তুমি
যজ্ঞ তুমি, আমার প্রেম।
বিত্ত তুমি, চিত্ত তুমি
হৃদয় তুমি, আমার প্রাণ
মোক্ষ তুমি, মুক্তি তুমি
ইষ্ট তুমি, আমার ত্রাণ।

তোমারে দেখেছি

শ্রীঅটলচন্দ্র দাস

তোমারে দেখেছি প্রভাতবেলায় চপল বালক সম,
ধরণী জুড়িয়া বেড়াইছ খেলি হে আমার নিরুপম!
তোমারে দেখেছি সন্ধ্যার কোলে ঘুমায়ে পড়িতে সুখে,
স্তব্ধ আবেগে রয়েছে যামিনী চাহিয়া তোমার মুখে!
তোমারে দেখেছি রুদ্রের রূপে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে
কর্মের ফল প্রদান করিতে বিচার-আসন-'পরে।
তোমারে দেখেছি কাঁদিতে একাকী ঘন ঘোর বরিষায়
পাতকীর দুখে গলিয়া পড়িতে কতো সমবেদনায়।
তোমারে দেখেছি শারদ-আকাশে, কুসুমের রাশে রাশে,
বক্ষে আমার চেয়েছ আসিতে প্রীতির মধুর হাসে।
তোমারে দেখেছি হৃদয়ে আমার উপজিতে করুণায়,
শোকের গভীরে দুখের তিমিরে দৈন্যের বেদনায়!
তোমারে দেখেছি হে প্রাণকান্ত, করমে কথায় গানে
ভিতরে বাহিরে সাথে সাথে মোর ফিরিছ সকল খানে।

যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য

শ্রীআশুতোষ দাস

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'অমৃতে ডুবে গেলেও মরণের ভয় নাই।' নিমজ্জিত ব্যক্তির মৃত্যু সর্বত্র সুনিশ্চিত হ'লেও এ যে অমৃত! এর ক্ষুদ্র কণিকাও অমর করে। তাই তার আহরণ আস্বাদন বিতরণ বা বিনিময় সবেতেই কল্যাণ। 'মিছরীর রুটি যেভাবে খাও মিষ্টি' এ অপূর্ব বাণীও তাঁরই মুখের। আর সেই সাহসেই বর্তমান বিষয়ের অবতারণা।

পাগলামি কথার শব্দার্থ যাই হ'ক, উহা যে সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং অনর্থকর কার্যের উপর্যুপরি অনুষ্ঠানের পরিচয় তা'তে সন্দেহ নেই। সচরাচর যা অসাধ্য ও অসম্ভববোধে অনেকে করতে নিরস্ত হয়, তা সংসিদ্ধ এবং সম্ভব করার উদ্যমকেও পাগলামি বলে।

সাধারণজ্ঞান অর্থে বিচারবুদ্ধিসহায়ে শুভাশুভ-নির্ধারণ এবং মঙ্গলের চেষ্টা ও অমঙ্গল-সম্বন্ধে সাবধান হওয়া। মানুষমাত্রেই আপন আহার ও আরামের জন্য যত্নশীল। শরীররক্ষার জন্য খাদ্য চাই, আচ্ছাদন চাই, আরও অনেককিছু চাই। শুধু নিজের জন্য নয়; যাদের নিয়ে সংসার সেই বাপ-মা স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি সকলের জন্য। যেখানে একের উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা যত বেশী প্রয়োজনও সেখানে তত অধিক। সে প্রয়োজনের আবার মাত্রা নেই; এই পরিমাণ হ'লে সকলে সন্তুষ্ট হবে তা'নয়। একজনের যা আকাঙ্ক্ষা—আর একজন তার শতগুণ পেয়েও অসন্তুষ্ট। কামনা-কল্পনা ছোট বড় যাই হ'ক তার জন্য যে কোন বাধা সরিয়ে অগ্রসর হ'বার অবিরাম চেষ্টাই মানব-জীবন। ঐরূপ অন্ধ আবেগে সকলেই চ'লেছে। বিরাম নেই—বিরক্তি নেই—তৃপ্তি নেই। তারপর একদিন শীঘ্র বা বিলম্বে অপ্রত্যাশিতভাবে যাত্রার যন্ত্র বিকল হ'য়ে পড়ে।—তখন সব নিশ্চল, সকল আশা-ভরসার অপূর্ণ অবস্থায় অবসান—অর্থাৎ মৃত্যু বা দেহান্তর। এই যে শ্রেষ্ঠ জীব মানবের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা এও কি প্রকাণ্ড পাগলামি নয়? সমগ্র মনুষ্যসমাজকে পাগল বলার স্পর্ধা বা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আমার নেই। আমি নিজেও তারই একজন;—আজীবন ধন মান খাদ্য স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যর্থ অনুসরণকারী। তবে দীর্ঘকালের মরুভ্রান্তিতে মুহ্যমান হরিণের যে অভিজ্ঞতা—মৃত্যুর মুক্তিদ্বার-সন্নিহিত ব্যক্তির বহুদিনের বহু প্রচেষ্টার ব্যর্থতা—উপস্থিত ও অনাগত পথবর্তীর সাবধানতার সহায় হতে পারে। তা'ছাড়া ভুল করলেও তা' স্বীকার এবং সংশোধনের প্রয়াস নিন্দনীয় নয়।

যে ভুল করে এবং উপর্যুপরি করে—বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও করে তাকেই পাগল বলে। সে হিসাবে কমবেশী আমরা সকলেই পাগল। মিথ্যাকে সত্য ভাবা—অস্থায়ীকে স্থায়ী মনে করা—ছায়াকে শরীর বলে দেখা ভ্রম বা ভুল। তবু যদি পুনঃপুনঃ আমরা তাই করি তা' কি পাগলামি নয়? পাঁচটার একটা খসলো—অশেষ চেষ্টাতেও রাখতে পারলাম না;—বাকী চারটাকে যদি চিরস্থায়ী বা নিজস্ব ভাবি, তবে পাগলামি ছাড়া তা' আর কি? ব্যাধির তাড়নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে যে শরীর অঙ্গহীন অবস্থায় কোনোমতে অস্তিত্ব রক্ষা করছে, তাকে অক্ষয় ভেবে আত্মপ্রসাদ বা অভিমান কি উন্মত্ততা নয়? চোখের উপর বহুক্ষেত্রে পাওয়ার বিড়ম্বনা দেখেও এই যে অহরহ ধনমান ইত্যাদি চাওয়ার ব্যগ্রতা, এও কি সুস্থতার লক্ষণ?

বস্তুতঃ আমরা সকলেই অল্পাধিক পাগল।

ভালবাসার একটা অফুরন্ত প্রেরণা অনুক্ষণ আমাদিগকে এটা-সেটা এদিক-ওদিক করাচ্ছে। গোল শুধু বস্তুবিচারে—সত্যনির্ণয়ে। যার বিকার আছে—বিনাশ আছে,—যা' পেয়ে পরিতৃপ্তি নেই, যা পান করে পিপাসার বৃদ্ধি সেই ভুল ক্রমাগত করার পাগলামি ছেড়ে এমন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা উচিত নয় কি—যার বিকার নেই বিনাশ নেই,—যে মিলনে বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, যার অন্তর্ধান নেই, আছে কেবল আবির্ভাব,—যাতে আছে যা কিছু লভ্য-লোভনীয় আর, আর আছে অতুলনীয় তৃপ্তি, অসীম শান্তি, অবাধ আনন্দ।

ভালবাসার প্রকৃত পাত্র এবং যথার্থ বস্তু কি তাই আমাদিগকে আগে বুঝতে হবে; এবং তার জন্য চেষ্টা নয় শুধু, জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে হবে। টাকায় ভাতকাপড় হয়, প্রকৃত কল্যাণের প্রায় কিছুই হয় না। আবার আশ্চর্য এই যে, পার্থিব প্রয়োজন থাকলেও যে জিনিস আশানুরূপ কেউ পায়ও না তার জন্য—আমৃত্যু অপরিসীম উৎকণ্ঠা—অথবা স্ত্রীপুত্র—যারা চিরসঙ্গী নয়—জীবনের যাত্রাপথে অভ্যাগত পথচারী মাত্র—তাদিগকে নিয়ে অল্পকাল অভিনয় করে' অনিচ্ছায় নিরুদ্দেশ যাত্রা—এই যদি মানুষের অবস্থা হয়, তবে তার পশুপক্ষী বা বৃক্ষাদির সঙ্গে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই মানুষের দেহ নিয়েই পরম পিতা যুগে যুগে আসছেন; তৎকালোপযোগী পথ দেখাচ্ছেন, মৃত্যুর মরুভূমিতে অমৃতের পরিবেশ রেখে যাচ্ছেন। আমরাও এখানে মরতেই আসি নি তা' বুঝতে হবে, আমাদিগকে আদর্শ সাক্ষাৎকার করতে হবে—অমর হ'তে হবে। 'হুঁশ' থাকবে বলেই আমরা মানহুঁশ। যাঁর একাংশ এই বিচিত্র বসুধাকারে সম্মুখে থেকে সর্বদা আমাদিগকে আচ্ছন্ন, অভিভূত এবং অন্ধ করে' রেখেছে সেই ঈশ্বরকে চাই—আংশিক নয়, অখণ্ড ভাবে।

"ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য" ইহা ভগবদ্বাক্য। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই। তথাপি ঐ চরমলক্ষ্য—সব অভাবের অবসান—সব পিপাসার পরিতৃপ্তি সহজ-সাধ্য নয়। তাই সর্বভাবের সমন্বয়মূর্তি, সর্বাধিক পরিস্ফুট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে গেলেন, "ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।" শুধু বলা নয়—পূর্ববর্তী ঈশ্বরাবতার বুদ্ধ-যীশু শ্রীচৈতন্যের মত আদর্শলাভের অত্যুগ্র উৎসাহে আহার বিশ্রাম, এমনকি সবচেয়ে প্রিয় আপন দেহবোধ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে' বহু মহাত্মার বর্ণিত বিভিন্ন পথে একই পরমধামে পৌঁছালেন এবং সংসারগহনে পথহারা সংশয়াচ্ছন্ন জগদ্বাসীর জন্য রেখে গেলেন তাঁর অভিনব অবদান—"নিষ্ঠা থাকলে সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" সন্দিহান শঙ্কাকুল দ্বিধাগ্রস্ত মানবাত্মার জন্য মুক্ত করে দিলেন সকল পথের সকল বেষ্টনী।

এ জগতে কেউ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'তে পারে না। তার কারণ সাধারণতঃ মানুষ যা' চায় তা' প্রেয় মাত্র—শ্রেয় নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রিয়—সর্বাধিক বাঞ্ছনীয়—সর্বস্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য এবং একমাত্র প্রাপ্তব্য। ঐ আসল লভ্য বা পরমসত্য-লাভের জন্য ব্যাকুলতা যখন সাধারণ প্রচেষ্টার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছায়—তখনই তাকে উন্মত্ততা বা পাগলামী বলা হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঐরূপ উন্মাদনা ভিন্ন এ পর্যন্ত কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই।—আর উহাই অতৃপ্তির জগতে—অমূল্য সান্ত্বনা—মানবজীবনে দৈবী সম্পদ। আরও আশ্বাসের বিষয় এই যে—ঐরূপ অসাধ্য সাধন এবং অদ্ভুত আবিষ্কার যাঁরা করেন তাঁরা নিজের শ্রেয়োলাভেই নিশ্চেষ্ট থাকেন না। অনুভূতির উচ্চচূড়ায় দাঁড়িয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা আশ-পাশের অপর সকলের কল্যাণের জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতা—তাঁদের অর্জনের সাফল্য দিয়ে যান। এর ফলে জাগতিক জীবন-প্রবাহে নূতন শক্তি ও গতির সঞ্চার হয়,— তার রূপ পরিবর্তিত

হয় এবং কালক্রমে সঞ্চিত দুষ্ট ব্যাধিবীজাণু বা আবিলতা অপসৃত হয়। এই নশ্বর ও সদা-পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তাঁদের অবদানই শুধু অমর হয় না— তাঁরাও স্মরণীয় ও নমস্য হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই সংস্কার বা পথ-নির্দেশের অধিকারী;— তাঁদের সুস্পষ্ট অনুভূতিই দুস্তর সমুদ্রে একমাত্র দিগ্‌দর্শন। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জোর দিয়ে বলেছেন— 'যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য।' ভক্ত কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস সেই সুরে ভাষায় রূপায়িত হল— 'আমায় দে মা পাগল করে।'

সৃষ্টির প্রয়োজনে স্রষ্টার অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির প্রভাবে মানুষ আত্মবিস্মৃত এবং সুখকর বোধে বাঁধনের উপর বাঁধন জড়াচ্ছে। ইহা অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য এবং নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হ'লেও এরই অপর দিক অবাধ উন্মুক্ত উজ্জ্বল এবং চিরসুন্দর। অন্ধকারের এই দুর্গম পথ উত্তরণের জন্য পূজা করতে হবে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে— প্রার্থনা করতে হবে আতুর অন্তরের সমগ্র ঐকান্তিকতা নিয়ে। তিনিই অভয়া মূর্তিতে পৌঁছিয়ে দেবেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের সুবর্ণসৈকতে— আলোকনিকেতনের বাঞ্ছিত তোরণে। সর্পাকারে দংশন এবং ওঝারূপে আরাম তিনিই করেন। জীবন-পথে মানুষ সতত বাধা পাচ্ছে— প্রতিপদে আহত হচ্ছে; অথচ মুক্তির পথ মুক্ত থাকা সত্ত্বেও ঘুনির মাছের মত মৃত্যুর অপেক্ষায় আবদ্ধভাবে পড়ে আছে। সাধারণতঃ এরূপ হ'লেও উপর্যুপরি আঘাতের ফলে অথবা সূচনাতেই সম্ভাবনা বুঝে কদাচিৎ কারুর দৃষ্টির আবরণ সরে যায় এবং মুক্তিদেবতার চিরমধুর আহ্বান সে শুনতে পায়। তাঁর অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি-সংকেত যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁরা সকল বন্ধন ছিন্ন করে আকুল উন্মাদনায় বেরিয়ে পড়েন। সাংসারিক বিধি-নিষেধ, আবেষ্টনী কিছুই তাঁদের সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে না। মূঢ় মোহাচ্ছন্ন জগৎ তাঁদের পাগল বা যাই বলুক, তাঁরাই পৃথিবীর অলঙ্কার, সার্থক মানুষ— মর ও অমর লোকের স্বর্ণসেতু। তাঁরাই আনেন সীমার মধ্যে অসীমের বার্তা, মর্তলোকে অমৃতের পণ্য— জগতের বেসুরা বাদ্যযন্ত্রে তাঁরাই তোলেন অনাদি সঙ্গীতের আনন্দ-ঝঙ্কার। সেই জন্যই যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—'যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সে-ই ধন্য'।

কালিদাস-কাব্যে আদর্শবাদ

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বসু, এম্‌-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সুবর্ণযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাকবি কালিদাস 'আর্ট ফর আর্ট সেক্' অর্থাৎ 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই মতবাদকে কাব্যরচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্যসম্ভোগের কবিহিসাবে কাব্যরচনা তাঁহার বিলাসমাত্র ছিল—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা বস্তুতই কবির উপর অবিচার করেন। প্রাচ্যের কবি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' মতবাদের যে পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা তাঁহার রচনার বিশদ আলোচনা করিয়া জানা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্য-মতে যাহা রচনার আদর্শ হওয়া উচিত তাহাকেই অর্থাৎ বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শকে কবি যথোপযুক্ত মাধ্যমে রূপায়িত করিয়াছেন। কবি প্রেয়কে কখনও শ্রেয়ের উপরে স্থান দেন নাই, তাঁহার রচনায় শ্রেয় ও প্রেয় একই বৃন্তে বিধৃত হইয়াছে। বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "তাঁহাকে একই কালে সৌন্দর্য-ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য এবং সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।"

এই প্রবন্ধে আমরা কবির প্রধান প্রধান কয়েকটি কাব্য ও নাটকের আলোচনা করিয়া তাঁহার রচনার আদর্শের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। কবির মেঘদূত-গীতিকাব্যে স্বাধিকার-প্রমত্ত যক্ষ কৈলাসস্থিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি অলকাপুরী হইতে নির্বাসিত হইলেন বহুদূরে রামগিরির আশ্রমে। প্রিয়ার বিরহে কাতর যক্ষ 'আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে' পুষ্কর-বংশোদ্ভব নূতন মেঘকে দূত পাঠাইলেন বিরহিণী দয়িতার কাছে একজন বিরহবিধুর প্রণয়ীর দূত-হিসাবে এবং তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেঘের গতি যথাসম্ভব ত্বরিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যক্ষ মেঘকে যাত্রাপথের নির্দেশ দিয়া রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী প্রভৃতি বিভিন্ন নদনদী এবং বিদিশা, অবন্তী, দেবগিরি প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের উপর শীতল বারি বর্ষণ করিয়া মন্থর গতিতে অতিক্রম করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে আপাত-অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও এই অসামঞ্জস্যের উপরই বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যক্ষ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে নিদাঘতাপে শুষ্কপ্রায় নদনদীর জলের প্রয়োজন না মিটিলে এবং বিভিন্ন জনপদের বিরহক্লিষ্ট জনগণের বেদনা উপশমিত না হইলে তাঁহার নিজের বিরহ-যন্ত্রণারও লাঘব হইতে পারে না। এই আদর্শই উপনিষদে বিশদভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় কবি হিসাবে কালিদাস এই আদর্শকেই তাঁহার রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যষ্টির অস্তিত্ব তখনই হয় সার্থক যখন ব্যষ্টির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের জন্য বিসর্জিত হয়। ব্যষ্টির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পরিচালিত হওয়া উচিত। ইহাই ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং মহাকবি কালিদাসের আদর্শবাদেরও ভিত্তি।

এই আদর্শবাদই কবির বিখ্যাত শকু নাটকেও সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শকুন্তলার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার অবসান হইল রাজ্যের ভবিষ্যদ্ ভাগ্যনিয়ন্তা রাজচক্রবর্তি-লক্ষণ-যুক্ত পুত্রের জন্মগৌরবে। পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া অশ্রুসজল নয়নে শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন তিনি আবার আশ্রমের এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তদুত্তরে মহর্ষি সহজভাবে তাঁহাকে বলিলেন দৌষ্যন্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এবং কুটুম্বপরি-বাররক্ষার গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া স্বামীর সহিত পুনরায় আশ্রমে আগমন করিবেন। আদর্শ ভারতীয় জননীহিসাবে এইখানে শকুন্তলার চরিত্র সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মহাকবির কুমারসম্ভব-মহাকাব্যেও একই আদর্শবাদের পরিচয় পাইতেছি। গিরিরাজদুহিতা পার্বতীকে অলৌকিক সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অপূর্ব রূপসী পার্বতী এমন এক অদ্ভুত পুত্রের জন্মদান করিবেন যাঁহার প্রয়োজন তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত নিখিল বিশ্ব অনুভব করিতেছে। কবি যদি 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' মতবাদের পক্ষপাতী হইতেন, তাহা হইলে কেবল রূপরাশির বর্ণনাতেই তিনি তাঁহার কল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া কবি এই অপরূপ সুন্দরীকে দিয়া কঠিনতম তপশ্চর্যা করাইয়া লইয়াছেন। কাব্যের প্রথমাংশে অকাল বসন্তের অজস্র সমারোহের মধ্যে গিরিরাজনন্দিনী অপূর্ব রূপলাবণ্য লইয়া কামদেব সমভিব্যাহারে

তপস্যারত গিরিশের হৃদয় জয় করিবার মানসে উপস্থিত হইলেন। ফল হইল বিপরীত—ত্রিলোচনের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন মদন আর পার্বতী মহেশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইলেন। ইহা দ্বারা কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কেবল কামের বশে বা মোহের আতিশয্যে কোন মঙ্গলকর্ম সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং কোন মহৎ জীবনও চরিতার্থ হয় না। পার্বতী সেইজন্য অনন্যোপায় হইয়া মহেশ্বরের হৃদয় জয় করিতে দুশ্চর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে মহাদেবের পরাজয় হইল, ধর্ম মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন এবং ধর্মের দ্বারাই তাপস-তপস্বিনীর মিলন সাধিত হইল। হরপার্বতীর পুণ্য মিলনে জন্ম গ্রহণ করিলেন উৎপীড়িত বিশ্বের শান্তি-সংস্থাপক এবং তারকহন্তা বিখ্যাত সেনানী 'কুমার'।

কবির রঘুবংশ-মহাকাব্য পাঠ করিয়াও আমরা এই বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শের সন্ধান পাই। কবি এই মহাকাব্যে আদর্শরাজ্য ও আদর্শ রাজত্বের পরিকল্পনাকে রঘুবংশীয় নৃপতিগণের জীবন ও কার্যাবলীর মাধ্যমে রূপ দান করিয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় যে, রাজ্যের প্রসার এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য রঘুবংশের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজসুখোপভোগ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সমষ্টির স্বার্থের জন্য ব্যষ্টির সার্থকতাই তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ ছিল। কবির মতে মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর অস্তিত্ব তাহাদের নিজেদের জন্য নহে, কিন্তু বিশাল-কায় মহাসমুদ্রের বিস্তৃতির জন্য। মহাসমুদ্র ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর সমষ্টিমাত্র।

উপসংহারে কবিমানসে আদর্শের উৎপত্তি ও তাহার প্রকাশকৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

যখন কোন আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত হয় তখন কবির সৃষ্টি, সৃজনের সমস্ত প্রয়াস ও পাঠক-হৃদয়ে সেই আদর্শ জাগ্রত করিয়া তুলিবার উদ্যম সাফল্যের চরম সীমায় উপনীত হয়। সাফল্যের সহিত চরম ফলপ্রাপ্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিমিশ্র বিমল আনন্দলাভ করা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর মাধ্যমকে বাদ দিয়া এই উচ্চতর আনন্দ লাভ করা সম্ভব নহে। বস্তুনিরপেক্ষ আনন্দ কথাটা আমাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং এই বিভ্রান্তিই 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক্' মতবাদের মূলেই বিদ্যমান। কোন উচ্চতর রচনা পাঠ করিয়া যখন বিমল আনন্দ লাভ করা যায় তখন ইহা বস্তুনিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। কবির মনের নিভৃত অংশে অনুভূত হয় এক তাগিদ (urge)—যাহা কবির সত্তার প্রশান্তিকে আন্দোলিত করিয়া দেয়। এই তাগিদ হইতে জন্মলাভ করে বিমর্শ (deliberation) এবং বিমর্শ হইতে ভাবরাশির উৎপত্তি হয়। ভাবের তরঙ্গ যখন পর্যায়ক্রমে কবির মনকে উদ্বেল করিয়া অবশেষে মনের উপরস্তরে স্থান দখল করিয়া লয় তখন পূর্বানুভূত তাগিদ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সেইজন্য কবির সৃষ্টিকে অকারণ এবং উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সৃষ্টির সূত্র ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলে সেই তাগিদেরও সন্ধান পাওয়া কঠিন নহে। কবির মনের উৎপন্ন ভাবরাশি উপযুক্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যখন ভাব তথা তাগিদ ও মাধ্যমের অপূর্ব সমন্বয় হয় তখন উচ্চতর বিমল আনন্দলাভ করা যায়। এই আনন্দকেই পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্যোপাসকেরা বলিয়াছেন "Symmetry" অর্থাৎ সৌষম্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ।" মহাকবি কালিদাসের রচনাও উদ্দেশ্যবিহীন নহে, মহৎ আদর্শের প্রেরণা তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে। কবির আদর্শ ও সৃষ্টির মধ্যে এমন এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে যে, আদর্শ কোথাও কাব্যরস-পরিস্ফুরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নাই। শিব ও সুন্দর সমভাবে তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে। ইহাই হইল মহাকবিদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি*

আইডা আন্‌সেল

(দ্বিতীয় পর্ব)

একবার তুরীয়ানন্দজী জনৈক ছাত্রের উপর তাঁর বাহ্যিক রাগ সম্পর্কে আমাকে এক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বললেন,—"আসলে আমি কিন্তু রাগি না; একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি রাগের ভান করি।" আরও বললেন,—"যে রেগে উঠতে না পারে সে একটি বোকা। যে জ্ঞানী সে রাগের বশ নয়। সবার সাথে এক হতে চেষ্টা কর। কারুর বিরোধিতা কোরো না। যতখানি বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই পরিমাণেই তোমার একত্ববোধ ব্যাহত হবে। তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে রেগে যেও না বা বাদ-প্রতিবাদ কোরো না। খুব সাবধানে বিচার করে দেখো তার কথা সত্যি কি না। যদি সত্যি হয়, সংশোধন করে নাও; মিথ্যে হলে তাতেই বা তোমার কি আসে যায়?" অতঃপর বুদ্ধের একটি বাণী যোগ করলেন,—"তার আবার দান কি যদি গ্রহীতা গ্রহণই না করল?"

অনন্তর তুরীয়ানন্দজী বুঝিয়ে দিলেন, এক জন সন্ন্যাসী কি ভাবে অপরের মতই সব কিছু উপভোগ করবে, তবে অপরের ইচ্ছার উপরই তার সব নির্ভর। নিজের কোন চাহিদা তার নেই। সে যেন মৃত। সজ্ঞানে সে যেন মরে রয়েছে। আচার্যদেব তাঁর প্রিয় তুলসীদাসের কথা আবৃত্তি করলেন—

"হে তুলসী—
চোখ মেলেছ যখন তুমি ধূলার ঘরে এই ভবে
অঝোর ঝরে কাঁদলে কেবল উঠল হেসে হায় সবে।
আসলো এখন তোমার পালা শান্তি দেবার জগৎটায়,
বাঁচার মত বাঁচতে হবে তৈরী কর জীবন-কায়;
শেষ-বিদায়ের পালা এবার আসলে পরে বিশ্বপার
হাসবে তুমি তোমার শোকে কাঁদবে সবে এই ধরার॥"

আবার বললেন, "হে তুলসী,—চাও, সকলেরই সাথে বাস করে চলো, কারণ, কে জানে কোনখানে এবং কোন্ বেশে ভগবান স্বয়ং এসে হাজির হবেন তোমারই কাছে।"

একান্ত আন্তরিকতার উপর তিনি অত্যন্ত জোর দিতেন। "মন মুখ এক কর; কিন্তু সত্য ও দয়া একসাথে পালন করবে।" ঐ সঙ্গে একটি সংস্কৃত কিংবদন্তী আবৃত্তি করে তার ইংরেজী অনুবাদ শোনালেন,—"মিষ্ট কথা বলবে, কিন্তু তা যেন মিথ্যা না হয়। সত্য বলবে, কিন্তু তা যেন রূঢ় না হয়।" আবার সুন্দর একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তার তাৎপর্য বললেন,—"সত্যেরই একমাত্র জয়, মিথ্যার নহে। যে পথ-অবলম্বনে ঋষিগণ পূর্ণে উপনীত হ'ন—তা-ই সত্যের সনাতন পথ। মুক্তিলাভ করার আর কোন রাস্তা নেই।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে যাঁরা শান্তি আশ্রমে প্রথম গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এলা-মেডার Home of Truth-এর শিক্ষক ছিলেন। ধীরা আর আমি ছিলাম মিস্ লিডিয়া বেল্-এর ছাত্রী; তিনি ছিলেন সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর Home of Truth-এর অধিনেত্রী। ওখানে প্রাচ্যবিদ্যা ও খ্রীষ্টীয় দর্শনের আলোচনা হ'ত। তিনি প্রথমে খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান ও নিউইয়র্কের থিওসোফি-বিষয়ে যে আন্দোলন চলছিল তার অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বক্তৃতাশিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে সার্

* হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের 'Vedanta and the West' পত্রিকায় (November-December, 1952) প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক অনূদিত। এই প্রবন্ধের প্রথম পর্ব (শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত) গত বর্ষের উদ্বোধনে (চৈত্র, ৫৯, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ৬০) প্রকাশ করা হইয়াছিল,—উঃ সঃ

এডউইন আরনল্ড-এর The light of Asia থেকে পড়ে শোনাতেন। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য আমাকে মিস্ বেল-এর নিকট পাঠান হ'ল; এই দুর্বলতার জন্য আমাকে স্কুলও ছাড়তে হয়েছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীরা যখন এলেন তখন আমাদের দৈনিক গীতার ক্লাস হচ্ছিল। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগও পড়ে ফেলেছিলাম; ঘটনাচক্রে ঐ বইখানাই শান্তি আশ্রমে পড়া হয়। কিছুদিন ধীরা ও আমি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর তাঁবুর পরের তাঁবুতেই ছিলাম— যেদিকটায় তাঁবুর আগুন জ্বালান থাকত। সান্ধ্য ধ্যানের পর তাঁর তাঁবু থেকে তুরীয়ানন্দজী আমাকে প্রথম শিক্ষা দেন; আমিও আমার তাঁবু থেকে তা গ্রহণ করি। আমার মিস্ বেলের প্রতি তীব্র আসক্তি ছিল; এটা ভাঙ্গিবার জন্য স্বামীজী যে উপায় অবলম্বন করেন তা'কে বলা যেতে পারে মৃদু পরিহাস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মিশ্রণ। আমার ভাবভঙ্গীর অনুকরণের একটু বাড়াবাড়ি করে স্বামীজী বল্লেন, "তোমার মনের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখ: 'প্রবেশ নিষেধ' যতক্ষণ না বলতে পার, 'এসো, সকলেই এসো'। সকলের মধ্যে মাকে দেখবার চেষ্টা কর, আর সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার কর।" কিন্তু আমার আসক্তি দূর করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমার শিক্ষাদাত্রীর প্রতি আমার সম্মান ও ভালবাসা পুরোপুরি বজায় থাকে। একদিন স্বামীজী মিস্ বেলের কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরাতে চাইলেন; সেদিন তিনি আমাকে ক্লাসে আসতে বারণ করেন; বল্লেন, 'গাছের তলায় বসে তাঁর জন্য প্রার্থনা কর।'

তুরীয়ানন্দজীর শিক্ষাদানে কোন প্রাণহীন, গতানুগতিক নিয়মানুবর্তী বহিরঙ্গভাব ছিল না; তিনি আমাদের মধ্যেই যেন বাস করতেন, আর প্রত্যেকের প্রয়োজন-অনুসারে শিক্ষা দিতেন। একদিন আমি দেখলাম, তিনি ঠায় একা বসে প্রাণভরে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হাসবার কি ব্যাপার স্বামীজী?" তিনি শুধু মাথা নেড়ে হাসতেই লাগলেন। তখন আমি বল্লাম, "আপনার মনে কি আছে জানতে পারলে আমি পৃথিবীতে সব কিছুই ছেড়ে দিতে পারতাম।"

মুহূর্তমধ্যে তুরীয়ানন্দজী শান্ত হয়ে বল্লেন, "উপরে তুমি দেখতে পাবে এটা ওটা— তুরীয়ানন্দ— কিন্তু ভেতরে দেখবে সব রামকৃষ্ণ।" আমি মাঝে মাঝে অনুভব করেছি, একথা মিশনের সব স্বামীজীদের সম্বন্ধেই সত্য। বাইরের দিকে তাঁদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, ভেতরে তাঁরা সকলেই রামকৃষ্ণে লীন। একজন স্বামীজী বুঝিয়ে বলেছিলেন, বাইরের পার্থক্য সব দেখা যাচ্ছে স্বামীজীদের প্রারব্ধ কর্মের জন্য; ছাত্রেরা সেদিকে দৃষ্টি দেবে না।

একদিন বিকালে একদল শিক্ষার্থী একসঙ্গে বসে কথাবার্তা করছিল। তুরীয়ানন্দজী সেখানে এসে বেশ উত্তেজিত ভাবে বল্লেন, "আমি দোলনা থেকে পড়ে গিছলাম। কেন আমি পড়ে গেলাম? যেটাকে ধরেছিলাম সেটা শক্ত ছিল না। মাকে ধরে থাক। তা'হলেই আমরা নিশ্চিন্ত। সেইটিই আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায়।"

অন্য আর একটি ঘটনা তিনি আমাদের বলেছিলেন। তিনি তখন প্রথম সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোয় আসেন, বাস করছিলেন ডাঃ লোগানের বাড়ীতে। একদিন কোন পয়সা না নিয়েই তিনি শহরের পথে বেরিয়ে পড়েন; ঠিক যখন একটা মোটর কারে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মনে হ'ল "তাইত, আমি আমেরিকায় রয়েছি, কারের ভাড়া লাগবে।" তারপর তিনি আবার দৌড়ে গিয়ে ডাঃ লোগানের কাছে দরকারী খরচার জন্য কিছু টাকা চাইলেন। মোটর কারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল; ভদ্রলোক তাঁকে চিনতেন। তিনি তুরীয়ানন্দজীর ভাড়া দিয়ে দিলেন। স্বামীজী নিজের

নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কারের ভঙ্গীতে কপালটুকে বলতে লাগলেন, "মা অনুযোগ করলেন 'আমি কি তোমার গাড়ীভাড়া দিতে পারতাম না?' "

আমেরিকাতে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। ঘটনাটি আমাদের সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। তুরীয়ানন্দজীর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোয় আসার প্রথম সপ্তাহেই একদিন বিকালে মিঃ য়্যাল্‌বার্ট উলবার্গ কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে একটি ফরাসী ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। রেস্তোরাঁটি Call Building-এর সবচেয়ে উপরের তলায় ছিল। তখনকার দিনে ঐটিই ছিল শহরটির মধ্যে সবচেয়ে উচুঁ বাড়ী। তুরীয়ানন্দজীর তখন সব বিষয়ে একটি সানন্দ কৌতূহলী ভাব। আর আঁধার ভেদ ক'রে আলোর ঝলক ঘন ঘন দেখা দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি?" সাধারণ প্রশ্নেও গভীর জিজ্ঞাসু ভাব! মিঃ উলবার্গ বল্লেন, "স্বামীজী, ওটা একটা সন্ধানী আলো। ওটা চ্যুট্‌স্‌ থেকে আসছে। চ্যুট্‌স্‌ এই শহরের দক্ষিণ দিকের একটি আমোদ-প্রমোদের পার্ক। আপনি কি সেখানে যেতে চান?"

"চ্যুট্‌স্‌? শিব! শিব! হ্যাঁ, যাব" বল্লেন তুরীয়ানন্দজী।

ভোজের পর নানাধরনের পাশ্চাত্য আমোদ-প্রমোদের সহিত স্বামীজীর প্রথম পরিচয় ঘটল। একটি নৌকার সামনের দিকে তিনি বসেছিলেন, হঠাৎ নৌকা কাত হওয়ায় তিনি হড়কে গিয়ে সাঁতারের ছোট্ট পুকুরে পড়ে যান; পড়ে গিয়েই হাবুডুবু খেতে লাগলেন, আর চারদিকে ছড়াতে লাগলেন জল। একবার তাঁর খুব উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কোন এক পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে চলেছেন খোলা একটি মোটর গাড়ীতে। গাড়ীটি ভীষণ বেগে একবার উঠছিল, একবার নামছিল। তা' দেখে আমাদের কি আনন্দের ধ্বনি!

তারপর তাঁকে 'মেরি-গো-রাউণ্ড' এর একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘোরানো হল। বয়স্ক লোকদের এই ভাবে তরুণদের মতো রঙ্গ-তামাসায় মাতা সম্বন্ধে আচার্যদেব মনে মনে কি ভাবছিলেন তা অবশ্য তিনি বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখে একটি আমোদের কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। এরপর আমরা গেলাম একটি থিয়েটারে। একটি নর্তকী তার পোষাকের সন্নিবেশ অদলবদল করে অনেকগুলি আয়নার সামনে এমনভাবে বহু বিচিত্র প্রতিবিম্ব ফেলছিল যে দর্শকবৃন্দের মনে হচ্ছিল যেন গোটা একটি নর্তকীর দল রঙ্গমঞ্চে হাজির! তুরীয়ানন্দজী দেখে খুব খুশী! বলে উঠলেন,—"দেখ দেখ! এরই নাম মায়া। বাস্তবিক রয়েছে এক অথচ অনেক বলে মনে হচ্ছে।"

আচার্যদেব যখন কথা বলতেন তখন তাঁর হাবভাবগুলি তাঁর কথার মতোই খুব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠত এবং তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন তা যেন প্রত্যক্ষভাবে সমীপবর্তীর অন্তর স্পর্শ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি যখন তাঁর নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথাটা একটু উপরের দিকে তুলে আমাকে বুল ডগের মত নাছোড়বান্দা হতে বলছেন, তখন অনুভব হত যে, তাঁর ভেতর দিয়ে যেন স্থির প্রতিজ্ঞার একটি বাস্তব তরঙ্গ বয়ে চলেছে।

তিনি এক মুহূর্তেই অপরের মনের অবস্থা বুঝতে পারতেন। একদিন সকালে আমার মনে একটা হতাশভাব চলছে। তিনি সেই সময়ে এসে হাজির। বজ্রদৃঢ়স্বরে বললেন,—"তুমি বুঝতে পার বা না পার এটা ঠিক যে, তুমি মায়ের সন্তান।" তারপর স্বর নরম করে বলছেন,—"তবে যদি এটা ধারণা করতে পার তাহলে তোমার সব ভয় দূর হয়ে যাবে, সব সন্দেহ কেটে যাবে, হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর উপর আমার টান একান্ত-

ভাবে বেড়ে চলছিল। এটা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনিও আমার সংশোধনের জন্য নির্মম উপায় অবলম্বন করেছিলেন। দিনের পর দিন তিনি আমার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে চললেন, আমায় যেন গ্রাহ্যই করছেন না, এবং আমি যতক্ষণ তাঁর তাঁবুতে কাজ করছি, তিনি ওদিকে আসছেনই না। তারপর আমি যখন প্রায় ধরেই নিয়েছি যে, তাঁর কাছ থেকে কোন স্নেহ পাওয়ার আশা আর নেই—তখন অকস্মাৎ একদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন—"তোমার বান্ধবী মিস বেলের উপর তোমার যে টান ছিল সেইটাই এখন আমার উপর পড়ছিল। তাই 'অস্ত্রোপচারের' দরকার হয়েছিল। এবার ঘা শুকোবার মলম পাবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর ভালবাসার ফল দুঃখ। 'মা'কে যদি ধর তাহলে সব পাবে।"

এই বিশেষ শিক্ষাটি লাভ করবার পর আচার্যদেবের সঙ্গে আমার পূর্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ফিরে এল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কয়েকমাসের জন্য আমাকে আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে হয়। শীত আসছে। বর্ষায় তাঁবু ছিঁড়ে জল পড়ত। ঠাণ্ডা লেগে আমি সর্দিতে আক্রান্ত হলাম। আবার সামনে আসছে শীতকাল। স্বামীজী আমাকে কাঠের ঘরে শুতে আদেশ দিলেন। আমি প্রথমে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন—"অত বেশী আমেরিকান হয়ো না, একটু হিন্দু হও, বাধ্যতা শেখো।" স্থির হলো আমি সানফ্রানসিস্কোতে থাকব—এবং বসন্তে ফিরে আসব। যদিও আমি শহরে গেলাম; আমার মন সব সময় আশ্রমেই পড়ে থাকত।

এই সময়ে আমি স্বামিজীর কাছ থেকে কতকগুলি পাই। তার একটিও পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এখানে দিলাম:

শান্তি আশ্রম; পোঃ ডি ফরেষ্ট
স্যাণ্টাক্লারা কোং
ক্যালিফোর্নিয়া—
১৫ই জানুয়ারী, ১৯০১

স্নেহের বেবী,

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়েছি। ভাল আছ জেনে আনন্দিত হ'লাম। তুমি আমার কাছে যে গানটি চেয়েছ তার সমস্তটা অনুবাদ করে পাঠাচ্ছি। আমি এটা গুরুদাসের জন্য করেছিলাম। এখানে এরা সকলেই ভাল আছে। আমি শীঘ্রই শহরে যাব বলে আশা করছি। শ্রদ্ধা পুনরায় ভালই বোধ করছে। এই একান্তবাস শেষ করে আমি কখন ওখানে আসব তা যথাসময়ে মিসেস উইলমটকে লিখে জানাব। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আসছে কাল থেকে আমি এক সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করবো। গত কয়েকদিন ধরে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা সব সময় জানবে। এখানে অনুবাদটি দিলাম।

"হে আমার মন, তোমাকে বলি যে পথই তুমি পছন্দ করো না কেন, কালীর ভজনা কর। তোমার গুরু তোমাকে যে মহৎ মন্ত্র দান করেছেন তাই দিবারাত্র জপ কর।

যখন শোবে তখন জানবে যে তুমি মাকে নমস্কার করছ।

যখন নিদ্রা যাবে, জানবে যে তুমি মায়ের ধ্যান করছ, যখন খাবে তখন জানবে—যে তুমি শ্যামা মাকে নৈবেদ্য অর্পণ করছ।

তোমার কানে তুমি যা শোনো, সবই মায়ের কথা, কারণ মা সকল অক্ষরেই বিরাজ করছেন।

মহানন্দে রামপ্রসাদ ঘোষণা করছেন যে, মা সকলের শরীরেই বাস করছেন। সুতরাং তুমি যখন নগরের চারিদিকে বেড়াচ্ছ, তখন ভাববে যে তুমি শ্যামা মাকেই প্রদক্ষিণ করছ।"

এই গানের মর্ম অনুভব করবার চেষ্টা করবে তাহলে তোমার ধ্যান ধারণা প্রভৃতি খুব চমৎকারভাবে সম্পন্ন হবে।

জগজ্জননীতে তোমাদের চির—তুরীয়ানন্দ।

আধ্যাত্মিক ভারতে তীর্থের স্থান

শ্রীরবি সিংহ

আধ্যাত্মিক ভারত-আকাশে পুণ্যতীর্থগুলি জ্যোতিষ্কস্বরূপ অপরিম্লান দ্যুতি নিয়ে ছেয়ে আছে। তারা নিয়তই পথ দেখাচ্ছে আপন ভাস্বর প্রভায় পরিপূর্ণ চৈতন্যসঙ্গম-পথযাত্রীকে। তাদের প্রাণস্পর্শী আহ্বান তীর্থপথিককে স্থির থাকতে দেয় না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত সে ছুটে যায় অভাবিত গন্তব্যের দিকে—আশার পিয়াসী মনে, অদৃশ্য শক্তির টানে। সংখ্যাতীত কাল হতে পুণ্যলোভাতুর ছুটে গিয়েছে দুরারোহ পর্বতমালায়, দুর্গম গহন অরণ্যে, দুস্তর পারাবার পেরিয়ে কোন্ সে পারমার্থিক স্বর্গঘেঁষা কিছু একটা অলক্ষিত অভাবিতের দর্শনমানসে—শত বাধাবিপত্তি, শত দুঃখকষ্ট, শত বন্ধন ছিন্ন করে।

ভারতের তীর্থযাত্রীরা তীর্থযাত্রায় যেমন করে মেতে ওঠে, তেমন করে নেচে উঠতে দেখি না অপর কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রবাসীদের। তাই ভারতমানসে তীর্থযাত্রা এক সাধনা—তার আসলরূপ চেনার সাধনা। আত্মসাধন স্ফূর্তিভরা মন নিয়ে আনন্দ-লহরীর মাঝে গা ভাসিয়ে দেয় এ পথের যাত্রী। কারো বা যাত্রা শুরু হয় যৌবনের উদ্দামতার তালে, কারও বা শুরু হয় বার্ধক্যের শেষ সীমায়।

প্রকৃতিদেবীর অশেষ দানে সম্পদশালিনী এই পুণ্যভারতের স্তবকে স্তবকে অসংখ্য তীর্থ তার ভূষণ হয়ে আছে। তীর্থভূষিত ভারতের জয়গান আমরা পাই তার প্রতিটি শাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকাব্যে। দেবদেবীর কাহিনী-বিজড়িত তার ইতিকথা। মাধুর্যভরা তার স্তুতি। রহস্যে ভরা তার স্থিতি। অনির্বচনীয় তার দিব্যদর্শন। কতশত যুগ গেছে এর পুণ্যকাহিনী বুকে নিয়ে মহাগৌরবে। দুর্দৈবকালের স্রোত এর উপর দিয়ে শতশত ঘটনায় ভারাক্রান্ত রথ ছুটিয়ে নিয়ে গেছে অশান্তচঞ্চল গতিতে। তবু সে পিষ্ট হ'লো না—চূর্ণ হ'লো না শত বৈরীর নিষ্ঠুর আঘাতে—নিঃশেষ হ'লো না সহস্র লুণ্ঠকের লুণ্ঠনে। অক্ষয়প্রভায় তারা এখনো ভারত জুড়ে রয়েছে।

ভারতজোড়া তীর্থশ্রেণীগুলি তীর্থকারীর দল পর্যটন করে বেড়াচ্ছে। অগণিত তীর্থ—দেবতীর্থ, কায়তীর্থ, পৈত্রতীর্থ, ব্রাহ্মতীর্থ, মানসিক তীর্থ আরও যে কতপ্রকার তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় বা চিরতুষারমৌলি হিমগিরি, কোথায় বা নীলাম্বু-শোভিত সরোবর। কোথায় বা পর্বতকন্দর-নিঃসৃত নির্ঝরিণী, তপ্তকুণ্ড, দু'তীর-ছোঁয়া সেতুবন্ধ, বহুশাখাপ্রসারিত মহীরুহতল, গিরিগুহা, বৃক্ষরাজি-শোভিত উদ্যান, কোথায় বা আবার গগনস্পর্শী মন্দিরচূড়া, বৈদূর্যখচিত, বিদ্রুমশোভিত গর্ভমন্দিরে পদ্মাসনে আসীন বিগ্রহ। বহুযুগের বৈচিত্র্যে ভরা বহুশিল্পীর কারুকার্যশোভিত দেবমন্দিরের প্রস্তরগাত্র। নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট দেবালয় বহুবিধ তার গঠনভঙ্গী। অভ্যন্তরে নানা ভঙ্গীতে বহুপ্রকার বিগ্রহ ও প্রতিমূর্তি।

বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সম্প্রদায় ও আচার-সমন্বিত এই ভারতে বহুবিধ মতামত। কত যে পথাবলম্বীর মিলন ঘটেছে এই ভারতের মিলন-তীর্থে তার কি ঠিক আছে? সকল আচার ও ব্যবহারকে নিঃসঙ্কোচে ভারত তার নিজের মর্মমাঝে স্থান করে দিয়েছে সুবিন্যস্তভাবে। সকল বৈচিত্র্য, সকল বিভিন্নতা কেমন যেন এক অদৃশ্য গ্রন্থিতে বাঁধা আছে সবার মধ্যে এককের উপলব্ধি ক'রে—তাদের সেই এককের সূত্রটি—যা তারা আবিষ্কার করেছে জ্ঞানের দীপ্ত দীপের আলোয়, প্রতিষ্ঠা করেছে অফুরন্ত কর্মশক্তি দিয়ে, জয় করেছে প্রেমের

শুচিশুভ্রতার স্পর্শে, প্রচারিত করেছে জীবনের উদাত্ত ঘোষণায়। তাই কোন কিছু আঘাত পেলো না তার অজ্ঞানের সংকীর্ণতার কাছে। কোন কিছু বিনষ্ট হ'লো না গোঁড়ামির নিষ্ঠুর হাতে। কোন কিছু প্রত্যাখ্যাত হ'লো না দম্ভ-অহমিকার জোরে। সব কিছু সে বরণ করে নিয়েছে আনন্দভরা মনে; আহরণ করেছে কল্যাণের অনিন্দ্য ছন্দে— সবার সত্তা স্বীকার করে। সত্যদ্রষ্টা ভারত তার মঙ্গলময় নিপুণহাতে বিশ্বজনীন আসরে মরণজয়ী, কালজয়ী, দ্বেষজয়ী একতারা নিয়ে বসেছে বিশ্বদেবতার বিশ্ব-সুর বাজাতে। সে একতারা সকল আত্মার পরম-তত্ত্বতন্ত্রীতে বাঁধা; তার আকাশে বাতাসে অহরহ মহেশ্বরের জয়গানের সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। চিত্তপুরুষের অম্লান প্রভা সে বিচ্ছুরিত করেছে আপন অঙ্গন-সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে। দিগ্বিজয়ীর অভিযানে সে বেরিয়েছে— বিশ্বজয়ী দিগ্বিজয়— ছুটেছে সে দেশ হতে দেশান্তরে। জয় করেছে কালপুরুষকে; অজাতশত্রু ভারত চলেছিল আধ্যাত্মিকতার রথে চড়ে, ধর্মের মুক্তকৃপাণ হাতে নিয়ে, সংস্কৃতির অশ্ব ছুটিয়ে। তখন তার সম্ভোগের বল্গায় টান পড়েছে, তামসিকতার মাঝে দোলা লেগেছে, আত্মদানী মন বলিদানের স্ফূর্তিতে নাচ শুরু করেছে, অহংভাবের সেদিন হয়েছিল মৃত্যু। তার রথচক্রের ঘায়ে চূর্ণ হয়েছে নানা দেশের পুঞ্জীভূত অন্ধতা, অজ্ঞতা, বদ্ধতা— সর্বজয়ী তিমিরান্তকের পরশ পেয়ে অভ্যুদয় ঘটেছে মঙ্গল দিনকরের।

ভুবনেশ্বরের আরাধনা হ'লো ভারতে, ধর্মের বেদীমূলে—সমন্বয়ের মন্ত্রে। অধ্যাত্মবাদ হ'লো তার পূজারী। বহুখণ্ডিত ভারত— বিক্ষুব্ধ ভারত এসে মিলিত হ'লো ধর্মবেদী ঘিরে। হৃদয়বীণা বেজে উঠল মানবসেবী শিল্পীর ঝংকারে। চিত্তাকাশে ধ্রুবতারার আবির্ভাব— প্রাণপুরুষ জেগে উঠলো, ঘুচে গেল মানবের আদিম মনের প্রবৃত্তির ছাপ। শুচিশুভ্র চিৎসরোবরে ফুটে উঠলো শ্বেতশতদলরাশি — সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। যার কাছে থেমে গেছে হিংসায় উন্মত্ত পিশাচের নৃত্য।

এই আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম ছিল তার পোষক —তার ধাত্রী। সকল সম্প্রদায়ের শিশুদেহ তার ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে, সঞ্জীবিত হয়েছে তার অমৃতরসে। আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম হচ্ছে প্রাণ-পুরুষের চাবিকাঠি। তাই এ ধর্মপাশে তার মিলন ঘটবেই। সকল দাবি, বহু সিদ্ধান্তের মাঝে সমন্বয়ী ধর্ম, সর্বধর্মমাঝে সাধারণ সূত্রগুলির গ্রন্থিতে বেঁধেছে এককের মহান অনুভূতিতে। তাইতো আধ্যাত্মিক ভারতে অধ্যাত্মের পরমপ্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বতেজা প্রকাশ যা' বস্তুমুখী বিশ্বকে ভস্ম করে দেবে তার আপন কল্যাণে, তার আপন মুক্তিতে।

আধ্যাত্মিক ভারতোদ্যানে তীর্থগুলি ফলে ফুলে ছাওয়া তরুরাজির মত শোভা পাচ্ছে। আধ্যাত্মিক ভারতের বুক হতে তারা সকল প্রকার রস সংগ্রহ করছে, বেঁচে আছে এর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে। সর্বত্র ফুটে উঠেছে মাটির বদ্ধতা ভেদ করে প্রাণ-পুরুষের অন্তর্গূঢ় খবর নিয়ে। চারিদিক জুড়ে তার প্রকাশ। অনির্বচনীয় তার শোভা, অনিন্দ্য-সুন্দর তার রূপ, আত্মবিস্মৃত তার পরিমল। নানা আকার, নানা ভঙ্গী, নানা বর্ণ, নানা ছন্দে সে রয়েছে আধ্যাত্মিক ভারতের ধর্মোদ্যান ছেয়ে। তার সেই রূপ যুগে যুগে তীর্থপথিককে আকর্ষণ করেছে, আকুল করেছে তার গন্ধ। অনুসন্ধিৎসুগণকে জ্ঞানফলে পরিতৃপ্ত করেছে। ছুটে গিয়েছে পুণ্য-তীর্থের পথিক। কত দুঃখ, কত ব্যথা যে নিষ্ঠুর কষাঘাত করেছে তার দেহে তার আর পরিমাপ নেই। দুর্গম পথ-যাত্রায় মনের সঙ্গে দেহের বার বার দ্বন্দ্ব লেগেছে। ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, আপনের সঙ্গে সবার।

তীর্থগুলির প্রাণস্পর্শী আহ্বান যে শুনেছে, সে ছুটে গিয়েছে আপন সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে —যে মায়াবন্ধনে সে বদ্ধ হয়েছে সারাজীবন ধরে—

আপন তৃপ্তি, আপন ভাবনা, আপন অভিপ্রায়, আপন স্পৃহা, আপন রুচি মিলিয়ে তা'কে সে অকস্মাৎ বিদীর্ণ করে ছুটে যায় দুর্গম পথে, দুর্দম বেগে। সব ফেলে যায়। বহু স্মৃতি তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কত স্নেহ, কত প্রীতি, সকল কীর্তি যে কেবলই বাধা দেয় মুক্তপথের যাত্রায়। তবু সে যায়, গেছে, যাবে সব কিছু পায়ে ঠেলে।

রহস্যভরা এই পৃথিবীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে বেরিয়েছেন যুগে যুগে আচার্যগণ ভারত পর্যটন-পথে তীর্থদর্শনে। অন্তরাত্মার অকথিত ভাষা প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের শ্রীমুখের বাণীতে। অজ্ঞাতপুরীর খবর পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের তীর্থ-পথযাত্রায়। তারই সঙ্গে তাঁরা শুনেছেন বিচিত্র দেশের বৈচিত্র্যের মাঝে এককের আহ্বান।

ভারত-চেনার আশা যাদের তারাই তো ফিরছে পুণ্যপুরীর পথে পথে। যে আধ্যাত্মিক ভারত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সত্যধর্মের আসন বিছিয়ে বসে আছে ধ্যানমগ্ন চিত্তে তাকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দর্শন পেতে গেলে তীর্থযাত্রা চাই-ই।

ভারতের প্রতিটি প্রান্তর জুড়ে, প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চল হতে তীর্থযাত্রী আসে তীর্থভূমিতে নানাপ্রকার ব্যবহার, নানাপ্রকার আচার, নানা বেশভূষা নিয়ে, নানা সামাজিক রীতি পোষণ ক'রে। এ'কে অপরের ভাষা বোঝে না, এ'কে অপরের রীতিনীতির সঙ্গে অনভ্যস্ত, তবু যেন তার মধ্যে ছন্দ, মধুর মিল—তারা যে একই পথের যাত্রী, একই পুণ্যের অভিলাষী, একই দর্শনের আকাঙ্ক্ষী। বাহিরের সকল বাধা, সকল বিভিন্নতা, সকল ব্যবধান তাদের অন্তরমিলনের কাছে পরাভূত হয়। সমন্বয়ী ভারত মূর্ত হয়ে ওঠে। কারণ তারা যে একই আকর্ষণডোরে বাঁধা—যে আকর্ষণ পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিয়েছে, জন্মান্ধকে দেবদর্শনে চক্ষুষ্মান করেছে। বৃদ্ধা চলেছে একাকিনী—সহায় প্রার্থনা না করে, বৃদ্ধ চলেছে যৌবনদৃপ্ত পদক্ষেপে। তাঁর আকর্ষণের দীপ্ত দীপের আভায় যে সবার মাঝে সুপ্ত মহাশক্তির জাগরণ হয় সব কিছু সাঙ্গ করে!

যে সভ্যতা, যে ভারতীয় সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে একদিন পথ দেখিয়েছে, শঙ্কাকুল মানবচিত্তের আগামী দিনের লক্ষ্য হয়ে আছে—সেই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভিত্তি ধর্মের উপর—অধ্যাত্মবাদ তার ভূমি; আর তীর্থ তার ভবন, তার আশ্রয়, তার প্রকাশ, তার ঘোষণা। আশ্রিত জনের পরে দেবতার আশিস নিয়তই ঝরছে—তাই বলি তীর্থপথযাত্রীর জয় হোক!

নির্ভর

শ্রীঅশোক সেন

তুমি যে অসীম, রয়েছ ছড়ায়ে ধরণীর সবখানে,
তবুও তোমার মধুর প্রকাশ মোর সীমায়িত প্রাণে;
হৃদয়ের যত কামনা আমার
নিয়েছ যে তুমি করি আপনার,
তনু-মালঞ্চে প্রতি অণু মোর তব সৌরভ আনে।

বক্ষে তোমার মুখ ঢেকে মোর, নয়নে নয়ন রাখি
তোমার অরূপ রূপ পানে আমি নিশিদিন চেয়ে থাকি,
জানি তুমি মোর হৃদিকন্দরে
রয়েছ লুকায়ে মনরূপ ধ'রে ;
তোমার-ই দেওয়া সে মায়া-অঞ্জন রেখেছে তোমারে ঢাকি'।

দুঃসহ দুখে যখনি হৃদয় কেঁদেছে ব্যাকুল স্বরে
সে তো জানি, প্রভু, তোমার আশিস্—পাঠায়েছ স্নেহভরে,
বরাভয়-মাখা তব দুই পাণি
ব্যথার আড়ালে রয়েছে তা' জানি
দুখহরা তব করুণা পরশ বুলাবে সে অন্তরে।

ক্লান্ত শরীর অসীম ব্যথায় ভেঙে পড়ে বারে বার,
নিরাশায় ছাওয়া জীবনের পথে নেমে এলো আঁধিয়ার,
শ্রান্ত এ হিয়া কেঁদে কেঁদে কয়
'আলো দাও মোরে, ওগো দ্যুতিময়,
আরো কতদূর—কবে হবে শেষ দুর্গম যাত্রার ?'

ধর্মের আহ্বান *

(William James—Will to Believe—1897)

এই প্রপঞ্চ জগতের পরপারে অদৃশ্যজগৎ আছে কি না আছে সে প্রশ্নের উত্তর আমার মনে হয় অনেকটা নির্ভর করে আমরা ধর্মের আহ্বানে কে কতটা সাড়া দিই তার উপর। মোটা কথায় বলতে চাই যে, হয়তো ভক্তের ভক্তির জোরের সঙ্গে ভগবানের প্রাণের শক্তি বাড়ে কমে। এ জীবনের দুঃখকষ্ট ঘর্মপাত রক্তপাত প্রাণপাত—এ সকলের অর্থ যদি কিছু থাকে তাহলে এই তো তার অর্থ। এ জীবনের যুদ্ধ যদি সত্য যুদ্ধ না হয়, এ যুদ্ধের জয়ে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনও সত্য এবং সনাতন বস্তু লাভ না করে তাহ'লে তো ইহা একটা সখের থিয়েটারের অভিনয়মাত্র, যার যখন খুশী এর থেকে সরে পড়তে পারে। কিন্তু তেমন তো ঠেকে না। অনুভব তো হয় এ জীবনযুদ্ধ সত্য যুদ্ধ ; যেন সংসারের এমন কিছুটা জঙ্গলে ঢাকা কাঁটাবনে পূর্ণ —স্থান আছে যাকে চাষের যোগ্য করবার জন্য আমাদের কর্তব্যপরায়ণতার, আমাদের বিশ্বস্ততার দরকার আছে। এবং প্রথমেই দরকার আছে আমাদের হৃদয়ের ক্ষেত্র থেকে নাস্তিকতার জঙ্গল এবং ভয়ের কাঁটাগাছ সাফ করা। এই রকমের

* শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস্. (অবসরপ্রাপ্ত) কর্তৃক অনুদিত।

কতকটা জংলা, কতকটা সাফ ব্রহ্মাণ্ডই যেন আমাদের স্বভাবের পক্ষে উপযোগী। আমাদের স্বভাবের গভীরতম স্থানই হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের সেই গহ্বর যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভয় বিশ্বাস নিয়ে একাকী বাস করি—যেখানকার কথা আমরা মুখে প্রকাশ করি না। পাহাড়ের অন্ধকার গহ্বরের ফাটল দিয়ে যেমন পৃথিবীর অন্তঃস্থলে থেকে জল এসে ঝরণার উৎপত্তি হয়, তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বের সেই আলো আঁধারে ঢাকা গভীরতা থেকেই আমাদের যত কাজকর্মের, যত সিদ্ধান্তের উৎপত্তি। এইখানেই পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের আসল যন্ত্রগুলি রক্ষিত আছে। এবং আমাদের আত্মার এই স্বচ্ছন্দগতির কাছে—দার্শনিকের মতবাদ কিম্বা বৈজ্ঞানিকের তর্ক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অগ্রাহ্য। বিশেষ করে যখন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলেন যে আমাদের এ বিশ্বাস বিচারসহ নয় তখন তাঁদের কথা আমরা অর্থহীন প্রলাপ বলেই মনে করি।

আমার শিষ্যদিগের প্রতি এই আমার শেষ কথা। জীবনকে ভয় করো না। বিশ্বাস রেখো যে বেঁচে থাকবার অর্থ আছে, মূল্য আছে। তোমাদের এই বিশ্বাসই নিজেকে বাস্তবে পরিণত হতে সাহায্য করবে। যদিও মহাপ্রলয়ের দিনের পূর্বে হয়তো তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলবে না, কিন্তু এখন যারা বিশ্বাস নিয়ে জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত আছে, সেই দিনে তারা কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা আজকের জীবনযুদ্ধে যারা ভয়ত্রস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত তাদের Arquesএর যুদ্ধ জয়ের পর Henry IV তাঁর বিলম্বপরায়ণ সেনাপতি Crillonকে যাহা বলেছিলেন তাই বলতে পারবে:—"বীরবর, গলায় দড়ি দাও—Arquesএতে আমরা যুদ্ধ করলাম —তুমিতো সেখানে ছিলে না।"

হরিনাম টহলগান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

বাঙলা দেশে গ্রামে গ্রামে কত অজ্ঞাত কবি কত যে সুরে হরিনামের গুণগান করিয়া নামপ্রচার করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এ সমস্ত গানের অধিকাংশের রচয়িতা কে জানা নাই, এমন অপূর্ব সুরই বা কাহারা দিয়াছেন, এত আকুল আর্তি কাহারাই বা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পর্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে।

কেবল বাঙলার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থঘরের ভক্তি-নম্র নরনারীরা আর বৈরাগী ভিখারীরা বছরের পর বছর সেই একই গানগুলি একই সুরে, একই ঢঙে গাহিয়া আসিতেছে। শরৎ-হেমন্তের শেষ রাতে বৈরাগী টহলদার ঐ সুরকে কণ্ঠে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, হাটে বাটে নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ফিরে। এ সব গান জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহারা নিজেরাই মনোমত করিয়া সুরের রদবদল করে, প্রয়োজনমত কলির রূপান্তর করিয়া লয়।

বাঙলা দেশের কত পরিবর্তন ঘটিল। কতবার কত রাজার বদল হইল; গ্রামগুলি রেলপথ-জলপথের প্রসাদে শহরের কাছে আগাইয়া আসিল। শিক্ষার প্রসার ঘটিল, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে নূতন ভাব, নূতন সুর আসিল, কিন্তু বাঙলার গ্রামবাসীদের সেই হরিনাম-গান সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

সদ্যঃপ্রয়াত রামদাস বাবাজীর কণ্ঠে যাঁহারা নামগান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন—নাম-

গানের অপূর্ব সুর-লহরী বাঙলা দেশে আজিও হারায় নাই। সারাদিনের কর্ম-অবসানে সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসীরা যে নাম গাহে, পালাপার্বণে, দোল-ঝুলনে, রাসে বারোয়ারীতলায় যে হরি-সংকীর্তনের আসর বসে—তাহার মধ্যেই এ দেশের লৌকিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই,
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই॥
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই, হরি নামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই।
হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার। হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই॥

এমন অল্প কথায় এত সহজভাবে ভগবানের নামগান আর কোথাও নাই। বাঙালীর ধর্মজীবন এবং সংসারজীবনের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এই শ্রেণীর হরিনামগান। শ্রীচৈতন্যদেব সকলকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেন নাই, সংসারী লোকদের মুক্তির উপায় বলিয়া তিনি নির্দেশ দেন হরিনাম গান করিবার। সবাই যদি সন্ন্যাস লয়, তবে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? এ ভাবে হরিনাম-কীর্তন করিলেও সন্ন্যাসের সমতুল্য ফল পাওয়া যাইবে—সে জন্য এই গানগুলি সংসারী লোকদের সাধন-ভজনের গান:—

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও।
গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও॥
একবার গাওরে আনন্দময় নাম
এনাম বদন ভরে গাও (হরিনাম বদন ভরে গাও)॥
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাও রে,
সদা সর্বক্ষণে গাও (হরিনাম সর্বক্ষণে গাও)॥
এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে
হরিনাম যথা তথা গাও (হরিনাম যথা তথা গাও)॥
এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে
গেয়ে জগৎ মাতাও (নামে জগৎ মাতাও)।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে (সংসারের দুর্গম পথে রে)
আনন্দে চলে যাও॥

এ সব গানের মধ্যে কোন গভীর তত্ত্বচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা, কোন গূঢ় গহন ইঙ্গিত, সুরের স্পর্ধিত কারুকার্য বা কসরৎ প্রভৃতি কিছুই নাই। এইগুলিতে বৈরাগ্যের নির্লিপ্ততা ও অনাসক্তির সঙ্গে সংসার-যাত্রা-নির্বাহের মধ্যে মুক্তির নিশ্চিন্ততার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হরি বলে ডাকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাকরে আমার মন, অন্তিম কালে জানবি হরিনামের কত গুণ;
আবার হরিবলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভবকাণ্ডারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে
তাদের মাসুল লাগবে না॥

নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, মধুসূদন কিন্নর, কাঙাল ফিকিরচাঁদ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গীতিকারের রচিত অনেক সুপরিচিত গানের ঈষৎ রূপান্তরিত নানা গানও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের স্বরচিত সুরকে অবলম্বন করিয়া আবার গ্রাম্য কবিরা নব নব গান রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। নিম্নের বিখ্যাত হরিনাম গানটি গোবিন্দ অধিকারীর রচনা—

হরি হরি বলরে ও আমার মন
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন
ভাবিলি না সে কাল-বরণ,　　কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ॥
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে,　　না মজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন॥
যে পদে লক্ষ্মীর সম্পদ,　　ভাবিলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ, এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন কররে মন!
কি আলাপন, সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন।
আপন যে চিনলি না তাঁরে,　　যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তারে, পালাবে শমন॥

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের অথবা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার সাহিত্যরসঘন অলঙ্কৃত বাগ্বিন্যাস ইহাতে নাই, ভাগবত অথবা চরিতামৃতের সঙ্গেও ইহার যোগ নাই। তত্ত্ব অথবা তথ্যের ভারে অযথা গানগুলিকে বুদ্ধিগম্য করা হয় নাই। এইগুলিতে আন্তরিকতার অভাব নাই।

বাংলাদেশের প্রেমধর্ম-প্রচারের ভার ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর উপর। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরেও নিত্যানন্দের লীলা প্রকট ছিল। গৃহস্থ ভক্তেরা গৃহে বাস করিয়াও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই কারণে গৌরাঙ্গদেব অপেক্ষাও নিতাই বাংলার বাউল গায়কদের অধিকতর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছেন--

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে　　নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্তা শ্রীচৈতন্য পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সীগিরি দিল অদ্বৈতরে।
ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর　　যারে ভাবে নিরন্তর
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে,
ওরে নারদ মুনি মগ্ন হয়ে বীণা-যন্ত্রে গান করে॥
ওরে নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে
রূপ-সনাতন দু'ভাই আসি　　প্রেমের বাজারে বসি;
আনন্দেতে বেচাকিনি করে,
ওরে রাঙ, দস্তা ফেলে সোনা নিতেছে ওজন করে॥

জগাই-মাধাইয়ের মতন পাষণ্ড নাস্তিক তাঁহার নাম করিয়া উদ্ধার পাইয়াছে, রূপসনাতনের মতন বিষয়াসক্ত গৃহী হরিনাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন— তখন যে কেহই তাঁহার নাম করিয়া ভবপারাবার পার হইতে পারিবে। বিষয়ীদের সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্ত গ্রাম্য কবিরা তাই গান ধরিলেন—

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল, দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল, তারা হরির নামে তরে গেল।
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে ফকির হ'ল॥
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে (সে যে ও নামে) তরে গেল।
(ওরে) অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে মানব হ'ল॥
(ওরে) মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥

এ সমস্ত গানের সুরেও মৌলিকতা আছে। বাঙলায় দুইটি প্রধান গ্রাম্য সঙ্গীতের সুর কীর্তন এবং বাউলকে— কথকতা এবং পাঁচালীর ভঙ্গীতে সরল করিয়া টহলদাররা এক বিচিত্র সুরে নামটহল গান গাহিয়া থাকে।

নামগানেরই বিশিষ্ট সুর আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াছে— 'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার'— এর সুরেই আমরা গাই—

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

গৃহস্থ সাধক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু, এম্‌-এ,বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ

বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের বংশে পূর্ণানন্দের জন্ম। তিনি হুগলী জেলায় সিঙ্গুরে কিছু সম্পত্তিলাভ করায় সেখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম শাক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসন এখনও আছে।

তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র অল্প বয়সেই গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি কাশীতে গিয়া বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা হয়। তদবধি তিনি নানাস্থানে ঘুরিতে থাকেন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। লোকসমাজে তিনি সতীশ বিদ্যানিধি নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার সিদ্ধাবস্থায় গুরুদত্ত নাম ছিল সনকানন্দ সিদ্ধান্তাচার্য। তিনি যখন পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন, তখন হঠাৎ বর্ধমানে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরে তাঁহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। গুরুদেব তখন বলেন—গৃহে তোমার মা তোমার জন্ত মনস্তাপ করিতেছেন— তুমি ফিরিয়া গিয়া সংসারী হও। তোমার দ্বারা জগতের কিছু কাজ হইবে।

তারপর সতীশচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহ করেন ও সংসারধর্মে মনোযোগ দেন। গৃহে আসিয়া তিনি বিল্ববৃক্ষমূলে একটি ত্রিমুণ্ডী আসন স্থাপিত করিয়া পূজারাধনা করিতে থাকেন। তিনি চিরদিন গৈরিক ইত্যাদি গ্রহণ না করিয়া সাধারণ

মানুষের মতই বেশভূষা করিতেন। তিনি টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইয়া ও পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অবস্থাতেও প্রসন্নভাবে তিনি তাঁহার সাধনার সূত্র অটুট রাখিতে চেষ্টা করেন। বাহিরে তিনি ঘোর সংসারী—তাঁহাকে সাধক বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া লোকে আশ্চর্য হইয়া যাইত।

তাঁহার কয়েক জন মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ শিষ্যের সংখ্যা অল্পই ছিল। একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের স্ত্রীর উৎকট ব্যারাম হয়। ডাক্তারেরা বলেন, আজ রাত্রে রোগিণীর রোগ অতিরিক্ত বাড়িবার সম্ভাবনা, রাত্রিটা কাটিবে কিনা সন্দেহ। সেই ক্ষীণকলেবর সংজ্ঞাহীন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ম্লানমুখে স্বামী বসিয়া আছেন। রেড়ির তেলের প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের দরজা বন্ধ, সদরদরজা ও খিড়কি সব বন্ধ। বাহিরে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন দুর্যোগমুহূর্তে হঠাৎ 'ওঁ তৎ সৎ' বলিয়া কমণ্ডলুহস্তে সতীশচন্দ্র রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দেখা দিলেন। দরজা বন্ধ—কেমন করিয়া আসিলেন, কিছু জানা গেল না। শিষ্য ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে গেলেন। ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়া তিনি রোগিণীকে উঠিয়া বসিতে বলিলেন। রোগিণী সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। তিনি তাঁহার হাতে কমণ্ডলুর জল দিলেন। তারপর আর তাঁহাকে দেখা গেল না। পরদিন ডাক্তারেরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, রোগিণীর রোগ প্রায় সারিয়া গিয়াছে।

সিঙ্গুরের মন্মথনাথ মল্লিক একজন বিখ্যাত ধনী। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের সময় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—এত আড়ম্বরে লাভ কি? —মরা গরুতে ঘাস খায় না। তাহাদের বাগ্‌বিতণ্ডায় বিরক্ত হইয়া সতীশচন্দ্র বলেন—'দেখতে চাও?'—তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করে, সমবেত সকলেই উৎসুক হয়। উক্ত বৃষোৎসর্গকালে মন্মথ বাবু নিজে এবং আরও অনেকে দেখিলেন—মন্মথবাবুর জননী তাঁহার প্রদত্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন। নিমেষ পরেই অবশ্য আর কিছু দেখা গেল না। কিন্তু এই নিমেষের দেখাই তাঁহাদের প্রাণে স্থায়ী আনন্দের ঢেউ তুলিল।

একদিন হঠাৎ তাঁহার গুরু তাঁহার নিকট দেখা দিয়া বলিলেন—তুমি ভুল পথে গিয়াছ, এত পরিশ্রমের পর শুধু হাঁটিয়া নদী পার হইলে বা শূন্যমার্গে অন্যস্থানে গেলে লাভ কী হইল? সামান্য নৌকাভাড়া বা রেলভাড়া যোগাড় করিলে অতি সাধারণ লোকেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। তুমি কেন্দুবিল্বে ক্ষেপাচাঁদের নিকট যাও, তাঁহার উপদেশমত কার্য কর। ইহার পর এই গুরুদেবের সহিত আর সতীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নাই।

কেন্দুবিল্বের ক্ষেপাচাঁদ একজন তেজস্বী সাধক ছিলেন। তিনি ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ড হইয়া অনেকদিন সাধনা করিয়াছিলেন। গুরুদেবের নির্দেশ-অনুসারে সতীশচন্দ্র বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বে গিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন ও তদবধি বৈষ্ণবমতে প্রেমের সাধন করিতে থাকেন।

তিনি কথাবার্তায় বিশেষ সংযত ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন—ভগবানকে পাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু বর্তমানযুগে মানুষ নিজেকে খুব স্বাবলম্বী মনে করে—ভগবানকে পাওয়ার প্রয়োজন হওয়াই শক্ত। অনেক সময় তাঁহার কথা হেঁয়ালির মত শুনাইত, কিন্তু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিতে কষ্ট হইত না। একবার এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন—তোমার ছেলে হয় নাই, তুই একজনের মা হইতে চাও, না হাজার হাজার ছেলের মা হইতে চাও? শিষ্যার সাহস হয় না – তিনি প্রথম বরই চাহেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে আনুমানিক সত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্বে তিনি একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে

বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন—এই দেহে বোধ হয় আর দেখা হইবে না। এই স্থূলটাকে পাল্টানো দরকার হইয়াছে, তবে সূক্ষ্মে থাকিব—আবশ্যক হইলে দেখা যাইবে। তখন তিনি নানারকম শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যেও ভুগিতেছিলেন। এই সময়েই তিনি সহধর্মিণীকে মাঝে মাঝে বলিতেন—হেরে গেলে! এ কথার কী ইঙ্গিত জানা যায় না।

দেহত্যাগের প্রায় পনের দিন পূর্বে তাঁহার মাথায় ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর প্রায় একইঞ্চি বাহুযুক্ত একটি সমত্রিভুজ পরিমিত স্থান হঠাৎ বসিয়া যায়। রাত্রে তিনি দেহত্যাগ করেন। যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি যোগাসনে আসীন; হঠাৎ কট্ করিয়া একটা শব্দ হয়। এই শব্দের পর অলৌকিক জ্যোতিতে সারা ঘর ভরিয়া যায়। বহুক্ষণ পরে ক্রমে ক্রমে এই জ্যোতি মিলাইয়া যায়। অনেকে ভাবিয়াছিলেন তিনি ধ্যানমগ্ন আছেন, কিন্তু জ্যোতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় তাঁহার মস্তকে একটা ছিদ্র হইয়াছে ও দেহে প্রাণ নাই। সাধক রামপ্রসাদের তনুত্যাগের বিবরণ অনেকের জানা ছিল। সতীশচন্দ্রের দেহত্যাগ দেখিয়া কাহারও আর সন্দেহ রহিল না—তিনি একজন বড় যোগী ছিলেন।

রামকৃষ্ণ

'ভাস্কর'

হে দেবতা রামকৃষ্ণ! সর্বগুণাকর
জগতের সর্বগ্লানি করিবারে দূর
দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে কামারপুকুর
গ্রামে আসি জন্ম নিলে, তাপসপ্রবর।

ভুলিলে নিজেরে, নিঃশেষে করিলে দান
মোহময় মানবের কল্যাণের ব্রতে,
কাঞ্চনেরে দেখিলে যে মাটির সমান
প্রতি নারী মাতা তব, হের জন্ম হ'তে।

ধর্মেরে ধরিলে তুমি মতের উপরে,
যত মত তত পথ, হের নিঃসংশয়,
আপন জীবনবাণী বাহিরে অন্তরে,
নিষ্কলুষ বন্ধহীন মহিমানিলয়।

অতি দীন মূঢ় জন, নাহিক ভকতি,
কৃপাকণা তরে পদে করিছে মিনতি।

বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় আদর্শ

অধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ

ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে বহিরাগতরা এই দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। উত্তরদক্ষিণে দুই হাজার মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে আঠারোশত মাইল পরিসর এই বিরাট দেশে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত নানা প্রকৃতির বহু জাতির দানে সমৃদ্ধ হিন্দু সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছিল, তা সত্যই একটি বিস্ময়ের বিষয়। নানাত্বের ভিতর, বহুত্বের বহিরাবরণের নিচে একত্বের ধারণা হিন্দু সভ্যতার

মর্মকথা। প্রবল ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রের উপরের জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয়, উত্তাল তরঙ্গের প্রলয়নাচন ভীতিসঞ্চার করে, কত বৃহৎ তরীর সমাধি রচনা করে, কিন্তু অতলের তলদেশ শান্ত নিস্তব্ধ থাকে। সেখানে কোন আলোড়ন-বিলোড়ন থাকে না। নানা রঙ, বহু ভাষা, পোষাক, আচারব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্নতাসত্ত্বেও হিন্দু-সভ্যতা একত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, এই বিরাট দেশের অসংখ্য জাতি ও ধর্মমত সুপ্রাচীন কাল থেকে শান্তিতে বসবাস করে এসেছে। শাখা-প্রশাখা ফুলফল পাতা প্রভৃতি নানা অংশের সমন্বয়ে বৃক্ষ, কিন্তু তার মূল এক। একটি মূল শিকড়ের সাহায্যে যে রস বৃক্ষদেহে পরিবেশিত হয়, তারই শক্তিতে বৃক্ষটি জীবিত থাকে, নূতন পত্রপুষ্পের শ্যামলিমায় সুন্দর হয়ে উঠে। হিন্দুসভ্যতা-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার অদ্বৈতভাব—হিন্দু-সভ্যতার মৌলিক অক্ষয় উপাদান—এর ভিত্তি-প্রস্তর। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের নানা জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপাদানে হিন্দুসভ্যতা-সৌধ গঠিত হয়েছে। হিন্দুরা একত্বসাধনার সোনার কাঠির সাহায্যে তাদের জাতীয় সমস্যা সমাধান করেছিল। বর্তমান যুগের রাজনীতিক ধুরন্ধররা যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, জাতির সঙ্গে জাতির যে মনোমালিন্য, হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও লোভ বিশ্বের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছে—তা দূর হয়ে যেতে পারে, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন ও জাতিজীবন সুসংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হতে পারে

হিন্দুসভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মের মূল নীতি-প্রয়োগের সুফল সন্দেহ নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু বিচার-বুদ্ধির স্থান অনুভবের নিচে দিয়েছে। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া—বিচারবুদ্ধির সাহায্যে,—তর্ক-বিচারের মাধ্যমে বিভেদ নিরসন হয় না। কারণ, তর্ক অনেক সময় প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরিপন্থী। হিন্দু বোধিকে বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, ধর্মমতের চেয়ে ধর্মভাবকে, বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হৃদয়-বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠতর স্থান দিয়েছে—বাইরের পরিচয়ের চেয়ে অন্তরের পরিচয়কে উচ্চতর বলে গ্রহণ করেছে। সে বস্তুকে, পরমসত্যকে শুধু জেনে আনন্দ পায় না, তাকে পেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

আমাদের মনের তিনটি বৃত্তি— অনুভূতি, মনন ও কর্মপ্রণোদন। অনুভূতি আনে প্রত্যক্ষ-বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক, মনন আনে বাইরের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— তাঁর (ডাক্তারের) সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল একটি বস্তু (পুত্র) সম্বন্ধে তথ্য মাত্র। সত্যের উপলব্ধি তা নয়। পুত্রের জন্য তাঁর নিবিড় অনুভূতির মধ্যে তিনি পরম সত্যের সন্ধান পান। এ হল সম্বন্ধগত সত্য, এ হল সৃষ্টির মৌলিক সত্য।

মানুষ শুধু মননশীল জীব নয়, সে অনুভূতিশীল জীবও বটে। সে মননের দ্বারা পায় জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, কিন্তু অনুভূতি জ্ঞেয় বস্তুর অন্তরের নাগাল পায়। মননের দ্বারা আমরা জ্ঞেয় বস্তুকে জানি মাত্র, কিন্তু তাকে পাই অনুভূতি দ্বারা। আচার্য শঙ্কর তাঁর শারীরকভাষ্যে সত্যসম্বন্ধে বলেছেন— স হি ন একান্তেন অবিষয়ঃ।

বেদান্ত জ্ঞান ভক্তি ও কর্মকে বাদ না দিয়ে তাদের উপর আর একটি বস্তুর, অনুভূতির নির্দেশ করেছেন। অনুভূতি ছাড়া বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মের সার্থকতা নেই। নিছক জ্ঞান, নিছক ভক্তি ও নিছক কর্ম বস্তুর সমগ্র সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে না। মানুষের বহুমুখী বৃত্তি প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি জাতিকে নিয়ত পরিচালিত করছে। এক একটি ধর্ম এক একটি বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি করছে। যে ধর্মে

অনুভূতির স্থান নেই, সে ধর্মে মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর পরিচয় সম্ভব হয় নি এবং এই পরিচয়ের অভাবে পৃথিবীতে মানবসভ্যতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

হিন্দুধর্ম ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জরথুষ্ট্রের মত কোন যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন নি। দল বেঁধে, সম্প্রদায় গঠন করে, অথবা তলোয়ারের সাহায্যে এই ধর্ম কখনও প্রচারিত হয় নি। রাজ্য-জয় বা সাম্রাজ্য-স্থাপন কোন দিন এর উদ্দেশ্য ছিল না। এর লক্ষ্য মানুষের হৃদয়জয়, চিত্তপরিশুদ্ধি।

ধর্মের মূলনীতির উপর হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত বলে প্রাচীন জগতে এর বিস্তৃতি আশ্চর্যজনক হয়েছিল এবং বহু বাধা বিপত্তি বিপ্লব সত্ত্বেও এই সভ্যতা এখনও জীবিত আছে। বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য হিন্দু যখন কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছিল, তাতে হিন্দুধর্ম সাময়িকভাবে রক্ষা পেলেও হিন্দুধর্মের মূলনীতি ব্যাহত হয়েছিল। ফলে যে নীতির প্রয়োগে সে পরকে আপন করতে সমর্থ হয়েছিল, তাহাই আবার আপনকে পর করে দিয়েছিল। সেই অধঃপতনের অমানিশার মধ্যে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতসাধনার আলোকবর্তিকা হস্তে ধারণ করে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শঙ্করের মনীষা কুসংস্কার ও বিকৃত ধর্মের শৈবালে আচ্ছন্ন জাতীয় জীবনকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি। তারপর প্রায় হাজার বৎসর অন্ধকার যুগ। এর প্রথমে ইসলাম ও ইস্‌লাম সংস্কৃতি এবং শেষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব হিন্দুমানসের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার প্রতিরোধের জন্য ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তার শক্তি ও বিশ্ব-পরিস্থিতি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত পশ্চিমী রাজনৈতিক জোটে পরোক্ষভাবে যোগদান করে নি। কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশ অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িত যে, পৃথিবীতে কোন বড় রকমের যুদ্ধ বাধলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা যেমন বিপজ্জনক তেমনই অসম্ভব। ভারত শান্তি কামনা করে, যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ, পরদেশ আক্রমণ বা পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপনের নীতিকে গ্রহণ করে নি। অন্যের উপর প্রভুত্ব করার দুর্দমনীয় বাসনা পৃথিবীর ঈর্ষাশীল জাতিদের, বিশেষতঃ ভুঁই-ফোড় আপকোওয়াস্তে রাষ্ট্রচালকদের মধ্য থেকে যতদিন না দূর হয়, ততদিন পর্যন্ত—পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তিস্থাপনের আশা কোথায়?

মিথ্যাপ্রচার ও অর্থবলে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকরা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেশের শাসকের স্থান দখল করে। তারা নানা অজুহাতে এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের শত্রুতা সৃষ্টি করে। ক্রমে এই শত্রুতা পরস্পরের ভিতর আত্মঘাতী যুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে। যে দিন যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা পৃথিবীর জনমন মানবতার উদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে, এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মানুষকে আত্মীয় বলে ভাবতে পারবে, এক মহামানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত এক একটি অংশ বলে চিন্তা করতে শিখবে, এবং যেদিন জনগণের হাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামগ্রিক অধিকার আসবে— সেই দিনই সামগ্রিক যুদ্ধের সর্বধ্বংসকর প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সামগ্রিক শান্তির সর্বাত্মক প্রস্তুতি রচিত হবে— সে দিন তারা তাদের সমরবিলাসী প্রচ্ছন্ন শত্রুদের বিতাড়িত করে তাদের প্রকৃত বন্ধুদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চস্থান দিয়ে শান্তিতে বাস করতে সমর্থ হবে।

বর্তমান জগতে ধনতন্ত্র গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ নিয়ে একটি জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের নিদারুণ সংঘাতে জনমন আলোড়িত হয়েছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবিত ধ্বংসলীলার আতঙ্কে সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে। এজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শান্তি-আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। এমন কি বিবদমান মতবাদি-

গণ একদিকে মুখে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছেন, আর অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য নূতন নূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছেন। একদিকে বাইরে শান্তিবৈঠক, অন্যদিকে ভিতরে অস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা চলেছে। সাধারণ মানুষ শান্তির ভিখারী। রাষ্ট্রচালকদের মানসিক অবস্থা ব্যক্তিত্বের বা বস্তুজগতের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে ওঠার পক্ষে অনুপযোগী। মহামানবতার লক্ষ্যে পৌছুতে না পারলে শান্তি মাত্র মুখের কথায় এবং শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

দুই হাজার বৎসর পূর্বে উপনিষদের ঋষি বিশ্ব-বাসীকে ডেকে যে শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন, সেই বাণী ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী। বস্তুজগতের মানুষ যেদিন বেদান্তের সেই মহামন্ত্রের সাধনাবলে বস্তুবোধের উপরে উঠিতে সমর্থ হবে, সেই দিনই বিশ্বে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হবে। শুধু শান্তিবৈঠকে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করলে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। যেদিন বেদান্ত-প্রতিপাদিত অনুভূতিলব্ধ একত্ববোধ বাহ্যিক নানাত্বের লোপসাধন করে এক অখণ্ড মহামানবতার বোধ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে—যেদিন সেই মহাযজ্ঞে মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ-ব্যবস্থা, ও হৃদয় পরিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত হয়ে উঠবে, সেই দিনই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তার পূর্বে নয়। সে দিন হয়ত বহুদূরে, কিন্তু সে দিন আসতে বাধ্য।

শ্রীম-প্রসঙ্গে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর জীবনী-আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা কথা বারবার মনে পড়ে ঈশ্বরের করুণাধারায় সিক্ত না হ'লে মানুষের জীবন সার্থকতা লাভ করে না। শস্যক্ষেত্র যতই উর্বর হোক না কেন, বীজ যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন তাতে ফসল হয় না, ফসলের জন্য চাই—বর্ষার ধারাবর্ষণ। শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাসহচরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ। বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে, জ্ঞানে এবং গুণে তাঁরা ছিলেন সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। তবু তাঁরা বুঝেছিলেন যে হৃদয়-কুসুমকে ফোটাবার জন্যে চাই আলো, চাই উত্তাপ। যেমন রাশি রাশি শুকনো কাঠ—প্রচুর দাহিকা শক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে; কিন্তু তারা নিজেরা শক্তিহীন অসার বস্তু-মাত্র। তাদের কাজে লাগাতে গেলে চাই অগ্নির সংযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই অগ্নিগর্ভ তেজোময় বিরাট পুরুষ—যাঁর কৃপাস্পর্শে তাঁর শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর জীবন সার্থক হ'য়ে উঠেছিল। যাঁর ধ্যান, যাঁর শক্তি এবং সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে তিনি হচ্ছেন প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সংক্ষেপে শ্রীম।

মহেন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর অবিস্মরণীয় উপহার শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। এই বইকে বাইবেল, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত করলেও বোধ হয় বাহুল্যদোষ হয় না। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কথামৃত আরও বেশী মূল্যবান বলে মনে হবে, কেননা পৃথিবীতে এর আগে কোন মহামানবের বাণীকে তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এ ভাবে যথাযথ রূপ দেবার চেষ্টা হয় নি। এখানে লেখককে অনুমান, জনশ্রুতি বা পরের কথার ওপর নির্ভর করতে হয়নি। গুরুর সঙ্গে প্রতিবার মিলনে তিনি তাঁর সমস্ত চেতনাকে নিয়োজিত করেছেন ঠাকুরের কথামৃত-সুধা পান করবার জন্য—

সুধাকরের মত বিকিরণ করেছেন ঠাকুরের নিকট হতে লব্ধ জ্ঞানের বৈচিত্র্যময় দ্যুতি।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখি ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা। তাঁর জীবনপাত্র পূর্ণ ছিল ঠাকুরের প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে। মহেন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ছিল দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্য-স্বরূপ। এই নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল ভক্তি। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানাভিমানী শিক্ষক, কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা যেমনই অলৌকিক তেমনি বিস্ময়কর। পুরীর রথযাত্রার পর মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করেন হাওড়া ষ্টেশনে জগন্নাথের প্রসাদের আশায়। কেউ খাম বা চুপড়ির মধ্যে প্রসাদ পাঠালে মহেন্দ্রনাথ চুপড়ি ও খামটি পর্যন্ত ফেলতে দেন না—সযত্নে রেখে দেন—"আহা, থাক দর্শন পাব।" বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে যেখানে ঠাকুরের দাদা রামকুমারের টোল ছিল এবং ঝামাপুকুরের যে মিত্রবাড়ীতে ঠাকুর কিছুদিন পূজা করেছিলেন, সেখানে যেতে আসতে মাষ্টার মশাই মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, মহেন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপ নেই—বলেন—"জান—এই রাস্তায় যদি কেউ বেড়ায় সেও যোগী হয়ে যাবে।" কখনও বা দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরেছেন, সঙ্গে এনেছেন অমূল্য সম্পদ একখানি ভিজা গামছা! তাই নিঙড়ে ভক্তদের গায়ে ছিটিয়ে বললেন—"ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করতেন সেই ঘাটের জল আছে এই গামছায়।" কি অপূর্ব ভক্তি! এর কণামাত্র পেলেও বুঝি মানুষের জীবন ধন্য হয়ে যায়। আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রেতাযুগের কথা। সীতাদেবী হনুমানকে উপহার দিয়েছেন বহুমূল্য মুক্তার মালা। হনুমান দূরে সরিয়ে দিলেন সেই মুক্তার হার—বললেন—"কি হবে এতে—এতে তো রামনাম নেই।" অভিমানভরে হনুমান তার বুক চিরে ফেললেন! দেখা গেল—রামসীতার মূর্তি। সারা সত্তায় মিশে ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল রামনাম। মহেন্দ্রনাথের সমস্ত চেতনাকে এই ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঠাকুরের কথা। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁর শুধু ঠাকুরেরই কথা, ঠাকুরেরই নাম। তাঁর কাছে কেউ ঠাকুরের কথা শুনতে চাইলে তিনি বুঝিয়ে বলতেন—"দেখুন, আগেকার দিনে ছাত্ররা সমিধ হাতে করে ঋষিদের কাছে এসে বলতেন—ঋষিবর, আমাদের উপনিষদের কথা বলুন, ঋষিরা বলতেন— আমাদের কথাই তো উপনিষদের কথা। তা আমারও ঠিক তাই। ঠাকুরের কথাই আমাদের কথা।" বাস্তবিকই তাই। মহেন্দ্রনাথ যে কেন বিষয়েই কথা বলুন না কেন, সে যুদ্ধের কথাই হোক আর যাই হোক, তার মধ্যে ঠাকুরের কথা এসে পড়বেই। ঠাকুরের প্রতি তাঁর কি অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল—তার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। মাষ্টার মশাইকে তখন "জাত সাপে" ধরেছে, অর্থাৎ ঠাকুরের করুণাজালে জড়িয়ে পড়েছেন। গুরুই তখন তাঁর ধ্যান, গুরুই তাঁর জ্ঞান। যখনই সময় পান, তখনই যান গুরুর চরণদর্শনে। তখন তিনি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক। ঠাকুর কলকাতায় এসেছেন শুনলে, টিফিনের ফাঁকে ফাঁকেও গিয়ে দেখে আসেন। এই সময় একবার স্কুলের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ধারণা হয় যে, গুরুর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির জন্যই মহেন্দ্রনাথ স্কুলের কাজে যথোচিত মন দিতে পারছেন না। একথা প্রকাশ হ'য়ে পড়াতে মহেন্দ্রনাথ তখনই স্কুলের কাজে ইস্তফা দিলেন। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হবে জেনেও গুরুনিন্দার গ্লানি থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহেন্দ্রনাথকে দেখি—এই নীতির মূর্তিমান বিগ্রহরূপে। তিনি সকলকেই আপনি বলে সম্বোধন করতেন, নিজের খুঁটিনাটি কাজ নিজেই করতেন। জামা কাপড় কাচা থেকে নিজের খাবারের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত নিজেই পরিষ্কার করতেন। কোন ভক্ত বিছানার মশারি ফেলে দিতে চাইলে তিনি বলতেন—"না না, তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিও না।" কিছুমাত্র ভোগবিলাস বিষয়-বাসনা ছিল না তাঁর মধ্যে। একবার এক ভক্ত কিনেছেন একখানা ভাল ইটালিয়ান কম্বল—তখনকার দিনেই তার দাম ছিল ১৮৲। মহেন্দ্র-নাথ দেখে বললেন—"আরে করেছ কি? এ যে অরক্ষণীয়া কন্যা। একে সামলাতে সামলাতে এর দিকে যে মন পড়ে থাকবে।" শুধু যে দেহের সুখভোগ তিনি বর্জন করেছিলেন তা নয়, ভাল খাদ্যগ্রহণেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন—জিহ্বার কোন রকম লালসা ছিল না তাঁর মধ্যে, ভাল তরকারি তিনি জলে ধুয়ে খেতেন, কোন ভক্ত ভাল ভাল খাবার জিনিস আনলে তিনি বলতেন—"আহা ধন্য আপনি, কি জিনিস এ সব! অদ্বৈত আশ্রমে নিয়ে যান সাধুসেবায় লাগবে।" ১৯২৪ অথবা ১৯২৫ সালে পূজার পর তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন, ৩।৪ দিন থাকার পর এক ভক্ত বললেন,—একদিন মাছের ঝোল খেলে কেমন হয়। মহেন্দ্রনাথ বললেন—"হ্যাঁ, পরের মাস খেতে খুব ভাল লাগবে। এখানে রেঁধে খাচ্ছি সেটাই অন্যায়। প্রসাদ খেয়ে থাকা উচিত।" এইখানেই একদিন সন্ধ্যার পর তিনি ভক্তদের সঙ্গে গিয়েছেন জগন্নাথ-দর্শনে, গরুড়-স্তম্ভের কাছে তিনি প্রদীপ নিয়ে আরতি সুরু করলেন, তখন তিনি অন্য জগতের মানুষ—তাঁর মন চলে গেছে দূরে কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকে। প্রদীপ কখন নিভে গেছে, মহেন্দ্র-নাথের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর এই নীরব আত্মনিবেদন শেষ হ'ল বহুক্ষণ পরে। এই তন্ময়তা, এই ধ্যান-মগ্নতার জন্যই মহেন্দ্রনাথের পক্ষে কথামৃত লেখা সম্ভব হ'য়েছিল।

মহেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রত ছিল সকলের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করা। তিনি ঠাকুরের কথার ভিতর দিয়েই সকলের প্রশ্নের জবাব দিতেন।

মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সংযম ও সাধনার মূর্তিমান বিগ্রহ। খরচপত্রের বেলাতেও এই সংযমের ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর স্বোপার্জিত প্রতিটি পয়সা যাহাতে সৎকার্যে ব্যয় হয়, তার প্রতিও মহেন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নির্জনে বনে, পাহাড়ে কন্দরে, যাঁরা তপস্যায় রত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য মাসে ২৲ টাকা করে পাঠাতেন, এতে মাসে প্রায় ২৫। ৩০ টাকা খরচ হত। এছাড়া বেলুড় মঠে (তাঁর ডায়েরীতে Lord's Math বলে লেখা আছে) মাঝে মঝে ৩০।৪০ টাকা করে দিতেন। সংসারের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে অন্ততঃ তিন মাসের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যাতে সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ১০০৲ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের লীলাবসানের পর শ্রীমা সারদামণি জয়রামবাটীতে থাকেন। এই সময় মহেন্দ্রনাথ জয়রামবাটীতে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীমার অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় শ্রীমাকে প্রতিমাসে ১০৲ করে পাঠাতে শুরু করেন। শ্রীমা মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং কোন কিছু প্রয়োজন হলে তা মহেন্দ্রনাথকে জানাতে কুণ্ঠিত হতেন না।

মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই একটি গান গাইতেন। তার কথা হল—

হরি জগত জীবন দীনবন্ধু
শুনেছি পুরাণে কয়,
পুনর্জন্ম নাহি হয়
হেরিলে ও মুখ ইন্দু
হরি জগত-জীবন দীনবন্ধু।

পতিতপাবন দীনবন্ধুর মুখচন্দ্রমা দর্শন করে মহেন্দ্রনাথ পরপারে চলে গেছেন। আবার কীর্তির্যস্য স জীবতি—তিনি তাঁর কীর্তির মধ্য দিয়েই চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

সমালোচনা

Philosophy and Life and other Papers—By J. C. P. d' Andrade, Late Professor of Logic and Philosophy, Elphinstone College, Bombay. With a foreword by the Rev. Dr. John Mekenzie, M.A., D.D., C.I.E. . Collected and edited by Miss S. Panandikar, M.A., M. Litt. (Cantab), H. M. Seervai, M.A., LL B. and prof. G. N. Lawande, M.A , Ph. D. Orient Longmans Ltd. Pages XXXVIII+240. Price : Rs 10/-

আধুনিক ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে সি ই এম্ জোড্ দুর্বোধ্য, গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বগুলি সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করে দর্শনশাস্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌কে বাদ দিলে ভারতীয় লেখকের মধ্যে ঠিক ঐ ধরনের জনপ্রিয় অথচ খাঁটি দার্শনিক গ্রন্থকার চোখে পড়েনি। অনেক লেখক দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ করতে গিয়ে কোথাও বিকৃতি এনেছেন। আবার কখনও বা পাঠককে ভুল বুঝিয়েছেন। আবার যাঁরা দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি জটিলতর করে পরিবেশন করেছেন, তাঁরা সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করতে পারেন নি। আলোচ্য গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি, অধ্যাপক ডি-এ্যান্‌ড্রেড্ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব সমন্বয়-সাধন করেছেন। লেখকের ভাষা এত স্বচ্ছ, সরল প্রাণবন্ত যে, বইখানি একবার পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। লেখক ভাববাদী, তাঁর ভাববাদের বৈশিষ্ট্য হল, ভাববাদের সঙ্গে তিনি বিবর্তনবাদ ও চরমমূল্যের সংমিশ্রণ করেছেন। তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতটি প্রত্যেক প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু নিজের মত জোর করে পাঠকের উপর চাপানোর নিষ্ফল প্রয়াস নেই। সহৃদয় পাঠকের মন লেখকের মতের সঙ্গে সায় না দিয়ে পারে না। রাসেলকে সমালোচনা করতে গিয়ে লেখকের নিজস্ব মত তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭১-১৮৯)।

আলোচ্য বইখানি লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন। বিষয়বস্তু মূলতঃ দর্শনশাস্ত্রের হলেও লেখনগুলির বৈচিত্র্য পাঠকের চোখ এড়ায় না। প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয় হচ্ছে দর্শন ও জীবন, তত্ত্ববিদ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভাববাদের মূলসূত্র, শুদ্ধ ভাববাদী 'সত্য' বলিতে কী বোঝেন, ভ্রম, চরম মূল্য, কাল ও পরিবর্তন, স্বাধীনতা, অলৌকিক ঘটনা, আত্মা ও জড়, স্পিনোজা, জেমস্ ওয়ার্ড, ব্র্যাডলির মনোবিজ্ঞান, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস, হাসির তাৎপর্য, সংস্কৃতি ও চরিত্র, কল্পনা, ন্যায়শাস্ত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহার, বিবর্তন ইত্যাদি। বইখানির দুটি সুলিখিত ভূমিকা রয়েছে; একটি লিখেছেন ডক্টর জন্ ম্যাকেঞ্জি, অপরটি শ্রীমতী এস্ পানানডিকর। গ্রন্থকারের স্মৃতিপ্রসঙ্গ লিখেছেন শ্রীমিরভাই।

গ্রন্থকার তৃতীয় প্রবন্ধে নিজের মত ও পথের কথা বলেছেন। তিনি বার্কলীর সঙ্কীর্ণ ভাববাদকে খণ্ডন করে বলেছেন যে, সত্যিকারের ভাববাদ জড়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না, করার প্রয়োজনও নেই। ভাববাদী জড়ের উপর চৈতন্যের আবির্ভাবকে বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের ভিতর তিনি অন্তর্লীন উদ্দেশ্যের আভাস প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

লেখকের অন্যতম প্রশংসনীয় ক্ষমতা হচ্ছে এই যে, তিনি কোন জায়গাতেই অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই। 'সত্য ও ভ্রম' সম্পর্কে কূট দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সহজ, সরল উদাহরণ

ব্যবহার করেছেন। ফলে আলোচনাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে শুদ্ধ ভাববাদের কোন বিরোধ নেই, বরং শুদ্ধ ভাববাদ অন্যান্য মতগুলিকে আত্মসাৎ করেছে—এই কথা লেখক নানাভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ষষ্ঠ প্রবন্ধে 'মূল্যের স্বরূপ' আলোচনা করতে গিয়ে মুর, রস্ প্রভৃতি বিশিষ্ট দার্শনিকের মত লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। স্পিনোজার দর্শন আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন (পৃঃ ১৩৫-৩৬)। লেখক নিজে উদ্দেশ্যাত্মক ঐক্যে বিশ্বাসী; স্পিনোজার পত্রাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, স্পিনোজা উদ্দেশ্যাত্মক ঐক্যে বিশ্বাসী (যদিও এই মত স্পিনোজার টীকাকারগণ সাধারণতঃ গ্রহণ করেন না)। স্পিনোজার 'দ্রব্য' বা ঈশ্বর যে অমূর্ত নন একথাও লেখক প্রতিপন্ন করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বিশ্বানুগতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্র্যাড্‌লির উপর লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭০)।

বইখানির অকুণ্ঠ প্রশংসা করবার যথেষ্ট কারণ আছে সত্যি, কিন্তু কয়েকটি ছোটোখাটো ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্মৃতি-প্রসঙ্গে ও ভূমিকায় বিভিন্ন লেখক-লেখিকা মানুষ হিসেবে কত বড় ছিলেন গ্রন্থকার তার পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকায় (পৃঃ ১৮৶০) লেখকের একটি বাক্যের উদ্ধৃতি আছে: "কোন লেখককে ভাল করে না বুঝে, না আত্মসাৎ করে কখনও সমালোচনা করবে না; কোন দার্শনিককে তুমি বুঝতে পারবে না, যদি তার প্রতি তুমি সহানুভূতিশীল না হও।" কিন্তু আলোচ্য বইখানির ১৭২ পৃষ্ঠায় লেখক যে ভাবে রাসেলের সমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয়, এই আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। বর্তমান জগতের নৈতিক শৈথিল্য ও চিন্তার অরাজকতার জন্য লেখক রাসেলকে দায়ী করেছেন, যদিও তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি প্রয়োগ করেননি। আমার মনে হয়, রাসেলের প্রতি তিনি একটু বেশী রূঢ় হয়েছেন। রাসেল তাঁর 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস'—বইখানিতে প্লেটো, কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন সত্য, কিন্তু লেখক রাসেলের প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করেছেন, তা ভূমিকায় বর্ণিত তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে। 'কাল ও অনন্ত' প্রবন্ধে রয়েস্ ঐ সমস্যা নিয়ে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন সে কথার কোন উল্লেখ নেই। 'আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি'—ডেকার্টের এই মৌলিক সত্যের উল্লেখ লেখক নানা স্থানে করেছেন। কিন্তু ডেকার্ট-দর্শনের অন্যতম টীকাকার নরম্যান্ কেমপ্-স্মিথ্ নজীর তুলে দেখিয়েছেন যে ডেকার্ট-দর্শনের মূলসূত্র অন্যত্র রয়েছে। আলোচ্য বইখানির ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক বার্কলীকে স্বয়ংসদ্‌বাদী (Subjective idealist) বলে অভিহিত করেছেন। আমার মনে হয় বার্কলীকে নিঃসন্দেহে "Objective idealist" বলা চলে। "মূল্যের স্বরূপ" প্রবন্ধে হার্টম্যানের উল্লেখ নেই, অথচ হার্টম্যান্ এই বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন এবং লেখকের মতবাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মিল আছে। "বিবর্তনের ধারা"—প্রবন্ধে অধ্যাপক এ ই টেলর-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। "Sparks from a Philosopher's Workshop"—অংশে লেখক অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক এই অংশ থেকে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাবেন।

ভূমিকায় ও স্মৃতি-প্রসঙ্গে লেখক-লেখিকারা গ্রন্থকারের চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তা, ছাত্রবাৎসল্য, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসার যে পরিচয় দিয়েছেন—তা সত্যিই দুর্লভ। লেখক শুধু দর্শনের অধ্যাপক নন, তাঁর জীবনই তাঁর দর্শন। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার (অধ্যাপক)

ধূমকেতু—(বিজ্ঞান),—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, O. A. R. E ; নক্ষত্র-রত্ন প্রণীত ; প্রকাশক—মেসার্স জি সি দত্ত এণ্ড কোং, প্রিণ্টার্স ও ষ্টেশনার্স—৯-এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১। পৃঃ ২৭০ ; মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এই পুস্তকের প্রবীণ গ্রন্থকার স্বয়ং একজন নক্ষত্রবিৎ ও গগন-পরিদর্শক এবং ইনি পূর্বে ভারত, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিশিষ্ট অনেক জ্যোতির্বিদ্যা-পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বর্তমানেও কয়েকটি নক্ষত্র-পরিদর্শন-প্রতিষ্ঠানের সভ্য রহিয়াছেন।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-পরিদর্শনে নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতার সহিত পাশ্চাত্ত্য নক্ষত্রতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিজ্ঞতার ফল মিলাইয়া জীবনব্যাপী সাধনার ফল বঙ্গ ভাষায় প্রকাশে উদ্যোগী এই মনীষীর নিকট বাঙালী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'পূর্বাভাস' নামক ভূমিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার সাধনা কেবল এই "ধূমকেতু" নামক গ্রন্থটিই সৃষ্টি করে নাই, 'সৌরজগৎ', 'সবিতা ও ধরণী' এবং 'নক্ষত্রজগৎ' নামক আরও তিনটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও রচনা করিয়াছে। ঐ ভূমিকার প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন, "দীর্ঘ চারি বৎসরাধিক মুদ্রাযন্ত্রের কুক্ষিগত থাকিয়া আমার প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'ধূমকেতু' লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইল।" ইহাও আবার শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দত্ত নামক জনৈক প্রিণ্টার্স ও ষ্টেশনার্স এর বদান্যতায় সম্ভব হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকে ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থান, গঠন, উপাদান, স্বভাব, প্রকৃতি, সূর্য-প্রদক্ষিণকাল, ঐ কালের পরিমাণ প্রভৃতি, প্রাচীন ও আধুনিক ধূমকেতুর জীবনেতিহাস, উহাদের স্থিতি, গতি, পরিণতি প্রভৃতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। বহু পাশ্চাত্য নক্ষত্রবিদের গবেষণার সহিত তাঁহাদের জীবনীও এই পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়, (১৪ পৃষ্ঠা) সূর্যসিদ্ধান্ত, সারদাতিলক, সিদ্ধান্তশিরোমণি, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থ এবং শব্দকল্পদ্রুম, মহাভারত, গরুড়-পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাদি সহ কেতুসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ একটি প্রবন্ধ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। ধূমকেতু বিষয়ে এই জাতীয় গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় বোধ করি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বাংলা সাহিত্যে কি ধরনের পাঠ্য-পুস্তকের অভাব আছে তাহার আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয় 'কি লেখা পড়ব' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৬০, ৭১২ পৃঃ) বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"আকাশ-রহস্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোনও বই নাই।" গ্রন্থকারের বর্তমান পুস্তকখানি ও অপ্রকাশিত তিনখানি পুস্তক এই অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে বলিতে পারা যায়।

পুস্তকখানিতে ধূমকেতুর ফটো ও রেখাচিত্রের ১৪ খানি ব্লক ছাপা আছে।

বিদ্বৎসমাজের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, এই আজীবন নীরব বিজ্ঞান-সাধক বিত্তহীন বৃদ্ধ মনীষীর বহু আয়াসে প্রথম প্রকাশিত 'ধূমকেতু' নামক পুস্তক প্রতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর জন্য রাখিয়া তাঁহারা বিদ্যার সমাদর করুন।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

শ্রীমা সারদা দেবী—শ্রীগৌরাঙ্গী রসিকলাল মেহতা প্রণীত। গুজরাত শ্রীশ্রীমা শ্রীসারদাদেবী শতাব্দী-মহোৎসব-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। মডেল হাইস্কুল, যি কান্ত রোড, আমেদাবাদ। পৃষ্ঠা—৩২ ; মূল্য—।৵০ আনা।

গুজরাতী ভাষায় এই পুস্তিকাখানিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবকাল হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশে মায়ের অমৃতময়ী কথা হইতে নির্বাচিত ২৫টি উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে। মুখবন্ধে কবিতায়

মাতৃ-প্রশস্তি, অন্তে 'মা সারদা' ও 'দক্ষিণেশ্বর তীর্থে মায়ের প্রথম গমন' শীর্ষক কবিতা দুইটি এবং শ্রীশ্রীমায়ের একখানি চিত্র ইহার সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছে।

সরল সহজ ভাষায় বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে অতি-রঞ্জনের বাহুল্য নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থের কাহিনীর সহিত কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়; সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশতই এইরূপ হইয়া থাকিবে। পুস্তিকার দ্বাদশ পৃষ্ঠায় আছে: "শ্রীশ্রীমা প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে শ্রীশ্রীঠাকুরের চুল ফেলিয়া দিলেন —শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি হইতে মনে হয়—তিনি ইহার পরে নিজের কেশরাশিও সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।" —ইহা সত্য নহে, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশের কথারই কেবল উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় আছে:—"পুরীতে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমা কিছুকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'দাসী'ভাবে সেবা করেন।" শ্রীশ্রীমায়ের মূল জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি একবার পুরীতে কয়েক মাস ছিলেন। মন্দিরের পাণ্ডা তাঁহাকে শিবিকায় মন্দিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে তিনি বলেন—না, তুমি আগে আগে পথ চলবে। আমি দীন হীন কাঙ্গালিনীর মত তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ-দর্শনে যাব।" অতএব দেখা যাইতেছে 'দাসী'-ভাবে সেবা করার ঘটনাটি অতিরঞ্জিত। জনৈক সন্ন্যাসীর আদেশে শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চতপা করার কাহিনীর মধ্যেও অতিরঞ্জন লক্ষিত হইল।

গুজরাতী পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তিকাটি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-পরিচিতির সহায়ক হইবে।

শ্রীকল্পলতা দেবী

শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা— স্বামী বেদান্তানন্দ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ শীল, মোহনালয় লিমিটেড, মেন রোড, রাঁচি; পৃষ্ঠা—১৫৪; মূল্য—১৲ টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের এই 'জীবনকথা' পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। মায়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সরস বর্ণনার সহিত তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজ ভাষায় সুন্দর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তরুণ-দিগের বইটি ভাল লাগিবে এবং ইহার মাধ্যমে দেবী-মানবীর জীবনাদর্শের প্রতি তাহারা আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বইটি পড়িয়া ইহা কিশোরদের ভিতর প্রচার করুন ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। বইএর মূল্য আকারের তুলনায় কমই বলিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১—রয়াল অক্টেভো ১৫২ পৃষ্ঠার বহু-চিত্র-শোভিত চমৎকার কাগজে সুমুদ্রিত পশ্চিম বাঙলার নানা তথ্যসম্বলিত এই বার্ষিকী প্রকাশের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রারম্ভে কবিগুরুর আশীর্বাণী (১৩৪৬ সালের একটি ভাষণ হইতে লওয়া) এবং তৎপরবর্তী প্রবন্ধ 'বাঙলার সংস্কৃতি' (ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত) বাঙালীর আত্ম-সম্বিৎকে উদ্বুদ্ধ করিবে। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক ভাবে দেওয়া হইয়াছে।



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

সংবাদ

সান্‌ফ্রান্সিস্কো (উত্তর কালিফোর্নিয়া) বেদান্ত সোসাইটি— ২৯৬৩, ওয়েবষ্টার ষ্ট্রীট্, সান্‌ফ্রান্সিস্কো— ২৩ স্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে গত ডিসেম্বর (১৯৫৩) মাসে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ 'ভগবান এখানেই আছেন, এ মুহূর্তেই আছেন', 'বুদ্ধি হইতে বোধি', 'আমার জানা এক মহাপুরুষ', 'আমরা কেন বাঁচি, কেনই বা মরি ?', 'ভগবানে মানুষ, মানুষে ভগবান্' ও 'খ্রীষ্ট যথার্থই আমাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন ?' বিষয়ে আলোচনা করেন। সহাধ্যক্ষ স্বামী শান্তস্বরূপানন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আমেরিকার যে ধর্মের দরকার' এবং 'মনের শক্তিসমূহ'। গত জানুয়ারী মাসে স্বামী অশোকানন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আমাকে অনুসরণ কর; মৃতগণ নিজেদের মৃত সমাহিত করুক', 'অন্তরাত্মা ভগবানের জন্য ব্যাকুল', 'বুদ্ধিবৃত্তি কতদূর যাইতে পারে ?' 'কুণ্ডলিনী-শক্তি', 'ভগবান কে ও কি ?', 'ঈশ্বরাবতার কিভাবে তাঁহার পার্ষদ নির্বাচন করেন' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার নবধর্ম'। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ 'কর্তব্য ও অনাসক্তি এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

স্বামী অশোকানন্দ প্রতি শুক্রবার সায়াহ্নে সোসাইটির সদস্যগণকে ধ্যানশিক্ষা দেন ও বেদান্ত-দর্শনসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার বালকবালিকাগণকে বেদান্তের সর্বজনীনভাব শিক্ষা দেওয়া হয়। সকল ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ-গণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবার শিক্ষাও তাহারা লাভ করিয়া থাকে। গত ৩১শে জানুয়ারী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্বামী অশোকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তীর কতকগুলির বিবরণ আমরা বৈশাখসংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসে আরও কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উৎসব দিবসত্রয় ধরিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল) সন্ধ্যায় জেলার জজ শ্রীযুত ডি এন হাজারিকা মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরসময় কাব্যতীর্থ, মহকুমাশাসক শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সরকারী উকিল শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত দত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরাম কৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় অতি মনোজ্ঞভাবে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণপ্রদান করেন। পরের দিন রবিবার সপ্তদিনব্যাপী পূজার্চনা, ভজন, পদাবলীকীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। অন্যূন ৮ হাজার নরনারীর মধ্যে ২৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুরুষাত্মানন্দ আলোক-চিত্র-সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি করেন।

রাঁচি ওয়েলফেয়ার সেণ্ট্রাল হলে রামকৃষ্ণ মিশন ও রাঁচির জনসাধারণ কর্তৃক ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হইয়াছে। স্বামী সুন্দরানন্দের সভা-পতিত্বে এই স্থানে এক জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর ব্যাপকতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাঁচি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীএন কে গোরী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইহার পর ইন্দুভূষণ

সেনগুপ্ত মহাশয় ধর্মের মহিমা নামক গল্পের অবতারণা করেন। গল্পদ্বারা তিনি সকলকে বলেন যে, ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে অবশেষে জয় হইবে। সভাপতি মহারাজ বলেন, ভারতবর্ষ বর্তমানে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীর মনের পরিবর্তন হয় নাই। প্রথমে তাহাদের মনের পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, মানুষকে যদি আমরা সম্মান না দিই বা শ্রদ্ধা না করি, তাহা হইলে আমরা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইব। সেই জন্য আমাদিগকে ভগবৎপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই সভায় বিহার-সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের শিল্পিবৃন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন যথারীতি পূজার্চনাদির অনুষ্ঠান হয়। প্রায় দুই সহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদগ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণ-কথামৃত (ইংরেজীতে) পাঠ এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ ইংরেজীতে ও শ্রী কে বালসুব্রহ্মণ্য আয়ার তামিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় আলোচনা করেন। ১৪ই মার্চ সাধারণ উৎসবের দিন সকালে প্রায় ষাট্ জন ভক্ত (অধিকাংশই তরুণ) 'গস্পেল অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ দি গ্রেট্ মাষ্টার' গ্রন্থদ্বয় হইতে 'পারায়ণ' করেন। অতঃপর মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসিকর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা এবং মধ্যাহ্নে শ্রীরামস্বামী ভাগবতার কর্তৃক উক্ত বিষয়েই 'হরিকথা কালক্ষেপম্' (কথকতা) নির্বাহ হয়। অপরাহ্নে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার-পতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় অধ্যাপক শ্রী এন্ ভক্তবৎসলম্ তেলেগুতে, শ্রী পি রামকৃষ্ণন্ (মাদ্রাজের প্রধান জেলা-শাসক) ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক আর্ বিশ্বনাথন্ তামিলে মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে যুগাবতারের জীবন এবং বাণীর মর্ম ও প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

উতকামণ্ড (নীলগিরি) শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমে উৎসব আয়োজিত হইয়াছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী। উহার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীও সংযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব-সূচীর অঙ্গ ছিল সকালে পূজা ও ভজন, মধ্যাহ্নে 'অন্নদানম্' ও কণ্ঠসঙ্গীত এবং সায়াহ্নে জনসভা। সভাপতি ছিলেন বোম্বাই-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রী এম্ বি বেণুগোপাল পিল্লাই এবং স্বামী চিদ্‌ভবানন্দ।

শিলং-কেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯-তম জন্মজয়ন্তী আসাম রাজ্যের সরবরাহমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কে এন দত্ত, শ্রী আর এন চ্যাটার্জী এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আলোচনা-সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আধুনিক জগৎ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তিথিপূজার দিন (২২শে ফাল্গুন) ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্থানীয় দুইশত ভক্ত আশ্রমে বসিয়া প্রসাদগ্রহণ করেন। পরদিবস (২৩শে ফাল্গুন, রবিবার) ১২০০ নরনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়। বৈকালে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ ও চিত্তরঞ্জন কারখানার শ্রী এম্ এন্ ঘোষ।

বাগেরহাট (পূর্ব পাকিস্তান) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১০ই বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় দেড় সহস্র নরনারীকে পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ তাঁহার মধুর ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ঐ দিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে ও পর দিবস শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা

সারদাদেবীর জীবন, লীলা ও নবযুগের প্রবর্তনকারি-রূপে তাঁহাদের আগমন-বার্তা ও উপদেশ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গো-পালন—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিজস্ব গোশালা—'সুরভি-কানন'-এর ১৯৫২ সালের কার্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকের 'মাড়োয়ারী বাগানে' (যাহা কয়েক বৎসর পূর্বে বেলুড় মঠ ক্রয় করিয়াছেন) এই গোশালা স্থানান্তরিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গাভী, ষাঁড় এবং বৎস মিলিয়া ৩০টি পশু ছিল। এক সময়ে ৪ হইতে ১০টি গাভী দুধ দিয়াছে। মাসিক উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ছিল ১১৫০ সের হইতে ১৫৫০ সের পর্যন্ত। আলোচ্যবর্ষে গোশালার মোট আয় ১৬,১২৯৵০ আনা, মোট ব্যয় ১২,৪৪৩৷৶১৫ পয়সা। উন্নত বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবাদির পালন এবং চিকিৎসার বহুবিধ ব্যবস্থা এই গোশালায় করা হইয়াছে। গো-পালনে উৎসাহী মঠ-দর্শনার্থিগণ এই গোশালা দেখিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমা-শতাব্দীজয়ন্তী—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শততম জন্ম-জয়ন্তী এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬ই চৈত্র হইতে একপক্ষ-ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আন্দুলের কালী-কীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের ও ঠাকুর-স্বামিজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, ময়নাডাল সম্প্রদায় কর্তৃক মাথুর ও মানভঞ্জন কীর্তন এবং সশিষ্য শ্রীনবনী দাসের বাউল নাচ ও গান প্রথম পাঁচদিনের কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল। ১২ই চৈত্র প্রাতে বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি ও সায়াহ্নে কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী পি কে গুহের পরিচালনায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধাত্মানন্দ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর জাতিগঠনমূলক ভাবধারার আলোচনা করেন। ১৩ই প্রাতে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতনায়ক শ্রীঅতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয় এবং অপরাহ্ণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীশিউবালক রায় ও স্বামী বোধাত্মানন্দ ভাষণ দেন। ১৪ই ও ১৫ই চৈত্রের সভায় বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীশিউবালক রায় ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ; শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় পদকীর্তন পরিবেশন করেন। ৩০শে মার্চ (১৬ই চৈত্র) শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা এবং আশ্রমস্থ হাই স্কুলের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয়। শিশুসাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ভাষণ দেন। বাকী কয়দিনের কর্মসূচী ছিল প্রখ্যাত সুরশিল্পীদের সঙ্গীত, নরনারায়ণসেবা, আশ্রমে নাট্যাভিনয়, শারীরিক ক্রীড়াকৌশল, আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রদের হস্তশিল্প-প্রদর্শনী।

৪ঠা বৈশাখ কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূরে বেলঘরিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস হোমের নূতন আবাসে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে যথোচিত নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে এই দিন বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও কীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে সুপ্রশস্ত মণ্ডপতলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়; অন্য বক্তা ছিলেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) এবং স্বামী সাধনানন্দ।

কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে ২০শে মার্চ, অপরাহ্ণে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশত-

বার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হয়। একটি সুসজ্জিত বেদিতে শ্রীমার এক রঙীন চিত্র রক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে মিশনের কার্যকরী সভার কতিপয় সদস্য ও কর্মকর্তাদিগের সহিত কেন্দ্র-পরিচালক স্বামী অসংগানন্দ, কলম্বোর অর্থমন্ত্রী মাননীয় স্যার অলিভার গুণেটিলেক এবং কলম্বোর পৌর-সভার সভাপতি শ্রীটি রুদ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। বক্তৃতা-কক্ষে শ্রীমার শতবার্ষিকী-সভার সভ্যদিগের সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর মন্দিরে যাইয়া তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্পপ্রদান করেন। ইহার পর তাঁহাকে মঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত শ্রীমা সারদাদেবীর আলোক-চিত্রে মাল্যপ্রদান করিলে পর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রার্থনা এবং প্রারম্ভিক ভাষণাদির পর শ্রীযুক্তা পণ্ডিত সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। (এই সংখ্যায় ২৩৯ পৃষ্ঠায় উহা পৃথক ভাবে মুদ্রিত হইল)।

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীমা-শতবার্ষিকীর কর্মসূচী ছিল বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং একটি মহিলাসভা। জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় আটশত মহিলা সভায় যোগ দেন। সভানেত্রী ছিলেন জেলাশাসকের পত্নী মিসেস বি কে রায়।

শিলং রামকৃষ্ণমিশন প্রাংগণে ২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) হইতে শ্রীশ্রীমার পঞ্চদিবসব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-ও বাণী-মূলক একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোতিরাম বোরা। শেষের দিনে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় ছয় হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত ও নরনারায়ণ সেবা হয়। শিলং ও তৎ-পার্শ্ববর্তী সকল দিক এবং খাসিয়া পাহাড়ের আভ্যন্তর অঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই প্রদর্শনী দেখিতে আসেন।

এই উৎসবের কার্যসূচীর মধ্যে ছিল মঙ্গলারতি, ভজন, বেদপাঠ, বিশেষপূজা, হোম, চণ্ডী গীতা ও উপনিষৎপাঠ, ধর্মসভা, রামনাম-সংকীর্তন, কালী-কীর্তন, পদকীর্তন, সঙ্কীর্তনসহ শোভাযাত্রা, ভক্তি-মূলক ও উচ্চাংগ সংগীত, কুমারীপূজা, ব্যায়াম-প্রদর্শন, আলোকচিত্র, প্রদর্শন, সাধারণ সভা এবং পাঁচদিনের মধ্যে একদিন মহিলাদিবস। বিভিন্ন দিনের সভার পরিচালনা করেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী ও শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকরী সভার সভাপতি শ্রীঅমিয়কুমার দাস, লেডি কেইন কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য, শ্রীমহাদেব শর্মা, আসামের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল শ্রী এ কে মুখার্জি এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী অবিনাশানন্দজী। বিভিন্ন বক্তা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ ইংরেজী, আসামী, খাসী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। আসামের বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায় যে লিখিত প্রবন্ধ পাঠান তাহা মহিলাদিবসের সাধারণ সভায় পঠিত হয়। কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত গায়কের সংগীত জনসাধারণ কর্তৃক খুবই আদৃত হইয়াছিল। শিলংএর সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই অনুষ্ঠান এক প্রবল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

প্রাচ্যবাণী-মন্দির— সম্প্রতি প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয়ের অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিগত এক বৎসরের

মধ্যে প্রায় দশ সহস্র টাকা পরিষদের উন্নতিকল্পে প্রদানের নিমিত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে প্রায় চারি হাজার হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং বিগত ১১ বৎসরে তাঁহারা ১১০টি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের শাখাসমূহ বিশেষভাবে ভারতীয়-সভ্যতার প্রচারমূলক কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই সভার উদ্বোধনকারী ডক্টর শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও প্রাচ্যবাণীর কৃষ্টিপ্রচারমূলক কার্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ কর্তৃক শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। অভিনেতৃগণের, বিশেষতঃ অভিনেত্রীগণের উচ্চারণ-বৈশুদ্ধ্য ও নাট্যকৌশল সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

বসিরহাটে অনুষ্ঠান—স্থানীয় টাউন হলে গত ১২ই বৈশাখ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অপরাহ্ণে বেলুড় মঠের স্বামী গোবিন্দানন্দের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য, শ্রীগণেশ বিশ্বাস চৌধুরী, অধ্যাপক নৃপেন গোস্বামী ও শ্রীমতী কমলরাণী ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, জীবনী, বাণী ও ভাবধারা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বহির্বঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজাহোমাদি ও প্রার্থনা এবং ভজনগান হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি মর্মরমূর্তি আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আজমীরের রাজ্যপাল শ্রী এ ডি পণ্ডিত প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পূজোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে একটি জনসভায় অধ্যাপক পি শেষাদ্রিজী, শ্রীকিষণলাল দুবে, আজমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় ও শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৩শে ফাল্গুন স্থানীয় টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি মঞ্চোপরি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। আজমীরের রাজ্যপাল শ্রী এ ডি পণ্ডিত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীব্রহ্মদত্ত ভার্গব, শ্রীকিষনলাল দুবে ও ব্রহ্মচারী মনোহরলাল এবং আশ্রম-সেবক স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে জনসেবায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান-সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুপম ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত করার মহান্ কর্মে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান জানান।

রামগড়ে (হাজারিবাগ) গত ৭ই চৈত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী প্রচুর উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজাকৃত্যাদিব্যতীত অপরাহ্ণে রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং 'উদ্বোধনে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দের পরিচালনায় এক জনসভা হয়। এই সভায় জাতিধর্মনির্বিশেষে রামগড়ের বিশিষ্ট নাগরিকেরা যোগদান করেন। রাঁচি ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী ও অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার বসু যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলাতে ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী এবং তাঁহার উপদেশাবলী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতি মহারাজ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর তাৎপর্য তাঁহার বিশ্লেষণাত্মক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে ব্যাখ্যা করেন।



দর্শন-প্রতীক্ষায়

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্রীজগন্নাথস্তোত্র

মহাসাগরের তীরে, কনকবর্ণ নীলাচলশিখরে, পাবন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গগনচুম্বী দেব-প্রাসাদ। মন্দিরবেদির এক পার্শ্বে সহোদর মহাবীর বলভদ্র এবং মাঝখানে ভগিনী সুভদ্রাদেবীকে লইয়া প্রভু জগন্নাথ তাঁহার লোকোত্তর মহিমায় সমাসীন। সমস্ত সুরগণ পরাৎপর শ্রীভগবানের সেবায় উন্মুখ। মর্ত্যের সামান্য মানুষ আমিও যুগ যুগ সঞ্চিত কত প্রতীক্ষা লইয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। জগন্নাথ, আমি তো জগৎ ছাড়া নই, নাথ। অহেতুক কৃপাময়, আমার নয়নপথে আসিয়া এই অকিঞ্চনকে আজ কৃতার্থ কর।

দয়ার যিনি পারাবার, সজল জলদশ্রেণীর ন্যায় শ্যামল সুন্দর যাঁহার অঙ্গকান্তি, সর্ব-সৌভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মী ও সর্ববিদ্যারূপিণী সরস্বতীর যিনি প্রীতিবর্ধন, বিকসিত নির্মল নয়নপদ্মশোভিত যাঁহার মুখ দেখিয়া চিত্তের সকল মোহ, সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়, সেই সকলদেবগণারাধ্য সকলবেদবন্দিত জগন্নাথ স্বামী দৃষ্টিপথে আসিয়া আজ আমার মানব জন্ম ধন্য করুন।

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম ও অলৌকিকতা

"যোগী ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চিত্ত সংযত করিয়া অন্তরলোকে যে সত্যের ও শান্তির সুস্পষ্ট সন্ধান পান তাহা সংসারের হাজার হাজার লোকের নিকট রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। এই হাজার হাজার লোক প্রাত্যহিক জীবনের আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, টাকা রোজগার—ইহাদের বেশী বড় কিছু ভাবিতে পারে না, চায়ও না। এইগুলিই তাহাদের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার। পক্ষান্তরে—অতিবাস্তব, অতিমূল্যবান এই যে বিষয়ভোগের পশ্চাতে ছুটাছুটি—সত্যদ্রষ্টা মুনি ওখানে জাগিয়া নাই; তাঁহার কাছে উহাদের সার্থকতা, আকর্ষণ, মূল্য—এই সব কিছুর উপরেই যেন এক নৈশ গাঢ় অন্ধকারের প্রলেপ মাখানো রহিয়াছে।"

এই কথাগুলি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যক শ্লোকের ভাববিস্তার সাধারণ বিষয়ী লোক আর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এই দুইজনের পার্থক্য যে শুধু তাঁহাদের চোখের চশমায়—জগৎ-সংসারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে—এই জিনিসটিই যেন শ্রীকৃষ্ণ এখানে বুঝাইতে চাহিতেছেন। একজনের কাছে যাহা দিন, সেখানে অপরে দেখে রাত্রি। একজন যাহা মনে করে কুহেলিকাময়ী নিশি, তাহাই হইয়া দাঁড়ায় অপরের চোখে সূর্যোদয়। দুইজনই রক্ত-মাংসের মানুষ, পৃথিবীর দেহধারী মানুষ, কিন্তু দুইজনের ভিতরটা সম্পূর্ণ আলাদা। একজনকে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ অনবরত নাকানিচোবানি খাওয়াইতেছে, একটুও বিশ্রাম দিতেছে না—অপরে বিষয় আকর্ষণের মূলদেশে শ্রীভগবানকে আবিষ্কার করিয়া ক্ষণিক ভোগবাসনা বর্জন করিয়াছেন, শাশ্বত সত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পরমা শান্তিলাভ করিয়াছেন। একজন মোহাচ্ছন্ন, অপর-জন মোহমুক্ত। একজনের জগৎ ও জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন হুঁশ নাই—অপরের নিকট সেই তথ্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত।

ধর্মজীবনে যদি কোন অলৌকিকতা থাকে তো উহা উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকুই। লক্ষ লক্ষ লোকের দেখা দিবালোককে যিনি রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় মনে করেন তাঁহার দৃষ্টি অলৌকিক তো বটেই—কিন্তু উহা তাঁহার নিজের হৃদয়-মনের একটি রূপান্তর ছাড়া আর কিছু কি? ধর্মসাধনায় এবং উহার সিদ্ধিতে যদি কোন রহস্য থাকে তবে তাহা এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনই, অপর কিছু নহে। আমাদের ভিতরে যে একটি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ বিষয়ভোগমত্ত পশু-মানুষ বসিয়া আছে, জীবনের রঙ্গমঞ্চে একনায়কত্ব করিতেছে, তাহাকে নূতন কাপড় পরাইতে হইবে, তাহার প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া তাহার অহ-মিকার উষর মরুভূমিতে ভগবানের প্রেমধারা বহাইতে হইবে। কঠিন কাজ—জীবনভোর অক্লান্ত পরিশ্রমের কাজ—কিন্তু যদি কোনক্রমে সিদ্ধ হয়, তখন দেখা যাইবে কী অদ্ভুত ত্রিলোক-বিস্ময়কর কাজ! দেবতারা পর্যন্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিবেন মর্ত্যদেহধারী মানুষের সেই সিদ্ধি দেখিয়া। আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার, ভূমিগর্ভে কুম্ভক করিয়া থাকিবার বা কয়েকমাস অনাহারে কাটাইবার সিদ্ধি নয়, অণিমা-লঘিমা-ব্যাপ্তি, ব্যাধি সারানো, ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া ইত্যাদ্যাকার সিদ্ধিও নয়—দুর্বার ইন্দ্রিয়গ্রাম-বশীকরণের সিদ্ধি, চিত্তে সমতার, হৃদয়ে পবিত্রতার, প্রাণে বিশ্বাস-ভক্তির সিদ্ধি, নিঃস্বার্থ জীবনে উদার মৈত্রীর, সেবার সিদ্ধি।

অনেক সময়েই কিন্তু আমরা ধর্মানুভূতির এই লক্ষ্যকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে চাই না। মনে করি উহা যেন অতি একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যহীন, নির্জলা ব্যাপার। কিছু আড়ম্বর না দেখিলে আমরা যেন খুশী হইতে পারি না, কিছু 'যোগশক্তি'র পরিচয় না

পাইলে ধর্মাদর্শকে পুরা গ্রহণ করি না। আমাদের মনে রাখা উচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার বালক ভক্তগণকে কিভাবে সাবধান করিয়া দিতেন। স্বামী সারদানন্দজী বর্ণনা করিতেছেন—

"ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন, 'যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি-তিলকের বিশেষ আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট (sign-board) মেরে নিজেকে বড় সাধু বলে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি নি।'"

(শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়)

নাট্যকার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষের সহোদর ভ্রাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ (ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন) বলিতেন, "ঠাকুরের miracle (যোগবিভূতি) যদি দেখতে চাও তো লাটুমহারাজকে দেখ।" সমাজের নিম্নস্তরের একজন শিক্ষাদীক্ষাহীন সামান্য মেষপালক বালকের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশসাধন—ইহাই বক্তার মতে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্তি।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"সকল অনিত্যবস্তুর মধ্যে সর্বকারণ নিত্য পরমাত্মা রহিয়াছেন, সকল সজীব প্রাণীর তিনিই চেতনা, সকল বহুত্বের পিছনে তিনিই 'এক' থাকিয়া সব কিছু বিধান করিতেছেন। যাহারা নিজের সত্তায় তাঁহাকে দেখিতে পারিয়াছে তাহারাই ধীর—যথার্থ কৌশলী, তাহারাই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অপরে নহে।" (কঠোপনিষৎ, ২।২।১৩)

অর্থাৎ, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে আবিষ্কারই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই কাম্যকে লাভ করিতে গেলে অবশ্যই কিছু অসাধ্যসাধন করিতে হয় (সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন,—শিবেরও অসাধ্যসাধন মন মজানো রাঙাপায়, নিগুর্ণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।), অবশ্যই উজানপথে নৌকা বাহিতে হয়; কিন্তু সেই অসাধ্যসাধন নিশ্চিতই এমন কিছু নয় যাহা রাস্তার লোকের ভিড় টানিয়া আনিবে। আবার কমলাকান্তেরই ভাষায়—"মন, তুই দেখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

ধর্মজীবন যে নীরব চেষ্টার জীবন, ধর্মানুভূতি যে নিভৃত অন্তরলোকের দীপ্তিবিশেষ—এইটিই ভাল করিয়া মনে রাখিবার। ইহাই ধর্মের অলৌকিকতা। আর যাহা কিছু তাহা শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের ভাষায়—'উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেষঃ'—উদরপূর্তির জন্য নানা বিচিত্র সাজসজ্জার আড়ম্বর মাত্র; অথবা ফ্রান্সিস্ বেকনের সংজ্ঞানুসারে—মানুষের চিত্তবিভ্রমকারী 'নাট্যমঞ্চের পুতুল' (Idols of the theatre)—সাজানো কতকগুলি বুলি, মনগড়া রঙীন কতকগুলি কল্পনা—সত্যের সহিত যাহাদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।৬।৩)

ধেই ধেই করিয়া নাচার অর্থ আড়ম্বর, অনাবশ্যক আত্ম-প্রচার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ধর্মানুভূতির সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। সংসারের আর দশজনেরই মত বেশভূষা লইয়া, দশজনের একজন হইয়া দশজনের মতো হাটবাজার করিয়া, খড়ের চাল মেরামত করিয়া চলিতে থাকিলে তত্ত্বজ্ঞান পচিয়া যায় না। হয়তো দশজনের মধ্যে বসিয়া থাকিলে তত্ত্বজ্ঞকে ধরিতেই পারা যাইবে না (শ্রীরামকৃষ্ণকে কত সোনার চশমা আঁটা কলিকাতার বাবু কালীবাড়ীতে আসিয়া মনে করিয়া গিয়াছেন বাগানের মালী!) কেন না, শ্রীমা সারদা দেবীর ভাষায় ভগবানকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মাথায় দুটি শিং গজায় নাই। কিন্তু সেই ঠিকানায়-পৌঁছিয়া যাওয়া লোকটির হৃদয়-মন? উহা যে স্বর্ণ-নির্মিতা বারাণসী!

উহার যে তুলনা নাই। উহার অলৌকিকতা যে মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না।

আজিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বপ্রকৃতির কোন ক্ষেত্রেই জটিলতা, কুয়াসা সহ্য করিতে পারে না। যাহা ভারী তাহাকে হাল্কা করিয়া দেওয়া, যাহা মন্থর তাহাতে গতি সংক্রামিত করা, যাহা অদৃশ্য তাহা দৃষ্টির কক্ষে লইয়া আসা—ইহাই আজ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার লক্ষ্য। বিজ্ঞান আজ শুধু ভৌতিক প্রকৃতি লইয়াই নাড়াচাড়া করে না, উহার গবেষণা-পরিধি বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে মানুষের চিন্তা আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রেও—তাহার মনস্তত্ত্বে, সমাজ-নীতিতে, ইতিহাসে, দর্শনে। ধর্মও বাদ পড়িবে না। ধর্মের মধ্যে যাহা সত্য, চিরন্তন তাহা থাকিবে, পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মর্যাদা পাইবে—যাহা মিথ্যা, দুর্বল, মাত্র সাময়িকউত্তেজনা-দায়ী তাহাই লোপ পাইবে, তাহাদের প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে।

ধর্মের সহিত যে সকল অলৌকিকতা জড়িত করিয়া সহস্র সহস্র 'বিশ্বাসী' ভ্রান্ত মুগ্ধতায় ধর্মের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেই বঞ্চিত থাকিয়া যাইত উহাদের অনেক কিছুই যদি এই বিশ্লেষণ ও আঘাতে ধসিয়া পড়ে তাহাতে মানুষের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ধর্মের মধ্যে যাহা যথার্থ অলৌকিক তাহা মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত ধার্মিকতা সাধিতে পারিবে।

কি ভাবে এবং কতটা ভাঙ্গিব ?

(ক) "হিন্দু সমাজের মূল গঠন সম্বন্ধে যাঁর একটুও ধারণা আছে তিনি বেশ ভাল করেই জানেন যে, যতদিন পর্যন্ত বর্ণ (জাতি)-ভেদ প্রথা থাকবে ততদিন অস্পৃশ্যতা দূর হবার নয়। অতএব বর্ণপ্রথার উপর সামনাসামনি আক্রমণ চালানো দরকার। * একটি অস্পৃশ্যের যত গুণই থাকুক হিন্দু ধর্মে এমন কোন ব্যবস্থা নেই, যার দ্বারা সে বা তার পরবর্তী সহস্রতম বংশধর অস্পৃশ্য ছাড়া অপর কিছু হতে পারে। এ অযথার্থ বিধান ঘুচবে না যতক্ষণ বর্ণপ্রথা রয়েছে। অতএব যাঁরা অস্পৃশ্যতা বন্ধ করতে শুধু মুখের নয়—হৃদয়ের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁদের উচিত বর্ণপ্রথা ভেঙ্গে ফেলার জন্য কার্যকরী উপায় অবলম্বন করা।

জাতিভেদ প্রথার মারাত্মক বিষ হিন্দুসমাজে এমন ভাবে মিশে গেছে যে, যিনি খুব প্রগতিশীল তিনিও পর্যন্ত অজানতে নিজের জাতির দিক চেয়েই চিন্তা ও কাজ করেন। বাহির থেকে মনে হয় যে ইচ্ছাপূর্বক জাতিবিচার তিনি করছেন না, কিন্তু অভ্যাসের শক্তি এমনই দৃঢ় যে, অনেক ক্ষেত্রেই কোন্ এক অনির্জ্ঞাত প্রভাব তাঁকে চালিত করে জাতিভেদ মানতে।"

—শ্রীজগজীবন রাম

(খ) "চারটি সহজ শব্দ—শিক্ষা দাও, রক্ষা করো, পুষ্টি দাও, সেবা করো। যিনিই কোন পরিবারের কর্তা, পোষ্য-বর্গের প্রতি তাঁহার যেমন এইগুলি আবশ্যক কর্তব্য সেইরূপ বৃহৎ-পরিবার অর্থাৎ সমাজের প্রতিও শাসকবর্গের ইহাই করণীয় কাজ। শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে গেলে চাই বিদ্বৎসম্প্রদায়—মনস্বিবৃন্দ অর্থাৎ প্রাচীন সংজ্ঞানুসারে 'ব্রাহ্মণ'গণ (বর্তমান কালে এই শব্দটি তুলিয়া শিক্ষক বা অধ্যাপক শব্দ বসানো উচিত, কেননা ব্রাহ্মণের প্রকৃত অর্থ যাহা তাহা আজকাল আর ঐ শব্দ দ্বারা বুঝায় না)। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজন নির্বাহিক-বর্গ—ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস, সৈন্য অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়' ('রক্ষক' বলিলে ভাল); 'পুষ্টি' সম্পন্ন করিতে হয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহায়তায় অর্থাৎ 'বৈশ্য' (বা পোষক)দের দ্বারা; সমাজের নানাবিধ সেবার কাজের জন্য চাই শিল্পজীবী—যাহারা হাতের কাজ করিবে অর্থাৎ 'শূদ্র' (সহায়ক, ধারক বা শ্রমিক বরং ভাল কথা)। এই চারটি সুনির্দিষ্ট 'আকার' দ্বারা প্রকৃতি মানুষকে চার বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। আজিকার সোভিয়েট রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনে এই বিভাগ বর্তমান। জীবনের বহু দুর্বিপাক, ভ্রান্তি, ব্যর্থতা—যাহাদের পরিণাম অনেক সময়ে আত্মহত্যা ও উন্মাদ অবস্থা—ঘটে, মানুষকে তাহার মানসিক গঠন ও স্বাভাবিক যোগ্যতার বিরোধী কাজে অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া যোগ দিতে হয় বলিয়া। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহাদের হুঁশ হইয়াছে—তাই তাঁহারা আজকাল স্কুল কলেজে মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞ 'বৃত্তি-নির্দেশক' (Career Masters) নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রের মানসিক ঝোঁক ও ক্ষমতা নির্ণয় করিয়া লন এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তির সুবিধার জন্য কে কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করিলে ভাল হইবে তাহা বলিয়া দেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই কাজটির ভার লইতেন গুরুকুলের আচার্যেরা। * * *

আচার্যই বলিয়া দিতেন কোন্ বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ-কাজের যোগ্য, কে ক্ষত্রিয়-বৃত্তির উপযোগী, বৈশ্য-কার্যই বা কাহার করা উচিত ইত্যাদি। উহাই হইত বিদ্যার্থীর প্রকৃত জাতি বা বর্ণ—জন্মগত জাতি নয়। * * * সমাজের সুসংহতি বলিতে কি বুঝায় তাহা চারিপ্রকার 'বর্ণের' নামগুলি হইতে সুস্পষ্ট। যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন আছে—কিন্তু আমরা চাইনা ব্রাহ্মণরাজ্য, পৌরোহিত্যের অত্যাচার, পুঁথি-শাহী। ক্ষত্রিয় চাই বই কি—কিন্তু চাইনা সার্বভৌম নরপতিত্ব, একনায়কত্ব, যুদ্ধবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, লাঠি-শাহী। * * বৈশ্যেরও দরকার আছে, কিন্তু দরকার নাই বৈশ্যরাজ্যের, বাঁধনহীন পুঁজিবাদের, 'থলিশাহী'র। সর্বশেষে শূদ্রও আমাদের চাই—শারীরিক শ্রম যাঁহারা করিবেন। ভরণ-পোষণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা ইঁহাদের দিতে হইবে—কিন্তু আমরা চাইনা, শূদ্ররাজ্য, মজদুর-বাদ, 'হুলড়-শাহী'। * * * শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, ধনধান্যবল, শ্রমবল এই চারিপ্রকার শক্তির প্রতীক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিবর্ণের পরস্পরের সহিত সুসম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। উহারা মাথা, হাত, মধ্য-দেহ এবং পা—শরীরের এই চারি অংশের ন্যায় পরস্পরের সহায়ক, প্রত্যেকেই সমাজের অপরিহার্য। প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করুক সমাজের পুষ্টি ও সুপরিচালনার জন্য, কিন্তু কেহ অপরের অধিকার ও কর্মে যেন ব্যাঘাত না আনে।"

—ডক্টর ভগবান দাস

একই বিষয়ের একটি পূর্ণতর চিত্র দেখিবার জন্য পর পর আমরা দুটি উদ্ধৃতি সাজাইয়াছি। হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথা বর্তমান আকারে যেরূপে আছে এবং ক্রিয়াশীল রহিয়াছে তাহার বহুতর অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ব্যাপক সচেতনতা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামের বিকানীরে প্রদত্ত একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতা হইতে যে কথাগুলি আমরা তুলিয়াছি ('ক' উদ্ধৃতি) তাহার জায়গায় জায়গায় এই আবেদনই পরিস্ফুট। এমন সহস্র সহস্র উচ্চশিক্ষিত হিন্দু বাস্তবিকই আছেন যাঁহারা হিন্দু-ধর্মের হয়তো কিছুই মানেন না কিন্তু হিন্দুসমাজের জাতিভেদের নাগপাশ হইতে নিজেদের তাঁহারা মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং বোধ করি মুক্ত হইতেও চান না। জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা সমাজ-দেহের অনেক বিষ সহ্য করিয়া চলেন। যে বিচার, তীক্ষ্ণবিশ্লেষণ, চিন্তা ও আবেগের বিদ্রোহ লইয়া তাঁহারা 'পুতুলপূজা' মঠ-মন্দির-তীর্থস্নান-ব্রত-জপ-শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 'মুর্দাবাদ' ঘোষণা করেন, সেই বীরত্ব ও সাহস থমকিয়া যায় যখন জাতি-সংক্রান্ত কোন কুরীতি বর্জন করিবার কথা উঠে। আজ আর্থিক বিপর্যয়ে ব্রাহ্মণসন্তান যখন জুতার দোকান দিতেছেন, তাঁতিবংশোদ্ভব শিক্ষিত ব্যক্তি যখন অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন তখন জাতিগৌরবের অর্থ নিশ্চিতই আর পূর্বের মতো নাই। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করিবার নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাশয় এবং তাঁহার ন্যায় বর্ণপ্রথাকে সম্মুখাক্রমণ (frontal attack) করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের দু'একটি জিনিস মনে রাখিলে ভাল হয়।

(১) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ এক জিনিস নয়। বর্ণপ্রথা হিন্দুসমাজেরই প্রথা। বর্ণপ্রথার অপ-প্রয়োগের জন্য দায়ী হিন্দুদের 'ধর্ম' নয়—সমাজ। ঐ প্রথা সামাজিক প্রয়োজনে বিস্তারলাভ করিয়াছে—ধর্মের প্রয়োজনে নয়।

(২) বর্ণপ্রথা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যখন প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন উহা একটি উদার বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। ঐ বৈজ্ঞানিক রীতি আজও পরিবর্জনীয় নয়। ডক্টর ভগবান দাস ইহাই তাঁহার প্রবন্ধে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৮।২।৫৪) দেখাইয়াছেন। (উপরোক্ত 'খ' উদ্ধৃতি)।

(৩) জাতিভেদপ্রথাই যে অস্পৃশ্যতার জন্য দায়ী তাহা বলা চলেনা। অস্পৃশ্যতা রীতির সহিত কোন আপোষ থাকা উচিত নয়—সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, সবদিক দিয়াই অস্পৃশ্যতাকে ভাঙিতে হইবে—কিন্তু চতুর্বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আরও ধীরভাবে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। নিম্নবর্ণীয়গণ উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি যাহাতে ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। হিন্দুসমাজের প্রধান চারিবর্ণের মধ্যে যে অসংখ্য শাখা প্রশাখা আছে সেইগুলির সংখ্যা যত

কমিয়া আসে ততই মঙ্গল—কেননা, এই সকল শাখা-প্রশাখার উদ্ভব যে কারণে হইয়াছিল—জীবিকাবৃত্তির পারম্পর্যরক্ষা—সেই কারণ এখন আর নাই। সূত্রধরের ছেলে এখন সূত্রধরই হয়না—তন্তুবায়ও হয়। অধ্যাপকের পুত্র দাস্যবৃত্তি করিলে এখন আর কেহ টিটকারি দেয় না। কিন্তু মানবসমাজে চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগের বৈজ্ঞানিক কারণটি এখনও রহিয়াছে এবং ডক্টর ভগবানদাসের উদ্ধৃত প্রবন্ধানুযায়ী চিরকালই থাকিবে। অতএব চাতুর্বর্ণ্যবিভাগকে 'ফ্রন্টাল অ্যাটাক্' বুঝিয়া শুনিয়া করা উচিত। চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগের প্রাচীনকালের মৌলিক রীতিটি যদি ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় তাহা হইলে সমাজের পক্ষে সর্বদিক দিয়াই মঙ্গল। ডক্টর ভগবানদাস তাঁহার প্রবন্ধে বোধ করি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাগুলি স্মরণীয়—

"সমস্যার সমাধান উঁচুকে নীচুতে নামাইয়া আনিয়া নয়—বরং নীচুকে উচ্চস্তরে উঠাইয়া। এই কর্মধারাই আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন লোক হয়তো অন্যরূপ বলিবেন—যাঁহাদের নিজেদের শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রাচীনদের বিশাল পরিকল্পনাগুলি বুঝিবার ক্ষমতা দুইই শূন্য বলিলে চলে। কি সেই পরিকল্পনা? একপ্রান্তে ব্রাহ্মণ,—অপর প্রান্তে চণ্ডাল—সমস্ত কাজটি যেন হইতেছে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের জায়গায় উঠাইয়া লইয়া যওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উহাদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

খেদ হয় যে, আজকাল নানাবর্ণের ভিতর এত বেশী বাগ্-বিতণ্ডা চলিতেছে। ইহা বন্ধ হওয়া অতি প্রয়োজন। উভয় পক্ষেই ইহা নিষ্ফল—বিশেষতঃ উচ্চতর বর্ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে—কেননা, এই সকল সুবিধা এবং বিশেষ দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে। সকল অভিজাত সম্প্রদায়েরই উচিত এখন আভিজাত্য বিসর্জন দেওয়া—যত শীঘ্র ইহা হয় ততই মঙ্গল। যতই তাঁহারা ইহাতে দেরী করিবেন, ততই তিক্ততা বাড়িবে এবং কঠিনতর আঘাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণের এখন কর্তব্য ভারতের অন্যান্য জাতির উন্নতির জন্য কাজ করা। যদি ইহা তিনি করিতে পারেন ও করেন তবেই তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ।"

ভক্তি*

স্বামী বিরজানন্দ

মানুষ এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এক অপরিমিত শক্তি নিয়ে, যা' সতত তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রকাশের পথ খুঁজে ফিরছে। আমরা যা কিছু কর্ম করি, যা কিছু ভাবি, যা কিছু অনুভব করি, সব হচ্ছে এই শক্তিরই খেলা। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও সঞ্চিত কর্ম আমাদের মধ্যে এত সুগভীরে মূল বিস্তার করে যে, এজন্মে ওগুলি যেন দাঁড়িয়ে যায় আমাদের 'স্বভাবে'। এই 'স্বভাবে'র বিপুল ক্ষমতার কাছে মানুষ এতই দুর্বল যে, একে সে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না এবং এরই প্রবাহে গা ভাসিয়ে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ও ভোগের মধ্যে একান্ত অসহায় ভাবে হাবুডুবু খায়। এইভাবে, সে তার শক্তির অপচয় করে চলে ভোগ-সুখ আয়ত্তের জন্য বহির্জগতে একে প্রয়োগ করে। দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই একটা আদর্শ সুখের কল্পনা আছে। সেই কল্পনালোকেরই অনু-সন্ধানে ফেরে সে বহির্জগতে। তারই অনুধ্যানে হয় সে বিভোর। এ তার প্রকৃতিগত; বিষয় হতে

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরলোকগত ষষ্ঠ অধ্যক্ষের অপ্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাধনা দাশগুপ্ত, এম্-এ কর্তৃক অনূদিত।

বিষয়ান্তরে এই কল্পিত সুখের আদর্শকে সে প্রক্ষেপ করে চলে। এই বিষয়গুলিকেই সে ভালবেসে ফেলে এবং প্রাণমন এরই উপর উজাড় করে ঢেলে দেয়। এগুলিরই উপর সে তার কল্পনার আকাশচুম্বী প্রাসাদ গড়ে তোলে, তার মনের সকল উচ্ছ্বাস ও আবেগ এদেরই উপর ভেঙ্গে আছড়ে পড়ে। আর তখন নিজেকে সে মনে করতে থাকে এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র অধীশ্বর। দুর্ভাগ্যবশতঃ একবারও তার মনে হয় না যে বালির বাঁধের উপর গড়ে তুলেছে সে তার এত সাধের, এত সুখের প্রাসাদ, যে কোনও মুহূর্তেই উহা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। তার প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণপ্রতিম পুত্র, যারা তার নয়নমণি, তার সকল আশা ও আনন্দের উৎস, মৃত্যুর করাল-গ্রাসে অকস্মাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নিদারুণ আঘাতে অন্তর তার দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে পড়ে। সম্মুখে প্রসারিত ভবিষ্যৎ তার কাছে আশাহীন, আনন্দহীন অতলস্পর্শী মহাশূন্যবৎ, কেবল গভীর তিমিরাবৃত। এমনই একসময় অকস্মাৎ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়, অপসারিত হয় দৃষ্টির বাধা। উদ্ভাসিত হয় সুতীব্র আলোকলেখা—"আমি কিসের জন্য আমার জীবন দিতে বসেছি? এই কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী মিথ্যার পিছনে আমার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেছি। আমি কার? এ বিশ্ব-সংসারে এমন কি কেউ নেই যাকে আমার আপনার বলতে পারি? কেন আমি এই ছায়াময়, প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে উদ্দেশ্য-হীন ইতস্তত ভ্রমণকরে মরছি। হায়! কেউ কি আছ আমার আপনার? তবে দেখা দাও। আমি যে তোমায় ছেড়ে আর মুহূর্তমাত্রও বাঁচতে পারছি না।" প্রেমময় ঈশ্বর এই কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। ভক্তের সেই সুতীব্র তৃষ্ণা, সেই অসহ্য অন্তর্জ্বালার দহন তাঁর পক্ষে চেয়ে দেখা অসহনীয় হয়ে পড়ে। টলে ওঠে তাঁর আসন, ভক্তবৎসল ভগবান অবশেষে এসে দাঁড়ান তাঁর ভক্তের সম্মুখে। কিন্তু, এইরকম সৌভাগ্যবান পুণ্যাত্মা ভক্তের সংখ্যা খুবই কম, কদাচিৎ মানব-ইতিহাসে এঁদের দর্শন মিলে থাকে।

সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, সে ত দূরের কথা, আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি। বলা বাহুল্য, এরূপ সন্দেহ প্রকাশ উন্মাদের বাতুলতামাত্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলতেন—"গলায় কাঁটা বিঁধলে বেড়ালের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়িস্। আর তোর যত সংশয় ঈশ্বরের আশ্রয় নিতে?" তিনিই বলেছেন, যেমন আকারহীন জল হিমে জমে যায় তেমনি ভক্তিহিমে জমে গিয়ে নিরাকার ঈশ্বর সাকার মূর্তি গ্রহণ করে থাকেন। দেহসীমাবদ্ধ বস্তুজগতে বিচরণশীল জীব আমরা সাকার ব্যতীত সকল গুণময় পরমবস্তুর ধারণা কি করে করব? অবশ্য, দুই শ্রেণীর মানুষ সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে না। এক, মানবদেহধারী পশু, যার ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। আর মানবপ্রকৃতির সীমা যাঁরা অতিক্রম করেছেন সেই সকল পরমহংস দেবমানবেরা। এই উভয় প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানব ভিন্ন অপর সকলেরই ঈশ্বরকে মানবীয় আকারে চিন্তা করা ভিন্ন উপায় নেই।

বেদোক্ত সনাতনধর্ম, যা একদিন অতি প্রাচীন কালে, ইতিহাসেরও জন্মের পূর্বে, ঋষিগণ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে লাভ করেছিলেন, তা' সাধককে ঈশ্বর-দর্শনের অসংখ্য পথের সন্ধান দিয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে আমাদের ধর্ম বড় বড় কথায় এবং বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়; এ ধর্ম নিছক মতবাদ, কেবল কল্পনাপ্রসূত অসার তত্ত্বও নয় যাতে বিশ্বাস করলেই ফুরিয়ে গেল। এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু। এই অনুভূতিই ত' মানুষকে করে দেবতা, মাটির জীবকে করে দেবত্বগুণে বিভূষিত। মানুষের সাধনায়ই এই সিদ্ধি সম্ভব। আমরা এখন যা', তা' আমাদের অতীত সাধনার ফল, আর ভবিষ্যতেও আমরা যা হব, তা' আমাদের বর্তমান সাধনার উপর

নির্ভর করছে একপ্রকারে অভ্যাসের কলকাঠি চালনা করে আমরা আমাদের বর্তমান প্রকৃতি পেয়েছি, আবার বিপরীত দিকে যদি অভ্যাসের কলকাঠি ঘোরাই ভিন্ন প্রকৃতি পাব। কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কথা ভেবে ভেবে আমরা বর্তমান জড়-প্রকৃতি পেয়েছি। জড়বস্তুর এই নিবিড়বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে আবার আমরা স্বস্বরূপে যা,—সেই চিন্ময়-আত্মারূপে উদ্ভাসিত হব। পূজা ও উপাসনা ধর্মের গবেষণাপদ্ধতি মাত্র। উপাসনা ও পূজাদ্বারা আমরা আধ্যাত্মিকতার পথে বাস্তবে এগিয়ে চলি। ভক্তির অভ্যাস ব্যতীত আমরা শুদ্ধাভক্তির সেই মহাঐশ্বর্যময় অবস্থা সংপ্রাপ্ত হতে পারি না,—যে অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় হৃদয়ের সকল গ্রন্থিমোচন হয়, সকল সংশয় নাশ হয়, সকল কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়

কি উপায়ে এই ভক্তির সাধনা আমরা করব? শাস্ত্র বলছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ

"নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র চিন্তা করে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অভ্যাস করে, কোনও সম্মানই নিজে না গ্রহণ করে, এবং যোগ্যব্যক্তিতে তা অর্পণ করে, ভক্ত ভগবানের উপাসনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকবেন।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তির নয়টি অবস্থা বর্ণনা করেছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, নিজেকে তাঁর দাস, তাঁর সখা কল্পনা করা এবং আত্মনিগ্রহ করা—এই নয়টি ভক্তি সাধনার বিভিন্ন পর্যায়। এই নয়টি অবস্থা অতিক্রম করলে তবে পরাভক্তি লাভ হয়। অনুক্ষণ স্মরণই প্রকৃত পূজা। মনে সতত ঈশ্বরচিন্তা করবে। খুবই শক্ত কাজ। কিন্তু, অভ্যাসযোগে এও সম্ভব্ হয়। গীতায় অর্জুন বলছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥

"হে কৃষ্ণ! মন সর্বদা চঞ্চল, প্রমত্ত ও অনমনীয়। বায়ুবেগ সংযত করা যেমন দুঃসাধ্য, প্রমত্ত মনকেও সংযত করা তেমনই দুঃসাধ্য।"

ভগবান উত্তর দিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

"হে মহাবাহো! সন্দেহ নেই মন সর্বদা চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ। কিন্তু, হে কুন্তীপুত্র, অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা সম্ভব হয়, মনকে সংযত করা যায়", সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তা কর, যখনই মন অন্যবস্তুতে ধাবিত হবে, সজোরে তাকে শাসিত কর, তাকে বারম্বার টেনে এনে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত কর একেই বলা হয় অভ্যাস।

বাসনাত্যাগ বা বৈরাগ্য মনঃসংযমের প্রকৃষ্টতম উপায়। এ জন্য সকল বাসনার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। বাসনা হৃদয় দুয়ার রুদ্ধ করে রাখে। জমিয়ে তোলে সেখানে প্রচুর ধুলোকাদা, সকল কুপ্রবৃত্তির লীলাস্থল করে তোলে তাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বারম্বার বলছেন "হে অর্জুন! কর্ম কর, কর্ম কর, কিন্তু বাসনারহিত হয়ে কর।" জানবে এই বাসনাই সকল দুঃখের আকর, বাসনাই মনের সাম্যরক্ষা দুঃসাধ্য করে তোলে। মনঃসংযোগ না করতে পারলে আর কি করেই বা আমরা ঈশ্বর চিন্তা করব? মনের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে আগে তাকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করে তোলা প্রয়োজন। তবেই না মনঃসংযোগ করতে পারব? মনে রাখতে হবে, কাম ও কাঞ্চন—এই দুইটি ধর্মপথে প্রবল বাধা। এ পথে যারা নূতন ব্রতী তাদের সযত্নে এই দুইটি পরিহার করতে হবে। এই দুইটি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের অভিশপ্ত ফল যা

নিখিল বিশ্বের অনন্ত দুর্ভোগ বহন করে আনে। অগ্নিশিখা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে পতঙ্গ যেমন ধ্বংসোন্মুখে পতিত হয়, কামকাঞ্চনের মোহিনী-মায়ায় প্রলুব্ধ, প্রমত্ত মূঢ়জনের আত্মাও ঠিক তেমনি করেই ধ্বংস কবলিত হয়। সাংসারিক সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতি যেন শিশুর খেলার মতই। এ গুলিকে অন্তর হতে বিদায় করে দিয়ে সেখানে বসাতে হবে শ্রীভগবানের জন্য নির্মল ভক্তির, সুমহান প্রেমের সিংহাসন, যেখানে চিরপ্রেমময় তিনি এসে আসন গ্রহণ করবেন। ভক্তি হচ্ছে হৃদয়ের অনুভূতি, ভাব, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। এ হচ্ছে অন্তরবিগলিত ধারা, হৃদয়-যমুনা প্রবাহ, বিচারপ্রসূত কোনও সংপ্রাপ্তি নয়। কিন্তু, পরম সুন্দরকে জানবার এইই সোজাপথ। অনুক্ষণ মনে মনে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তোমার সকল অভাব, সকল অভিযোগ তাঁকে জানাও, তোমার ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য তাঁর কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদ। তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। চাও, চাইলেই পাবে। তাঁর বিরহে পাগল হও। কোনও সময় এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহু পুণ্য কর্ম করেছেন, তবে কেন তাঁরা ঈশ্বরের দর্শনলাভে ধন্য হন নি বা হচ্ছেন না। তাঁর উত্তরে ঠাকুর বল্লেন, "তুমি তোমার রামকৃষ্ণকে যতখানি ভালবাস, বল, ঈশ্বরকে কি ততখানি ভালবাস?" বলা বাহুল্য রামকৃষ্ণ ভক্তটির পুত্রের নাম। ভক্তটি উত্তর দিলেন "না, তা' নয়।" তখন ঠাকুর বল্লেন "লোকে নাম যশ ও টাকার জন্য ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের অদর্শনে কে একবিন্দু চোখের জল ফেলছে বল দেখি?" বুঝে দেখ। অতএব, তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন জলাশয়ের সন্ধানে কাতর হয়, তেমনিই ঈশ্বর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হও। অশেষ অধ্যবসায় ও অদম্য দৃঢ়তা সহায়ে আপন অন্তরের নীচবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কর, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চালাও। যদি আপনার অন্তরে কুবেরের সম্পদ পেতে চাও, তবে সজাগ থাক। যতক্ষণ না যুদ্ধে জয়ী হচ্ছ ততক্ষণ যেন কোনও মতেই আলস্যভরে ঘুমিয়ে প'ড়' না, নিরন্তর অতন্দ্র দৃষ্টি নিয়ে জাগ্রত রাখ। অন্যথায় অনিষ্টকারী দস্যুদল কোন ফাঁকে হানা দিয়ে লুঠে নেবে তোমার সব সম্পদ। রন্ধনশালায় বসাও প্রহরী, নতুবা কখন মার্জার ও কুকুরশ্রেণী প্রবেশ করে নষ্ট করে দেবে তোমার মুখের অন্ন। জেনো, ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথ নয়, ক্ষুরের ধারের ন্যায়ই শাণিত দুর্গম সেই পথ। এ পথে আছে সহস্র বাধা, সহস্র বিপর্যয়; শত শত প্রলোভন, মোহিনীমায়া তোমায় হাতছানি দিয়ে কতবার ডাকবে; কত মিথ্যা আশা, অলীক মরীচিকা তোমায় বিভ্রান্ত করবে; বনবনানী, গহন অরণ্যসঙ্কুল এই পথে একক যাত্রী, তোমার পথ হারাবার কত না সম্ভাবনা! একলা পথিক এ পথে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায় ধর্মের গূঢ় রহস্য যে গহনে নিহিত তারই উদ্দেশ্যে। যুক্তি বিচার সহায়ে দীপ্ত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বহুতর বৃদ্ধি করেও সে অন্ধকার দীর্ণ করা যায় না। বহু মহাত্মা, মহাপ্রাণ সাধক এরূপ প্রয়াস করে বিফল হয়েছেন। আত্মা শুধু অপর আত্মার স্পর্শে জেগে ওঠে, অন্য কিছুতেই সে সাড়া দেয় না। আধ্যাত্মিক পথে এরূপ সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥"

"এ সংসারে তিনটি বস্তু দুর্লভ—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষের আশ্রয়; ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এ তিনটি সম্পদ লাভ হয় না।" সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে যে এসেছে, সে ধন্য হয়ে গিয়েছে, জীবনে তার স্বর্ণদ্যুতি ঝলকে উঠছে। সদ্‌গুরুর দিব্যস্পর্শে চৈতন্যলাভ হয়, অন্তরের সকল বাধা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠে সেই অশেষ ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি এই দিব্যস্পর্শ সঞ্চার করতে

পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু। তাঁর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত। তাঁর আদেশ বেদবাক্য বলে শিরোধার্য করতে হবে। তাঁর করুণাই সাধকের মোক্ষলাভের তরণী। জন্মমৃত্যুর ভয়াল অপার মহাসাগর পারাপারের পথে তিনিই একমাত্র আলোক-সঙ্কেত, তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রতি ভক্তি বিনা, অশেষ দীনতা এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ বিনা ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি লাভ করা অসম্ভব। একমাত্র নিষ্ঠাসহকারে গুরুপাদপদ্ম সেবা করে সাধক আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। অবশ্য তাঁকে সিদ্ধগুরু হতে হবে, যিনি নিজে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। নতুবা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় গুরুশিষ্য উভয়েরই পতন ঘটবে। মন্ত্রসহায়ে গুরু শিষ্যের মনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করে দেন। শিষ্য সেই মন্ত্র নিরন্তর ধ্যান করবে। মন্ত্রকে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁরই বিগ্রহ বলে মনে করতে হবে। মন্ত্রের অনুধ্যান ও উচ্চারণই জপযজ্ঞ নামে অভিহিত। এই জপযজ্ঞ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন :—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"—"যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জপযজ্ঞস্বরূপ।" এই জপযজ্ঞদ্বারাই মনঃসংযোগ লাভ করা যায় এবং এইরূপে চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হলে প্রশান্ত হ্রদের বক্ষে চন্দ্র যেমন প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই অচঞ্চল মনে স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিফলিত হন।

সাধনার প্রথম অবস্থায় আমাদের পথ চলতে চাই ধরা ছোঁয়া যায় এমন কিছুর সহায়তা। পুরাণ-কথা এবং প্রতীক উপাসনা প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ তখন পরিহার করা যায় না। ভক্তির এইগুলি বহিরঙ্গ, এর সহায়তা ভিন্ন প্রথম প্রথম সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। পাছে ছাগল ভেড়া খেয়ে ফেলে এই ভয়ে কেমন চারাগাছের চারপাশে বেড়া দিতে হয়, তেমনই প্রবর্তক সাধককে বহিরঙ্গ ভক্তিসাধনার মাধ্যমে আপনার ভাব রক্ষা করতে হয়। কালে এই চারাগাছই চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা পরিব্যাপ্ত করে মহামহীরুহে পরিণত হয়। যে সকল শক্তিধর মহাসাধকেরা জগতের ভাগ্যনির্ণয় করেছেন, মানবসভ্যতা ও চিন্তাজগতে ঘটিয়েছেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তাঁরা সকলেই এমন ধর্মের ছায়াতলে বর্ধিত হয়েছেন যা ক্রিয়াকাণ্ড এবং কাহিনী কথায় সমৃদ্ধ। বহিরাবরণশূন্য বীজ রোপণ করলে তার থেকে কোন মতেই গাছ জন্মাতে পারে না। ঝিনুকের খোলা থেকেই ত' মুক্তার জন্ম। অতএব এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব আছে দেখা যায়। এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই পাব। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব তাঁর মধ্যে মূর্ত, এবং সকল অবতারপুরুষদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রত্যেক ধর্মের খুঁটিনাটি সকল ক্রিয়াকাণ্ড নিজে অনুষ্ঠান করে অনুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। তাঁর পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি কি ঈশ্বরসম্বন্ধে নির্গুণ অব্যয়-তত্ত্ব অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন যে, এই সকল সগুণ সাকার উপাসনা ব্যতীত তাঁর কোনও গত্যন্তর ছিল না, না তাঁর সেই প্রজ্বলন্ত প্রেম, প্রচণ্ড ভক্তি—যার কাছে ভগবান না ধরা দিয়ে পারেন না—তার অভাব ছিল? এ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা চিন্তা করাও মহাপাপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করে থাকেন, সাধারণেও তাই অনুকরণ করে। তাঁরা যা প্রামাণিক বলে অনুষ্ঠান করেন, অন্যলোক তাই অনুসরণ করে থাকে।"

ভগবান আরও বলেছেন :—

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

আমি যদি অনলস হয়ে কর্ম না করি তবে, হে পার্থ, মানবগণও সর্বপ্রকারে ঠিক আমারই পথের অনুসরণ করবে।" ভগবান নিজে আচরণ করে জীবকে শেখান কি করতে হবে, কি করণীয়। মানবকল্যাণার্থেই ভগবান পরমহংসদেব এত কঠোর সাধনা, এত ক্রিয়াকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু এইসকল বাহ্যিক কর্মাদি, মূর্তিপূজা—এ সকলই প্রবর্তক সাধকের জন্য। ভগবান রামকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলতেন—"বহিরঙ্গ ভক্তিসাধনা ততক্ষণই প্রয়োজন যতক্ষণ না হরিনাম শুনে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ছে।"

ভক্ত হতে যে ইচ্ছা করে সে দৃঢ় ধারণা করে নেবে যে, যত মত তত পথ। যে পথ তোমার নয় তাকে ঘৃণা ক'র না, ব্যঙ্গ ক'র না, সে পথও পথ। তবে তোমার পথে তুমি দৃঢ় থাকবে, তোমার ইষ্টপদে দৃঢ় নিষ্ঠা রাখবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে একই পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় জানবে। এইভাব আয়ত্ত হলে তবে ত তাঁকে ঠিক ঠিক ভালবাসা যায়।

চিত্তশুদ্ধির জন্যই এইরূপ বহিরঙ্গ ভক্তির সাধনা। ত্যাগই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। জীবনে ত্যাগ বিনা এ সকলই ভস্মে ঘি ঢালা। ত্যাগই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ত্যাগ ছাড়া সাধকের আধ্যাত্মিকতার পথে একপাও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ভক্তের পক্ষে এই ত্যাগ অনায়াসলব্ধ। যখনই তোমার উচ্চ আদর্শের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে তখনই তুচ্ছ ক্ষুদ্র যা কিছু এতদিন পরম মমতাভরে আঁকড়ে ছিলে, সে সব কিছুর উপরেই তোমার আকর্ষণ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে। এর জন্য তোমার কোনও জোর করতে হবে না, কোনও প্রয়াস করতে হবে না। সূর্য যখন আকাশে উদিত, চন্দ্রতারার দ্যুতি তখন ম্লান হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বরকামনা সাধকের অন্য সকল কামনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভগবৎপ্রেম যখন প্রবল আকার ধারণ করে পরা ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন কোথায় লাগে ইন্দ্রিয়সুখ, কোথায় লাগে বিলাস-ভোগ! ভক্তি বলে ভক্তকে—"আমি তোমার কিছুই ধ্বংস করতে চাই না, আমি তোমায় পূর্ণ করতে চাই।" তোমার স্বভাবজ বাসনাকামনার শ্বাস রুদ্ধ করবার দরকার নেই, শুধু তাদের মোড় ফিরিয়ে দাও ঈশ্বরের অভিমুখে। যদি ক্রোধেরই বশবর্তী হও, তবে এইবলে ঈশ্বরেরই প্রতি ক্রোধ কর যে, কেন তোমার এত চাওয়া সত্ত্বেও তিনি দর্শন দিচ্ছেন না, কেন তিনি দূরে সরে রয়েছেন? যদি প্রাণে শূন্যতা অনুভব কর, তবে তাঁকে আলিঙ্গন-চুম্বন করে প্রাণের আবেগদ্বারা তা'কে দূর কর। যদি অহঙ্কার থেকে থাকে, তবে এই অহঙ্কারই থাক যে তুমি তাঁর সন্তান, আবার কার কাছে তুমি মাথা নোয়াবে? যখন সকল কামনার মোড় এমনই করে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, তখনই তাঁকে হৃদয়মন উজাড় করে ভালবাসতে সক্ষম হবে। তখনই তুমি অনুভব করবে তিনি প্রেমময়, প্রেমস্বরূপ তিনি। অবশেষে এইভাবে এই সর্বগ্রাসী প্রেম, এই তীব্র ভালবাসা, এ হতেই জন্ম নেবে পরিপূর্ণ নির্ভরতা। ভক্ত তখন দেখবে তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। একমাত্র এই অবস্থায়ই মানুষ সকল দুঃখকষ্ট, এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও হাসিমুখে ও প্রশান্তচিত্তে বরণ করে নিতে পারে। একমাত্র এইরূপ ভক্তই বলতে সক্ষম হয়—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, হে প্রভু আমার।"

ভক্ত চায় ভগবানকে আস্বাদন করতে। এইজন্য তাঁর প্রতি পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রেমিক প্রভৃতি নানাভাব সে আরোপ করে থাকে। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে পবিত্রতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, আজ্ঞানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মনিগ্রহ ও প্রেমের যে আদর্শ অঙ্কিত আছে জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তার তুলনা মেলে

কি? সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ-সংগঠন-কৌশলে গর্বিত কোনও জাতি রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, যুধিষ্ঠির, সীতা বা গোপী—এঁদের কোনও একটিকেও দেখাতে পেরেছে? কত নাম করব? সংখ্যাহীন এই সকল পুণ্য নাম ভারত-ইতিহাসে। এ জন্মে হোক বা শতজন্ম পরে হোক একদিন না একদিন সব মানুষকেই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ করতে হবে। এ চরম সত্যটি কি? সে হচ্ছে প্রেম; এবং ভগবান এই প্রেমস্বরূপ। সেইজন্যই ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করতে চায়। রামপ্রসাদ যেমন আর কি বলেছেন—"মা চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই।" ভক্ত ভগবানকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের মাধ্যমে উপাসনা করে থাকে। ভক্ত যখন উচ্ছ্বাসহীন শান্ত ও স্থির শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহায়ে তাঁকে প্রার্থনা করে, তাকে বলা হয় শান্ত ভক্ত। পরবর্তী উচ্চাবস্থা দাস্যভাব। যখন নিজেকে ঈশ্বরের দাস মনে করা যায়, তখনই এই ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিকটবর্তী শ্রেয়তর প্রেম সখ্যভাবের মধ্যে নিহিত। ভক্ত তখন মনে করে ভগবান তার সখা, তখন বন্ধুর মত তাঁর জন্য সমবেদনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে সে। তাঁকে সে খেলার সাথী এবং সর্বতোভাবে নিজের সমকক্ষ একজন বলেই চিন্তা করে থাকে। তারপরই আসছে বাৎসল্যভাব। এ ভাবে ঈশ্বরকে আর পিতা বলে মনে করি না আমরা, পুত্র বলে তাঁকে গ্রহণ করে থাকি তখন। বাৎসল্যভাব ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি ও ঐশ্বর্যবিমুক্ত করে একান্ত আপনার করে ভাববার প্রকৃষ্টতম উপায়। ঐশ্বর্যের ভাব থাকলেই ভয় উৎপন্ন হয়। ভয় থাকলে ভালবাসা যায় না। এই বাৎসল্যভাবেই আবার ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করা চলে। ভক্ত তখন নিজেতে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ভাব আরোপ করে থাকেন। অবোধ শিশু যেমন মার কাছে ন্যায় হোক, অন্যায় হোক সব আবদারই করতে পারে, ভক্তও তেমনি ঈশ্বরের কাছে সব কিছুই চাইতে পারে এবং প্রার্থিত বস্তু না পাওয়া পর্যন্ত শিশুর মতই সে কেঁদে চলে। সন্তান কাঁদলে কোন মা আর স্থির থাকতে পারেন, কোন মা না তাকে সব আবদার পূর্ণ করে শান্ত করবার চেষ্টা করেন? আর কোন শিশুই বা মাতৃক্রোড়ে উঠে নির্ভয় না হয়? ভক্তও জগজ্জননীর অঙ্কে স্থান নিয়ে তাঁরই মুখচুম্বন করে, জগজ্জননীও সন্তানকে সাদরে চুম্বন করেন। এ আশ্বাস তখন সে পায় যে, সে যাই করুক না কেন, মা তার অপরাধ নেবেন না, মা তাকে কোনও শাস্তি দেবেন না। জগজ্জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে সে একেবারে নির্ভয়।

সর্বশেষে আসছে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে প্রেমের শ্রেষ্ঠভাব—মাধুর্যে এ ভাবের তুলনা নেই। এর নাম মধুরভাব। এ ভাবে ভক্ত ভগবানকে আপনার প্রিয়তম পতি বলে ভজনা করে থাকে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে ভালবাসা জন্মে, তার মত আর কোন্ ভালবাসা মানুষকে এত উন্মত্ত করে তোলে? দুর্বার উদ্দাম আবেগে তার ব্যক্তিত্ব, তার পদমর্যাদা সব কিছুকে নিয়ে যায় ভাসিয়ে? তার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে তার আপন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাকে কাজ করায়? এই প্রীতির তিনটি রূপ, যথা—সমর্থা,—অর্থাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম, সমঞ্জসা—অর্থাৎ আদান-প্রদানে সমান ভালবাসা, এবং সাধারণী—অর্থাৎ স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা যা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি। প্রথমোক্তরূপ ভালবাসায় প্রেমিক প্রেমাস্পদের কল্যাণ ও সুখের চিন্তায় বিভোর থাকেন, নিজের দুঃখকষ্ট জ্ঞান তাঁর থাকে না। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের এইরূপ উন্মত্ত ভালবাসা ছিল। তাকে প্রকাশ করবে কোন ভাষা? বৃন্দাবনের কুঞ্জে যখন পরমসুন্দর প্রেমমূর্তি কৃষ্ণ বংশীবাদন করতেন তখন নিশীথ রাতে ঘন অন্ধকারময় পথে সে আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে চলতেন অসামান্য রূপবতী ব্রজগোপীরা।—ভুলে

যেতেন জাতি, কুল, মান, সমাজসংসার, কাজকর্ম, দুঃখ সব কিছু। অনভ্যস্ত পথ চলতে, কাঁটায় ছড়ে যেত তাঁদের কোমল পা। রক্তাক্তপদে প্রেমভরে তবুও ছুটে যেতেন তাঁরা প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে।

এ অবস্থায় মাঝে মাঝে বিরহ আসে, ঈশ্বরের অদর্শনে অসহ্য হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয়। বিরহ হচ্ছে সেই পরমমধুর বেদনা যা ভালবাসাকে গভীরতর করে তোলে। বিরহের দশদশা বৈষ্ণব-শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন। এদশায় ভক্ত বিরহজনিত অসহনীয় যাতনা ভোগ করে। অবশ্য এ বেদনা মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ। অতএব, এ দশদশায় ভক্ত বিরহমাধুর্য উপভোগ করে এও বলা চলে। এ দশায় সে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, পুলক-কম্পনে শরীর স্পন্দিত হয়, অসহ্য আবেগে বাক রুদ্ধ হয়ে যায়, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় কখনও বা এলো-মেলো পদক্ষেপ হয়। সে কখনও অস্থির, কখনও চিত্রার্পিতের ন্যায় স্পন্দনহীন, শান্ত; কখনও তার ধমনীস্পন্দন যায় থেমে, চৈতন্যহারা হয়ে মৃতবৎ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে তার দেহ। কখনও সে অদৃশ্য কাকে দর্শন করে আনন্দে ওঠে হেসে। তখন কার সঙ্গে কথা বলে, কি মাধুর্য যে উপভোগ করে তা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। লোকে তাকে পাগল বলে এবং মনে করে হয়ত বা ভূতেই পেয়েছে তাকে। সে কিন্তু বিষয়বাসনায় উন্মত্ত মূঢ়জনদের একমাত্র সুস্থমস্তিষ্ক নিজেকে উন্মাদ বলতে দেখে হাসে। মৃতেরা যেন জীবন্তকে প্রাণ দিতে চাইছে! এতে সে কি ক'রে না হেসে থাকতে পারে? যে এই আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে সে রসসাগরে ডুবে যায়, প্রেমাস্পদের সঙ্গে উচ্ছল মিলনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে সম্পূর্ণরূপে। সে তখন আর কিছু চায় না, মুক্তি চায় না, স্বাতন্ত্র্য চায় না, দেবগণের সাহচর্যে অক্ষয় স্বর্গসুখ চায় না। তখন ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদরূপে পেলে সহস্রবার কীটযোনিতে জন্মাতে সে দ্বিধাবোধ করবে না। এই জন্য ভক্ত প্রার্থনা করে—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদা ত্বয়ি॥"

সারা বিশ্ব তখন সে দেখে প্রেমের রঙে অনুরঞ্জিত। প্রেম—প্রেম প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই সারা বিশ্বে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই প্রেমে মাতোয়ারা হয়েই কালীমন্দিরে বিগ্রহকে ভোগ না নিবেদন করে বেড়ালকে খাইয়েছেন সে ভোগ। দৈবী ভক্তির এই মত্তাবস্থাই একমাত্র আমাদের ভবরোগ দূর করতে পারে। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তখনই লাভ হয় যখন উপাস্য-উপাসক এক হয়ে যায়, যখন এ পরমতত্ত্ব আর অজ্ঞাত থাকে না যে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক; ভক্ত, ভগবান, ভাগবত এক।

"ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্যন্ত যায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

(১)

[অংশতঃ ইংরেজী হইতে অনূদিত]

নিউ ইয়র্ক

62 West 71st Street

২৮শে জানুয়ারী ১৯০৭

ভাই শশী,

বহু দিন তোমার পত্রাদি না পাইয়া ভাবিত আছি, তুমি কেমন আছ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। বসন্তের মুখে শুনিলাম যে, তুমি ৺রামেশ্বর-দর্শনে গিয়াছিলে বাবুরাম ও তাহার মাকে লইয়া। আশা করি নির্বিঘ্নে ৺রামেশ্বর দর্শন করিয়া মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিয়াছ। তোমার কার্য কিরূপ চলিতেছে এবং খগেন কেমন আছে তাহাও লিখিবে।

বসন্ত[১] আমার সঙ্গে ইংলণ্ড হইয়া এখানে আসিয়াছে ও ভাল আছে। গতকল্য সে তাহার প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিল। উহা চমৎকার উৎরাইয়াছে। বিষয় ছিল আত্মসংযম। সকলেরই বসন্তের কথা ভাল লাগিয়াছে। গত সপ্তাহে আমি পিট্‌স্‌বার্গে একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে বসন্ত এখানকার ক্লাসের ভার লইয়াছিল। হরিপদকে[২] পিট্‌স্‌বার্গে রাখিয়া আসিয়াছি।

* * * *

বসন্ত অতি খাসা ছেলে। এই আটমাস তাহাকে দেখিলাম, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। তাহার ভিতরকার যে সব সদ্‌গুণ আছে সেগুলি বিকাশের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বাস্তবিকই উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। হাজার হউক তোমাদের হাতের বানান চরিত্র। তোমার শক্তি কি বিফল হবার? * * * তুমি ভাই আমার প্রতি দয়া রেখো। ওখানে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য স্থানের বন্ধুদের আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইও। মহীশূরের দেওয়ান ও ডাক্তার পালপুকে কি চিঠি দিয়াছ? উভয়কে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিও। আমি নানাকাজে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদের সোসাইটির স্থায়ী বাড়ী শীঘ্রই হইবে। আমি একটি নূতন বিষয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছি। সঙ্গের কাগজটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ—ইতি

দাস

অভেদানন্দ

পুনশ্চ :—

খগেনকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও। বাবুরাম ও মঠের অন্যান্য ভাইদেরও।

(২)

[ইংরেজী হইতে অনূদিত]

নিউ ইয়র্ক

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭

ভাই শশী,

তোমার সহৃদয় ও স্নেহমাখা চিঠিটি এইমাত্র পেলাম। এ জন্যে বহুৎ ধন্যবাদ। পত্রটি ২৪শে জানুয়ারী তারিখের। তুমি লিখেছ যে আমার ভারতবর্ষ থেকে রওনা হওয়ার পরে আমায় চিঠি দিয়েছিলে। সে চিঠি তো আমার হস্তগত হয় নি।

বসন্ত আমার ক্লাশগুলোর ভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে। সে ছোট খাট সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে

১ স্বামী পরমানন্দ

২ স্বামী বোধানন্দ

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

এবং এখানে আমাদের কাজের বেশ সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। * * মায়লাপুরে শীঘ্রই মঠ তৈরী হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। ওখানে তোমার বন্ধুবর্গের যার যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।

বসন্ত আমাদের ভ্রমণের একটি বিবরণী লিখছে। শেষ হয়ে গেলে সংশোধনের জন্য তোমার কাছে পাঠাবার ইচ্ছা আছে। তোমার নিজের চোখে দেখা বিষয়গুলির বর্ণনা যদি তুমি লেখ তা হলে আরও অনেক ভাল হবে। তারিখগুলোর জন্য ভেবো না। সাধারণ ভাবে স্থান, অভ্যর্থনা এবং লোকের উৎসাহাদির বিষয় বর্ণনা করে যাবে। তারিখ সহ সমস্ত স্বাগত অভিনন্দনগুলি আমাদের এখানে রয়েছে। ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্ কাড্ডালোর, বন্যাম্বাডী এবং ধর্মপুরীতে প্রদত্ত আমার ভাষণগুলি যা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিলো ওদের কেটে আমাকে পাঠাতে পার কি? কলোম্বোয় আমাদের বন্ধুদের একটু জিজ্ঞাসা করে দেখো যে জাফ্না, কাণ্ডী এবং সিংহলের অন্যান্য জায়গায় আমি যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলাম তা আমাকে পাঠাতে পারবে কি না? ওরা ছোট কোন বই ছাপিয়েছে কি? * *

আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করো।

ইতি দাস
অভেদানন্দ

(৩)

London
May 30th, 1908

ভাই শশী,

তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি এবং অদ্য তোমার "The Universe of Man" নামক পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। The Message of Ramakrishna Chapter (রামকৃষ্ণের বাণী—এই অধ্যায়)টি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তোমার বক্তৃতাগুলি যেমন সরল তেমনি সুপাঠ্য। অধিক আর কি বলিব, পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

এখানে প্রায় ৪ মাস ধরিয়া কার্য করিতেছি। Vedanta Society of London (লণ্ডন বেদান্ত সমিতি) খোলা হইয়াছে। শীঘ্রই উহার Head quarters স্থাপিত হইবে এবং জুন মাসে একটি বড় হল-এ Public Sunday Lectures (সর্বসাধারণের জন্যে প্রতি রবিবারের বক্তৃতা) দিব স্থির হইয়াছে। নিউইয়র্কের কার্য বেশ চলিতেছে। বসন্ত আর সেরূপ ছেলেমানুষ নাই; বেশ কাজের লোক হইয়াছে। তুমি তাহার জন্য কিছুই ভাবিও না। সে এত কার্যক্ষম হইয়াছে যে নিউইয়র্ক সোসাইটির কার্য করিয়া ক্লান্ত হওয়া দূরে থাকুক Mont Clair-এ একটি Centre (কেন্দ্র) খুলিয়াছে। সে একলা সমস্ত ভার লইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিল। তজ্জন্য তাহাকে রাখিয়া আমি এস্থানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। এখানে একজন উপযুক্ত লোক পাইলে তাহাকে এখানে বসাইয়া দিয়া Paris-এ একটি Centre খুলি। এখানকার কার্য চালাইতে উপযুক্ত কেহ কি আমাদের মঠে আছে? যদি থাকে তাহা হইলে সত্বর আমাকে লিখিবে।

বসন্তকে এক্ষণে নিউইয়র্কে থাকিবার জন্য তুমি লিখিবে। সে তোমার কথা খুব মানে। * * * ভাল আছি। আশা করি তুমি স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছ। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিও। ইতি

দাস
অভেদানন্দ

নিঃসঙ্গ যাত্রী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জীবনের পথে যতই আগাই যত হয় বোঝা ভারী,
সঙ্গীরা তত একে একে যায় ছাড়ি',
তফাৎ ঘটেছে কাহারো সঙ্গে জীবনাদর্শে ব্রতে,
যত দিন যায় কাহারো সহিত মিলে নাক আর মতে।
কেহ দ্রুত গতি আগাইয়া চলে কিছুতে ফিরে না চায়,
কেহ মন্থর, বহু অন্তর তার সাথে ঘটে' যায়।
বহু আশা ক'রে ছিল যারা সাথে নিরাশায় তারা ছাড়ে,
পথপাশে কেহ বটচ্ছায়ার মায়া না ছাড়িতে পারে।
সুদিনে যাহারা সঙ্গ লইল সুখের অংশী হ'য়ে
দুর্দিনে দিল ভঙ্গ তাহারা নানা ছলকথা ক'য়ে।
জীবনের পথে যতই আগাই তত ঘুচে অবসর,
বিচার করিতে ভুলে যাই পথে কেবা আত্মীয় পর।
ক্লান্ত চরণে যতই আগাই তত হই উদাসীন,
উদাসীনে ছেড়ে সবে চলে দূরে ক্রমে তাই সাথীহীন।
জীবনের পথে একলা এখন চলি,
আগে পাশে পিছে চেয়ে ক্ষোভ মিছে সাথী নাই সাথে বলি।
দিনত ফুরায় আঁধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী,
গোধূলি-ধূলায় বুঝিতে পারি না পথ কতটুকু বাকী।
দেখি সাথে সাথে কেহ চলে নাক আজ নিয়ে হাতে আলো,
সাঁজের আঁধারে একলা চলার অভ্যাস করা ভালো।
জীবনমরণ-সন্ধির পরপারে
অন্ধকারের সুদীর্ঘ পথে সঙ্গী পাইব কারে?
জানি না সে পথে কোথা সীমা তাহা আঁধারে যায় কি চিনা?
জানি না সে পথে তারা জ্বলে কিনা খদ্যোতও জ্বলে কিনা।
জানি শুধু তাহা অনাবিষ্কৃত চিররহস্যময়,
রাজা বাদশারো দিগ্‌বিজয়ীরো একলা যাইতে হয়।
সাথীহারা হয়ে চলিতেছি পথ বলি'
ক্ষোভ নাই তাই গোধূলি ধূলায় একলাই পথ চলি।

আমি কে?

(শ্রীরমণ মহর্ষির উপদেশালোকে)

'দাদু'

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্‌মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥

"যিনি অবিভাজ্য সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ যাঁহাতে অবস্থিত, সেই বাক্য ও মনের অগোচর পরমাত্মাকে আমি আশ্রয় করিতেছি।"

মহর্ষি শ্রীরমণের পদপ্রান্তে বসিয়া 'আমি কে'—এই জিজ্ঞাসা বা আত্মতত্ত্বের কথা যাহা শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি।

অনাদিকাল হইতে ভারতবক্ষে—মাভৈঃ মাভৈঃ অভয়বাণী ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। বেদ ও উপনিষৎসকল একবাক্যে বলিতেছেন, হে অমৃতের সন্তানগণ! ভয় নাই, দুঃস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াও।

"মরণের রোলে পড়ি, কেন তুমি বীর!
মাখি হুতাশের ছায়া
ব্যাপিয়া সমগ্র কায়া—
কেন এত যাতনা অধীর?
কেন পাষাণের ভার—
বুকে চাপা অনিবার—
কেন এত বিষাদ প্রবীর!
ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্
আমার আনন্দভেরী ওম্ ওম্ ওম্ ॥"

ভয়ই পাপ, ভয়ই দুঃখ, ভয়ই অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয়ই মৃত্যু। তোমার অভাবের রোদন, ভয়ের কম্পন, দৈন্যের হাহাকার—শুধু তোমার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই। তুমি তোমার 'আমি কে' জান না বলিয়াই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সূচনায় অর্জুন যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়ামোহে ভীত ও দুঃস্বপ্নে পীড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার সত্যস্বরূপ দেখাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আত্মবিস্মৃতিই সকল দুঃখ ও ভয়ের কারণ। উহাই মৃত্যু। এই পুণ্যভূমির মহামানবেরা, ঋষিরা, শাস্ত্র ও দর্শনসকল, পুনঃ পুনঃ একবাক্যে বলিয়াছেন—তুমি তোমার 'আমি'কে' জান। নিজেকে, সবচেয়ে আপন যে—তাহাকে চেন। তোমার অন্তরে যিনি নিত্য জাগ্রত সেই চেতনাময় পুরুষই তোমার আত্মা। তিনিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম—তোমার 'আমি'। সেই আমিকে জানিলে সব জানার অবসান হয়, তখন আর 'তুমি-আমি' এই ভেদ থাকে না—দুইটি ভাঙিয়া হয় জগৎজোড়া একটি আমি। তাই সাধক গাহিয়াছেন—

"আপন চিন্‌বে যেদিন
বিশ্ব সেদিন
আপন হয়ে যাবে।"

তোমার আজিকার এই জীববোধের খোসাটি তখন আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে। তুমি ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়া অভয়ের বুকে এসে দাঁড়াইবার অধিকার পাইবে। মুক্ত হইয়া পরমানন্দে ভাসিবে। সকল অভাব, ভয় ও দুঃখের অবসান হইবে। ভয়ের অবসানেই হয় প্রকৃত জীবন আরম্ভ।

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো
ভোক্তা কর্তা ন বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী
নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥

"তুমি ত শরীর নহ, না তব শরীর
নহ কর্তা, নহ ভোক্তা, জেনো ইহা স্থির।

অসঙ্গ চৈতন্য সাক্ষী স্বরূপ তোমার
নিরপেক্ষ সদানন্দে করহ বিহার।"

মহামহিমময় ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব কঠোর তপস্থায় মানবজ্ঞানের পরিসীমায় উত্তীর্ণ লইয়া যে উপলব্ধ সত্যের সন্ধান ব্রহ্মসূত্রে দিয়াছেন তাহার মর্ম এই —"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।" ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ অলীক ; জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। এই মহাবাক্যে সদা মরণ-ভীত, দুঃস্বপ্ন-পীড়িত, মোহাচ্ছন্ন মানব পাইয়াছে তাহার অমরত্বের সন্ধান। তাই নামিয়াছে সত্যানুসন্ধিৎসু মানব সাধনসমরে, মুছিয়া ফেলিতে তাহার অজ্ঞানের শেষ রেখাটি। দেহে আত্মবুদ্ধি মিথ্যা ; কিন্তু মিথ্যা হইলেও দেহাতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির পূর্বে তাহা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। জগৎ মিথ্যা হইলেও আত্ম-দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জগৎ ও জীব সত্য বলিয়াই ভ্রম হয়। আত্মদর্শন হইলে জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন বলিয়া আর ধারণা হয় না। সেখানেই দ্বৈত-ভাবের অবসান হয়। ইহাই গুরুবাক্য ও বেদবাক্য।

যতদিন না সত্যের দিব্যালোক অন্তরে পাওয়া যায়,—ততদিন মানুষের মন বাহিরে, বিষয়ে, বিত্তে, ভোগে আনন্দ অন্বেষণ করে। নামরূপের মোহা-কর্ষণেই ছুটাছুটি করে। অভাব তার মেটে না, শুধু ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে ফিরিয়া আসে। এই ভাবে মন আত্মাকে ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ ভোগের তাড়নায় ছুটিয়া যায় মরীচিকাপানে।

পিপাসার নিবৃত্তি তাহার হয় না, অভাবের শুধু সে দগ্ধ হয়। ইহাই জীববোধের অভিশাপ। এই জীববোধই মন। ভোগবাসনা, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু আত্মধর্ম নয়, একথা মন কিছুতেই মানুষকে বুঝিতে দেয় না। বুঝিতে দিলে যে তার জগৎ-রচনার খেলা ভাঙিয়া যায়। অভ্যাসে সে গড়িয়া তুলিয়াছে—সংস্কারের প্রস্তরের উপর প্রস্তর সাজাইয়া—এক মনোরম দুর্গ। জীব তাহাতেই বন্দী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন—

"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"

সপ্তধাতু-নির্মিত এই স্থূল দেহ আমি নহি। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামক পঞ্চ বিষয় এবং উহাদের পৃথক পৃথক গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও 'আমি' নহি। তেমনি বচন, গমন, গ্রহণ, বিসর্জন এবং প্রজনন এই পঞ্চবিধ কর্মের করণ—বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থনামীয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ও 'আমি' নহি। আবার সর্ববিষয় ও সর্ববৃত্তিশূন্য বাসনামাত্রাবশেষ অজ্ঞানও 'আমি' নহি। আমি ইহা নহি, আমি উহা নহি, এই ভাবে সকল উপাধি বর্জন করিলে সর্ববিলক্ষণ যাহা থাকে সেই জ্ঞানসত্তাই 'আমি'—যাহা সৃষ্টিপ্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে নিরালম্ব সত্তা। আত্মবিস্মৃতি হইতেই আসে জগৎ-প্রতীতি, আবার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যায় মুছিয়া। যেমন ভ্রমবশে দড়িকে না দেখিতে পাইলে সর্প বোধ হয়, আর রজ্জুকে রজ্জু জ্ঞান করিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায়।

জীববোধই মন বা অজ্ঞানতা, মোহ ও বন্ধন। মনই আত্মদর্শনের পথের কণ্টক, অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া মানবজীবনকে মিথ্যাজ্ঞানে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ বিপর্যয়-জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। মনের এই চাতুরী বা খেলাই মায়ার ছলনা। পঞ্চভূতকে 'আমি' বলিয়া সেবা করাইয়া প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রতারিত করিতেছে। প্রকৃত 'আমি'হারা জীব ভাসিয়া চলিয়াছে এক গহন আঁধারের অকূল পাথারে।

সীমাহীন সেই দুর্ভেদ্য মহা আঁধারে, ক্ষণে ক্ষণে তাহার আর্তনাদে, তাহার করুণ ক্রন্দনে, আকাশ বাতাস আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! হায়! তুমি যে জান না, জীবনের পর জীবন লইয়া কেবলি

ছুটিয়া চলিয়াছ আলেয়ার পিছু পিছু। সেখানে সত্য নাই, আনন্দ নাই, শান্তি নাই। স্থূলত্বের মোহপাশ কাটিয়া ফিরিয়া এস নিজ বাসভূমে, নিজ অন্তরে। তুমি যে আনন্দ অন্বেষণ করিতেছ সে আনন্দ তোমার অন্তরেই, বাহিরের কোন বস্তুতে নয়, নামে, রূপে, রসে, গন্ধে বা স্পর্শেও নয়। অবাধ আনন্দ তোমার পূর্ণ স্বরূপ। ঋষিরা বলিয়াছেন, আনন্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মত্বই আমার স্বরূপ—আমার 'আমি'। এই 'আমি'কে জানিলে আর কিছুই জানিবার বা পাইবার অবশিষ্ট থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি মুহূর্তে বিদূরিত হয়। আত্মপরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ গোলোক ধাঁধায় ঘুরিয়া মরে। তাহার কল্পনারচিত জগদ্দৃষ্টি দূর হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গে না, মোহ টুটে না। মন আত্মাকে পাইলেই সকল কামনা বাসনা শূন্য হইয়া মুক্তি পায়। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির পূর্ণনাশ হইলে মন আত্মারামকে পাইয়া তাহাতেই মিশিয়া অভিন্নত্ব-লাভ করে। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহার আর তখন থাকে না।

চাই সদ্‌গুরুর কৃপা। কৃপা ব্যতীত মুক্তির পথে চলা যায় না।···

"তত্ত্ববিদ্ গুরু যদি
করেন জ্ঞান দান
তবেই তো এই তত্ত্ব
হবে মূর্তিমান।"

যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে আশ্রিত, তাহাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনিই ভগ্ন হৃদয়ের ঘন তমসার পর্দা সরাইয়া আত্মজ্যোতি দেখাইয়া দেন।

শ্রীগুরু মহর্ষি রমণ বলেন ঈশ্বর, আত্মা ও গুরু - যথার্থ ভিন্ন নহেন। ব্যাঘ্রের কবলে পতিত শিকার যেমন কোন প্রকারেই ফিরিতে পারে না, তদ্রূপ-সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষে যাঁহারা পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন কালেই পরিত্যক্ত হইবেন না। তাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় সত্যের সন্ধান পাইয়া দিনের পর দিন ঊর্ধ্বতম স্বরূপের পথে অগ্রসর হইবেন। চাই শুধু লক্ষ্যে ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সাধনা।

আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় নির্দেশ করিয়া শ্রীরমণ মহর্ষি বলিয়াছেন "মনোনাশ কর" —তবেই তুমি তোমার আমি কে জানিতে পারিবে। তোমার সকল অভাব পূর্ণত্বে অবসিত হইবে। মৃত্যু অমৃতময় হইবে। ভয় চিরতরে মুছিয়া যাইবে। তখনি বুঝিবে তুমি—তোমার 'আমি'—নিত্যশুদ্ধ, চিরমুক্ত, বুদ্ধ, নির্বিকার, নির্বিকল্পস্বরূপ।

মহর্ষি শ্রীরমণ-বিরচিত উপদেশসার পুস্তিকার ২০নং শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—

অহমি-নাশ ভাজ্যহমহং তয়া।
স্ফুরতি হৃৎস্বয়ং পরমপূর্ণসৎ॥

মনোবৃত্তি-মূল অহংকারের বিনাশে।
পূর্ণসত্য আমি, আমি হৃদয়েতে ভাসে॥

মনোবৃত্তির মূলে যে অহংকার, বা জীবত্বের বোধ, উহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইলে পূর্ণসত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ 'আমি' হৃদয়েতে প্রকাশিত হয়। এই অস্মিতা-বোধ, বা আমিময় জ্ঞান বা প্রকাশ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুখময়। এই বোধ সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বরূপে স্থিতি বলা হয়। মহর্ষি পুনরায় রমণগীতায় ঐ কথাই বলিতেছেন।

হৃদয়কুহরমধ্যে কেবলং ব্রহ্মমাত্রম্
অহম্ অহম্ ইতি সাক্ষাৎ আত্মরূপেণ ভাতি।
হৃদি-বিশ-মনসা স্বং চিন্বতা, মজ্জতা বা
পবন চলন রোধাত্মানিষ্ঠো ভব ত্বম্॥

অর্থাৎ হৃদয়াকাশের গুহামধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত। যিনি কেবল 'আমি, আমি' আত্মরূপে প্রকাশিত। হৃদয়ের অতলতলে শ্বাস, প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ডুব দিলে মহাবিজ্ঞানময় সত্তায় পৌঁছিয়া স্থিতিলাভ সম্ভব হয়।

মনোগত অহং—যাহা উপাধি দ্বারা আবৃত—

আমি রূপে উদিত হয় তাহার পূর্ণনাশেই আত্মস্বরূপ চিৎ বা জ্ঞানময় 'আমি'র প্রকাশ। মহর্ষি শ্রীরমণ বলেন, মন আত্মস্বরূপে অবস্থিত এক আশ্চর্য শক্তি—যাহার প্রভাবে এক সত্তা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ-রূপী ত্রয়ীর ঘটে আবির্ভাব। সুষুপ্তির মাঝে এই তিনটি বিভিন্ন বস্তু একাকার হইয়া যায়। মনই দৃশ্য জগতের মূলবীজ বা আদ্যাশক্তি। উহাই সকল বৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। চিন্তার সমষ্টিই মন; উহাই আমিরূপে দেহে উদিত হয়। এই মনোগত আমিই বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, অহংকার, কর্ম, কল্পনা, বাসনা, প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়া। সকলই একমাত্র মন। শব্দবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে বুঝিলাম, মনই অদ্বয় চৈতন্যসত্তাকে অবলম্বন করিয়া নানা উপাধির পরিচ্ছেদে আবৃত হইয়া বহুরূপে বহুভাবে সাজিয়াছে। (ইংরেজীতে যাহাকে Self-consciousness, Individuality, Ego, Personality ইত্যাদি বলা হয়) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মহামুনি বশিষ্ঠদেব ঐ কথাই বলিতেছেন। মনই সকল বস্তু, কল্পনার আধার। মনই আত্মার ভোগায়তন—বা প্রথম শরীর। মহর্ষিও বলেন চিন্তাসমষ্টিই মনরূপে প্রতীত হয়। অহংবৃত্তিই মূল ও প্রথম বৃত্তি। উহার উদয় হইলে পশ্চাতে আর সব চিন্তার উদয় হয়।

উত্তম পুরুষ 'আমির' উদয় হইলে পরেই মধ্যম পুরুষ— 'তুমি' ও প্রথম পুরুষ 'সে'র স্ফুরণ হয়। উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও প্রথম পুরুষ থাকে না। মনই জগতের প্রথম অঙ্কুর। এই অঙ্কুরেই সব সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিচিত্র রঙ্গভূমির স্রষ্টা কর্তা একমাত্র মনই। মন ভাবময়—যাহা ভাবা যায় তাহাই সংসাররূপে প্রতীত হয়। অতএব বৃত্তি বা চিন্তাই মনের স্বরূপ। চিন্তা ব্যতীত জগৎ বলিয়া অন্য কোন বস্তু নাই। সুষুপ্তিতে চিন্তা নাই, জগৎও নাই। জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিন্তা আছে, তাই জগৎও আছে। মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে সৃষ্টিসূত্র বাহির করিয়া পুনরায় উহা নিজেরই ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়; মনও তেমনি স্বস্থান হইতে জগৎ-প্রতীতি বিস্তার করিয়া পুনরায় উহা আপনার মধ্যে গুটাইয়া লয়। মন আত্মস্বরূপ হইতে যখন বহির্গত হয়—তখন জগৎ 'প্রতিভাত' হয়। সুতরাং যখন জগৎ প্রকাশিত হয় তখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় না—যখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন জগৎ প্রকাশিত হয় না। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার নাই। তেমনি যেখানে জ্ঞান, সেখানে অজ্ঞান নাই। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। উভয়ের জন্য একাসন নহে।

"The self of matter and the self of spirit can never meet. One of the twins must disappear. There is no place for both."

যাহারা মনোনাশপ্রার্থী বা আত্মজ্ঞান-পিয়াসী, তাহারা বিচারের উদয়-কামনা করিবে। অবিদ্যারূপ মেঘ যতদিন না সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, ততদিন আত্মদর্শন সম্ভব নয়। একমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই মনোনাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অন্য কোন তপস্যার আবশ্যক হয় না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—হে রাম, তুমি বিবেকদ্বারা সঙ্কল্প উত্থাপন করিয়া বিশ্ববিকল্প মনকে জয় কর এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞান উদিত কর। মনের নাশই মহান অভ্যুদয় এবং মনের উদয়ই মহা অনর্থের মূল। অতএব তুমি মনের নাশ বিধানের জন্য যত্নবান হও। এই মনই মহারোগগ্রস্ত সংসার। মনই জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে—সুতরাং মনের অভাবেই অদ্বয় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন। "সঃ অয়ম্ অহম্"—শুদ্ধ চৈতন্যরূপ বস্তুটিই হইতেছি আমি—"অয়ম্ অহম্ ন" মায়া-কার্য বিশ্বরূপ বস্তুটি আমি নহি। তবেই বুঝিলাম মনোগত আমিরূপে যাহা উদিত হয় উহা সত্যিকার

আমি নহে—অজ্ঞানের আমি। সে আমি আত্মবিস্মৃত, ভোক্তা আমি—কল্পনার আমি,—মায়ার আমি,—পঞ্চভূতের আমি হইয়া দিশাহারা পথিকের ন্যায় অকারণ জন্মমৃত্যুর পথে কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত হইয়া ঘুরিতেছে—ইহাই অবিদ্যারূপী মনের খেলা। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার এই যে, মন জগতের সব কিছুই জানিতে বা পাইতে চাহে, কিন্তু চাহে না শুধু নিজেকে। কারণ নিজেকে জানিতে যাওয়া মানেই তাহার নাশ। শ্রীরমণমহর্ষি বলেন 'আমি কে ?' অর্থাৎ অহংবৃত্তিরূপ এই অহংকার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? এই আত্মবিচারই অন্য সকল চিন্তার লোপ করিয়া শবদাহক বংশদণ্ডের ন্যায় পরিণামে নিজেই লুপ্ত হয়।

প্রত্যেকটি চিন্তার উদয়কালেই 'ইহা উঠিয়াছে কাহার ?'—এইরূপে সাবধানে বিচার করিলে 'আমার'—এইরূপ বোধ হইবে। অতঃপর 'আমি কে' ? এইরূপ বিচার করিলে মন নিজ উৎপত্তি-স্থান হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং উদিত চিন্তাও বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অভ্যাসের ফলে দেহগত মনের বা জীবের—নিজ আশ্রয়স্থলে, অর্থাৎ জ্ঞানময় আত্মসত্তায় থাকার শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। হৃদয়ে বা আত্মসত্তায় অবস্থান করিলে নামরূপ জগৎ তিরোহিত হয়। মন বহির্মুখী হইলেই নাম-রূপের জগৎ ভাসিয়া উঠে। মনকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখার নাম অন্তর্মুখীনতা। এবম্বিধ রীতিতে মন হৃদয়ে স্থিতিলাভ করিলে, সকল বৃত্তির যাহা মূল সেই অহংভাব বা দেহগত আমি নিঃশেষে লোপ পাইলে নিত্য বর্তমান সদ্‌বস্তু আত্মগত আমিমাত্র প্রকাশিত থাকে। যে অবস্থায় অহংভাবের দেহের বা মনের আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও থাকে না—তাহাই স্বরূপে স্থিতি। বস্তুতঃ উহাকেই মৌন বলা হয়। এই মৌন স্থিতির অপর নাম জ্ঞানদৃষ্টি। আত্মস্বরূপ ত্যাগ না করাই জ্ঞান। উহাই আত্ম-সংস্থিতি।

তাহা হইলে মনোনাশের পর যাহা নিত্য বর্তমান থাকে সেই সদ্‌বস্তুই আমার 'আমি', আত্মা বা ব্রহ্মশব্দবাচ্য। আমার নিত্যজাগ্রত আমি-বোধই জ্ঞানের মূল ভিত্তি। আমার এই জ্ঞানের ভিতর দিয়াই 'আমি'র স্বতঃসিদ্ধস্ফূর্তি। এই আমিই জ্ঞানের কেন্দ্র বা আত্মস্বরূপ। 'আমি'ই সত্যস্য সত্যম্। ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য। এবিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহর্ষি শ্রীরমণ তাই বার বার বলিয়াছেন, তুমি শুধু তোমার আমিকে জান, তবেই তোমার সব জানা ও পাওয়ার অবসান হইবে। আমরা সকলেই জানি যে আমার 'আমি' বা আত্মাই আমার পরমাত্মীয়। মানুষ বা জীবমাত্রেই ভালবাসে বা প্রিয়তম জ্ঞান করে আপনাকে। নিজেকে সে যত ভালবাসে, তত আর কোন কিছুকেই ভালবাসে না। এই চিরন্তন সত্য আমাদের না মানিয়া উপায় নাই। এই 'আমি'র বা আত্মতৃপ্তির জন্যই তাহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম। তাহারই ভোগের নৈবেদ্য সাজাইতে অহর্নিশ জীবের ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা। আমরা সহজেই দেখিতে পাই, মানুষের সকল কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে একটা আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা, আনন্দলাভের এষণা। তাহার সকল কামনা-বাসনার লক্ষ্য রহিয়াছে ঐ একদিকেই। মানুষের প্রকৃত সত্তার স্বরূপটিই হইল আনন্দ। আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, বিষয়, নাম-যশ চাই ঐ আত্মতৃপ্তির জন্যই। সংসারে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই চাহে আনন্দ, শুধু আনন্দ। প্রত্যেকটি মানুষই আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে কোন না কোন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কেহ বা লইতেছে ধর্মের আশ্রয়, কেহ বা ছুটিতেছে বিষয়ভোগের পশ্চাতে। কিন্তু পন্থা যাহাই হউক উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ আনন্দলাভ।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জীবনে, মানুষে মানুষে রহিয়াছে অনেক পার্থক্য, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় ঐ ব্যবধানের পশ্চাতে

সকলেরই অন্তরে রহিয়াছে আনন্দের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সে চাহে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, নিত্যানন্দ, অখণ্ড আনন্দ, পূর্ণানন্দ—যে আনন্দে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। বেদ ও উপনিষদের ঋষিরাও বলিয়াছেন—সেই কেবলানন্দই আমার 'আমি'র স্বরূপ। আমি সেই আনন্দ হইতেই জাত, সেই আনন্দেই আমার স্থিতি। আনন্দ অনুসন্ধানের সংগে ওতপ্রোত হইয়া আছে আত্মানুসন্ধান—কারণ আনন্দ চাওয়ার মানেই হইল আত্মবস্তুকে চাওয়া। আত্মবস্তু অমর। ইহাকে লাভ করিলে তবেই মানুষ সেই আনন্দকে লাভ করে—যাহার শেষ নাই।

"স্বরূপে আনন্দ মোর সিদ্ধ চিরদিন।
আনন্দ সাধিতে শ্রম করে বুদ্ধিহীন॥"

জীবের বুকে অর্থাৎ মনোগত 'আমি'র বুকে ফুটিয়া আছে স্বতই একটা অভাব, কারণ আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। সেই অভাবের মোহই তাহাকে লইয়া যায় বাহিরে, বিষয়ে আনন্দ অন্বেষণে। যাহার উপাদানই আনন্দ, যাহার স্বরূপই আনন্দ তাহাকে কি বাহিরের বস্তুতে অন্বেষণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে হয়? আনন্দ বিষয়ে জড়িত নাই। উহা যে জীবের অন্তরেই। যিনি অন্তরের অতল তলে ডুবিয়াছেন, তিনিই সেই আনন্দে পৌঁছিয়া আনন্দময় হইয়াছেন।

ঋষিরা ও শাস্ত্র বলেন 'আমি'ই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। সচ্চিদানন্দ মানে—সৎ + চিৎ + আনন্দ। সৎ অর্থে সত্তা, থাকা—existence। আমি আছি ইহাতে ভুল নাই, সংশয় নাই। আমি রহিয়াছি, নিয়তই থাকিব। এই 'আছি'-বোধই সত্তা। চিৎ—মানে চেতন, জ্ঞান বা জানা—knowledge। আমি যে আছি ইহা জানিতেছি। এই জানা বা আত্ম-অস্তিত্বের জ্ঞানই চিৎ বা চৈতন্য। জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় চৈতন্য-প্রভাবেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হইয়াছেন। আত্মা নিজেই জ্ঞান স্বরূপ হওয়ায়—নিজের জ্ঞানের বা প্রকাশের জন্য-জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিজের স্বরূপেই নিজে প্রকাশিত। যাহাদ্বারা সমস্ত জানা যায় সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যাইতে পারে? সে স্বতঃস্ফূর্ত। ইহাই অনির্বচনীয় স্বয়ংপ্রকাশত্ব। সাধারণতঃ আমরা যে জ্ঞানকে অনুভব করি, উহা শুধু বিষয়প্রকাশরূপী জ্ঞান। কিন্তু তাহার স্বরূপকে জানি না।

মহর্ষি এখানে বলিতেছেন :—

"জ্ঞানবর্জিতাঽজ্ঞানহীনচিৎ।
জ্ঞানমস্তি কিং জ্ঞাতৃমন্তরম্॥

অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞানশূন্য এবং অজ্ঞানশূন্য চিৎই জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ। প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানে—জ্ঞানবিবর্জিতত্ব কিরূপে সম্ভব? তাই কারণ দেওয়া হইতেছে। জানিবার অন্য পৃথক বস্তু না থাকায় দ্বৈতবিবর্জিত জ্ঞানস্বরূপ চিৎকে জ্ঞানশূন্য বলা হইয়াছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত। পারমার্থিক সত্তায় জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী-বিভাগ বস্তুতঃ নাই। উহা পাই শুধু অজ্ঞানেতেই। আলো অপরকে প্রকাশ করে,—কিন্তু প্রকাশ করা তাহার স্বরূপ নহে—তাহার স্বরূপ দীপ্তি। যিনি আপনি আপনাকে—আপনার দ্বারাই সদা জ্ঞাত, যে জানায় ক্রিয়াত্ব নাই, সেই স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ তত্ত্বই পরমাত্মতত্ত্ব। আমি আছি, ইহা আমি জানি, ইহা আমাকে কাহারো জানাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হয় না। জানি আছি। তাহা হইলে সৎ (সত্তা বা থাকা), চিৎ (জ্ঞান, চৈতন্য বা জানা) উভয়ে অভিন্ন। আমি আছি, আমি জানি, এই যে জ্ঞানময় অস্তিত্ব-বোধে থাকা—অতি সুখময় —এই জ্ঞানই আনন্দ (Bliss) শুদ্ধ চৈতন্যময় বস্তুটিই 'আমি'। অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি ও থাকিব। কি আশ্চর্য এই—'আমি'! এই 'আমির' নাশ নাই, জরা নাই—মৃত্যু নাই—ভয় নাই, অভাব নাই—দুঃখ নাই। দেহবিশিষ্ট হইয়াও নির্বিশেষ ও গমনাগমনের অতীত হইয়াও বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া

বিরাজিত এই 'আমি'। তথাপি যে দুঃখবোধ হয়, উহা দ্বৈতমূলক। যাহা কিছু জানা হয় বা পাওয়া যায় সবই অসৎ। কারণ মনোগত আমিই জানে। যে জ্ঞানস্বরূপ তাহার আবার জানার কি থাকিতে পারে? অজ্ঞানাৎ ময়া উপাধিঃ কল্পিতঃ। মোহবশে আপনাতে দেহ, মন, প্রাণ, অহংকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া দুঃখ পাইতেছি। এই আমি চিন্মাত্রস্বরূপ, মায়া ও মায়ারচিত প্রপঞ্চ-জালের অতীত একমেবাদ্বিতীয়ম্। প্রতীয়মান জড়-সমূহ মিথ্যা, পারমার্থিক নহে।

"ইদম্ বিশ্বম্ ভ্রান্তিমাত্রম্"—এই বিশ্ব কেবল ভ্রান্তি দ্বারাই সিদ্ধ। দ্রষ্টা হইতে ইহার পৃথক সত্তা নাই। স্বপ্নরাজ্যে প্রাসাদ ও বিষয়াদি যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্ন থাকা কালীন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, আবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে উহাদের অসারতা প্রকাশ পায়—ইহাও তেমনি। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখা ভিন্ন অন্য আর কিছুই নয়। আত্মস্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। সকল দুঃখই দ্বৈত-ভ্রান্তিজনিত, অহংকারজনিত, নানাত্বদর্শনের ফল। মহামুনি অষ্টাবক্র স্বক্তসংহিতার ১৬ শ্লোকে বলিতেছেন :—

> দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
> দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্বং একোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ॥
>
> "তথাপি যে করি অহো দুঃখ অনুভব
> আত্ম ভিন্ন বস্তু জ্ঞান আনে দুঃখ সব।
> আমি বস্তু দুঃখ মূল মায়ার অতীত,
> অদ্বৈত চিন্মাত্ররূপে চির প্রতিষ্ঠিত।
> যাহা দৃশ্য তাহা মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞান
> অমোঘ করিতে মোর দুঃখ অবসান॥"

* * *

'আমি' পূর্ণ; 'আমি' কেবলানন্দস্বরূপ। সর্বাবস্থায়—এই 'আমি' অপরিবর্তনশীল। বাল্যের আমি, এই যুবক আমি হইয়াছে। এই যুবক আমিই কৈশোর পরিত্যাগ করিয়া আবার বৃদ্ধ আমি হইয়াছে। রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, দেহের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু আমার আমির পরিবর্তন হয় নাই, হইবেও না। 'আমি' নিত্য নির্বিকার। আমার আত্মগত 'আমি' বিকারগ্রস্ত হয় না। তাই আমি মন নহি, প্রাণ নহি, দেহ নহি, ভোগ্য বা ভোক্তাও নহি। ইহার একটিও আমি হইলে বলিতাম না আমার মন, আমার প্রাণ, আমার দেহ ইত্যাদি। আমির বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই। যেমন ছিল, তেমনই আছে ও থাকিবে। এই 'আমিই' এক স্বকীয় সৎস্বরূপে নিত্য জাগ্রত। কিন্তু জগতের যে কোন দৃশ্য পদার্থই অপরের সাহায্য লইয়া নিত্য অবস্থান করিতেছে। দৃশ্য-মাত্রই ত অন্যাশ্রিত। নিরালম্ব অবস্থানের সামর্থ্য নাই। একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ 'আমি'ই নিরালম্ব, স্বতঃস্বাধীন। এই জ্ঞানস্বরূপ 'আমি' কিছু হইতে জন্মায় না। যাহা জন্মায় তাহার নাশও আছে। 'আমি' অমর, অক্ষয়, অব্যয়। জ্ঞানস্বরূপ আমির নাশ নাই। এই আমিকেই ঋষিরা 'কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্' বলিয়াছেন। কেবল জ্ঞানস্বরূপ 'আমি'। কারণ আমিই আমার অস্তিত্বের জ্ঞাতা। অতএব জ্ঞানই আমার একমাত্র স্বরূপ। আমি আছি ইহাই সৎ (Existence), আর আমি যে আছি এই জ্ঞানই প্রকাশ বা চিৎ (Knowledge of Existence), যে জানার কোন হেতু নাই, অবলম্বন নাই, উহাই চিৎ। নিজ বোধস্বরূপ স্বপ্রকাশই চিৎ। তবে বুঝিলাম, সৎ+চিৎ (সত্তা+চৈতন্য) আমার নিত্যস্বরূপ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন। এই নিত্য স্বরূপই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তাই আনন্দময়। 'আমি' যে আছি এই জ্ঞান বা চৈতন্যই আনন্দ। আমার এই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে দুঃখের লেশমাত্রও নাই বলিয়া—'আমি' সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—তাহা হইলে 'আমি'-ই কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্। মহর্ষি শ্রীরমণ উপদেশসার পুস্তিকায় নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে বলিতেছেন :

কিং স্বরূপ মিথ্যাত্ম দর্শনে।
অব্যয়াহ ভবাহ-হ পূর্ণচিৎ সুখম্ ॥

স্বরূপ-সন্ধানে যদি আত্মদৃষ্টি হয়
পূর্ণ চিদানন্দ তাহা অজ ও অব্যয় ॥

নিজের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবিনাশী,—অকৃত্রিম, অনুপাদের ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হয়।

বন্ধমুক্ত্যতীতং পরমসুখম্।
বিন্দতীহ জীবস্তু দৈবিকঃ ॥

মুক্তি বন্ধনাতীত এই চিদানন্দরূপ ;
জীব যথা লভিছেন ঈশ্বর স্বরূপ ॥

স্বরূপতঃ আমি বদ্ধ নহি ; আমার মোক্ষও নাই, কেননা আমি নিত্য চিদ্রূপ। মনোগত 'আমি' বা অজ্ঞানের 'আমি' বিচিত্র বিশ্ব রচিয়া প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে। শুধু চিন্মাত্র 'আমি' তে বিশ্ব নাই, নাম নাই, রূপ নাই—ছিল না বা থাকিবে না। অদ্বৈত চৈতন্যে স্থিতিলাভ করিলেই জগদ্ভ্রম—নিরস্ত হইয়া যায়। জীববোধই বন্ধন—মুক্তিসাপেক্ষ। কোন দিন কোন কালেই এই আমির বন্ধন ছিল না ; আজও নাই। কোন দিন হওয়াও সম্ভব নয়। অসীমকে সীমায় আনা যায় না। তাহাকে বাঁধা যায় না। একমাত্র মনেরই বন্ধন ও মুক্তি সম্ভব। "Thought of liberation is bound with the sense of bondage."

মুক্তিচিন্তায় বন্ধনচিন্তা জড়িত। ইহাও সংস্কারের বা মনেরই খেলা ছাড়া যে আর কিছুই নয়। মহামুনি অষ্টাবক্র স্বক্ত-সংহিতায় বলিতেছেন :

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গর্তিভবেৎ ॥

"মানিলে আপনে মুক্ত মুক্ত হয় নর,
জানিলে আপনে বদ্ধ বদ্ধ নিরন্তর।
লৌকিক প্রবাদ জেনো, সত্যি 'অতি'
যার যথা হয় মতি তার তথা গতি ॥"

যিনি আপনাকে মুক্ত মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত ; আর যিনি আপনাকে বদ্ধ মনে করেন তিনি বদ্ধই। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যার যেমন মতি তার তেমন গতি। ইহা মিথ্যা নহে। বন্ধ, মোক্ষ—বস্তুতঃ মনেরই বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়। কারণ বন্ধপ্রত্যয়ের বিলোপ ও মোক্ষপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা বিচারবুদ্ধি দ্বারাই সাধিত হয়।

স্বরূপে বন্ধনমুক্তি কিছুই নাই ; উহা সর্বাবস্থাতীত চিৎ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ। পূর্ণ জ্ঞানী সদাই সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন।

অহমপেতকং নিজ বিভানকম্।
মহদিদং তপো রমণবাগিয়ম্ ॥

অনাত্মারূপ মনোমূল অহংকার বিনষ্ট হইলে যে আত্মস্বরূপের প্রকাশ তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। নিত্য আত্মস্ফুরণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন তপস্যা নাই, ইহাই শ্রীরমণ বলেন।

শাস্ত্রে আর তীর্থে তার না মেলে সন্ধান
তারে শুধু পাওয়া যায় হ'লে আত্মজ্ঞান
সে যে 'আমি' ছাড়া নাহি কিছু আর
একমাত্র সত্য 'আমি' সর্বসারাৎসার ॥

"জগৎ এই মহান্ আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কারসকল দূর হউক। দুর্বল লোকদিগকে ইহা শুনাইতে থাক—ক্রমাগত শুনাইতে থাক—তুমি শুদ্ধস্বরূপ—উঠ, জাগরিত হও। হে মহান্, এই নিদ্রা তোমায় সাজে না। উঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি আপনাকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিতেছ? হে সর্বশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাণী

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়, এম্-এ

মানুষের তরে রেখে গেল যারা কিছু নয় শুধু আঁখিজল,
হৃদয়ের কথা ভাষায় ফোটেনি মরিল ব্যথায় অবিরল;
জীবনের বুকে ছিন্ন পাত্র ধরিয়া
মরণের কোল দিল অমৃতে ভরিয়া
লক্ষ আঘাত বেদনায় তবু করেনিক কোন কোলাহল,
তাহাদের সেই বাণী হোক আমাদের চির সম্বল।

সংসার মাঝে সবাই যখন অভিশাপ দিল বিধাতায়,
সমূহ সৃষ্টি ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার অরাজকতায়,
তখনো যাহারা বিশ্বাস লয়ে হৃদয়ে
নীরব হাসিতে জেগে ছিল সারা নিশি এ
তখনো যাদের অটুট শ্রদ্ধা রহে মঙ্গল ক্ষমতায়,
মোরা চাই আজ তাহাদের সেই নীরব বাণীর বারতাই॥

জীবনের যত দুঃখ ও গ্লানি বিপুল দ্বন্দ্ব হাহাকার,
যারা দেখে গেল নয়ন ভরিয়া তবুও রহিল অবিকার;
ভালো ও মন্দ নিল দুই হাতে সমানে
পাপ ও পুণ্যে টেনে নিল বিনা প্রমাণে
সবার লক্ষ দাবিরে ছাড়ায়ে উঠেছে প্রেমের দাবি যার,
আজিকে আমরা লইব সকলে বিশ্বপ্লাবী সে বাণী তার॥

পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

স্বামী জগন্নাথানন্দ

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

শ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর যত উৎসব আছে, তন্মধ্যে রথযাত্রাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নরনারীরা আসিয়া রথে বিরাজিত প্রভুকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না,—হিন্দুদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় অশেষ দুঃখকষ্ট

বরণ করিয়া দর্শনলালসায় আকুল প্রাণে তাঁহারা ছুটিয়া আসেন। রথযাত্রার সময় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

প্রভু ও ভৃত্য

কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই দেহ রথ, আত্মা রথী, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, মন লাগাম, বুদ্ধি সারথি।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥"

যেমন দেহরথে বিরাজিত পরমাত্মাকে ভৃত্য-স্থানীয় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে চালাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জগতের নিয়ন্তা, জগতের পালক প্রভুকে রথে অবস্থিত আছেন জানিয়া রথের রজ্জু ধরিয়া সেবকেরা টানিয়া আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন। পুরীতে অবস্থানকালে চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাবের উড়িয়া ভাষায় রচিত একটি গান করিতেন 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'; পরিমুণ্ডা অর্থাৎ দীনতা প্রকাশ করা, নমস্কার ও প্রশংসা করা। জগবিমোহনকারী জগন্নাথ মহাপ্রভু যাইতেছেন। তাঁহাকে নমস্কার ও নিজেদের আর্তি জানাইবার জন্য চল। এই গান সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের পার্ষদেরা সাত দলে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। এক এক দলে একজন করিয়া প্রধান গায়ক থাকিতেন; যথা অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস, সত্যরাজ খান ও হরিদাস। চৈতন্যমহাপ্রভু সকলের দলে যোগ দিয়া নৃত্য করিতেন, তাঁহার দেবদুর্লভ অপূর্ব উদ্দাম নৃত্য, গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ আজানুলম্বিত বাহুযুগল, গৌরকান্তি সকলের মন হরণ করিয়া নিত। পূর্বোক্ত গানটি করিয়া চৈতন্যদেব কখনও অন্তর্দশা, কখনও অন্তর্বাহ্যদশা, কখনও বা সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। পুনরায় একটু বাহ্যজ্ঞান আসিলে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। তাঁহার দেহের রোমাবলি কখনও কণ্টকিত হইত; কখনও তিনি প্রফুল্ল, কখনও বা কাষ্ঠের মত নিশ্চল হইয়া থাকিতেন। জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা তাঁহার মধ্যে সঞ্চার হইত। ভাবপূর্ণ অবস্থায় জগ···গগ · পরি···পরি ·· (জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ) ইহাই বলিতেন। সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেন না। ঈশ্বরীয় প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে প্রেমঘন মূর্তিটি যেন তরঙ্গায়িত ও হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে হাড়মাংসের শরীর দর্শকেরা মনে করিতে পারিত না। নয়নপ্রাণহরণকারী অপূর্ব নৃত্য দর্শন করিয়া দর্শকেরা বুঝিতে পারিতেন না যে, তাঁহারা পৃথিবীতে আছেন—না অন্য কোথাও আছেন। প্রভুর প্রেমের তরঙ্গে সেই সময় প্লাবিত হইয়া তাঁহারা দেশকাল ভুলিয়া যাইতেন। প্রভুর অবস্থানকালে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহার স্মৃতি পুরীর সর্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে।

এই রথযাত্রার সময় গোপীগীতা পাঠ করিবার কালে প্রতাপরুদ্রকে ভাবাবস্থায় মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। ওড়িশার রাজারা নিজেদের জগন্নাথ-দেবের সেবক বলিয়া ভাবিতেন; প্রভুই এই রাজ্যের মালিক, আমরা তাঁহার ভৃত্যমাত্র এবং তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী। ভোগনিবেদনের পর জগন্নাথদেবকে রাজারা পানের ডিবা লইয়া দিতেন। যথাযথভাবে পূজা হইল কিনা, কোন ত্রুটি হইল কিনা, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব লইতেন।

ভোগ-নিবেদনের সময় দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইলে বুঝা যাইত কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইয়াছে। তজ্জন্য নাটমন্দিরস্থিত গরুড়-স্তম্ভের নিকট রাজাকে হত্যা দিয়া থাকিতে হইত। স্বপ্নাদেশে প্রভু তাঁহাকে যেরূপ বলিতেন, তদনুযায়ী রাজা ব্যবস্থা করিতেন। কোন ভক্ত হয়ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছে, কেহ বা জগন্নাথদেবের ভক্তকে অপমান করিয়াছে, কোন ভক্ত হয়ত গ্রাসাচ্ছাদন

পাইতেছেন না—তজ্জন্য রাজাকে স্বপ্নাদেশের পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইত। কখনও কখনও প্রভু নিজে আপদবিপদ হইতে ভক্তকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাগ্রতদেবতার লীলা উৎকল-সাহিত্যে, কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন গল্পকথা লোকের মুখে গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। ওড়িয়া ভাষায় পদ্যে রচিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তি' গ্রন্থ হইতে রঘু অরক্ষিতের একটি সংবাদ নিয়ে দেওয়া হইল।

ভক্ত রঘুনাথ

রঘুনাথ ছিলেন মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ মহাপাত্র, মাতার নাম কমলা। তাঁহাদের অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাঁহারা প্রভুর ভক্ত ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মাতাপিতার মৃত্যুর পূর্বে এক ধনী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি অতি সুলক্ষণা ও সতীসাধ্বী, নাম অন্নপূর্ণা।

ঐশ্বর্য নষ্ট ও মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথ অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরে অন্নসংস্থান না থাকায় তাঁহাকে দরিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। এককালে যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তিনি কোনমুখে সেই গ্রামেই ভিক্ষা করিবেন? রঘুনাথ দেশে না থাকিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, সেখানে তিনি নিত্য জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্তবস্তুতি করিতেন এবং সাধনভজনে অধিকাংশ সময় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। মঠে মঠে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেকালে সর্বসাধারণের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল।

এদিকে কন্যার পিতামাতা ভাবিলেন, রঘু এখন পথের ভিখারী—তাঁহার কুলশীলের কোন মর্যাদা নাই। এরূপ অবস্থায় কোন বড়লোকের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করাই ভাল। মেয়েটি সুখে থাকিবে। বাসুদেব মহাপাত্র নামে সেইদেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইল। সতীসাধ্বী অন্নপূর্ণা ঐরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু, আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর, আমার পতি থাকিতে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমি আত্ম-হত্যা করিয়া জীবনের অবসান ঘটাইব"। তিনি আকুলকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—"হে প্রভু, আমার কাছে আমার পতিকে আনিয়া দাও, নচেৎ তাঁর কাছেই আমাকে লইয়া যাও।" সেই গ্রাম হইতে কয়েকজন নীলাচলে যাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণা একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন এবং স্বামীকে দিবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন।

গ্রামের লোকেরা নীলাচলে আসিয়া অনেক খুঁজিয়া রঘুনাথের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহার হস্তে তাঁহারা পত্নীপ্রদত্ত পত্রখানিও অর্পণ করিলেন। দশদিন পরেই অন্নপূর্ণার পুনর্বিবাহ। পদব্রজে দেশে ফিরিতে হইলে একমাস লাগিবে। অথচ না গেলেও পত্নীর আত্মহত্যা-দোষ লাগিবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথ জগন্নাথ মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরকণ্ঠে স্বীয় মর্মবেদনা জানাইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু, আমার কোন সহায় নাই, তুমিই আমার সর্বস্ব, একমাত্র সহায়, তোমার নাম বিপদমোচন" ইত্যাদি প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহদ্বারের নিকট ধরনা দিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথদেব বেতাল নামক অনুচরকে রাত্রি থাকিতেই রঘু অরক্ষিতকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। বেতাল তদনুযায়ী প্রভাত হইবার পূর্বে তথায় তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিল। রঘু

অরক্ষিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা প্রভুর লীলা।

কন্যার পিতামাতা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কাঙাল জামাতা রঘুকে তাঁহাদের দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া মহা আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন। রঘুকে মারিয়া ফেলিলে কন্যা অন্যকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ভাবিয়া পিতামাতা বিষমিশ্রিত খাদ্য তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু তিনি প্রভুকে সমস্ত অন্ন নিবেদন করিলেন। পত্নী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। নিবেদিত অন্ন ফেলিয়া দিলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া বিষমিশ্রিত সমস্ত প্রসাদ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। প্রাণবায়ু নির্গত হইলে রঘুনাথকে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। প্রচারিত হইল সর্পাঘাতে রঘু অরক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছে। পতির নিধনের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় পতির সহগামিনী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

সতীর আর্তনাদে প্রভুর আসন টলিল—তিনি আসিয়া করস্পর্শে রঘু অরক্ষিতকে বাঁচাইলেন। পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে যাইবার পথে অন্য এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত যে রাজপুত্রের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি সসৈন্যে আসিতেছেন জানিয়া পতি-পত্নী বিচলিত হইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশে জগন্নাথ বলভদ্র সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া বিপদ হইতে ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে সমস্ত দুঃখবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া উভয়ে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দেহান্তে এই দিব্যদম্পতী বাঞ্ছিতলোকে গমন করেন।

জগন্নাথদেবকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা ভক্তদের চরিত্র ও জাগ্রত দেবতার লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রথত্রয়

আমরা এখন রথযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা আরম্ভ হয়। জগন্নাথদেবের রথের চাকার সংখ্যা ষোল, বলভদ্রের রথের চাকা চৌদ্দ এবং সুভদ্রা দেবীর বার। যথাক্রমে রথত্রয়ের নাম নন্দিঘোষ, তালধ্বজ ও দর্পদলন। তিনটি রথ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। নন্দিঘোষের বর্ণ রক্ত ও পীত, তালধ্বজের নীল ও রক্ত, দর্পদলনের রক্ত ও কৃষ্ণ। শাস্ত্রানুসারে বিবিধ পতাকা ও বিবিধ কারুকার্যে রথত্রয় মণ্ডিত হইয়া থাকে। জগন্নাথ-দেবের রথে গরুড়ধ্বজ, বলভদ্রের রথে লাঙ্গুলধ্বজ, সুভদ্রার রথে পদ্মধ্বজ থাকে। রথের বেদী হইতে জগন্নাথের রথের উচ্চতা তেইশ হাত, বলদেবের বাইশ হাত, সুভদ্রার রথের একুশ হাত। আষাঢ় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে রথগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠার পর হইতে কোন জীবজন্তু, পক্ষী, মার্জার, এমন কি মনুষ্য পর্যন্ত রথের উপর যেন না বসে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

আষাঢ় শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়ার দিনে সেবকেরা প্রভাতে প্রভুকে অর্চনা করিয়া খিচুড়ি ভোগ দিয়া থাকে। তাহার পরে প্রার্থনার সুমধুর স্বর ভক্তকণ্ঠে জাগিয়া উঠে। প্রার্থনান্তে মহাপ্রভু রথে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া থাকেন। ইহাকে 'পহন্তি বিজে' বলা হয়। 'পহন্তি বিজে' অর্থ—ধীরে ধীরে বসিয়া বসিয়া চলা। পহন্তির সময়ে বিবিধ বাদ্য, নানাবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। এই সময় প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। প্রথমে সুদর্শন চক্র, তাহার পরে বলরাম, তাহার পরে সুভদ্রা, শেষে জগন্নাথদেব রথে আসেন।

পহন্তি বিজে করিবার পূর্বে স্বয়ং রাজা ঝাড়ু হস্তে রথত্রয় ও পথ মার্জনা করেন।

এক কিংবদন্তী আছে ওড়িশার রাজা পুরুষোত্তম-দেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) রথের সময় ঝাড়ু হস্তে মার্জনা করিয়া থাকেন শুনিয়া কাঞ্চি কাবেরীর রাজা ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং পূর্ব প্রস্তাবমত তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। সেজন্য পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথমে তিনি সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হন। রাজার প্রার্থনায় জগন্নাথদেব ও বলভদ্র সৈন্যসহ দুইটি অশ্বপৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা পুরুষোত্তম জয়লাভ করিলেন।

জগন্নাথ, বলভদ্র সৈন্যবেশে নিজেদের রত্ন অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়া মানিক নাম্নী গোয়ালিনীর নিকট হইতে দই দুধ খাইয়াছিলেন। পরে সেই গোয়ালিনীর সঙ্গে রাজার দেখা হইলে রত্ন অঙ্গুরীয় দেখাইয়া তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে যে একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, উহা মানিক পাটনা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ. রথযাত্রার সময় প্রভুর যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য পথের স্থানে স্থানে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে এবং দর্পণে তাঁহাকে কর্পূরমিশ্রিত শীতল জলে অভিষিক্ত করা হয়।

অপরাহ্নে রথ টানা হয়। রথগুলি গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিবার পর মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত বেদিতে দেবতাদিগকে স্থাপন করা হয়। এখানে তাঁহারা থাকেন সাতদিন, বড় মন্দিরে থাকাকালীন যেরূপ ভোগরাগ দেওয়া হয়, সেইরূপ এখানেও হইয়া থাকে। এখানে মহাপ্রসাদও হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের নিকট ঠাকুররা সাতদিন থাকেন। গুণ্ডিচা মণ্ডপে দেবতারা গেলেও প্রতিদিন রথস্থ ধ্বজগুলির পূজা হয়। আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা দ্বারা রথের কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্য ভূতপ্রেতাদি ও দিক্‌পালদিগকে যথাবিধি বলি (পূজা) দেওয়া হয়।

অষ্টমীর দিন তিনটি রথকে দক্ষিণাভিমুখী করিয়া মাল্য, পতাকা ও চামর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। নবমীতে সকালবেলা মন্দির হইতে ঠাকুরদের আনিয়া রথে স্থাপন করা হয়। সেইদিন রথ টানিয়া বড় মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট রথগুলি রাখা হয়। ঠাকুর আসিলেও সহজে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। লক্ষ্মীঠাকুরানী রাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বচনিকা আরম্ভ হয়, তারপর লক্ষ্মী দ্বার খুলিয়া দিলে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করেন।

গুণ্ডিচা বাড়ী

বড় মন্দিরের দেড় মাইল উত্তর দিকে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত। এই গুণ্ডিচা মন্দিরকে মহাবেদী, যজ্ঞমণ্ডপ, জন্মস্থান, জনকপুরী ও গুণ্ডিচা মণ্ডপ বলা হয়। প্রাচীন কালে ইন্দ্রদ্যুম্ন এইখানে নৃসিংহ-মূর্তি স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া গুণ্ডিচাবাড়ী, বেদী রচনা করিয়া উহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞমণ্ডপ এবং ঠাকুরদের এখানে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জন্মস্থান বা জনকপুরী বলা হয়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকল-খণ্ডে বর্ণিত আছে—

গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য মহাবেদী তবাভবৎ॥

আমি যেখানে পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেখানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই গুণ্ডিচা-মণ্ডপে আমাকে লইয়া যাইবে, উহা আমার জন্মস্থান ও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। আমি সেখানে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলাম বলিয়া আমার ঐ স্থানের প্রতি অসীম প্রীতি রহিয়াছে।

মমোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং প্রীতিকৃন্মম শাশ্বতম্।
বহুকালং স্থিতশ্চাহং মমাস্মিন্ প্রীতিরুত্তমা॥

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন গুড়িচা শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। তেলেগুতে

গুড়িচার অর্থ কুটীর। আদিম অধিবাসীরা জগন্নাথদেবকে ঐদিন মন্দির হইতে বাহির করিয়া কুটীরে রাখিতেন বলিয়া কালক্রমে উহার গুণ্ডিচা নাম হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম গুণ্ডিচাদেবী ছিল, তদনুসারে গুণ্ডিচা হইতে পারে।

রথ-নির্মাণ-বিধি

প্রত্যেক বৎসর ঠাকুরদের রথ নূতন ভাবে নির্মাণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব বৎসরের রথ ব্যবহার হয় না। উহা নিলাম হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রাজা সংকল্প করিয়া আচার্য ও তিনজন সূত্রধরকে বরণ করিয়া থাকেন, অরণ্যে যেখানে ভাল কাঠ পাওয়া যায়, সেখানে পুরোহিত যাইয়া অরণ্যে অগ্নি স্থাপন করিয়া সুপ্র-শস্থ পাঠ ও ১০৮ আহুতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে ঘৃতের দাগ দেওয়া হয় এবং দিক্‌পাল ও ক্ষেত্রপালদের জন্য পৃথক পৃথক বলি দেওয়া হয়। বনস্পতির প্রীতির জন্য পায়সান্ন দ্বারা ১০০টি আহুতি দেওয়া হয়; তারপর আচার্য ভগবানকে স্মরণ করিয়া দাগদেওয়া বৃক্ষগুলিতে কুঠার দ্বারা আঘাত করেন। এইরূপে আচার্য সূত্রধরদের ছেদনকার্যে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক বৎসরের রথনির্মাণের পূর্বে যথোক্ত বিধি পালিত হয়।

নব-কলেবর

অবতার বা মহাপুরুষদের যেমন ভৌতিক দেহ জরাজীর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ অবতারমধ্যে পরিগণিত জগন্নাথ প্রভু কলেবর-পরিবর্তন করেন। যে বৎসরে আষাঢ়ে মলমাস পড়ে, অর্থাৎ দুইটা আষাঢ় মাস হয় সেই বৎসরে ঠাকুর কলেবর-পরিবর্তন করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই কলেবরপরিবর্তনপ্রথা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বাবসু-বংশীয় শবর জাতিরা জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিংবদন্তী আছে বহুপূর্বে প্রাচীনকালে জৈনেরা এই মূর্তি পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শবরজাতিরা ছাড়াইয়া নিয়া আসে। তাঁহারা আনিয়া মূর্তির পরিবর্তন করিয়া নীলমাধব নাম দিয়া পূজা করেন। যে বৎসর মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছিল, সেই বৎসর দুইটি আষাঢ় মাস পড়িয়াছিল, সেই মাসে তাহারা মূর্তি পরিবর্তন করিয়াছিল। উহা হইতেই নবকলেবর-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

দুইটি আষাঢ় মাসে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা ঘট পরিবর্তন করেন। ঠাকুরদের জীর্ণ কলেবরগুলিকে মন্দিরের মধ্যে 'কুইলি বৈকুণ্ঠ' স্থানে প্রোথিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় শবরেরা এই আষাঢ় মাসকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। যখন ঠাকুরদের কলেবর প্রোথিত করা হয়, তখন হইতে 'দইতারা' (শবররাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ফুলের বংশধর) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করেন। উহারাই প্রভুর জ্ঞাতি-কুটুম্ব। নয়দিন যথাবিধি তাঁহারা অশৌচ পালন করিয়া থাকেন।

বিগ্রহনির্মাণ যে কোন কাষ্ঠে হয় না। উহা নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়। যেকোন নিম্ববৃক্ষে হয় না। বহু প্রকার বিধি আছে, কোন নির্জন স্থানে সাধুর আশ্রমে নিম্ববৃক্ষ থাকিবে। উহা কীটদষ্ট হইলে হইবে না। সেই বৃক্ষমূলে ধূপ ধুনা প্রত্যহ দেওয়া চাই। উহাতে একটি বিষধর সর্পের বাস থাকিবে। গাছের উপর কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। সে বৃক্ষের রং ধবল হইবে, শঙ্খের চিহ্ন থাকিবে এবং তাহাতে সাতটি শাখা থাকিবে।

এইরূপে বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনের প্রত্যেকের একটি লক্ষণযুক্ত নিম্ববৃক্ষের প্রয়োজন হয়। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত নিম্ববৃক্ষ সহজে পাওয়া যায় না। সেবকরা পুরী জেলার মধ্যে কাকটপুরস্থ সর্বমঙ্গলার নিকট হত্যা দিয়া থাকেন। কোন্‌

দিকে গেলে সেইরূপ বৃক্ষ পাওয়া যাইবে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন। তদনুসারে সেবকেরা উহার অন্বেষণে চলিয়া যান। সেই সেই নিম্ববৃক্ষের মূলে পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। তারপরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া নূতন শকটে আনিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কুইলি বৈকুণ্ঠে দারু নির্মিত হয়। জগন্নাথদেবের নাভিস্থলে যে কৌট আছে (আত্মারাম কৌট) উহা বাহির করিয়া নূতন দারুমূর্তির নাভিস্থলে রাখা হয়। যে লোকটি বাহির করে তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ভূতাবিষ্টের মত উহা আনিয়া নূতন কলেবরে স্থাপন করে। সে কৌটের মধ্যে কি আছে আজ পর্যন্ত কেহ দেখে নাই; কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের দন্ত আছে।

রথযাত্রার ইতিবৃত্ত

রথ-শব্দের ব্যবহার বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। আর্য অনার্য উভয়ে এই রথ যে ব্যবহার করিতেন উহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের লোকেরা শোভাযাত্রার সহিত রথে চড়িয়া ভ্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতেন। দেবতারাও রথযান অতিশয় ভালবাসিতেন। কোন্ দেবতার কোন্ রথ দ্রুতগামী ও মনোহর উহাও স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্যদেব, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, কুবের, ইঁহারা সকলেই রথ ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের রথ অতি মনোহর ও অতি দ্রুতগামী ছিল। উপনিষদে ও সংহিতাভাগে ভূরি ভূরি রথের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জনসমাজে যা বিশেষ প্রচলিত ছিল, উহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। রামায়ণে রঘুবংশীয় রাজাদের, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভাস সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের কবি, তিনিও তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্ত-নামক নাটকে রথের বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার পরবর্তী কবি, এতদ্ব্যতীত সেকালে রোম ও গ্রীস-বাসীরা রথ ব্যবহার করিতেন। দশাশ্ববাহিত রথে চড়িয়া শোভাযাত্রা-সহকারে রাজা যাত্রা করিতেছেন। বর্ণনা আছে রথগুলি কাষ্ঠনির্মিত, কারুকার্যমণ্ডিত চাকাগুলি লোহার ও অন্য কোন ধাতুর পাত দিয়া মুড়া থাকিত। যেগুলি যুদ্ধে ব্যবহার করা হইত সেগুলির চক্র সুতীক্ষ্ণ ছিল।

সর্বজন-আদৃত পবিত্র রথে লোকে তাহাদের অভীষ্ট দেবতাকে যে বহন করিয়া লইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তাহা হইতে অনুমান করা যায় রথযাত্রা প্রাচীন কালেও ছিল।

নেপালে বৈশাখ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ভৈরব ও ভৈরবীর রথযাত্রা এবং বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে কুমারী রথযাত্রা প্রসিদ্ধ, জৈনদের মধ্যেও এই রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। পূর্বে উজ্জয়িনীতে জৈনেরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন তীর্থঙ্করকে রথে বসাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতেন। অনেক বৌদ্ধক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের রথযাত্রা হইত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ইহা দেখিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান পাটলিপুত্রের রথযাত্রা-সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদের মতে অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর সকলে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শবররা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ত্রিরত্নের প্রতীক জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। জগন্নাথ—বুদ্ধ, বলভদ্র—সংঘ, সুভদ্রা—ধর্ম। জগন্নাথ-নামের মূলে বুদ্ধ আছেন। বৌদ্ধেরা ধর্মকে নারীমূর্তি বলিয়া অভিহিত করেন। ভাই-ভগিনীর মত সংঘের সম্পর্ক থাকায় বলভদ্র সংঘ। বৌদ্ধধর্মে যেমন জাতিভেদ নাই তেমনি জগন্নাথ-মহাপ্রসাদেও জাতিভেদ নাই। উহা যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হণ্টর সাহেব বলেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বৌদ্ধদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দন্ত-উৎসবের নকল।

জাপানে ত্রিরত্নের রথযাত্রা প্রচলিত। ইহা উহার সাদৃশ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ফগুর্সন সাহেব বলেন, বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্বাণের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা; বৌদ্ধেরা ঐ দিনে বুদ্ধের দেহাবশেষ রথে রাখিয়া রথযাত্রা করিয়া থাকেন। ইহা উহারই অনুকরণ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ঐরূপ মতপোষণ করেন। যাহা হউক, দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের লীলা চলিতেছে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধন্য করিয়াছে, কত ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য রচিত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত ধর্মের উত্থান-পতন হইয়াছে। কত রাজার রাজ্যশাসন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে, কত বড় বড় দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে উহার সমস্তই জগন্নাথদেব সাক্ষ্য দিতেছেন।

হে প্রভু, হে সাক্ষিন্‌, তুমি সকলের মঙ্গল কর, তুমি সকলকে ধর্মে মতি দাও।

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—ইহাই প্রার্থনা।

ওঁ তৎ সৎ।

বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানুষের অন্তরের গভীরে রয়েছে অমৃতের জন্যে পিপাসা, অনন্তের জন্যে কান্না। হাসির ছটা—সে তো বাহিরের। 'অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না ধন।' হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত, পান-ভোজন—সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে মানুষ নিঃশব্দে চলেছে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি হতাশাকে বহন ক'রে। এই প্রচ্ছন্ন বেদনার কথা কোন স্বামী বলে না তার স্ত্রীকে, কোন স্ত্রী বলে না তার স্বামীকে। বন্ধু বন্ধুর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে না তার নিঃসঙ্গ হৃদয়ের এই ব্যথাকে। সত্য সত্যই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে দুটো মানুষ। একটা মানুষ বাহিরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, মেনে চলেছে তার আইনকানুন। কায়দা-দুরস্ত তার মুখে লেগে আছে দেঁতো হাসি, তার পোষাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত, চায়ের টেবিলে সে হাস্যময়, জর্জেট সাড়ীতে আর রিবনে সুসজ্জিতা সে মনোহারিণী। দ্বিতীয় মানুষটি কিন্তু নিঃসঙ্গ এবং মৌনী। কামনার মৃত্যুজালে আবদ্ধ সে কাঁদছে মুক্তির জন্যে। সে বল্‌ছে: দরকার নেই আমার কিছুতে। আমার দরকার শুধু তাঁকে যিনি আমাকে উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, যা অধ্রুব তার মোহ থেকে যা ধ্রুব তারই শাশ্বত আনন্দের মধ্যে। মানুষের এই spiritual nature সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

ব্যথাতুর মানুষের কাছে এই চিরন্তন আনন্দলোকের বার্তা বহন ক'রে আনলেন রামকৃষ্ণ। পুরাকালের ঋষি অন্তরের মধ্যে জ্যোতির্ময় সেই পরমপুরুষকে দর্শন করে উল্লাসে ঘোষণা করেছেন:

'শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো—অন্য পথ নাহি।

তপোবনের সেই ঋষির মতোই রামকৃষ্ণ পরমহংস জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথকে বললেন: 'আমি ঈশ্বরদর্শন

করিয়াছি।' শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন: 'আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব!' উত্তরকালে স্বীয় জীবনের এই অমূল্য অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন:

> বালকবয়সে এ কলিকাতাশহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বরদর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত, আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছি।

ধর্ম বাহ্য অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম কোন মতবিশেষে বিশ্বাসও নয়। ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি। বিবেকানন্দের ভাষায় 'তাহাই ধর্ম যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য।' ঈশ্বরলাভের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ধর্মশাস্ত্রের ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। যাঁরা সেই বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত তেমন পণ্ডিতেরও অভাব নেই। কিন্তু সুদুর্লভ সেই পুরুষ যিনি অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করেছেন, সর্বভূতে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

যাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন—রামকৃষ্ণ সেই সুদুর্লভ পুরুষদেরই অন্যতম। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ঠাকুর দুধ খেয়েছিলেন। কথামৃতের প্রত্যেক খণ্ডে এই দুধ খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আছে।

কি ক'রে তাঁকে দর্শন করা যায়? পাণ্ডিত্যের দ্বারা? বিচারের দ্বারা? ঠাকুর অকুণ্ঠভাষায় বললেন, তাঁকে পাণ্ডিত্যদ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না। বললেন, 'শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়।' আমাদের দেশের ঋষিরা অনেক আগেই বলেছিলেন: নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্রপাঠের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।

কিন্তু ব্যাকুল হয়ে যাঁকে ডাকবো—তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়? ঠাকুর বললেন: বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তিনি আছেনই আছেন—এই জীবন্ত বিশ্বাস। এই যুগে—বিচারবুদ্ধির প্রাধান্যের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আর একজন বিরাট মানুষ বিশ্বাসকে দিলেন তার প্রাপ্য মর্যাদা। আমি প্রথিতযশা মার্কিন্ দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌সের (William James) কথা বলছি। জেম্‌সের The Will to Believe নামক যুগান্তকারী প্রবন্ধ বিংশশতাব্দীর দুনিয়াকে চলার পথে নূতন আলো দিয়েছে সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধে জেম্‌স্ বললেন: সত্যান্বেষণে বেরিয়েছে যারা তাদের দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে: সত্যে বিশ্বাস করো, আর মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। এ দুটোর মধ্যে আমরা সত্যান্বেষণকে প্রাধান্য দিতে পারি অথবা বলতে পারি: সত্য পাই আর না পাই ভুল করা কিছুতেই চলবে না। জেম্‌স বললেন: Better risk loss of truth than chance of error—অবিশ্বাসীর এই দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে আছে ভীরুমনের পরিচয়। বললেন, পাছে মিথ্যায় বিশ্বাস ক'রে ঠকি—এ ঠকার ভয় আমারও আছে। কিন্তু ঠকার চেয়েও বড়ো বিপদ পৃথিবীতে আছে। আমাদের ভুলগুলোকে এত ভয়াবহ ক'রে দেখবার দরকার কি? এ পৃথিবীতে যত সাবধানই আমরা হইনে কেন, ভুল করবোই। কোন সেনাপতি যদি তার বাহিনীকে বলে: আঘাতকে এড়িয়ে চলতেই হবে, তার জন্য যুদ্ধ থেকে যদি দূরে থাকতে হয় দূরে থাকতে হবে—তবে সেই সেনাপতিকে আমরা কি বলবো? বলবো: আঘাতের ভয়ে যুদ্ধকে যারা এড়িয়ে চলে তারা কখনও শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে না। বিপদকে যারা ভয় করে তারা প্রকৃতিকেও কি জয় করতে

পারে? যারা বলছে বস্তুর অস্তিত্বের সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি তারা কোন দিনই কোন বড় জিনিস আবিষ্কার করেনি; তারা তীরে বসে শুধু লাভক্ষতির হিসাব কষেছে, আর ঠকেছে। যারা বলেছে 'ফাল্গুনীর' বাউলের ভাষায় 'আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি' তারাই যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে সত্যকে, ললাটে পরেছে জয়লক্ষ্মীর মালা। তাই জেমস্ বললেন: ভুল করার ভয়কে এতখানি প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে মনের খানিকটা বে-পরোয়াভাব ভালো।

কোন্ শাপে কোন গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকবো বসে'—

এইবলে যারা অজানা সমুদ্রে তরী ভাসালো একটা জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রেরণায় সেই বে-পরোয়া বে-হিসিবী কলম্বাসের দল আবিষ্কার করেছে নবনব সত্য। কলম্বাসের সামনে সেদিন ছিল কূলহীন পথহীন মহাসিন্ধুর ফেনিল ঊর্মিরাশি। জলপথে ঈপ্সিত দেশে পৌছানো যাবে—এমন কোন objective evidence ছিল না কলম্বাসের সামনে। কলম্বাস কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষায় তীরে বসে থাকলেন না। তিনি যদি ভাবতে বসতেন ভাবনার কূল-কিনারা পেতেন না। ভাবতে ভাবতেই তাঁর জীবন কেটে যেতো। ভিতর থেকে কে যেন বললে, বেরিয়ে পড় অজানা পথে আর সেই অন্তরের ডাক শুনে কলম্বাস বেরিয়ে পড়লেন। সর্বনাশের আশঙ্কা ষোলো আনা ছিল—কিন্তু সে আশঙ্কায় তিনি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন না। বিশ্বাস ক'রে অজানার বুকে ঝাঁপ দিয়ে ঠকার ভয় নিশ্চয়ই আছে; জাহাজ খোয়ানোর, প্রাণ খোয়ানোর, সর্বস্ব খোয়ানোর ভয়। কিন্তু অজানাকে অবিশ্বাস ক'রে, ভয় ক'রে ঠকার আশঙ্কাও কি নেই? জেমস্ বললেন, Dupery for dupery, what proof is there that dupery through hope is so much worse than dupery through fear? অবিশ্বাস ক'রে ঠকা আর আশা ক'রে ঠকা, এ দুয়ের মধ্যে আশা ক'রে ঠকার বিড়ম্বনা যে বেশী—এর প্রমাণ কোথায়? যাকে বিয়ে করে ঘরে আনবো সে গৃহলক্ষ্মী হবেই—এ নিশ্চয়তা ভিন্ন যে বিয়ে করতে রাজী নয় তার আইবুড়ো নাম ঘুচবার নয়।

ঈশ্বর আছেন—বাইরে এর কোন প্রমাণ নেই। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। তিনি আছেনই—এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দিকে চলতে হবে। প্রমাণ না পেলে তাঁর দিকে যাবো না—একথা বললে তাঁর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা বেরিয়েছে তারা ডুবে থাকেনি পুঁথির মধ্যে, মেতে থাকেনি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে। তারা সব পাওয়ার জন্যে সব ছেড়ে বেরিয়েছে মুক্ত পথের বুকে। তারা বলেছে—Sail forth—steer for the deep waters only. কূল আঁকড়ে থেকো না, অকূলে ভাসিয়ে দাও তোমার তরী।

ইংরেজী লেখাপড়া শিখে আমাদের মন যখন শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিল, হারিয়ে ফেলছিল দেবদেবীতে বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধিকে দিচ্ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাধান্য, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এই সংশয়-দোলায় ক্রমাগত দুলছিল ঘড়ির দোলকের মত, তখন ঠাকুর বললেন: বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস! বললেন, 'তিনি সাকার কি কি নিরাকার সে কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়,—'হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন তাই আমায় দেখিয়ে দাও! তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।' বললেন মাষ্টার এবং তাঁর সগোত্রদের ব্যঙ্গ ক'রে: 'শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যান্‌রা মানে না।' ইংরেজদের প্রতিধ্বনি ক'রে যারা

বলছিল প্রতিমা-পূজা ক'রেই দেশটা জাহান্নামে গেল, ঠাকুর তাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী তৎকালীন ইংরেজী লেখাপড়া-জানা যুবকেরা দেখ্‌লে এক ন্যাংটা ব্রাহ্মণ। ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয় নেই বল্‌লে হয়। রসিকের চূড়ামণি। আনন্দময় পুরুষ—শুট্‌কে সাধু নয়। মুখে হাসি লেগেই আছে। নম্র, নির্মল, সরলতার প্রতিমূর্তি। বৃন্দাবনে থেকে যাচ্ছিলেন ; মা কাঁদবে, তাই সেজোবাবুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। করুণায় মন কত নরম! ন্যাংটা ব্রাহ্মণের ব্যক্তিত্বের অনির্বচনীয় আকর্ষণ কলেজে পড়া যুবকদের মনকে জয় ক'রে ফেললো। শ্রদ্ধাহীন মনে শ্রদ্ধা ফিরে এলো। 'সুলক্ষণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাক্‌বে—তা হ'লে ভগবানের পূজা হয়।' ঠাকুরের একথায় নরেন্দ্র আগে বিশ্বাস করতে পারতো না। ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জাগলো। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন : 'নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলতো ; এখন সব মানছে।' মেকলে এবং তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত পাদ্রীসাহেবেরা দেশময় স্কুলকলেজ খুলে ভেবেছিল, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মারফতে দেশটাকে আস্তে আস্তে খ্রীষ্টান বানিয়ে দেবে। ঠাকুর এসে তাদের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিলেন। যুব-সমাজকে মেকলে ধরেছিল ঢোঁড়ায় যেমন ব্যাঙ ধরে। ঠাকুর ধরলেন যেমন ক'রে জাত সাপে ব্যাঙ ধরে। সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান তরুণ চিত্তগুলি নিঃসংশয় হয়ে গেল। ঘুচে গেল তাদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার। সংসারবন্ধন তাদের কাটলো। সাকার-নিরাকারের বাদানুবাদে ঠাকুর কোন একটা বিশেষ পক্ষ নিলেন না। বললেন, একটাতে বিশ্বাস থাকলে হ'ল। জোর দিলেন বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরে। বললেন, 'বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে।' বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যে উইলিয়াম জেমসের যে অভিযান, প্রাচ্যে ঠাকুরেরও সেই ঐতিহাসিক অভিযান। এই অভিযানের দরকার ছিল সত্যান্বেষণের ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির উদ্ধত দাবীকে একটা সীমার মধ্যে সংযত রাখবার জন্যে। এই অভিযানের প্রয়োজন ছিল সত্য আবিষ্কারের ব্যাপারে বিশ্বাসের বিপুল প্রয়োজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পেলে হাঁড়ির মাছ যেন গঙ্গায় তলিয়ে যায়—এই জানাই তো সব নয়। 'সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আর আনন্দ হয়। তুমি খেলে না, কিছু করলে না। বসে বসে বলছো 'সিদ্ধি সিদ্ধি'! তা হলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়? ঠাকুর বললেন সাধনের কথা। কাঠে অগ্নি আছে, আগুনে ভাত রাঁধা হয়—এই বিশ্বাস ও জ্ঞান ভাত তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাঠে কাঠে ঘসতে হয় ; তবে আগুন বেরোয়। ঠাকুর বললেন পুরুষকার চাই, খুব রোখ চাই। মিছরির রুটী সিধে ক'রে খাবো, না আড় ক'রে খাবো —এই নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি বারণ করলেন। বললেন, যেমন করেই খাও মিষ্ট লাগবে। দরকার পথে চলা। দরকার সাধন।

এইখানে আসে ব্যাকুলতার কথা। ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের সমস্ত আনন্দ আছে, ঈশ্বর-দর্শন হ'লে রমণ-সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। মগজের বুদ্ধির কাছে এ সবই সত্য। কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যে প্রাণ দুলে ওঠে কৈ? সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে অন্তরের মধ্যে সে ব্যাকুলতা কই? ঈশ্বর না থাকলে, ঈশ্বরকে না পেলে প্রাণে বাঁচবো না—এ পাগলামি কই? ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হ'তে হয়।' তিনি বললেন, 'ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হোলো। তার পর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।' 'মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালোবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয়কে ভালোবাসে। এই তিন জনের ভালোবাসা,

এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয় ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শনলাভ হয়।' এই ভালোবাসা, এই টান, এই অনুরাগই হোলো সকলের বড়ো কথা। নারদীয়ভক্তি-সূত্রে আছে—ওঁ তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্। ভক্তিরই সাধনা কর। মগজ দিয়ে কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা এমন কিছু কঠিন হয়। কিন্তু মগজের জ্ঞান প্রাণকে যদি দোলাতে না পারে, হৃদয়কে যদি নাচাতে না পারে—মানুষ জোর পাবে না ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবার। কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপে' কে কবে জীবনকে নিঃশেষে বলি দিতে পেরেছে সত্যের বেদীমূলে? কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী ঠিকই বলেছিলেন: 'বুদ্ধিবৃত্তি বিচারশক্তি খুব ভালো জিনিস হইতে পারে; কিন্তু উহা বেশীদূর যাইতে পারে না। ভাবের ভিতর দিয়াই গভীরতম রহস্যসম্পদ উদ্‌ঘাটিত হয়।' মীরাবেনকে চিঠিতে গান্ধীজী বল্‌লেন: Any truth received by the brain must immediately be sent down to the heart.'

কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে মরিয়া হওয়া যায় কেমন ক'রে? সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার পাগলামিকে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার উপায় কি? মনের মধ্যে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা জাগানোর পথ কোথায়? 'কামিনীকাঞ্চনের জন্যে পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তাঁর জন্য একটু পাগল হও।' হায়! ঈশ্বরের জন্যে এই পাগল হ'তে পারাটাই যে সব চেয়ে মুশকিল। আমাদের মূলব্যাধি তো বাতব্যাধি। আমরা spiritually rheumatic. আমাদের জড়তা আত্মার মজ্জায় মজ্জায়। আমরা তীরে তীরেই তরী বাইতে ভালোবাসি; অকূলের ডাকে তুফানের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভরসা পাইনে। এ আড়ষ্টতা, এ আলস্য, এ আরামপ্রিয়তা—এদের জয় করবার উপায় কি? এ প্রশ্নের জবাবে Imitation of Christ এর লেখক বললেন: 'ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরালে সমস্ত জড়তাকে পরিহার ক'রে নব জন্ম লাভ করা যায়। লোহা আগুনে পুড়লে তবে তার মরচে চলে যায়। ঈশ্বরচিন্তার আগুনের মধ্যে মন-লোহাকে ফেলতে হবে। তবে জড়তা যাবে, তবে জীবনে রূপান্তর আস্‌বে।' ঠাকুর বললেন: অভ্যাসযোগ! রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। এক দিনে হয় না। রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।'

ঈশ্বর-লাভের কোন সহজ পথ আমাদিগকে তিনি দেখিয়ে দেন নি। মন্দ বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্যের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন চিত্তশুদ্ধির কথা, তিনি বলেছেন নির্জন বাসের কথা, তিনি বলেছেন কামিনীকাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকবো, নির্জনে তাঁকে ডাকবো না, কর্ম করবো না—এতে কখনো বস্তুলাভ হবে না। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। আর এই ব্যাকুলতার জন্যে প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি। আর মন থেকে বিষয়রস শুকিয়ে ফেলবার উপায় নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা। মহিমাচরণকে ঠাকুর বলেছিলেন: 'ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন! মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো!' এই সাধনের কথাই আধ্যাত্মিকতার চরম কথা। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' শচীশের মুখ দিয়ে বলেছেন: 'আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁহাকে পাই তো আমিই তাঁহাকে পাইবো, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।' মার্কিন কবি হুইটম্যানের কণ্ঠেও একই কথা:

Not I, not any one else can travel
that road for you,
You must travel it for yourself.

শচীশের সেই কথা—'আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না।'

ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার, আর এই অনুভূতি সম্ভব পুরুষকারের রাস্তায়। সাধনকে এড়িয়ে গিয়ে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব। আর এই সাধন বলতে ঠাকুর বারংবার বলেছেন নির্জনতা আর প্রার্থনা। নির্জনতা আর প্রার্থনাকে বাদ দিয়ে আর সব হ'তে পারে কিন্তু ব্যাকুলতা আসবে না, আর ব্যাকুলতা ভিন্ন ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব।

আমরা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করতে বসেছিলাম। ঠাকুর বিশ্বাসকে মূল্য দিলেন। আমরা বলছিলাম গুরুর কৃপা হ'লে ঈশ্বরকে সহজেই পাওয়া যায়। ঠাকুর বললেন, বৈরাগ্যের কঠিন পথেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব; ভোগের রাস্তায় যোগ সম্ভব নয়। যে ঘরে 'আচার তেঁতুল সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে রোগ কোন কালেই সারবে না।' আর একটা কথা ঠাকুর বললেন: 'সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।' তিনি শেখালেন প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে। ভেদ-বুদ্ধিতে দেশের আবহাওয়া ছিল বিষাক্ত। তিনি উচ্চারণ করলেন ঐক্যমন্ত্র। যেখানে ঘৃণা ছিল সেখানে এলো প্রেম; যেখানে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা ছিল সেখানে এলো হৃদয়ের উদারতা। ঐক্যের মতো বৈচিত্র্যও যে পরম সত্য—এ কথা ঠাকুর যেমন ক'রে বোঝালেন এমন ক'রে আর কে বোঝাতে পারতো? জীবন উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্যরূপ ছিলো বলেই এমন ক'রে যুগকে প্রভাবিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মাতৃমন্ত্র

শ্রীমতী আলোরাণী নাগ

শিশু যবে জন্ম লয় ধরাবক্ষতলে
কাঁদে সে মায়েরে খুঁজি
ভীত অশ্রুজলে
জীবনে প্রথম বাণী তার
সেই মাতৃমন্ত্র নাম।
অসহায় শৈশবের একান্ত আশ্রয়
মধুক্ষরা আঁখিযুগ,
স্নেহমাখা করতলদ্বয়।
সন্তানের চিরশান্তি মাতৃ-অঙ্ক-পাশ
কোনো সন্দেহের সেথা নাহি অবকাশ

তুমি চিরশিশু
মায়ে ছাড়িলে না কভু; জীবন ব্যাপিয়া
রহিলে সে স্নেহক্রোড়ে।
মনপ্রাণ দিয়া
মাতারে পূজিলে তুমি সমস্ত
বিশ্বমায়ে মাতা বলি তুলি নিলে মাথে
আপন জননী, জায়া, স্নেহ-পরিজনে
জানিলে একত্রীভূত বিশ্বমাতা সাথে।
বিশ্বাস-উচ্ছ্বাসে
শ্যামারে আনিলে টানি ধরাবক্ষপাশে।
তুমি চিরপূজনীয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব।

পুণ্য গয়াধামে ছাড়ি মৌন শিলাপট
মূর্ত হলে নররূপে, ধন্য করি বঙ্গভূমি তট।
স্নিগ্ধ করি পবিত্র সুন্দর!
পুণ্য তব কল্যাণ সৌরভে
নত নেত্রে এলো তব পাদপীঠ-তলে,
দশদিক হতে জন সবে।
সবাকারে দিলে মহামাতৃমন্ত্র নাম;
হয়ে সিদ্ধকাম
শান্তি পেলো আর্তজন তব পদযুগে
লভিল আশ্রয়।

পশ্চিম পৃথিবী এলো ছুটি।
হানাহানি, মারণাস্ত্র, দ্বন্দ্ব ফেলি উঠি
এলো তব পদতলে।
তব তরে তার আত্মনিবেদন রাজে
'নিবেদিতা' ভগিনীর মাঝে।

আজিও তোমারই দয়া মাতৃসঙ্কীর্তন
আঁকড়িয়া আছে কতজন,
ভরিতেছে বিশ্বলোক
মাতৃমন্ত্রে করিয়া সহায়।

বিশ্ব আজো গায়
তোমার মহিমাগাথা।

অসংখ্য মানবে তুমি তরিলে জীবনে
অগণিত কতজন শান্তি পেল মনে
তব মাতৃ-মন্ত্র নামে।

জগতের গুরু তুমি নব-অবতার
অপরূপ সুমহান কল্যাণ-আধার।

জানাইনু তোমারে প্রণতি
তুমি চিরবন্দনীয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব!

স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এম্-এ

শোপেনহাওয়ার নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers.' স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতির উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন: তোমাদের আদর্শ সীতা। সীতা সহনশীলতার অপূর্ব প্রতিমূর্তি। এই সহনশীলতা সীতার জীবনে যে অসামান্য শক্তি ও মাধুর্য আনিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সীতার জীবন এক বেদনা-বিধুর, শুচি-শুভ্র অপরূপ আলেখ্য। ভারতের সকল শ্রুতি ও স্মৃতি যদি কোন দিন অবলুপ্ত হইয়া যায় তবুও শুধু সীতার পুণ্য জীবন-কাহিনী হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিবার অপরিমেয় ঐশ্বর্য থাকিবে। সীতার জীবনের প্রতিটি কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা সে-প্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়। আসল কথা, সীতা আমাদের নারীজীবনের চরম আদর্শ। তিনি প্রেম ও শুচিতার অখণ্ড মূর্তি; জীবনে অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়াও তিনি কাহারও দুঃখের কারণ হন নাই।

বিদেশে নারীজাতির আচার-ব্যবহার স্বামীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। স্বামীজী মনে করিতেন পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোক আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেখানে নারীর জীবন বহির্মুখী; পুরুষের সঙ্গে তাহাদের প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে অশোভন ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। আফিসে, বাজারে, স্কুলে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিতে গিয়া নারীর জীবনে যে ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই অহিতকর প্রতিযোগিতার ফলে নারী তাহার মাধুর্য হারাইয়াছে, শালীনতা-বোধ ও জীবনের মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়াছে।

পুরুষের তুলনায় নারী বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, কর্ম-শক্তিতে হীন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রতিকূল পরিবেশের ফলেই আমরা এই ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। স্বার্থান্বেষী পুরুষের চক্রান্তের ফলেই স্ত্রীজাতি কোন কোন যুগে অনাদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীজী মালাবার পরিক্রমার

সময় দেখিয়াছেন যে সেখানে স্ত্রীজাতি পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল ; তাহাদের শাস্ত্র-জ্ঞান সুগভীর, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ এবং কর্মশক্তি অতুলনীয়। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিয়া স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অবনতির যুগে ভারতের কুচক্রী পুরোহিতগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বেদাধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত করেন এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদপাঠে অধিকারও অস্বীকার করেন। অথচ আমাদেরই শাস্ত্রে আমরা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গীর উপাখ্যান দেখি যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

স্বামীজীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বা আত্মিক শক্তিকে বিকশিত করা। এই কথা পুরুষের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য নারীর সম্বন্ধেও তেমনি। যিনি পরাবিদ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ নাই। শিক্ষার লক্ষ্য পরাবিদ্যা লাভ করা এবং স্ত্রী-পুরুষে বিভেদ কল্পনা করা এই লক্ষ্যের পরিপন্থী। শক্তিপূজার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য স্বামীজী জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং এই কথাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যিনি ঈশ্বরের সর্বব্যাপী শক্তিকে নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাঁহার শক্তিপূজা সার্থক। ভারতের উন্নতি করিতে হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীজাতির উন্নতি করিতে হইবে। এবিষয়ে স্বামীজীর মত স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" এই শাস্ত্রবাক্য স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে বলিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের জীবনের নানাবিধ সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন ইহাই স্বামীজীর সুচিন্তিত অভিমত। স্বামীজীর প্রসিদ্ধ উক্তি: "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী"—এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সোপান শুচিতা। শুচিতা ভারতীয় নারীর পরিপূর্ণ সত্তার মধ্যে নিহিত, অস্থি-মজ্জার সঙ্গে বিজড়িত। কাজেই শুচিতার উদ্বোধন করিয়া শিক্ষার সূচনা করিতে হইবে। শুচিতা হইতে নারীর জীবনে আসিবে আত্মপ্রত্যয় ; আত্ম-প্রত্যয় হইল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নারীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বামীজীর মতে হইল: ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, চারুশিল্প, বিজ্ঞান ; গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন, সীবন ও স্বাস্থ্য। এই বিষয়গুলির মধ্যে উপন্যাসের স্থান নাই। পূজাপদ্ধতি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় সত্য ; কিন্তু অন্ধভাবে ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপার্বণ অনুসরণ করিলে চলিবে না ; এই সকল ক্রিয়াকর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু মোহমুক্ত মন লইয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মিক স্বাধীনতা ব্যতীত শিক্ষা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না ; কাজেই মানুষের মনে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মনে, এই স্বাধীনতাবোধ জাগাইবার জন্য স্বামীজী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মিক শক্তির মহিমা যাহাতে নারীজাতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে সেইজন্য স্বামীজী শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরাবাঈ প্রভৃতির অমর জীবনকাহিনীকে স্থান দিয়াছেন। অমূর্ত ভাবধারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জীবনকাহিনীর মূল্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশী ; সেইজন্যই এই পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারীকে অসহায় ও দুর্বল করিয়া রাখিবার মত পাপ আর কিছুই নাই। সেইজন্য স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল দৈহিক শক্তিতে নারীজাতিকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। এই কথা মনে রাখিয়া তিনি স্ত্রীজাতির সামনে ঝাঁসির রানী, রানী দুর্গাবতী, অহল্যাবাঈ, রানী রাসমণি, রানী ভবানীর জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন।

স্বামীজী জাতির কাছে চাহিয়াছেন আদর্শ জননী—যাঁহারা হইবেন দৈহিক ও আত্মিক শক্তিতে শক্তিমতী, যাঁহাদের জীবনের ভিত্তি

পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা। এইরূপ জননীর কাছেই আদর্শ সন্তান আশা করা যাইতে পারে।

উনিশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন— যাঁহারা ত্যাগ ও সেবাকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের ধমনীতে থাকিবে শুচিতা ও আত্মিক শক্তির প্রবাহ। তাঁহারা বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রস্থানে শিক্ষিতা হইবেন সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষা তাঁহাদের স্বার্থের জন্য নহে; সে শিক্ষার বীজ ছড়াইয়া দিতে হইবে সমগ্র জাতির মধ্যে। শিক্ষাকে তাঁহারা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

স্বামীজী একথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতেন যে, নারী প্রকৃতই জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান, ভক্তি ও সেবা মানুষের মনে পরাপ্রীতির সন্ধান দিতে পারে, তাহার জীবনে শক্তি ও মাধুর্য আনিতে পারে। সেইজন্য স্বামীজী চাহিয়াছিলেন নারীজাতির জন্য মঠপ্রতিষ্ঠা করিতে; সেই মঠের সংলগ্ন বিদ্যালয়ে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সে বিদ্যালয়ে বেদ, উপনিষদ্‌, সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কিছু ইংরেজী সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। সেই সঙ্গে থাকিবে সীবন, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিশু-লালন প্রভৃতি বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা। জপ, পূজা ও ধ্যান, শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয় ও মঠ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। মঠে পাঁচ ছয় বৎসর শিক্ষান্তে বালিকার ভার তাহার অভিভাবক গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাকে বিবাহ দিতে পারেন। যদি কোন বালিকা আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তাহাকে ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ত্যাগ, সেবা ও সংযম হইবে এই মঠের মূলমন্ত্র।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও জন ডিউই উভয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। শিক্ষার্থীর মর্যাদা-সম্বন্ধে উভয়েই সচেতন। স্বামীজী বহু বৎসর পূর্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি একটি ভাব (idea)কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে; কাজে কাজেই সকল শিক্ষার্থীকে এক ছাঁচে ঢালাই করা চলে না। স্বামীজীর মতে একটি জাতিকে যদি সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি বিশেষ সুরের সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। স্বামীজীর আদর্শ সেইজন্য বহুর মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা; বহুর বহুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়।

রাসেল ও ডিউই উভয়েই শিক্ষার্থীর মন হইতে ভয় দূর করিবার কথা বলিয়াছেন। রাসেলের মতে ধর্মের মূলে ভয়; স্বামীজীর মতে ধর্মের মন্ত্রই অভয়। রাসেল কুসংস্কারগুলিকেই ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন; স্বামীজী কুসংস্কারকে দূর করিয়া ধর্মের আসল রূপটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মিক সত্যে উদ্বুদ্ধ হইলে সকল ভয় বিদূরিত হইবে

পাশ্চাত্য দেশ জড়বাদের উপর যতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন তাহার কল্যাণ নাই—স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের ধ্বংসের শক্তি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া পাঠ্যতালিকা হইতে বিজ্ঞানকে বাদ দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন বিজ্ঞানকে উপায়রূপেই দেখিতে হইবে, উদ্দেশ্যরূপে নয়। বিজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয়হীন বীক্ষণাগারে নির্বাসন দেওয়ার ফল শুভ হইবে না; উপায়কে উদ্দেশ্যের স্থানে বসাইলে আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ স্বামীজী আমাদের সামনে তুলিয়াছেন তাহার মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা রহিয়াছে। এক তার্কিকের প্রতি ঠাকুরের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্তব্য: "যদি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার কাছে এস, আর খুব তর্কযুক্তি করে যদি বুঝতে চাও, ত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যাও।" এই "এক কথা"কে যদি আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি তাহা হইলে বলা যায় যে এই কথাটি "মা"। শ্রীরামকৃষ্ণ এই একাক্ষর মন্ত্রের সাহায্যে অপূর্ব দিব্য জীবনের সন্ধান দেখাইলেন। স্বামীজী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী-জীবনের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ। নারীর মর্যাদা, নারীর শিক্ষা ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য স্বামীজী যে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মূল্য আজিকার যুগসংক্রান্তির ক্ষণে অপরিসীম। স্বামীজির এই উক্তি অবিস্মরণীয়: "সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

কবীরবাণী

"কবীর কব. সে ভয়ে বৈরাগী"—বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

প্রশ্ন

আজিকে তোমারে শুধাই কবীর
কবে হতে তুমি হ'লে বৈরাগী,
তোমার যে প্রেম বল মোরে বল
ছড়াল কোথায় কাহার লাগি ?

উত্তর

বিশ্ব প্রকাশ ছিল না যখন
যখন ছিল না গুরু ও চেলা,
কিছুই তখন লভেনি প্রসার
পুরুষ একাকী করিত খেলা—
সেই কাল হতে সন্ন্যাসী আমি
শুন ওহে সাধু গোরখনাথ,
আমার সে প্রেম হয়েছে ধন্য
পরশি ব্রহ্মে দিবস রাত !
ব্রহ্মা যখন পরেনি কিরীট
অথবা বিষ্ণু তিলক ভালে,
শিব ও শকতি লভেনি জনম
শিখিনু যোগ সে অতীত কালে
প্রকট আমি তো হলেম কাশীতে
চেতনা দিলেন শ্রীরামানন্দ—
অসীমের তৃষা অন্তরে ধরি
বহিয়া এনেছি মিলনানন্দ !
সহজে সহজে হইবে মিলন
উছল ভকতি জাগিবে প্রাণে,
শুন হে গোরখ—চলো আগাইয়া
অসীমের সেই চির আহ্বানে।

বেদ ও বর্তমান জীবন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ, বি-এল্, পিএইচ্-ডি

দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাম্।
দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্!
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ম্
দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে॥

দেবতাদের শুভ কল্যাণবুদ্ধি, ভদ্র সুমতি ঋজু ও সরল হয়ে প্রবাহিত হোক; দেবতাদের আশীর্বাদ ও প্রীতি আমাদিগের পরিবেশ পরিপুষ্ট করুক। আমরা যেন দেবগণের সখ্য যাজ্ঞা করি—দেবতারা আমাদের আয়ু অভিবর্ধন করুন, আমরা যেন বাঁচবার মতন বাঁচি।

অনেকে হয়ত অবাক্ হবেন, ভাববেন যে প্রাচীন গত হয়ে গেছে তার এই উজ্জীবনের বৃথা প্রয়াস কেন? বেদকে যতই সম্মান আমাদের পিতৃপুরুষেরা দিন না কেন, তার কাছে পুরাতাত্ত্বিক কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছু আশা করা বিফল।

আমি বলব— জলদগম্ভীরস্বরে বলব— তা নয়। বর্তমান জীবনের কলকোলাহল ও সংঘর্ষের মাঝেও বেদ আমাদের দেবে চলবার পথের পাথেয়—দেবে প্রেরণা—দেবে উৎসাহ—দেবে বিশ্বাস—দেবে অতন্দ্র কর্মের বাণী—অমৃতের আশ্বাস—দিব্যজীবনের ছন্দ ও দেবজীবনের সৌরভ। সুলেখক লেভি তাঁর 'আধুনিক মানুষের দর্শন' পুস্তকে বেশ সুন্দর কথা লিখেছেন—

"If philosophy does not illuminate the practice of ordinary life, we maintion it fails in is function. It must be something drawn from the world of human affairs and guiding it. To lead a philosophy in this way from the barren wilderness of speculation into the rough and tumble of action is more than to violate the traditional meaning of philosophy. To suggest that its truth be consciously and deliberately tested by human beings in the fire of practice is to demand that, like science, it stand or fall by its active meaning for man."

আমিও সেই কথা বলব—বেদ যদি শুধু রহস্য-ভাণ্ডার হ'ত—যদি তাহা সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রয়োজনে না লাগত—তাহলে আমরা তার অলোচনা করতাম না।

তাই সর্বপ্রথম বলছি—বেদের বলিষ্ঠ জীবনবাদই তার মহিমময় বিশেষত্ব। আমাদের দেশে অনেক সময় নৈষ্কর্ম্যকে ধর্মের স্বরূপ মনে করি। ভাবি মায়াময় এই সংসারকে পরিত্যাগ করে হৃদয়কে আমরা যতই পরলোকপ্রবণ করব ততই আমরা অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভ করব।

আমাদের বৈদিক পিতামহেরা এই ধরনের 'পলায়নবাদ'কে আমল দেননি—তাঁরা এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠ হয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। সেই সঞ্জীবন প্রাণবত্তার জয়গান আজ দেশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠুক নূতন দিনের সুরে—নূতন যুগের ভাষায়।

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাম্
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥

পরমাত্মা দিন আমাদের পরম ধন। দিন আমাদের চিত্তের দক্ষতা, দিন আমাদের সৌভাগ্য। দিন আমাদের পরিপূর্ণ পুষ্টি—তাঁর আশীর্বাদে আমাদের তনু হোক নিরাময়—আমাদের বাক্ হোক স্বাদু

মধুময়—আমাদের প্রাত্যহিক দিনগুলি হোক উজ্জ্বল, সুখময় ও সুন্দর।

দিনগত পাপক্ষয় করে বৈতরণী পার হওয়ার আশা এ নয়। এ শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নয়। এ হল আশাতুর সুখাতুর কর্মচঞ্চল উৎসাহদীপ্ত আনন্দময় দিবসযাপনের আকাঙ্ক্ষা।

এই কর্মসুন্দর দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা তিনবেদেই আছে। ঋগ্বেদ শুধু শত শরৎ বাঁচবার প্রার্থনা করেছেন—যজুর্বেদে সেই প্রার্থনা নবতর ও মধুরতর হয়েছে—একশত শরৎ যে বাঁচব সেই একশত বৎসর চোখ দিয়ে ভাল করে দেখব—নূতন নূতন বাণী শুনব—নূতন নূতন কথা বলব—অদীন হয়ে মাথা উঁচু করে বীরের জীবনযাপন করব। অথর্ববেদ বলছেন:—

পশ্যেম শরদঃ শতম্॥
জীবেম শরদঃ শতম্॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম্॥
রোহেম শরদঃ শতম্॥
পূষেম শরদঃ শতম্॥
ভবেম শরদঃ শতম্॥
ভূয়েম শরদঃ শতম্॥
ভূয়সী শরদঃ শতাৎ॥

শতোত্তর জীবন হোক আমাদের—সেই একশতের অধিক বৎসর আমরা যেন জীবন্মৃত হয়ে শরীরের ভার বয়ে না বেড়াই—আমাদের চাক্ষুষ ও মানস দৃষ্টিশক্তি যেন অভিবর্ধিত হয় দিনে দিনে—আমরা যেন প্রাচুর্য ও মাধুর্যে বেড়ে চলি। যদি বসে থাকি তবে আর বাঁচা কিসের—রোজ রোজ নূতন কিছু জানব ও নূতন কিছু শিখব। দিনে দিনে ঊর্ধ্বাভিসারের পথে হোক আমার আরোহণ—প্রত্যহই হোক আমার পরম পুষ্টি—যে পুষ্টি নবতর সম্পদে দিনে দিনে সমৃদ্ধ ও দীপ্ত হয়ে উঠছে। আমার এই দীর্ঘজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকব ও শুধুই বেড়ে চলব—অগ্রগতির পথে হবে প্রাত্যহিক অভিযান।

অনুভূতির পথে অনন্ত অভ্যুদয়—এই ছিল তাঁহাদের কামনা, তাই আমাদের পিতামহেরা এমন এক চমৎকার কবিতা লিখেছেন যাহা ভাবের গভীরতায়, অভিব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ।
সংবেদং বিচ পশ্যেম॥

হে জ্যোতির্ময় দেবতা, হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের দুটি চোখে দাও দৃষ্টিশক্তি—তোমার এই বিপুল বিশ্বের অতি বিপুল মহিমা আনন্দ ও উল্লাসে দেখব। কিন্তু শুধু দুটি চোখ ত তোমার বিশ্বজোড়া মাধুরী দেখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়—তাই দাও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিশক্তি—আমি দেখব, সমগ্রতার সম্যগ্দর্শনও চাই, আবার বিশ্লেষণ চাই—যা কিছু দেখা তাকে তাই সমন্বয় ও বিশ্লেষণের মাঝে পরিপূর্ণ করে যেন দেখি।

বৈদিক জীবনবাদ কিন্তু শুধু বাঁচবার জন্য নয়, পৌরুষের আহ্বানেও ঝঙ্কৃত। তাঁহারা বলদাতা ইন্দ্রের নিকট বল প্রার্থনা করতেন, বীর্যবান ও বলবান হয়ে লোকোত্তর জীবনযাপন করতে চাইতেন।

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।

আমি এই পৃথিবীতে সকলের শ্রেষ্ঠ হব—মর্যাদায় আমি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকব। অকাল মৃত্যুকে তাঁরা ঘৃণা করতেন—শত শরৎ সবল ও আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু তাঁহাদের ঈপ্সিত ছিল। অজর হয়ে অতন্দ্র কর্ম করে মনুষ্যত্বকে ফোটাবার জন্যই ছিল তাঁহাদের সাধনা।

ভারতবর্ষ সব চেয়ে দরিদ্র দেশ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। এই অভাবের মাঝে প্রাচুর্য আনতে পারে একমাত্র অদম্য অধ্যবসায়, শ্রান্তিবিহীন কর্ম। কিন্তু বৃটিশের হাতে গড়া অদ্ভুত আমলাতন্ত্র সাতবৎসরেই ধ্বংস হয়ে

গেছে বলা চলে। সর্বত্রই সরকারী ঔদাসীন্য ও অকর্মণ্যতার পরিচয়।

আমাদের জনপ্রিয় নেতৃগণের উচিত ছিল—সবাইকে আহ্বান করে মহাভারত গড়বার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে—আট ঘণ্টার স্থানে ১৬ ঘণ্টা খাটতে; কিন্তু তা হয়নি। দেশের সমূহ ক্ষতি করে ডাকঘরের কাজ একদিন বন্ধ করা হয়েছে—ফলে জাতীয় জীবনে বহুকোটী টাকার লোকসান ঘটছে। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে এই ভরসার স্থলে দেখছি একজনের স্থলে তিনজন লোক এসেছে—কিন্তু কাজ আদৌ হচ্ছে না। সর্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। তাসের প্রাসাদের মত আমাদের স্বাধীনতা যাতে ধূলিসাৎ না হয়, তার জন্য অনবসর কর্মের প্রয়োজন। বেদ তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করেছেন:

ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ
সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥

প্রগাথ কাণ্ব বলছেন :—হে পরিত্রাণকারী দেবগণ, তোমাদের গভীর আশীর্বাদে আমাদের ধন্য কর, আমরা যেন নিদ্রা ও গালগল্পে সময় না অপব্যয় করি। আমরা যেন সোমদেবতার প্রিয় হয়ে, সুবীর হয়ে সভাতে সুকর্ম আলোচনা করি, সুব্রতের পরিকল্পনা করি।

দেবতারা অলসকে ক্ষমা করেন না।

ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তম্
ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ ॥

দেবতারা যাজ্ঞিককে প্রীতি করেন—যাহার কর্ম লোকসেবায় ও জগৎসেবায় নিয়োজিত তাহাকেই তাঁহারা ইচ্ছা করেন, স্বপ্নালু ও তন্দ্রালুকে তাঁহারা ভালবাসেন না। দেবতারা অতন্দ্র, তাই যাহারা প্রমাদকারী তাহাদিগকে তাঁহারা শাসন করেন। গীতাতেও সর্বোত্তম বেদব্যাখ্যাতা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা মানুষের মৃত্যুর কারণ।

বেদ মানুষকে ভ্রান্তি হতে জাগতে বলছেন। অনবধান হয়ে বিমূঢ় হয়ে থাকলে ধর্মলাভ হয় না—বলা যেতে পারে কিছুই লাভ হতে পারে না। শ্রান্তিহীন কর্ম, বিরামবিহীন উদ্যোগে ভারতবর্ষ আবার বেদধর্মে উদ্বুদ্ধ হোক, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ!

ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ—দেবতারা পথিকেরই বন্ধু, যাত্রীরই নির্ভরস্থল—কর্মে যে শ্রান্ত নয়, ঘর্মজলে যার দেহ সিক্ত নয়, সে দেবতাদের সখ্য আশা করতে পারে না।

তাই আজ তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আহ্বান করি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।—ওঠো, জাগো—তোমাদের পাওনা যে ঐশ্বর্য সেই মহান সম্পদে ধনী হয়ে ওঠো। অশ্রান্ত কর্ম ভগবান নিজেই করছেন—

পশ্য সূর্যস্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ চরৈবেতি। চলার মন্ত্রে আজ দেশ সবল হোক। আকাশে সূর্যের গতি লক্ষ্য কর। সূর্যদেব কখনও ঘুমান না—সব সময়ই তিনি শ্রম করে চলেছেন—তাঁরই মত অতন্দ্র কর্ম কর—আর চল অগ্রসর হয়ে চল।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তিনি নিজেও অতন্দ্রিত হয়ে কাজ করে চলেছেন, কারণ লোকসংগ্রহ তাঁহার কাম্য। তাই আমরা যারা আমাদের সাধের ভারতকে জগৎ-লোকসভায় বরণীয় ও মহনীয় আসনে বসাতে চাই, তারা যেন আলস্যহীন হয়ে অতন্দ্র কর্মের বন্যায় দেশকে পরিপ্লাবিত করি।

কিন্তু এই কর্ম যাতনার নিগড় নয়—ইহা আনন্দে ছন্দিত, উল্লাসে রঙীন, মধুরতায় মধুর,

অমৃতের স্পর্শে স্বাদুতম। স্বস্তিপন্থা যারা অনুসরণ করে, তারা ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা করে—

পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্বা
মা সুচরিতে ভজ।
উদ আয়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
অমৃতাঁ অনু॥

হে ভগবন্, দুশ্চরিত পাপ হতে আমায় প্রতিনিবৃত্ত কর, সদাচার ও পুণ্যে আমায় নিয়োজিত কর। আমি উঠব অমৃতলোকে—এই জীবনের সাথে সাথে শোভন কর্মে, শোভন চিন্তায় শুভ যে আয়ু সেই আয়ু যাপন করে—অমৃতময় দেবজীবনের পথে আমি পরমানন্দ লাভ করব।

মানুষের আনন্দে জন্ম, আনন্দেই জীবন এবং আনন্দেই তিরোধান, তাই কর্মসুন্দর বলিষ্ঠ জীবন তার চলার সুরে সুরে মানুষকে অনন্দলোকে জাগরিত করবেই করবে। আমিত্বের প্রসারে মানুষের দৃষ্টি যখন প্রসারিত তখন সকলই মধুময় হয়ে যায়। দ্যুলোক ও ভূলোক, বনস্পতি ও ওষধি, রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, সকলই মধুরতায় মধুর হয়ে ওঠে। মধুশ্রীতে রমণীয় সাধক অনুভব করেন—পায়ের তলাকার ধূলিও সুধায় সুধাময়, দিকসকল আনন্দোৎসবে কোলাহলমুখর—সকলই অমৃতের প্রস্রবণে রসায়িত।

মানুষের বর্তমান জীবনে তাই বেদের একান্ত প্রয়োজন আছে। আণবিক অস্ত্রের ঝঞ্ঝনমুখর তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে দেখছি শুধু অশান্তি, কানে শুনছি অশ্রান্ত হাহাকার, দুঃখদুর্বহ এই জীবনে বেদ এনে দেবে পরম নির্ভয় আশ্রয়।

নিবেদিত জীবন যাপন করে আমরা কানে শুনব ভদ্র ও শোভন কথা, চোখে দেখব যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গকে করব দৃঢ় ও স্থির, তার পর জগৎহিতে উৎসর্গীকৃত ভাগবত জীবন যাপন করব।

অখিল ধর্মমূল বেদের এই শাশ্বত বাণীর আজিও একান্ত প্রয়োজন আছে—এই জীবনপন্থা যদি অনুসরণ করতে পারি, তবেই বিদ্বেষ ও হিংসার শেষ হবে, মৈত্রী ও করুণার উদ্ভব হবে।

তখনই আমরা প্রার্থনা করতে পারব—শান্তির ও সমৃদ্ধির।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ।
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি।

ভাগবত ও দিব্যজীবনের পথযাত্রী সাধকদের সাধনায় বিশ্বে আনবে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব—তখন প্রতি মানুষ সকল প্রাণীকে মৈত্রীর চোখে দেখবে—সকল প্রাণী মানুষকে মৈত্রী দান করবে—এই মৈত্রীভাবনা-তৎপর মানুষ দেখবে দ্যুলোক শান্তিতে প্রফুল্ল, অন্তরিক্ষলোক শান্তির হিল্লোলে হিল্লোলিত। পৃথিবী শান্তির বাতাসে আবৃত হোক, জলধারা শান্তির ছন্দগান করুক; ওষধি ও বনস্পতি নিরুদ্বেগ স্বস্তিতে পূর্ণ হোক, সমস্ত দেবলোক শান্তির সৌরভে সুরভিত হোক, ব্রহ্ম তাঁর পরম উপশম দিয়ে জগৎ পরিতৃপ্ত করুন। সকলই বিঘ্নহীন হোক—শান্তিজলে সবাই পূত ও পবিত্র হোক। সেই পরমা শান্তি—সেই উদ্বেগহীন একান্তনির্ভর উপশম আমাতে আসুক।

বেদবাণী তাই বর্তমানে দেবে অমৃতের বার্তা, অভয়ের শিক্ষা, সংযম ও পবিত্রতার দীক্ষা। আসুন আমরা বিনম্র শরণাগতিতে সেই অমৃতবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নারীভক্তদের সম্মেলন

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতি)

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেবী শ্রীসারদামণিদেবীর শুভ আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিগত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারাদমণিদেবীর নারীভক্তদের একটি অপূর্বসুন্দর, সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লী, পাটনা, শিলং, নাগপুর, মাদ্রাজ, কুর্গ, অন্ধ্র, ত্রিচুর, গৌহাটী, কলিকাতা, রেঙ্গুন প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং বাহির থেকেও পঞ্চাশ জন প্রাতনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নারী-ভক্তসমবায়ে এবং বর্তমান লেখিকার সভানেত্রীত্বে ও শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাক্‌সারের সম্পাদনায় একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিনে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎস্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি সভার শেষ পর্যন্ত থাকতে না পারায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী মাধবানন্দ অবশিষ্ট সময় সভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেন। সেইদিন সুবৃহৎ অনুষ্ঠানগৃহটি ভক্তিব্যাকুল নরনারী-গণে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবং সভায় তিল-ধারণেরও স্থান ছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘ তিনঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই বিশাল জনতা মুহূর্তের জন্যও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে সভার সেই অনুপম



সজ্জিত মঞ্চের দৃশ্য

ভক্তিনম্র পরিবেশ নষ্ট করেননি। অপূর্ব ফুলসাজে সজ্জিত মঞ্চের উপরিস্থ বিশ্ববন্দ্য এই দিব্য দম্পতির যুগ্ম প্রতিকৃতির পরম স্নেহ ও করুণাবর্ষী দৃষ্টি সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে এক সুমধুর ভাবাবেশের সৃষ্টি করে। সেই রসমধুর, আনন্দঘন, শ্রদ্ধাপ্লুত, শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁর চিত্তোন্মাদনকারী ভাষণে "পরমা জননীর কন্যাদের" তাঁরই পরমশুভ জীবনব্রত গ্রহণে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান, এবং সেই মহাব্রত-উদ্‌যাপনের পন্থাও নির্দেশ করেন—প্রথমতঃ ও মুখ্যতঃ তাঁরই মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপে নিজেদের বিকশিত করা এবং দ্বিতীয়তঃ ও গৌণতঃ স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন সেই নূতন যুগের প্রবর্তক নূতন মানুষদের সৃষ্টি করা। তাঁর ভাষণের সমাপ্তিকালে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় পুনরায় অতি সুন্দরভাবে বলেন—"যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনব্রত হওয়া উচিত শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে নিজেদের গঠিত করা এবং অন্যদেরও তাই করতে উদ্‌বুদ্ধ করা।" শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় সভাগৃহ ত্যাগ করে যাবার বহুক্ষণ পরেও তাঁর শেষ আশীর্বাণী যেন সমগ্র কক্ষে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, এবং উপস্থিত সকলকেই এক আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে: "তোমরা এই সম্মেলন থেকে যে শিক্ষালাভ করবে, তা প্রত্যেকে নিজেদের প্রদেশে বহন করে নিয়ে যাও, এবং অনুরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে তা সকলের মধ্যে প্রকাশ কর। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী তোমাদের সকলের জীবন মধুময় করুন; এবং তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তোমাদের সকলকে শক্তি ও সাহস দিন।"

পরের চারদিন মহাবোধি সোসাইটী হলে "শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী"-সম্বন্ধে দু'টি এবং "সমাজসেবায় ভারতীয় নারী" ও "নারীশিক্ষা"-সম্বন্ধে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য আরো দুটি আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব সভায় সভানেত্রীত্ব করেন যথাক্রমে মাদ্রাজের স্বনামখ্যাতা সমাজসেবিকা ভগিনী শুভলক্ষ্মী, কলিকাতা শ্রীসারদা আশ্রমের মায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীযুক্তা বাণীদেবী, কলিকাতা আনন্দাশ্রমের সুপ্রসিদ্ধা নারীশিক্ষাব্রতী ভগিনী চারুশীলা ও বিশিষ্টা শিশুশিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায়। প্রত্যেকদিনই বিভিন্ন প্রদেশের বহু প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশে নবশিক্ষাপ্রণালী-প্রবর্তনের জন্য নানারূপ সুচিন্তা-প্রসূত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সহধর্মিণী, সঙ্ঘনেত্রী, বিশ্বজননীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের যে সব অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও অতি প্রাণস্পর্শী আলোচনা হয়। করুণাবতার ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মূর্তির উভয়পার্শ্বে স্থাপিত এই দুই যুগাবতারের পুণ্য প্রতিকৃতির পাদদেশে উপবিষ্ট মহিলাগণ শ্রদ্ধানম্রচিত্তে পুনরায় স্মরণ করেন পুণ্যভূমি ভারতের পরম দেবতাকে, যিনি জগদুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশিত করেন জ্ঞান, প্রেম ও সেবার মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপে।

এই সকল সাধারণ সভা ব্যতীত প্রত্যেকদিন সকালে প্রতিনিধি-শিবিরে কেবলমাত্র প্রতিনিধিদের জন্য ঘরোয়া বৈঠক বসত। এই ক্ষুদ্র বৈঠকগুলিই হয়েছিল সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী ও শুভপ্রসূ। ধর্মশালার নিভৃত কক্ষে এই দিব্য দম্পতির পরমশিব ও পরমাশক্তির পুষ্পশোভিত, ধূপবাসিত প্রতিকৃতি-দ্বয়ের সম্মুখে ভক্তিনম্রচিত্তে উপবিষ্ট বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাঁরা নিজেদের প্রদেশে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য আদর্শ কিরূপে জনশিক্ষায় ও মানবসেবায় সার্থক করে তুলতে প্রচেষ্টা করছেন—তারই বিবরণী প্রদান করেন। তাঁরা পূর্বে একে অপরের সম্পূর্ণ অপরিচিতা হলেও তাঁরা সকলেই যে একই পরমা জননীর কন্যা এই অপূর্ব বোধ তাঁদের সকলের মধ্যেই এক মধুর ভগিনী-সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং এই সব ঘরোয়া বৈঠকে নিকটতম প্রাণের আদানপ্রদানের

মাধ্যমে সেই সম্বন্ধ আরো দৃঢ় হয়। নীরবে, নিভৃতে, অনাড়ম্বরে, বিনাপ্রচার-বিজ্ঞাপনে ভারতের সাধারণ নারীরাও যে কি ভাবে অধ্যাত্ম-সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেইজন্যও সিদ্ধিকে নিষ্কাম কর্মে ও পরহিতৈষণায় পুষ্পিত করে তুলেছেন—তারই সুন্দর প্রমাণ আমরা পেয়েছি এই প্রাতঃকালীন ঘরোয়া আলোচনাদির মাধ্যমে।

প্রতিনিধিরা বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোত্থান, উদ্বোধন কার্যালয় ও মায়ের বাড়ী, কাশীপুর মঠ প্রভৃতি পুণ্য পীঠস্থান দর্শন ক'রে ধন্য হন। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানীয় গায়িকাদের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর ভাবগম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা লীলা-কীর্তন, নামগান, ভজন প্রভৃতিতে সমগ্র ধর্মশালাটি ধ্বনিত হয়ে উঠত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীর নারীভক্তদের এরূপ সম্মেলন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি, এবং সর্বদিক থেকেই এই সুন্দর সম্মেলনটি অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এর প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সকলকেই মুগ্ধ করেছিল তা হল এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চাবচ সকলেরই সুগভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। সাধারণ ভৃত্য থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই যেন মায়ের পূজার অঞ্জলি প্রদান করছিলেন এই ভাবটিই ফুটে উঠেছিল সকলের মধ্যে। মায়ের আশীর্বাদে সমগ্র সম্মেলনটি এক অনির্বচনীয় মাধুর্য ও শান্তি-বিমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী তাঁর উদ্বোধন-ভাষণে এই সম্মেলনের যে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য বিবৃত করেন সে দুটিও সার্থকতম হয়েছিল। এরূপে দ্বিতীয়তঃ, এই সম্মেলন সত্যই হয়েছিল সকলের আত্মপরীক্ষার স্থল; সকলে কতদূর শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে জীবন গঠন করতে সমর্থা হয়েছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনার সুযোগ ছিল প্রচুর। তৃতীয়তঃ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানের অপরিচিতা নারী-ভক্তদের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল এই মহাসম্মেলন। এই উপলক্ষ্যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিগূঢ় প্রীতির, মধুর প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা কোনদিনই ছিন্ন হবার নয়। চতুর্থতঃ, এই ভক্তসম্মেলন সকলের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ-দীপ প্রজ্বলিত করেছিল, সকলকে এক অভূতপূর্ব শান্তি ও অনন্দের সন্ধান দিয়েছিল।

মাত্র পাঁচটি দিন! কিন্তু নিরবধি কালের মধ্যেও এই স্বল্প পাঁচটি দিনের স্মৃতি পঞ্চপ্রদীপের মতই আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন অম্লান দীপ্তি বিকিরণ করবে। স্বপ্নের মতই কেটে গেল সেই পাঁচটি দিন যখন আমরা যেন এক পরমানন্দময় অমৃতলোকেই বিচরণ করছিলাম। এই পরম অমৃত ও রসের আস্বাদ সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন তাপ ও গ্লানির মধ্যেও আমাদের চিরদিন শান্তি ও তৃপ্তির পথ দেখাবে, নিঃসন্দেহ।

নারীভক্তদের এই মহাসম্মেলন এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠান একটি কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করেছে। সেটি হল এই যে, সভ্যতা-মদগর্বিত আধুনিক জগৎ তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও যান্ত্রিক শক্তি নিয়েও প্রকৃত আনন্দ ও সার্থকতার পথ অনুসন্ধানে হয়েছে শোচনীয়তম ভাবে ব্যর্থ। সেজন্য আসন্ন-যুদ্ধভীত নৈরাশ্যক্লিষ্ট, মোহগ্রস্ত মানবসমাজ কেবলমাত্র জাগতিক সুখসমৃদ্ধির লক্ষ্য ত্যাগ করে আজ সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করছে আধ্যাত্মিক সাধনায়। সেজন্যই শ্রীশ্রীমায়ের শুভজন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান-সমূহে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরূপ সহস্র সহস্র মুমুক্ষু নরনারীর সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, যাঁরা তাঁর পুণ্য জীবনগাথা থেকে নূতন আশার, নূতন পথের, নূতন জীবনের আভাস পাচ্ছেন, জ্বালিয়ে নিচ্ছেন এই পরমা জ্যোতির্ময়ীর চির অম্লান জীবনপ্রদীপ থেকে নিজেদের মনেরও ক্ষুদ্র দীপটি।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের প্রকৃত সার্থকতা

এইখানেই, এবং এইখানেই আমাদের নারীভক্তদের সম্মেলনের একমাত্র সিদ্ধি ও ঋদ্ধি।

যিনি এই মরজগৎকে অমৃতলোকের সন্ধান দিয়েছেন, আপাতদৃষ্ট শোকদুঃখপূর্ণ সংসারের অন্তঃস্থলেও যে পরম সত্য, পরম শিব ও পরমসুন্দরের উৎসধারা নিরন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে তাকে যিনি নিজের জীবনে পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত করে অন্যদের জীবনেও করেছেন অকাতরে দান, সেই পরমানন্দময়ী, পরমমঙ্গলময়ী, পরমকরুণাময়ী মা আজ আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নয়াদিল্লী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—এই কেন্দ্রের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত: (১) ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার (২) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তার (৩) রোগীর সেবা ও চিকিৎসা (৪) প্রয়োজন সময়ে রিলিফ-কার্য। নিয়মিত বক্তৃতা, শাস্ত্রালোচনা, ধর্মসভা প্রভৃতির দ্বারা সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। রবিবারের ধর্মসভা শহরের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। উহাতে সহস্রাধিক জনসমাগম হয়। শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্। ছাত্রসমাজের মধ্যেও আশ্রমের ভাবধারা গ্রহণে আগ্রহ লক্ষিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কি?' এবং 'কেন আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা গ্রহণ করিব?'—এই দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল কলেজের ১০৫৬ প্রতিযোগীর মধ্যে ১৩৬ জন পুরস্কার পাইয়াছে। মিশনের গ্রন্থাগারে আলোচ্যবর্ষে ৬৩৫৩ খানি পুস্তক ছিল এবং ৬০৯৩ খানি পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছে; গ্রন্থাগার-সংলগ্ন পাঠাগারে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ জন পাঠক আগমন করেন। গ্রন্থাগারটির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গভর্নমেণ্ট ইহার উন্নতির জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৪৪,১৪১ (নূতন ৯,৯২৭) জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ক্যারলবাগ আর্যসমাজ রোডের উপর অবস্থিত যক্ষ্মা-চিকিৎসা-কেন্দ্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ৬০,৬৬৪ জন (নূতন ১৪২০) যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন; ইহার অন্তর্বিভাগে ৩২৭ জন রোগীকে বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু কিছুকাল রাখা হইয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, খ্রীষ্টজন্মোৎসব বুদ্ধজয়ন্তী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ও উৎসবাদি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে উৎসাহী শিক্ষার্থিগণের জন্য একটি সংস্কৃতি শিক্ষার ক্লাস করা হয়।

সমাজ সেবা—পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (ছাত্রাবাস) পরিচালিত বিবেকানন্দ সমাজ-সেবাকেন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, শ্রীশ্রীমার শতবর্ষ-জয়ন্তী ও বিবেকানন্দ জয়ন্তী-উৎসব গত ১৭ই বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন উদ্বোধনী সভার পরিচালনা করেন শিক্ষাবিভাগের কর্মসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। বক্তৃতা দেন শ্রীঅমর নন্দী ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। ১৮ই

বৈশাখ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের লীলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ এবং বক্তৃতা করেন শ্রীতামস রঞ্জন রায়। অপরাহ্ণে কুটীরশিল্প-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা বস্তীর বয়স্ক ও শিশু শিল্পীদের একটি শিল্প ও চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জনসভায় বস্তী-জীবন ও কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় সরকারী সাহায্যের আশ্বাস দেন। ১৯শে বৈশাখ পুরস্কার-বিতরণী সভায় নেতৃত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার পুরস্কার বিতরণ করেন। চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে উপজাতি-কল্যাণ-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়ের সভাপতিত্বে বস্তীর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন পৌরপ্রতিষ্ঠানের কমিশনার শ্রীবি, কে, সেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল এবং সমাজশিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়। সভান্তে বালকবিভাগের ছাত্রেরা 'গুরু-দক্ষিণা' অভিনয় করে। ২১শে বৈশাখ সকালে দুইশতাধিক বস্তীবাসী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা করিয়া সিমলা পল্লীতে স্বামিজীর পুণ্য জন্মস্থান প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্ণে স্বামী পুণ্যানন্দের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ শ্রীসত্যচরণ পাল, অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ স্বামিজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভাশেষে বস্তীর কারিগরদের তৈরী বাজি পোড়ান সকলকে বিপুল আনন্দ দান করে। রাত্রি ৯টায় আশ্রম বাসী ছাত্রদের অভিনীত 'মুকুট' বস্তীবাসীর মনোরঞ্জন করে। শেষদিন নরনারায়ণ সেবা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এগার শতাধিক নরনারীকে পরিতোষ পূর্বক খাওয়ানো হয়। পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রগণ উক্ত রামবাগান বস্তীতে গত দুই বৎসর যাবৎ নৈশ বিদ্যালয় দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্র, পাঠাগার, কুটীরশিল্প-উন্নয়ন ও বস্তীর স্বাস্থ্যসমস্যাসমাধান প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী—আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের প্রভিডেন্স বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৪ একটি সভার অনুষ্ঠানে স্বামী অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করিয়া ভারতে ও জগতে শ্রীমায়ের অবদানসম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ১০ই মে যে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়, উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রখ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ, ধর্মযাজক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ্‌, বিদ্যার্থী এবং ভক্ত নরনারী সমবেত হন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রাউন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, মিসেস্‌ রাইস্‌টন্‌ এবং রোড্‌ দ্বীপের গীর্জাসংঘের পরিচালকবৃন্দ অন্যতম। স্বামী অখিলানন্দজী এবং আমেরিকাস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেহ্‌তা বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত মেহ্‌তা শ্রীশ্রীমায়ের সার্বভৌম ভাবটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্বজ্জনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে।

বোষ্টন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি দিবসে পূজানুষ্ঠানের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৪ বহু ভক্তের সম্মিলিত এক সভায় স্বামী অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ৭ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় বোষ্টনের ইউনিভার্সিটি হলে সাধারণ সভার অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক,

ধর্মবিদ্ এবং রাষ্ট্র-সচিবগণের উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর কেসি, নিউটন্ এ্যান্ডোভার থিয়োলজিক্যাল সেমিনারির অধ্যক্ষ ডক্টর হেরিক্, ডক্টর খ্যাপ্‌লি, ডক্টর অল্‌পোর্ট, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মিনার্ এবং ইনষ্টিটিউট্ অফ্ টেক্‌নোলজির ডক্টর পেন্‌সন্। বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা দেন। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নিউ্ইয়র্ক রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী, আমেরিকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেহ্‌তা ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা মেহ্‌তা। প্রার্থনা ও স্বামী অখিলানন্দজীর আশীর্বাণীর পর সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

বিগত ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার হইতে ২৩ ফাল্গুন রবিবার পর্যন্ত দশ দিন ব্যাপী কাটিহার (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, বিশেষ-পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তনভজনাদি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ১৪ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। কলেজের সহাধ্যক্ষ এবং স্থানীয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সভাপতি মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। রবিবার দিন বিশেষ পূজান্তে প্রায় ৪৫০০ নরনারী প্রসাদগ্রহণ করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। উহা পরিচালনা করেন মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ—এই দিনের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বীতশোকানন্দ এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। মধ্যে দুই দিন দুইটি মহিলাসভার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচিত হয় এবং একদিন আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণীসভাও অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়দিনের মধ্যে শিবরাত্রি পড়ায় ঐ দিন সারারাত্রি পূজা পাঠ ভজনাদিতে বিশেষ আনন্দপূর্ণ পরিবেশে সমবেত ভক্তবৃন্দ রাত্রি জাগরণ করেন।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ পর্যন্ত ৪দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১৯ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০শে চৈত্র প্রভাতে একটি সুসজ্জিত মটরজীপে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া মাইকযুক্ত মটর ট্রাকে সঙ্গীত সহ শোভাযাত্রা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে। বৈকাল ৫ ঘটিকায় পাকিস্থানস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার ডাঃ এম্ এস্ মেহ্‌তা, আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন এবং হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। আনন্দমুখরিত ১লা বৈশাখ পূজা, হোম, ভজন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, উপনিষৎপাঠ, রামনাম-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয়। অপরাহ্ণে স্বামী যোগস্থানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অর্কেষ্ট্রা পার্টি ঐকতান বাদন ও যন্ত্রসঙ্গীত-পরিবেশনে সকলকে আনন্দ দান করেন। ২রা বৈশাখ বৈকাল ৫৷৷টায় স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীমণিভূষণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর, এম্-এল্-এ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিবেকানন্দ ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের সভ্যগণ চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। ৩রা

বৈশাখ প্রায় এগার হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়া ও প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৫ই হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অষ্টাহব্যাপী শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ হইত। ৭ই প্রাতে শ্রীসারদামণি বালিকা-বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। ৮ই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিসহ সংকীর্তন করিতে করিতে ভক্তগণ গ্রাম-প্রদক্ষিণ করেন। ৯ই বিশেষ পূজা, হোমাদি ও নারায়ণ-সেবা হয়। সায়াহ্নে মানিকগঞ্জ মহকুমাশাসক শ্রীঅজিতকুমার দত্তের সভাপতিত্বে এক সভায় বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণের পর, বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রী-ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন। ১০ই প্রাতে শ্রীনিতাই পালের পদাবলী কীর্তন সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করে। অপরাহ্নে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকারের পরিচালনায় এক মহতী জনসভায় স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সত্য-কামানন্দ ও শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ বক্তৃতা করেন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরানীর নেতৃত্বে একটি মহিলাসভা হয়। সন্ধ্যায় 'প্রগতি সংসদে'র উদ্যোগে বাজি পোড়ান হয়; রাত্রে ভক্তগণ 'রাজনন্দিনী' নাটক যাত্রাভিনয় করেন। ১২ই জ্যৈষ্ঠ সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত কবির গান হয়। উহাতে দূর দূর গ্রাম হইতে প্রায় দুই সহস্র হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন।

কুমিল্লায় শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ— বিগত ২৪শে বৈশাখ (৭ই মে) অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কুমিল্লা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্যে পর্যাপ্ত পুষ্প-মাল্যে ভূষিত হন। তৎপর তিনি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গমন করেন। ৩০শে মে পর্যন্ত পূজ্যপাদ মহারাজজী এখানে ছিলেন। ২৬শে বৈশাখ তিনি আশ্রমের বার্ষিক সাধারণসভার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ-অবলম্বনে মহারাজের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে এক অপূর্ব ধর্মভাব জাগাইয়া দিত। এ কয়টি দিনে আশ্রমে প্রভূত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা অনুভূত হইয়াছিল।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর প্রচারকার্য— বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী গত ১০ই চৈত্র (১৩৬০) হইতে বর্তমানবর্ষের ১৭ই বৈশাখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং আসামের নানাস্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারকার্য-ব্যপদেশে সফর করেন। তিনি কুলটি, বার্নপুর, আসানসোল, বর্ধমান ও চিত্তরঞ্জনে ১০টি; মধুপুর, মাইথন, সিন্দ্রি, ধানবাদ, আদ্রা, রাঁচি ও পাটনায় ৭টি; শিলচর ও ইম্ফলে ৭টি এবং কলিকাতায় ১টি বক্তৃতা দেন।

পরলোকে স্বামী ভাগবতানন্দ—বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী ভাগবতানন্দজী (নরেন মহারাজ) গত ২৩শে বৈশাখ (৬ই মে) অপরাহ্ন ৬টায় বারাণসীতে ৭০ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর অভয়পাদপদ্মে চিরমিলিত হইয়াছেন। ১৯১১ সালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া মঠে যোগদান এবং ১৯২৮ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নরেন মহারাজ প্রধানতঃ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ধ্যান-ধারণাদি লইয়া জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহার শান্ত অমায়িক সপ্রেম ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

বিবিধ সংবাদ

কটকে অনুষ্ঠান—ওড়িষ্যার কটক জিলার অন্তর্গত রাজকণিকাস্থিত ঝরম্ গ্রামে গত ৩০শে চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকাল হইতে বিশষ পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগান ও সঙ্কীর্তনাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় পাঁচ শত ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় চাঁদবালী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবিনারায়ণ জেনার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হইয়াছিল।

বিকানীর শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর—বিকানীর শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের কার্যবিবরণী সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাতে অক্টোবর, ১৯৪৯ হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ সালের কার্যক্রম প্রদত্ত হইয়াছে। স্বামী জপানন্দের কয়েক বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল এই শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অসাম্প্রদায়িক ধর্মাদর্শে ও জীবসেবায় জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করা। ভারতসরকারের ১৮৬০ সালের সোসাইটি-রেজিষ্ট্রেসন্-এ্যাক্ট-অনুযায়ী গত আগষ্ট মাসে ইহা রেজিষ্টার্ড করা হইয়াছে। কুটীরের পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ১৪১৪। নৈশ বিদ্যালয়টির কার্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্তমানে উহার ছাত্রসংখ্যা—১৭৮। প্রকাশন-বিভাগ হইতে হিন্দীতে (১) শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস (২) মাতাজী (শ্রীসারদামণি দেবী) (৩) ভক্তি-তত্ত্ব (৪) কঠোপনিষদ্ প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতের বীরাগ্রগণ্য রাজস্থানবাসিগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছেন—ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়।

পল্লীবঙ্গে উৎসব—হরিশপুর (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে, গত ৫ই বৈশাখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড়মঠের স্বামী অনিকেতানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও আরতি সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে একটি সভায় স্থানীয় সুধীবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। এই সভায় 'যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাশেষে প্রায় পাঁচ শত দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৪পরগণার নূতনপুকুরে গত ২০শে ও ২১শে চৈত্র (৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল) শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমদিনের কার্যসূচী নিম্নোক্তরূপে অনুসৃত হয়:—প্রাতে মঙ্গলারতির পর শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তন, দ্বিপ্রহরে শ্রীবলরাম আচার্য কর্তৃক বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি, অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনকথা-আলোচনা, সন্ধ্যায় রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকগণ কর্তৃক 'দেশের ছেলে ও বিবেকানন্দ' অভিনয়। ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্নে বেলুড়মঠের স্বামী মনীষানন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা হয়। উহাতে শ্রীমোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস চৌধুরী ও সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় আলোচনা করেন। কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল সংঘ করেন কীর্তন পরিবেশন।

কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা ও ৫ই বৈশাখ যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমদিন কাটোয়ার প্রধান

ও ধর্মপ্রাণ চিকিৎসক শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিন পৌর সভাপতি শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য বেদান্ত দর্শন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাষণ দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাবলীল ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। উক্ত দুই দিনই প্রাতে নগরকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আশ্রমস্থ বালকগণ কর্তৃক নির্মিত তোরণগুলির উপর পরমহংসদেব ও স্বামীজীর উপদেশাবলী আশ্রম প্রাঙ্গণের শোভা বর্ধন করিতেছিল। অপরাহ্ণে আশ্রম-সংলগ্ন আম্রকাননে অতি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সভার কার্য সম্পন্ন হয়।

চৌধুরীহাট (কুচবিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৫দিন ব্যাপী উৎসব হয়। ২০শে চৈত্র পূজাপাঠ হোমাদি, শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ, রাত্রিতে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা এবং কালীকীর্তন হয়। ২১শে চৈত্র অপরাহ্ণে বেলুড়মঠ হইতে আগত স্বামী পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়, কুচবিহারের মহারাজা শ্রীযুত জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহার এবং দিনহাটার সরকারী কর্মচারী এবং অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ প্রায় ছয় সহস্রাধিক ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

২২শে এবং ২৩শে চৈত্র ষোল প্রহরব্যাপী নাম-যজ্ঞ হয়। ২৪শে চৈত্র বুধবারে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে পাঁচ সহস্রের অধিক লোক পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে রামলীলা-কীর্তনের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

বহির্বঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—২২শে ফাল্গুন, আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে পূজা, পাঠ, হোমাদি সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০শে ফাল্গুন ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণসেবা হয় এবং স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ধর্মসভায় কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দ, শ্রীমাধুর্যময় মিত্র ও শ্রীঅমরেন্দ্র গাঙ্গুলী বক্তৃতা করেন।

দরং (তেজপুর, আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এক মহতী সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅজয়কুমার বসু। বাঙ্গালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ এবং শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমতী তৃপ্তি দত্ত, শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত, শ্রীমতী হিরণ্ময় বরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে রচিত সঙ্গীতাদি দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। শিক্ষক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার ঐতিহাসিক দিক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের লোকান্তর—কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় ৮৯ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে হারাইল। তিনি ১২৭২ বঙ্গাব্দে পূর্ববঙ্গের ময়নসিং জেলান্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গুরুদাস বিদ্যারত্নও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল। বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি অবশেষে বঙ্গের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি জীবনে কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। তিনি বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘকাল অতিদক্ষতার সহিত ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সরকার হইতে একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

নানাস্থানে শ্রীমা সারদাদেবীর শত-বার্ষিকী-পালন—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদা-দেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরোদায় একটি জয়ন্তী-সমিতি গঠিত হইয়াছে। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যা শ্রীমতী হংস মেহ্‌তা এই সমিতির পরিচালিকা। গত ২৭শে ডিসেম্বর পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে একটি মহতী জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী শ্রদ্ধাসহকারে বিশিষ্ট বক্তাগণ কর্তৃক আলোচিত হয়।

সম্প্রতি পুনায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদা দেবীর জয়ন্তী-উৎসবের উদ্বোধন বিপুল উদ্দীপনার সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় এক বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী-অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। মারাঠী ও হিন্দী ভজনগান এই উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

কোলাপুরে (বোম্বাইরাজ্য) এই উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে মহারানী শ্রীমতী বিজয়মালার সভানেত্রীত্বে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। উহাতে শ্রীমতী যমুনাবাঈ হীরলেকার মারাঠীতে এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ হিন্দীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভানেত্রী মহোদয়া বলেন,—ভারতকে এখন জননী সারদাদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। রোটারী ক্লাবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হিন্দু কন্যা-ছাত্রালয়ে হরিজন বালিকাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও শ্রীমতী হীরলেকার বালিকাদের শ্রীমায়ের আদর্শটি বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় পৌরগৃহে আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডাভোল-কারের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়, উহাতেও মাতৃজীবনী হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় সম্যক্ আলোচিত হয়। স্থানীয় বিবেকানন্দ আশ্রম-পরিচালিত এক শ্রমিকসভায় সমাজের অধস্তন নরনারীবৃন্দের মধ্যেও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোক-সম্পাত করে।

হোজাই (নওগাঁও, আসাম) তে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৯ই চৈত্র হইতে তিন দিন। প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে মাঙ্গলিক এবং পূজাদির অনুষ্ঠান হয় এবং অপরাহ্ণে বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জনসভায় বিভিন্ন ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের নানাদিক আলোচিত হয়। অন্যান্য দিনের কর্মসূচী :— ছায়াচিত্রে বক্তৃতা (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক), ব্যায়াম-প্রদর্শন, প্রায় সাত হাজার নরনারায়ণসেবা এবং সবুজ বালক-সঙ্ঘ কর্তৃক একটি অসমীয়া নাটিকার অভিনয়।

দরং (তেজপুর, আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৭ই চৈত্র হইতে তিন দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজাকৃত্য (বেলুড় মঠের স্বামী কাশিকানন্দ কর্তৃক সম্পন্ন) ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ব্যতীত উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল স্বামী প্রণবাত্মা-নন্দের ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা এবং বেলুড় মঠের স্বামী চণ্ডিকানন্দের পরিচালনায় জনসভা ও ভজনসঙ্গীত। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেশকর্মী শ্রীমহাদেব শর্মাও ভাষণ দিয়াছিলেন।

সিঁথি (কলিকাতার উপকণ্ঠে) রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উদ্যোগে ৫ই বৈশাখ হইতে শ্রীমা-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিদিনই পূজাপাঠ, যজ্ঞ, কীর্তন ও প্রসাদবিতরণ উৎসবসূচীর অঙ্গীভূত ছিল।

দুইটি জনসভায় (একটি বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য) বক্তৃতা করেন বেলুড় মঠের স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী দেবানন্দ; 'শ্রীমা সারদামণি' গ্রন্থের যশস্বী লেখক শ্রীতামসরঞ্জন রায়, আনন্দ আশ্রমের সম্পাদিকা ভগিনী চারুশীলা দেবী এবং বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত।

কলিকাতা গৌরীবেড়েস্থিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুর-বাটীতে (২৬বি, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট) ৩রা বৈশাখ হইতে দিবসত্রয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, মহাসপ্তশতী যজ্ঞ ও আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কলিকাতা বেতার-কথক), প্রচারব্রতী শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, সাহিত্য-রত্ন, বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে এবং শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। সঙ্গীত-শিল্পিগণের মাতৃনাম-গান এবং শ্রীগুরু-বালিকাসঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণসখা' গীতাভিনয় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভক্তি উদ্রিক্ত করিয়াছিল।

ছোট সরসা (হুগলি) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ ৪ঠা ও ৫ই বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীমা-শতবার্ষিকী যুক্তভাবে অনুষ্ঠান করেন। এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা-সভায় বক্তৃতা দেন বেলুড়মঠের স্বামী শর্মানন্দ, ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার (ইটাচুনা মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। গ্রামবাসিগণকে মনোমুগ্ধকর কালীকীর্তন দ্বারা পরিতৃপ্তি দেন ভাটপাড়ার 'নবীন সঙ্ঘ'।

জঙ্গিপুরবাসী যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় জঙ্গিপুর শহরে (জেঃ মুর্শিদাবাদ, শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউর নাটমন্দিরে গত ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬ই ও ১৭ই মে যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন প্রাতে অগণিত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ সংকীর্তন করিয়া নগর-পরিক্রমা করেন। প্রত্যাবর্তনের পর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিশেষ পূজা হোম, আরতি ও প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। উভয়দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও বাণীসম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য জনসভার আয়োজন করা হয়। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয়চৈতন্য ও সারগাছি আশ্রমের স্বামী বিরজাত্মানন্দ যোগদান করায় অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

বারাসত শিবানন্দধামে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী-উপলক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে গত ফেব্রুয়ারী মাসে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থান বারাসত শিবানন্দধামে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় "দেবী-মানবী শ্রীসারদামণি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তৎপর জন্মজয়ন্তীর দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ৯ই মে সারাদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভজন হয়; বৈকালে বেলুড়মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দের পরিচালিত এক জনসভায় স্বামী প্রেমরূপানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও সভাপতি শ্রীসারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

খড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১লা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মোৎসব ও শ্রীমা সারদামণির শতবার্ষিকী-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি এই পাঁচদিন বিশেষ পূজা, কালীকীর্তন, কথামৃতপাঠ, ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে মুখরিত ছিল। ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্নে একটি মহিলাসভার আয়োজন করা হয়, উহাতে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী চারুশীলা দেবী। ৫ই প্রাতে শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি সহ একটি শোভাযাত্রা নগর-প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। দ্বিপ্রহরে পূজাবসানে ভক্তবৃন্দ প্রসাদগ্রহণ করেন। বৈকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী পুণ্যানন্দ অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।



অহংকার আত্মস্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে

ভানুপ্রভাসংজনিতাভ্রপঙ্‌ক্তি-
 র্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহংকৃতিরাত্মতত্ত্বং
 তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ং ॥

ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে
 যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচি-
 জ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাঽস্তু ॥

—শ্রীশঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি, ১৪২,১৬৩

সূর্যকিরণ পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া আকাশে মেঘের জন্ম দেয়। সেই মেঘপঙ্‌ক্তিই কিন্তু অবশেষে সূর্যকে ফেলে ঢাকিয়া, আর আকাশে বিস্তার করে নিজেদের রাজত্ব। ঠিক এমনিভাবেই আত্মা হইতে উত্থিত অহংকার জীবনের পরম সত্য আত্মতত্ত্বকেই আবরিত করিয়া রাখে. এবং নিজে সাজিয়া বসে দেহ-মন-প্রাণের নকল সম্রাট। [এই মর্মান্তিক প্রহসনের অবসান হওয়া প্রয়োজন। জাল রাজা 'অহং'কে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া আসল রাজা 'স্বয়ং'কে তথায় বসাইতে হইবে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন।]

রৌদ্রে যে দেহের ছায়া পড়ে, জলে শরীরের যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, স্বপ্নে নিজের যে দেহ চলে ফিরে কিংবা হৃদয়ে কল্পনা দ্বারা আপনার যদি কোন শরীর গড়িয়া উঠে—এই সকল বিভিন্ন দেহকে কি তুমি কখনও 'আমি' বলিয়া মনে কর? —না। তুমি সর্বদাই জানিতেছ, এই সব কায়া সত্য নয়—ছায়া, তোমার সহিত উহাদের কোন বাস্তব আত্মীয়তা নাই। যদি জীবনের নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে জাগ্রতকালের এই জীবিত শরীরকেও ঐরূপই ছায়া বোধ করিতে হইবে। জানিতে হইবে উহাও তোমার 'আমি' নয়।

কথাপ্রসঙ্গে

রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণ

জানিয়াছিলেনঃ মা আছেন আর তিনি আছেন; তিনি মায়ের শিশু, "শিশুর মা নইলে চলে না"; মা যন্ত্রী তিনি যন্ত্র, মায়ের হাতের পুতুল তিনি, মা যেমন চালাইতেছেন তেমনই চলিতেছেন, যেমন নাচাইতেছেন তেমনিই নাচিতেছেন। জানিলেনঃ "আমাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না"—মা-ই তাঁহার মধ্যে বসিয়া আছেন—তাঁহার শরীর-মন আশ্রয় করিয়া লোককল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহার 'আমি'তে মায়েরই 'আমি' ভর করিয়াছে। বুঝিলেনঃ বিশ্বসংসারনেত্রী মায়ের যেমন বিশ্রাম নাই তাঁহারও সেইরূপ বাকী জীবনের জন্য অতন্দ্রিত অকুণ্ঠিত অনবসর কর্মব্যাপৃতি কিসমতে লেখা হইয়া গিয়াছে!

তাই অবাক্ হইলেন না যেদিন পঞ্চবটীর নিভৃত আত্মস্থিতি হইতে কুঠির ছাদে উঠিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে হইল,—'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়, তোদের না দেখে থাকতে পারছি না'—যেদিন কালীবাড়ীর প্রাচীর পার হইয়া জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া ছুটিতে হইল বেলঘরের একটি বাগান-বাড়ীতে, ঈশ্বরের নামে ব্যাকুল কাহারা যে নিভৃতে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছে তাহাদিগকে দেখিতে। ছুটিতে হইল পরে—দিনের পর দিন, সকালে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে কামকাঞ্চনোন্মত্ত রাজধানীর অলিতে গলিতে 'চিহ্নিত' মানুষদের সন্ধানে। সারাদিন নাচিয়া গাহিয়া, অন্তরালবাসিনী জননীর রাশ-ঠেলিয়া-দেওয়া ধান্য-সম্ভার জনে জনে বিতরণ করিয়া, ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে মিতালি পাতাইয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে রাত বারোটায় সুপ্ত পল্লীর বুক মাড়াইয়া দেবালয়ের রুদ্ধ দ্বারে ফিরিতে হইল—দৌবারিককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বিশ্রামের মানসে উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরখানির দিকে পা বাড়াইতে হইল।

হাঁ, রাত্রির পর রাত্রি।

শুইয়াছেন—কিন্তু কতক্ষণ? চকিতে উঠিয়া পড়িয়াছেন—ঘরে পায়চারী করিতেছেন—চোখে ঘুম নাই।

রাজপথ চোখে বাসা লইয়াছে।

রাজপথে যাহাদের দেখিয়া আসিয়াছেন, চিনিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের কথা ভাবিতেছেন, তাহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ 'ভাবমুখে' নিরীক্ষণ করিতেছেন—কাহারও জন্য কাঁদিতেছেন, কাহারও জন্য শঙ্কিত হইতেছেন, কাহারও জন্য উল্লাসে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছেন। একদা পঞ্চবটীর শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ রাত্রি জাগরণ করিতেন,—উপলক্ষ্য ছিল 'মা', ধ্যানের মা—একান্ত নিঃসঙ্গ অনুভূতির মা। আজ রাজপথের শ্রীরামকৃষ্ণকে সেইরূপই বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইতেছে, উপলক্ষ্য—'মা'য়ের কাছে যাহারা যাইবে তাহারা, পুরুষ-নারী, বালক-বৃদ্ধ, অভিজাত-দীন;—জ্ঞানের মা—বহুমানবরূপিণী মা।

ঈশ্বর-প্রেমমদিরা পান করিয়া মাতাল হইয়াছেন, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, পা টলমল করিতেছে—তবুও চলন্ত ঘোড়ার গাড়ী হইতে রাস্তার ধারে লৌকিক মাতালদের দেখিয়া পাদানে পদবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন। 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—জীব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। বেদবাক্য। রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণানুভবে প্রমাণীকৃত সত্যবাক্য। তেমনই রাস্তার পাশে দ্বিতলের বারান্দায় ছলনাময়ী বারবনিতার মধ্যে দেখিলেন জগদম্বাকেই, মনুমেণ্টে হেলান দিয়া দাঁড়ানো সাহেবের ছেলেকে মনে হইল বঙ্কিমবিহারী শ্রীকৃষ্ণই। পাপী ও পুণ্যবান, দুর্বল

এবং সবল, কালো এবং সাদা ইত্যাত্মাকার বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে সাম্যকে দেখিবার যে অবস্থার কথা নানা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ঘোষণা করিয়া গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ রাজপথে দাঁড়াইয়া।

শুধু পঞ্চবটীতে বসিয়া ইহা হইতে পারিত না। পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সত্তার দ্বন্দ্ব কাটাইয়া উঠা যাইত না—ফলে 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' প্রকাশিত হইতেন শুধু ধ্যানে এবং দশজনের সমক্ষে বসিয়া তত্ত্বালোচনার সময় ধুনীর আগুন হইতে কয়লা লইতে উদ্যত দুঃসাহসীকে তোতাপুরীর মতো চিমটা লইয়া তাড়া করিতে হইত! ন্যায়ের ফাঁকি দিয়া বলিতে হইত—"পরমার্থত সব ব্রহ্ম - ব্যবহারত য়হ্ সব ঝুট হ্যায়—মায়া, আর মায়াই যদি, তাহা হইলে আসক্তি বিরাগ, গ্রহণ-বর্জন একটু রহিলই বা—ক্ষতি কি?"

রাজপথে দাঁড়াইয়াছিলেন, চলিয়াছিলেন ফিরিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনদর্শনে এই ফাঁকি ঢুকিতে পারে নাই। ব্রহ্ম শুধু একটি তাত্ত্বিক পদার্থমাত্র নয়, এই বহুবিচিত্র সংসারের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সর্বসময়ে চাই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভব। যে ব্রহ্ম সংসারাতীত তিনিই সংসার-সত্য, সংসার-শক্তি, সংসার-লক্ষ্য। ব্রহ্মকে আশমান হইতে দুনিয়ায় বসাইয়া দিতে হইবে—দোকানে সাজানো আলমারীর মধ্য হইতে বাহির করিয়া আঁচলে বাঁধিয়া লইতে হইবে।

ব্রহ্মসাধনার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় রাজপথে। এই দ্বিতীয় পর্বের কথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। প্রথমপর্ব সাধিয়াই ভাবিয়াছিলাম অলমিতি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন নিজে রাজপথে দাঁড়াইয়া, চলিয়া, ঘাম ফেলিয়া, রক্ত দিয়া। ইহারই নাম ভালবাসা। তোমায় ভালবাসি কিন্তু তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে পারি না, মরিতে পারি না, এই ভালবাসার দাম এক পয়সা। ব্রহ্মকে যদি 'সর্বম্' বলিয়া অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে গৃহকোণে বসিয়া শুধু বাক্যে তাহার প্রমাণ দিলে চলিবে না—রাজপথে দাঁড়াইয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

> 'ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়
> মনঃপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
> বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
> জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

'মদীয় আচার্যদেব' (My Master) বক্তৃতায় স্বামীজী রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি আঁকিয়াছেন—

> "তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। * * অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। * * * হাসিয়া এইমাত্র উত্তর দিতেন—'কি দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে উহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, তাহার জন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।'"

একদা শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাতীরে সূর্যাস্তের সময় ভূমিতে লুটাইয়া বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়াছিলেন—এই নশ্বর জীবনের আর একটা দিন চলিয়া গেল। মা এখনও দেখা দিলে না?

ঈশ্বরদর্শন-ব্যাকুল তাঁহার নয়নের সেই অশ্রু তোমারও হৃদয়কে যদি ব্যাকুল করিয়া থাকে তো তুমি অবশ্যই ধন্য। কিন্তু তাঁহার আর একদিনকার চোখের জলের কথা মনে পড়ে কি? তীর্থের পথে ছিন্নবস্ত্র বুভুক্ষু দরিদ্র নরনারীদের জন্য যেদিন তিনি কাঁদিয়াছিলেন, তীর্থের দেবতাকে ভুলিয়া এই নরদেবতাগণের সেবায় তৎপর হইয়াছিলেন? রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দ্বিতীয় নয়নাশ্রু মানস-নয়নে দেখিতে পাইয়া কি তোমার হৃদয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিবে না? তাহা যদি হয় আর সেই ব্যথা যদি মূর্ত হইয়া উঠে ব্যথিতের জন্য অকুণ্ঠ

সেবায়, আত্মবিসর্জনে—তাহা হইলে তুমি অধিকতর ধন্য।

আমাদেরই চোখে দেখা

কিছুকাল পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজকুমারী অমৃতকাউর সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করিয়া নয়াদিল্লীতে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—রাশিয়ায় বেকারসমস্যা নাই। জীর্ণশীর্ণ বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায় সেরকম লোক তিনি রাশিয়ায় দেখিতে পান নাই।* * কেহ দেশে ভিক্ষা করে না। অতি দরিদ্র অথবা অতি ধনবান্ সে দেশে নাই। * * সে দেশে বিলাসদ্রব্যের মূল্য বেশী। রাশিয়ায় সাজগোজ করা নারী দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে সাজ-পোষাকের একটা মান আছে। * * স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে শিক্ষাদানের উপর সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সমধিক জোর দেন। প্রতিগ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক ডিস্পেন্সারী, প্রতি ৫ হাজার লোকের জন্য ২৫টি বেডের একটি করিয়া কটেজ হাসপাতাল এবং প্রতি ২৫ হাজার লোকের জন্য ১২০টি বেডের জেলা হাসপাতাল আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে জনস্বাস্থ্যের জন্য বছরে মাথাপিছু ৩৫০ রুবল ব্যয় করা হয়, আর ভারতে মাথাপিছু ১ টাকাও ব্যয় করা হয় না!

শ্রীমতী অমৃত কাউরের কয়েকমাস পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একমাস রাশিয়া-সফরের অভিজ্ঞতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

"কম্যুনিজমের রাজনৈতিক দর্শন বা সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরকার রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ দেশ মাত্র ৩৫ বৎসরে যে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং নিজেদের সমস্যাগুলির (অনেকগুলি আমাদের দেশের সমস্যা সমূহের মতো) সমাধান যেভাবে করিয়াছে, তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। আমাদেরই মতো উহাদের বিরাট দেশে ছিল নানা ভাষা ও সংস্কৃতিযুক্ত বিভিন্ন জাতির আবাস। জনগণও ছিল অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং শৃঙ্খলাবোধরহিত। কৃষিব্যবস্থা ছিল অতি প্রাচীন, শিল্পচেষ্টাও নগণ্য। * * কিন্তু ৩৫ বৎসরে তাহাদের কৃষি এবং শিল্প বিপুল প্রসারলাভ করিয়াছে। নিরক্ষরতা দূর হইয়াছে। * *"

ভারত-লোকসভার স্পীকার শ্রী জি ভি মবলঙ্কর কিছুকাল পূর্বে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যভ্রমণের সময় একমাত্র বৃদ্ধ স্থবির ব্যতীত তিনি কোনও অলস ব্যক্তি দেখেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারী-পুরুষ সকলেই কোনও না কোনও কাজ করিয়া থাকে।

মহীশূর রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের অধিকর্তা শ্রী ই ভি গণপতি আয়ার সম্প্রতি তাঁহার জাপান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, জাপানের বর্তমান অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও জাপানীদের মধ্যে যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও কর্মনিষ্ঠা দেখিয়া আসিলাম তাহা ভারতবাসীদের অনুকরণীয়।

আমাদের নিজেদের প্রতিনিধিদের চোখে দেখা এই সকল তথ্যের দিকে আমাদের ভাল করিয়া তাকানো উচিত। রাশিয়া, ইংলণ্ড ও জাপানে যাহা সম্ভবপর হইতেছে, আমাদের দেশে তাহা হইতেছে না কেন? শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর একটি মন্তব্য অনুধাবনীয়—

"সোভিয়েট জনগণের বিপুল প্রাণশক্তি ও কর্মোৎসাহ দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। তাহাদের পরিকল্পনাগুলির উপর তাহাদের রহিয়াছে গভীর আস্থা এবং ইহাতেই তাহাদের মনে জাগ্রত হয় আত্মবিশ্বাস। * * ৩৫ বৎসরের একনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল এবং কঠিন পরিশ্রম—শুধু দু-চারজনের নয়—বিরাট দেশের সমস্ত জনমণ্ডলীর—উহাই তাহাদের সাফল্যের কারণ।"

নিষ্ফল রাজনীতিচর্চা কমাইয়া যাহাতে যুবকদের মধ্যে দেশকে তুলিবার ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠে, ঐ আগ্রহ চরিত্রে ও কর্মে প্রকাশ পায় ইহাই আমাদের এখন লক্ষ্য হউক। দলগত কোন্দল, পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পদমর্যাদার চেষ্টা—এইগুলিই যদি কর্মী ও নেতাদের মধ্যে প্রকট দেখিতে পাই, তাহা হইলে ভারতের আর আশা কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছিলেন,—

"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না, যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

স্বাধীনতার পূর্বে দেশবাসীর পক্ষে স্বামীজীর এই বাণীগুলি অনুধাবন ও অভ্যাস করিবার যতটা প্রয়োজন ছিল, স্বাধীনতার পর এখন উহা শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের চেষ্টায় নহে, অনেকটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্যও—আবার নিজেদের চেষ্টা বলিতে সমগ্র দেশবাসীর চেষ্টাতেও নয়। দেশের এক বৃহৎ অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন নাই, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বিধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সমগ্র দেশবাসীকেই লইতে হইবে। কেহ পাশ কাটাইলে চলিবে না। রাশিয়া, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্বামীজী প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে আমাদের বলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের নিজেদের প্রতিনিধিরাও বিদেশ ঘুরিয়া উহা আজ উপলব্ধি করিতেছেন। আমরা যেন উহার অনাদর না করি।

জরা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জরা আসে যৌবনের শেষে,
অকারণে আসে না সে, আসে সে ত কঞ্চুকীর বেশে।
আসে সে ত বোধনের শোধনের তরে
বিধাতার শাপে নয়, বরে।
আবাল্য ত দুরন্ত সংগ্রাম,
জরার শিবিরে শুধু দিনান্ত বিশ্রাম।
জরাই ত প্রায়শ্চিত্ত, জরা অনুতাপ,
ধুয়ে মুছে ধৌত করে আঁখি জলে পুঞ্জীভূত পাপ।
হরি চিত্তমল
শিরের কুন্তল সহ অন্তরেও করে সে ধবল।
হেরে সে যে শিয়রে মরণ
হরে তাই একে একে মায়ার বন্ধন
বৃথা মোরা পাই শোক, লঘু করে ভার
ধীরে ধীরে সরাইয়া লয় সব ভোগ্য উপচার।

থাকে না হিংসার পাত্র বৈতরণীতীরে
দম্ভের স্তম্ভের ফাঁকে নরসিংহ জাগে ধীরে ধীরে।
নোয়ায়নি কভু শির যেবা কারো পায়,
মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া করে জরা নতশির তায়।
রুদ্ধদ্বার দেহকক্ষে ষড়যন্ত্র করে নানা রোগ।
নব নব পাপ তাই প্রবেশের পায় না সুযোগ।
ভোগের শক্তির সাথে লুপ্ত হয় লোভ
না পেয়ে হয় না আর ক্ষোভ।
যেই যষ্টি একদিন দুর্বলেরে করেছে শাসন,
দুর্বল মুষ্টিতে হয় সেই যষ্টি পথাবলম্বন।
হুহু ক'রে ভবসিন্ধু হ'তে বায়ু বয়।
উড়ায় বন্ধনজাল, হরে আয়ু জুড়ায় হৃদয়,
ভুলায় সংসারমায়া। কাণ্ডারী ত নয় ভুলিবার
নিভৃতে পারের কড়ি করে আত্মা গোপনে সঞ্চয়।

পবিত্রতা

স্বামী প্রভবানন্দ

সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, পবিত্রতার অর্থ জীবনের নৈতিক বিধিসমূহ অনুসরণ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র নীতিশাস্ত্রের কতকগুলি তত্ত্ব মানিলেই কি আমরা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যাই?—না। যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই যথার্থ পবিত্র। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'যাহারা পবিত্র-হৃদয়—তাহারাই ধন্য, কারণ তাহারাই ভগবানের দর্শন পাইবে।'

পবিত্রতার স্বরূপ সম্বন্ধে খ্রীষ্ট আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন। একটি লোক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে সৎ প্রভু, আমাকে বলিয়া দিন, কি কি ভাল কাজ করিলে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়?" যীশু উত্তর দিলেন—"আমাকে তুমি প্রশংসা করিতেছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত সৎ নহে।" উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সৎ এই বিশেষণে অভিহিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। উপরোক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে মানুষ-বুদ্ধি করিয়াই সৎ এই কথাটি বলিয়াছিলেন। এইজন্যই যীশু নিজেকে সৎ বলিতে চান নাই। কেননা, সৎ এই বিশেষণটি কেবল ঈশ্বর-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই পৃথিবীতে অনেক মহৎ ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আছেন। কিন্তু যে পর্যন্ত তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ না করিতেছেন, ততক্ষণ যীশুর নির্দিষ্ট অর্থে তাঁহাদিগকে সৎ বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে যীশু প্রকৃতই সৎ ছিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া স্বয়ং ঈশ্বরই হইয়া গিয়াছিলেন।

প্রশ্নকারী সেই যুবকের প্রতি যীশুর আরও উপদেশ—"যদি প্রকৃত সৎ জীবনলাভের অধিকারী হইতে চাও, তবে ঈশ্বরের অনুজ্ঞাসমূহ মানিয়া চল।"

যুবক প্রশ্ন করিলেন, "সেইগুলি কি?" যীশু উত্তরে বলিলেন,—"নরহত্যা করিবে না, স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হইবে না, চুরি করিবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, পিতামাতাকে সম্মান করিবে, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে।" যুবকটি বলিল,—"শৈশবকাল হইতেই আমি এই সকল উপদেশাবলী মানিয়া চলিতেছি, আর আমাকে কি করিতে হইবে আপনি বলিয়া দিন।" তখন যীশু বলিলেন, "যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় করিয়া গরীবদের দিয়া দাও ও আমার নিকট চলিয়া আইস, আমাকে অনুসরণ কর।" এই যে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বলা, ইহাতে যীশু ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সমস্ত ভোগ বাসনা ও আসক্তি একেবারে বিসর্জন দিয়া পরমেশ্বরের শরণ লইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন, কাম-কাঞ্চনে আসক্ত সংসারীর মন যেন ভিজা দিয়াশালাই, যতই তুমি ঘষ না কেন, কিছুতেই জ্বলিবে না। কিন্তু ভক্তের হৃদয় যেন শুক্‌নো দিয়াশালাই। একবার ঘষিলেই জ্বলিয়া উঠিবে অর্থাৎ—ঈশ্বরের নাম শোনা মাত্রই তাঁহার হৃদয় ভগবৎপ্রেমে উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। ভোগবাসনা সম্পূর্ণরূপে বিলীন না হইলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

সর্বস্ব ত্যাগেই আসে ভগবৎপ্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও;

এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। যে বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ এইখানে বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পবিত্রতা, তাহাই ঈশ্বর দর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা ভাল মন্দ বিচারের বাহিরে।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, আমাদিগকে জীবনের নৈতিক অনুশাসনসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে না এবং ভাল হইয়া চলিবার চেষ্টা করার কোনও দরকার নাই। নৈতিক নিয়মসমূহ আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি, তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু ভয় এই যে, জীবন যদি কেবল মাত্র আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র হইয়া পড়ে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলনের আদর্শ যদি বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যায়, তবে ধর্মের আসল উদ্দেশ্যই হারাইয়া যায়। কেবলমাত্র নীতিপরায়ণ হওয়াই যথেষ্ট নয়। মাঠে যে গাভীটি বিচরণ করিতেছে, তাহার কোনও নৈতিক দোষ নাই। সে চুরি করে না, মিথ্যা বলে না, কাহাকে হত্যাও করে না, কিন্তু গাভীটি সেই গাভী-ই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে যে মানুষ গুরুতর অপরাধ করে সেই মানুষই পরে হইতে পারে দেব-মানুষ। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা যাহা খুশী তাহা করিয়াও দেবত্ব লাভ করিতে পারিব। জীবনে নৈতিক নিয়মসমূহ পালন করিতেই হইবে এবং ইহাই ঈশ্বরলাভের প্রথম সোপান। সুতরাং আমাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভে ভাল-মন্দের বিচার করিতেই হইবে। পরে যখন আধ্যাত্মিক জীবনের এমন এক স্তরে আমরা উপনীত হইব—যেখানে আমাদের মন একেবারে ঈশ্বরপ্রেমে ডুবিয়া থাকিবে, এবং ভালমন্দ-দ্বন্দ্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন আর আমরা মন্দ করিতে পারিব না, আমাদের হৃদয় এত পবিত্র হইয়া যাইবে যে, একটি অসৎ চিন্তাও আর মনে উঠিবে না।

যাঁহারা ধর্ম-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই বিবেক-বিচারসম্পন্ন এবং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া শুধু ভালবাসিবার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসেন তাঁহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। অনেকেই এই জীবনের দুঃখদুর্গতি হইতে মুক্তি-লাভের অথবা কোনও অতৃপ্ত বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে ভগবানকে ডাকে। অবশ্য ইহাতে কিছুই যায় আসে না; কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে কোন কারণেই ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া যাক্ না কেন তাহাই মঙ্গল। কিন্তু যাহারা এই ক্ষণস্থায়ী জাগতিক বিষয়ের অসারতা উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানকেই পাইতে চায়, তাহারা তাঁহার অত্যন্ত আপন ও প্রিয়। আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতি হইতে হইতে মানুষ এমন এক অবস্থায় আসে, যখন কোনও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হইয়া শুধু ভগবানের জন্যই ভগবানকে সে ভালবাসিতে পারে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পবিত্রতার দুইটি বিশেষ লক্ষণ। একটি হইল ভালমন্দ-বিচার-বিবেচনার অর্থাৎ দ্বৈতবুদ্ধির ঊর্ধ্বে চলিয়া যাওয়া, আর অপরটি হইল নিঃস্বার্থভাবে ভগবানকে ভালবাসা। নিজের অন্তরে কতটুকু পবিত্রতা আসিয়াছে, তাহা নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। যখন আমরা ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বসি, দেখিতে পাই যে মুহূর্তকাল পরেই তাঁহার চিন্তার পরিবর্তে অন্য নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা আসিয়া মনকে অধিকার করিয়া বসে। হয়তো উহারা অসৎ চিন্তা নয়, সৎ ও নিঃস্বার্থ চিন্তাই, কিন্তু তবুও এই চিত্তবিক্ষেপ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মন ভগবানে সম্পূর্ণ অনুরক্ত নয় এবং হৃদয় এখনও পবিত্র হয় নাই।

কিসে এরূপ চিত্তবিক্ষেপ হয়? কোন্ চিন্তা আসিয়া মনকে এভাবে জুড়িয়া বসে? উহারা আমাদের এই জীবনের এবং পূর্ব পূর্ব জীবনের চিন্তা

ও কর্মের সংস্কার—যাহা অবচেতন মনে জমা হইয়া থাকে। ঐ সংস্কারগুলিই প্রকট হইয়া আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপ সৃষ্টি করে। মনের এই সব ভাব-তরঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিয়া মনকে ভগবচ্চিন্তায় অবিচলিত রাখিতে হইবে। ঋষি পতঞ্জলি ইহাকেই যোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত পবিত্রতা। ভগবান সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম দেশে অধিষ্ঠিত আছেন। আমাদের মন যখন একটি নিস্তরঙ্গ সরোবরের ন্যায় স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই প্রশান্ত মনে তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হন।

মনকে এইরূপ শান্ত ও চিন্তাতরঙ্গহীন করা ব্যাপারটি কি? উহা মনকে শূন্য ও অচৈতন্য করিয়া ফেলা নয়—যেমন কেহ কেহ মনে করেন। ধরুন, যখন আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন তো আমাদের কোন চিন্তাতরঙ্গ বা জ্ঞান থাকে না। আমরা একেবারেই তখন অচৈতন্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ কি? জাগিয়া উঠিলেই তো আমরা দেখি যে, পুরাতন চিন্তা ও সংস্কারগুলি আমাদিগকে আবার আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছে। পবিত্রতা লাভের জন্য যে মানসিক প্রশান্তি অর্জন করিতে হইবে, তাহা জড় অবস্থা নয়, উহা বরং সর্বোচ্চ ধরনের সক্রিয়তা। মনে করুন, চারিটি বলবান্ ঘোড়া একটি শকটকে দ্রুত পাহাড়ের ঢালুর দিকে নীচে নামাইয়া লইতেছে, এমন সময় চালক শক্ত করিয়া বল্গা টানিয়া ধরিল, এবং ঘোড়াগুলিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অশ্বচালকের মনের এই সক্রিয় অথচ অবিচলিত অবস্থাই প্রকৃত প্রশান্ততা বা যোগ। এরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলে মনের বহুকাল সঞ্চিত যে মলিনতা তাহা ধুইয়া মুছিয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। সেণ্ট্ পল এই সত্যটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"মনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোমরা রূপান্তরিত হও।"

মনকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে চিত্তবিক্ষেপের মূল কারণগুলি কি তাহা বুঝিতে হইবে। যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি এই চিত্তবিক্ষেপের পাঁচটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন,—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা বর্তমান জীবন আঁকড়াইয়া থাকার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা। এই পাঁচটির মধ্যে আবার অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আর সকল কারণের মূল। অজ্ঞান হইতেছে সর্বব্যাপক। শিক্ষিত ও নিরক্ষর সকলের মধ্যেই এই অজ্ঞান বর্তমান। বহু বিষয়ে জানা থাকিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। যখন আমাদের অন্তঃস্থিত প্রকৃত সত্তা—জীবনের পরম ও চরম সত্য—আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়, তখনই আমরা লাভ করি প্রকৃত জ্ঞান।

এই যে সর্বব্যাপী অজ্ঞান বা অবিদ্যা—ইহা প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃত সত্তা ভুলাইয়া দেয়, দ্বিতীয়তঃ উহা প্রকৃত সত্তাকে ঘিরিয়া এমন কতগুলি মায়াবরণের সৃষ্টি করে যাহার কোনও ভিত্তি নাই। পৃথিবীর সকল সত্যদ্রষ্টা সাধু মহাপুরুষ এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, আমাদের প্রকৃত সত্তা মূলতঃ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "আমি ও আমার পরম পিতা পরমেশ্বর এক।" বেদে ঋষিগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"তত্ত্বমসি"; কিন্তু তবুও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না যে, আমরা অমৃতের সন্তান—পূর্ণ ও পবিত্র। অজ্ঞান আমাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া থাকি। অজ্ঞানই আবার আমাদের মধ্যে এক 'অহং' বুদ্ধি সৃষ্টি করে এবং এই অহং বুদ্ধিই আমাদিগকে পরস্পর এবং ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। হিন্দু দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, আমাদের শরীর, মন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি ও বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের প্রকৃত সত্তা হইতে পৃথক, প্রকৃত সত্তার আবরণ মাত্র। আমরা কিন্তু তাহা ধারণা করিতে পারি না, এই সকল আবরণকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া

ভুল করি। 'অহং বুদ্ধি' হইতেই এই শোচনীয় আত্মবিস্মৃতির সৃষ্টি। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের অহং বুদ্ধি বা আত্মাভিমান একেবারেই ভিত্তিহীন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—"যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য। 'আমার' 'আমিত্ব' দূর হলে ভগবান দেখা দেন।" আমরা আত্মবিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কিংবা এই সকলের সমবায় আমরা নই, এই সব আমাদের আবরণ মাত্র; ইহারা পরিবর্তনশীল, কিন্তু উহাদের দ্রষ্টা আমরা অপরিবর্তনীয় জ্ঞানস্বরূপ। ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে ধরিয়া থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গেই আসে অন্যান্য উপসর্গ—আসক্তি, বিরাগ ও এই পার্থিব জীবনের প্রতি ঐকান্তিক তৃষ্ণা।

আসক্তি ও বিরাগের নিদান কি? কোন কোন বস্তু উপভোগ দ্বারা আমরা আনন্দ পাই, সেই সেই বস্তুর প্রতি সেজন্যই আমাদের আসক্তি হয়। আর যে বস্তু হইতে আমরা দুঃখ পাই, স্বভাবতই উহার উপর আমাদের বিরাগ বা বিমুখতা আসে। কিন্তু এই সকল বস্তুর আমাদিগকে সুখ বা দুঃখ দেওয়ার নিজস্ব শক্তি নাই। এই সকল বস্তুদ্বারা আমরা যেভাবে প্রভাবিত হই, তাহার উপরই আমাদের সুখ বা দুঃখ নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে পুরাকালের এক মনোবিজ্ঞানবিদ্ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি সুন্দরী তরুণী তাহার স্বামীকে দেয় আনন্দ, ঈর্ষা জাগায় অন্য তরুণীদের মধ্যে, তাহার ব্যর্থ প্রণয়ীদের অন্তরে উদ্রিক্ত করে দুঃখ, আবার আত্মসংযমী পুরুষের মনে আনে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। একই বস্তু হইতে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়। সুখ বা দুঃখ নির্ভর করে বস্তু এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার উপর।

সর্বশেষে আছে আমাদের এই পার্থিব জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার ঐকান্তিক বাসনা। বুদ্ধদেব ইহাকে বলিয়াছেন তন্‌হা। যীশুখ্রীষ্ট এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যে তাহার জীবন বাঁচাইতে চাহিবে, সেই উহা হারাইবে।" বর্তমান জীবনকে আমরা এতটা ভালবাসি যে, যদি কেহ আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দিতে চায়, তবে সেখান হইতে আমরা সরিয়া আসি। এমন কি তত্ত্বান্বেষী সাধক হইলেও দেখা গিয়াছে যে, যে মুহূর্তে সত্যের দর্শন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে, তখনই যেন তিনি উহা এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যকে যেন আমরা চাহিয়াও চাই না!

মনের উপর এই যে চারিদিক হইতে পুঞ্জীভূত সংস্কারের চাপ—উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? মহামুনি পতঞ্জলি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যই এই উপায়। অভ্যাস দ্বারাই ক্রমে ক্রমে সংস্কারের সৃষ্টি হয়, সুতরাং নূতন অভ্যাসের বলে পূর্ব সংস্কারজনিত মানসিক বিকার হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে। এই ভাবেই আসিবে প্রকৃত পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুভূতি। অজ্ঞানই চিত্তবিক্ষেপের মূলীভূত কারণ। আমাদের অন্তরে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই অজ্ঞান। সুতরাং আমাদিগকে একাগ্র চিত্তে ইষ্ট-চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হইবে। ঈশ্বরকে দেখি নাই—তাঁহাকে চিনিও না, তবু এই বিশ্বাস যেন আমাদের জাগ্রত থাকে যে, তিনিই শাশ্বত সত্য এবং আমাদের অন্তরতম আত্মা।

মনে করা যাক্, একটি টেবিলে একটি কালির পাত্র রহিয়াছে। পাত্রটি টেবিলের সঙ্গে গাঁথা, টেবিল হইতে আলাদা উঠাইয়া কালি ফেলিয়া দেওয়া যায় না। পাত্রের ময়লা কালি পরিষ্কার করিতে হইলে তখন কি করা দরকার? বার বার সেই

পাত্রে ঢালিতে হইবে পরিষ্কার জল। ঐরূপ করিতে করিতে পরে দেখা যাইবে—সেই কালিমাখা পাত্রে পরিষ্কার জল ব্যতীত আর কিছু নাই। সেইরূপ আমাদের পূর্ব সংস্কার দূর করিতে হইলে ভগবৎ চিন্তারূপ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ বিশুদ্ধ জল মনে অবিরাম ধারায় ঢালিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা অবচেতন বা অচেতন মনকে পুনর্জীবিত করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিব। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত—এই চিন্তা আমাদের অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ীভূত করিতে হইবে। প্রারম্ভে এই চিন্তা মুহূর্তমাত্রস্থায়ী হইতে পারে, ক্ষণ পরেই আবার অন্য চিন্তা আসিয়া মনকে জুড়িয়া বসিতে পারে। তখন আবার চেষ্টা করিতে হইবে, এইরূপ বার বার চেষ্টা করিলে মন ক্রমশঃ সংযত হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ আধ্যাত্মিক চিন্তা কিছু কাল অভ্যাস করিয়া তাহা ছাড়িয়া দেয়। ইহা করা উচিত নহে। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত মনকে বার বার সংযত করিতে হইবে, তবেই না অজ্ঞান ও অহংজ্ঞানের মূলীভূত কারণটি উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হইবে। বুঝিতে হইবে শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদি কিছুই আমি নই, এ সকল আমার বাহ্যিক আবরণ মাত্র—ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন ও আমরা তাঁহার সহিত অভিন্ন। এ ভাব দ্বারাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে।

"শুদ্ধ খাদ্যে শুদ্ধ মন হয়, সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ভগবৎ চিন্তা জাগরূক থাকে এবং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়।" শুদ্ধ খাদ্য দ্বারা কেবল আমরা সাধারণতঃ যাহা খাইয়া থাকি তাহাই বুঝায় না, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আমরা দেহের ও মনের জন্য যাহা কিছু নানাদিক হইতে আহরণ করিয়া থাকি সেই সব কিছুকেই বুঝায়। এই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আমাদের শুদ্ধ ভাব আহরণ করিতে হইবে। ভগবান সর্বত্র আছেন, এ সত্য উপলব্ধি করিতে শিখিতে হইবে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থেই ভগবানের অস্তিত্ব বর্তমান—এ বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে।

ঈশ্বর প্রেমময় ও আনন্দের খনি। একাগ্র চিত্তে সর্বদা তাঁহার ধ্যানে আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দ-সুধার স্বাদ পাওয়া যায়, হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত হয়। তখন পার্থিব জীবনভোগের তৃষ্ণা আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া যায় ও এই পৃথিবীতে থাকিয়াই মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। উহাই পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ

(১)

ডক্টর সুদর্শন

[নূতন দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণমিশনে ইন্দোনেশিয়ার ভারতস্থ ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূতের একটি ভাষণ হইতে সঙ্কলিত]

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি তাঁহার The World and the West—'জগৎ ও পাশ্চাত্ত্য' নামক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেন, অপাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে পাশ্চাত্ত্য যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার শতগুণ অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে পাশ্চাত্ত্য তার প্রতি। উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

যখন আমরা জগতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে অপাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের মিলনের কথা ভাবি—তখন দেখি হিন্দু, মুসলমান, চৈনিক, জাপানী, রুশিয়—সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বর্তমান ইতিহাসে পাশ্চাত্ত্যই সর্বত্র প্রথম আক্রমণকারী। রাশিয়া আমাদের স্মরণ করিয়ে

দেয় ১৯৪১, ১৯১৫, ১৮১২ এবং ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিম ইয়োরোপীয় বাহিনীর কথা—পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী—সব দেশই তাদের সৈন্য পরিচালিত করেছে মস্কোর দিকে। অতএব রাশিয়ানরা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিকে এখনও যে সন্দেহের চোখে দেখবে—ইহা স্বাভাবিক। পাশ্চাত্ত্যের দিক থেকে বরাবরই রাশিয়ার উপর একটা চাপ দেওয়া হয়েছে—ইহা প্রবলতর আকার ধারণ করে শিল্প-বিপ্লবের ও আগ্নেয়াস্ত্র-ব্যবহারের সময় থেকে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড যখন মস্কো জয় করে।

পশ্চিমী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্ব

সুইডেনবাসীরাও রাশিয়ায় এসেছিল এই একই উদ্দেশ্যে একই উপায় অবলম্বন করে। তাদেরও অভিযান চলে শক্তিশালী জার পিটার দি গ্রেটের প্রতিরক্ষামূলক বাধাদানের পূর্বপর্যন্ত। তুরস্কে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক এবং মিশরে মহম্মদ আলী পাশা প্রভৃতি নেতারাও জারের স্বদেশ-প্রতিরক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। রাশিয়ায় জার পিটার পাশ্চাত্ত্যের শিল্পোৎকর্ষনীতি গ্রহণ করার ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা উপযুক্ত ও শক্তিশালী হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয়ে। অবস্থা একরূপই থাকত, কিন্তু শিল্পবিজ্ঞানের জয়যাত্রার অগ্রগতিতে অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পোন্নতি ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। এই উন্নতির সঙ্গে তাল রাখতে ও ফাঁক পূরণের জন্য রাশিয়াকে এক নিরঙ্কুশ শাসনের অধীনে সম্মিলিত হতে হল, রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৪১ সালের দুর্বার নাৎসী অভিযান প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করল। কয়েক বৎসর পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা ফেলায় জগদ্বাসী পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে আরও শক্তিমান দেখল। আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষা, প্রতিআক্রমণমূলক দ্বন্দ্ব রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। রাশিয়ার কম্যুনিজম্ গ্রহণের একটি কারণ হল শত্রুর অগ্রগতি-প্রতিরোধ।

বিগত শতাব্দীগুলিতে ভারত

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতেরও দশা ঐরূপ ছিল বলিলেও হয়। পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়েছে, তারা এখানে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মত রাজনৈতিক অত্যাচার অবিচারের বন্যা অবাধগতিতে চালিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার মত ভারতেও রাজনৈতিক ভাঙন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। চারিত্রিক উৎকর্ষহীন স্বার্থপর দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসনের পরিবর্তে শুধু শোষণই করেছে পাশ্চাত্ত্য ঔপনিবেশিকদের ভেদনীতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে। নিজেদের সুখসমৃদ্ধি বাড়ানোই ছিল তাদের একমাত্র কাম্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের ধর্মপ্রচারকগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই ছিল বেশী—এঁরা ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট আধ্যাত্মিক আন্দোলনের হোতাদের পূর্বাচার্য। এই সময় ভারতে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাধি প্রবেশ ক'রে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল। ধর্ম যে ভারতের মেরুদণ্ড—একথা সংস্কারকগণের অনেকেই ভুলে গিয়ে শুধুই সংস্কার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই জন্যই হিন্দুর কৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাসের দিকে মোড় ফিরাবার প্রয়োজন হল।

সৃজনক্ষম শক্তি

ভারতে সৃজনীশক্তির কোনকালে অভাব দেখা যায়নি—এখনও এখানে এ শক্তির অভাব নেই। সত্যই নানাক্ষেত্রে এখানে এখনও অগণিত বিভিন্নমুখী সৃজনী শক্তি কাজ করে চলেছে। এই সমস্ত শক্তির একটি কেন্দ্র হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর আলোক-বর্তিকায় পথ পেয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক জীবনের জয়যাত্রায়। তাঁর পূর্ববর্তী শক্তিমান্ পুরুষ

অনেকে ছিলেন কিন্তু প্রেম ও নিঃস্বার্থতায় এবং ভারতীয় কৃষ্টি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে এই মহাপুরুষের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না।

যাঁরা রামকৃষ্ণমিশনে নিজেদের উৎসর্গ করছেন তাঁর শক্তির প্রকাশ এখনও তাঁদের মধ্য দিয়ে হচ্ছে। তাঁর কাজ সুন্দরভাবে এঁরা করে চলেছেন। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু রেঙ্গুণে রামকৃষ্ণমিশন চিকিৎসালয়ের নূতন একটি শাখার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলেছিলেন—সৎকাজের জন্য প্রচারের প্রয়োজন হয় না। এর জন্য অর্থ আপনাথেকেই আসে—এইকথা রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। বহুসমস্যা-কণ্টকিত বর্তমান জগতে এই ধরণের কাজ সমাদৃত হচ্ছে—ইহা বাস্তবিকই আশার কথা।

এইরূপ বলা হয়-আধুনিক সভ্যতা দয়া, মানবিকতা, বিচারশীলতা, সহিষ্ণুতা, সাম্য এবং প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা সকলেই শান্তি, গণতন্ত্র, ও জনকল্যাণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। পরমত-সহিষ্ণুতা ও সাম্য নিয়েই গণতন্ত্র। ক্ষমতা ও সহনশীলতার বাণী হল শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের ধারণার অতীত ভিন্ন একটি রাজ্যে উচ্চতম স্তরে অবস্থান করলেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সহিষ্ণুতার বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হত। ইহা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন করে।

(২)

ডি সেনানায়ক

[গত বৎসর সিংহলস্থ কাতারাগামা নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন মডম্-(ধর্মশালা) উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সিংহল রাজ্যের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ হইতে সঙ্কলিত]

রামকৃষ্ণ মিশনের একনিষ্ঠ পবিত্র সেবাধর্মের আর একটি নিদর্শন—এই সুন্দর গৃহটির উদ্বোধন করিবার সুযোগ লাভে আমি আজ গৌরবান্বিত। একথা সর্বজনবিদিত যে পার্থিব জীবনে অবসাদপ্রাপ্ত সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী চিত্ত-সান্ত্বনা এবং আধ্যাত্মিক-সহায়তার আকাঙ্ক্ষী হইয়া ভগবান স্কন্দ (কার্তিকেয়)কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে এবং কয়েকজন মহানুভব দাতার বদান্যতায় নির্মিত এই ধর্মশালার সেবা গ্রহণ করিতে এই পবিত্র প্রাচীন স্থানটিতে আসিয়া থাকে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি এবং এই ধর্মস্থানের সংস্কারে যাঁহারা দান করিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রতি আমাদের সকলের কর্তব্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

সহস্র সহস্র মানুষ ধর্ম-শ্রেণী-মতবাদ-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এখানে বন্ধুভাবে এবং সমযোগে আসিতেছে তাহাদের অন্তরের ভক্তি নিবেদনের উদ্দেশ্যে—এই দৃশ্যটিই এই পবিত্র স্থানের একটি অপূর্ব মনোরম বৈশিষ্ট্য। নানা ধর্মের, বিভিন্ন জাতির ও সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপে পরস্পর বন্ধুতা এবং ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে—ইহা যে আমাদের খুবই আনন্দের ও গর্বের বিষয় তাহা যেন আমরা অনুধাবন করি। আমরা সত্য সত্যই বলিতে পারি যে কাতারাগামার সমন্বয়-চেতনা আমাদের সমগ্র দেশের সাধারণ জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং পরীক্ষা আজ জগতকে আঘাত হানিয়া চলিয়াছে, উহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কাতারাগামার এই ঐক্য-চেতনা এবং এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়বাণী আজ আমাদের অমূল্য সম্পদ।

আমাদের চতুর্দিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি মতের অমিল, অনৈক্য, ঘৃণা এবং ঐ অসামঞ্জস্যেরই বহুবিধ প্রকাশ। বিভিন্ন পদার্থে একত্বের অনুভবই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের একটি প্রধান বাণী। দুর্ভাগ্যের বিষয় জগৎ আজ যে রোগে প্রপীড়িত তাহা হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনৈক্যের উপরই ঝোঁক দেওয়া—উহা ধর্মের বিষয়ই হউক,

কিংবা সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সামাজিক বিষয়েই হউক। সর্বাঙ্গীণ সমতা এবং একতার বৃহৎ ক্ষেত্রের দিকে আমাদের যেন লক্ষ্য নাই। অতএব বর্তমান সময়ে জগতে সত্যকার যে বাণীর একান্ত প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশন তাহাই জগতকে দিবার প্রচেষ্টা করিয়া চলিতেছেন। কাতারাগামায় উৎসব-কালেই যে কেবলমাত্র উক্ত বাণীর প্রকাশ দেখা যায় তাহা নহে, উহার স্থায়িত্ব সমভাবে বর্ষব্যাপী বিদ্যমান। সারাবৎসরই বিভিন্ন ধর্মমতের, এবং নানা সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ আসিয়া থাকেন এই পবিত্র স্থানটিতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে। এই মিলনের ভাবটি শক্তির পর শক্তি লাভ করিয়া চলুক এবং উন্নত করুক আমাদের এই পবিত্র দ্বীপটিকে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, ইহার গতি এইখানেই ব্যাহত হইবে না। আমার আশা—ক্ষুদ্র কিন্তু পবিত্র এই দ্বীপটি জগতকে ঐ সমন্বয়ের বাণী দানে সমর্থ হইবে।

(৩)

শ্রীএম্ পতঞ্জলি শাস্ত্রী

(সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি)

[মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণ হইতে সঙ্কলিত]

ধর্ম যে বর্তমানে অনাদৃত হইতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা শ্রীগণেশ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইতে দেখিয়াছি। এইরূপ পরিস্থিতিতে বর্তমান সময়ের শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক ব্যক্ত আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ বহুল প্রচারিত হওয়া উচিত। রামকৃষ্ণ মিশনকে আমি তাঁহাদের সেবামূলক কর্মসূচীর সহিত এই প্রচারের কাজটির দিকেও বেশী জোর দিতে বিশেষ আবেদন করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সমন্বয়ের অবতার। তিনি যথার্থতঃ কিরূপে বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধে বহু বিচিত্র অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলে শুনিয়াছি। তিনি যীশুখ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—ইহা অনুভব করিলেন এবং যিনি ইসলামের একমাত্র পরমেশ্বর তাঁহাকেও তিনি আপন সাধনা দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন ও এইরূপেই অন্যান্য ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার যথাযথ উপলব্ধি হইয়াছিল। সব পথ সেই একই ভগবানে লইয়া যায়—এই উক্তির সত্যতা তিনি আপনার জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"যেরূপে যে জন মম করেন সাধন,
সেরূপে সে জন মম পান দরশন।"

এই সত্যকে কেবল আবৃত্তি করাতে, লোক সমক্ষে যত্র তত্র শুধু প্রচার করাতেই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সাফল্য তাহা নহে, বরং নিজ জীবনে তিনি উহা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির প্রমাণ তিনি নিজেই। এই সত্যটি সকলকে উপলব্ধি ও বাস্তবক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গুলিতে আমরা ধর্মশিক্ষার বিপক্ষে বহু অনুযোগ শুনিয়া থাকি। বলা হয় যে, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। ইহা এই হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ যে, রাষ্ট্রপরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে বা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থ-সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে অন্য ধর্মকে ছোট করিয়া কোন বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া চলিবে না। কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতি, প্রচার বা প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই হিসাবে এই রাষ্ট্র যে ধর্মনিরপেক্ষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের সংবিধানে এই প্রকারের ধর্মশিক্ষা দানের স্থান নাই, কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। যথা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সত্যসমূহ ছাত্রগণকে শিখাইতে কোন বাধা নাই। সেগুলিকে কোন বিশেষ ধর্মমতের বলা যায় না। তিনি নিজে সকল ধর্মের সত্য অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব ছাত্রদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা

সম্বন্ধে বলিলে ধর্ম-সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইতেছে বলা যায় না। আমার মতে, ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিনা বাধায় এরূপ ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়, যে হেতু ইহার ফলে নির্দিষ্ট কোন ধর্মানুসরণকারীদিগের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমাদিগের চারিদিকে ধর্ম ও নাস্তিকতার যে ক্রমবর্ধমান প্রবাহ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার উচ্ছেদ-কল্পে, বিদ্যালয়গুলি তাহাদেরই সুবিধার্থে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষা হইতে উপদেশ দিতে পারেন বলিয়া আমি মনে করি।

পত্র

(১)

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

Paris
July 28, 1908

ভাই শশী,

তোমার ৯ই তারিখের ভালবাসাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তুই ভাই ধন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের শক্তি তোমার ভিতর হইতে প্রকাশ হইতেছে। Bangaloreএ মঠ হইতেছে শুনিয়া কত আনন্দ হইল, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। পূজনীয় মাধব রাওকে আমার যথেষ্ট ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও এবং নারায়ণ আয়েঙ্গার ও ডাক্তার প্রভৃতিকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও। মিস্ গ্লেনের শরীর খারাপ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কি কারণে আমি তাঁহার উপর রুষ্ট হইব, বল। তিনি ঠাকুরের আশ্রিত, ৺ঠাকুর তাঁহাকে যেমন চালাইতেছেন তিনি তেমনি চলিতেছেন, ইহাই আমার বিশ্বাস ও ধারণা। "দোষ ও কারু নয় গো মা।" তাঁহাকে ঠাকুর সৎপথে চালান এবং পরম শান্তিতে রাখুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি তাঁহাকে আমার love and best wishes দিও।

তুমি শুনিয়া থাকিবে যে, Tiger Mahatma চারিমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ হইয়াছে। এই clipping (সংবাদপত্রের অংশ) পাঠে সমস্ত খবর পাইবে। এবং মাদ্রাজে সমস্ত কাগজে ছাপাইয়া দিও যে, উহার সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই ইত্যাদি।

লণ্ডনে Vedanta Society স্থাপিত করিয়াছি এবং এখানেও একটি খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। আগষ্টমাসে নিউইয়র্কে ফিরিয়া যাইব। এই পত্রের উত্তর নিউইয়র্কে পাঠাইও। * * * আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। আমার ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ জানিও এবং আমাকে আশীর্বাদ করিও —ইতি

দাসানুদাস
অভেদানন্দ

(২)

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

Hotel Ste Anne
10, Rue Ste Anne
(Avenue De L' opera)
Paris
April 29th, 1909

ভাই শশী,

আমি তোমার দুইখানা ভালবাসাপূর্ণ চিঠি পাইয়াছি; এইগুলি নিউইয়র্ক হইতে এখানে ফেরত পাঠান হইয়াছে। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ আমি

বক্তৃতা দিতেছি ও ক্লাশ চালাইতেছি। এইসব কাজ বেশ কৃতকার্যতার সহিত চলিতেছে। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ইংরেজীভাষী অনেক ফরাসী ব্যক্তি বেদান্তের শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত। তাঁহারা আমার প্রাণায়াম প্রভৃতির ক্লাশে যোগদান করিতেছেন।

লণ্ডনে আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; আমি এখানে একটু বিশ্রামের জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু লোক আমাকে এত বেশী চায় যে, আমি যেখানেই যাই একেবারেই কোন বিশ্রাম পাই না।

আগামী সপ্তাহে আমি লণ্ডনে যাইব আশা করি; ওখানে আমার বক্তৃতা ও ক্লাশ শেষ করার ইচ্ছা। তারপর নিউইয়র্কে ফিরিয়া যাইব; সেখানে কিছু দিন থাকিব এবং কয়েকটি বক্তৃতাও দিব।

ভাবি, আমার ভাব-অনুসারে কাজ করিবে, আমার অনুগত হইয়া চলিবে এমন দুই তিন জন সাধু যদি পাইতাম!

আমার ক্লাশের একজন ছাত্র আমাদের ঠাকুরের বাণী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে প্রচার করিতেছে। সে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রস্থাপনও করিতেছে।

লণ্ডনে স্থায়ী ভাবে থাকিবে ও আমার উপদেশ অনুসারে চলিবে এমন একজন সাধু আমার নিকট যদি পাঠাইতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে আনন্দের সহিত লণ্ডন বেদান্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিব। কারণ, সব সময় আমি নিজে সেখানে থাকিতে পারিব না। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটী আমাকে চাহিতেছে; যথাসম্ভব সত্বর সেখানে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে।

এখানে আমার ক্লাশের একজন ছাত্রী রহিয়াছে। সে সংসারের সব ত্যাগ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মেয়েটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আশা করা করা যায় সে ব্যাঙ্গালোরের একজন ভাল কর্মী হইবে। তাহাকে বালিকাদের ও অন্যান্য মহিলাদের একজন সুদক্ষ শিক্ষয়িত্রী রূপে লাগানো যাইতে পারে।

আশাকরি তুমি সুস্থ এবং আনন্দেই আছ। আমাদের মহারাজকে আমার ভালবাসা ও দণ্ডবৎ দিবে ও নিজেও তাহা গ্রহণ করিবে। ইতি—

দাসানুদাস
অভেদানন্দ

(৩)

[নিম্নের পত্রখানি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের লিখিত]

২১।৬।১২

পরম কল্যাণবর শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। বাঁচা মরা ভগবানের হাত—মানুষ সহ্য করিতে জন্মিয়াছে—সুতরাং তাহাকে সহিতেই হইবে। অন্নজলের বরাত হইলে পুনরায় তোমাদের ওখানে যাওয়া যাইবে। আপাততঃ কোথাও বাহির হইবার তেমন ইচ্ছা নাই।

জগতে উপদেশ যথেষ্ট হইয়াছে—আর উপদেশে কি হয়, যদি পূর্বজন্মের সুকৃতি এবং ভগবানের কৃপা না থাকে? উপদেশ দেওয়া বড় সহজ কিন্তু পালন করিবার লোক পাওয়া দায়। তাই ঠাকুর বলিতেন "গুরু মিলে লাখ লাখ—চেলা না মিলে এক" অর্থাৎ উপদেশ সকলেই দিতে পারে—পালন করিতে সকলেই নারাজ। যাহা হউক তোমরা ভাল হয়ে দিন দিন উন্নতি কর, ইহা সকলের ইচ্ছা। তোমরা আমাদের ভালবাসাদি জানিবে। এখানকার সকলে ভাল। তোমাদের মঙ্গল সংবাদ মাঝে মাঝে দিও। ইতি—

স্নেহানুরক্ত
সুবোধানন্দ

(৪)

প্রিয়—, ১১।৪।১৩

আজ তোমার পত্র পাইলাম। সুরেন্দ্র বাবু নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ধর্মসম্বন্ধে জানিবার জন্য, শিক্ষা করিবার জন্য তাঁর খুব একাগ্র চিত্ত ছিল; আমি যত তাঁকে দেখিয়াছিলাম বেশ ভালই মনে হইয়াছিল।

ভগবানের ইচ্ছা কখন কাকে কিরকম অবস্থায় রাখিবেন, তিনিই জানেন। সুরেন্দ্র বাবুর মতন লোক বেশী দিন থাকিলে কত লোকের কত উপকার হইত; সৎকার্য করিব, গরীবকে সাহায্য করিব এ ইচ্ছা তাঁর বরাবর ছিল। এখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা তার ছেলেকে তিনিই আশ্রয় দিন এবং তাঁর কাছে কাছে রাখুন।

বিপদে, সম্পদে এক ভগবান ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই; সকল সময় ভগবানকে স্মরণ করিবে, মনের দুঃখ কষ্ট তাঁকেই জানাবে, তিনিই সান্ত্বনা দিবেন। মাতা ঠাকুরানী এখন তাঁর দেশে জয়রামবাটী—সেইখানে শারীরিক ভাল আছেন।

* * *

তোমাদের

স্নেহাধীন

সুবোধানন্দ

কাঁদি

অনিরুদ্ধ

হারায়নি যাহা হারানোর মতো তবুও আড়ালে রহে
সে-ধন বিরহে দু'চোখে আমার নিভৃত-অশ্রু বহে।
সেই প্রিয় লাগি চাহি পশ্চাতে যে-দিন সে কাছে ছিল
চাহি সম্মুখে এই বুঝি আসি হৃদয় পুরিয়া দিল।

স্বজন যাহারা কেহ নয় তবু পথ দিয়া যবে চলে
তাদের বেদনা কেমনে আমারে ভাসায় নয়ন-জলে।
কেমনে তখন ব্যথার সলিলে অহমিকা যায় গলি
নিখিল বিশ্ব পাই তো সমীপে আমারি আপন বলি।

মানুষ যখন স্বার্থ ভুলিয়া মানুষে বাসিল ভালো
জানিনা কখন সে-কথা স্মরণে আঁখিতে বাষ্প এলো।
মানুষের তরে মানুষের দয়া, ক্ষমা ও আত্মদান
যখনি শুনেছি আসিয়াছে বুকে উথল অশ্রু-বান।

দুর্জয় কোন্ লক্ষ্য সাধিতে যাত্রী চলেছে একা
সে যে গো চকিতে দিয়ে গেল মম সিক্ত লোচনে দেখা!
মানুষের মাঝে মানব-অতীত মহিমা যেমনি জাগে
অমনি তো কাঁদি, সে-ই মোর পূজা মানুষের অনুরাগে।

মালদহে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী

শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ পূর্ব পাকিস্তানের পথে গত ২২শে মার্চ মালদহে শুভ পদার্পণ করেন। মালদহের পল্লী-অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং কাটিহার প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক নরনারী মালদহে আগমন করিয়া স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্যলাভ এবং উপদেশাবলী-শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

তিনি সপ্তাহে তিন দিন সান্ধ্য ভজনাদির পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধর্মবিষয়ক ভাষণ দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বেদান্ত, গীতা ও পুরাণ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাবে আগ্রহান্বিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার উপদেশাবলী-শ্রবণে মাতৃজাতির মধ্যেও সমধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

২৪শে মার্চ তাঁহার বক্তৃতার প্রসঙ্গ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। তিনি বলেন, সমগ্র কথামৃত বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে ঠাকুরের দুইটি প্রধান নির্দেশ দেখা যায়: "এগিয়ে পড়ো" এবং "ডুব দাও"। ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত কাঠুরিয়ার গল্প উদ্ধৃত করিয়া বক্তা বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে এবং হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়া অমূল্য আধ্যাত্মিক রত্নরাজি আহরণ করিতে হইবে।

২৮শে এপ্রিলের ভাষণে বক্তা বলেন কথামৃত-কার মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের নিকট চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ঈশ্বরে কিরূপে মন হয়? সংসারে কি ভাবে থাকা কর্তব্য? ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় কিনা? মনের কি অবস্থা হইলে ঈশ্বরদর্শন হয়? সহাধ্যক্ষ মহারাজ এই দিন এবং তাঁহার পরবর্তী ভাষণগুলিতে ক্রমে ক্রমে ঠাকুর এই প্রশ্নগুলির যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত্যভিমান প্রভৃতি অষ্টপাশ সংসারী জীবকে বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অহঙ্কার আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের পথে একটা একান্ত প্রতিবন্ধক। অষ্টপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে তবেই শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। পঞ্চবটীতে ঠাকুর বস্ত্র ও উপবীত ত্যাগ করিয়া বালকভাব লইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। যীশুখ্রীষ্টও বলিয়াছেন "Except ye be converted and become as little children ye cannot enter into the kingdom of heaven"..."The kingdom of heaven is revealed unto the babes but is hidden from the wise and the prudent."

২রা এপ্রিলের ভাষণে পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন—মন স্বভাবতই চঞ্চল। গীতায় শ্রীভগবান মনকে চারটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—চঞ্চল, প্রমাথী, বলবৎ এবং দৃঢ়। বাসনামদিরা-পানে এই চাঞ্চল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। মনের অবস্থা আচার্য বিবেকানন্দ-বর্ণিত সেই ভূতাবিষ্ট বানরের মতো যাহাকে একই কালে কতকটা সুরাপান করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহার লাঙ্গুলে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। গীতা এবং সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে আয়ত্তে আনয়ন করিতে হয়। নিত্য একটা জিনিস সাধন করিলে অভ্যাস হয়। বৈরাগ্যের অর্থ ভোগবাসনায় বিতৃষ্ণা। সমস্ত বিষয়েই সাধন প্রয়োজন। যন্ সাধন্ তন্ সিদ্ধি। পুরুষকার (অভ্যাস এবং সাধন), দেব

(ঈশ্বরের কৃপা) এবং কাল (সময়)—এই তিনটি যখন একই সঙ্গে অনুকূল মূর্তিতে উপস্থিত হয় তখনই সিদ্ধিলাভ ঘটে। তবে প্রথমে পুরুষকারের বিশেষ প্রয়োজন

আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, জগতে এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় বড় দুর্লভ—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষসংসর্গ। অত্যল্প কাল মাত্র বশিষ্ঠের সান্নিধ্যলাভের ফলে অভিমানী বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা ও দয়া শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় হইতে ব্রহ্মর্ষিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। বক্তা সাধুসঙ্গ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সাধুসঙ্গ করিলে ঈশ্বরে মন ও শ্রদ্ধা হয়।

৪ঠা এপ্রিলের ভাষণে সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন, ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, ধর্ম আস্বাদনের বস্তু। অনুভূতি না থাকিলে ধর্ম শুষ্ক হইত। কেবলমাত্র শাস্ত্রাদি-অধ্যয়নে ধর্ম বুঝা যায় না। মৈত্রেয়ী উপনিষদে তাহা তীর হইতে জলে প্রতিবিম্বিত ফল-সম্ভোগের সহিত তুলিত হইয়াছে।

ঈশ্বর অনন্ত, সুতরাং সাধক অনন্ত এবং ঈশ্বরলাভের পথও অনন্ত। ঠাকুরের সাধনান্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট ছুটিতেন এবং তাঁহার অনুভূতির বিষয়-শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। সত্য এক, কিন্তু সেই একই সত্যকে এত বিবিধভাবে দর্শন এবং অনুভূতি ঠাকুর ব্যতীত আর কোনো ধর্মাচার্য এ পর্যন্ত করেন নাই। তাঁহার বিচিত্র প্রত্যক্ষানুভূতির সম্মুখে সম্প্রদায়গত বাদবিসংবাদ স্তব্ধ হইত। তিনি সমগ্র হস্তীটাকে দেখিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি জগদ্‌গুরু। যে কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাইত, ঠাকুর তাহাকে তাহার নিজ ধর্মের রঙে রাঙাইয়া দিতেন।

পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, ভোগের মধ্য দিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। নবযুগে ঠাকুর-স্বামীজী সেই একই অমৃতত্বের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ত্যাগের পথ। আমরা খাপ-খাওয়ানোর—compromiseএর চেষ্টা করি, কিন্তু তাহাতে কার্যোদ্ধার হয় না।

১১ই এপ্রিল সহাধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন:—মার অহৈতুকী ভালবাসা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। তিনি শ্রীজয়রামবাটীতে প্রথম মার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎমাত্রই করুণাময়ী সম্পূর্ণ অপরিচিত তাঁহাকে অজস্র স্নেহবর্ষণে যে ভাবে কৃতার্থ করিয়াছিলেন বক্তা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থানকালে সমাধিস্থা শ্রীমা একদিন বরাভয়করা মূর্তিতে দক্ষিণদেশীয় দর্শনার্থীদের কৃপা করিয়াছিলেন। বক্তা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় ভাষায় কথা বলিতে পারেন না বলিয়া শ্রীমা খেদপ্রকাশ করেন। কিন্তু তথাকার ভক্তগণ তাঁহার দর্শনমাত্রেই কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন—ঠাকুর শ্রীমার সহিত তিনটি ভাবে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভাব—শ্রীমা পতিব্রতা স্ত্রী। দ্বিতীয় ভাব—মা অনুগতা শিষ্যা। ঠাকুর তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রগতি-সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। তৃতীয় ভাব—মা সাক্ষাৎ জগদম্বা, ঠাকুরের ইষ্ট। আবার এই ভাবেই ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন—সম্প্রতি নহবতে, তুমি আমার সেই মা আনন্দময়ী।" আবার শ্রীমা ঠাকুরকে তিন ভাবে দেখিতেন। ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যখন লীলাসংবরণ করেন তখন "মা কালী, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলে গো" বলিয়া মা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এইটি প্রথম ভাব। মার দ্বিতীয় ভাব—ঠাকুর তাঁহার গুরু। তৃতীয় ভাব—মা ঠাকুরের পতিব্রতা সহধর্মিণী। সংসার-রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর এবং মার এই অভিনয় কামগন্ধহীন, একান্ত নিঃস্বার্থ

এবং অভূতপূর্ব। এমন নিখুঁত অভিনয় অদ্যাপি আর হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে কিনা বলা যায় না।

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর চৌত্রিশ বৎসর বিশ্বজননীরূপে মা রঙ্গমঞ্চে অবস্থান করত ঠাকুরেরই কাজ করিয়া গিয়াছেন। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে তিনি বিশ্বের অগণিত নরনারীর সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

উপসংহারে সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন—এখন ঠাকুর ও মায়ের যুগ। আমাদের সেই ভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে। মায়ের একটি উপদেশ তিনি প্রত্যহ চিন্তা করেন। লীলাসংবরণের পূর্বে অন্নপূর্ণার-মা নাম্নী একটি ভক্ত মেয়েকে শ্রীমা বলিয়াছিলেন, "যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"

বিশ্বজননীর এই মহান্ অন্তিম উপদেশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন: নিম্ব-বৃক্ষের সকলই তিক্ত, কিন্তু মৌমাছি নিমফুল হইতেও কিঞ্চিৎ মধু আহরণ করিয়া লয়। তেমনি, সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে বটে, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান এবং প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় সত্তা বর্তমান জানিয়া সকলকেই আপনার জ্ঞান করিতে হইবে।

* * *

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের ইহা মালদহে দ্বিতীয় শুভাগমন।

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীতারকনাথ রায়

[কর্মজীবনে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে জেলাশাসক, ৭৬ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ লেখকের বহু পত্রিকায় প্রকাশিত দার্শনিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর সহিত বাঙলার পাঠকসমাজ সুপরিচিত। "পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস" (তিন খণ্ড) তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে।—উঃ সঃ]

জীবন সায়াহ্নে উপনীত হইয়া যখনই অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই একটি দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আবির্ভূত হয়। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দের চরণ তলে উপবিষ্ট হইয়া এক ঘণ্টার অধিককাল তাঁহার অমৃতায়মান বচন-রাজি শুনিবার সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম।

১৮৯৯ সালের কথা। তিন বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ সালে এন্ট্রেন্স্ পাস করিয়া কলেজে পড়িতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। সিকাগো ধর্মসভায় এক অখ্যাত অজ্ঞাত হিন্দু সন্ন্যাসীর বিজয়বার্তা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। তারপরে সমগ্র আমেরিকায় স্বামীজীর বিপুল অভ্যর্থনার সংবাদও ভারতের সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এক দিন সংবাদ আসিল, স্বামীজী দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মাদ্রাজ ও কলিকাতায় আয়োজন হইতে লাগিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক অথবা সভাপতি হইয়াছিলেন। যে দিন স্বামীজী শিয়ালদহ আসিয়া পৌছেন, সে দিন দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়াছিল। আমিও গিয়াছিলাম। এক সুশোভিত গাড়ীতে স্বামীজীকে উঠাইয়া কয়েকজন উৎসাহী

যুবক গাড়ী টানিয়া লইতেছিলেন। স্বামীজী গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া যুক্তকরে উভয় পার্শ্বের অগণিত জনসংঘের অভ্যর্থনা স্বীকার করিতেছিলেন। দেখিলাম, হ্যারিসন রোডের উপরের এক দ্বিতল গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক জটাধারী সন্ন্যাসী উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া স্বামীজীকে আশীর্বাদ করিলেন; এবং স্বামীজী তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, জটাধারী শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ইহার পরে শোভাবাজার রাজবাটীতে যে বিরাট জনসভায় স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু দূর হইতে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই। ষ্টার থিয়েটারে ও আরও দুই এক স্থলে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু ভাল বুঝিতে পারি নাই। দক্ষিণেশ্বরে এক উৎসবে গিয়া স্বামীজী স্বহস্তে সাধু সন্ন্যাসীদিগকে খাওয়াইতেছেন, দেখিয়াছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর সহিত কথা বলিবার সুযোগ কোথাও পাই নাই।

সে সুযোগ পাইয়াছিলাম দেওঘরে। ১৮৯৯ সালে বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দেওঘরে গিয়া শুনিলাম স্বামীজী তখন তথায় অবস্থান করিতেছেন। একদিন সকালে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম, দ্বিতলে বসিয়া কে উদাত্ত স্বরে গীতা পাঠ করিতেছেন। নিম্নে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী খড়ম পায়ে নামিয়া আসিলেন। ক্ষণকাল অপলক নয়নে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে আছে, বঙ্গবাসী পত্রিকায় স্বামীজীকে অহিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শাস্ত্রবচন উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি শূদ্র হইয়াও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সমুদ্রপারে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিয়া অহিন্দু-স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, 'বঙ্গবাসী' তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। পড়িয়া স্বামীজীর হিন্দুত্ব-সম্বন্ধে আমার মনেও সন্দেহ জাগিয়াছিল। কিন্তু সেই প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে চাহিবামাত্র সমস্ত সংশয় অপনীত হইল। মনে হইল আর্যসংস্কৃতি তাঁহার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম, এবং আদিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলাম।

কি বলিব ভাবিতেছি। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য এসেছ?" বলিলাম, "চরণ দর্শন কর্তে এসেছি।" স্মিত মুখে বলিলেন, "আর কিছু নয়?" কি বলিব? বলিলাম, "আপনার মুখে কিছু শুনিব ইচ্ছা আছে।" তখন নূতন দর্শন-শাস্ত্র পড়িতেছি। স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কাহাকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন?" হেগেলের দর্শন তখন আমাদের দেশের দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, স্বামীজী হেগেলের নাম করিবেন। কিন্তু তিনি স্পিনোজাকে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন। স্পিনোজাও অদ্বৈতবাদী কিন্তু মায়াবাদী নহেন। জগৎ তাঁহার নিকট মায়া নহে, সত্য। স্বামীজীও জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই।

আর একটি প্রশ্ন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। না করিলেই ভাল করিতাম। কেননা, প্রশ্নটি করিবামাত্র স্বামীজীর মুখে বিরক্তির আভাস দেখিতে পাইয়াছিলাম। অবতারবাদের কোনও সুসংগত দার্শনিক ব্যাখ্যা আমি দেখিতে পাই নাই। যাঁহার ইচ্ছা ও বাস্তবের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, যাঁহার ইচ্ছাই রূপগ্রহণ করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, সমগ্র বিশ্বই যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ, কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার এক বিশিষ্ট নররূপ ধারণ কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমি কখনই বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা

করিলাম, "পরমহংসদেবকে আপনি কি অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন ?" বলিলেন, "বিশ্বাস করিতে বাধা কোথায় ? শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তো কত বিশ্রী কাহিনী বর্ণিত আছে। তাহা সত্ত্বেও তো তাঁহাকে আমরা অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি। আর এই নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র চিরব্রহ্মচারী, নিরক্ষর অথচ সর্বশাস্ত্র পারদর্শী করুণাময় ব্রাহ্মণকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা কোথায় ?" বাধা ছিল আমার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণায়। কিন্তু আমি তাহা বলিলাম না।

ইহার পরে আমি আর কিছু বলি নাই। স্বামীজী তাঁহার ইয়োরোপের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কত বড় জাতি আমেরিকানরা, কত বড় ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মানরা। আমরা তাদের তুলনায় কত ছোট। কত ভালবাসে তারা তাদের দেশকে ও জাতিকে! আর আমরা? সঙ্কীর্ণমনা, আত্মসর্বস্ব আমরা দেশের জন্যে এ পর্যন্ত কতটুকু স্বার্থ বিসর্জন করিয়াছি ? জ্ঞানবিজ্ঞানে তারা কত উন্নত। আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি। কিন্তু চিরদিন আমরা এরূপ ছিলাম না। পূর্বে পরের নিকট হইতে আমরা যতটুকু গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আমরা জগৎকে দিয়াছি। এক সময় আমরা জগতের গুরু ছিলাম। আবার জগতের গুরু আমরা হইব। তাহাই ভারতের নিয়তি। চিরকাল ভারত বিদেশীর পদানত হইয়া থাকিবে না, তাহা তাহার নিয়তি নহে। গত গৌরবের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে। ইংরেজ তাহার সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। কিন্তু আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি চিরকাল চাপা থাকিবে না। ইংরেজী ভাষা চিরকাল ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা থাকিবে না। সংস্কৃত আমাদের জাতীয় ভাষা, তাহাই রাষ্ট্রভাষা ও lingua franca হইবে। কে বলে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন ? আমার ইচ্ছা আছে কয়েক-খানা সংস্কৃত প্রাইমার লিখিব। কত সহজে সংস্কৃত শিখিতে পারা যায়, তাহা আমি দেখাইয়া দিব। "যথা গোমুখীর মুখ হইতে নিঃস্বনে ঝরে পূত বারিধারা"—আমি সেই পূত বচনধারায় ডুবিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ তিনি থামিলেন। আমিও বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার পরে আর তাঁহাকে দেখি নাই।

সন্ন্যাসী স্বামীজী আমাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ দেন নাই, বেদান্ত অথবা রাজযোগ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। এক ঘণ্টা ধরিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে তিনি কি ভাবে পুনর্গঠিত করিতে চান, আমার মনে তাহার একটি ধারণা উৎপন্ন করা। স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসম্মানগর্বী ভারত তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তাঁহার স্বপ্ন তাঁহার সাধনার ফল তাঁহার তিরোধানের পরে অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজ-পৎ রায়, বাংলায় অরবিন্দ তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বপ্ন অর্ধেক বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির সমগ্র উদ্ধার এখনও হয় নাই। যত দিন তাহা না হইবে, ততদিন স্বাধীনতার স্থায়িত্ব সংশয়ের অতীত হইবে না

"জগতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি হইয়া গিয়াছে। আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের সেই মহাসম্রাট অশোক, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পাঞ্জাবী সুফী কবি বুল্ল্‌হে শাহ্‌

[অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্‌-এ]

বুল্ল্‌হে শাহ্‌ শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী সুফী কবিদের অন্যতম। বস্তুতঃ তিনি সুফী কাব্য-জগতের একজন প্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহাকে অনেক সময় ভারতের মৌলানা রুমী বলিয়া অভিহিত করা হয়। বুল্ল্‌হে শাহ্‌ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের অন্তর্গত কসুরের পণ্দোকী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও একজন ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু সৈয়দ বংশোদ্ভূত তাঁহার পরিবারটি ছিল বিশেষ গোঁড়া। বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ধর্মপ্রবণ বুল্ল্‌হে নিজ জন্মভূমিতে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া একজন উপযুক্ত ধর্ম-গুরুর অন্বেষণে লাহোর গমন করেন। শীঘ্রই তথায় প্রসিদ্ধ সুফী অরাঈঁ ইনায়ৎ শাহ্‌র সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অরাঈঁ অর্থ বাগানের মালী; এবং ঈনায়ৎ শাহ্‌ ছিলেন জাতিতে মালী। বাগানের কাজে লিপ্ত ইনায়ৎ শাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ক কিছু উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি বুল্লহেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

বুল্ল্‌হিআ রব্ব্‌ দা পান্‌ অই ;
এধরোঁ পুটটণ্‌ ও ধরোঁ লান্‌ হই।

[হে বুল্ল্‌হে, ইহাই ভগবৎ-রহস্য যে, তিনি এখানে বিনাশ করিতেছেন, (আর) তথায় সৃজন করিতেছেন।]

কথিত আছে এই কথা বুল্ল্‌হেকে এতই মুগ্ধ করিল যে, তিনি তাঁহার সকল বংশ-মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া বাগানের মালী বংশোদ্ভূত ইনায়ৎ-কে তাঁহার মুর্‌সিদ্‌ বা ধর্মগুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন।

আবার, এরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে যে, ভ্রমণ উদ্দেশ্যে লাহোর পৌঁছিয়া এক গ্রীষ্মের রৌদ্রে বুল্ল্‌হে কোন আম্রকাননে ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। বৃক্ষের পাকা ফল বুল্ল্‌হের মনে ইহাদের স্বাদ গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু কাহাকেও তথায় দেখিতে না পাইয়া, চুরির অপরাধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নিষ্ঠাবান্‌ বুল্ল্‌হে হঠযোগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তিনি ফলগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া, 'আল্লাহ্‌ ঘনী' (অর্থাৎ ভগবান্‌ অদ্বিতীয় ও মহান্‌)-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; আর একটি একটি করিয়া পাকা ফল তাঁহার হস্তে আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। তৎপর বুল্ল্‌হে ফলগুলি একত্র জড়ো করিয়া নিকটেই কোন স্থানে বসিয়া মনের আনন্দে সেইগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাগানের মালী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মালী আর কেহ নহে, সেই প্রসিদ্ধ সুফী ইনায়ৎ শাহ্‌। মালী তাঁহাকে চোর বলিয়া দোষারোপ করিলে, বুল্ল্‌হে তাঁহাকে সঠিক জানিতে না পারিয়া, তাঁহার নিকট নিজের হঠযোগ ক্ষমতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুবক হঠযোগী যখন দেখিলেন যে, সেই বৃদ্ধ মালী তাঁহার যোগ-ক্ষমতায় আশ্চর্যান্বিত না হইয়া বরং স্মিতহাস্য করিতেছেন, তিনি কতকটা অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তখন ইনায়ৎ শাহ বলিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ ঠিকমত হয় নাই বলিয়াই, যোগ-ক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই বলিয়া তিনি সেই একই মন্ত্র একবার উচ্চারণ করা মাত্র বৃক্ষের সকল ফল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করায় ফলগুলি পুনরায় যথাস্থানে চলিয়া গেল। প্রথম দৃষ্টিতে যাঁহাকে একজন সাধারণ মালী বলিয়া অনুমান

করিয়াছিলেন, তাঁহার এই আশ্চর্য ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার প্রতি বুল্ল্হের মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বুল্লহে ইনায়ৎ শাহ্র একজন পরমভক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু বুল্লহে-র এই সুফীমতে দীক্ষাগ্রহণে তাঁহার পরিবারবর্গ মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, তাঁহার এক ভগিনী ছাড়া তাঁহার পরিবারের সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এই প্রিয়তমা ভগিনী তাঁহার আজীবন সহচরী ছিলেন। বস্তুতঃ এই ভগিনী ইনায়ৎ শাহকে কতকটা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার আদরের ভাইকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ ইনায়ৎ শাহকে একজন সাধারণ মালী বলিয়াই মনে করিতেন।

তাঁহার পরিবার হইতে পরিত্যক্ত হইয়া বুল্লহে তাঁহার গুরুর সহিত লাহোরেই বসবাস করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার নিকট হইতে সকল ভগবৎ-রহস্য অবগত হইয়া একজন পরম জ্ঞানী ও ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার কাব্য হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে তাঁহার এই নূতন ধর্মজীবনের প্রথম ভাগে এই ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুর প্রতি বুল্ল্হে-র একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাকে এই পথ হইতে বিচলিত হইতে দেয় নাই। বুল্ল্হে নিজেই গাহিয়াছেন—

বুল্ল্হে নূঁ সম্ঝাবন্ আঈয়াঁ ভইনাঁ তে ভরজাঈয়াঁ ;
আল্ নবী অউলাদ্' অলী দী বুল্লহিআ তূঁ কী লিকাঁ লাঈয়াঁ ;
মন্ন্ লই বুল্ল্হিআ সাডা কহ্না ছড্ড্ দে পল্লা-রাঈয়া।

[ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূগণ বুল্ল্হের নিকট আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, হে বুল্ল্হে তুমি পয়গম্বর ও আলীর বংশোদ্ভূত পরিবারকে কেন কলঙ্কিত করিলে ? হে বুল্ল্হে, তুমি আমাদের কথা মন দিয়া শুন, এবং অরাঈ-এর আশ্রয় ত্যাগ কর।]

আর ইহার প্রত্যুত্তরে বুল্ল্হের উদ্দীপ্ত বাণী শুনিতে পাই—

জেহ্ড়া সানূ সৈয়দ্ আক্খে দোজ্খ মিলন্ সজাঈয়াঁ ;
জেহ্ড়া সানূ রাঈ আক্খে বহীস্তী পীঁগাঁ পাঈয়া ;
জে তূঁ লোড়েঁ বাঘ বহারাঁ বুল্ল্হিআ তালিব হোজা রাঈয়াঁ।

[যে আমাকে সৈয়দ বলিয়া সম্বোধন করে, সে নরক-শাস্তি প্রাপ্ত হইবে ; (আর) যে আমাকে মালী বলিয়া সম্বোধন করিবে, সে তাহার স্বর্গে (উড়িয়া যাইবার) পাখা প্রাপ্ত হইবে। হে বুল্ল্হে, যদি তুমি (ভগবৎ-) বাগানের আনন্দ পাইতে চাও, তাহা হইলে অরাঈ (মালীর) অনুসরণকারী হও।]

কাদিরী সম্প্রদায়ভুক্ত বুল্ল্হের ধর্মগুরু হজরৎ শেখ মহম্মদ ইনায়ৎ উল্লা একজন প্রসিদ্ধ সুফী ব্যক্তি ছিলেন। অরাঈ বংশোদ্ভূত ভারতীয় মুসলমান বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদের নিকট ইনায়ৎ শাহ-পরিবার কতকটা হেয় বলিয়া গৃহীত হইলেও, তিনি কিন্তু একজন বিশেষ ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইনায়ৎ শাহ মুঘল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক ও প্রসিদ্ধ সুফী মহম্মদ আলী রজা শত্তারীর শিষ্য ছিলেন। কয়েকটি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক ফারসী গ্রন্থ ছাড়া, তাঁহার একটি কোরানের টীকারও উল্লেখ আছে।

ইনায়ৎ শাহ-র শিক্ষার মধ্য দিয়া ভগবৎ-উপলব্ধি লাভ করিয়া বুল্ল্হে ইস্লাম ধর্মের সাধারণ

ধর্মনীতি অবমাননা করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনকার সময় ছিল ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। তাই ইনায়ৎ শাহ হকীকৎ (বা ভগবৎ-উপলব্ধি)-র স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া ও ত্বরীকৎ পথে (সুফীমতে ভগবৎ-উপলব্ধির প্রথম সোপান) নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রকাশিত হইতেই চাহিতেন। কিন্তু সেই উপদেশের মর্ম সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বুল্ল্‌হে গাহিতেছেন

বুল্ল্‌হে নূঁ লোক্ মত্তী দেঁ দে বুল্লহা তূঁ জা বৈহ মসীতী ;
বিচ্‌চ্‌ মসীতাঁ দে কীহ্‌ কুঝ্‌ হুন্দা জো দিলোঁ নমাজ্‌ না কীত্তী ;
বাহরোঁ পাক্ কীত্তে কীহ্‌ হুন্দা জো অন্দরোঁ গঈ না পলীতী ;
বিন্ মুর্শিদ্ কামিল্ বুল্ল্‌হিআ তেরী অইঁবেঁ গঈ ইবাদৎ কীত্তী ;
ভংঠ্‌ নমাজ্‌াঁ তে চিক্কড়্‌ রোজে কল্‌মে তে ফির্ গঈ সিআহী ;
বুল্লহা শাহ সৌহ অন্দরো মিলিআ ভুল্লী ফিরে লুকাঈ।

[বুল্লহে-কে লোকে উপদেশ দেয়, হে বুল্লহে, তুমি মস্‌জিদে গিয়া বস। (কিন্তু) মসজিদে গিয়া কি লাভ হইবে, যদি মন নমাজ (বা প্রার্থনা) না করে? বাহ্যিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া কি লাভ, যদি অন্তর হইতে অপবিত্রতা দূর না হয়? হে বুল্লহে, প্রকৃত গুরু ছাড়া তোমার প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। (সকল) প্রার্থনা-আগুনে, (এবং) সকল উপবাস কাদায় (নিক্ষেপ কর); (কারণ এই মিথ্যা আড়ম্বর পূর্ণ) কোরানের বাণী কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। বুল্লহে শাহ বলে, অন্তর হইতে তাঁহার দর্শন হয়, কিন্তু লোকে অন্যত্র খুঁজিতেছে।]

এই সকল যুক্তি সত্য হইলেও, গুরু ইনায়ৎ শাহ শিষ্য বুল্লহের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কারণ এই গোঁড়ামির জগতে এইসব উক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল কি, তাহা তিনি নিশ্চিত ভাবেই জানিতেন। শীঘ্রই বুল্ল্‌হে-ও তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, এবং গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্যে ইনায়ৎ শাহ-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

বৎ না কর্‌সাঁ মান্ রঝেঁটে ইয়ার দা বে অড়িআ ;
অজ্জজোকড়ী রাৎ মেরে ঘর রহীঁ খাঁ বে অড়িআ ;
দিল্ দিআঁ ঘুন্‌টিআঁ খোল্ অসাঁ নাল্ হসস্‌ খাঁ বে অড়িআ।

[হে বন্ধু, আর কখনো আমি আমার প্রিয়তম রাঁঝা (অর্থাৎ পঞ্জাবী কবিদের প্রেমময় ভগবানের প্রতীক)-র অহঙ্কার করিব না। হে বন্ধু, আজ রাত্রের জন্য আমার ঘরে অবস্থান কর (এবং) তোমার মন হইতে সকল সন্দেহ দূর করিয়া আমার সহিত একটু আনন্দ কর।]

কারণ, এখন বুল্লহে সত্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রেম স্বর্গীয়, সাধারণ মানুষ ইহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না (ইশক্ আল্লাহ্‌ দী জাৎ, লোকাঁ দা মেহ্‌ণা)।

কথিত আছে, ইনায়ৎ শাহ তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া বুল্ল্‌হে-কে আবার তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং বুল্ল্‌হে সেই দিন হইতে তাঁহার গুরুর শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে লাহোরে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

পাঞ্জাবী সুফী জীবন কাহিনীর (Punjabi Sufi Poets) গ্রন্থকার বুল্ল্‌হে শার জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমভাগ কবির শিক্ষা-দীক্ষার কাল। এই সময়ে কবি সুফী মতে দীক্ষিত হইলেও, তিনি শরিয়ৎ বা ইস্‌লাম ধর্মের ব্যবহারিক আইন-কানুন কখনও বিস্মৃত হন নাই।

তিনি তখন ইসলামীয় বেহেশত, দোজখ্ বা কিয়ামৎ (বা পুনরুত্থান) প্রভৃতিতে আস্থাবান এবং নমাজ্, রোজা প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম সম্বন্ধীয় রীতি নীতি মানিয়া চলিতে বিশেষ আগ্রহশীল। তাঁহার মধ্যে পাপ-পুণ্যের অন্তর্দাহ তখনো বিদ্যমান। মৃত্যু-ভয় থাকার জন্য সুখ-দুঃখকে তিনি এখনো অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি গাহিতেছেন—

ইক্‌ক্ রোজ. জাহানোঁ জাণা হৈ ;
জা কবরে বিচ্‌চ্ সমাণা হৈ।
তেরা ঘোশ্‌ৎ কীড়ি অাঁ খানা হৈ ;
কর্ চেৎতা মনো বিসার নহীঁ ;
উট্‌ঠ্ জাগ্ ঘুরাড়ে মার্ নহীঁ।

[একদিন তোমার এই পৃথিবী হইতে যাইতেই হইবে এবং কবরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। (তখন) তোমার মাংস কীটে খাইয়া নষ্ট করিবে। হে মন. ইহা বিস্মরণ করিও না। উঠ, জাগ; আর ঘুমে অচেতন থাকিও না।]

তিনি এখনো ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না যে, এই জীবন বস্তুতঃ নশ্বর নহে এবং ক্রম-পরিবর্তনশীল দেহ ও মন জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া ক্রমে সেই পরম ধনকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিতই একাত্মবোধ প্রাপ্ত হইবে। তাই তিনি গাহিয়াছেন,

তুঁ এস্ জহানোঁ জায়ঁগী, ফির্ কদম্ না এহ্ৎথে পায়ঁগী ;
এহ্ জোবন্ রূপ্ বঞ্জায়ঁগী, তঙ্গঁ রহিণা বিচ্‌চ্ নহীঁ।

[তোমাকে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে, তুমি আবার এখানে পদার্পণ করিতে পারিবে না। তোমার যৌবন ও রূপ (ক্রমে) বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (বস্তুতঃ) তুমি এই সংসারে অবস্থান করিবার জন্য নও।]

কিন্তু এইরূপ মনের অবস্থা বুল্লহের বেশী দিন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ শরিয়তী চিন্তাধারা তাঁহার কাব্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। শীঘ্রই তিনি ভারতীয় বেদান্তবাদ ও বৈষ্ণবধর্মে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন। গুরু ও ভগবৎরূপে তিনি কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া তাঁহার জীবনের এই দ্বিতীয় স্তরে তিনিও ভারতীয় বৈষ্ণবদের ন্যায় বলিতেছেন,

ইশ্‌ক্ অন্ধেরী কোঠরী দুজা দীবা না বাটী ;
বাহোঁ ফড়্ কে লই চলে শাম্‌বে কোঈ সঙ্গ না সাথী।

[হে শ্যাম, দীপশিখা বা দীপাধার-হীন (নিরাশ) এই গৃহে (পৃথিবীতে) তাহারা (অর্থাৎ দুষ্কর্ম) এই সঙ্গীসাথীহীনকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে।]

এখনে কবি তাঁহার মুর্শিদকে বৈষ্ণবদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে শ্যাম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বৈষ্ণবদের ন্যায় তাঁহার নিকট গুরু ও ভগবান অভেদাত্মা। তাই তাঁহার গুরু বা সেই পরম রূপকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন,

পহিলী পৌড়ী প্রেম্ দী পুল্‌সরাতে ডেরা ;
হাজী মক্কে হজ্জ্ করন্ মঈঁ মুখ্ দেখা তেরা ;
আঈঁ ইনায়থ কাদিরী হৎথ্ পকড়ী মেরা ;

মঙ্গঁ উডীকাঁ কর্ রহী কদী অ কর্ ডেরা ;
ঢুণ্ড্. শহির্ সভ্. ভালিয়া কাসদ্ ঘল্লাঁ কেহ্ড়া ;
চঢ়ী আঁ ডোলী প্রেম্দী দিল্ ধড়কে মেরা ;
আও ইনায়ৎ কাদিরী জী চাহে মেরা।

[প্রেমের প্রথম সোপান পুল্সরাৎ (কোরানের প্রথম অধ্যায়ের সিরাতুল্-মুস্তকীম্ বা হিন্দুদের বৈতরিণীর খেয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে) এ দাঁড়ান অবস্থার ন্যায়। হাজী মক্কায় হজ করে, কিন্তু আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি ; হে ইনায়ৎ কাদিরী, তুমি আমার হাত ধর। আমি তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছি ; তুমি (অন্ততঃ) কিছুকালের জন্য আমার সহিত অবস্থান কর। আমি সমস্ত শহর ঘুরিয়াছি, কোন্ সংবাদ-বাহককে তোমার নিকট প্রেরণ করিব ? প্রেমের ডুলিতে চড়িয়া আমার মন (এখন) দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতেছে। হে ইনায়ৎ কাদিরী, তুমি এস, তোমাকেই (কেবল) আমার মন চাহিতেছে।]

বুল্লহে তাঁহার জীবনের এই দ্বিতীয় স্তরে ভগবানের স্বরূপ এখনো সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি এখনো তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াই বেড়াইতেছেন, এবং সময় সময় হয়তো তাঁহার উপলব্ধিও লাভ করিতেছেন ; কিন্তু এই ফনা বা আত্মোপলব্ধি ক্ষনিক। কবি গাহিয়াছেন,

হুণ মঙ্গঁ লক্খিআ সোহণা ইয়ার, জিস্দে হুসন্ দা গরম্ বজার্ ;
জদ্ অহদ্ ইক্ক্ ইক্কলা, সী না জাহর্ কোই তজল্লাসী ;
না রব্ব রস্থল্ না অল্লাহ্. সী না জবার্ কহার্ ;
বেচুঁ ব বচগুনা সী বে শুবহা বে নমুনা সী ;
না কোই রং নমুনা সী, হুণ্. গুনাগুঁ হজার্।

[এখন আমি আমার শোভন বন্ধুকে দেখিয়াছি, যাঁহার সৌন্দর্যে বাজার ভরপুর। যখন সেই তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাঁহার কোন প্রকাশ বা দীপ্তি ছিল না। তখন কোন পালনকর্তা, পয়গম্বর, আল্লা বা ত্রাণকর্তা ছিলেন না। সেই তিনি একক ও অদ্বিতীয় ছিলেন, তাই তাঁহার কোন তুলনা বা প্রকাশ ছিল না। তাঁহার কোন বর্ণ বা গঠন ছিল না, কিন্তু এখন তিনি নানা বর্ণে রঞ্জিত।]

বুল্লহে তাঁহার জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে আধ্যাত্মিক চরম সীমায় আরোহণ করিয়া ধর্মাধর্মের উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট পাপপুণ্য শত্রুমিত্রের কোন বালাই নাই। সব কিছুতেই তিনি এখন ভগবানের স্বরূপই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। একজন প্রকৃত সুফী কবি বা অদ্বৈতবাদীর ন্যায় তিনিও বলিতেছেন,

পাইআ হৈ কুঝ্. পাইআ হৈ, সৎগুরুনে অলখ লখাইয়া হৈ ;
কহুঁ বৈর্ পড়া কহুঁ বেলী হৈ, কহুঁ মজনু হৈ কহুঁ লয়লী হৈ ;
কহুঁ আপ্. গুরু কহুঁ চেলী হৈ সভ আপনা রাহ দিখাইআ হে ;
কহুঁ চোর্ বনা কহুঁ শাহজী হৈ, কহুঁ মম্বর্ তে বহীঁ কাজী হৈ ;

* * * * *

দর্শন্ পীআ দা ইলাজ্. হুআ লগ্গা ইশ্ক্ তাঁ এহ্. গুণ গাইআ হৈ।

[আমি কিছু পাইয়াছি ; সদ্‌গুরু অদর্শনীয়কে আমার দর্শনযোগ্য করিয়া দিয়াছেন। ইহা কখনো শত্রু (বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার) কখনো মিত্র। ইহা কখনো মজনু, (আবার) কোন সময় লয়লা (প্রতীয়মান হয়)। তুমি কখনো গুরু, (আবার) কখনো চেলা—সকলেই তাহার নিজ নিজ পথ দেখাইয়া গিয়াছে। তুমি নিজেই কোথাও চোর হইয়াছ ; কোথাও দাতারূপ পরিগ্রহ করিয়াছ ; আবার বিচারাসনে বসিয়া কাজীরূপ গ্রহণ করিয়াছ।...(বস্তুতঃ) প্রিয়তমের দর্শন আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে ; তাঁহার প্রতি আকর্ষণের জন্যই আমি তাঁহার গুণ গাহিতে সক্ষম হইয়াছি।]

প্রকৃত ভগবৎ-ভক্তের নিকট ধর্মের সত্যরূপের কোন তফাৎ নাই। কারণ সকল ধর্মেই সেই পরম রূপেরই প্রকাশ করা হইয়াছে। তাই বুল্লহে বলিয়াছেন,

বৃন্দাবন্ মেঁ গৌ চরাবে ;
লঙ্কা চড়্‌কে নাদ্ বজাবে ;
মক্কে দা বন্ হাজী আবে ;
বাহ্ বাহ্ রং বটাঈ দা ;
ছুণ কী থীঁ আপ ছুপাঈদা।

[বৃন্দাবনে তুমি গরু চড়াইয়াছিলে, আবার লঙ্কায় তুমি (বিজয়-) নাদ বাজাইয়াছিলে। (আবার) মক্কায় হাজীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আশ্চর্য, তুমি কত রঙ্গ-ই না জান! তুমি এখন আর কি ছাপাইতে চাও?]

বুল্লেহে অনেক দিন লাহোরে অবস্থান করার পর, তাঁহার গুরুদেবের মৃত্যু হইলে আবার তাঁহার জন্মভূমি কসুরে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নিজ জন্মভূমিতেই তাঁহার কবর-স্থান এখনো রক্ষিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীনারদমুনি

স্বামী ধর্মেশানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা সকলে "নারদীয় ভক্তি"র কথা পড়িয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি যে ভক্তশিরোমণি শ্রীশ্রীনারদের ন্যায় শ্রীভগবানের স্তবস্তুতি, ভজন ও হরিগুণগান করাই ভক্তির লক্ষণ। আর এখানে ওখানে যাত্রার অভিনয়ে কখনও কখনও আকাশমার্গে সহসা বীণাহস্তে নারদের আগমন দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়া আমরা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি যে নারদ ঋষি শূন্যে গমন করেন, তিনি তিনকালে অমর, পরম হরিভক্ত এবং যেখানে যান ভক্তি-গদগদচিত্তে হরির গুণগান করেন। মোটকথা এক হিসাবে নারদঋষিকে হিন্দুগণ এইরূপই জানেন, আর অতি সাধারণ লোক জানে যে, নারদঠাকুর যেখানে যান, সেখানেই কোঁদল ঘটান। সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও নারদকে এইভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে :—

"কান্দে রানী মেনকা চক্ষুর জল ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদমুনি হাসে॥

কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি।
আকশলী পোয়া যোগা পড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুরী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ি লয়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র॥"

শাস্ত্রে কিন্তু ঢেঁকিবাহন নারদমুনির দর্শন মেলে না। জনশ্রুতি অবলম্বনে ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া কবি ভারতচন্দ্র এইরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। নারদ নামের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে:—নারং পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি, অথবা নারং নরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি বা নারং জলং পিতৃভ্যো দদাতি। নার-শব্দের এক অর্থ পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান; যিনি এই জ্ঞান দান করেন তিনি নারদ। নরসমূহকে যিনি খণ্ডন করেন তাঁহাকেও বলে নারদ। নারদ শব্দের তৃতীয় অর্থ—যিনি পিতৃগণকে নার অর্থাৎ জলদান করেন। নাম নিরুক্তি:

নারং পানীয়মিত্যুক্তং তৎ পিতৃভ্যঃ সদা ভবান্।
দদাতি তেন তে নাম নারদেতি ভবিষ্যতি॥

পিতৃগণকে সর্বদা নার অর্থাৎ জলদান করায় নারদ নাম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে:—

"অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎকীর্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ॥" ১।৬।৩৯

অহো, দেবর্ষি নারদ ধন্য, যিনি নিরন্তর বীণা বাজাইয়া হরিগুণ গাহিয়া মত্ত থাকেন, আর এই দুঃখপূর্ণ জগৎকে আনন্দ দান করেন। শ্রীভগবান লীলার জন্য অবতীর্ণ হন এবং লীলার উপযোগী উপকরণও সংগ্রহ করেন। শ্রীভগবানের লীলাসহায়ক মহাপুরুষগণ মুক্ত হইলেও সাধারণ জীবের কল্যাণের জন্য জগতে অবতীর্ণ হন। অবিদ্যা, অহঙ্কার, আসক্তি ও মমত্বশূন্য এই মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিয়া যান। দেবর্ষি নারদ এইরূপ একজন। সমস্ত যুগে, সমস্ত শাস্ত্রে, সমস্ত সমাজে এবং সমস্ত কর্মে দেবর্ষি নারদের অপ্রতিহত প্রবেশ। তিনি সত্যত্রেতাদ্বাপর যুগে ছিলেন, কলিতেও আছেন, শুনা যায় শ্রীভগবানের প্রেমিক ভক্তগণ কখনও কখনও তাঁহার দর্শন পান। গোলোক, বৈকুণ্ঠলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি হইতে তলাতল-পাতাল পর্যন্ত তিনি গমনাগমন করেন। মনে সঙ্কল্প উদিত হওয়া মাত্রই স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনে বিলম্ব হয় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা, জ্যোতিষ, সংগীত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই তিনি দৃষ্টিগোচর হন। সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু ও শিব হইতে ঘোর রাক্ষসের পর্যন্তও তিনি সম্মান, আদর এবং বিশ্বাসের পাত্র। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমস্ত বাক্যেরই আদর করেন। ব্যাস, বাল্মীকি, শুকদেবকেও তিনি পরমতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। আবার কখনও দুই পক্ষের মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিয়াছেন—এইরূপও দেখা যায়। বাস্তবিক তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না। যে কার্যে সকলের মঙ্গল হয় এবং শ্রীভগবানের লীলারূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই তিনি করিয়া থাকেন। তাঁহার ঝগড়া-লাগানর মধ্যেও লোককল্যাণ-সাধন রহিয়াছে।

অনেকে বলেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে নারদকে যে দেখা যায়, সেই নারদ এক নন, ভিন্ন ভিন্ন লোকে এই নারদনামে পরিচিত। নারদের সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে তাহা ছয় ব্যক্তিতে আরোপিত হইয়া থাকে: (১) ব্রহ্মার মানসপুত্র (২) পর্বত-ঋষির মাতুল (৩) বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর ভ্রাতা (৪) কুবেরের সভাসদ্ (৫) ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সভার একজন ধর্মজ্ঞ সভাসদ্ (৬) জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সদস্য।

নারদ এক ছিলেন কি বহু এ প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ সন্দেহ নাই; কিন্তু বিবাদ না করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় নারদ একজনই, যিনি ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ও ভিন্ন যুগে যুগে শ্রীভগবানের লীলাসহায়করূপে কাজ করিয়া থাকেন।

দেবর্ষি নারদ ছিলেন প্রথমজ ব্রহ্মার পুত্র। কত ব্যাকুলতা, বিরোধ ও তপস্যার মধ্য দিয়া তপস্বী নারদের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়, তাহা আমরা অল্প লোকেই খবর রাখি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত-দৃষ্টে আমরা শ্রীশ্রীনারদের অলৌকিক জীবনের বিষয় যৎসামান্য এখানে বিবৃত করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া মহাভারতকার ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত-রচনার পরামর্শ দিতেছেন। হিমালয়ে ৺বদরী-নারায়ণ তীর্থে সরস্বতী নদীতীরে ব্যাসদেব আপনাকে অত্যন্ত হীনবোধে স্বীয় আশ্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় আকাশমার্গে দেবর্ষি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শান্তিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণপরমব্রহ্মের অপূর্ব লীলা বর্ণন করিয়া পুস্তক রচনা করিতে বলিলেন—শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করিলে এতশাস্ত্র প্রণয়নে যে জ্ঞানপিপাসার নিবারণ হয় নাই, তাহা নিবৃত্ত হইবে। অনন্তর এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকীর্তন করিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বীয় পূর্বজীবনী বিবৃত করিয়া শোনাইলেন। তিনি দাসীপুত্র হইয়াও ঋষিযোগীদের সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহাদের সেবা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া, সেবাকালে শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণ করিতে করিতে কিরূপে পাপমুক্ত হইলেন এবং নিজ হীন জন্ম পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে কিভাবে পবিত্র দেবর্ষিরূপ ধারণ করিলেন, সমুদয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া ব্যাসদেবকে ভক্তিলাভের উপায় ও তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীনারদের সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা-শ্রবণে ব্যাসদেব মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর আকাশমার্গে দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন—কোন স্থানে যে তাঁহার নিত্য স্থিতি নাই।

দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মনদী সরস্বতীর তীরে বদরীবৃক্ষসমাকীর্ণ শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে সমাধি-অবলম্বনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তখন ভক্তির প্রভাবে স্বীয় নির্মল অন্তঃকরণে পরমেশ্বর ও তাঁহার মায়াশক্তির স্বরূপ সন্দর্শন করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিতে যে অজ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় তাহা অবগত হইয়া জীবের শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও প্রীতি উদ্দীপিত করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করিলেন এবং নির্বিষয় শুকদেবকে উহা পাঠ করিয়া শোনাইলেন। পরম জ্ঞানী শ্রীশুকদেবের কোন অভাব ছিল না, কিন্তু হরিগুণগানের ও শ্রীহরির লীলার এমনই মাহাত্ম্য যে আত্মারাম জ্ঞানিগণেরও তাহাতে অহৈতুকী ভক্তি ও প্রীতি সঞ্জাত হয়।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

—ভাগবত ১।৭।১০

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে, ব্রহ্মা নারদকে সৃষ্টি করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিলেন। নারদ পরম বৈরাগ্যবান, সংসারের অনিত্যতাদর্শনে সৃষ্টিকার্যে পরাঙ্মুখ হইয়া তপস্যা ও হরিগুণগান করিতে চাহিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি গন্ধর্ব হইয়া জন্মগ্রহণ কর এবং সুদীর্ঘকাল সংসারসুখ ভোগ কর। পরে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া সাধুসংসর্গে হরিভক্তি লাভ করিয়া পরজন্মে পুনরায় আমার পুত্র হইবে।" নারদ ভীত হইয়া 'হরিভক্তি যেন না হারাই' এই বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মার বরে নারদ গন্ধর্বজন্মেও শ্রীহরিস্মরণমনন ভুলেন নাই। নারদও পিতা কমলযোনি ব্রহ্মাকে কঠিন অভিশাপ দিলেন, 'আপনি যখন বিনাদোষে আমাকে গন্ধর্বযোনি প্রাপ্ত করাইলেন তখন আপনিও ত্রিলোকে অপূজ্য হইবেন।' যাহা হউক নারদ উপবর্হন নামে এক গন্ধর্বকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং রাজকন্যা মালাবতীর সহিত পরিণীত হইয়া সুদীর্ঘকাল সংসার-সুখ ও সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণগান করিতে লাগিলেন। একদা তিনি রমণীগণ-পরিবৃত হইয়া

পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে—ব্রহ্মা নারদের এই ধৃষ্টতা দর্শনে তাঁহাকে 'শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া দ্বিতীয়বার অভিশাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ নারদ গন্ধর্বতনু ত্যাগ করিলে তাঁহার সাধ্বীপত্নী মালাবতী মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া দেবগণকে উহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতে আহ্বান করিলেন। পরিশেষে বিষ্ণু তাঁহার সতীত্বে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ং দেবগণ সহ উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আরও কিছুকাল গন্ধর্বজীবন সম্ভোগের পর—গন্ধর্বকুমার উপবর্হন ব্রহ্মশাপহেতু যথাকালে প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন। কলাবতী নামক এক গোপকন্যা শূদ্রার স্বীয় পতি বিয়োগ হইলে প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করায় জনৈক দয়ালু ব্রাহ্মণ আসিয়া কলাবতীকে লইয়া নিজ পরিবারে রাখিলেন। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে নারদের জন্ম হইল। ব্রাহ্মণ হরিভক্ত-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে একবার বর্ষাগমে চাতুর্মাস্যকাল কতিপয় সাধু অতিথি হইয়াছিলেন। পঞ্চবর্ষীয় বালক নারদকে ঐ ব্রাহ্মণ সাধুগণের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। ব্রহ্মতেজপরায়ণ সাধুগণের সেবা ও তাঁহাদের নিকট হরিগুণগান শ্রবণ করিয়া ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টাদি ভোজন করিয়া বালক নারদের অন্তরে হরিভক্তি ও তীব্র বৈরাগ্য জাগ্রত হইল। বর্ষাপগমে ঋষিগণ প্রস্থান করিলে এবং তাঁহার একমাত্র সংসার-বন্ধন শূদ্রা মাতার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে পঞ্চবর্ষীয় বালক নারদ ধ্রুবের ন্যায় শ্রীহরির দর্শন-লালসায় একাকী গোপনে বনে গমন করিলেন। তথায় নির্জনে সাধুপ্রদত্ত মন্ত্রজপে তপস্যায় হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার দিব্য শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তির একবার মাত্র দর্শন লাভ করিলেন এবং পুনরায় দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে দৈববাণী হইল—'তুমি এই তনুতে আর আমার দিব্য দর্শন পাইবে না। পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র নারদের দেবতনু লাভ কর ও আমার নিত্য পার্ষদ হইয়া সর্বদেশে ও সর্বকালে জীবগণের মোক্ষদায়ক হরিভক্তি বীণাযোগে গান করিয়া অমর জীবন লাভ কর।' শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে নারদ পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্ম লাভ করিলেন এবং পিতৃ-নির্দেশে ভগবান শম্ভুকে গুরুপদে বরণ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিলেন। তারপর বদরিকা আশ্রমে নারায়ণ ঋষির আশ্রমে গমন করিয়া শ্রীভগবানের অবতার নারায়ণ ঋষি হইতে ব্রহ্মশক্তি দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও ভক্তশিরোমণি হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে 'নারায়ণ ঋষি ও নারদের উপাখ্যানে' এই ব্রহ্মের মায়াশক্তি ব্রহ্মময়ীর লীলা ও গুণগান সবিশেষ বর্ণিত আছে। উহা প্রকৃতিখণ্ড নামে উক্ত। উহাতে ভাগবতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণজীবনলীলা-কাহিনীও কীর্তিত আছে।

এ পৃথিবী আমাদের

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

স্রষ্টার পৃথিবী ছিল অন্য এক স্বতন্ত্র
কতগুলি বন্য জীব, শাখামৃগ ও মৃগয়াজীবী
মানুষের বাসভূমি। মরু, গিরি, অরণ্য প্রান্তর
অলঙ্ঘ্য অসীম সিন্ধু, যম সম মহা ভয়ঙ্কর
ঊষর তুষার ক্ষেত্র, ছিল মাত্র সম্পদ তাহার।
সে পৃথিবী আর নাই; ধন-ধান্যে পূর্ণ আজিকার
এ পৃথিবী আমাদের। আমরাই আপনার হাতে
আপন মনের মত বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা সম্পাতে

দিয়েছি তাহার এই নবরূপ ; বনেরে ভবন
করিয়াছি, গড়িয়াছি জনপদ নগর শোভন ;
মাটিরে ঘাঁটিয়া বিশ্বে বিলাইয়া শস্য অবিরাম,
খনি হতে মণি লয়ে আমরাই বসুন্ধরা নাম
সার্থক করেছি তার। ধন্য ধন্য আমরা মানব ;
এ পৃথিবী আমাদের। সেকালের দেবতারা সব
(অনল, অনিল, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, আকাশ)
মানবত্বে মুগ্ধ হয়ে আমাদের আজ্ঞাবহ দাস
সেজেছে একান্তমনে ; কারখানা, বিজ্ঞান আগারে,
ষ্টিমারে, মোটরে, রেলে খেটে খেটে তারা আপনারে
ভাবিছে কৃতার্থ ধন্য। অন্নপূর্ণা, গঙ্গা, সরস্বতী
দেবীগণ স্বর্গ ছেড়ে সশরীরে করিছে সম্প্রতি,
আমাদের তাঁবেদারি। আদিদেব পরম পুরুষ
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ বাস যুগে যুগে হয়েছে মানুষ।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জীন, শ্রীগৌরাঙ্গ সব আমাদের
আপন ঘরের ছেলে। আমাদেরই পূর্ব পুরুষের
অমূল্য অতুল্য কীর্তি গীতা, বেদ, সংহিতা, পুরাণ
উপনিষদাদি যত ; ভক্তি-জ্ঞান-কর্মে মহীয়ান্
হয়েছি তা হতে মোরা, জনে জনে জিতেন্দ্রিয় বীর
মহাজ্ঞানী মহাজন। সেকালের সেই পৃথিবীর
যত কিছু ভেঙ্গে চুরে গড়িয়াছি নূতন করিয়া।
অরূপে দিয়েছি রূপ, অচিন্ত্যকে চিন্তায় ধরিয়া
আনিয়াছি এইখানে। এ পৃথিবী আমাদের ভাই,
কোথা স্বর্গ দেবদেবী ? অন্য আর কোথাও সে নাই।
থাকিলে এখানে আছে। অমরত্ব, পারিজাত-সুধা,
কল্পনার হাত থেকে কেড়ে এনে মানুষের ক্ষুধা
আমরাই মিটায়েছি। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর
আমাদেরই হাতে গড়া ; আমাদেরি সুকৃতি নিকর
ব্যাপিয়া রয়েছে বিশ্ব। ইন্দ্রজিতে করিয়াছি জয়
ইন্দ্রিয়জয়ের বলে ; হইয়াছি বশিষ্ঠ, সঞ্জয়।
সাধনায় নব স্বর্গ অপবর্গ করেছি সৃজন,
বিশ্বের হিতের লাগি। পর্বতেরে করেছি শাসন,
গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়াছি সরোষ-কৌতুকে।
আমাদের পদচিহ্ন সগৌরবে ধরিয়াছে বুকে
আপনি ব্রহ্মাণ্ড পতি। কভু পুত্র, কভু বন্ধুরূপে
স্বচক্ষে দেখেছি মোরা বারবার মহাবিশ্বভূপে

খেলিতে মানুষ বেশে মর্ত্যালোকে ; বুঝিয়াছি তাই
"সবার উপরে সত্য মানবত্ব তার পর নাই।"

শিবত্ব ব্রহ্মত্ব আদি মানবের করায়ত্ত সব,
সৃষ্টির বিজয় স্তম্ভ ধন্য ধন্য আমরা মানব।

এক বৃন্তে তিনটি ফুল

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ

ভক্ত ! মাভৈঃ, কোনও ভয় নাই, লৌকিক ও পারমার্থিক ইষ্ট সাধনে তোমার ক্ষমতা নাই, এরূপ মনে করিও না। 'অভীঃ' মন্ত্র গ্রহণ কর। অভী শব্দের অর্থ ভয়ের অভাব। তুমি সৎকার্য সম্পাদনে নির্ভীক এইরূপ আত্মপ্রত্যয় সংগ্রহ কর।

গীতাপাঠের আসরে আচার্য শ্রোতৃবৃন্দকে ঐরূপ উপদেশ দিতেছিলেন।

বলিতেছিলেন—তোমার দেহতত্ত্ব-অনুশীলনে ইহারই ভিতর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মূলসূত্র পাওয়া যাইবে। তোমার দেহকে যদি আমি লতারূপে ব্যাখ্যা করি, আর যদি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকে একটি লতারূপে কল্পনা করি, তবে তোমার ভয় দূর হইবে। মনে কর গীতা একটি পুষ্পময়ী লতা। উহাতে মোটে তিনটি ফুল ফুটিয়া আছে। সেই ফুল তিনটি

যেন একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত অপূর্ব দর্শন। সেই লতাতে কর্মপুষ্প, ভক্তিপুষ্প ও জ্ঞানপুষ্প এই তিন পুষ্প বিকসিত।

ভক্ত! তোমার দেহরূপ লতাতে তিনটি অংশ প্রধান। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এক অংশ, মন এক অংশ এবং আত্মা এক অংশ। ইহার এক একটি অংশের বিকাশে ভগবানের সন্তোষবিধান সম্ভবপর, যেমন পুষ্পের বিকাশে এবং পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের তুষ্টি-সম্পাদন সম্ভবপর হয়। দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্মযোগ সহজসাধ্য, তোমার হাত, পা, বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা কর্মযোগ সাধন সুসাধ্য। তোমার হাত আছে, হস্তদ্বারা পুষ্পচয়ন কর, নৈবেদ্যাদি আহরণ কর, তারপর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে বন্দনা কর এবং ঐ সমস্ত তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদন কর। পা আছে, পদব্রজে মন্দির প্রদক্ষিণ কর, দূর দেশ হইতে পূজার উপকরণ সংগ্রহ কর, তারপর ভাবের আবেশে কর নৃত্য,—

"সোনার নূপুর রাঙা পায়
কিবা শোভা দেখা যায়,
নাচে হরিবোল হরিবোল বোলেরে।
শ্রীবাসের আঙ্গিনা মাঝে
আমার গৌর নাচেরে।"

তোমার বাক্য আছে, ভাষা আছে, সেই ভাষার বলে কর স্তোত্র পাঠ, অথবা কর জপযজ্ঞ-সংকীর্তন। চক্ষু আছে, সেই অপরূপ রূপ দর্শনের জন্য নয়নদ্বয় বিস্ফারিত কর।

কর্ণ আছে—ভগবানের নামকথা শ্রবণ কর।

নাসিকা আছে—পুণ্যগন্ধ গ্রহণ কর, তেমন মধুরগন্ধ আর কোথাও মিলিবে না। ছন্দে গন্ধে ভরপুর সেই পরমানন্দের আনন্দময় দেহ। ভক্ত পায় তার গন্ধ।

এইরূপে কর্মযোগী তার কর্ম-প্রসূনের অঞ্জলিতে ভগবানকে তুষ্ট করিতে পারে।

গীতা বলিতেছেন—কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কর্মদ্বারাই ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন।

অধিকারিভেদে যোগসাধনার ভেদ। কর্ম-যোগের অধিকার যাহার নাই, যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল নয়, শক্তিমান্ নয়, তাহার যদি অগতির গতি শ্রীপতির পদে মতি থাকে তবে তাহা দ্বারা ভক্তিযোগ সম্ভবপর। মন যদি থাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ, তবে সেই বিশুদ্ধ মনের সাহায্যে বিশুদ্ধ ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশ সুগম হয়।

মন দুই প্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ মন বিষয়াদিতে আবদ্ধ, শুদ্ধ মন শুধু ভগবানে আসক্ত। স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি বিশুদ্ধ মনের পরিপোষক। ভক্তিযোগের সাধকদের হৃদয়বীণাতে ঐ সমস্ত সুমধুর তান মধুর মধুর বাজে। তখন আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই—

"ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি বা অনুরাগের নামই ভক্তি। সেই ভক্তির বলে ভক্ত মনে করে—আমি তব চিরদাস, তুমি মম প্রভু। এখানে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ।

গীতা বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

(ভগবান বলিতেছেন)—আমি যে কত বড়, এবং আমি যে কি পদার্থ তাহা ভক্ত ভক্তির বলে জানিতে পারে। শুধু জানা নয়, ভক্তিযোগের সাধনায় সম্যক্ প্রকারেই আমাকে জানিতে পারে (=তত্ত্বতঃ)। তারপর?—

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।

আমাকে জানার পর আমাতেই প্রবেশ করে।

কোন কোন অধিকারীর পক্ষে শরীরস্থ আত্মা হইল সাধন। আত্মাকে অবলম্বনপূর্বক—অর্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্বের অনুশীলনে, পরমাত্মার প্রদীপ্ত রাজ্যে প্রবেশ করা চলে। তোমার আমার দেহের মধ্যে

আবদ্ধ জীবাত্মা, স্থূলদেহের সংস্পর্শে লৌকিক পদার্থে আসক্ত, কিন্তু যেই মুহূর্তে উহা বিশুদ্ধ মনের সহায়তায় পরমাত্মার সঙ্গে সংবদ্ধ হইল, সেই মুহূর্তে আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা এরূপ দ্বৈতবুদ্ধি রহিল না। ঘটাকাশ তখন মহাকাশে মিশিয়া গেল।

গীতার বাণীতে আছে—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বালিত হইলে সমস্ত কর্ম, সর্বপ্রকার কর্মরূপ কাষ্ঠখণ্ড ভস্মীভূত হইয়া যায়।

গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাজ্ জ্ঞানভক্ত্যাদিকর্মসু॥

গীতাতে অষ্টাদশ অধ্যায় যেন আঠারোটি সোপান। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য উহা সিঁড়ি। অনেকের মতে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ত্রিধা বিভক্ত এই গীতাতে কর্মযোগ-বিভাগে ভক্তিমূলক বা জ্ঞানমূলক শ্লোকও দেখিতে পাই। ভক্তিযোগ-বিভাগও জ্ঞানকাণ্ডের বৃত্তান্ত-জড়িত, সেইরূপ জ্ঞানযোগ-বিভাগেও কর্ম ভক্তি উভয়ই অনুস্যুত। তিনটি ফুল ফুটিয়া আছে, উহারা একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বলিতেন, গীতা শব্দটিকে উল্টাইয়া ধরিলে আসে ত্যাগী। ত্যাগী না হইলে গীতার অনুশীলন সার্থক হয় না। ত্যাগ বলিতে সর্বকর্ম-ত্যাগ নয়, সর্বকর্ম-ফলত্যাগ। ইহাই সন্ন্যাসযোগ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।

কর্মফলত্যাগ বা নিষ্কামকর্ম জ্ঞানযোগের মর্মপ্রকাশক, সকামকর্ম স্বর্গলাভের নিদান। স্বর্গলাভ নশ্বর, কিন্তু নিষ্কাম কর্মের ফল অবিনশ্বর। নিষ্কাম কর্মকে শরণাগতি বলা চলে। হে ভগবান! আমার যত কিছু কাজ, সব তোমার প্রীতির জন্য। আমার জন্য কিছুই নয়। ভগবৎপ্রেমময়ী মীরাবাঈ প্রাণ ভরিয়া গান গাহিতেন :—

আমার বল্‌তে কিছুই নাই আর
তোমায় দিয়েছি।
(হরি) তোমার ভাবে জগৎ ভুলে
দাসী হয়েছি।

তোমার দেহরূপ লতাতে যখন কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান পুষ্পের বীজ রহিয়া গিয়াছে, তখন ঐ অঙ্কুরিত বীজকে ক্রমবিকসিত কর। আর, পার যদি সঙ্গীতের তান তোলো :—

(হরি) কি দিয়ে পূজিব তোমায়?
কি আছে আমার!
প্রেম-ফুলে পূজিলে নাকি
পূজা হয় তোমার।
তুলসী আর গঙ্গাজলে
পূজিলে কি তোমায় মিলে?
অশ্রুজলে না ভিজালে
চরণ তোমার।

ভাব একবার, তোমার দেহের ভিতরে যে জীবাত্মা অবস্থিত, সেই হইল অভীষ্ট দেবতা শিব বা বিষ্ণু, তোমার মনটি হইল শিব-গেহিনী পার্বতী অথবা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী, তোমার দেহের ভিতরের প্রাণবায়ু-সমূহ তোমারই সহচর, তোমার অতি প্রিয়, তোমার শরীরটি যেন মন্দির।

"আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ
শরীরং গৃহম্।"

তারপর তুমি যে প্রত্যহ বিষয়ভোগের জন্য আয়োজন করিতেছ, তাহাই অভীষ্ট দেবতার পূজা। তোমার নিদ্রাকার্যটি যেন সমাধি, সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাতে আসিবে তুরীয় অবস্থা সুষুপ্তির অতীত।

"পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা
নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।"

তুমি যে পা দিয়া হাঁট, তাহাতে যেন মনে হয় মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছ, মন্দিরস্থ অভীষ্টদেবতাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া হাঁটিয়া নাচিয়া পাহারা দিতেছ। তাঁহার তো পাহারার দরকার নাই, তবু তুমি তাঁহাকে

প্রদক্ষিণ করিতেছ। তোমার মুখের যতকিছু ভাষা সব যেন তাঁহার স্তোত্র; "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।" প্রতিমুহূর্তে তাঁহার ধ্যান, তাঁহার স্তোত্র, তাঁহার নামকীর্তন।

"সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ
স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ।"

অতএব, উপসংহার হইল এই :—তুমি যাহা কিছু কর্ম কর, অথবা আমি যাহা কিছু করি সমস্তই তাঁহার আরাধনা।

"যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং
শম্ভো তবারাধনম্।"

হে শম্ভু শঙ্কর (হে বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু), আমি প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ করি, তাহাই তোমার আরাধনা।

প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

আমার দেহ, মন ও আত্মাদ্বারা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত যাহা কিছু কাজ করি, তাহাই যেন হে জননি! জগন্মাতঃ! তোমার পূজার সাধন হয়।"

জিজ্ঞাসা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জীবনে যেদিন ঘনাবে তামসী ঘোর
শূন্য হৃদয়—ব্যথাতুর নিরমম,
রহিবে না আলো আকুল নয়নে মোর
তোমারে সেদিন হেরিব কি প্রিয়তম?

অস্ত-অচলে জীবন-সূর্য ঢলে
এপারে ওপারে আঁধারের পারাবার,
পারের যাত্রী অন্ধ নয়ন-তলে
তোমারে সেদিন হেরিবে কর্ণধার?

কাঠিয়াবাড়ের পুরানো গল্প

স্বামী জপানন্দ

এখন কি আর আছে?

কয়েক বৎসর অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির পর সেবার বেশ ভাল শস্য হয়েছে। রাজাপ্রজা সকলেই আনন্দে ভরপুর, বিশেষতঃ কৃষকবর্গ। দীপাবলীর বেশী দেরী নাই, অল্প শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। "খলাবাড়ে" জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ধান্য এসেছে, কৃষকরা সকলেই মহাব্যস্ত,—যে যার ধান্য সাফ ক'রছে আর মনে মনে কি ক'রবে, না করবে,—দেয়-নেয় ইত্যাদি কত বিচারই না করছে! স্ত্রী পুত্রাদি তাদের সকলেই খাটছে। তাদের মনেও গয়নাগাটী, কাপড়-চোপড় আর আনন্দ উৎসবের নূতন নূতন কল্পনার ফোয়ারা ছুটছে। সকলেই উৎসাহে পরিপূর্ণ, অক্লান্ত পরিশ্রম করছে সবাই। জগুপটেল এবং তার স্ত্রী-পুত্রেরাও বাজরা পরিষ্কার ক'রছিলো।

জগুপটেল গ্রামের একজন নামজাদা চাষী। রাজদরবারে তার সুনাম আছে। জমিও তার অন্যের চেয়ে বেশীই ছিল, আর খাটতোও সে খুব। এবার সে কেবল বাজরার চাষ ক'রেছিলো,—

সোনা ফলেছে তার জমিতে। কাজ করতে করতে এক ছিলিম তামাক টেনে তাজা বনবার জন্য পাশেই বসে সে তার তোড়জোড় করতে লাগলো। অবশ্য নজর ছিলো তার বাজরার ঢেরের উপর—"অহহ! এমন বাজরা বহুকাল হয় নাই, দানাগুলি যেন মোতির মত!"···ছিলিম টানতে টানতে তার মনের এক কোণে ঢেউ উঠলো,—"কত মেহনৎ-ই না করেছি এর জন্য! কেন, হোক্ না-হোক্ প্রতি-বৎসরই তো সমানভাবে মেহনৎ করি!···কিন্তু (চকিতে হিংসার ভাব তার চোখ মুখে ফুটে উঠলো) ···কিন্তু এর ভাগ তো নিয়ে যাবে রাজা। জুলুম! জুলুম!! দিন নেই, রাত নেই খেটে মরি, তা যেন সব ওঁর জন্যই!···না, না এবার ছাড়বো না, কিছু সরাবই যা ঘরে আসে তাই লাভ!" জগু কিছু বাজরা চুরি করবার সঙ্কল্প দৃঢ় করল, আর তা করবার তাক্ খুঁজতে থাকলো।

একরাত্রে সে ঐ সুযোগ পেয়ে গরুর গাড়ীতে খুব ঠেসে ঠেসে বাজরা ভরে নিয়ে চল্লো বাড়ীতে। (ঐদিন তার পালা ছিলো খলাবাড়* পাহারা দেবার, আর কেউই সেখানে ছিল না।) তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, তাই ধরা পড়বার ভয়ে সে খুব জোরে জোরে হাঁকাতে লাগলো গাড়ী। ভাগ্যদোষে গ্রামের কাছে এক পাথরে ধাক্কা লেগে গাড়ীর একটা চাকা খুলে গেল। এখন উপায়? অপর কাহাকেও ডাকলে সবাই জেনে যাবে জগুর কীর্তি! নিজে খুব চেষ্টা করলে, কিন্তু একে তো ভারী গাড়ী তায় ভরেছে বাজরা যত পেরেছে ঠেসে! চাকা কিছুতেই পরাতে পারলে না। ভয়ে কাঁপতে লাগলো—"কী হবে? খলাবাড়ে ফিরে যাবারও তো উপায় নাই। সকলেই আমাকে ভাল লোক বলে জানে, দরবার আমাকে বিশ্বাসী পাত্র ভেবে মান দেয়!···হে রাম! আর এ কাজ করবো না, এইবার লাজ রাখো!···"

জগু দেখলে গ্রামের বাহিরে কে যেন আসছে! পাপের ফল হাতে-নাতে পেলে ভেবে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কাছে আসতে অপরিচিত কোন পথিক বোলে তার মনে হলো। একটু আশা তার অন্তরে উঁকি মারলো—"ওহে ভাই, একটু এদিকে এস না, আমায় এই চাকাটা পরাতে একটু সাহায্য কর!"

বিনা বাক্যব্যয়ে ঐ ব্যক্তি সাহায্য করলে। চাকা পরিয়ে জগু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার মত তার হুঁশ ছিল না। তাড়াতাড়ি গাড়ী হেঁকে সে বাড়ী চলে গেল।

ঐ ব্যক্তি আর কেহ নয়, স্বয়ং ভা কুম্ভাজী, গ্রামের রাজা। ভোরে উঠে অন্ধকার থাকতেই, গ্রামের বাইরে শৌচাদিতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। একটু একটু শীত পড়েছে, তাই বড় একটা চাদর মুড়ি দিয়ে যথানিয়মে শৌচার্থে যাচ্ছিলেন।

জগু তাঁকে চিনতে পারে নাই। জগু যে চুরি ক'রে ধান্য নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেও কিছু না বোলে রাজা তাকে সাহায্য করলেন গাড়ীতে চাকা পরাতে!···

"আহা! লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মেহনৎ মজুরি অত করে, তা হয় অমন বৃত্তি!··· ওরাই তো আমার সম্পত্তি, আমার সন্তান। না হয় কিছু বেশী নিলে। ওরা সুখী থাকলে আমার সুখ।" —ইত্যাদি ভাব কুম্ভাজীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে এক স্বর্গীয় প্রসন্নতা এনে দিলে। করুণায় তাঁর বুক ভরে গেল। এ ঘটনার কথা কিন্তু তিনি আর কাউকেও বল্লেন না।

(২)

কয়েকমাস পরে কুম্ভাজীর গড়ে (কেল্লায়) কোন কার্য-উপলক্ষে অনেক অতিথি-স্বজনের সমাগম

* খলাবাড় ধান্যাদি একত্র করবার স্থানবিশেষ। সকলের ধান্য এইখানে একত্র করা হলে যথারীতি রাজ-ভাগ দেওয়া হয়, অনন্তর যে যার ধান্য স্বগৃহে নিয়ে যায়।

হয়েছে। গ্রামের প্রথামত পাইক সকল গৃহস্থের বাড়ী থেকে পাতবার জন্য চাদর, বিছানা ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। জগুর কাছে গিয়ে যখন সে চাইল দরবারের হুকুমে, জগু সাফ্ না করে দিলে। পাইক পাট্টার জোরে যখন একটু গলা চড়িয়ে বল্লে, যা ভাল ভাল বিছানাপত্র আছে তা ভালয় ভালয় বের করে দিতে, তখন জগুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে আগুন জ্বলে গেল।

"নিজেরা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে মরি। আর ভাল যা আছে তা দরবারের চাই! দূর ছাই, এমন রাজ্যে বাস না করাই ভাল!"—জগু বেশ গরম হয়ে বোলে উঠলো।

"কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে থাকতে ব'লছে? যাও, যেখানে পোষায় চলে যাও না!"—ক্রুর দংশন করলে পাইক।

"ওহে পাইক! এই জগুপটেল তা করে দেখাবে। কালই!"—বুক ফুলিয়ে জানালে জগু।

জগুর যা কথা, তাই কাজ। পরদিন সকলে দেখলে গরুর গাড়ী বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে জগু পটেল গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। 'রাম রাম, ভাই! রাম রাম'—বিদায় অভিবাদন কর'তে ক'রতে সে রাজার গড়ের সাম্নে যখন পৌঁছাল, তখন জগুর আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবৃদ্ধেরা তাকে ঘিরে অনেক বুঝাতে লাগলো ঘরে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু জগু কারো কথাতেই কান দিলে না। গোলমাল শুনে ভা কুম্ভাজী বাহিরে এলেন এবং জগুকে হঠাৎ গ্রাম-ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। রাগে বিহিত-অবিহিত জ্ঞানশূন্য জগু দু-চারটা কঠিন শব্দের সহযোগে সব ঘটনা জানিয়ে—তার পক্ষে যে তাঁর রাজ্যে বাস করা আর সম্ভব নয়, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দিলে। রাজা অনেক মিষ্টি কথায় তাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করলেন, এবং পাইকের দণ্ড-দণ্ডবিধানও করলেন। তবুও জগু মানলো না, সে যাবেই। কুম্ভাজীর তখন মনে পড়ে গেল জগুর সেই কীর্তির কথা। তার কাছে গিয়ে কানে কানে বল্লেন,—"গাড়ীর চাকা পরাতে কাঁধ দেয়, এমন রাজা যদি কেহ থাকেন, তাঁর গ্রামে যেও!"—এই বোলে তিনি গড়ের ভিতর চলে গেলেন।

এদিকে জগুর পা যেন পৃথিবী ধরে রেখেছে, নড়বার আর সামর্থ্য নাই! এর চেয়ে মরণ তার ছিলো ভাল। এমন দেবতার রাজ্য ছেড়ে কোথা যাচ্ছিল সে? তার মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য চুপি চুপি বলে গেলেন তার পাপের কথা! আর সে থাকতে পারলে না, পরিতাপ-অগ্নি তাকে দহন করতে লাগল। দৌড়ে গিয়ে ভা কুম্ভাজীর পায়ে পড়ে সে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে। "যাও, পটেল, ঘরে ফিরে যাও। শান্তিতে থাকগে!" বোলে হাত ধরে তুল্লেন তাকে।*

* প্রবাদ ভা কুম্ভাজী বর্তমান গোণ্ডল নরেশের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

বর্তমান সৌরাষ্ট্র-ই ছিল কাঠিয়াবাড়। কাঠি-রাজাদের রাজ্য ঐনামে পরিচিত ছিল।

"আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সবদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ভক্তকবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্বর্ধনা-উপলক্ষ্যে)

তারেই বলি কবি—যে চায় সুন্দরে তার অন্তরে
ভক্ত যাচে ভগবানে—গড়েন যিনি সুন্দরে।
ভক্ত কবি একাধারে—বাউল তুমি প্রাণখোলা,
নও শহুরে ফানুষ—তুমি গ্রামের মানুষ মনভোলা।
একতারাটি বাঁধা তোমার একজনারি প্রেমসুরে,
পায়ে পায়ে ছন্দ তাঁরি বাজিয়ে চলো নূপুরে।

তথ্য পেয়ে মুগ্ধ সবাই!—জানল বিজ্ঞে আজ কতই!—
অণু থেকে নীহারিকা—যতই হাতায় পায় ততই—
জানতেই চায় সব কিছু, না মানতে চেয়ে—যাঁর বরে
সব কিছু রয় আজো উজল—জীবন উছল যাঁর তরে।

তুমি এমন ভুল করো নি, বেঠিক পথের নও পথিক,
বাসলে ভালো তাঁকেই—প্রিয় যাঁর চেয়ে কেউ নয় অধিক।
শিল্পী মানী ধনী জ্ঞানী—অঢেল মেলে এই ভবে
তাঁরাই নাকি সভ্যতাকে করেন ধারণ—কয় সবে।
চেয়ে তাঁদের নেকনজর আজ নজর অঝোর দেয় তারা
পায়ে তাঁদের—নামে যাঁদের হয় তারা আপনহারা।
নাম করে যে তাঁর শুধু, ধায় শুধুই তাঁরি সন্ধানে
ভিখ পায় না সেই ভুবনে!—তাঁর লীলা কি কেউ জানে?

এই দলেই যে নাম লেখালো—সেই তোমাকে প্রাণ খুলে
আমরা দুজন করি বরণ।—তাঁর নামের তুফান তুলে
চলো তুমি সোজা পথে—শুনল বা না শুনল কেউ
কী আসে যায়? গান গেয়ে যায় যারা প্রেমের জাগিয়ে ঢেউ
সংখ্যা তাদের কম হয় হোক—ধন্য তারাই ভক্তপ্রাণ
কোটির মাঝে গোটিক মেলে কৃষ্ণ-অনুরক্ত প্রাণ।
এই গোটিকের মাঝে তুমি পুণ্য-অমল একজনা:
তাই তোমাকে বাসি ভালো—করি তোমার বন্দনা।

ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদর্শ*

শ্রীমতী সৌদামিনী মেহ্‌তা

আমাকে শ্রীসারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ। আজ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একান্ত অনুগামিনী সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী উৎসব পালন করছি। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর বাংলার এক দূর পল্লী-অঞ্চলে জয়রামবাটী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র বালিকার জন্ম হয়েছিল। তার নাম ছিল সারদা। সারদা অর্থ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই ছোট গ্রাম্য মেয়েটি পরবর্তী কালে হলেন শ্রীসারদাদেবী, আর অর্জন করলেন ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম-জ্ঞান—যে জ্ঞান অধীত বিদ্যার চেয়ে শ্রেয়স্কর। এই রকমের জ্ঞান ভগবানের দান এবং এ কেবল তিনিই লাভ করতে সমর্থ, যাঁর অন্তরাত্মা সাধারণ মনবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশস্ত, গভীরতর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর মত সত্যদ্রষ্টাগণের জীবন হতে যে দিব্যপ্রভা বিচ্ছুরিত হয়, তা শত শত লোককে ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চালিত করে। সারদাদেবী যে আমাদের মধ্যে খুব বেশী দিন আগে এসেছিলেন তা নয়, তবুও তাঁর জীবনকথা বিশেষ সুবিদিত নয়। তিনি নীরব জীবন যাপন করে গেছেন, যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাঁকে ঘিরে ছিল, তাদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা ও অসাধারণ ক্ষমা দেখিয়ে গেছেন।

মোটামুটি ভাবে তাঁর উপদেশ-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক জীবনের মূলতত্ত্ব কোন অলৌকিক দর্শনলাভ বা অলৌকিক ব্যাপার-প্রদর্শনের মধ্যে নিহিত নয়; ইহা রয়েছে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-অনুশীলনের মধ্যে। বেদান্তদর্শনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নি। তিনি ভক্তি-পথের কথাই বলে গেছেন। তাঁর শিক্ষা হল সব কিছুই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে; আর ভগবানের কৃপালাভের প্রধান উপায় হল তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।

সেই মহীয়সী নারীর প্রতি আজ আমরা আমাদের বিনত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এখন আমি আজকের বিষয়বস্তুতে আসছি।

স্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় সমাজে নারী খুব উচ্চাসন পেয়ে আসছে। সাধারণের ধারণা প্রাচ্যে, বিশেষ করে এশিয়ার সব দেশে সমাজজীবনে নারীর স্থান নিকৃষ্টতর। সুতরাং আমার উক্তি এই ধারণার বিপরীত বলে মনে হতে পারে। যদিও একথা সত্যি যে, পাশ্চাত্যের নারীরা যতটা স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভারতের নারীরা ততটা করেন না; তবুও ভারতীয় নারীদের তাঁদের পাশ্চাত্য ভগিনীদের চেয়ে সুযোগ-সুবিধা কম, তাঁদের জীবন ভাগ্য-বিড়ম্বিত—এইরূপ ধারণা করলে কিন্তু সত্যই ভুল করা হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীদের অবস্থার তুলনা না করে এবার আমি সাধারণভাবে ভারতীয় নারীজাতির মূলগত আদর্শের বিশ্লেষণ করব।

ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসে ভারতীয় নারী-জাতির আদর্শের অফুরন্ত নজির আছে এবং ভারতীয় জাতিগঠনে ভারতীয় নারীগণ যে কতখানি গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন তা দেখাবার জন্য শত শত ভারতীয় নারীর নাম একত্র গ্রথিত করা কষ্টসাধ্য হবে না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতে অবিস্মরণীয় ছন্দে বীরাঙ্গনাদের গুণ ও কার্যাবলীর যে চিত্র অঙ্কিত

* নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ হতে সঙ্কলিত।

হয়েছে, কোন সাহিত্য আজও তা অতিক্রম করতে পারে নি। আসুন, আমরা এই ধরনের কয়েক জন মহীয়সী মহিলার নাম স্মরণ করি। সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, মীরা, পার্বতী—আমি এইভাবে নামের এক অভিধান তৈরী করতে পারি। ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে এইরূপ প্রত্যেকটি নামের সঙ্গে একটি বিশেষ তাৎপর্য জড়িত আছে। বর্তমান ভারতের অশিক্ষিত নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ নারী এইসব নামের সঙ্গে পরিচিত ও এইসব মহিলারা ভারতের যে ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করেন তার সঙ্গেও তাঁরা সম্পূর্ণ পরিচিত। জগতের প্রাচীনতম ধর্ম—হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে নারী শক্তিস্বরূপা; ভগবানের গুণময়ী মায়া। ভারত-স্থাপত্যের নিদর্শন মূর্তিগুলিতে জগৎপিতা ভগবানকে অর্ধনারীশ্বর, অর্থাৎ অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারীরূপে দেখান হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু পুণ্যপ্রভামণ্ডিতা, পূতচরিতা মহিমময়ী নারীর জীবনকথা আমরা পেয়ে থাকি, যাঁরা তাঁদের সমসাময়িক যুগে জাতীয় জীবনে অনেক কিছু দান করে গেছেন। বৈদিক যুগে দেখি, গার্গী ও মৈত্রেয়ী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের বহু নারী শিষ্যা ভগবান তথাগতের নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন। মুঘলযুগে নারীগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতেন ও মহনীয় শিল্পকলা-ক্ষেত্রেও প্রেরণা যোগাতেন। ভারতের স্থাপত্য-সৌন্দর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাজমহলের জন্ম হয় এক সম্রাজ্ঞীর প্রেরণায়, সম্রাট্ শাহ্‌জাহান যাঁর প্রেমকে এই নিখুঁত প্রস্তরময় কবিতায় অমর করে রেখে গেছেন। পদ্মিনী, শিবাজীর মাতা জীজাবাঈ ও ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ তাঁদের দেশভক্তি, নেতৃত্ব ও বীরত্ব দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। অতএব আদর্শের সন্ধানে ভারতীয় নারীদের ভারতবর্ষের বাইরে বা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাইরে যেতে হবে না। আদর্শের তো অভাব নেই, কিন্তু আজ আমার বক্তব্য হল, সেই আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতখানি সজীব হয়ে আছে এবং বর্তমান ভারতের নারীদের কাম্যই বা কি।

আধুনিক ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা যদি আমরা ভালভাবে বিশ্লেষণ করি, তা'হলে দেখতে পাব, তাঁরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দ্বারা চালিত হচ্ছেন। একটি হল নারীজাতির চিরাচরিত ঐতিহ্যের প্রভাব, যার প্রতি তাঁদের আনুগত্য সুস্পষ্ট। অপরটি হল আধুনিক নারীদের ভাবরাজ্যে অনুভূত, অদৃশ্য এক বিপ্লব—সে বিপ্লব অতীতের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করছে না সত্য, কিন্তু যুগপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন আদর্শের মূল্যকে অনবরত পরীক্ষা করে চলেছে। তাই আমরা দেখি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে আধুনিক ভারতীয় নারীর মধ্যে বহু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

জীবন ও জীবনচর্যার ভিত্তিরূপে 'ধর্ম'-কথাটি ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে গৃহীত। আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষায় ধর্ম-শব্দটির কোন যথার্থ প্রতিশব্দ নেই, এবং সেইজন্য ইহা অনুবাদ করা যায় না। কিন্তু Righteousness (ন্যায়পরায়ণতা) Right conduct (ন্যায়াচরণ) বা Pursuit of Truth (সত্যানুসরণ) কথা দ্বারা ধর্মের আন্তর তাৎপর্য বুঝা যায়। বহু যুগ ধরে ভারতীয় নারীগণ এই ধর্ম-শব্দটিকে গ্রহণ করে আসছেন এবং স্ত্রীধর্ম বলতে যা বোঝায় তা অনুসরণ করছেন। ভারতের দূরতম গ্রামগুলিতে আজকের দিনের মেয়েদেরও ধর্ম বা স্ত্রীধর্ম কথাটি বলতে শোনা যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই যে শব্দটির সংজ্ঞা দিতে সমর্থ তা নয়, কিন্তু কথাগুলির তাৎপর্য কি তা তাঁরা বোঝেন। নির্বিবাদেই তাঁরা তাঁদের কয়েকটি কর্তব্য করে থাকেন এবং এই ভাবে অনুশীলন করতে পারেন বলেই গৌরব বোধ করেন। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের সময়ে, দুর্বিপাকে, যাতনা, নৈরাশ্য, ক্ষতি ও

প্রিয়জনের মৃত্যুর সম্মুখবর্তী হয়েও আমি ভারতীয় মহিলাদের ধর্মের কথা বলতে শুনেছি ও যা অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী তাকে সম্পূর্ণ শান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে দেখেছি। এইরূপ ধর্মজীবন যাপন এবং ওঠা-পড়া, আনন্দ-বিষাদ, সফলতা-বিফলতার সঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করা ভারতের সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় মহিলারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, এবং ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমার মনে হয় উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত মনোবলের প্রভাবেই তাঁরা যা অবশ্যম্ভাবী তাকে সহ্য করার ক্ষমতালাভ করেছেন; নিষ্ক্রিয় অসহায় ভাব তার কারণ নয়। পরিবারের প্রতি ভারতীয় নারীর তাদাত্ম্যবোধ ও সামগ্রিক আকর্ষণ এই শক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ভারতের পরিবার আজও তার সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি; পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীই প্রধান পরিচালিকা। ভারতের একান্নবর্তী পরিবারের কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এরূপ পরিবেশে একই পরিবারভুক্ত কতিপয় লোক বৃদ্ধ প্রপিতামহ থেকে আরম্ভ করে প্র-পৌত্র পর্যন্ত একই বাড়ীতে বাস করে ও একই সঙ্গে সুখদুঃখ ও দায়িত্বের ভাগী হয়ে পরস্পরের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করে।

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র মনে করেন, বিবাহ এক ধর্মানুষ্ঠান এবং পতিপত্নীর বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য। আজও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নারী নির্বিচারেই এই নিয়ম মেনে চলেন। নারীর মুক্তি-আন্দোলন বিবাহকে ধর্মীয় সংস্কাররূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে আজও কোন বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে নি। ভারতে নারীর কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র বলে পারস্পরিক জীবনের উপর আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি যে, মুক্তি বলতে যদি সামান্যতম উত্তেজনায় বিবাহ-বিচ্ছেদ আনার স্বাধীনতা বোঝায়, তা হলে তাকে লোকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য।

ভারতে, মাতৃত্বকে সকল সময়ই নারী-জীবনের সর্বোচ্চ পূর্ণতা বলে গণ্য করা হয়েছে; সুতরাং বিবাহে প্রত্যেক নারীর একরূপ জন্মাধিকার এসে যায়। ভারতীয় ধর্মও ঐতিহ্য জননীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন মনে করে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্যই ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর নারী থেকে বিংশ শতাব্দীর নারীতে পরিবর্তন সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। আমরা ছিলাম মাতৃদেবতার পূজক; বর্তমানেও তাই আছি।

ভারতীয় নারীর এইরূপ বদ্ধমূল বিশ্বাস ও দৃঢ়-চরিত আদর্শ ছিল বলেই বিবাহবিচ্ছেদ ও পারি-বারিক বন্ধনের শৈথিল্য এই দেশে কমই দৃষ্ট হয়। ইহা বিস্ময়ের বিষয়। এ সবের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, ভারতীয় সমাজজীবনে কেমন করে সুপ্রতিষ্ঠ পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। ভারতীয় নারীগণের উত্তরাধিকার-স্বরূপ আদর্শ ও রক্ষণশীলতা-সম্বন্ধে বলে এখন আমি ভারতবর্ষের আধুনিক নারীদের নিত্যপরিবর্তনশীল ভাবধারার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

১৯১৭ সালের মে মাসে প্রথম সর্বভারতীয় নারীসম্মেলন হয় এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে আশীটি বিভিন্ন কেন্দ্রে এ সম্মেলনের কাজ ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে চোদ্দ জন মহিলা প্রতিনিধি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ও ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেটের সংগে দেখা করে পুরুষের মত নারীরাও যাতে সমান ভোটাধিকার পান তার দাবী করেন। ১৯২৬ সালে পুনরায় প্রথম সর্বভারতীয় মহিলা-সম্মেলন হয় এবং সেই বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত এই সম্মেলন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে আসছে।

আমার বক্তৃতার প্রথম দিকে আমি নারীর মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছি যে, ইহা ভারতীয় নারীর গার্হস্থ্যজীবন, বিবাহ ও পরিবার প্রভৃতির প্রতি

রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিবর্তনসাধন করতে পারে নি। কিন্তু ভারতীয় নারীর সত্যিকারের মুক্তি, অন্যান্য শক্তির সমবায়ে যতটা না এসেছে তার চেয়েও বেশী এসেছে একজন ব্যক্তির দ্বারা, তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ভারতীয় নারীদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে, বিদেশী শাসকের আইনভংগ করতে, দেশের স্বাধীনতার জন্য অহিংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করতে আহ্বান করেছিলেন। শত সহস্র নারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। এমনি করেই কাজ করবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাঁরা লাভ করেন। ইউরোপীয় দেশ-গুলিতে নারী নারীর ভোটাধিকার-অর্জনে প্রবল আন্দোলন এনেছিল। তবুও বলা যায়, গান্ধীজী ভারতীয় নারীদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা এনে দিয়েছিলেন, জগতের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। একজন বিদেশিনী এই মুক্তি-আন্দোলনকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যা বলেছেন এখানে তা দেওয়া হল। মহিলাটি আয়ার্ল্যাণ্ড-বাসিনী। তিনি বলেন :—

"জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, ভারতীয় নারী যে পরিমাণে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন তা মনে হয় অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। সেই বিরাট ধর্মযুদ্ধে, সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের নারী, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, পুরানো রীতি নীতির উল্লেখ না করে, 'এ সব মেয়েদের যোগ্য নয়' এই পুরানো কথা না বলে ও নারী পুরুষ ভেদ না রেখে, কালের প্রয়োজনে সাড়া দিতে গিয়ে নবলব্ধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভার, দুঃখ, আত্মত্যাগ ও আনন্দ ভাগ করে নিয়েছিল। নর ও নারীতে তখন পৃথক্ বুদ্ধি-ভেদ ছিল না। তারা একাত্ম হয়ে কাজ করেছিল এবং আত্মশক্তি ছিল তাদের অস্ত্র বা আত্মরক্ষার উপায়। যে নারী কখনও ঘরের বাহিরে আসে নি, সে সাধারণ শোভাযাত্রায় সকলের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছে ও পরে কারাজীবনের সব কিছু সহ্য করেছে ; গর্ভবতী নারী কারাগৃহে সন্তান প্রসব করার ভয়ও করে নি বরং তারা ভাবত যে, আসন্নজন্মা সন্তানের পক্ষে এ স্থানে জন্ম অসম্মানের না হয়ে গৌরবের হবে ; দেবদাসী বা নর্তকীও মহাত্মাজীর আহ্বানে আপন পেশা ত্যাগ করে সম্ভ্রান্ত কয়েদীরা যে ব্যবহার পাবে সেও তা পেতে সাহসে বুক বেঁধেছিল। আমি দেখেছি, খুব গোঁড়া বামুনের মেয়েও তার সংগে সামাজিক ভাবে মেলামেশা করছে, এমনকি এক সংগে খাচ্ছে। অপরপক্ষে সে কাঁদছে, কেননা যে সত্যাগ্রহী বোনটি তার সংগে একাত্ম ও সমান ব্যবহার করেছে, আজ তাকে ছেড়ে যেতে হবে। এই রকমের একটা ভাব নারীদের মধ্যে বন্যার মত বয়ে চলেছিল। কারাগৃহকে তারা মন্দিরে পরিণত করেছিল। আর কারা-পথকে করেছিল তীর্থযাত্রার পথ। সেদিন মহাত্মা গান্ধী তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিলেন সন্ন্যাসী, দেবমানব, এমন একজন নেতা যাঁর অধীনে জাতীয় কংগ্রেস পতাকায় কোন নোংরামি বা মন্দ কিছু প্রবেশ করতে পারে না।"

১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের মধ্যে সহস্র সহস্র ভারতীয় নারীর দ্বারা যে প্রচুর শক্তি ক্ষরিত হয়েছে, তার ফলে ভারতের সামাজিক কাঠামোয় এসেছে বহু বিপুল পরিবর্তন এবং আজকের ভারতীয় নারীর আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষাও এর ফলে প্রভাবিত হয়েছে। ১৯৫০, ২৬ জানুয়ারীতে গৃহীত ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতীয় নারীরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করেছে ও রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন হয়েছে। নতুন শাসনতন্ত্রানুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৮২ লক্ষ নারী ভোটদাতার মধ্যে ৫৬ লক্ষ নারী ভোট দেওয়ার ব্যাপারে আপন রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেছিল।

আজকের ভারতীয় নারীরা এক নতুন যুগ ও নবীন আদর্শের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহাসিক বিবর্তনোদ্ভূত প্রাচীন আদর্শ ও জ্ঞান পরিত্যাগ করতে অবশ্য উৎসাহ দেওয়া বা সেইরূপ সম্ভাবনার আশা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে। সমান উত্তরাধিকার, বহু বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রভৃতির পক্ষে তারা পুরানো নিয়মের অনুসরণ না করে বহু সংস্কার দাবী করছে। যে সব আদর্শের দ্বারা আজ তারা পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলি ভারতের জাতীয় জীবনের বিরাট ঐতিহ্যের কোন অংশেই বিপরীত নয়। অতীতের ঐতিহ্য প্রেরণাহীন নয়; সুতরাং ভবিষ্যৎও নৈরাশ্যময় ভাববার কোন কারণ নেই।

আণবিক বোমা ও ভগবদ্গীতা

শ্রীজীবনতারা হালদার, এম্‌-এস্‌সি

আধুনিক বিশ্বের ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র আণবিক বোমার আবিষ্কর্তা রবার্ট ওপেনহেমার (Robert Oppenheimer) হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্র, বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভগদ্গীতার প্রতি কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তাহার বিস্ময়কর কাহিনী এই প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওপেনহেমারের প্রতিভা অদ্ভুত সর্বতোমুখী। তিনি বৈজ্ঞানিক হইয়াও ইতিহাস, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, প্রাচ্যদর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী। কমপক্ষে ছয়টি বিখ্যাত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে—তন্মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম।

আর্থার রাইডার নামক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে ওপেনহেমারের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার রাইডার জ্ঞানপিপাসু সৎসঙ্গ লইয়া তাঁহার গৃহে ভগবদ্গীতা, কালিদাস, ভর্তৃহরি এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন। এই সুযোগে ওপেনহেমার সংস্কৃত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রপাঠে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি এখনও ইহাতে বিশেষভাবে অনুরক্ত।

প্রাচ্যবাণীতে তাঁহার অনুরাগের মুখ্যতম কারণ এই যে, তিনি ভারতীয় দর্শনের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা উদ্‌ঘাটিত দর্শনের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়াছেন। এই শেষোক্ত দর্শনের মতে পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির অন্তরে অধ্যাত্ম জগৎ নিহিত রহিয়াছে এবং এই অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান করিতেছে যোগী এবং বিজ্ঞানী নিজ নিজ মত ও পথ অবলম্বন করিয়া—যোগী ইন্দ্রিয়নিরোধ ও তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা, বিজ্ঞানী গণিতশাস্ত্র ও সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা।

পদার্থবিজ্ঞানের অণুপরমাণুসংক্রান্ত গবেষণা বহুদিন যাবৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আণবিক বিস্ফোরণ কখনও তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার বিপুল বৈজ্ঞানিক খ্যাতির জন্য ওপেনহেমারের এই গবেষণা হইতে দূরে থাকা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহাকে আণবিক বোমার মূলতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইল। ইহারই ফলে ১৯৪৩ সালে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত আণবিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তথায় তাঁহাকে ঠিক কি ধরণের কাজকর্ম করিতে হইত, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত না হইলেও এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অবদানসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনিই বোমার কারখানার উপযুক্ত স্থান, সহকারী সংগ্রহ এবং প্রাথমিক কর্মিবৃন্দের তদারক করিতে লাগিলেন এবং এই যুগের চরম

উপযোগী করিয়া একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ মাত্র ৩০জন কর্মী লইয়া আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত কারখানাটি এত বিস্তৃতি লাভ করিল যে, ১৯৪৫ সালে সর্বশুদ্ধ ৪৫০০ ব্যক্তি নানাবিধ কার্যে তথায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক—এমনকি কয়েকজন নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত—যেমন বহ্‌র্, ফার্মি, সডউইক্। তাঁহারা সকলেই ওপেনহেমারের জ্ঞান ও খ্যাতির সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিশাল পরিধির বিস্তারে ও গভীরত্বে সকলেই ক্রমাগত আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিলেন।

চির-আচরিত ধারাবাহিক রীতি অপেক্ষা ওপেনহেমারের গবেষণা সৃজনমূলক ছিল। তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে ঐ বোমাটির প্রকাশে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে হয় নাই। উক্ত গবেষণাগারের জনৈক অধ্যক্ষ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওপেনহেমার ব্যতীত এই বোমা নির্মাণ-কার্য সম্পাদিত হইতে পারিত কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে উহা সম্ভবপর হইত না। এই বিষয়ে তাঁহার সাহচর্য অপরিহার্য হইয়াছিল। ওপেনহেমারের অবদানের পরিমাপ হিসাবে অপর একজন মন্তব্য করিয়াছেন :— "ওপেনহেমার আণবিক বোমার মূল সূত্রগুলি নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে সবগুলিই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।"

এইরূপ অসাধারণ পরিশ্রমে তাঁহার শক্তিক্ষয় হইতে লাগিল এবং বোমার পরিসমাপ্তির দিকে তিনি দৈনিক মাত্র ৩।৪ ঘণ্টা ঘুমাইবার সময় পাইতেন। বস্তুতঃ সদ্যনির্মিত আণবিক বোমার পরীক্ষার প্রাক্কালে তাঁহার ওজন ১৪৫ হইতে ১১৫ পাউণ্ডে নামিয়া গিয়াছিল।

এই আণবিক যুগে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন আণবিক বোমার প্রথম বিস্ফোরণ পরীক্ষা হইয়াছিল। লোকালয় হইতে বহু দূরে অবস্থিত এক মরুপ্রান্তরে ঐ পরীক্ষা পরিচালিত হইয়াছিল। ঐ দিন উষাকালে পরিশ্রান্ত শরীরে ও অবসন্ন মনে ওপেনহেমার ২।৩ মাইল দূর হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে ধূসর মরু-ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে ভয় ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। একবার তাঁহার সন্দেহ হইল—যদি বোমা বিস্ফোরণ না হয়! পরবর্তী মুহূর্তে তাঁহার আতঙ্ক হইল যদি প্রকৃতই বিস্ফোরণ হয় তবে পৃথিবীর কি অবস্থা হইবে! মানবজাতি কি এইরূপ ভয়াবহ মারণাস্ত্রের অধিকারী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে? ইহার অপব্যবহারে জগতের কি ঘোরতর অনিষ্ট ও অকল্যাণ সাধিত হইবে? অনাগত দুর্দশার সম্ভাবনায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য চক্ষু মুদিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। "প্রভু, এই আণবিক বোমা নির্মাণ-কার্যে আমি নিমিত্ত মাত্র। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। যেরূপ পরিচালনা করিয়াছ, সেইরূপ চলিয়াছি। আমার কোনও কৃতিত্ব ও দায়িত্ব নাই। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমারই মহিমা প্রচারিত হউক।"

অবশেষে বোমাটি বিদীর্ণ হইল। বিস্ফোরণের পরিণামে গোলাকার অগ্নিপিণ্ড উত্থিত হইয়া আকাশের তারকারাজি আচ্ছাদিত করিল। ঐ অপূর্ব তেজরশ্মির বিচ্ছুরণে ওপেনহেমারের চক্ষুর সম্মুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ যেন স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে এই শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

(গীতা—১১।১২)

"যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা বিকীর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপধারী সেই মহাত্মার তেজের তুল্য হইতে পারে।"

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। * * *
(ঐ—১১।৩২)

"আমি লোকসমূহের ধ্বংসকারী মহামৃত্যুরূপ কাল। বর্তমানে লোকসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"**

এইরূপে তিনি আণবিক বোমাকে ভগবানের বিশাল ঐশ্বর্যের এক অভূতপূর্ব বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাময়িক হৃদয় দৌর্বল্য দূরীভূত হইল। তিনি শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

আণবিক বোমার আবিষ্কর্তার শিক্ষা, দীক্ষা ও হৃদয়মনের উপর ভগবদ্গীতার এই অত্যাশ্চর্য প্রভাব দেখিয়া হিন্দু মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।*

* রবার্ট ওপেনহেমার সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনের দলিল ও বিবৃতিগুলি যাঁহারা সংবাদপত্রে মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের এই উন্নতচরিত্র দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা অধিকতর জাগ্রত না হইয়া পারে না।—উঃ সঃ

কবিতাঞ্জলি

(এক)

ঈশ্বর

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি কি কল্পিত কিছু, কায়াহীন মায়া,
বিশ্বাসে অস্তিত্ব শুধু আছে লুকাইয়া ?
'তুমি নাই',—যে কহিল কোথা ভ্রান্তি তার ?
অভ্রান্ত কে করিয়াছে, তোমারে প্রচার ?

জ্ঞানের চরম শীর্ষে, মূক স্তব্ধতায়,
পারিল না প্রমাণিতে কেহ তো তোমায়।

মানবের প্রয়োজনে অস্তিত্ব কি তব ?
রচিত হয়েছ তুমি মিথ্যা অভিনব।

অথবা হেরিয়া সৃষ্টি, স্রষ্টারে খুঁজিয়া,
যাহা নাই তারই তরে মরিছে কাঁদিয়া ?

তবু কিন্তু ভাবি যবে নাই তুমি নাই,—
হাহাকারে চিত্ত কেন মর্মরে সদাই !

কল্পনায় রচি এক রূপ প্রাণারাম,
দোদুল বিশ্বাসে করি তোমারে প্রণাম।

(দুই)

'রাজ সব রূপ ধরে'

শ্রীপুলক আঢ্য

সূর্যরূপেতে দিতেছ জীবন চন্দ্রমা হয়ে আলো,
পিতারূপে প্রভু করিছ পালন, পত্নী—বাসিছ ভালো।

জননী হইয়া দিয়েছ জনম ঢেলেছ অপার স্নেহ,
সন্তানরূপে কলহাস্যেতে রেখেছ ভরিয়া গেহ।

সখা হয়ে প্রিয় সঙ্গ দানিয়া ভরেছ জীবন মম,
বায়ু-বারি হয়ে বাঁচাও জীবন নিখিলের প্রিয়তম।

সঙ্গীত হয়ে শ্রবণানন্দ ফুল হয়ে সৌরভ,
যশঃ রূপে সখা পুলকিত কর বাড়াইয়া গৌরব।

অন্ন হইয়া অযাচিত রূপে বাঁচায়ে রেখেছ প্রাণ
তবুও তোমায় পারিনা চিনিতে অদৃশ্য ভগবান।

সুখরূপে তুমি সুখী কর পুনঃ দুখ হয়ে দাও ব্যথা,
অপমান শোক দিয়ে তুমি আন তোমাতে একাগ্রতা।

ব্যাকুল তবুতো হই না বন্ধু ভুলে যাই বারে বারে,
সকলেরি মাঝে তুমি যে সতত রাজ সব রূপ ধরে।

(তিন)

চির আনন্দ

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী

তোমার মুখের বাণী
কানেতে কভু না শুনি -
তবুও প্রাণে সে বাজে,
দিনের সকল কাজে।

তোমার পরশ-রসে
হৃদয় হরষে ভাসে,
যদিও না পাই ছোঁওয়া
সেই ত পরম পাওয়া।

দেখিতে না পায় কেউ,
তবুতো মলয় ঢেউ,
বনের বুকেতে লাগে,
মর্মর গীতি জাগে।

তেমনি তোমার প্রেমে,
হাহাকার গেল থেমে
সকল জীবন মোর
হলো আনন্দে ভোর।

(চার)

বিশ্বাস

শ্রীগণেশ লালওয়ানী

(যে দিন) ভাঙবে ঝড়, নিববে আলো,
সকল অন্ধকার
অনেক দূরের পথে
সেদিন যেন আমার মনে
না পাই আমি ভয় ;
এমন যেন হয়—
অরণ্যে পর্বতে।

(যে দিন) আমার ক্লান্তি, আমার শ্রান্তি
ভাঙবে মনোবল—
অনেক দূরের পথে
সেদিন যেন আমার মনে
না জাগে সংশয় ;
এমন যেন হয়—
অরণ্যে পর্বতে।

(পাঁচ)

রহস্য

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

রজনীরে বলে দিবা—"তুমি বড়ো কালো,
আমার ধরে না রূপ—আলোয় তো আলো।"
হাসিয়া রজনী কয়—"আমি কালো ব'লে
সবার নয়নে তুমি রূপবতী হোলে।"

সমালোচনা

ভারত আত্মার বাণী—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক :—প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা ২৮৬; মূল্য ৫৲ টাকা।

এই সুপরিকল্পিত পুস্তকখানি প্রধানতঃ একটি সংকলন-গ্রন্থ। লেখক শাস্ত্রাদি হইতে এবং আধুনিক যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষ ও মনীষীর প্রচুর কথা ও লেখা উদ্ধৃত করিয়া ভারত-আত্মার যথার্থ বাণী কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ উপনিষদের আদিমন্ত্র "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই আর্য-সভ্যতার মূল মন্ত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই গ্রন্থের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইয়াছে।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" আজকাল উপনিষদ্ আদর্শের এই মহা-বীরত্বকেও দুঃখবাদ, মায়াবাদ, escapism প্রভৃতি নাম দিয়া খাটো করা হয়, আর মূর্খতা ও দুর্বলতাকে পাণ্ডিত্য ও বীরত্বেররূপ দিয়া আত্মপ্রসাদ-লাভ এবং স্বভাবতঃ দুর্বল ও ভোগপ্রিয় জনসাধারণকে বিপথে পরিচালনার প্রয়াস দেখা যায়। অধুনা পাশ্চাত্য প্রভাবাভিভূত পণ্ডিতম্মন্য তথাকথিত দার্শনিক এবং স্বার্থান্বেষী ধর্মধ্বজী লেখক ও সংস্কারকের অন্ত নাই। এ অবস্থায় জনসমাজে ভারত-আত্মার যথার্থ বাণী প্রকাশক এই জাতীয় পুস্তকের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

এই পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায় আমাদের ধর্ম যে পাশ্চাত্য "Religion" নহে তাহা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, জগতে নানা Religion প্রচলিত—যাহা creed, cult, sect, church প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। এই ধরনের ভারতে Hindu religion নামক কোনও religion নাই। আর যদি religion শব্দকে আধ্যাত্মিকতার বাচক বলিয়া ধর্ম বলা হয়, তাহা হইলেও ভারতে যে ধর্মমতসকল প্রচলিত আছে তাহা সনাতন ধর্মেরই অঙ্গমাত্র। হিন্দুধর্ম বলিয়া কোনও বিশেষ religion ভারতে নাই। আমাদের শাস্ত্রেও হিন্দুধর্ম বলিয়া কোনও ধর্মের উল্লেখ নাই।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। কয়েকখানি সুন্দর ছবি আছে।

—স্বামী প্রশান্তানন্দ

বৈশেষিক দর্শন—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা; পৃষ্ঠা—৫৩; মূল্য ॥০ আনা।

'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' পুস্তকমালার অন্তর্গত এই বইখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও গ্রন্থকার ইহাতে কণাদসূত্র, ও প্রশস্তপাদাচার্যের ভাষ্যাবলম্বনে উপস্কার প্রভৃতি টীকা ও স্বীয় পর্যালোচনার সাহায্যে বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলি অতি সরলভাবে বুঝাইয়া মুক্তির স্বরূপ ও উপায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু ন্যায় দর্শনের পদার্থের সহিত বৈশেষিক দর্শনের পদার্থের ভেদ এবং অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রের সহিত দ্বৈতবাদের ভেদও বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ক্ষুদ্রতা-নিবন্ধন এবং বোধ করি সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় লেখক অনুমান ও শব্দের প্রক্রিয়ায় মূল পদার্থগুলির উল্লেখ অতি সংক্ষেপেই করিয়াছেন। ঐ কারণেই সৃষ্টির আদিত্ব স্বীকারে অকৃতাগম, কৃতনাশ, মুক্তির অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষের প্রসক্তি থাকিলেও ঈশ্বরবাদী বৈশেষিকের পক্ষে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বরূপ প্রধান দোষেরই উল্লেখ পুস্তকে করা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব-বিষয়ে মতভেদ

থাকিলেও সুপণ্ডিত লেখক সংক্ষেপে ঐ দর্শনের প্রকাশাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি সংস্কৃতানভিজ্ঞ বৈশেষিক দর্শনের পদার্থজিজ্ঞাসু বাঙালী পাঠক-পাঠিকার বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি।

—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী (সপ্ততীর্থ)

মরণের পারে—স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; ডিমাই আট পেজী ১৯৫ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য পরম পূজ্যপাদ পরলোকগত গ্রন্থকার আমেরিকায় অবস্থানকালে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈঠকে মরণোত্তর জীবনসম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন ঐগুলির সঙ্কলন 'Life Beyond Death' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থটি উহারই বাঙলা সংস্করণ। মৃত্যুই মানুষের জীবনের শেষ কিনা এই বিষয় লইয়া মানুষ স্মরণাতীতকাল হইতে ভাবিয়া আসিয়াছে। নানাদেশের ধর্মে, দর্শনে এবং লৌকিক বিশ্বাসে পরলোক-সম্বন্ধে বিবিধ ধারণা ও রহস্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুষ্ক হইতে কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকও প্রেততত্ত্ব লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন এবং বহু বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান পান। আলোচ্য পুস্তকে অগাধ পাণ্ডিত্য, মেধা ও যোগদৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থকার পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় মত ও গবেষণার পরিচয়দান, বিশ্লেষণ এবং আপেক্ষিক মূল্যনিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক প্রেত-বিজ্ঞানের প্রণালীতে গৃহীত অনেকগুলি প্রেতাত্মার ফটো গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। মরণোত্তর জীবনসম্বন্ধে বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরলোকতত্ত্বানুসন্ধানের যথার্থ লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, কি ভাবে ঐ অনুসন্ধান করিলে আমরা কল্যাণলাভ করিতে পারি এবং কোন্ কোন্ সতর্কতার অভাবে উহা আমাদের শরীর ও মনের ক্ষতিকর হয় এই বিষয়ে গ্রন্থকারের যুক্তিপূর্ণ প্রসঙ্গ ও সিদ্ধান্তগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বহুতথ্যপূর্ণ এই সুখপাঠ্য বইটি বাঙলার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম-সাহিত্যে যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন ইহাতে সন্দেহ নাই। এই অমূল্য গ্রন্থের প্রকাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত; ডিমাই আট পেজী ১৯৫ পৃষ্ঠা; মূল্য—৫৲ টাকা।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শুধু একজন তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী রূপেই কাশ্মীর ও তিব্বত পরিভ্রমণ করেন নাই—সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন তথ্যসন্ধানী প্রখরমননশীল একজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-রূপেও তিনি ঐ দুই দেশের দ্রষ্টব্য স্থান ও তথ্যসমূহ অনুশীলন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকটি তাই শুধু একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনীই নয়—ইহা বহু অপরিজ্ঞাত বিবরণসম্বলিত কাশ্মীর ও তিব্বতের একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বটে। ১৩৩৬ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণে কলেবর কিছু পরিবর্ধিত হইয়াছে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থের অত্যন্ত মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। যীশুখ্রীষ্টের ভারতে আগমন-সম্পর্কিত তথ্যও খুব চিত্তাকর্ষক। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণাদায়ী তথ্যপূর্ণ এই সুলিখিত ভ্রমণকাহিনীটি উপযুক্ত সমাদর লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

Mystery of Death—By Swami Abhedananda. Published by Ramakrishna Vedanta Math, 19B Raja

Rajkrishna Street, Calcutta. Pages 395. Price : Board : Rs 8/8 ; Cloth : Rs 10/-

আলোচ্য পুস্তকখানি ১৯০৬ সালে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আমেরিকাতে প্রদত্ত ১৯টি বক্তৃতার সঙ্কলন। বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু কঠোপনিষদে উপন্যস্ত জীবন-মৃত্যুর 'রহস্যবিদ্যা' বা ঔপনিষদ বিজ্ঞান। কঠোপনিষদের মূল বিষয়বস্তুর আরম্ভ যমের নিকট নচিকেতার একটি প্রশ্নে—'কেহ বলে মানুষ মৃত্যুর পরে থাকে, কেহ বলে থাকে না, এই সংশয়ের মীমাংসা কি ?' প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী হইতে ৮০টি শ্লোকে যম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন লৌকিক এবং তাত্ত্বিক দুই দৃষ্টিকোণ হইতে। মানুষের ইহলোকের জীবন ও কর্ম, তাহার ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ, সংসারে তাহার বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, জ্ঞান—তাহার তাত্ত্বিক স্বরূপ, পরলোক, উর্ধ্বগতি, মুক্তি এ সকল প্রসঙ্গই 'জীবন-মৃত্যুর রহস্যের' অন্তর্গত। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং অসন্দিগ্ধ সত্যদৃষ্টি দ্বারা এই সকল বিবিধ তত্ত্বের প্রচুর মৌলিকতাপূর্ণ প্রাঞ্জল আলোচনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদে আছে—'অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি'—আত্মজ্ঞ পুরুষের উপদেশ ব্যতীত আত্মবস্তুর জ্ঞানলাভ হয় না। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ছিলেন আত্মদ্রষ্টা আচার্য ; তাই তাঁহার কথাগুলি পদে পদে আধ্যাত্মিক শক্তি ও উদ্দীপনায় ভরপুর। গ্রন্থখানি শুধু 'জীবন-মৃত্যুর রহস্যে'র একটি উপাদেয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনাই নয়, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধকের নিকট অমূল্য সাধনসঙ্কেত ও সিদ্ধান্তের উপস্থাপক। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পূজ্যপাদ অভেদানন্দ মহারাজের কঠোপনিষদের দর্শন ও ধর্মজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তৃতাগুলির এই সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত সঙ্কলন-গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের প্রভূত ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৫৪)—রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৬৪।

এই বার্ষিকীটি বিদ্যামন্দিরের ছাত্র এবং অধ্যাপক-গণের পরিচালিত পত্রিকার মুদ্রিত পর্যায়ের চতুর্থ সংখ্যা। সম্পাদনা করিয়াছেন ব্রহ্মচারী তারাপদ, অধ্যাপক শ্রীসুপ্রিয়কুমার কর, শ্রীঅমিয়কুমার হাটী (২য় বর্ষ), শ্রীদেবব্রত ঘোষ (১ম বর্ষ)। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, জনসেবা, ভ্রমণবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তরুণ বিদ্যার্থিগণের মননশীলতা এবং পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গল্প কয়েকটিও ভাল লাগিল। অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে।

উদয়াচল (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৫৩)—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ১৮ ও ২০, যদুলাল মল্লিক রোড, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদনা করিয়াছেন ডক্টর বিধানরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, ডি-ফিল্, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, এম্-এ, (উভয়েই প্রাক্তন ছাত্র) এবং শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১৮।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটাস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থিগণের পরিচালিত এই বার্ষিকী পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইংরেজী এবং বাঙ্গলা দুটি অংশই সুনির্বাচিত লেখায় সমৃদ্ধ। ১৯টি রঙীন ও একবর্ণ চিত্র পত্রিকাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

উজ্জীবন (প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রীঅক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬১)—সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

ধর্ম ও নীতিবিষয়ক এই নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করি। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমতী লীলা মজুমদার যথাক্রমে লিখিয়াছেন—'সমাজে ধর্মের স্থান' এবং 'আদর্শবাদ'। কবিশেখর কালিদাস রায় এবং শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতাদ্বয় ভাবরসে ভরপুর। কীর্তনগান-সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ এবং লীলাকীর্তনের স্বরলিপি পত্রিকাখানির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পীড়িতের সেবা—কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ৫৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্নমুখী জনসেবা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট ঐতিহ্য সৃষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের ইন্‌ডোর সাধারণ হাসপাতালে ২৭৫৩ জন রোগী ভর্তি হন। এই হাসপাতালে ৫২৫ জন রোগীর অস্ত্রোপাচার হয়। সেবাশ্রম এই বৎসরে ২০ জন দুঃস্থ আশ্রয়হীন নরনারীকে আশ্রয় প্রদান করে। এতদ্‌ভিন্ন চন্দ্রিবিবি ধর্মশালা ফণ্ডের অর্থদ্বারা কয়েক জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য ও আশ্রয় দান করা হয়। সেবাশ্রমের বহির্বিভাগীয় ঔষধালয়ে ৯৫,০৫৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। এই বিভাগে ২৩,০৬৭ জন রোগীর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৩৮ জন ব্যক্তিকে ২,০৯১।/০ আনা অর্থ-সাহায্য করা হইয়াছে। দুঃস্থ নরনারীগণকে বস্ত্রাদিও দান করা হইয়াছিল। ৪৫৯ জন ব্যক্তির সাময়িক সাহায্য বাবদ ৮০৫/১১ পাই ব্যয়িত হইয়াছে।

সেবাশ্রমের Pathological Laboratory ও রঞ্জনরশ্মি বিভাগও সুপরিচালিত হইতেছে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের সাধারণ ফণ্ডে আয় ১,০৭,৪৭৮৵০ আনা এবং ব্যয় ১,০৩,৬৮৫॥৶৮ পাই। এই মানবকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানটির কর্মসম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দিকে সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণীও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ৪৭ বৎসর যাবৎ পীড়িতের সেবা দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে ১৯৯২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে চক্ষুরোগীও অন্তর্ভুক্ত। অস্ত্রোপচার-সংখ্যা ছিল ২৬৯৩। চক্ষু-অস্ত্রোপচারও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

বৃন্দাবন ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে চক্ষুরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। সুতরাং সেবাশ্রমের নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতালটি চক্ষুরোগীদের নিকট বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ। উত্তরপ্রদেশ সরকার আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগকে ২,০০০৲ সাহায্য করিয়াছেন। সেবাশ্রমের বহির্বিভাগীয় ঔষধালয়ে ৪২,২৬৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই বিভাগের অস্ত্রোপচার-সংখ্যা ছিল ২৩৩৭। ইহাতে চক্ষু অস্ত্রোপচারও অন্তর্ভুক্ত। সেবাশ্রমের রঞ্জনরশ্মি এবং Electro-therapeutic বিভাগ ও Clinical Laboratoy বিভাগ সুপরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ২১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই বাবদ ১৩৯।০ ব্যয়িত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ছিল ৫১,৪৪৩/১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৭,৯০৫॥৵৫ পাই। সেবাশ্রমের বিভিন্ন অপরিহার্য প্রয়োজনের দিকে সেবানুরাগী সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী—গত ৫ই মে হইতে ৮ই মে পর্যন্ত কালাডি (ত্রিবাঙ্কুর) আশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব, শ্রীশঙ্কর-জয়ন্তী ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম্ বোর্ডের সভাপতি শ্রী পি জি নারায়ণন্ উন্নিথন্, বি-এ, বি-এল্ এই অনুষ্ঠান-ত্রয়ের উদ্বোধন করেন। প্রভাতফেরি, পূজা, আরতি, গীতা ও ভাগবত-পাঠ এবং গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-

উপদেশাবলীর আলোচনা প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সম্মেলন হয়। তাহাতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীব্যাকরণভূষণ ডি দামোদর পিশারদী, সাহিত্যশিরোমণি সভাপতিত্ব করেন। বহু প্রাক্তন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শিক্ষাসম্মেলন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী টি সি শঙ্কর মেনন। বিভিন্ন বক্তা শিক্ষাসম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। 'হরিকথা-কালক্ষেপম্', ভজন প্রভৃতিতেও অগণিত নরনারী যোগদান করেন।

পূজা, আরতি, ভজন প্রভৃতি ভিন্ন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী ও আশ্রমের সাংবৎসরিক উৎসব ছিল দ্বিতীয় দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান। শ্রীগোবিন্দ পানিকার তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আহূত জনসভায় সভানেত্রী হন ডাঃ পি গৌরী আম্মা। শ্রীমতী পি কে কমলাক্ষী আম্মা শাস্ত্রী, কুমারী তঙ্কমণি, এম্‌-এ ও স্বামী মেধসানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পরম পবিত্র জীবন-সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। হরিকথা ও গীতালোচনাও সেদিন বিশেষ উৎসাহ-সৃষ্টি করিয়াছিল। তৃতীয় দিবসে শ্রীশঙ্কর-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজা, আরতি, ভজন, শিবসহস্রনাম ও শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় পাঠ এবং ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্‌ ও গীতা আলোচনা জনচিত্তে বিমল অধ্যাত্ম-ভাবের সঞ্চার করে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশঙ্কর কলেজ-এসোসিয়েশনের সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রী এন্‌ কৃষ্ণ আয়ার, বি-এ, বি-এল্‌।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে দীর্ঘ নয় দিবস-ব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২২শে জ্যৈষ্ঠ উৎসব আরম্ভ হয় এবং ৩০শে জ্যৈষ্ঠ উহার সমাপ্তি ঘটে। প্রথম দিন প্রত্যূষে প্রভাতীকীর্তনসহ বেলুড় মঠাগত সন্ন্যাসিগণ নগর পরিভ্রমণ করেন। তৎপর বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, অপরাহ্ণে বোম্বাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের একটি তৈলচিত্রের উন্মোচন ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। তিন দিনে তিনটি মহিলা-সম্মেলন, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। শ্রীমতী উমা রায়, শ্রীমতী সুরেন্দ্রবালা দেবী, শ্রীমতী উমা সরকার তিন দিন সভানেত্রীর কার্য করেন। উৎসবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী জপানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এবং স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ একাধিক বক্তৃতা দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে বর্ধমানের চণ্ডী-কীর্তন অথবা লীলা-কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। একদিন বিবেকানন্দ শিশু-সঙ্ঘের ছেলেমেয়েদের নানা প্রকার ক্রীড়া-প্রদর্শন ও প্রতি-যোগিতা হয়। শেষ দিনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন উদ্বাস্তু পল্লী এবং আইহো গ্রামে দুই দিন দুইটি সভার ব্যবস্থা হয়। উহাতে বেলুড় মঠ হইতে আগত সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও অবদান-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই বৈশাখ হইতে ১৯শে বৈশাখ পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস পূজাপাঠভজনাদি হয়। শ্রীযুক্তা আশালতা সেনের পরিচালিত একটি মহতী সভায় স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্ত, কুমারী নমিতা বসু, ডাঃ গোবিন্দ দেব, শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীসম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন ও

প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস পূজাহোমাদি ব্যতীত অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অপর একটি জনসভারও অধিবেশন হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দিবস ভজন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ এবং পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিবস জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় ৬০০০ নরনারী বসিয়া পরিতোষের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনাধীন রামহরিপুর শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব ১২ই বৈশাখ হইতে তিন দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা বিড়রা গ্রাম হইয়া শাঁকবাড়া ও নতুন গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রম করিয়া ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। পরে পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্ত ও নরনারায়ণ প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যার পর বাঁকুড়া শহরের সবুজ সঙ্ঘের ব্যায়ামাগারের ছাত্রেরা ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করিয়া জনগণকে মুগ্ধ করেন। রাত্রিতে জেলাপ্রচার বিভাগ কর্তৃক সবাক ছায়াছিত্রে 'মহিষাসুর বধ' প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে পূজাদি এবং সন্ধ্যারতির পর স্বামী মহেশ্বরানন্দ ও স্বামী আদিনাথানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এদিনও জেলা প্রচার বিভাগ কর্তৃক সবাক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। শেষদিন পূজা ও চণ্ডীপাঠ ছাড়া স্বামী সুশান্তানন্দ কর্তৃক ছায়াচিত্রের সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহযোগিতায় বিগত ২৪শে বৈশাখ রঘুনাথবাড়ী হাইস্কুলে স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে আহূত এক ধর্মসভায় বেলুড় মঠের স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী ভবানন্দ, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি এল্, অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২৫শে বৈশাখ অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মবর্ষ এবং শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চৈতন্যপুরে এক ধর্মসভা হয়। উহাতে বক্তা ছিলেন স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী ভবানন্দ, শ্রীতারাপদ মাইতি, শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীধর গোস্বামী। তমলুক সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে এবং মহিষাদলেও পৃথক সভার আয়োজন হইয়াছিল। স্বামী ভবানন্দ ও স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ ভাষণ দেন।

চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৮ই বৈশাখ হইতে ৮ দিন ব্যাপী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন উৎসবের উদ্বোধনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি লইয়া একটি শোভাযাত্রা কয়েকখানি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ ও হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়, বৈকাল ৪॥ টায় তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী ভবানন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভার অধিবেশন বসে। তমলুক আদালতের মুন্সেফ শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিশেষানন্দ এবং বেলুড় মঠের স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ সভায় বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ জনশিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক ছায়াচিত্রের সাহায্যে শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনী আলোচিত হয়। পরবর্তী দিনগুলিতে যথাক্রমে ঈশ্বরপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, ভগবানপুর, ভীমেশ্বরী, গোপীনাথপুর এবং কাজলাগড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে এবং হাঁসচড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী—বিগত ১২ই বৈশাখ বিপুল জনসমাগমের মধ্যে হাওড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীমা সারদামণির জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি-দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বেলুড় মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করেন। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃত ও বাংলায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সারদাদেবীর বিশ্বমাতৃত্ব-ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সভাপতি মহারাজ বলেন, সমগ্র দেশে শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীসম্বন্ধে যে উদ্দীপনা দেখা যাইতেছে, তাহা অতীব আনন্দের বিষয়। ভাগবতী সত্তা লইয়াই শ্রীমায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী ও বাণীগুলি ধীরভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। যাঁহারা তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিশ্বাস করিতে চান না, তাঁহারা শ্রীমা দৈনন্দিন জীবনে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও উপকৃত হইবেন। শ্রীসুশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার আরম্ভ ও শেষে সঙ্গীত-পরিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করেন। সভাবসানে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পুরুলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় শান্তিময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২রা বৈশাখ হইতে চার দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমদিন শ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ একটি সুবৃহৎ শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। উৎসবের প্রত্যেক দিনই বিশেষ পূজা ও হোমাদি যথারীতি সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর আহূত জনসভায় বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দ, রাঁচী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ, রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতালের অধ্যক্ষ স্বামী বেদান্তানন্দ, বেলুড়মঠের স্বামী জপানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী শ্রীমায়ের জীবনী ও অমৃতময়ী বাণীর আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বামী প্রণবাত্মানন্দের আলোকচিত্র-সহযোগে বক্তৃতা, হাওড়ার অভয়সঙ্গীত-পরিষদের কালীকীর্তন, এবং নবযুবক-সঙ্ঘের ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল-প্রদর্শন এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

কাঁথি রামকৃষ্ণমিশনের সহযোগিতায় বড়বাড়ী (মেদিনীপুর)তে গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী জন্মোৎসব বিশেষপূজা, আলোচনা-সভা, শোভাযাত্রা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, নামসংকীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সাধারণ সভার পরিচালনা করেন স্বামী ভবানন্দ; বক্তা ছিলেন স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়। মহিলাসভার নেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী অন্নদানন্দ। উৎসবে সহস্রাধিক ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। এই দুই দিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এক অপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে।

কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে বৈশাখ হইতে সপ্তাহ কাল ধরিয়া শ্রীসারদাদেবীর জয়ন্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব আড়ম্বরের সহিত হইয়া গিয়াছে। ২০শে অধিবাস, ২১ বিশেষপূজা ও পাঠাদি এবং ২২শে শোভাযাত্রা ও ব্রতচারী নৃত্য হয়। শ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রাটি বেশ দর্শনীয় হইয়াছিল। ২২শে অপরাহ্ণে পাটনা মগধ মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা

শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষের নেত্রীত্বে মহিলা সম্মেলনে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রারম্ভিক ভাষণ এবং শ্রীমতী সুধা সেন শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ-অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। রাত্রে আশ্রম-বালকগণ "দধীচির আত্মদান" অভিনয় করে। অভিনয় খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ২৩শে তারিখের আকর্ষণীয় ছিল 'গীতা জয়ন্তী'র অনুষ্ঠান; অষ্টাদশ অধ্যায়ী গীতার শ্লোকগুলি দশজন স্নাতক সমস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকেন, এবং একটি শ্লোকের আবৃত্তি হইলে ঋত্বিক একটি সচন্দন তুলসী-পত্র অর্ঘ্য দেন। অন্যদিকে অবিচ্ছিন্নভাবে ১০৮টি মাতৃসঙ্গীত গীত হয়। পূজান্তে ১০৮টি উপকরণের সহিত শ্রীমায়ের বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। অপরাহ্নের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বেলুড়মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অসীমানন্দজী। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়, শ্রীমতী নীলিমা দাসগুপ্তা, শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এবং স্বামী পূর্ণানন্দ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ২৪শে সমস্তদিন কীর্তন হয় এবং বিকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলে। নিকটস্থ ও দূরবর্তী গ্রাম হইতে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬টায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের আগমনে ভক্তবৃন্দের আনন্দ ও উদ্দীপনা দ্বিগুণ হইয়া উঠে। রাত্রে স্থানীয় এমেচার পার্টি 'শৈবসাধনা' অভিনয় করেন। ২৫শে অপরাহ্নে যে সভা হয়, উহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী; বক্তৃতা করেন স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ ও শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার। সভাপতি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমায়ের জীবনাদর্শের আলোচনা করেন। রাত্রে মহেশাঙ্গনে মহিলা সমিতির পরিচালনায় 'দেবতার ডাক' অভিনীত হয়।

ধূম (চট্টগ্রাম) বিবেকানন্দ সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাৎসরিক উৎসব ও শ্রীসারদাদেবীর জয়ন্তী ১৯শে ও ২০শে বৈশাখ সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভোর হইতে মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, ভজন ইত্যাদির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। তৎপর পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ হয়। ভোগরাগের পর প্রায় ২৫০০ লোককে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দিন সুসজ্জিত হস্তীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া এবং দ্বিতীয়দিন অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা গ্রামখানি পরিক্রমা করে। উৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল; তন্মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের ঐকতানবাদন, ব্রতচারী নৃত্য, কবির গান, নৃত্যাভিনয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে ধর্মসভাটি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

ধুবড়ী (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীসারদাদেবীর শততম জন্ম-জয়ন্তী ১৭ই বৈশাখ হইতে তিনদিবস বিপুল উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, ধর্মসভা, প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা ইত্যাদি। প্রথমদিন সকাল ৮টায় তিনটি সুসজ্জিত হস্তীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া বিরাট শোভাযাত্রা করা হয়। ১৯শে বৈশাখ বহু ভক্ত নরনারী কুমারীপূজা দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করেন। প্রথমদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটী কমিশনার শ্রীলক্ষেশ্বর শর্মা; বক্তা ছিলেন স্বামী সৌম্যানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ এবং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিনের মহিলাসভায় সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সুরমা দেবী। তৃতীয় দিনের সভার সভাপতি ছিলেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। শেষদিন রবিবার প্রায় দশ হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিগত ১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল) বিহারের অন্তর্গত চক্রধরপুরে হিন্দুস্থানী ও বাঙালী অধিবাসীদের উদ্যোগে শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ জন্ম-

জয়ন্তী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অতি প্রত্যূষে প্রভাত-টকীর সবিস্তৃত প্রেক্ষাগৃহে নবনির্মিত বেদীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি বিচিত্র পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী মুকুন্দানন্দ ও স্বামী বিমুক্তানন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পূর্বাহ্ণে যথারীতি পূজা, পাঠ, হোমাদির পর মধ্যাহ্নে প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়। অপরাহ্ণে বিবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এক বিরাট সভায় স্বামী বিমুক্তানন্দ বাংলায় এবং শ্রীব্রজলাল শর্মা হিন্দীতে শ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী আলোচনা করেন। শ্রীশম্ভুনাথ লোধ, শ্রীপ্রয়াগজী প্রেমজী, শ্রীশিবরাম দাস খিরোওয়াল, শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবারিদবরণ ঘোষ ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য লোক এই উৎসবে যোগদানপূর্বক সানন্দে ও সোৎসাহে সমস্তকার্য সুসম্পন্ন করেন।

পাণ্ডু (কামরূপ)তে শ্রীশ্রীমার শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ। ঐদিন সন্ধ্যায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 'শক্তিসাধনা ও ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয়দিবস অপরাহ্ণ ৪টায় মহিলাসম্মেলন হয়। উহাতে নেত্রীত্ব করেন অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা রাজুবালা দাস। তৃতীয় দিবসে সকাল ৬টায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতিসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। পূজা, হোম, পাঠ ও নরনারায়ণ সেবা ঐদিনকার উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ণে আহূত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশশাঙ্কশেখর বাচস্পতি, বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমা ও ভারতীয় নারী-জাতির আদর্শ-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায়ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 'যুগধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন। চিত্তাকর্ষক 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম'-পালা কীর্তন দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরিতাবলম্বী চিত্রপ্রদর্শনী দিবসত্রয়ই খোলা ছিল।

ইম্ফলে (মণিপুররাজ্য) বিগত ১০ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) হইতে ১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল) পর্যন্ত তিনদিবসব্যাপী শান্ত গম্ভীর পরি-বেশের মধ্যে শ্রীমা-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ও পাকিস্থানের নানাস্থান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ এই উৎসবে যোগদান করায় উৎসবটি বিশেষভাবে আনন্দময় ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। প্রথমদিনে বোম্বাই আশ্রমের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এক সভায় উৎসবের উদ্বোধন করেন ও ইংরেজী ভাষায় সনাতনধর্ম ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে আলোকপাত করেন। দ্বিতীয়দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদার পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি হয় ও বিকাল ৪॥ টায় স্থানীয় শ্রীললিতমাধব সিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি হয়। শ্রীমার জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির পারিতোষিক বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। তৎপর স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদ্বয় নিজভাষায় (মণিপুরী ভাষা) তাহাদের সশ্রদ্ধ ভাষণে শ্রীমার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিলে হবিগঞ্জের স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, আসানসোলের স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ ও শিলচরের স্বামী পুরুষাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমার পূত জীবনচরিত আলোচনা করেন। সর্বশেষে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সুগম্ভীর মনোজ্ঞ ভাষণ এবং সভাপতি মহোদয়ের সময়োপযোগী বিবৃতির পর সভাভঙ্গ হয়। তৃতীয়দিবস সকাল ৯টা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদাদেবীর বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, হোম, ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ চলিতে থাকে ও পরে বেলা ১২টা হইতে প্রায় ১০০।৭৫০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকাল ৫টায়

বিশেষভাবে আহূত জনসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বৈদিকযুগের মহীয়সী রমণীগণ ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ ভাষণ দান করিলে পর মণিপুরী পালাকীর্তন হয় ও রাত্রি ৯টায় উৎসব শেষ হয়। তৃতীয়দিনের উৎসবে করিমগঞ্জের স্বামী গোপেশ্বরানন্দ যোগদান করিয়াছিলেন।

দাসপুর (মেদিনীপুর) থানার আরিট গ্রামে আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক বিগত ২৪শে হইতে ২৬শে বৈশাখ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হয়। ২৪শে বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে একটি শোভাযাত্রা নগর সংকীর্তন সহ ৩।৪টি গ্রাম পরিক্রমা করে। বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগারতি, দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ, এবং আরাত্রিকের পর খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সভ্যগণ কর্তৃক তিনঘণ্টা ব্যাপী কালীকীর্তন ও রামকৃষ্ণকীর্তন গীত হয়। ১৫ই বৈশাখ সন্ধ্যায় আরিটগ্রামে এবং ২৬শে বৈশাখ খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে একটি করিয়া জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন খেপুত উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর রায়। বেলুড়মঠের স্বামী আপ্তকামানন্দ প্রথমদিন শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও নারী-জাগরণ সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়দিন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। ২৬শে বৈশাখ রবিবার রাত্রিতে কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটীর সভ্যগণ কর্তৃক ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর অলৌকিক জীবনী আলোচিত হয়। প্রতিদিন পল্লী অঞ্চলের ছয় শতাধিক নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির বাৎসরিক শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব এবং শ্রীশ্রীমায়ের শত বার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও স্বামী শর্মানন্দ এবং দুইজন ব্রহ্মচারী এই উৎসবে যোগদান করায়, অধিকন্তু এই উপলক্ষ্যে বিদেশাগত ও স্থানীয় বহু ভক্তের সমাগম হওয়ায় সকলের প্রাণে বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং ৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি নির্বাহ হয়। প্রত্যহ সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশ পাঠ এবং অপরাহ্ণে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। প্রথম দুইদিন স্বামী যোগস্থানন্দ যথাক্রমে ঠাকুর ও মায়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। স্বামী পূর্ণানন্দ শেষের দুইদিন বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, যথাক্রমে (ক) সংসারীদের নিষ্কাম কর্ম ও ত্যাগ, এবং (খ) রামকৃষ্ণ সারদার জীবন কথা। এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৫ই জ্যৈষ্ঠ বিবেকানন্দ কিশোর-সমিতির উদ্যোগে একটি প্রীতি সম্মেলন হয়। ৬ই জ্যৈষ্ঠ সর্বদিনব্যাপী আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত পট পুরোভাগে লইয়া ভক্তগণ মাতৃসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। প্রায় সহস্র লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কলমার উৎসবের পর সাধুগণ ও অনেক ভক্ত লৌহজঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসব করিতে তথায় গমন করেন। সেখানে ৮ই জ্যৈষ্ঠ বিকালে মহতী জনসভায় স্বামী শর্মানন্দ ও স্বামী যোগস্থানন্দ ঠাকুর ও মায়ের প্রসঙ্গ লইয়া বক্তৃতা করেন। ঢাকার শ্রীমতী আশালতা সেন এই সভায় সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। ৯ই জ্যৈষ্ঠ সমস্তদিন ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। সারাদিন "নিমাই সন্ন্যাস" পালা কীর্তন হয়। প্রায় ৪০০০ লোক বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। স্বামী শর্মানন্দ ঠাকুর ও মায়ের বিশেষ পূজাদি সম্পন্ন করেন। রাত্রিতে বহুক্ষণ ধরিয়া সামাগত সাধুরা ভজন গান করেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ৩রা

হইতে ৫ই বৈশাখ দিবসত্রয় ব্যাপী শ্রীমা সারদাদেবীর উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করিয়া পূজা-মণ্ডপে পরিণত করা হয় ও বেদীতে শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর প্রকৃতি স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় দিন পূজা, পাঠ, কীর্তন, হোম, ভোগ-রাগাদিতে প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে নদীয়ার জেলা-শাসক শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বৃহৎ জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী বিমুক্তানন্দ, সুকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ বেশ সুন্দর হইয়াছিল। তৃতীয়দিন সহস্রাধিক নরনারী ও বালক-বালিকা কীর্তন ও জয়ধ্বনি সহকারে দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী একটি শোভাযাত্রা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমতী মিনতি গুপ্তার নেত্রীত্বে একটি মহিলা সভা হয়। উহাতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী বাসুদেবানন্দ।

হাফলং (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে বিগত ২১শে হইতে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তিন দিন শ্রীমা সারদাদেবীর জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী শিবরামানন্দ, স্বামী প্রতিভানন্দ, স্বামী কাশিকানন্দ যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেন। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদ ও চণ্ডীপাঠ, পূজা, আলোচনা-সভা, ভজন, শোভাযাত্রা, প্রসাদ বিতরণ, ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া কয়টি দিন অত্যন্ত আনন্দ ও পবিত্রতার পরিবেশে অতিবাহিত হয়। শ্রীমায়ের জীবনচিত্র ও পাহাড়ী শিল্পকলা প্রদর্শনী দর্শন করিতে বহু দর্শক প্রত্যহ দুর গ্রামাঞ্চল হইতে আগমন করিতেন। শ্রীমতী ইলা বসুর নেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভা এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ও স্বামী শিবরামানন্দের পরিচালনায় দুই দিন দুইটি ধর্মসভা হয়। এই সমস্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীমায়ের জীবনী, সাধনা ও তাঁহার অমৃতবাণী অবলম্বনে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। হাফলং নগরীর ইতিহাসে এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অভিনব।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী

গত ১লা আষাঢ় বুধবার (১৬ই জুন) শুভ স্নান-যাত্রা দিবসে বিপুল জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শতবর্ষ পূর্বে ১২৬২ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নান-যাত্রার দিন (১৮৫৫ সালের ৩১শে মে) নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দেবালয় স্থাপিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী রানী রাসমণির প্রস্তর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এই মূর্তিটি পরে মূল মন্দির-প্রাঙ্গণের বহির্দেশে নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে কলিকাতার অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তা শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে রানী রাসমণির পুণ্য জীবনের মাধুর্য, তেজস্বিতা, তপস্যা ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃপ্রভাবে আজ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ-পূজা, হোম, কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

৫ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-পর্বে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে মন্দির-প্রাঙ্গণে এক জনসভা হয়। উহাতে বক্তৃতা করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরেবতীমোহন মান্না ও শ্রীআলামোহন দাশ। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রানী রাসমণির উদ্দেশে স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভ্রমসংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধনে ২৪৫ পৃষ্ঠায় 'জয়রামবাটীতে অবিস্মরণীয় উৎসব'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনটি তথ্য-সংক্রান্ত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৫	বাম	২য়	১৯২৪ সাল	১৯২৩ সাল
ঐ	ডান	৩য়	বাসন্তী সপ্তমী	অশোকষষ্ঠী
২৪৭	বাম	১৯	চারজন	তিনজন



কৃষ্ণময় জীবন

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৮০।৩,৪

যে জিহ্বা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর গুণাবলী কীর্তন করা হয়, তাহাই সার্থক জিহ্বা। যে হাত দুটি শ্রীভগবানের প্রীতিকর কাজ করিয়া চলে, উহারাই সার্থক হাত। চর এবং অচর এই নিখিল বিশ্বসংসারে শ্রীহরি ওতপ্রোত রহিয়াছেন—যে মন ইহা ধারণা করিতে পারে, সর্বদা স্মরণ করিতে পারে তাহাকেই বলি সার্থক মন। নরদেহ স্বীকার করিয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে যে সকল অদ্ভুত কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পবিত্র কাহিনী যে কান শ্রবণ করে তাহারই তো কর্ণেন্দ্রিয়ত্ব সার্থক।

ধন্য সেই মস্তক যাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উভয়মূর্তি—মন্দিরে পূজিত দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের বাহিরে অখিল স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিরাট বিশ্ব-বিগ্রহকে প্রণাম করে, আর সফল সেই চক্ষু যাহা তাঁহাকে এই উভয়রূপেই দেখিতে পায়। ধন্য দেহের অঙ্গসমূহ যদি তাহারা বিষ্ণুর এবং বিষ্ণুভক্তগণের পাদোদক প্রতিদিন ভক্তিভরে ধারণ করে।

[আমাদিগের সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনকে নিয়োগ করিতে হইবে শ্রীভগবানের অনুভূতিতে, তাঁহার সেবায়, তাঁহার স্মরণে। আমাদিগের সত্তার এমন কোন অংশ থাকিবে না যাহা ভগবচ্চেতনায় তৎপর নহে। সমগ্র জীবন আমাদের হওয়া চাই কৃষ্ণময়।]

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মমেঘ

ধর্ম কাহারও জীবনে কষ্টের সাধনা, কাহারও জীবনে দুদণ্ডের কৌতূহল বা বিলাসমাত্র, কিন্তু কাহারও নিকট উহা চরিত্রের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য—নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো জীবনসত্তার অবিচ্ছেদ্য সহচর। এই শেষোক্ত সৌভাগ্যবান ধর্মের মূল উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই উৎসের নাম 'সমাধি'—পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ। শ্রীমৎ বিদ্যারণ্যস্বামী তাঁহার 'পঞ্চদশী' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—

ধর্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥

"চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূর হইয়া উহা যখন ধ্যেয় পরমাত্মাতে নিশ্চলরূপে অবস্থান করে, তখন চিত্তের ঐ অবস্থার নাম সমাধি। ব্রহ্মজ্ঞগণ এই সমাধিকে বলেন 'ধর্মমেঘ'—কেননা উহা হইতেই জীবনে সহস্র ধারায় নামিয়া আসে ধর্মামৃতের বন্যা।"

বন্যা আসিলে কেহ আর জলকষ্টের কথা ভাবে না—জলের হিসাবনিকাশ করে না। জল—জল, কেবলই জল, চারিধারে জল। যত খুশী যেভাবে খুশী, যখন খুশী জলের প্রয়োজন মিটাইয়া লও। সেইরূপ ধর্মামৃতধারা যখন জীবনে প্রবাহিত হয়, তখন আলাদা একটি থলিতে আর পুণ্যসঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয় না। যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, যাহা কিছু কথা কওয়া যায়, যাহা কিছু কর্ম সম্পাদিত হয় সকলই তখন পুণ্যময়, ধর্মময়। চেষ্টা করিয়া তখন কেহ সত্য বলে না, কসরৎ করিয়া তখন কাহাকেও প্রলোভন জয় করিতে হয় না, নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া তখন কেহ মৈত্রী, করুণা, ক্ষমা সাধে না। লোহা যে তখন স্পর্শমণির ছোঁয়াচ লাগিয়া সোনা হইয়া গিয়াছে—লোহের মলিনতা, কাঠিন্য, ভঙ্গুরতা প্রভৃতির আর আশঙ্কা কোথায়? যে মানুষ মানুষের অন্তরতম সত্যের সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবনাকাশে ধর্মমেঘের সঞ্চার করিতে পারিয়াছে, সে-ই যথার্থ ধার্মিক। সে ধর্মাচরণ করে না—তাহারই আচরণ হয় ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় পিতা তাহার হাত ধরিয়াছেন, তাহার আর পড়িবার ভয় নাই।

'সমাধি' বা ভাগবতসত্তার অনুভূতি ব্যতীত যে ধর্মাচরণ—উহা বাঞ্ছিত সার্থকতা লাভ করে না। এই ধর্ম যেন একটি প্রাথমিক পাঠমাত্র। উহা আমাদিগকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারে না। উহার উপকারিতা অবশ্যই আছে—উহাকে ধরিয়াই আমাদের শ্রেয়ের সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে একথাও সত্য—কিন্তু ধর্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য উহা হইতে অনেক দূরে। কিছু স্নান, কিছু দান, কিছু আচারনিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, কিছু জপ পূজা—এইরূপ 'কিছু'-মূল্যে বৃহৎ বস্তু করাধিগত হইবার নয়। 'কিছু' কিছুকালের সঙ্গী হউক, চিরদিনের যেন না হয়। অতএব এমন দিনকে ব্যাকুলভাবে চাহিতে হইবে, যেদিন সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে উৎসে যাইবার জন্য, জীবন-সত্যের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য; পৃথিবীর বিবিধ আকর্ষণের জন্য এতদিন যত চোখের জল ফেলিয়াছি, তাহার শতগুণ অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে অপার্থিব ভগবদাকর্ষণের জন্য।

এমন দিন শুধু দুচারজনেরই জীবনে আসিবার—এইরূপ যেন আমরা মনে না করি। সকলেরই ঐ দিনকে চাহিবার অধিকার আছে। উপনিষৎ ও

গীতাদি শাস্ত্র বার বার আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, যে চাহিবে সে-ই পাইবে, পাইয়া ধন্য হইবে; যে না চাহিবে, সে ঠকিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"তিনি আপনার বাপ, আপনার মা—তাঁর উপর জোর খাটে। * * তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপর সমান স্নেহ। * * তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়। * * কর্ম যে বরাবরই করতে হয় তা নয়। ঈশ্বরলাভ হলে আর কর্ম থাকে না। * * তাঁতে মগ্ন হলে অসৎবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি থাকে না। * * আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়। ঈশ্বরের কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়। * * জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ...শাস্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে···এরূপ ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধী কর্মের প্রয়োজন হয় না। * * প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি। * * যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়। * * যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে আর অহঙ্কার থাকে না। কি রকম জানো? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে—সমাধিস্থ হলে অহংরূপ ছায়া থাকে না।"

'তাঁকে ঘরে আনা,' 'আত্মার সাক্ষাৎকার', 'ঈশ্বরের কৃপা হওয়া', 'ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি'—শ্রীরামকৃষ্ণকথিত এই বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির অর্থ একই—জীবনের পরম ও চরম সত্যের অনুভূতি। উহাই ধর্মমেঘ—ধর্মের অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের উৎস। যে জলধারাকে নিত্যসঞ্জীবিত করিবার মত কোন উৎস পশ্চাতে নাই, সে ধারা পথে শুকাইয়া যাইতে পারে—সে ধারার স্রোত-বেগ মন্দীভূত, এমন কি একেবারেই বিলুপ্ত হইতে পারে—সে ধারার উপর আমাদের আস্থা সংশয়াকুল। যে ধর্মকৃত্য বা ধর্মদৃষ্টি মাত্র সামাজিক নিয়মরক্ষা মাত্র তাহা শ্রেষ্ঠ কল্যাণশক্তি নয়। চরাচর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে নিগূঢ় সাম্য ও শান্তি নিহিত আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়া এই আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার দ্বারা মানবসমাজে মহামিলন সম্পাদিত হইবার নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিবাদ, নিপীড়ন প্রভৃতির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি ঘটা সম্ভবপর হইয়াছিল ধর্ম তাহার লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই বলিয়াই, উহাকে সংসারের আর দশটা জিনিসের মতই বৈঠকখানা সাজাইবার সৌখীন একটা জাপানী ফুলদানিমাত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই। মানুষ যেখানে ভূমাকে আবিষ্কার করিয়াছে—ভূমা যেখানে জীবনে কল্যাণ-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, সেখানে মানুষের ইতিহাস লিখিত হয় অন্যভাবে। সে ইতিহাস লইয়া উত্তর-কালীনরা কোন সংশয় তুলেনা, লজ্জিত হয় না। সে ইতিহাসে মানুষের আত্মিক মহিমা চিরদিন অপরিম্লান বিভায় জল্ জল্ করে।

আমরা যখন বলি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ধর্মে—তখন আমরা ধর্মের গতানুগতিক আচার ও বিশ্বাসগুলির কথা বুঝাই না—বুঝাই ধর্মের মূলকেন্দ্র 'ধর্মমেঘের' কথা। কতকগুলি অন্ধ আচার ও বিশ্বাস জাতির সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে না; খণ্ডিতভাবে পারে, কিছুকালের জন্য পারে। কিন্তু জাতির সমস্ত দেহে বিপুল আলোড়ন আনিয়া দেয় সামগ্রিক সত্যের বিজ্ঞান—'ধর্মমেঘ'। ভারতীয় জাতির জীবনে ইহাই ঘটিয়াছিল। আজ যদি আবার আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্রকৃতি লইয়া গর্বপ্রকাশ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগেরও দায়িত্ব আধ্যাত্মিকতার উৎসকে বিস্মৃত না হওয়া, ঐ উৎস হইতে জাতীয় জীবনকে বিচ্ছিন্ন না করা, ঐ উৎসে পৌঁছিবার উৎসাহকে সজীব রাখা।

কেহ যদি বলে,—'আমি এই দুনিয়ার কোন

কিছু চাইনা ; অর্থ, মান, ভোগসুখ এ সকল আমার প্রয়োজন নাই, আমি চাই শুধু সত্যকে লাভ করিতে, ঈশ্বরদর্শন করিতে' তাহা হইলে আমরা যেন তাহাকে 'ইহকাল বিমুখ' বলিয়া উপহাস না করি। সকলেই কিছু এইরূপ পাগল হইবে না—কিন্তু যে হইতে পারে ভারতবর্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দিয়া আসা হইয়াছে। অন্যান্য দেশ বা জাতির তুলনায় ভারতের মাটিতে এইরূপ 'পাগল' অনেক বেশী জন্মায়। ইহা ভারতবর্ষের লজ্জা নয়, শক্তি। যে যায় সে তো আবার ফিরিয়া আসিবার জন্যই যায়। বুদ্ধ গিয়াছিলেন, শঙ্কর গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন,—কিন্তু প্রত্যেকেই যখন ফিরিয়া আসিলেন, জগৎকে কত সম্পদ দিয়া গেলেন—কত শক্তি, কত উৎসাহ, কত শান্তি, কত সামঞ্জস্য, কত যুগের জন্য কত ঐশ্বর্য রাখিয়া গেলেন। ধর্মমেঘ মানুষের জীবন-আকাশে নিষ্ফল শোভামাত্র নয়—উহা 'সহস্রশঃ' 'ধর্মামৃতধারা' বর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সেই অমৃতধারায় সমাজের যাহা কিছু কল্যাণজনক সকলই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তি

জন্মাষ্টমী আসিতেছে।

জন্মিয়াই যিনি মানুষকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন নানাভাবে নিকটের, দূরের আবালবৃদ্ধবনিতা শত্রু মিত্র সকলকে আকর্ষণ করিয়া গেলেন, আবার পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পর সুচিরকালের জন্য বিশাল ভারতবর্ষের দিকে দিকে উত্তরকালীনদের হৃদয়ে হৃদয়ে এক দুরতিক্রম্য আকর্ষণ রাখিয়া গেলেন—তাঁহার জন্মের কথা, সর্বাকর্ষক কৃষ্ণের মর্ত্যজীবন-লীলার কথা মনে পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসাধারণ কীর্তির কথা। কত ভালবাসা, কত কোমলতা, আবার কত রোষ, কত কঠোরতা ; কত প্রচণ্ড কর্মব্যাপৃতি, সংগ্রাম, আবার কত শান্তি, ঔদাস্য। এই সবগুলিরই মধ্যে একটি জিনিস কিন্তু সাধারণ—তাঁহার দুর্বার আকর্ষণ। আকর্ষণই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তি। সর্বভাবে সর্বকালে সর্বসংসারকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ।

শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ত্রিভুবনের যাহাকিছু রমণীয় তাহা তাঁহার মনোহর মূর্তির নিকট যেন ম্লান হইয়া যাইত, মানুষের চোখ তাঁহার দিকে একবার চাহিলে আর অপর বস্তুর দিকে চাহিতে পারিত না, তাঁহার মধু-নিস্যন্দী জ্ঞান-গর্ভ বাক্য শুনিলে, স্মরণ করিলে মানব-চিত্ত চিরকালের মতো আকৃষ্ট হইয়া থাকিত, তাঁহার পদচিহ্ন অবলোকন করিলে মানুষ সকল কাজ ছাড়িয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। এমনই আকর্ষণে তিনি সকলকে আভিভূত করিয়া দিতেন। তাঁহার বহু-বিচিত্রময় জীবনে যে সকল কর্ম তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার লোকোত্তর মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাবীকালের নরনারী উহা অনুধ্যান করিয়া সহজেই হৃদয়ের মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এই কীর্তি রাখিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ধামে প্রয়াণ করিলেন।*" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৬,৭)

সংসারে কত নয়নবিমোহন শিশু আসিয়াছে, খেলিয়াছে, কত প্রেমিক নির্মল ভালবাসার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছে, কত রাজা, কত যোদ্ধা ইতিহাসে দাগ রাখিয়াছে, কত তপস্বী তপস্যা করিয়াছে, কত জ্ঞানী তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও কত বক্তা বাক্যৈশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সে সকল কীর্তি মানব-কীর্তিই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু মানবতার মানদণ্ডে উহার প্রভাব নির্ণয় করা

* স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাং।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥
আচ্ছিদ্য কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্যহ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥

যায় না। মানবকীর্তি জাগায় বিস্ময়, শ্রদ্ধা; উদ্রিক্ত করে প্রশংসা; রচনা করে ইতিহাস, কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তি উন্মেষ করে নির্মল ভক্তি; আনে অতীন্দ্রিয় আবেশ; গড়ে সত্যদৃষ্টিদায়ী সংশাস্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ শিশু, প্রেমিক, রাজা, যোদ্ধা, তপস্বী, জ্ঞানী, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা কিন্তু প্রত্যেক ভূমিকার পশ্চাতে তাঁহার ভগবত্তা ছাইয়া আছে। তাই এই সকল ভূমিকায় তাঁহাতে যে মাধুর্য, যে বীর্য প্রকট হইয়াছিল—মানুষ তাহা পরিমাপ করিতে পারে না, ভাষাতেও প্রকাশ করিতে পারে না। উহা চিরন্তন ধ্যানের বস্তু।

প্রশংসনীয়

'ইউ এস্ আই এস্' এর একটি সংবাদে প্রকাশ—এই জুলাই এবং আগষ্ট মাসে আমেরিকার 'ন্যাস্‌নাল কাউন্সিল্ অব্ চার্চেস্'-এর উদ্যোগে আমেরিকার অনুকূল এবং মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশযুক্ত কয়েকটি স্থানে একান্তভাবে ভগবৎচিন্তা এবং প্রার্থনাদিতে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাইতে সমুৎসুক ১৪০০ মার্কিন দেশবাসীর জন্য 'আশ্রমবাসের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক একটি স্থানে একসঙ্গে আন্দাজ দুই শত ব্যক্তি এক এক সপ্তাহ করিয়া থাকিবেন। আশ্রমজীবনের এই পরিকল্পনাটি হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের অনুকরণে আমেরিকায় চালু করিয়াছেন ডাঃ ই স্ট্যান্‌লি জোন্‌স্। ইনি পূর্বে ভারতবর্ষে মিশনারী-রূপে ছিলেন।

শত প্রকারের উত্তেজনাময় কর্মব্যস্ত জীবনে এইরূপ অন্তর্মুখীনতা অভ্যাসের অল্পমাত্র সুযোগও সমধিক আদরণীয়। খ্রীষ্টধর্মের ঐতিহ্যে এইরূপ নির্জনে ঈশ্বরচিন্তার প্রথা সুপরিচিত। পশ্চিম ইয়োরোপের লাটিন দেশসমূহে ৬।৭ শতাব্দী পূর্বেকার মঠগুলির কথা স্মরণীয়। খ্রীষ্টধর্মের মূল সত্যগুলি জীবনে পরিণত করিবার আগ্রহ তখন খ্রীষ্টান সমাজে জাগ্রত ছিল। তাই নির্জনবাস, প্রার্থনা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, ভক্তি—এ সকল আধ্যাত্মিক সাধনগুলি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের নিকট আদরণীয় ছিল।

পরবর্তীকালে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের প্রসার এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা উৎকট ভোগবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে যখন আচ্ছন্ন হইল, তখন ধর্মের অন্তরঙ্গসাধনার দিকে মানুষের হুঁশ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতে থাকে এবং ধর্ম কেবল গীর্জা-সংক্রান্ত কতকগুলি বিধির আনুগত্যে পর্যবসিত হয়। খ্রীষ্ট-ধর্মের ইহা যে দারুণ সঙ্কট তাহা স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীঃ হইতে প্রায় চার বৎসর আমেরিকা মহাদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভীক উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দিগকে 'হিন্দু' হইতে বলেন নাই, বলিয়াছিলেন যথার্থ খ্রীষ্টান হইতে। ধর্ম যদি এক ধরনের সামাজিকতামাত্র রহিয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মের প্রাণশক্তি শুকাইয়া যায়। ধর্ম তখনই সতেজ ও কল্যাণপ্রদ, যখন উহা ব্যষ্টিগত জীবনের একটি সত্যদৃষ্টি এবং ভগবদুন্মুখী বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুশীলিত হয়।

'ইউ এস্ আই এস্' যে সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন, উহার বিশদ পূর্বপশ্চাৎ বিবরণ জানা নাই বলিয়া দূর হইতে আমেরিকান গীর্জার জাতীয় সংসদের উপরোক্ত উদ্যমের বিস্তারিত বিচার করা সম্ভবপর নয়—তবে মার্কিন ধর্মজীবনের পক্ষে পরিকল্পনাটির উপকারিতা সম্বন্ধে আস্থা হয় এবং এইজন্যই উহার প্রশংসা করি।

নিন্দনীয়

দৈনিক বসুমতী এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন—

(নিজস্ব সংবাদ)

মহিষবাথান (২৪ পরগণা), ২৭শে, জুন :—সম্প্রতি স্থানীয় কৃষ্ণপুর গীর্জায় এক সাধুর আবির্ভাব ঘটে। ইনি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন বলিয়া জনরব প্রচারিত হইলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় উক্ত গীর্জায় বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। সাধুবাবাজী

অন্ধের চক্ষু, বোবার বাকশক্তি এবং খঞ্জকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটিবার শক্তি প্রদান করিতে পারেন বলিয়া প্রচার করা হয়। কোনও রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা এই সাধুবেশী ভদ্রলোকটিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক বলিয়া অনুমান করিতেছেন। গত ২১শে জুন তিনি উক্ত গীর্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল।

এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যাইতেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী মহলে বহু আলোচনাও চলিতেছে। উপরোক্ত সংবাদটি মিশনারীদের 'নিঃস্বার্থ কল্যাণচেষ্টার' একটি নূতন নমুনা। কিছুকাল পূর্বে জনৈক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক একটি সংবাদপত্রে মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'অখ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্মে আনয়ন' — খ্রীষ্টধর্মের একটি প্রধানতম কৃত্য। অতএব মিশনারীদের এই চেষ্টাকে নিন্দা কর কেন?' এ দেশ যখন খ্রীষ্টান রাজশক্তির অধীনে ছিল তখন 'খ্রীষ্টধর্মের এই প্রধান কৃত্যটির' কথা খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এমন নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন নাই। আজ 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতরাষ্ট্রে তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা কাটিয়া গিয়াছে! আজ তাঁহাদের অপকর্মকে তাঁহারা জোর গলায় সমর্থন করিতে শঙ্কিত হন না।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কর্তব্য সুস্পষ্ট। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজে যাঁহারা 'বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত' (privileged)—বিত্তায়, আভিজাত্যে, ধনসম্পদে—তাঁহাদিগকে নিজেদের অধিকার লইয়া নিরাপদ কোণে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব, যত দিকে সম্ভব 'বঞ্চিত' গণকে তুলিয়া লইবার দায়িত্ব তাঁহাদিগকেই বেশি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'বঞ্চিত'গণই খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ধর্মান্তরীকরণের লক্ষ্য। হিন্দুসমাজে যদি তাহাদের জন্য সহানুভূতি, সাম্য, উদার ব্যবহারের প্রাচুর্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিতই পরধর্ম গ্রহণ করিতে পা বাড়াইবে না। কি মর্মান্তিক দুঃখে তাহাদিগকে স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হয়, তাহাই আজ সমাজশীর্ষগণের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিবার।

জন্মাষ্টমী

শান্তশীল দাশ

গীতা-উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ আজ তোমার জন্মদিনে,
ব্যাকুল চিত্তে তোমারে স্মরণ করি।
ঘন দুঃখের দুর্গম পথে আমরা পথিক সবে,
সমুখে মোদের অতন্দ্র বিভাবরী।

চলার মন্ত্র ভুলে গেছি মোরা, রুদ্ধ হয়েছে গতি,
সীমাহীন শুধু গভীর অন্ধকার।
সকল আলোর হে দিশারী! আজ জ্ঞান-বর্তিকা জ্বালো,
যুগ-সঞ্চিত শেষ হোক্ তমসার।

পার্থ আজিকে বড় অসহায়, মোহ-অঞ্জন চোখে,
সমর ক্ষেত্র নির্বাক, নিশ্চল;
হরণ করেছে কে যেন তাহার অতুলন বিক্রম,
গাণ্ডীব ধনু হতাশায় বিহ্বল।

হে চির সারথি! দূর করে দাও চিত্তের অবসাদ,
ক্ষাত্র তেজের কর হে উদ্বোধন;
কর্মযোগের দুরূহ মন্ত্রে দীক্ষা দাও আবার,
ঘুচে যাক্ তার ক্লীবতার আবরণ।

অন্ধ-দৃষ্টি মানুষ আজিকে, পৃথিবী বেদনা-ম্লান,
আঁখিজল ঝরে, ওগো চির-সুন্দর!
এস আর বার ধরিত্রী-বুকে কাতরে স্মরণ করি,
কর ধরণীরে পুন চির-ভাস্বর।

আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্মবাণী

স্বামী পবিত্রানন্দ

[১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, 'ভয়েস্ অব আমেরিকা'র দূর প্রাচ্য দেশগুলির জন্য প্রদত্ত বেতারভাষণ হইতে সঙ্কলিত।]

আমি তিনবছর আগে এদেশে এসেছি। ঠিক ১৯৫১ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমি নিউইয়র্কে পা দিই। ভারত ত্যাগ করবার সময়, দেশের সেই-সময়কার অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর আমাদের দেশে এল উদ্বাস্তু, খাদ্য এবং অন্যান্য বিবিধ সমস্যা। বহু লোকের মনে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিল। সত্য বলতে কি, এই অবস্থা আমার উপরও যে প্রতিক্রিয়া করেনি, তা নয়। কখনও কখনও আমিও বড় মনমরা হয়ে যেতাম। কিন্তু ভারতের বাহিরে আসার পর যখন পাশ্চাত্ত্য দেশ সম্বন্ধে জানলাম, তখন আমাকে মানতেই হল যে, মানুষ সর্বত্রই সেই মানুষ। সব খানেই সে পরিস্থিতি ও সংকটের সংগে সংগ্রাম করে চলেছে। তার জীবন উত্থান ও পতন, ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত। এখন এই দূর থেকে যখন ভারতের দিকে ফিরে চাই এবং অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি যে, ভারত কিভাবে তার কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে, তখন প্রশংসায় হৃদয় ভরে উঠে। কোন কাজেই ফল সহসা আসে না, সময় লাগে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে, তা থেকে সে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসবেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ, আমাকে নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির কার্যভারের দায়িত্ব দিয়ে এদেশে পাঠিয়েছেন। এই সমিতি, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, ১৮৯৩ খ্রীঃ তিনি এদেশে এসে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করেন। তিনি হিন্দুধর্ম, অর্থাৎ দার্শনিক সংজ্ঞায় বললে, 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেই একটি বক্তৃতাই তাঁকে প্রসিদ্ধ করে তুললো, অপরিচিতির অন্ধকার থেকে তাঁকে নিয়ে এলো জগতের প্রচণ্ড দিবা-লোকের সামনে। সেই রাতে বিবেকানন্দ অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন, কেননা ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ একজন সন্ন্যাসীর যেমন সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে থাকা কাম্য তেমনি করে তিনি আর অপরিচিত ও অলক্ষিত থাকতে পারবেন না।

ভারতের তটভূমি ত্যাগ করে কোন হিন্দু সন্ন্যাসীর বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করতে যাওয়া স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঘটল অন্ততঃ হাজার বৎসর পরে। পুরাকালে বা বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা ভারতের সীমারেখা পার হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর নানা কারণে আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছিল কঠোর এবং এমনকি গৃহী ব্যক্তিও বিপুল সামাজিক বাধার সম্মুখীন না হয়ে তথাকথিত 'কালাপানি' বা সমুদ্র পার হতে সাহস করত না।

পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যে আমেরিকাতেই গিয়ে প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন এটা কি অদ্ভুত নয়? এমনি করে কি তিনি পৃথিবীর অতি প্রাচীনতম দেশ গুলোর একটির, ও তুলনায় একটি অতি আধুনিক জাতির মধ্যে সেতু-স্বরূপ হন নি? এর কি এই ইঙ্গিত নয় যে, ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ আমেরিকার যন্ত্রশক্তির সংগে সংযুক্ত হয়ে জগতে আনবে একটি উন্নততর অবস্থা? কারণ দুটোরই প্রয়োজন আছে।

কোন মানুষ বা জাতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ছাড়া পাশবিক স্তরে পতিত হয়। আবার কোন মানুষ বা জাতি যতদিন না তার জাগতিক প্রয়োজনের সমস্যা সমাধান করতে পারছে, ততদিন তার বাঁচার আশা থাকতে পারে না। ক্ষিদেয় যখন পেট জ্বলে, সে অবস্থায় ধর্ম এবং ঈশ্বরের চিন্তা করা যায় না। রাজনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক বাধার ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী দারিদ্র্য ও হৃদয়-বিদারক দুঃখ থাকা সত্ত্বেও ভারত যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত রাখতে সক্ষম হয়েছে, এটা পৃথিবীর কাছে একটি বিরাট বিস্ময়। ভারতেতিহাসের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তা লোক সমক্ষে দেখিয়ে গেছেন ও জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্যের পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। কিন্তু শুধু অতীতের গৌরব করলে চলবে না। আমাদের উচিত বর্তমানকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করা ও বেশি না পারলেও অন্তত: তাকে অতীতের মত গৌরবোজ্জ্বল করে তোলা। প্রত্যেক ভারত-বাসীর উপর এই বিরাট দায়িত্বভার ন্যস্ত আছে

:খন দেখা যাক, পাশ্চাত্যে এবং এই দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের কোন্ বাণী বহন করে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অনবরত চেষ্টা করে নিখুঁত হতে হবে, দেবতা হতে হবে, ঈশ্বরকে পেতে ও দেখতে হবে, আর এই ঈশ্বরকে পাওয়া ও দেখা—স্বর্গীয় পিতা যেমন নির্দোষ তেমনি নির্দোষ হওয়াতেই আছে যথার্থ ধর্মের বীজ। মনুষ্যজীবনে মানুষের পক্ষে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। এ নয় যে, এই সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে মানুষকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। হিন্দুধর্ম বলে, এই জীবনেই ভগবানকে দেখা ও লাভ করা যায়। মানুষ সাক্ষাৎ সত্যদর্শন করে তার সমগ্র জীবনকে পরিবর্তিত করেছে, জগতের ইতিহাসে এই রকম অনেক নিদর্শন আছে।

আধ্যাত্মিক আদর্শের এই যদি মর্মকথা হয়, তবে তো ধর্মে ধর্মে ভেদ থাকে না। একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তাহলে অপরটিও সত্য। সেই একই পূর্ণতা লাভার্থে বিভিন্ন ধর্ম, যেন বিভিন্ন চেষ্টা মাত্র। তাই বেদান্ত কেবল ধর্ম বিষয়ে পরমতসহিষ্ণুতার কথা না ব'লে, বলে থাকে একই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য, সব ধর্মই স্বীকার্য।

আমেরিকায় বা পাশ্চাত্যের সবগুলি বেদান্ত কেন্দ্রে ধর্মের প্রতি আমাদের এই উদার দৃষ্টিভংগী দেখে অনেকে আকৃষ্ট হয়। ধর্মক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও মতবাদসর্বস্ব আধুনিক পরিবেশে এমন লোকও আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের নামে সংকীর্ণতা সহ্য করতে পারেন না ও বেদান্তবাণীর সংস্পর্শ পেয়ে অন্তরে শান্তি পান।

নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের উপাসনা মন্দিরের একটি দেওয়ালে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতীক খোদিত আছে ; যথা ইসলামের 'অর্ধচন্দ্র,' বৌদ্ধদের 'ধর্মচক্র,' বেদান্তের 'ওঁ,' ইহুদিদের 'তারকা' এবং খ্রীষ্টধর্মের 'ক্রুশ'। এ সবের নীচে লেখা আছে—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—।" "সত্য এক, জ্ঞানিগণ উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।" এই ভাবই আমাদের অবলম্বন এবং আমাদের প্রাণপণে এইভাব গ্রহণ করিতে দেখে অনেকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন।

আমেরিকায় এখন আমাদের ১১টি কেন্দ্র আছে। দুটি নিউইয়র্কে, তিনটি ক্যালিফোর্ণিয়ায় এবং বোষ্টন, প্রভিডেন্স, সেণ্ট লুই, চিকাগো, সিয়েটল ও পোর্ট-ল্যাণ্ড এই সব স্থানে একটি করে। এই রাষ্ট্রে আমরা সবাই মিলে, রামকৃষ্ণ মিশনের ১০জন সন্ন্যাসী কর্মরত রয়েছি।

ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম ও অন্যত্র রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের কাজ হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা ও ধর্ম বিষয়ক কর্মানুষ্ঠান-পরিচালনা। এখানে আমেরিকায় আমরা কেবল প্রচার-কাজই করি। বক্তৃতা এবং

পুস্তকাদির প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে সাধারণতঃ এদেশের গীর্জাগুলিতে যেমন হয়, আমরাও তেমনি রবিবার সকালে বক্তৃতা করে থাকি এবং সপ্তাহের মধ্যে দুদিন কিংবা একদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রালোচনা ও ধ্যান ধারণার শিক্ষাদান করি। আধ্যাত্মিক সমস্যা নিয়ে লোকেরা আমাদের সংগে আলোচনা করতে আসেন। এটা বাস্তবিকই খুব দরকারী কাজ। আমাদের নিজেদের পাঠালোচনা ছাড়াও, বাহিরের ধর্মসভায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা প্রায়ই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান পাই। বাহিরে এই ভাবের বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার অপসারণ হয়। জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যদিও নিকটবর্তী হতে চলেছে তবুও, এখনও এই ভ্রান্ত ধারণা অতিমাত্রায় বর্তমান।

আমাদের ধর্মসভায় যে খুব বেশী লোক হয় তা বলা যায় না। বাস্তবিক বলতে কি আমেরিকার কয়েকটি গীর্জায় যে জনসমাগম হয় সে তুলনায় আমাদের শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু যে ঐকান্তিকতা ও অকপটতা নিয়ে আমাদের কেন্দ্রগুলিতে শ্রোতারা আসেন তা বিস্ময়কর। তাঁরা কোন সিদ্ধাই দেখবেন বলে আসেন না। যাঁরা ইন্দ্রজালপটু সন্ন্যাসী বা প্রাচ্য যোগীর কাছ থেকে কিছু সিদ্ধাই দেখবার আশায় আসেন, তাঁরা আপনা হতেই সরে পড়েন। আমাদের কাছে যাঁরা আসেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য স্পষ্ট কিছু পেতে চান। সময়ে সময়ে ভাবি, এ আমাদের এক মহাদায়িত্ব। শ্রীভগবান—যাঁর নামে আমরা এখানে এসেছি, আমাদের যেন পূর্ণরূপে এ দায়িত্ব পালন করতে শক্তি দেন।

বিশেষ করে, যখন প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের এক দেশে কাজ করছি, তখন বেদান্ত সেই ধর্মকে কি চোখে দেখে এখন তাই দেখা যাক। পূর্বেই বলেছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সব ধর্ম মূলতঃ এক। অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সেগুলোকে তো সহজেই উপেক্ষা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা ধরা যাক। ক্রীশ্চানরা জড় দেহের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। আমরা বলি, এ দেহ কিছুই নয়, আধ্যাত্মিক শরীরই নিত্য বস্তু। জড় দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক দেহ অনন্তকাল থাকে। যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা জড় দেহ না দেখে আধ্যাত্মিক দেহ দেখেছিলেন। এই সমর্থনে আমরা সেণ্ট পলের ভাষণ উদ্ধৃত করতে পারি: "মৃতের পুনরুত্থানও সেই রকম। পাপের মধ্যে পুনরুত্থানের বীজ উপ্ত হয়; নিষ্পাপ অবস্থায় ইহা উত্থিত হয়" ··· "প্রাকৃত দেহে ইহা উপ্ত হয়; আধ্যাত্মিক শরীরে ইহা উত্থিত হয়।"

আমাদেরও এই কথা। কিন্তু ব্যাখ্যার পার্থক্যে কি কিছু এসে যায়? যীশু বলেছিলেন:—

(১) মানুষ যদি তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলে, তবে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হলেই বা লাভ কি?

(২) আগে ভগবানকে খোঁজ, আর সব এসে যাবে।

(৩) মন, প্রাণ, অন্তর দিয়ে তোমার প্রভুকে, তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে।

(৪) প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসবে।

ব্যাখার কোন পার্থক্য কি যীশুর এই সব বাণীর গৌরবকে ছোট করতে পারে?

যীশু প্যালেস্টাইনের প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের কি মূলকথা নয়? ঈশ্বর বিভিন্ন 'প্রেরিত পুরুষ' ও বিভিন্ন অবতারকে সহায় করে বিবিধ ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু আমরা যদি যত্ন করে তা অনুসরণ করি তবেই না বুঝব যে, তাঁরা একই সত্য প্রচার করেন।

আজ যীশুর পুনরুত্থানের দিন। ক্রীশ্চানরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের উপকারার্থে এই দিনে তিনি সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু

আমরা যদি তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করি, তবেই সেই উপকার সাধিত হয়। তাঁর বাণী হল মানবতার শাশ্বত বাণী, যা সদাই আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ।

আমরা জগতের এক সংকটময় কালে বাস করছি। এখন আবার এক যুদ্ধপ্রস্তুতির মহড়া চলেছে। সকলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে সমগ্র বিশ্ব ও তার সঙ্গে মানুষের এত দিনের চেষ্টা ও শ্রম-নির্মিত সমগ্র সভ্যতা বিনষ্ট হইবে। লোক হতাশায় কেঁদে বলে—মানুষ মানুষের কি দশা করেছে। যা শাশ্বতবাণী বা যা জগতের প্রেরিত পুরুষদের কথা—তার দিকে আরও সক্রিয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার সময় কি আসেনি? ... প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষিদের বাণী হল—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদীহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

এই পৃথিবীতেই যদি তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ কর, তবে ধন্য হবে। যদি তুমি আধ্যাত্মিক সত্যলাভ না করতে পার, তাহলে তোমার দুঃখের পর দুঃখ আসবে। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জাতি, বর্ণ বা ভৌগোলিক সীমা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একই দৈবী শক্তি নিরীক্ষণ করেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

অক্ষম

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্-এ

সবারে দিয়েছ কাজ তোমার সংসারে;
বরষ মাসের মত তারা বারে বারে—
আপনার কক্ষপথে হৃষ্ট শান্ত মনে
নিত্য আবর্তিয়া ফিরে। তারা অকারণে
হয় না উতলা কভু, হয় না অধীর।
আমারে করেছ হায় রিক্ত মুসাফির—
চলার এ' পথে! দিলে মোর ক্ষীণ হাতে
একখানি বীণা শুধু,—দাও নি সে সাথে
শক্তির গৌরব!

তাই অপটু অঙ্গুলি—
পদে পদে মরমের সুর যায় ভুলি।
জমে না রাগিনী রাগ লয়-তান-মীড়ে;
অর্ধ পথে অতর্কিতে তন্ত্রী যায় ছিঁড়ে!
প্রকাশ-ব্যথায় তাই ক্ষুব্ধ শান্তি হীন—
আমার অতন্দ্র রাতি, মোর দীর্ঘ দিন!

লালন ফকির ও তাঁহার সঙ্গীত

শ্রীমতী মিনতি দেবী

সাধক ও সুললিত সঙ্গীতের রচয়িতা হিসাবে ফকির লালন সাহ (বা লালন ফকির) এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকটই সমান পরিচিত। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা এইরূপ—সংসারাশ্রমে লালন ফকিরের নাম ছিল লালন দাস। কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জননীর নাম পদ্মাবতী। অল্প বয়সেই লালনের বিবাহ হইয়াছিল। বাল্যকালে একবার তিনি এক প্রতিবাসীর সহিত গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চলে যান। সেখানেই তিনি ভয়ানক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকে ; এবং শেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া শ্মশানে লইয়া যায় ; তথায় মুখাগ্নি ও যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করার পর তাহারা লালনকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। বাড়ীতে জননী পদ্মাবতী এই খবর শুনিয়া শোকে যে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা যথারীতি লালনের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীও বৈধব্যাচরণ আরম্ভ করেন। ওদিকে আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গীরা মৃত মনে করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেও লালনের প্রাণবায়ু কিন্তু তখনো নিঃশেষ হয় নাই। সর্বপাপহারী গঙ্গার শীতল জলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি এক স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নানার্থিনী জোলা-জাতীয়া এক মুসলমান রমণী লালনকে দেখিতে পাইয়া মাতৃতুল্য স্নেহে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া আসেন। সেখানে মমতাময়ী এই রমণী ও আরো কয়েকজনের সেবাশুশ্রূষায় কিছুদিন পরেই লালন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন প্রাণরক্ষাকারিণী এই মুসলমান রমণীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন নিজ বাটীতে। 'মৃত' পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া পদ্মাবতী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রীও স্বামীকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। কিন্তু ইহার পরের ঘটনাই অত্যন্ত করুণ। যে পুত্র এতদিন মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মীয়স্বজন কর্তৃক যথানিয়মে যাহার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় গৃহে লওয়া চলে কি না, স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করার তীব্র বিরোধী। জননী পদ্মাবতী দ্বিধায় পড়িলেন। একদিকে পুত্রস্নেহ অপরদিকে জাতিধর্ম, ইহার কোন্‌টিকে গ্রহণ করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। অপর পাঁচজনের পরামর্শে থালার পরিবর্তে কদলী-পত্রে ভাত দিয়া লালনকে তিনি বারান্দায় বসাইতে বাধ্য হইলেন। জননী হইয়া পুত্রকে এতদূর অযত্ন করিতে তাঁহার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছিল, তাহা বুঝিতে আমাদের আদৌ কষ্ট হয় না। অন্নগ্রহণ শেষ করিয়া লালন ভারাক্রান্ত চিত্তে গৃহে সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। জননীর ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারও দেরী হয় নাই। লালন আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, ঠিক এই সময় সিরাজসাঁই নামক জনৈক দরবেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লালনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া লালনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে লালন যেন আলোর সন্ধান পাইলেন, সাঁইজীর উপদেশ লালনের হৃদয়কে এক অপূর্ব মধুর রসে পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি তখনই গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন। তারপর জননী, স্ত্রী, গৃহ, অর্থ এবং পার্থিব সব কিছুর মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি

বাহির হইয়া পড়িলেন মহত্তর ও সার্থকতর জীবনের সন্ধানে। পরবর্তী কালে তিনি লালন ফকির নামেই বিখ্যাত হন। সিরাজসাঁইকেই তিনি জীবনে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং তাঁহার রচিত বহু গানে সাঁইজীর নামোল্লেখ দেখা যায়।

লালনের জাতি কী, তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী, যে বিষয়ে আজো সঠিক কিছু জানা যায় না। হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মুসলমানের হস্তে তিনি অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। লালন কিন্তু কোনদিনই নিজের ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন—

সব লোক বলে, লালন কি জাত সংসারে?
লালন বলে, জাতির কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।
কেউ মালা, কেউ তস্‌বী গলে,
তাই তো জাত ভিন্ন বলে,
যাওয়া কিংবা আসার বেলা জাতির চিহ্ন রয় কারে?
জগৎ বেড়ে জাতির কথা—
লোকে গল্প করে যথা তথা,
লালন বলে, জাতির ফাৎনা ডুবিয়েছি সাধ বাজারে॥

লালনের মন তুচ্ছ জাতিধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না বলিয়াই, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলের নিকট হইতেই তিনি সমান শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। লালনের শিষ্যদের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী একাধিক লোক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সাঁই, বাউল প্রভৃতি সাধকদের নিকট সব ধর্মই সমান। তাঁহাদের উপদেশের মূল কথা, সেই অনাদি অনন্তকে জানাই যখন সব ধর্মের আসল উদ্দেশ্য, তখন প্রত্যেকটি ধর্মকে পৃথক্ চক্ষে দেখার কোনই প্রয়োজন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই, বাউলদের সাধন-সঙ্গীতগুলির এক দিকে যেমন আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির প্রকাশ, অপর দিকটি তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে নবীর মহিমাকীর্তনে। সুতরাং একথা বিনা-দ্বিধায় বলা চলে, পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' উপদেশটি ইঁহারা সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়া। লালনের রচিত গানগুলিতেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সব কিছুর প্রতিই সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তাঁহার একটি গানে এই ব্রজের ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—

সে ভাব কি সবাই জানে,
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে?
গোপী বিনে জানে কেবা,
শুদ্ধ রয় অমৃতসেবা?
গোপীর পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণদরশনে,
গোপীর অনুগত যারা, এদের সে ভাব জানে তারা,
নীর হেতু অধর ধরা গোপীর মনে।

টলে জীব, অটল ঈশ্বর,　তাইতে কি হয় রসিক নাগর ?
লালন বলে, রসিক বিভোর রস-ভিয়ানে ॥

পৃথিবীর সকলেই যখন একই পিতার সন্তান, তখন সেই প্রেমময় ও রূপময়ের কৃপালাভ করার অধিকারও সকলেরই আছে ; যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব। এই সব কাল্পনিক বাধার সৃষ্টি করিয়া যাহারা ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা কেবল ভণ্ডই নয়, মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হইতেও তাহারা মানুষকে বঞ্চিত করিতেছে। ভক্তিই সাধনপথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ; আকুল হইয়া যিনি ডাকিতে পারিয়াছেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ বিনা দ্বিধায় তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, ধ্রুব ও প্রহ্লাদও যেমন সেই বিরাট পুরুষের করুণালাভে ধন্য হইয়াছেন, তেমনি রামদাস ও কবীরের মত নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হন নাই। যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। লালনও তাঁহার একটি গানে এই কথাটিই চমৎকারভাবে বলিয়াছেন—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই,
হিন্দু কি যবন বলে বিচার নাই।

শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ারা　　　জাতিতে কবীর জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা সর্বস্ব ধন তাই।

রামদাস মুচি ভবের মাঝে　　　ভক্তির বল সদাই তার যে,
ও তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে শুনি সাধুর ঠাঁই।

এক চাঁদে জগৎ আলো,　　　এক বীজে সব জন্ম হল,
ফকির লালন বলে, মিছে কালা ভবে শুনতে পাই !

"কোঽহং", আমি কে, এই প্রাচীন প্রশ্ন প্রাচীন মুনি-ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানের বহু সাধককেও বিচলিত করিয়াছে। নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে সব কিছু জানার পরিসমাপ্তি। তাই আত্ম-পরিচয় পাওয়ার প্রেরণায় যুগে যুগে কত লোক যে অজানার পথে পাড়ি দিয়াছে, তাহার হিসাব কোনদিনই জানা সম্ভব হইবে না। সব সাধনার মূল, আত্মতত্ত্বলাভ, নিজেকে না চিনিয়া অপরকে জানিতে যাওয়া মুর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। লালনও ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন—

আপন খবর আপনারে হয় না,
আপনারে চিনিলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
আত্মরূপ কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাড়বে তত লখ্ না।
ধড়ের আত্মকর্তা কারে বলি,
কোন্ মোকাম তার, কোথায় গলি আওনা-যাওনা।
সেই মহলে লালন কোন্ জন, তাও লালনের ঠিক হল না ॥

আত্মতত্ত্বলাভের পথ-নির্দেশও তিনি করিয়া গিয়াছেন—

দিল-দরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পায়,
নইলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কি হয়?
স্বয়ং রূপ দর্পণ ধরে মানব রূপ সৃষ্টি করে হে,
দিব্য জ্ঞানী যাঁরা ভাবে বোঝেন তাঁরা,
মানুষ ধরে কার্যসিদ্ধি করে লয়।

একেতে হয় তিনটি আকার অজনী সহজ সংস্কার হে,
যদি ভাব তরঙ্গে তর, মানুষ চিনে ধর,
দিনমণি গেলে কী হবে উপায়।
মূল হতে হয় ডালের সৃজন, ডাল হতে পায় মূল অন্বেষণ হে,
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ,
অধীন লালন সদা নিরূপ ধরতে চায়॥

লালন জীবনে কোনদিনই পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তাই বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের কোন সুযোগও তাঁহার হয় নাই। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানী লালনের নিকট পার্থিব কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত ছিল না, সেইজন্য তাঁহার গানগুলিতে বেদ ও উপনিষদের বহু জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু ও সহজ প্রকাশ দেখা যায়। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনেই জীবনের পূর্ণতা। সেই আনন্দরসসাগরে নিজেকে যিনি বিলীন করিতে পারিয়াছেন, পার্থিব দুঃখ-বেদনার অকূল পাথারেও তাঁহার জীবন সার্থকতার শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। লালন নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বটি উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

আমি একদিন না দেখিলাম তারে,
বাড়ির কাছে আরসী নগর এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি, দেখবো তারে, আমি কেমনে সেথায় যাই রে।
আমি কি কব পড়শীর কথা তার হস্ত, পদ, স্কন্ধ, মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক ভাসে শূন্য ভরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
সেই পড়শী যদি আমায় ছুঁতো, ভবের যম-যন্ত্রণা সব যেতো দূরে,
সে আর লালন একখানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত ভ্রান্ত মন একটু শান্তি, একটু সুখের আশায় বার বার ছুটিয়া যায় দেবালয়ের শান্ত ছায়ায়, কিন্তু তাহাতেও সে তৃপ্ত হয় না, যাহা সে চায় সেখানে তাহা মেলে না, তাই আকুল ক্রন্দনে কেবলি সে চীৎকার করিয়া উঠে, "কোথায় শান্তি, কোথায় মুক্তি!" অন্ধ মানুষ ঘরের ধনকে না চিনিয়া নিষ্ঠুর দেবালয়ের কঠিন পাষাণে বৃথাই মাথা কুটিয়া মরে শান্তির আশায়। সহজলভ্য রত্নকে অবহেলা করিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া বেড়ানোর এই যে বিড়ম্বনা, তাহা লক্ষ্য করিয়াই লালন বলিয়াছেন, "এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে, কত মুনিঋষি চারিযুগ যারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।" লালনের এই উক্তি

আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমূল্য উপদেশ, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' লালনের রচিত সম্পূর্ণ গানটি নীচে উদ্ধৃত করা হইল—

এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে
কত মুনিঋষি চারি যুগ যারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, সে চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়?
ও যে আলেক মানুষ, তেমনি সদায় আছে আলেকে বাসা।
অচিন দলে বসতি তার,　　দ্বিদল পদ্মে আরাম তার,
আমার ভ্রান্ত হল মন,　　আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন,
সিরাজ-সাঁই বলে, ঘুরবি লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে॥

লালন ছিলেন অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধক, তাই তাঁহার গানগুলিতে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা যেমন দেখা যায়, তেমনি সেগুলির সর্বত্র একটি সহজ ও সরল ভাবের প্রকাশও চোখে পড়ে। তিনি ছিলেন গৃহী সাধক, নিজের আশ্রমেই তিনি সেই অসীমের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সংসারের তাপদগ্ধ নরনারীর ব্যথাবেদনা, ভগবৎসাধনায় তাহাদের বাধাবিপত্তির কথা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। একটি গানে সংসারের মায়া-আসক্ত জীবের এই বেদনার সার্থক রূপ দিয়াছেন—

বিষয়-বিষে চঞ্চল মন দিবা রজনী,
মন তো বুঝিলে বোঝে না ধর্ম কাহিনী।
বিষয় ছাড়িয়া কবে　　মন আমার শান্ত হবে হে,
আমি　কবে সে চরণ করিব স্মরণ, যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী?
কোন্ দিন শ্মশানবাসী হবো,　　কী ধন সঙ্গে লয়ে যাবো হে,
আমি কী করি, কী হই,　　ভূতের বোঝা বই,
একদিনও ভাবলাম না শ্রীগুরুর বাণী।
অনিত্য দেহেতে বাসা,　　তাইতেই এত আশার আশা হে
অধীন লালন তাই বলে, নিত্য হইলে
আর কতই কি মনে করতেম না জানি।

এগুলি পাঠ করার পর মনে হয়, তিনি যেন আমাদেরই একজন। অত উচ্চ স্তরের সাধক হইয়াও কত সহজে তিনি সাধারণ মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই সরলতাই প্রকৃত সাধকের আসল পরিচয়। সেইজন্য মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে থাকিবে, লালন ফকিরের মত ভগবৎপ্রেমিকেরাও ততদিন মানুষের হৃদয়ে চির-জাগরূক হইয়া থাকিবেন।

জননী রোহিণী

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় শ্রীনন্দ ও যশোদা-রাণীর মত রোহিণী দেবীও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বাৎসল্য রসের ঘনীভূত মূর্তি ছিলেন তিনি; স্বয়ং সেই রস আস্বাদন করেছেন এবং শ্রীভগবানকেও আস্বাদন করিয়েছেন। যখন ভগবানের অবতরণের সময় হল, তখন এই চিদানন্দময়ী বাৎসল্যরসময়ীরও আবির্ভাব প্রয়োজন হল। ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি ও ঐশ্বর্য থেকে বিযুক্ত করে যে অনুভূতি, তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই যেন যুগে যুগে রোহিণী-সদৃশা মহীয়সী জননীর আবির্ভাব হয়।

যখন মুনিবর কশ্যপ বসুদেবরূপে জন্মপরিগ্রহ করলেন, তখন মাতা কদ্রুদেবীও রোহিণীরূপে আবির্ভূতা হলেন। পুরাণে একটি মতান্তরও দৃষ্ট হয়—এই মতে কশ্যপপত্নী অদিতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই রূপে উৎপন্ন হন—এই দুইটি রূপ যথাক্রমে দেবী দেবকী ও দেবী রোহিণী।

যথা সময়ে বসুদেবের সহিত রোহিণীর পরিণয় হয়। নিষ্ঠুর কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করলে সাধ্বী রোহিণী নিরতিশয় ব্যাকুলা হন। কংসকে অনেক অনুরোধ করে পতির সেবা করবার জন্য কারাগারে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি। দেবকীর সপ্তম গর্ভের সময় রোহিণীরও গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। বসুদেবের চিন্তা—দুরাত্মা কংস একটির পর একটি করে দেবকীর সন্তান বিনাশ করছে, হয়তো বা রোহিণীর সন্তানকেও বিনাশ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এই ভয়ে শ্রীবসুদেব তখন ভাই নন্দরাজের কাছে গোপনে রোহিণীকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রজপুরে আসার চারমাস পরে যোগমায়া তাঁর গর্ভকে অন্তর্ধান করে এবং দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করে তাঁর গর্ভে স্থাপন করলেন। এইরূপে রোহিণীর শ্রীবলরামের জননী হওয়ার সৌভাগ্য হল। যোগমায়া-কর্তৃক গর্ভস্থাপনার দশমাস পরে সব মিলিয়ে চৌদ্দমাস গর্ভধারণের পর রোহিণীদেবী শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের আটদিন পূর্বে অনন্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করলেন—অনন্ত ভগবান্ বলরামরূপে রোহিণীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন।

যেদিন রোহিণীদেবী নন্দালয়ে শুভ পদার্পণ করলেন, সেইদিন থেকেই যশোদা এবং রোহিণীর মধ্যে এমন ভালবাসা হল যে, মনে হতে লাগল যেন দুইজনের দুইটি দেহ কিন্তু প্রাণ একই। প্রেমের গঙ্গাযমুনা যেন এক স্রোতে প্রবাহিত হতে লাগল। গভীর প্রেম পরস্পর পরস্পরকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করল। রোহিণীকে পেয়ে যশোদার আনন্দের সীমা রইল না। যশোদার আনন্দের কারণ এইজন্য যে, রোহিণী ছিলেন অত্যন্ত পতিপরায়ণা, তাঁর পাতিব্রত্যের যশোগানে চারিদিক মুখরিত—এই সতীর পাদস্পর্শে ব্রজরাণীর গৃহ পবিত্র হয়ে গেছে, তাঁর সতীত্বসৌরভে ব্রজপুরী আজ আমোদিত। নিশ্চয় নন্দরাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হবে, পুত্রহীনা নন্দরাণীর কোল আলো-করা পুত্রলাভ হবে সতী রোহিণীর শুভাগমনে। হয়েছিলও তাই, রোহিণীদেবীর আগমনের পর মা যশোদার কোল আলো হয়েছিল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে।

ব্রজরাণী যশোদা রোহিণীর গুণে এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, গৃহস্থালীর সমুদয় কর্ম রোহিণীর উপর সমর্পণ করে দিলেন, একেবারে তাঁর সংসারের কর্ত্রী হয়ে গেলেন রোহিণী। আরও রোহিণীর পুত্র হওয়ার পর নন্দালয়ের সর্বত্র আনন্দের তরঙ্গ খেলে

যাচ্ছে—কিন্তু আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ কই? কেননা, বসুদেব শ্রীনন্দকে আনন্দোৎসব করতে নিষেধ করেছেন—পাছে পুত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, কংসের কানে উঠলে আবার কোন্ বিপদপাত হবে কে জানে! যশোদারাণী তাইতো প্রাণভরে উৎসব করতে পারছেন না। রোহিণীর পুত্রলাভ সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি পুত্রজন্ম-কথা। নন্দরাজ গোপনেই পুত্রের জাতকর্ম সম্পন্ন করালেন পবিত্র ব্রাহ্মণকে দিয়ে। রোহিণী প্রথম থেকেই নন্দরাজ ও যশোদার ব্যবহারে আশাতীত সন্তুষ্ট হয়েছেন, এখন পুত্রলাভের পর তাঁদের মধুর ব্যবহারে তাঁর প্রতিটি রোমকূপ যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তাঁর চোখে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল। পুত্রের মুখচ্ছবি দেখে আত্মবিস্মৃত হলেন তিনি। কী সুন্দর সেই ছবি—

শুভ্রাংশুবক্ত্রং তড়িদালিলোচনং
নবাব্দকেশং শরদভ্রবিগ্রহম্।
ভানুপ্রভাবং তমসূত রোহিণী
তত্তত্র যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ॥

সমুদিত শুভ্রাংশু সদৃশ ঐ মুখচ্ছবি, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় নয়নযুগলের শোভা, মাথায় নবজলধরকৃষ্ণ-কেশদাম, সমস্ত অঙ্গের আভা শারদীয় শুভ্র মেঘ সদৃশ। এই বালক সূর্যতুল্য তেজশালী। এমন সুন্দর পুত্রের প্রসূতি জননী রোহিণী! বালকের এইরূপ শোভাসম্পন্ন হওয়ায় আশ্চর্যের কিছুই নাই, কারণ এই শিশু অস্থিমজ্জামেদমাংসনির্মিত প্রাকৃত শিশু নয়—এ পরম রমণীয় দিব্য শিশু। শুধু শিশুর আকারমাত্র, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবানই যে এই শিশুশরীরে!

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং,
হলহতিভীতি মিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ,—জয় জগদীশ হরে॥

রোহিণীর একটি দুঃখ যেন যাবার নয়। এই দুঃখ পতির বিরহজনিত। আহা, পতিদেবতা কংসের কারাগারে কত কষ্টই না পাচ্ছেন! পুত্রমুখ-দর্শনে এই দুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব হল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তরের অন্তঃস্থলে ঐ স্মৃতি জেগে উঠে রোহিণীকে ব্যাকুল করে দেয়। যেদিন যশোদা-নন্দনের জন্ম হল, যেক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচ্ছবি অবলোকন করলেন, সেই মুহূর্তেই যেন তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। একি অভাবনীয় পরিবর্তন! তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাবেদনা দুঃখজ্বালা অন্তর্হিত হল। যশোদানন্দনের শ্রীমুখচন্দ্রমা তাঁর সমস্ত দুঃখ হরণ করে নিল, তাঁর প্রাণ শীতল হল। ব্রজপুরে আজ রোহিণীকে বসনভূষণে প্রথম সুসজ্জিত দেখা গেল।

*　*　*

সার্ধ একাদশ বৎসর বলরাম ও শ্যামসুন্দরের মধুর বিচিত্র বাল্যলীলার দিব্য রসমন্দাকিনী ব্রজপুরে প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে নিরন্তর অবগাহন করে যশোদা ও রোহিণী ধন্য হচ্ছেন। কৃষ্ণবলরামের সাজসজ্জায়, পরিচর্যায়, রক্ষণে, শাসনে বাৎসল্যরসের অপূর্ব আস্বাদন!

এতদিন যে রূপমাধুরী যশোদাভবন আলোকিত করেছে, আজ সেই আলোক অন্তর্হিত হতে চলেছে। কৃষ্ণবলরামকে ব্রজপুরী থেকে মধুপুরী নিয়ে যাবার জন্যে অক্রুর এসে উপস্থিত হয়েছেন। রোহিণী-যশোদা পুত্রদ্বয়কে ছেড়ে দিতে চান না—কিভাবে তাঁরা প্রাণাধিকদের কংসের রঙ্গালয়ে যাবার অনুমতি দেবেন! নন্দরাজ কত বোঝালেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হল। অবশেষে যোগমায়ার বিস্তারে মধুপুরী যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। ফাল্গুনী দ্বাদশী সন্ধ্যায় ব্রজপুরী অন্ধকার করে ও মাতৃদ্বয়কে শোকসাগরে নিমগ্ন করে রামশ্যাম মধুপুরে চলে গেলেন। * * *

দুরাত্মা কংসের নিধন হল। বসুদেব কারাগার থেকে মুক্ত হলেন। পুত্রদ্বয়কে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে তাঁর হৃদয়ের জ্বালা নির্বাপিত হল। এর পর বসুদেব রোহিণীকে আনবার জন্যে ব্রজপুরে দূত

প্রেরণ করলেন। পতির আহ্বান শুনে রোহিণীর সে এক অদ্ভুত অবস্থা! তিনি ভাববিহ্বল হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—

আজ্ঞা পত্যুর্দিদৃক্ষাপ্যথ নবসুতয়োর্জাতু হাতুং ন শক্যা
সেয়ং গোবিন্দমাতা বত কথমিব বা হেয়তামাশু যাতু।
তস্মাদেকৈকনেত্রাত্ত্বয়বমপি চেত্তাগমেকং তনোর্মে
পূর্য্যা জীবে ন কুর্যাদপরমিহ বিধিস্তর্হ্যেহং নিস্তরেহয়ম্॥

—হায়! এক দিকে পতির আজ্ঞা, অন্য দিকে যশোদাদেবীর প্রীতির বন্ধন! পুত্রদ্বয়কে দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করাও আমার আয়ত্তাধীন নয়। শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদাকে ত্যাগ করা যায় না। বিধাতা যদি আমার শরীরকে দুভাগ করে দেন—এক নেত্র অর্ধ অবয়বে অপর নেত্র অপরার্ধে। এক শরীর মধুপুরের জন্য, অপর শরীর যশোদার পরিচর্যার জন্য—তাহলে আমি এই বিপদসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি, অন্যথা আর তো কোনও উপায় দেখি না।

রোহিণীকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখে ক্রন্দনরতা যশোদারাণী তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, "ভগিনি, তোমার প্রাণ, আর আমার প্রাণ যে একই, এর প্রমাণ আমরা উভয়েই কখনও ক্ষণকালের জন্যও যে রামকৃষ্ণের মধ্যে ভেদ দেখিনি। আমার কথা শোন, আমার ভাগ্য মন্দ, তাই পুত্রদর্শনে যেতে পারছি না; তুমি যাও, রামশ্যামকে দেখে তোমার প্রাণ শীতল কর, পুত্রদের দেখে তুমি শান্তি পেলে, আমিও শান্তি পাব—আমারও প্রাণ বেঁচে যাবে, তোমাতে আমাতে যে অভিন্ন। এ ছাড়া আমার প্রাণ বাঁচাবার আর তো কোন উপায় নেই। রোহিণীদেবী তখন নন্দরাণীর এই কথা শুনে আশ্বস্তা হয়ে মধুপুর চলে গেলেন।

* * * *

মধুপুরী থেকে যখন পিতা বসুদেবকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকা গেলেন, তখন মাতা রোহিণীকেও সঙ্গে নিলেন। রোহিণীর মনে এই আনন্দ ছিল—তিনি রামকৃষ্ণের লীলা দর্শন করবেন, তাঁদের স্নেহ-মাখা কথা শুনবেন। কিন্তু যখন যশোদার কথা মনে হত, তখন তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠতেন, হায়! যশোদার কতই না কষ্ট হচ্ছে কৃষ্ণবলরামের বিরহে।

কুরুক্ষেত্রে রোহিণী ও যশোদার পুনর্মিলন হয়। যশোদাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে, তাঁর গুণাবলী কীর্তনে পঞ্চমুখ হলেন রোহিণী। কী অদ্ভুত ভালবাসা উভয়ের মধ্যে ছিল, তা চিন্তা করলে অবাক্ হতে হয়।

এক সময়ে রোহিণী আবার ব্রজপুরে আসেন। দন্তবক্রকে বিনাশ করে যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজপুরে যান, তখন দাদা বলরামের সঙ্গে মাতা রোহিণীকে দর্শন করবার খুব ইচ্ছা হয়। রোহিণী-মা বলরামের সঙ্গে আসলেন। তাঁদের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব ভাব হল। ব্রজপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের শেষ লীলাসমূহে যোগদান করতে থাকেন।

যদুকুল ধ্বংস হল। দারুক এই নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে দ্বারকায় পৌছুলেন, বসুদেব-দেবকীর সঙ্গে রোহিণীও কাঁদতে কাঁদতে আসলেন যেখানে যদুগণের মৃতদেহ পড়েছিল। চারিদিকে স্বজনবর্গের প্রাণহীন শরীরগুলি দেখে করুণাময়ীর হৃদয়ে শোক উথলে উঠল। সেখানে রামকৃষ্ণকে না দেখে তিনি মূর্ছিতা হলেন—এ মূর্ছা আর ভাঙল না। লীলা সাঙ্গ হল, শ্রীভগবানের নিত্যলীলাকে আশ্রয় করে যুগে যুগে যাঁর আবির্ভাব, সেই বাৎসল্যরসবিগ্রহরূপিণী রোহিণী শ্রীভগবানের চিন্তায় তন্ময় হয়ে তনুত্যাগ করে নিত্যধামে চলে গেলেন—পশ্চাতে রইল অনাগত কালের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য একটি আদর্শ, যাকে অনুসরণ করে শত শত সন্তানবৎসল জনক-জননী ধন্য হবেন।

জননী রোহিণীর সঙ্গে বসুদেব দেবকীরও একই দশা হল।

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্॥
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১।৩১।১৮

বন্ধন ও মুক্তি*

স্বামী প্রভবানন্দ

"এই বিরাট বিশ্বকে বলা হয় ব্রহ্মচক্র। ইহা অনবরত ঘুরিতেছে। যতদিন জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে, ততদিন তাহাকে জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন হইয়া উহাতে আবর্তিত হইতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় যদি একবার তাঁহার সহিত একাত্ম-বোধ জাগে তাহা হইলে আর ঘুরিতে হয় না। সে অমরত্ব লাভ করে।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপরোক্ত কথাগুলি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, মানুষের প্রকৃত স্বভাব হইল দিব্য—মুক্ত ও আনন্দময়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সত্তাই মানুষের ভিতর রহিয়াছে। সে আসল স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে দেহ ও মনের সহিত জড়াইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই কর্মফলের অধীন, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আবদ্ধ। সেইজন্যই তো তাহাকে ভোগ করিতে হয় জীবনমরণ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আরাম এবং বেদনা। এই বন্ধনগুলি দূর না হওয়া পর্যন্ত অবিমিশ্র সুখলাভ অসম্ভব। দেহমনের সহিত নিজের তাদাত্ম্যবোধ দূর করিয়া মানুষ যখন অনুভব করে যে সে অন্তরতম চৈতন্যস্বরূপ—অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় সত্তা—তখনই তাহার মিলে সকল প্রকার গণ্ডীর হাত হইতে মুক্তি।

কিভাবে এই মুক্তি আসিবে? জগতের সকল ধর্মেই ইহার উপায় বর্ণিত আছে। উপায় হইল মনকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখা, তাঁহার সহিত যুক্ত থাকা।

যোগ-দর্শন বলেন, মন তরল পদার্থের ন্যায়। উহা প্রত্যক্ষ বস্তুর আকার গ্রহণ করে। অর্থাৎ মন প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত তদাকার-কারিত হইলেই সেই বস্তুর জ্ঞান উপস্থিত হয়। এইভাবে মন যাহা কিছু চিন্তা করে, তাহা উহাতে একটি রং রাখিয়া যায়। আর মানুষের চরিত্র নির্ণীত হয়, তাহার মনের চিন্তাপ্রণালী দ্বারা, উহা ভালই হউক বা মন্দই হউক।

মনের মন্দ রঙ কি করিয়া দূর করা যায়? ঈশ্বরের দিকে চিন্তার মোড় ফিরাইয়া। তিনি শুচিতার প্রতিমূর্তি, দিব্যভাবের বিগ্রহ। পবিত্রতাই তাঁহার স্বরূপ। মন যদি ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা নির্মল হইয়া উঠে। মনের উপর তখন ভগবানের দিব্যভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে। হ্রদের জল যখন স্বচ্ছ ও শান্ত থাকে, তখন যেমন উহার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাও সেইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। তোমার মন শুদ্ধ করিয়া আমাতে নিবদ্ধ কর, শান্তি পাইবে।" ব্যাপারটি এই, ঈশ্বরের অনুভূতি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে অতিক্রম করিয়া যায়। মনের নিজের সেই স্থানে পৌঁছিবার ক্ষমতা নাই। তবুও বলা হইয়া থাকে যে, কেবল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারাই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ হয়। এই উক্তিদ্বয় পরস্পর বিরোধী নহে। অচেতন অশুদ্ধ মনই ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কেননা উহা জড়বস্তুর চিন্তায় এবং স্বার্থপরতায় ও অহংকারে আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধিতে ও এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের প্রতি নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াই মন ঐরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই একই মন ঈশ্বরমুখী হইলে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়। তখন তাহার ঘটে রূপান্তর। উহাই শুদ্ধ

* দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র 'Vedanta and the West' (March-April, 1951) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

মন। অতএব সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে, ঈশ্বরে মন রাখা অর্থাৎ আমরা যাহা প্রার্থনা, একাগ্রতা বা ধ্যান বলি তাহা।

ধ্যান করিতে হইলে ভগবানে ভক্তি একান্ত প্রয়োজন। কাহাকেও ভালবাসিলে তাহার চিন্তা করা সহজ হয়। ঠিক সেইরূপ, স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের প্রতি মনের গতি ফিরাইতে হইলে তাঁহার প্রতি যাহাতে ভালবাসা বর্ধিত হয় তাহাই করণীয়। সেই ভালবাসা অবশ্য হঠাৎ হয় না। ভালবাসার স্বরূপ কি? অনুক্ষণ স্মরণ। ঈশ্বর-চিন্তায় লাগিয়া থাকিলে, ক্রমশঃ আমরা দেখিব অন্তরে প্রেমের উদয় হইতেছে, আরও বেশী বেশী ধ্যান করিতে ভাল লাগিতেছে। এই ভাবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতির মধ্যেই ধর্মের গভীরতম সত্য নিহিত। ইহা শুনিতে খুব সহজ মনে হইলেও অভ্যাস করা কঠিন, এমন কি কতক লোকের পক্ষে এক প্রকার দুঃসাধ্যই। যাঁহারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের জানা আছে যে, যে মুহূর্তে আমরা মনকে একাগ্র করিতে যাই, অমনি যত প্রকারের বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ যখন আমরা ধ্যান করিবার চেষ্টা না করি, তখন বরং সেইরূপ হয় না। এমনই আমরা বেশ শান্ত, কিন্তু ধ্যান করিতে বসিলেই যত আজে বাজে চিন্তা! এ ক্ষেত্রে করণীয় কি? ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস চালাইয়া যাওয়া।

কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁহারা ধ্যানাভ্যাস করিতেই পারেন না। মন যখন বিষয়বাসনায় একেবারে ডুবিয়া থাকে, তখন উহা ভগবন্মুখী হইবে কি করিয়া? তাহা হইলে উপায়? ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে নিষ্কাম কর্ম কর। যাহা কিছু কর্মফল আমাতে সঁপিয়া দাও।" অর্থাৎ, ধ্যান করা খুব কষ্টসাধ্য হইলে আমরা নিঃস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। কিন্তু তখন কোন আসক্তি রাখিলে চলিবে না। সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। গীতাও এই শিক্ষা দেয়। ধ্যানাভ্যাস করিতে হইলে যেটুকু মনের পবিত্রতা ও সূক্ষ্মতা অত্যাবশ্যক তাহা অর্জন করিবার জন্য এই কর্মব্যাপৃতি প্রয়োজন।

কিন্তু কর্মবৃত্তি কি জীবনে জটিলতা ও বিক্ষেপ আনয়ন করে না? সত্য এই যে, কর্মের মধ্যে বন্ধন বা মুক্তি নাই। বন্ধন বা মুক্তি আসে মনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য বলিতেছেন হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা। নিজেদের জন্য না করিয়া সব কিছু যেন আমরা ঈশ্বরের জন্য করিবার চেষ্টা করি। এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমাকে তো আহার করিতে হয়, কিছু কর্তব্য সাধন করিতে হয় এবং আমার কিছু বাধ্যবাধকতাও আছে। এই কর্মসমূহ কি নিজের জন্য করি না? এস্থলেও মনোগত ভাবের পরিবর্তন চাই। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্মের জন্যই সব কিছু করিতেছি। ধরুন খাইতেছি, তখন ভাবা উচিত—ব্রহ্মকে খাদ্য নিবেদন করিতেছি। সব কিছুই উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা হয়তো অপরের জন্য কাজ করিতেছি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মনোভাব যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে উহাতে স্বার্থদৃষ্টি আসিতে পারে। যেমন, কতক লোক হয়তো জনসেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে। ইহারা প্রায়ই ভাবে যে তাহাদের অভাবে জগৎ চলিবে না। জনসেবামূলক কর্ম করিব না, ইহা বলিতেছি না। অপরকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ইহার একমাত্র ভাব হইবে সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা, সকল প্রাণীতে তাঁহারই সেবা করা। অধিকন্তু, সেবা করিবার সুযোগ দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নিঃস্বার্থ কর্মসমূহে আত্মনিয়োগ করিলে মন আরও পবিত্র হয়। তখন আপনা

হইতেই লোক ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয়।

বহির্জগতের ও মনের গতি সর্বদাই বহির্মুখী। ঐ স্রোতের বিপরীত মুখে যাওয়াই আধ্যাত্মিক জীবন। সেইজন্য মানসিক শৃঙ্খলা আনিতে হইলে ধীর ও শান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। একদিক দিয়া বলা যায়, ধর্মজীবন এক সংগ্রাম। জীবন অর্থেই সংগ্রাম। যাহা লাভ করিবার যোগ্য তাহা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথেও ইহা সমভাবে সত্য। জনৈক মহাত্মা বলিতেন, —"যতক্ষণ তোমার মধ্যে সংগ্রাম নাই, ততক্ষণ তুমি স্থাণু। সংগ্রাম করিতে থাকিলেই তুমি চলিতে আরম্ভ করিবে।"

ব্রহ্মকে যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে ধ্যান করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে একটি সহজতর ধ্যানের উপায় শিক্ষা দিতেছেন। "আমি বহু বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অবতার হইয়া আসিয়া বহু কর্ম করিয়াছি। সেগুলি চিন্তা করিলে জীব শুদ্ধ হয়। উহাতে সকলেরই মঙ্গল। শ্রদ্ধা সহকারে সে সব শ্রবণ কর। আমার দৈবী মহিমা কীর্তন কর।" অনেকের পক্ষেই নিরুপাধিক চিন্তা করা কষ্টকর। ব্রহ্ম অবতার হইয়া আসেন। তখন তিনি যে সব লীলা করিয়া যান, এখানে তাহারই ধ্যান করিতে বলা হইতেছে। "তিনি যুগে যুগে নব নব রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, অবতার হইয়া আসেন মানুষকে প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য" —এই উক্তিটি জনৈক জগদ্‌গুরুর। ভগবান খ্রীষ্ট-রূপে, কৃষ্ণরূপে, বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবনী-পাঠ, গুণ ও মহিমা কীর্তন দ্বারা আমরা জীবনে ভক্তি ও মাধুর্যের অধিকারী হইব। তখন মন স্বভাবতঃই ব্রহ্মাভিমুখী হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমাকে ধ্যান কর; আমাকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, কেবল আমারই জন্য কর্তব্য কর, ন্যায্য বাসনা রাখ ও অর্থোপার্জন কর।" হিন্দুমতে জীবনের চারিটি অনুসরণীয় বস্তু আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও শেষেরটি হইল মোক্ষ। এ কথা সত্য যে, সম্পূর্ণ নির্বাসনা না হইলে জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষে পৌছান যায় না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমাদিগকে কতিপয় বাসনা মিটাইয়া লইতে হইবে। উপদেশগুলি পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। নির্বাসনা চরম আদর্শ। কিন্তু সকলের পক্ষে উচ্চতম সত্য-নির্দিষ্ট পথে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যদি বলি যে, সকলেই নির্বাসনার আদর্শ গ্রহণ করুক, তখন অবস্থা কি হইবে? অধিকাংশ লোক কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া জীবন-সংগ্রামে অতিমাত্রায় অলসতা প্রকাশ করিবে। উহা আধ্যাত্মিকতা নহে। শান্তি ও অলসতা এই দুটি চরম অবস্থা দেখিতে সমান। শান্তির স্তরে পৌছি-বার পূর্বে সাধককে অবশ্যই আত্মবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অতএব ন্যায্য প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করাতে কোন দোষ নাই। তাহা ছাড়া সংসারে আমাদের কতকগুলি কর্তব্যও সম্পন্ন করিতে হয়। এগুলি এড়াইলে চলিবে না। উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারাই উহাদিগকে আমরা অতিক্রম করিতে পারি। কর্তব্য ও অভাব পূরণের জন্য, সকলেরই কিছু না কিছু আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই যুগে বা অন্য কোন যুগেই হউক এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

ত্যাগের আদর্শ পুরোভাগে অবশ্যই থাকা চাই। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই জীবনের চরম লক্ষ্য লভ্য হয়। কিন্তু ত্যাগ কাহাকে বলে? বিত্তহীন হইলেই ত্যাগী হয় না। ধরুন, একজন গরীব। সে যদি অনবরত মনে ভাবে, 'আহা, আমার যদি সম্পদ থাকিত' তাহা হইলে তাহার নিঃস্বতা ধর্মের সহায়তা কি করিল? 'আমি' 'আমার' ত্যাগই আসল ত্যাগ। ধনসম্পত্তি থাকুক। কিন্তু উহারা যেন আমাদিগকে না অধিকার করিয়া বসে।

যাহাতে আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবান লাভ ব্যাহত না হয়, তাহা করিতে হইলে কি ভাবে আমরা 'ন্যায্য বাসনা, কর্তব্য ও অর্থে'র অনুসরণ করিব? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমাকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, কেবল আমারই জন্য কর্তব্য কর, ন্যায্য বাসনা রাখ ও ধনার্জন কর।" যাহ ভগবানের পথে লইয়া যায়, তাহাই সৎ। যাহা ভগবান হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহা অসৎ। যে কাজ ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, তাহা করিলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাই। আর যে কাজের ভিতর থাকিলে তাঁহাকে মনে রাখিতে পারি, উহাই ভগবান লাভের অনুকূল। অতএব যখন সৎ বাসনা পূরণ, কর্তব্য ও ধনার্জন করিব তখন যেন না ভাবি যে, উহা নিজেদের জন্য করিতেছি, ভাবিতে হইবে উহা ভগবানের জন্যই করিতেছি।

আদর্শ হইতেছে, ভগবানে মনঃসন্নিধান করিবার যতগুলি বিভিন্ন পন্থা আছে, সবগুলির সুসমঞ্জস সমন্বয়-সাধন। আমাদিগকে সাধিতে হইবে ধ্যানাভ্যাস এবং অবতারপুরুষদের জীবনীপাঠ, ভগবদ্ মহিমা ও গুণ কীর্তন আবার নিঃস্বার্থ কর্মও করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—"এই ভাবে চলিলে তোমাদের আমাতে অবিচলিত প্রীতি জন্মিবে। আমিই শাশ্বত সত্য। যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত আমার ধ্যান করে, সে নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করে।"

জন্মাষ্টমীর স্মৃতি

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

সে ঘোর দুর্যোগ রাতে মুখর বরষা সাথে
গগনে গরজে ঘন মেঘ,
আঁধার নিকষ-কালো অন্তরীক্ষ ভরি' ছিলো
খরতর চলে বায়ুবেগ।

ভাদরের ভরা জল ভাসায় পৃথিবীতল,
অবিরাম ঝরে ঝর ঝর,
কড় কড় নিঃস্বনে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
রুদ্ধ কারা-গৃহের ভিতর।

বন্দিনী খুঁজিছে কাকে হাহারবে দিকে দিকে,
পাষাণ-দুয়ারে ঠুকে মাথা,
শীর্ণ দুটি হাত মেলে সজল নয়ন বলে,
'কই? কোথা সে ওগো? সে কোথা?'

* * *

সহসা আলোক ছায় আঁধার টুটিয়া যায়
হাসে শিশু মানবলীলায়,
যুগে যুগে সে যে আসে ধরণী-তিমির নাশে
আর্তের সঙ্কট-বেলায়।

পলকে মিলালো কোথা পাষাণ-চাপানো ব্যথা
যত শঙ্কা, দৈন্য হলো দূর,
বদ্ধ কারাগার মাঝ মুক্ত শিশু করে আজ
পরাণ আশায় ভরপুর।

দুখিনী জননী তারে বুকেতে চাপিয়া ধরে
উথল আবেগে হ'য়ে হারা,
ঝরে পড়ে গ'লে গ'লে আকুল আঁখির জলে
হৃদয়ের যত স্নেহধারা।

* * *

গভীর নিশীথ রাতে জীবন-সর্বস্ব-হাতে
সহসা খুলিয়া কারা-দ্বার,
বাহিরিয়া ও কে আসে পদদুটি কাঁপে ত্রাসে,
সচকিত দেখে চারিধার?

সমুখে যমুনা বয় ভয়ঙ্কর স্রোতময়,
থমকিয়া থাকে সে যে চেয়ে,
নিমেষে দামিনী খেলে দেখিল শৃগাল চলে,
অনায়াসে যায় পার হ'য়ে।

'আমিও পারিব তবে পারে যে যেতেই হবে
যতই থাকুক বাধা ঘিরে,'
এই বলি দুটি করে নয়ন-মণিরে ধ'রে
বসুদেব জলে নামে ধীরে।

তখনো রয়েছে নিশি অচেতন দশ দিশি
জানিল না এ দিব্য ছলনা,
আকাশে দেবতাগণ 'জয় নর-নারায়ণ'
ঘোষিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা।

*

যমুনা সরিয়া যায় পথ যেন করে দেয়
ছত্র হয় বাসুকির ফণ,
স্নেহেতে বিবশ হ'য়ে চলে পিতা ভয়ে ভয়ে
আপনার ভাবেতে মগন।

আসিলেন অবশেষে নন্দপুর বিনা ক্লেশে
গোপরানী-সূতিকা-আগারে,
যশোদায় পুত্র দিয়ে কন্যাটিরে বিনিময়ে
তুলিলেন নিজ বক্ষপরে।

তোমার সুন্দর ধরা আজ যে মাধুরী-হারা,
হে কৃষ্ণ দেখিছ কি চেয়ে ?
সত্য নাই, ত্যাগ নাই শুধু স্বার্থদ্বেষ তাই
রহিয়াছে চারিদিক ছেয়ে।

হিংসা-বিষে জর্জরিত নাহি বুঝে হিতাহিত
লালসায় চায় অধিকার,
শুধু কপটতা চলে মিথ্যা স্তোকবাক্যচ্ছলে
বর্বরতা আর স্বেচ্ছাচার।

কোথা তুমি প্রেমময় ? দূর কর দুঃসময়
জাগো পুনঃ সকল হৃদয়ে,
আসুক শান্তির বাণী যাক্ অধর্মের গ্লানি
ভরি যাক্ বিশ্ব তব জয়ে।

শ্রীশ্রীবিঠ্‌ঠলদেবজী

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

জি, আই, পি, রেলওয়ে দিয়া বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথে খুরদুয়ারী জংশনে গাড়ী বদল করিয়া ছোট লাইনের রেলগাড়ীতে পাণ্ডারপুর যাইতে হয়। মারাঠা দেশের ইহাই প্রধান ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভারতের নানাদেশ হইতে এখানে যাত্রীরা শ্রীভগবানের দর্শনলাভমানসে আসে। এই পবিত্র তীর্থস্থানেও কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় অনেকে তীর্থবাস করিয়া থাকে। পাণ্ডারপুর একটি ছোট শহর, চন্দ্রভাগানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এ অঞ্চলে লোকে এই নদীকে নর্মদা বা গোদাবরীর সমতুল্য মনে করে। এই পবিত্র পুণ্য-সলিলা চন্দ্রভাগাতে মৃতদেহ সৎকারের পর অস্থি বিসর্জন দিয়া থাকে। তীরে বসিয়া পূর্ব-পুরুষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে।

ষ্টেশন হইতে শ্রীশ্রীবিঠ্‌ঠলদেবের মন্দির প্রায় দুই মাইল। সদর ফটকের অতি নিকটেই চন্দ্রভাগা নদীর পাকা ঘাট। শীতকালে নদীর জল আরও কিছু দূরে সরিয়া যায়। যাত্রীরা ইহাতে নিত্য স্নান করিয়া মন্দিরে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করিয়া থাকে। নদীর মাঝে ছোট ছোট দুইটি মন্দির আছে। ঐ সময় নদীর জল কম হইলেও বেশ স্রোত বহিয়া যায়। অপর পারের গ্রামবাসীরা নৌকায়

পারাপার হয়। যাত্রীরাও নৌকাবিহার করিয়া থাকে। নদীবক্ষ হইতে শহরের দৃশ্যাদি অতীব মনোরম। কোথাও গাছপালা, গুল্মলতা, ফলফুলে পরিপূর্ণ বাগান, আবার মাঝে মাঝে আকাশভেদী মন্দিরাদি, তীর্থবাসীদের সৌধমালা, আবার কোথাও বা যাত্রীদের নিমিত্ত ধর্মশালা ও স্নানের ঘাটসমূহ শোভা পাইতেছে।

বহু শতাব্দী পূর্বে শ্রীভগবানের এই মন্দির স্থাপিত হয়। মন্দির ও নাটমন্দির কষ্টিপাথরে নির্মিত। বড় বড় থাম দিয়া নাটমন্দিরটি তৈরী। শ্রীমন্দির উত্তর ভারতীয় মন্দির সদৃশ। গর্ভ মন্দিরে কষ্টিপাথরের শ্রীভগবানের বিষ্ণুমূর্তি বিরাজ করিতেছে। মূর্তি বহু পুরাতন বলিয়া মনে হয়। উচ্চতাতে প্রায় তিন ফুট। শ্রীবিগ্রহের পোষাক পরিচ্ছদের বা অলঙ্কারের মোটেই কোনরকম আড়ম্বর নাই, সাধারণ ভাবে সুসজ্জিত। ইহা সত্ত্বেও মূর্তির বদনমণ্ডলে কি এক অপূর্ব লাবণ্যময় ভাব বিরাজ করিতেছে! যাত্রীরা একবার দর্শনে কেহই তৃপ্ত হয় না। বার বার দর্শনেও অতৃপ্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বেদীর সম্মুখে অপরিসর স্থান হইলেও সকলেই শ্রীভগবানের দর্শন স্পর্শন ও পূজাদি করিতে পারে। ভক্তদের জন্য অবারিত দ্বার। ইহাই এই তীর্থের বিশেষত্ব।

নিত্য ভগবানের তিন বার ভোগ হয়। ভোর ৪ টায় মঙ্গলারতির পর লাড্ডু ও মাখন ভোগ; দ্বিপ্রহরে—অন্ন, রুটী, পুরন পুরী, ডাল ও নানারকম ব্যঞ্জনাদি ভোগ এবং বৈকালে ৫টায়—লাড্ডু ভোগ হয়। রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত আরতি হইয়া থাকে। রাত্রি ১০টায় শ্রীভগবানের শয়ন ও মন্দির বন্ধ হয়।

বৎসরে চারিবার পাণ্ডারপুরে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী, কার্তিক শুক্লা একাদশী, শিব চতুর্দশী ও চৈত্র শুক্লা একাদশী —এই চার তিথিতে বিশেষ ভাবে উৎসবাদি হয়। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে এই মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। এই তিথিতে আলান্দি হইতে জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপান, মুক্তাবাঈ; নাসিক হইতে ত্র্যম্বকেশ্বর; দেহু হইতে তুকারাম, একনাথ, রোহিতাশ প্রভৃতি ভক্তদের পাল্কি শোভা-যাত্রা সহ বহুযাত্রী আসিয়া থাকে। দ্বাদশীতে এক হাঁড়িতে খৈ, দৈ ও মিঠাই মিশ্রিত করিয়া শ্রীভগবানের ভোগ হয়। ঐ প্রসাদী হাঁড়ি উপরে ঝুলাইয়া পরে ভাঙ্গিয়া দেয়। যাত্রীরা লুট করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণ করে। ইহার নাম "কালা" প্রসাদ। কার্তিক শুক্লা একাদশীতে গোরা কুমার ও সাঁওতা মালীর পাল্কী শোভাযাত্রা সহ বহু যাত্রী আসে। এই উৎসবেও কালা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিব চতুর্দশীতে যাত্রীরা শ্রীভগবানের দর্শন, স্পর্শন, পূজা ও ভজনাদি বিশেষ ভাবে করিয়া থাকে। চৈত্র শুক্লা একাদশীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীবিঠ্ঠলদেবের চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। এই দিন সকল যাত্রীই শ্রীভগবানের অঙ্গে চন্দন লেপন করে। দ্বাদশীর দিন ভোর ৪টায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গরম ও ঠাণ্ডা জলের দ্বারা ভগবানের স্নান ও অভিষেক হয়। ঐ প্রসাদী চন্দনের নাম "উটি"।

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে জ্ঞানেশ্বরের উৎসবে পাণ্ডারপুর হইতে শ্রীবিঠ্ঠলদেব, নামদেব ও পুণ্ডলিক এই তিন বিগ্রহের পাল্কী শোভাযাত্রা সহ যাত্রীরা আলান্দি যাইয়া থাকে।

শ্রীবিঠ্ঠল দেবের মন্দিরের নিকটেই রুক্মিণীর মন্দির অবস্থিত। পাণ্ডারপুরের অনতিদূর গ্রাম সমূহে পুণ্ডলিক, নামদেব, গোরা কুমার, সাঁওতা মালী, চোখবা, কান্থ পাতরা, সেনাহাবি ও দামজী প্রভৃতি ভগবান বিঠ্ঠলদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের জন্মস্থান।

ভগবান্ শ্রীশ্রীবিঠ্ঠলদেব ও তাঁহার ভক্তদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

এইগুলি স্মরণ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ ভজনে অনুপ্রেরণা পায়। এখন কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের জীবনীর সহিত কয়েকটি কিংবদন্তী উল্লেখ করিব। নামদেবের কথা স্বতন্ত্রভাবে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুণ্ডলিক

পাণ্ডারপুরের আশী মাইল পশ্চিমে কাশীগাঁও গ্রামে পুণ্ডলিক নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পিতা নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। একমাত্র ছেলে পুণ্ডলিক পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ছিল। পিতামাতা মহাসমারোহের সহিত ছেলের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর হইতেই পুণ্ডলিকের ভাবধারা দিন দিন পরিবর্তিত হইতে থাকে। পুণ্ডলিক পিতামাতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইল। আসক্তি ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। ফলে স্ত্রীই তাহার সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। কোন বিশেষ পর্বোপলক্ষ্যে সস্ত্রীক পুণ্ডলিক পিতামাতাসহ গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন মানসে কাশী অভিমুখে যাত্রা করে। বৃদ্ধ পিতামাতা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পুণ্ডলিক ও তাহার প্রিয়তমা, দুইজনে দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া পিতামাতার পশ্চাদনুসরণ করিল। পথে নিম্বলকর রাজার রাজধানী পল্টন গ্রামে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই গ্রামে রোহিতাশ নামে জনৈক চামার বাস করিত। পরদিন সকাল বেলায় তাহারা যাত্রা করিল। রাস্তায় রোহিতাশকে দেখিয়া পুণ্ডলিক তাহার জুতা মেরামত করাইল। রোহিতাশ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথায় যাইতেছেন?" পুণ্ডলিক উত্তর করিল, "গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভে কাশী যাইতেছি।" রোহিতাশ বলিল, "যাহারা তীর্থ দর্শনে যায়, তাহাদের জুতা আমি বিনা মূল্যে মেরামত করিয়া থাকি।" এই বলিয়া সে গঙ্গায় নিবেদনার্থ একটি পয়সা পুণ্ডলিকের হাতে দিল। প্রায় ছয় মাস পরে তাহারা কাশীতে পৌছিল। গঙ্গাস্নানান্তে রোহিতাশের পয়সাটি নিবেদন করায় পুণ্ডলিকের হাতে একটি সোনার বালা উঠিল। ইহা দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্যান্বিত হইল। অতঃপর বাবা বিশ্বনাথের পূজা, দর্শন ও স্পর্শন করিল বটে, কিন্তু মনে আশানুরূপ শান্তি পাইল না। যাহা হউক কাশীতে তিন রাত্রি বাস করিয়া তাহারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়মাস পরে পল্টন গ্রামে আসিয়া পুণ্ডলিক রোহিতাশের সঙ্গে দেখা করিল এবং সোনার বালাটি তাহার হাতে দিয়া ঘটনাটি সব খুলিয়া বলিল। রোহিতাশ বলিল, "মনমেঁ চঙ্গা তো কাঠত মেঁ গঙ্গা।" অর্থাৎ মন পবিত্র হলে কাঠের গামলাতেও গঙ্গা দর্শন হয়। পুণ্ডলিক অবাক হইয়া রোহিতাশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রোহিতাশ একটি কাঠের গামলাতে জল ঢালিয়া একটি পয়সা তাহাতে ফেলিয়া করজোড়ে বলিল, "হে গঙ্গা মাঈ, এক হাতের জন্য একটি বালা দিয়াছ, অপর হাতের জন্য আরও একটি বালা দাও।" বলিবামাত্রই তাহার হাতে একটি বালা উঠিল। এই সব দেখিয়া পুণ্ডলিক বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। রোহিতাশ বলিল, "আপনারা কয়জন যাত্রায় গিয়াছিলেন?" পুণ্ডলিক বলিল, "দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা স্বামী-স্ত্রী ও পদব্রজে পিতামাতা এই চারিজন যাত্রায় গিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া রোহিতাশ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "গঙ্গা-স্নানে বা বাবা বিশ্বনাথের দর্শনে আপনার কোনই ফল হয় নাই, কারণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে খুবই কষ্ট দিয়াছেন এবং মহাপাতকের কাজ করিয়াছেন।" পুণ্ডলিক করজোড়ে রোহিতাশের নিকট প্রার্থনা করিল, "দয়া করিয়া আমাকে এই মহাপাতকের ফল হইতে উদ্ধার করুন।"

রোহিতাশের আদেশে সে প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিল এবং পিতামাতার সেবায় তৎপর হইয়া সর্বতীর্থ-দর্শনমানসে পুনর্যাত্রা করিল।

একবৎসর পরে পুণ্ডলিক, আবার রোহিতাশের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি আমার গুরু, আমায় কৃপা করুন।" রোহিতাশ বলিল, "সায়ংকালে আপনি আমার নিকট আসিবেন।" পুণ্ডলিক আসিলে রোহিতাশ তাহাকে পঞ্চগঙ্গা দেখাইয়া বলিল, "আমার ঘরেই পঞ্চগঙ্গা আছে। আমি পিতামাতার সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করি না।" এইসব দেখিয়া পুণ্ডলিক বলিল, "আপনি মহাপুরুষ, আমায় শিষ্যত্বে বরণ করুন।" রোহিতাশ পুণ্ডলিককে বলিল, "আপনি দণ্ডকারণ্যে যাইয়া পিতামাতার সেবা করুন। উহাতেই শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হইবে। ভগবান আসিলে কোন কথা বলিবেন না এবং কোন জিনিসই চাইবেন না।"

বর্তমান পাণ্ডারপুরই দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত ছিল। তদবধি পুণ্ডলিক পাণ্ডারপুরের ঘোর জঙ্গলের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া পিতামাতাসহ বাস করিতে লাগিল। পার্শ্ববর্তী কুয়ার জলে নিত্য স্নান করিয়া পিতামাতার সেবায় দিন অতিবাহিত করিত। এইভাবে কিছুদিন চলিল। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান দর্শন দিবার মানসে পুণ্ডলিকের কুটীরের দরজায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও?" পুণ্ডলিক পিতামাতার সেবায় রত ছিল। সে পিছনের দিকে না তাকাইয়া একখানা ইট ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "ঠাকুর ইহার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এইমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের পদসেবা করিতেছি।" ভগবান সেই ইটের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে রুক্মিণী ভগবানকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ইটের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, যিনি বিশ্বপতি রাজরাজেশ্বর তিনি কিনা, একখানা ইটের উপর দাঁড়াইয়া! রুক্মিণী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীভগবান বলিলেন, "পুণ্ডলিক আমার বিশেষ ভক্ত, তার আদেশে আমি এই ইটের উপর দাঁড়াইয়া আছি। তার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। সে আসিলে তাকে বর দিয়া চলিয়া যাইব।" পুণ্ডলিক পিতামাতার সেবায় এতই তন্ময় ছিল যে, বর চাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি একবার দেখা করিতেও আসিল না। অতঃপর শ্রীভগবান ১০০ মাইল দূরবর্তী ভীমশঙ্কর পাহাড় হইতে চন্দ্রভাগা নদীকে আনয়ন করিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন, "পুণ্ডলিক! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বর চাওয়া তো দূরের কথা একবার দেখা করিতেও আসিলে না, বরং আমায় একখানা ইটের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিলে। আমি তোমার স্নানের সুবিধার জন্য এই নদী আনয়ন করিলাম। জগতের লোক এই নদীতে স্নান করিয়া আমার দর্শনে উদ্ধার হইবে।" যেস্থানে ভগবান ইটের উপর দাঁড়াইয়া-ছিলেন, সেই স্থানেই সাধু মহাত্মারা পাথরের সাহায্যে প্রভুর শ্রীমন্দির নির্মাণ করে। পরে ভক্ত ব্রাহ্মণ জ্ঞানদেব নাটমন্দির ও চারিদিকের দেওয়াল দিয়া দেন। নদীগর্ভে পুণ্ডলিকের মন্দির অদ্যাবধি বিদ্যমান। মহারাষ্ট্রী ভাষায় ইটকে "বিঠ" বলে। ইহা হইতেই শ্রীভগবানের নাম হয় "বিঠ্‌বা" বা "বিঠ্‌ঠলদেব।"

গোরাকুমার

পাণ্ডারপুরের অনতিদূরে আরনগাঁও গ্রামে গোরা নামে জনৈক কুম্ভকার সস্ত্রীক বাস করিত। তাহাদের 'সবেধন নীলমণি' এক পুত্র। স্বামী স্ত্রী উভয়েই হাঁড়ি তৈয়ার করিত। ইহাই তাহাদের একমাত্র জীবিকা ছিল। তাহারা এত গরীব ছিল যে, নিত্য যাহা রোজগার হইত তাহাতেই কোন

প্রকারে ভরণ-পোষণ হইত। এমনকি কোন কোন দিন উহাতে তাহাদের দৈনন্দিন ভোজনের সঙ্কুলানও হইতনা। এমতাবস্থাতেও নিত্য ভগবানের নাম কীর্তন করিতে ভুল হইত না। খুবই নিষ্ঠা ও নিয়ম পূর্বক ভজনাদি করিত। গোরা যখন হাঁড়ি তৈয়ার করিত, অধিকাংশ সময়েই ভগবানের নাম করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। একদিন ঐরূপভাবে আত্মহারা হইয়া ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে কাদা মাটীর সহিত ছেলেকে মিলাইয়া রাখে। ফলে ছেলের মৃত্যু হয়। গোরার কোনই হুঁশ নাই। স্ত্রী কাদা মাটির সহিত ছেলেকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল, "তুমি কিরকম ভগবানের ভজন করিতেছ? ছেলে যে মারা-গিয়াছে!" গোরা চোখ খুলিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে মৃত ছেলে পড়িয়া রহিয়াছে। নিজের দোষেই ছেলের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিল। অনুতপ্ত হইয়া গোরা নিজের হাত কুঠার দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। তাহার রোজগার বন্ধ হইল। উপবাসে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তবুও নিত্য ভগবানের ভজনের ব্যাঘাত হইল না।

একদিন ভগবান ছদ্মবেশে গোরার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমি নানা রকমের ভাল ভাল হাঁড়ি তৈয়ার করিতে পারি। তোমার সঙ্গে কাজ করিতে আমার বড়ই সাধ হইয়াছে।" গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" ভগবান উত্তর করিলেন, "আমি দ্বারকা হইতে আসিয়াছি।" গোরার সম্মতিতে ভগবান হাঁড়ি তৈয়ার করিতে লাগিলেন, উহাতেই গোরার নিত্য ভরণ-পোষণের অভাব মিটিয়া গেল। এইভাবে কিছুদিন বেশ চলিল। গোরা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। ইতোমধ্যে নামদেব বিঠ্ঠলদেবকে মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে গোরার বাড়ীতে আসিল। প্রভু হাঁড়ি তৈয়ার করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কেন, প্রভো?" ভগবান বলিলেন, "গোরা আমার পরম ভক্ত। সে বিভোর হইয়া আমার নাম কীর্তন করিতে করিতে তার ছেলেকে বধ করে। তাহার পর অভিমানভরে গোরা নিজের হাত কাটিয়া ফেলে। এই কারণে তাহারা উপবাসে মৃতপ্রায়। তাই তাদের জন্য হাঁড়ি তৈয়ার করিতেছি।"

আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে সমবেত ভক্তেরা ভগবানের ভজন করিতেছে। নামদেবের অনুরোধে গোরাও যোগদান করিল। সকলেই হাতে তালি দিয়া ভজন করিতেছে। গোরা কেবল মাথা নাড়িতেছে। নামদেব বলিল, "গোরা! তুমিও হাততালি দাও।" গোরা কোন জবাব না দিয়া মাথা নিচু করিয়া আপন মনে ভজন করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ নামদেবের অনুরোধে গোরা হাত তুলিতেই দেখিল, তাহার হাত হইয়াছে। অমনি সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নামদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ভাই নামদেব! তাহলে কি আবার আমার ছেলেও বাঁচিয়া উঠিবে?" নামদেব বলিল, "হ্যাঁ ভাই! মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের ভজন করিলেই তোমার ছেলে বাঁচিয়া উঠিবে।" গোরা বিভোর হইয়া একমনে ভজন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিল ছেলে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। গোরা ভক্তিতে গদগদ হইয়া বিঠ্ঠল ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে বলিল, "প্রভো! তোমার অপূর্ব লীলা। জীবের সাধ্য কি তোমাকে চিনিতে পারে? তুমি দীনের দীননাথ।"

সাঁওতা মালী

সাঁওতা নামে একজন মালী সেঁওগা গ্রামে বাস করিত। তাহার বাগানে নানা রকমের সুগন্ধি ফুলের গাছ ছিল। ফুল-বিক্রয়ই ছিল তাহার একমাত্র

জীবিকা। নিত্য সকালে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথে, আর ভগবানকে নিবেদন করিয়া বিভোর হইয়া ভজন করে। পরে বাজারে ফুলবিক্রয়লব্ধ অর্থে আহার্য দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে বাগানে কাজ করে ও ভগবানের নামকীর্তন করে। অহর্নিশিই তাঁর ভাবে সে মাতোয়ারা। এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। বিঠ্‌ঠলদেব সাঁওতার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন। একদিন সাঁওতা বাগানে কাজ করিতেছে ও আপন মনে ভজন করিতেছে। ভগবান ছদ্মবেশে তাহাকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাঁওতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে চোরে তাড়া করিয়াছে, কোথায় লুকাইব, লুকাইবার স্থান নাই।" সাঁওতা চীৎকার শুনিয়া সবই বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ নিজের পেট চিরিয়া বলিল, "প্রভো! এই যে লুকাইবার স্থান।" স্বস্বরূপে বিঠ্‌ঠলদেব দর্শন দিয়া সাঁওতার পেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সাঁওতার পেটও জুড়িয়া গেল।

চোখবা

পাণ্ডারপুরের কিয়দ্দূরে মঙ্গলবেড়য়া নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে চোখবা বাস করিত। সে জাতিতে মহার। ইহারা গ্রামের মৃত জানোয়ার সব ফেলিয়া থাকে। চোখবা অবিবাহিত। বাড়ীতে তাহার একমাত্র ভাই আছে। তাহার শৈশবাবস্থাতেই পিতামাতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চোখবা অধিকাংশ সময়েই ভগবানের ভজনে দিন অতিবাহিত করে। একদিন গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের একটি ঘোড়া মারা যায়; ঘোড়া ফেলিবার জন্য ব্রাহ্মণ চোখবাকে ডাকিল। তখন চোখবা ভাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ভাই বলিল, "আমাকে কেন? তোমার ভগবানকে ডাকনা, সেই তোমার সঙ্গে যাবে।" চোখবা ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী যাত্রা করিল। পথে ছদ্মবেশী ভগবান বিঠবার সহিত দেখা হয়। ভগবান চোখবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?" চোখবা উত্তর করিল, "ব্রাহ্মণের ঘোড়া মারা গিয়াছে, তাহা ফেলিতে হইবে।" ভগবান বলিলেন, "চল আমিও যাইব, তোমায় সাহায্য করিব।" উভয়ে মিলিয়া ঘোড়াকে ফেলিয়া দেয়। তারপর চোখবা সঙ্গের লোকটিকে আর দেখিতে পাইল না। পারিশ্রমিক বাবদ চোখবা সামান্য গম পাইয়াছিল।

উক্ত গম ভগবানের নিমিত্ত মস্তকে ধারণ করিয়া পাণ্ডারপুরাভিমুখে সে যাত্রা করিল। পথ চলিতে চলিতে অনেক রাত্রি হইল। পাণ্ডারপুরে আসিয়া দেখিতে পাইল, মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া পূজারী বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। চোখবা মন্দিরের পাশে বাহিরে বসিয়া ভগবানের ভজন করিতেছিল। সেই সময় ভগবান স্বয়ংই মন্দিরের ভিতরে তাহার বিশ্রামের ও খাবারের ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন সকালে পূজারী মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল, একজন লোক ভিতরে বসিয়া আছে। পূজারী ক্রোধান্বিত হইয়া চোঁখবাকে প্রহার করিল এবং মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। পূজারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ভগবানের বগলে একটি গরুর হাড়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পূজারী হাড়টি টানিয়া বাহির করিতে পারিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া পাণ্ডারপুরের ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া আনিল। তাহাদের সকলের চেষ্টাতেও হাড় বাহির করিতে অকৃতকার্য হইল। নিরুপায় হইয়া পূজারী গলবস্ত্রে ও করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, "প্রভো! এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" ভগবান আদেশ করিলেন, "যাও, চোখবাকে ডাকিয়া লইয়া এস। সে আমার পরম ভক্ত। তাহাকে তুমি অযথা মারিয়াছ। তাহার নিকট ক্ষমা চাও। তাহার হাত লাগিলেই এই হাড় খুলিয়া যাইবে।"

পূজারী চোখবার অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিছুক্ষণ পরে অনতিদূরে দেখিতে পাইল, চোখবা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বসিয়া রুটি খাইতেছে। লোকজনের যে জায়গায় যাতায়াত নাই, এমন জায়গায় বসিয়া চোখবা রুটি খাইতেছিল। ঘাটে বসিলে হয়তো আবার কোন বিপদ হইতে পারে, তাই দূরে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। চোখবা ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র প্রাণের দায়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণও পিছু পিছু ছুটিতেছে। কিছুক্ষণ পরে চোখবাকে আলিঙ্গন করিয়া সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। চোখবা ভগবানের আদেশ জানিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মন্দিরে আসিল। চোখবার হাত লাগিবামাত্রই ভগবানের বগল হইতে গরুর হাড় বাহির হইয়া গেল। বিঠ্‌ঠলদেব বলিলেন, "যার যা কাজ, সে তাই করবে।" চোখবা আপন গ্রামে চলিয়া আসিল এবং পূর্ববৎ ভগবানের ভজনে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন চোখবার ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল। উহাতেই চাপা পড়িয়া চোখবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিঠ্‌ঠলদেবের আদেশে নামদেব চোখবার মৃতদেহ পাণ্ডারপুরে আনয়ন করিয়া মন্দিরের সম্মুখেই তাহার সমাধি স্থাপন করিলেন। অদ্যাবধি মহারগণ প্রথমে চোখবার পূজা করিয়া পরে বিঠ্‌ঠলদেবকে দর্শন পূজাদি করিয়া থাকে।

কান্নু পাত্তরা

মঙ্গলবেড়য়া গ্রামে জনৈকা নর্তকী বাস করিত। নৃত্যগীতই তাহার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সে বাদশাহের দরবারে নৃত্যগীত করিত। কান্নুনামে তাহার এক পুত্র ছিল। সে নিত্য ভগবানের ভজন না করিয়া আহারাদি করিত না। তাহার সুললিত কণ্ঠের গান শুনিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই মুগ্ধ হয়। কান্নুর ভজন শুনিবার জন্য বাদশা তাহার মাতাকে বলিলেন। মাতা ছেলের নিকট বাদশাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কান্নু দরবারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বাদশা দুইবার তাঁহার সিপাহীদের পাঠাইলেন। তাহারা অকৃতকার্য হইয়া বাদশাহের সকাশে ফিরিয়া আসিল। অগত্যা বাদশা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কান্নু পাণ্ডারপুরে আসিয়া বিঠ্‌ঠলদেবের নিকট সভয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, "প্রভো। বাদশা আমাকে শাস্তি দিতে আসিয়াছেন।" ভগবান বলিলেন, "তোমাকে দরবারে যাইতে হইবে না। তুমি মন্দিরের পাশেই লুকাইয়া থাক। কেহই তোমায় দেখিতে পাইবে না।" ভগবান এইরূপভাবে কান্নুকে লুকাইয়া রাখিলেন যে, বাদশা তাঁহার সিপাহীগণসহ বহু চেষ্টা করিয়াও কান্নুর কোনই খোঁজ করিতে পারিলেন না। অকৃতকার্য হইয়া বাদশা বিফলমনোরথে রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। কান্নু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিল।

সেনা হ্বাবি

আম্বো সহরে সেনানামে একজন নাপিত বাস করিত। মারাঠী ভাষায় নাপিতকে 'হ্বাবি' বলে। সে বাদশাহের ক্ষৌরকর্ম করিত। নিত্য বিঠ্‌ঠল ভগবানের পূজা ও ভোজ্য দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। ভুলিয়াও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। একদিন বাদশা ক্ষৌরকর্মের নিমিত্ত সেনাকে ডাকিলেন। সেই সময় সে ভগবানের পূজায় রত ছিল। ভক্ত সেনার পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বিঠ্‌ঠলদেব সেনার রূপ ধারণ করিয়া বাদশাহের আদেশ পালন করিলেন। ক্ষৌরকর্ম করিবার সময় ভগবান বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! কে আপনার কাজ করিতেছে?" বাদশা উত্তর করিলেন, "সেনাই আমার কাজ করিতেছে।" ক্ষৌরকর্ম শেষ করিয়া ভগবান চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে সেনা বাদশাহের সকাশে আদেশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বাদশা বলিলেন, "সেনা, এই যে তুমি আমার কাজ করিয়া গেলে, আবার কেন আসিয়াছ ?" সেনা দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই কাজ যে বিঠ্ঠল ভগবানই করিয়াছেন, ইহা সে মরমে মরমে বুঝিয়াছিল। "যিনি জগৎপিতা জগদীশ্বর, তিনি কিনা আমার মতন গণ্য ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া অস্পৃশ্যকাজ করিয়াছেন!" বিঠ্ঠল ভগবানের এই অপার দয়ার কথা স্মরণ করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া সেনা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দামজী

দামজী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। খুব নিষ্ঠা সহকারে তিনি নিত্য ভগবানের ভগবানের পূজা ও পাঠ সমাপনান্তে আহার করিতেন। তিনি বেদর রাজ্যের মঙ্গলবেড়য়া অঞ্চলের বাদশাহের দেওয়ান ছিলেন। কোন এক সময়ে ঐ দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অনাহারে হাজার হাজার নরনারী আবাল-বৃদ্ধবনিতা অকাল মৃত্যুতে পতিত হইল। একদিন ঐ অঞ্চলের বহুলোক সমবেত হইয়া পাণ্ডার-পুরে আসে। সকলেই ইহা স্থির করিল যে, অনাহারে মরার চেয়ে চন্দ্রভাগা নদীতে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ। সকলেই নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ঠিক সেই সময় ছদ্মবেশে বিঠ্ঠল ভগবান তাহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ ?" তাহারা বলিল, "আমরা পেটের দায়ে চন্দ্রভাগাতে ডুবিয়া মরিব ঠিক করিয়াছি।" ভগবান বলিলেন, "আমার কথা শুন। তোমরা মঙ্গল-বেড়য়াতে যাও। সেখানে তোমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি পাইবে।" তাহারা মঙ্গলবেড়য়াতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ানের নিকট সব বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। দামজী বাদশাহের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি লইতে আদেশ করিলেন। ফলে বাদশাহের ভাণ্ডার শূন্য হইল বটে, কিন্তু বহুলোকের জীবনরক্ষা হইল। বাদশা জনৈক কর্মচারীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। বিনানু-মতিতে ভাণ্ডার হইতে দ্রব্যাদি বিতরণের অপরাধে দামজীকে কারাদণ্ডের উদ্দেশ্যে সিপাহী প্রেরণ করিলেন। সিপাহীরা দামজীকে বন্দী করিয়া বেদর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। দামজী বিনীতভাবে সিপাহীদের বলিল, "পথে পাণ্ডারপুরে বিঠ্ঠল ভগবানকে একবার দর্শন করিব।" সিপাহীরা ইহাতে কোনই আপত্তি করিল না। তাহারা পাণ্ডারপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামজী স্নান করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগাতে অবতরণ করিলেন।

এদিকে বিঠ্ঠল ভগবান কালো কম্বল গায়ে ও লাঠি হস্তে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি দামজীর চাকর। আমার নাম বিঠ্। আমি জাতিতে মহার। ভাণ্ডারের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাবদ এই টাকা সহ আমাকে তিনি পাঠাইয়াছেন। হিসাব করিয়া রসিদ লিখিয়া দিতে হইবে।" বাদশা টাকা পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ধনভাণ্ডারে টাকা জমা রাখিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাণ্ডারের শস্যের মূল্য হইতেও টাকার পরিমাণ বেশী। ভগবান বলিলেন, "এই টাকা আপনারই জন্য তিনি দিয়াছেন।" বাদশা রসিদে নিজের নাম দস্তখত করিয়া দিলেন। 'বিঠ্' রসিদসহ প্রত্যাবর্তন করিল। রসিদ এই মর্মে লেখা হইয়াছিল— "আমি মঙ্গলবেড়য়া ভাণ্ডারের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝিয়া পাইয়াছি।" ভগবান ঐ রসিদ দামজীর গীতার ভিতর রাখিয়া দিলেন। স্নানান্তে দামজী পাঠের উদ্দেশ্যে গীতা খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, বাদশাহের স্বহস্তের দস্তখতসহ একখানা রসিদ। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দামজী পাঠান্তে ভগবানের

দর্শনলাভ করিয়া সিপাহীগণসহ বেদর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাদশা বিঠ্ঠুর পুনর্দর্শনলাভমানসে পাগল হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই মনে শান্তি নাই। বিঠ্ঠুর দর্শন—এই একমাত্র চিন্তাই হৃদয় অধিকার করিল। অগত্যা দর্শনমানসে রাজ্য ছাড়িয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পথে দামজীকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি মহাপুরুষ, আমি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। বিঠ্ঠু নামে তোমার চাকরটিকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" বাদশাহের কথায় দামজী খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হুজুর! বিঠ্ঠুনামে আমার কোন চাকর নাই। আমি তাহাকে জানি না। আপনি দয়া করিয়া তাহার কোন নিদর্শন দিতে পারেন কি?" বাদশা বলিলেন, "সে জাতিতে মহার। ভাণ্ডারের সমস্ত শস্যের মূল্য সে আনিয়াছিল। তাহার গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানে কালো কম্বল ও হাতে লাঠি, জ্যোতিঃপূর্ণ বদনমণ্ডল, মনোমুগ্ধকর নয়নযুগল ও সুমিষ্টভাষী।" গীতার ভিতর সেই রসিদের কথা স্মরণ করিয়া দামজী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইল। আর বলিল, "হে বিঠ্ঠলদেব, হে পাণ্ডুরঙ্গ! আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি মহারের বেশে বাদশাকে দর্শন দিয়াছ। তিনি খুবই ভাগ্যবান। হে প্রভো! তুমি জগৎপিতা জগদীশ্বর, আমার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছ। আমি জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম।"

"হে বিঠবা, হে বিঠ্ঠল" বলিয়া দামজী গদগদভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সময় দীনবন্ধু পতিতপাবন ভগবান দামজী ও বাদশাকে শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সেই অবধি দামজী বিঠবার ভাবে বিভোর হইয়া বাদশাহের দেওয়ানের কর্ম ত্যাগ করিয়া বাকী জীবন পাণ্ডারপুরে বাস করিতে লাগিলেন। বিঠ্ঠলদেবের স্মরণ-মননে তাঁহার দিন পরমশান্তিতে অতিবাহিত হইত।

ডক্টর মতিলাল দাস, এম্-এ, বি-এল্, পি এইচ্-ডি

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, ছন্দে সুরময়, গতির হিল্লোলে হিল্লোলিত। সেই অবাধ, অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে যখন যতি ফেলি, তখন দেখি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব সংহার করেন। কিন্তু গতিবেগের স্রোতে তিনই এক, একই তিন।

এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। ঋষিগণের উপলব্ধ সত্য। তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির ভাস্বর অবদান। বিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয়ের প্রশ্নে পরাশর এই গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই জগৎ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতেই এই জগৎ অবস্থিত, তিনিই ইহার স্থিতি ও সংযমের কর্তা এবং আসলে তিনিই জগৎ।

দর্শনের পরিপ্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সমস্তই পুরাণবিদের সঙ্কলনে রূপ পাইয়াছে। বিষ্ণু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্॥ বি-২-১৩

এই পরম জ্ঞান পরম্পরায় পুরাণকারের কৃপায় সাধারণের সম্পদ হইয়াছে। বিষ্ণু ও ব্রহ্ম অভিন্ন—উভয়েই পরম সত্তা—শাশ্বত নিত্য পদার্থ, অজ, অক্ষয় ও অব্যয়। তাহা একেরই বিভূতি ও প্রকাশ, মায়াহীন বলিয়া তাহা নির্মল ও জ্যোতির্ময়।

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানম্ বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥ বি-২-৬৩

প্রভু বিষ্ণু স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন,

পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকে পালন করেন, শেষে সংহর্তা হইয়া নিজেই সমস্ত ধ্বংস করেন। বিষ্ণুর এই পরম মাহাত্ম্য কিন্তু আদি আর্যগণের মধ্যে ছিল না। ঋগ্বেদে বিষ্ণু কিন্তু অপ্রধান দেবতা—তাঁহার উদ্দেশে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণের মত সূক্তের উচ্ছ্বাস নাই। অল্প কয়েকটি সূক্তে মাত্র বিষ্ণুর উল্লেখ আছে।

কণ্বপুত্র মেধাতিথি বিষ্ণুর বন্দনা করিতেছেন:—

বিষ্ণু যেথায় সপ্ত ধামে করেছিলেন পাদক্রমণ,
দেবতা সবে সেই ভুবনের করুন মোদের পরিরমণ।

বিষ্ণু যখন বিশ্ব পরে রেখেছিলেন ত্রিধা চরণ,
ধূলি জালে পূর্ণ ধরা নিয়ে ছিল স্নিগ্ধ শয়ন।

বিস্তারিলেন তিনটি চরণ ত্রিলোকেরি ব্যাপ্তি-কারণ,
অবিজেয় পালক তিনি করেছিলেন ধর্ম ধারণ।

ইন্দ্রদেবের যোগ্য সখা বিষ্ণুদেবের কর্ম হেরি,
যাঁহার কৃপায় ব্রত পালি থাকেন যিনি ক্রিয়া ঘেরি।

বিষ্ণুদেবের পরম পদে দেখেন সদা কবি দলে,
অবিরোধে দেখে সকল চক্ষু যথা আকাশতলে।

বিপ্র যারা অপ্রমাদে স্তুতি করেন নিত্য দিবা,
বিষ্ণুদেবের পরমপদে দেন যে তারা দীপ্ত বিভা।"

ইহার পর দীর্ঘতমার বন্দনা পাই। তিনি দুইটি পূর্ণ সূক্তে বিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন এবং অন্য একটি সূক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর যুক্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

দীর্ঘতমা বলিতেছেন—এই পৃথিবী বিষ্ণু পরিমাপ করিয়াছিলেন—যাঁহার ত্রিবিক্রম পদক্ষেপের মধ্যেই বিশ্বজগৎ বাস করে। তিনি ত্রিভুবন ধারণ করিয়া আছেন—এই ত্রিভুবন তাঁহার অমৃত ধারায় প্লাবিত—তাঁহার পরমপদে সেই অক্ষয় মধুর উৎস। মানুষ তাঁহার প্রথম দুই পদ জানিতে পারে, কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। গগনচারী বিহগেরাও তাঁহার তৃতীয় পদের সন্ধান পায় না।

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং
ব্যতীঁরবী বিপং।
বৃহচ্ছরীরো বিসিমান ঋকভির্যুবাকুমারঃ
প্রত্যেত্যাবহং॥ ১-১৫৫-৬

কেহ কেহ বলেন বিষ্ণু ও আদিত্য অভিন্ন। বিষ্ণু তাহার নব্বইটি অশ্বকে (দিনকে) গতি দান করেন, তাহাদের চার নাম দিয়া চার ঋতু সৃষ্টি করেন এবং এইরূপে ৩৬০ দিনে বৎসর পরিমাণ করেন।

রাজা বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎ-পরিচালক বিষ্ণুর আজ্ঞা মানেন। বিষ্ণু যজমানকে ঋতের ভাগ অর্পণ করেন।

তথাপি বিষ্ণু উপেন্দ্র। ভরদ্বাজ বলেন—বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য শত মহিষ বলির আয়োজন করেন। ভরদ্বাজই ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ সূক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর যুগপৎ উপাসনা করেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে ভরদ্বাজ মদপতি বলিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন, মানুষের জীবনধারণের জন্য দেশকে প্রসারিত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাতৃগণ এই শ্লোক হইতে অনুমান করেন, ইন্দ্র ও বিষ্ণু আর্যগণের দুই অবিস্মরণীয় নেতা—দিগ্বিজয়ে যাত্রী আর্য পিতামহগণকে তাঁহারা পথ দেখাইয়া দুর্গম মরুকান্তার পার করাইয়া ভারতবর্ষে নিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নেতৃত্বেই আর্যগণ পঞ্চনদের তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়াই এই দুই মহাপুরুষের বিজয়গাথা রচিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজ পুনরায় বলিতেছেন—ইন্দ্র ও বিষ্ণু চিরবিজয়ী—কেহ তাঁহাদিগকে কখনও পরাজিত করিতে পারে নাই—তাঁহারা তাঁহাদের সমরাভিযানের দ্বারা বিস্তৃতা পৃথ্বীকে আর্যগণের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে বিষ্ণু ইন্দ্রের গৌরবকে ম্লান করিয়া পরম পুরুষের মাহাত্ম্য লাভ করিলেন—

ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডল যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত সূর্যের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ-যুগেই ইহা ঘটিয়াছিল এবং মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে ইহার চরম পরিণতি লাভ হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নির্দেশ দিতেছেন—

অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা
অন্যা দেবাঃ। ১।১

অগ্নি দেবতাদের প্রথম, আর বিষ্ণু দেবগণের পরম - অন্য দেবতারা ইহাদের মাঝখানে থাকেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক বিষ্ণুর এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কাহিনীর কথা বলিয়াছে। দেবগণ যজ্ঞ করিলেন। স্থির হইল যে, তপস্যার বিভূতিতে যিনি সর্ব প্রথম যজ্ঞ ফল লাভ করিবেন, তিনিই দেবতাদের নেতা পরমদেব হইবেন।

বিষ্ণু স্বকীয় অপূর্ব প্রতিভায় যজ্ঞের চরম সিদ্ধি সকলের পূর্বে লাভ করিলেন, এবং দেবতাগণের প্রথম ও প্রধান হইলেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব শক্তির, বীর্যের ও ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা।

বিষ্ণুর এই অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিই বামন-কাহিনীর মূল। সুরাসুরের কলহে বিষ্ণু অসুরগণের নিকট মাত্র ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া লইলেন, পরে সেই ত্রিপাদ-সংক্রমণে সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করিলেন। এই ত্রিবিক্রম কথা কিন্তু সংহিতা যুগের ভাবসম্প্রসারণ। ব্রাহ্মণে তাহা বিস্তৃত এবং পুরাণে তাহা পল্লবিত।

কিন্তু এইটুকু বলিলেই বিষ্ণুর পরম বিজয়ের রহস্য বুঝা যায় না। তাঁহার গৌরবের কারণটুকু কঠোপনিষদে সুব্যক্ত করা হইয়াছে। কাঠকেরা বলেন—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যে মানুষ বিবেককে সারথি করিয়া চলে, যে মনন-শক্তিরূপ বল্গাকে শাসনে রাখে, সেই মানুষ পথের পরিসমাপ্তি পায়, সেই বিষ্ণুর পরম পদ পায়। বিষ্ণুর পরম পদ মানুষের অভীপ্সার শেষ সীমা, মানুষের অধিকারের পরাকাষ্ঠা!

বিষ্ণুর দুই পদ দৃশ্য, কিন্তু তাঁহার অদৃশ্য যে পদ তাহাই মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম অধিষ্ঠান বলিয়া মানুষ ধরিয়া লইল। অপবর্গ, মুক্তি বা চরম অভ্যুদয় বলিতে মানুষ এই অজ্ঞাত পদকে বুঝিতে শিখিল। বিষ্ণু এই পরম পদের গোপ্তা, তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

কবে কোন্ ঋষির সাধনায় এই পরম সত্য মানব জানিয়াছিল, ইতিহাস বা শাস্ত্র তাহার নির্দেশ রাখে নাই, কিন্তু যেদিন হউক, সেই দিন হইতে বিষ্ণু হিন্দুর পরম দেবতা। কালে কালে যুগে যুগে নব নব কল্পনা আসিয়া মানুষকে নূতন নূতন সাধনায় চালাইয়াছিল, কিন্তু দেখা যায়, বিষ্ণু সেই সব সাধনার সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন।

বাসুদেব, নারায়ণ, কৃষ্ণ, প্রভৃতির সহিত বিষ্ণু অভিন্ন হইয়া মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষ্ণু পুরাণে এই সব ভক্তিবাদের সকল আবির্ভাব কৌতূহলী সাধককে রসাপ্লুত করে।

বিষ্ণুপুরাণে ভক্তিবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের সমন্বয় ঘটানো হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে পাই—

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তু জাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ—
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্।
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্।
এবং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥

সংসারে যাহা কিছু দেখি, তাহা জ্ঞানেরই লীলা। জ্ঞানের বাহিরের বস্তুসত্তা কিছুই নাই—নানা মানুষের নানা চিত্তে এই এক পরম প্রকাশ বিচিত্ররূপে

প্রতিভাসিত, কিন্তু আসলে এক জ্ঞানই আছে। সেই পরম প্রজ্ঞান বিশুদ্ধ, বিমল; তাহাতে শোক নাই, গ্লানি নাই, আর সেই জ্ঞান পরমপুরুষ সনাতন বাসুদেবের সহিত অভিন্ন।

শঙ্করাচার্যের উক্তিই যেন বিষ্ণুপুরাণ-কথক পরাশরের মুখেই বসানো হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু অদ্বৈতবাদের প্রধান অধিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ান নাই, তিনি মানুষের মনে প্রীতি ও অনুরাগের দীপ জ্বালাইয়া মানুষকে বুকে টানিয়াছেন।

বাংলা দেশে চৈতন্যদেব হরিভক্তির যে বন্যা বহাইয়াছেন বাঙালী সকলেই তাহা জানেন, তাহার কথা বলিব না। বিষ্ণুপুরাণেই দেখি বিষ্ণু ভক্তির পাত্র ও পূজাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রহ্লাদ যে বিষ্ণুস্তব করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশে তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন এই মন্ত্রে—

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্য প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষয়মব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ
যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ॥

যে পরম দেবতা জগৎ জুড়িয়া আছেন, জগতের কারণ তিনি, ধ্যানের কমলাসনে তাঁহাকেই উপলব্ধি করি, তাঁহার পরিবর্তন নাই, সেই অব্যয় শ্রীহরি প্রসন্নতার আশীর্বাদে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

এই বিরাট জগৎ যাঁহাতে ওতপ্রোত—কাপড়ের টানা ও পড়েনের মত যাঁহাতে গ্রথিত, সেই পরম পুরুষ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সেই বিষ্ণুকে বার বার ভজনা করি, যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, যিনি সর্ব, যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়—সেই বিষ্ণুকে বার বার নতি জানাই।

বিষ্ণুর লীলাভিনয় ভারতীয় সাধনার সকল যুগে নব নব রূপ লইয়া ভারতচিত্তকে সরস করিয়াছে। এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই লীলার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। প্রহ্লাদ যে প্রার্থনা ও যে বর চাহিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রার্থনা জানাই—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

হে অচ্যুত, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অবিচলা ভক্তি থাকে। বিষয়ীরা যেমন বিষয়ে মাতিয়া যায়, আমি যেন তোমাতে তেমনই আসক্তি অনুভব করি। আমার হৃদয় হইতে যেন তোমার প্রতি পরানুরক্তি কখনও অপসৃত না হয়।

প্রয়াগে একমাস

শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়

বহু বৎসর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পিতৃতুল্য একজন সাধু বলিয়াছিলেন, "সনাতন ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য উপলব্ধি করতে হলে একবার অবশ্য কুম্ভমেলায় যেও।"

কখনও একলা কোনও তীর্থস্থানে যাই নাই। তাহাতে অসুস্থ শরীর। কোনও আত্মীয়-স্বজনের সম্মতি পাইব না বলিয়াই কাহাকেও জানাই নাই। একান্ত আত্মনির্ভরশীল নই, তাই একটু ভয়ে ভয়ে ৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৪ (২৪শে পৌষ, ১৩৬০) পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম কাশী। পরদিন পৌছিলাম। কাশীতে মা রহিয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী মায়ের হাতের তৈয়ারী খিচুড়ি

খাইয়া রওনা হইলাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শুনিলাম গাড়ী (যেটা আসিবার কথা ১০-৪৪) বিলম্বে পৌঁছিবে। ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। দলে অন্ততঃপক্ষে আমরা পঁচিশ তিরিশ জন ছিলাম। কাশী সেবাশ্রমের কয়েকজন সাধু মহারাজও যাইতেছিলেন।

যাহা হউক অবশেষে বহু প্রত্যাশিত ট্রেনটি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সশব্দে কুলীদের ত্রস্ত ব্যস্ত করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাত্রীরা ছুটিতে ছুটিতে যে যে কামরায় পারিল উঠিয়া বসিল। 'চাচা আপন বাঁচা' কে কার ধার ধারে? সঙ্গীদের কাহারও সাহায্য পাইলাম না। আশ্চর্য, এত ভিড় সত্ত্বেও ষ্টেশনে কেহই পড়িয়া রহিল না।

সন্ধ্যার গোধূলিতে আমরা ঝুসী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা, সূর্য পাটে বসিয়াছেন। সমস্ত ঝুসী শহর বিজলী আলোর মালায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তাঁবুর উপর ধর্মের প্রতীক বিচিত্র বর্ণের পতাকা পত্‌ পত্‌ শব্দে উড়িতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিলাম দেড় মাইল হাঁটিয়া। মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সারি সারি কুটীর। একটিতে আমার স্থান হইল। স্থানটি অপরিচিত, তখনও বেশী যাত্রী আসে নাই। একলা একটি ঘরে থাকিতে হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, পূর্বদিকে নিটোল রক্তগোলক ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌ ··· এবং ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্‌' অজ্ঞাতে কখন উচ্চারিত হইল বুঝিতে পারিলাম না।

দুরন্ত শীত, হাত পা অবশ অসাড়; তুষার-তল বায়ু শরীরে সূচিকা বিদ্ধ করিতেছে। তথাপি ত্রিবেণীর সন্ধানে চলিলাম পরমাগ্রহে। ঝুসী হইতে গঙ্গা এক মাইল হইবে। চলিতে চলিতে সঙ্গীদের সহিত আলাপাদি করিতে করিতে গত দিনের ক্লান্তি দূর হইল। গঙ্গাতীর হইতে নৌকাযোগে সঙ্গমে যাইতে হয়। নৌকায় উঠিলাম। গঙ্গার অবিরাম গতি, উচ্ছৃঙ্খল ঢেউয়ের তালের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও নৃত্য করিয়া উঠিল অপার আনন্দে। শরীরমনও স্নিগ্ধ হইল। পূর্বে দুইবার সঙ্গমে স্নান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু এবার সঙ্গমকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম। গঙ্গা ও যমুনার দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে বিভিন্ন রূপ লইয়া। গঙ্গার রং গেরুয়া, যমুনার নীল জলে কাহার রং প্রতিফলিত হইতেছে? এ যে শ্যামসুন্দরের গাত্রের অবিকল নীল রংটি! কি অপূর্ব শোভা! 'যো অপ্সু' মনে পড়িল। সুনীল অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া সেই একই অনুভূতি হইল। অরূপের রূপ বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া আছে। অবগাহন করিয়া শরীর মন পবিত্র হইল। নবশক্তি সঞ্চার হইল।

যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মকর-সংক্রান্তি আসিয়া পড়িল। চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। কি দেখিব? কি জানিব? না জানি সে কি আনন্দ, 'নূতন আলোক আপন হৃদিমাঝে!' শুনিলাম, নানা সম্প্রদায়ের সাধুদিগের মিছিল বাহির হইবে ভোর ছয়টায়। ভিড়ের ভয় সত্ত্বেও দুরন্ত শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া ভোর চারিটায় টর্চ্চ জ্বালাইয়া বাহির হইলাম তিনটি প্রাণী। পথে দেখিলাম—জনসমুদ্র, রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য যাত্রী স্থানাভাবে রাত্রি যাপন করিয়াছে।

রাজ্য সরকারের বন্দোবস্ত খুব ভালই ছিল। অতি যত্নে গঙ্গার উপর এক নম্বর, দুই নম্বর করিয়া সাত নম্বর পর্যন্ত সেতু নির্মাণ করা হইয়াছিল। যে সেতুর উপর দিয়া মিছিল গঙ্গামুখে যাইবে, সে সেতুর উপর দিয়া জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ

ছিল। মিছিল এক পথ দিয়া যাইবে এবং স্নানান্তে অন্য পথ দিয়া ফিরিবে এইরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল। দর্শকদিগের জন্য রাস্তার দুই পাশে প্রায় দুইতলা সমান উঁচু পাশাপাশি শালের খুঁটি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা চারিজন মিছিলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কলেজের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও পুলিশবাহিনী অতি দক্ষতার সহিত কার্য করিতেছে দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম।

ক্রমে দেখিলাম, নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ আপন আপন নানারূপ অস্ত্র—ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, সোঁটা ও বাদ্যযন্ত্র সহ অগ্রসর হইতেছেন। সন্ন্যাসী, বৈরাগী, উদাসী, পঞ্চব্রতী, নাথপন্থী, কবীর-পন্থী, দাদূ-পন্থী, অটল, নিম্বার্ক, আবাহন, শ্রীসম্প্রদায় মাধবী ও বল্লভাচারী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায়। সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব। ইঁহারা আপন আপন মর্যাদানুসারে কেহ হাতীতে, কেহ পালকিতে, কেহ উটের পিঠে, কেহ বা চতুর্দোলায়। অধিকাংশ সাধু বিশেষতঃ নাগা সাধুরা পদব্রজে আপন আপন ইষ্টদেবতা ও ধর্মের প্রতীক বিচিত্র পতাকা সহ একে একে (দড়ি দিয়ে ঘেরা) গঙ্গায় নামিলেন স্নান করিতে। নাগা সাধুদিগের স্নান দেখিয়া খুবই আনন্দ পাইলাম। জলে নামিয়া ইঁহারা একে অপরের গায়ে জল ছিটাইলেন, গঙ্গামাটি সারা অঙ্গে মাখিলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 'পার্ব্বতীপতে হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে ওঁকারের ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া চলিলেন।

সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য—ক্ষুদ্র লেখনীতে কিরূপে বর্ণনা করিব? দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম।

সাধুদিগের স্নানের পর দড়ি-দিয়া-ঘেরা স্থানেই আমরা স্নান করিলাম। এক অপূর্ব অনুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের কথা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। বেলা সাড়ে এগারটা আন্দাজ ক্যাম্পে ফিরিয়া দেখি চা জলখাবারের পরিপাটী বন্দোবস্ত। মাতা যেমন ক্ষুধিত ক্লান্ত শ্রান্ত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত মহারাজও খাদ্যাদি লইয়া সেইরূপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইতোমধ্যে তিনি যে কখন স্নান সারিয়া ফিরিয়াছেন জানি না! বারটা সাড়ে বারটার ভিতর খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। বসুমতীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতাও ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীস্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) শিশুকালের অনেক গল্পই শুনিলাম। ছোট বড় সকলের একত্র আহার-বিহার, আলাপ-আলোচনা চলিত মহানন্দে। ক্রমশঃ যাত্রী সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। মহারাজেরা নিজেরাই রান্নার বন্দোবস্ত করিতেন, তরকারি কুটিতেন। এতজন স্ত্রীলোক থাকিতে মহারাজেরা তরকারি কুটিবেন, ইহাতে আমাদের বড় সঙ্কোচ বোধ হইত। অবশেষে আমরাই এই কার্যের ভার লইলাম। খাদ্যাদির ব্যবস্থা অতি পরিপাটী ও চমৎকার ছিল। সকাল বিকাল চা জলখাবার, দুপুরে ও রাত্রে ভাত ও রুটি, দুইটি তরকারি, ডাল ও চাটনি। একত্রে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্রী-যাত্রী আহারে বসিতেন, পরিবেশন মহারাজেরাই করিতেন। প্রত্যেকের নিকটে গিয়া বলিতেন, "মায়েরা লজ্জা করবেন না, পেট ভরে খাবেন।" নিত্য নূতন তরকারি রান্না করাইতেন। আমাদের সংসারাশ্রমে এরূপ সুবন্দোবস্ত সর্বত্র আছে কিনা সন্দেহ। এইরূপে অতি সুখে ও আরামে দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি ঝুসী প্রয়াগ শহরের একপ্রান্তে, মা গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় চড়ার উপর বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়ের ক্যাম্প অধিকাংশই ঝুসীতে স্থাপনা করা হইয়াছিল।

সারবন্দী কুশের ছাওয়া কুটীর ও বিভিন্ন বর্ণের তাঁবুগুলি যেন যাত্রীদের সাদরে আহ্বান করিবার জন্যই নির্মিত হইয়াছে।

দৈনিক কার্যের ধারা ছিল এইরূপ :—ভোর ৫টায় সঙ্গমে স্নান, ফিরিয়া রৌদ্রে বসিয়া পাঠাদি, দুপুরে আহার সারিয়া একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বিকালে বিভিন্ন ক্যাম্পে যাইয়া সাধু-দর্শন ও তাঁহাদের বাণী-শ্রবণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটি বিশিষ্ট ঠাকুর ঘর ছিল। সেখানে আপন আপন ইষ্টদেবের মূর্তি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইত। কোন স্থানে শিবলিঙ্গ, কোনও স্থানে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, কোনও স্থানে বালগোপালের মূর্তি, কোনও স্থানে রামসীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি, আবার কোথাও বা কেবল পটাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহাদের ভোগারতি, পূজা ও স্তবস্তুতি হইত। এক একদিন এক এক স্থানে গিয়া সন্ধ্যারতি ও পুষ্পাঞ্জলি দেখিতাম ও আনন্দে বিভোর হইতাম। আশ্চর্যের বিষয় এই, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। গীতা-মন্দিরে অষ্টপ্রহর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা চলিত। তথায় মণি-মুক্তা-রত্নাদি-খচিত, অলঙ্কার-মণ্ডিত, স্বর্ণ-নির্মিত নটরাজ শিবের অপূর্ব মূর্তি দেখিলাম। তাহার পার্শ্বে সমগ্র গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ, তিনখানি তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণফলকে মুদ্রিত রহিয়াছে। শুনিলাম, সীতাদেবী যে বল্কল পরিধান করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। উহা বিশ্বাসে স্পর্শ করিলাম ও মস্তকে ধারণ করিলাম। সারা শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

অপরদিকে প্রতিদিনই এক এক সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্ত সমষ্টি-ভোজন করাইতেন। কোনও দিন গীতামন্দিরে, কোনও দিন ভোলানন্দ গিরির শিবিরে, কোনও দিন মহামণ্ডলেশ্বরের, কোনও দিন কালীকম্‌লীওয়ালার, কোনও দিন বা হংসরাজের শিবিরে। দীর্ঘ একটি মাস এই সমষ্টি-ভোজন। দরোয়ান ভৃত্য সকলকে একত্রে লইয়া শঙ্করাচার্য এবং মহামণ্ডলেশ্বরের ন্যায় সাধুও ভোজন করিতেন। মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশতলে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চারি পাঁচ হাজার সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ ও ভোজন দেখিবার সৌভাগ্য জীবনে আর কখনও হইবে কিনা জানি না! যে দিকে দৃষ্টি যায়, অপূর্ব গেরুয়ার রং। সাধুদের মধ্যে খুব অল্পবয়স্ক সৌম্য বালক সন্ন্যাসীও দেখিলাম। ইঁহাদের যে ভোজনসামগ্রী দেওয়া হইত, তাহা গৃহে প্রস্তুত ও উপাদেয়। সকল খাদ্য একত্রে পরিবেশন করিবার পর এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে দক্ষিণা দিবার পর মহাত্মারা খাদ্য গ্রহণ করিতেন নীরবে। পরিবেশনের দক্ষতা ও আয়না দেখাইয়া কাক চিল তাড়াইবার নূতন পন্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে 'সকলেই ভক্তি সহকারে ইঁহাদের ভোজনের পর পরিত্যক্ত খাদ্যাদি (প্রসাদ) লইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিত এবং কণামাত্র পাইয়া ধন্য হইত।

চারিদিকে অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ। কোনও শিবিরে অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্তন, কোথাও গীতাপাঠ, কোনও শিবিরে রামনাম-গান, কোথাও বা ছোট ছোট বালক রামলক্ষ্মণের সাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রতিদিন রামায়ণ অভিনয় করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মন স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইত। মাইক্ এবং লাউডস্পীকারে এই সব প্রচারিত হইত।

আমাদের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রী-মাতাঠাকুরাণী (সারদামণি) ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। প্রত্যুষে, দ্বিপ্রহরে পূজা ও ভোগারতি হইত। সন্ধ্যায় আরতি, সমবেত স্তোত্রপাঠ, শ্যামাসঙ্গীত ও কথামৃত পাঠ হইত। এক এক দিন এক একজন ভক্ত ফুলের মালা ও ফলমিষ্টান্ন দিয়া পূজা দিতেন। আরতির পর প্রসাদ বিতরণ হইত। অসহ্য শীত। সন্ধ্যায় বাহিরে বসিতে পারা যাইত না।

কিন্তু মহারাজদিগের তত্ত্বাবধানে অনবরত গরম জল পাইতাম, সুতরাং কোনও কষ্ট হইত না।

দেখিতে দেখিতে কুম্ভযোগের দিন আসিয়া পড়িল। এলাহাবাদ শহরে তিল ধারণের স্থান রহিল না। কিছুদিন পূর্বেও বাঙালী যাত্রী দেখিতে না পাওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বাঙালী, গুজরাটী, ওড়িয়া, সিন্ধি, পাঞ্জাবী মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় ও সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী যাত্রীতে শহর পূর্ণ হইল। কে বলে সনাতন ধর্মের গ্লানি হইয়াছে? এই সকল যাত্রীর ধর্মপ্রাণতা, ব্যাকুলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

প্রত্যূষে সাধুদিগের মিছিল বাহির হইল সাড়ে পাঁচটায়। আকাশ নিবিড় কুয়াসাচ্ছন্ন। পাশের ব্যক্তিকেও দেখা যায় না। পুলিশ দুপাশে দর্শক যাত্রীদের বসাইয়া রাখিয়াছে, মিছিলের পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতেছে। এইরূপে অতি সতর্কতার সহিত শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যাত্রীদিগের সঙ্গমে যাইবার জন্য অন্য পথের ব্যবস্থা ছিল।

সেইদিনই ভোর ৬টা আন্দাজ একটা অসম্ভব কলকোলাহল ও সমবেত কাতর আর্তনাদ শুনিলাম দূর হইতে। ভাবিলাম, যেখানে তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোকের সমাবেশ, সেখানে এরূপ হইলে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু কী মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তখন একটুও অনুমান করিতে পারি নাই!

কাণপুর হইতে আগত (প্রয়াগেই আলাপ) একজন বর্ষীয়সী বান্ধবীর পুত্র তাহার মাতা ও আমাকে বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ স্নান করাইতে লইয়া গেল। সেদিন নৌকাভাড়া জনপিছু আড়াই টাকা। তথাপি স্নানে যাইতে কেহই বিমুখ নহে, কারণ যোগের স্নানে জন্মজন্মান্তরের পাপ-ক্ষয় নিশ্চিত, প্রত্যেকেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বেলা বারটা আন্দাজ আশ্রমে ফিরিয়া শুনিলাম, ওপারে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ন্যূনপক্ষে তিন হাজার যাত্রী ভিড়ের চাপে পদদলিত হইয়া মারা গিয়াছে! দেখিতে দেখিতে আমাদের সেবাশ্রমে অনেক আহত সাধু ও যাত্রী জিপে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা করা হইল।

এই দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে মুখে পরদিনই প্রচারিত হইল। নানাস্থান হইতে আগত যাত্রীদিগের আত্মীয়স্বজন আপন আপন প্রিয়জনের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কুম্ভযোগের এই দুর্ঘটনায় প্রত্যেকেই মর্মান্তিক ব্যথিত হইলেন। দিবারাত্র সকলের মুখে এই একই কথা, একই আলোচনা। যাঁহারা চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার কি আছে? কিন্তু তাঁহাদের পরিত্যক্ত আত্মীয়-স্বজনের শোকদগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গেল। দূর দূরান্তর হইতে কত আশা, কত সংকল্প লইয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন, আজ সব শেষ! সঙ্গীহীন হইয়া হয়তো কত জনকে গৃহে ফিরিতে হইল! বিধাতার বিধান কে খণ্ডাইতে পারে?

কুম্ভযোগের পর, বসন্তপঞ্চমীর স্নানও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। মিছিলও বাহির হইল, কিন্তু পূর্বের সে উৎসাহ, সে আগ্রহ আর দেখা গেল না, সকলেই বিষণ্ণ ও নিরানন্দ। সকলের মুখেই শোকের ছায়া!

মেলায় দোকানপাটের অভাব ছিল না। নানা-স্থান হইতে নানা দ্রব্যাদি—মহামূল্য শাল, কম্বল, বেণারসী সিল্কের কাপড়, খেলনা, তৈজসপত্র, চিত্র, প্রসাধন সামগ্রী, মেওয়া, দুধ দই মিষ্টান্নের সারবন্দী দোকানের সব সুবন্দোবস্তই ছিল। ছিল না মুড়ি চিঁড়া খইয়ের দোকান!

আমাদের সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বেশ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইল। হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, কালীকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা

ও একদিন বিভিন্ন সাধুদের সমষ্টি-ভোজন বেশ সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বসন্তপঞ্চমীর স্নানের পরেই মেলায় ভাঙন ধরিল। সাধুরা একে একে আপন আপন শিবির তুলিয়া চলিয়া যাইতে শুরু করিলেন। ঝুসীতে কয়েকদিন পূর্বেও তিলধারণের স্থান ছিল না। সেইসব স্থান এখন ফাঁকা হইয়া গেল। একটা বিরাট শূন্যতা! এইবার বিদায়ের পালা। দীর্ঘ একটি মাস যেস্থানে পরমানন্দে কাটাইয়াছি, সেস্থান ও তথাকার সঙ্গীদের ত্যাগ করিতে হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পরস্পরের ঠিকানা লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদায় লইতে লাগিলাম।

আমাদের শিবির ভাঙিয়া দিবার পূর্ব দিনে একটি হোম হইল। শান্তিজল দেওয়া হইল, শেষ প্রসাদ বিতরণ করা হইল, এবং মঙ্গলকামনা ও আশীর্বাদ-স্বরূপ হোমের বিভূতি সকলের কপালে আঁকিয়া দেওয়া হইল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, ঠাকুরঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে শূন্যতা, একটা হাহাকার। মনে হইল ঝুসী যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, একটি মাস আমার বুকে যে উৎসব করিলে—তাহা সত্যই কি মায়ার খেলা? না, আনন্দের মেলা!

রুগ্ন শরীর, অশান্ত মন লইয়া, অসহায় অবস্থায় মেলায় গিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিলাম সুস্থ, শান্ত, সবল, অক্ষত শরীরমন লইয়া। করুণাময়ের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণে লুটাইলাম।

চক্ষে জল আসিল যমুনার নীলজলের নৃত্যশীল অশান্ত বীচিমালা ছাড়িয়া আসিতে। কি অপরূপ মনোমুগ্ধকারিণী এই যমুনা!

এই দীর্ঘ একটি মাসে যাহা যাহা দেখিলাম, যাহা যাহা সংগ্রহ করিলাম—সবই মনের ভাণ্ডারে গচ্ছিত রহিল। এই পরিপূর্ণ নির্মল আনন্দই আমার শেষ জীবনের সম্বল। সংসারের তাপে যখন আবার ক্লিষ্ট হইব, এই দিনগুলির স্মৃতিই আবার নব বল ও নব উদ্যম আনিয়া দিবে। এ সুদিন জীবনে আর আসিবে কি না জানি না! জানেন অন্তর্যামী। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

জপ ও অজপা জপ

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

জপের স্বরূপ ও পরিণতি

জপ বলিতে প্রণব, বীজাক্ষর মন্ত্র, তারকব্রহ্ম নাম বা যে কোন দেবদেবীর নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা গণনাই আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। এই জপ হিন্দু, জৈন, পার্শী, বৌদ্ধ, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান এবং মুসলমান—প্রায় সব ধর্মাবলম্বীদের ভিতরই প্রচলিত। রোমান ক্যাথলিক গির্জার অনুবর্তিগণ 'এভী মেরীয়া' (Ave Maria—A Prayer to the Virgin Mary as Mother of God) এবং 'পিতর্নস্টার' (Paternoster—A Prayer to the Lord Father of all) যথাক্রমে ছোট দশ সংখ্যক মালায় ও পরবর্তী বড় একাদশতম মালায় জপ করিয়া থাকেন।

একটি প্রচলিত শাস্ত্রবাক্য—'জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।—জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।" হরিভক্তিবিলাস ধৃত পদ্মনাভীয় বচনে দেখা যায়—

'কোটি জপ্তেন মন্ত্রেণ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥'

মুক্তি এবং ইষ্টদর্শন একনিষ্ঠ কোটি জপেতেই

লাভ হয়। উপাসনার উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে জপ একটি যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে জপ-যজ্ঞের মহিমা বর্ণনা আছে—

'পাকযজ্ঞাশ্চ চত্বারো বিধিযজ্ঞে-সমন্বিতাঃ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥'

এবং পদ্মনাভীয় বচনেও তুল্য বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

'যাবন্ত কর্মযজ্ঞাশ্চ প্রদীপ্তানি তপাংসি চ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্

চরু-পাকাদি যত প্রকার প্রসিদ্ধ যজ্ঞ উপাসনা-রাজ্যে বিদ্যমান, তাহাদের কোনটিই জপযজ্ঞের এক ষোড়-শাংশ ফলদানেও সমর্থ নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশমাধ্যায়ে অর্জুনকে উপদেশছলে ইহার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া বলিয়াছেন—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।' যত প্রকার যজ্ঞ আছে তাহার ভিতর শ্রীভগবান নিজে হইতেছেন জপযজ্ঞ।

বিভিন্ন প্রকারের জপ

জপ সাধারণতঃ তিন প্রকার, যথা—মানস, উপাংশু ও বাচিক। (১) জিহ্বা পর্যন্ত স্পন্দিত না করিয়া কেবল মনে মনে জপ করাকে মানস জপ বলা হয়। (২) ঈষৎ রসনা-স্পন্দন সহ কেবল শ্রুতি-গোচর হয়—এমন জপের নাম উপাংশু জপ। (৩) সুস্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক নিজের ও অপরের শ্রুতিগোচর হয়, এমন জপের নাম বাচিক জপ; কীর্তন, স্তোত্রপাঠাদিও ইহার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত এক এক সংখ্যা জপের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সহ যে জপ করা হয়, তাহাকে মানস জপের অন্তর্গত (১ক) প্রণাম জপ বলা হয়। তণ্ডুলের দ্বারা সংখ্যা রাখিতে রাখিতে জপ করিয়া সেই জপ-সংখ্যা তণ্ডুল-সমষ্টির অন্নমাত্র দিবারাত্রির ভিতর একবার ভোজনক্রমে আজীবন বা নির্দিষ্ট কালের জন্য জপনিষ্ঠ সাধক-সাধিকার উদাহরণও ভক্তিরাজ্যে আছে, এইরূপ জপকেও মানসজপের অন্তর্গত (১খ) সংখ্যান্ন জপ বলা যায়। এই সংখ্যান্ন জপের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

সকল জপেই জাপককে নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া জপিতে হয়। এই নিমিত্ত করমালা স্ফটিক, শঙ্খ, মহাশঙ্খ, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, তুলসী, গুঞ্জা প্রভৃতির গ্রথিত মালায় সংখ্যা-রক্ষা-ক্রমে জপের ব্যবস্থা আছে। বাহ্য গ্রথিত মালায় জপ করিবার সময় মধ্যশীর্ষ মালা লঙ্ঘন করিতে নাই। উহা লঙ্ঘন করিলে মেরুলঙ্ঘনজনিত অপরাধ হয়। করাঙ্গুলির বৈদিক, শৈব বা দেবমন্ত্রজপে মধ্যমার মধ্য ও নিম্ন পর্বকে এবং তান্ত্রিক, শক্তি বা দেবী মন্ত্রজপে তর্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্বকে মেরুস্থানে লঙ্ঘন করিতে নাই। অনামিকার মধ পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জনীর নিম্নপর্বে দশবার জপ শেষ করিতে হয়। দশ সংখ্যার কম জপ কোন ফলদায়ক বলিয়া গণ্য হয় না। জপ অষ্টাদশ সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ অষ্টবিংশ, অষ্টোত্তর শত, অষ্টোত্তর সহস্র বা তদূর্ধ্ব সাধ্যমত কর্তব্য। এইভাবে শ্রীশ্রীগুরুদত্ত বীজমন্ত্র বা ভগবন্নাম দৃঢ় একাগ্রতা সহকারে জপের ফলে জাপকের দেহটি সম্পূর্ণরূপে জপময় হইয়া ইষ্টের সহিত অভেদাত্ম হয়।

অজপার স্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠা

জপযজ্ঞনিষ্ঠ মানব ঐকান্তিকী নিষ্ঠার ফলে যখন জপময় অবস্থা বা পূর্ণ তন্ময়তা লাভ করে, তখন অজ্ঞাত বা অচিন্ত্য রূপে দেহ-যন্ত্রের ভিতর আপনা আপনি জপকার্য চলিতে থাকে। কোনরূপ যত্ন-নিরপেক্ষ এই ফল্গুনদীপ্রবাহবৎ আভ্যন্তরিক জপকে একতম মহান্ অজপা জপ বলা হয়। চেষ্টাশূন্য জপই অজপ। ন+জপ=অজপ, স্ত্রী লিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় যোগে অজপা অর্থাৎ চেষ্টা ব্যতিরেকে জপনীয়া। বৈষ্ণব শাস্ত্র বর্ণনা করেন—

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥'—

ভগবন্নাম এবং বিগ্রহ অতলগর্ভ চিন্তামণি এবং চিন্ময় রসখনি বলিয়া জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তবে পুনঃ পুনঃ নামকীর্তন, পুনঃ পুনঃ বিগ্রহ-দর্শনের ফলে অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে রসনাতেও আপনি বাজিয়া উঠে এবং নয়নেও আপনি ভাসিয়া উঠে। পূর্বেকার প্রগাঢ় জপ বা সাধন অভ্যাসের ফলেই এই অজপা স্ফূর্তি ঘটে !

ইষ্টের সহিত একাত্মবোধ বা চরম মিলনানুভূতি-রূপ অজপা-স্রোত যার দেহযন্ত্রে অবিরাম প্রবাহিত হয়, যদি অকস্মাৎ এর বিরাম ঘটে, তবে অজপা-স্পন্দন-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-স্পন্দন স্থগিত হইয়া তার প্রাণ-পাখী দেহ-খাঁচা ভাঙিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত অজপা ফুরাইয়া যাওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। ভক্ত কবি মদনমোহন তাঁর অমর সঙ্গীতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায় ?
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়।'

তীর্থে দেহত্যাগ শ্রেয়স্কামী মানব মাত্রেরই কাম্য, তবে ইষ্টস্মৃতি এবং ইষ্টনাম-জপকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলেবর-ত্যাগ তদপেক্ষাও শ্রেয়স্কর।

অজপা-নিবৃত্তি বা ইষ্ট-মিলনানুভূতির অভাবকে বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেহত্যাগের দশায় পর্যবসিত করা হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অমর পদাবলীতে বর্ণনা করিয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম,　　　যেন জাম্বুনদ হেম,
এ প্রেম নৃলোকে নাহি হয়।
যদি হয় তার যোগ,　　　না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে না জীয়য় ॥'

চেষ্টা নিরপেক্ষ স্বাভাবিক অজপা

অন্যতম অজপা জপ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়াসাধ্য। তন্ত্রশাস্ত্র ঘোষণা করেন,—

'উচ্ছ্বাসৈরেব নিঃশ্বাসৈর্হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাখ্য আত্মাকরেণ সংস্থিতঃ॥'

হং—সঃ এই দুইটি অক্ষর বীজমন্ত্র পূরক·রেচকে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দিবানিশি জপিত হওয়ায় হংসাখ্য প্রাণবায়ু আত্মারূপে দেহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইটি জীবের জীবিতাবস্থা। মাতৃসাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ তাঁহার অমর সঙ্গীতে অক্ষয় বর্ণনা দিয়াছেন,—

'হং বর্ণ পূরকে হয়,　　　সঃ বর্ণ রেচকে কয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে।
অজপা হইলে সাঙ্গ,　　　কোথা রবে তব রঙ্গ,
সকলি হইল ভঙ্গ ভবানীরে না ভাবিয়ে ॥'

তন্ত্রশাস্ত্রীয় দক্ষিণা-মূর্তি সংহিতায় শিববাক্য আছে,—

'একবিংশতিসহস্রং ষট্শতাধিকমীশ্বরি !
জপ্যতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্।
বিনা জপেন দেবেশি ! জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তিনী।'

তন্ত্রে মহাদেবীকে অজপা নাম দেওয়া হইয়াছে। রূপে তিনি অর্ধনারীশ্বর, ভবপাশনিকৃন্তিনী সান্দ্রানন্দময়ী পমেশ্বরীকে প্রাণিগণ প্রত্যহ ২১৬০০ একুশ হাজার ছয় শত বার বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে জপিয়া থাকে। প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞানমতে এই অজ্ঞাত অজপা জপ দিবা-নিশিতে প্রতি দেহযন্ত্রে ৩৮৮৮০ আটত্রিশ হাজার আট শত আশি বার হয় বলিয়া নির্ধারিত।

এই অজপা জপ যাঁহার ভিতর চৈতন্যলাভ করে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধমনী সব ভাবময়, ইষ্টময়, এক অপার্থিব সত্তায় পরিণত হয়। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন ঈশ্বর-লাভ, তেমনই ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল জীবের ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, কুল, শীল, জাতি, গর্ব ইত্যাদি অষ্টপাশ ঘুচিয়া এই দিব্যভাবপ্রাপ্তি ঘটে। তখন সাধক, মন্ত্র ও ইষ্ট সব এক হইয়া যায়। এই অবস্থা যখন দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘটিয়াছিল, তখন তিনি যে যে অঙ্গে যে যে মন্ত্র জপ করিতেন, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে

প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহা পূর্ণ চিন্ময়ত্ব বা ইষ্টময়ত্ব। জপ করিতে করিতে তিনি দেখিতে স্পষ্ট পাইতেন, সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথে সহস্রারে উঠিয়া জীবশিব পরমশিবপদে লীন হইতেছে। এ দর্শন শুধু কথার কথা নয়, এ বহু জন্মের তপস্যার এবং অসীম ভাগবতীকৃপার ফল!

অজপা-নিবৃত্তি বা দেহান্তদশা-প্রাপ্তি

জপ ও অজপা জপের কতক পরিচয় এইভাবে বিভিন্ন আলোচনায় লাভ করা গেল। অজ্ঞাত ও অচেতন ভাবে এই অজপা জপ প্রতিনিয়ত সকলেরই হইতেছে; উহাকে জ্ঞানগম্য এবং সচেতন অনুভূতিতে আনিতে পারিলে অর্থাৎ হাতেকলমে সাধিতে পারিলে মানবজমি আবাদ হইয়া সত্যসত্যই যে সোনা ফলে এবং জন্ম ও জীবন সার্থক হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অজপা ফুরাইয়া গেলে দেহান্তদশাপ্রাপ্তির কথা রামপ্রসাদ-প্রমুখ বহু কবি বহু ভাবে সুপরিব্যক্ত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ নিজ অন্তিমকালে গভীর খেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

'বাল্যকালে কত খেলা
মিছে খেলায় দিন গোয়াল,
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায়
অজপা ফুরায়ে গেল।'

অন্য কবিদের বর্ণনায় আছে,—

'অজপা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়
তীক্ষ্ণ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে!'

* * *

'সহজ অজপাগতি, যদিগো লভে বিরতি,
অষ্ট পাশাবদ্ধ জীব পায় যে মহামুকতি।'

মহাশক্তিময়ী জগদম্বার স্নেহাশ্রিত আমরা ক্ষণে ক্ষণে জীবনবায়ু নিঃশেষিত হইতে হইতে যে দিন অজপা সাঙ্গ হইবার হউক, তাহাতে কোনই ভয় ভাবনা নাই; কিন্তু মায়ের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণমনন হইতে যেন কিছুতেই কোন অবস্থায় বিচ্যুত না হই,—এই ঐকান্তিকী প্রার্থনা জগজ্জননীর শ্রীচরণারবিন্দে।

আবিষ্কার

অনিরুদ্ধ

বন্ধন যদি ভার লাগে, শোন্
বন্ধন কিছু নাই
তুই তো নিজেই বাঁধিস্ নিজেরে
বন্ধন শুধু তা-ই।

মুক্তি কোথায় ভেবে ভেবে যদি
নাহি মেলে কোন কূল
জেনে রাখ্ তবে আপনারি মাঝে
রয়েছে মুক্তি-মূল।

সুন্দর লাগি যদিরে ব্যাকুল
আঁখি দুটি তোর ছোটে
চিরসুন্দর যিনি দেখ্ তাঁরি
বিভা সব খানে ফোটে।

যদি তোরে কেহ নাহি বাসে ভাল
প্রাণ কাঁদি হয় সারা—
অখিল প্রেমের দেবতা হৃদয়ে
খুঁজিয়া নিজেরে হারা।

আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র*

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

মানুষের দেবত্ব, মনুষ্যজাতির সেবা—এই হচ্ছে বর্তমান যুগের সর্বোচ্চ আদর্শ। প্রাচীন যুগের লোকেরা দেবসত্তাকে একটি পৃথক্ বস্তু বলে দেখতেন এবং সেই বস্তুকে তাঁরা মেঘের ওপর কোন এক স্বর্গ রাজ্যে স্থাপন করতেন, তথা ঐ দেবসত্তায় আরোপ করতেন অসংখ্য কাল্পনিক গুণ। তাঁদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মানুষ একটি কাল্পনিক রাজ্যে যাবে, যার নাম স্বর্গ; আর ধর্মব্যাখ্যাতাদের কোন কিছু দান করলে ঐ স্বর্গে তা জমা থাকবে ও মৃত্যুর পর দাতা সেখানে গিয়ে তা ভোগ করবে। পুরোহিতগণ যেন ছিলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থ বাহন। কেউ যদি এই পুরোহিতদের বিরাগভাজন হয়, তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল আর একটি জায়গা—নরক। স্বর্গ বা নরকে পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল সকল পুরোহিতের হাতে। অনেক ধর্মপুস্তকে আমরা যে নরকের বর্ণনা দেখতে পাই, তা এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্থান। অজ্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে পুরোহিতগণ স্বর্গ ও নরকের আশা বা ভয় দেখিয়ে বহু অর্থ আদায় করতেন। দেবতা ও মানুষ এদুটি তখন ছিল পৃথক্ বস্তু।

মানুষের এখন দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। দেবত্বকে এখন পেতে হবে মানুষের মধ্যে। স্বর্গের দিব্যত্ব মানুষের পবিত্রতারই প্রতিবিম্ব। মানুষের অন্তনিহিত দেবসত্তার একটি অংশবিশেষ হল স্বর্গের দেবত্ব। এই কারণেই এখনকার কেন্দ্র হয়েছে মানুষ এবং কাল্পনিক স্বর্গস্থ দেবতা হয়েছে তার কক্ষ বা পরিধি। মানুষের সেবা তাই দেবতার সেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং মানব-কেন্দ্রিক ভাবই ফুটে উঠছে। দেব-কেন্দ্রিক থেকে মানব-কেন্দ্রিক নয়, বরং মানবকেন্দ্রিক ভাব থেকেই দেবসত্তার বিকাশ হচ্ছে। সেই জন্য আধুনিক যুগে ধর্মব্যবসায়িগণের এবং তাঁদের পুঁথিপত্রেরও বেশী মূল্য নেই।

সেমিটিকগণ মানুষের 'আদিম পাপে'র (Original sin) যে মতবাদ পোষণ করেন, তা অতি ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রগতির পক্ষে এই মতবাদ হচ্ছে এক বিপুল আঘাতস্বরূপ। সর্বতোভাবে এই 'আদিম পাপে'র ধারণা পরিত্যাগ করা উচিত। দেব-কেন্দ্রিক ও মানব-কেন্দ্রিক ভাবের বৈপরীত্য তো এইভাবেই আসে। মানুষকে জন্মপাপী বলে প্রচার না করে, তার অন্তর্নিহিত দেবসত্তার কথা প্রচার করা উচিত। মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

মতবাদ-নিষ্ঠ ধর্মানুশাসনের আর একটি দিক এই যে, ইহা মানুষকে শেখায় বশ্যতা, নিরানন্দভাব আর নিজেকে দুর্বল মনে করা। মানুষের যেন কোন শক্তি নেই! পুরোহিতদের আজ্ঞাধীনে রেখে মনুষ্যজাতিকে একদল মূঢ় ক্রীতদাসে পরিণত করাই যেন ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। অদৃশ্য দেবতাদের কাছ থেকে পুরোহিতগণ যেন পেয়েছিলেন রাজার অধিকার। কোন রকম স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাবকে বরদাস্ত করা হত না। মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে পাপ বলে গণ্য করা হত। ঐরূপ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল নরকের ব্যবস্থা।

রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের জীবনযাত্রা থেকে এই মতবাদ এসেছে। পুরোহিতগণ পৃথিবীর রাজাদের নকল করে এই একাধিপত্য-ভাবটি স্বর্গে চালান দিয়েছেন। স্বর্গের অধীশ্বর প্রকৃতপক্ষে

* লেখকের মূল ইংরেজী-রচনা হইতে শ্রীলালবিহারী ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

পার্থিব নরপতিরই প্রতিরূপ বা প্রতিনিধিমাত্র। পক্ষান্তরে আমরা যদি আত্মার স্বরূপ ও মানুষের প্রকৃত সত্তার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, দৃঢ়তা ও আত্মবিকাশই হচ্ছে দেবত্বের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন। ইহা অহমিকা বা দম্ভ নয়, কিন্তু আত্মবিশ্বাস—আত্মসত্যের অভিব্যক্তি। অহমিকায় ভ্রান্তি ও দুই ব্যক্তিতে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, এবং সেই জন্য পরস্পরের যোগ বা মিলনে বাধা ঘটাও স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে 'আত্মাভিব্যক্তি' সেখানে সকলেই এক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই আত্মাভিব্যক্তিই সমাজের একপ্রাণতার নিদান। মানুষের দেবত্বকে অতএব তারস্বরে ঘোষণা করা উচিত। স্বর্গের দেবতার ধারণা মানব-দেবতা থেকেই আসছে। মানব-কেন্দ্রিক ভাবের দিকে জোর দিয়ে ধর্মের দেব-কেন্দ্রিকতার দিকটি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করা উচিত।

পুরোহিত এবং ধর্মব্যবসায়িগণ আধুনিক কালে বাস করলেও তাঁরা যেন প্রাচীনকালের বৃদ্ধ-শিশু-বিশেষ। তাঁরা আধুনিককালের উন্নতির কথা বুঝতে এবং ভাবতে পারেন না, স্বীকারও করেন না। তাঁরা পাচ হাজার বৎসর অতীত কালের সামাজিক অবস্থার কথা বলে থাকেন। এই সব পুরোহিতকুল সমাজের ক্ষতি করছে, কিন্তু সমাজ তাদের ছাড়তেও পারছে না! মানুষের চিন্তাজগৎ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পারলৌকিকবাদকে অতএব কালোপযোগী অদলবদল করে নিতে হবে।

কামন্দকের 'নীতিসারে' বিগ্রহ ও কূটযুদ্ধ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্., সাহিত্যরত্ন

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিদ্যার যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নীতির উপযুক্ত প্রয়োগদ্বারা দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য অত্যুত্তম রাষ্ট্রনীতি অবলম্বিত হইত। 'শুক্রনীতিসার', কামন্দকের 'নীতিসার' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'—এই তিনখানা প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিগ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও অতিশয় উপযোগী। শুক্র ও কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্রে রাজনীতি ব্যতীতও অন্যান্য অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু কামন্দকের 'নীতিসারের' বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল রাজনীতির কথাই আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে দণ্ড, আত্মরক্ষা, সন্ধি, বিগ্রহ, যান-বাহন, মন্ত্রণা, দূত-চর, যুদ্ধযাত্রা, শিবির-সন্নিবেশ, সৈন্য, সেনাপতি, কূটযুদ্ধ, ব্যূহরচনা, রাজকোষ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অতিশয় নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থ হইতে বিগ্রহ ও কূটযুদ্ধ নামক দুইটি বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

কামন্দক বিগ্রহের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পরস্পর অপকার করিলে তাহা হইতে যে ক্রোধ ও দুঃখ জন্মায়, ইহাই মনুষ্যগণের মধ্যে বিগ্রহ বা যুদ্ধের প্রধান কারণ। রাজা নিজের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষায় অথবা শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া দেশ, কাল ও নিজের সৈন্যবলাদি বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ আরম্ভ করিবেন। শত্রুর রাজ্যের প্রজাগণ তাহাদের নিজেদের রাজার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছে—এরূপ রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির সুযোগ-গ্রহণই দেশের কথা বিবেচনা করা। আর মন্ত্রী প্রভৃতি কর্মচারিগণ বিরূপ হওয়ায় শত্রু যখন

অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়ে সেই সুযোগ-গ্রহণই কালের কথা বিবেচনা করা। শত্রুকর্তৃক রাজ্য, স্ত্রী, দুর্গ, যান, ধন, সৈন্য, মান প্রভৃতির নাশ, প্রজাগণের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা, একটি বিষয়লাভের জন্য উভয়ের আকাঙ্ক্ষা—এগুলিই সাধারণতঃ বিগ্রহের কারণ।

রাজ্য, স্ত্রী, ও দুর্গের নাশহেতু যে বিগ্রহ সংঘটিত হয়, উহা দান অর্থাৎ কোষ, অশ্বাদি বা ভূমি-প্রদান দ্বারা, কিংবা দম অর্থাৎ গুপ্ত দণ্ড দ্বারা প্রশমিত করিবে—ইহা রাজনীতিজ্ঞদের মত। অপমান হইতে যে যুদ্ধ হয়, সম্মান প্রদান করিয়া উহার উপশম করিবে। শত্রুকর্তৃক ধনের অপচয় ঘটিলে যুদ্ধ করা উচিত নয়, কারণ যুদ্ধ লোকক্ষয়কর ও অশেষরূপে অনিষ্টজনক। উভয়ের একই বস্তুলাভের জন্য যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ যুদ্ধপরিহারের নিমিত্ত ঐ বস্তুলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে।

কোন্ কোন্ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না তৎসম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন: যে যুদ্ধ অল্প ফল দান করে, যে যুদ্ধে কোন ফল হয় না, যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে দোষজনক ও পরিণামে নিষ্ফল, যে যুদ্ধ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অনিষ্টকর, যে যুদ্ধ অপরিজ্ঞাত প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুর সহিত, যে যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী, যে যুদ্ধে শত্রু বলবান মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে ফলোপধায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে ফলশূন্য, যে যুদ্ধ ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ কিন্তু বর্তমানে নিষ্ফল—এই-সকল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে।

যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সময়-নির্ধারণ সম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন: বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন নিজ সৈন্যসামন্তগণকে উৎসাহযুক্ত ও বলবান আর শত্রুসৈন্যদিগকে ইহার বিপরীত দেখিবে, তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। যখন নিজের জনমণ্ডলীকে অতিশয় বলশালী ও অনুরক্ত, আর শত্রুকে ইহার বিপরীতভাবাপন্ন দেখিবে, তখন বিগ্রহ করিবে। ভূমি, মিত্র ও হিরণ্য—এই তিনটি বিগ্রহের ফল। যখন এই তিনটি অবশ্যই পাইবার নিশ্চয়তা থাকে, তখন বিগ্রহ করিবে। প্রথমতঃ অর্থই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মিত্র, তদপেক্ষা ভূমি।

প্রবল শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও যে পরিণামে জয়লাভ করিতে কৃতসংকল্প, সে বেতসবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ বেতকে যেমনি ইচ্ছামত ঘোরান-ফেরান-বাঁকান যায়, তেমনি প্রবল শত্রুর মতানুবর্তী হইয়া চলিবে; কিন্তু ভুজঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিবে না অর্থাৎ সাপের ন্যায় তাড়া করিয়া কামড়াইতে যাইবে না। বেতসবৃত্তি-অবলম্বনকারী কালক্রমে অতুল শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়, আর ভুজঙ্গবৃত্তি-অবলম্বনকারী কেবল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বেতসবৃত্তি-অবলম্বনকারী রাজনীতিজ্ঞ সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিবে এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই দুর্বার শত্রুকে সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া গ্রাস করিবে। বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ অকালে কূর্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পীড়নও সহ্য করিবে কিন্তু সময় পাইলেই ক্রুর সর্পের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং পাষাণে আছড়াইলে ঘট যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, শত্রুকেও সেরূপ বিনাশ করিবে। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে শত্রুর সহিত ব্যবহার করিবে। রাজা স্বয়ং মন্ত্র, প্রভাব ও উৎসাহ—এই ত্রিশক্তিতে শক্তিমান হইয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য অভিযান করিবেন। যিনি ইহার অন্যথা করেন, তিনি অত্মঘাতী। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে শত্রুকে দমন না করিলে নিজেকেই নিজের বিনাশের কারণ হইতে হয়।

কূটযুদ্ধের প্রণালী-সম্বন্ধেও কামন্দক তাঁহার নীতিসার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। দেশ ও কাল অনুকূল হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি ভেদ করিতে পারিলে রাজা প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু দেশ ও কাল প্রতিকূল হইলে এবং শত্রুর

প্রকৃতি ভেদ করিতে না পারিলে রাজা কূটযুদ্ধ করিবেন। গিরিকন্দরাদি পথে 'অভূমিষ্ঠ' অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়, অতএব অসাবধান শত্রুসৈন্যকে বধ করিবে। আর 'ভূমিষ্ঠ' অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে উপজাপ করিয়া বধ করিবে। সম্মুখে একদল সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং আর একদল বলবান বেগগামী বীরসৈন্য দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে শত্রুসৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া দুই দিক হইতে বিধ্বস্ত করিবে, অথবা পশ্চাৎদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, শেষে সম্মুখ হইতে শক্তিশালী সৈন্যদ্বারা আক্রমণপূর্বক বিব্রত করিয়া বধ করিবে। ইহাও দুই দিক হইতে আক্রমণ। সম্মুখদেশ বিষম হইলে পশ্চাৎ হইতে বেগবান হইয়া বধ করিবে। আর পশ্চাৎদিক বিষম প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে। এরূপে পার্শ্বের বিষয়ও বুঝিতে হইবে। অসার সৈন্যের মধ্যে সারবান সৈন্যবল লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে অসার সৈন্যের বিনাশে শত্রুসৈন্য শিথিলপ্রযত্ন হইলে তখন ঐ শত্রুসৈন্যকে সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা নিহত করিবে। আক্রমণের ভয়ে রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত, দিবাপ্রসুপ্ত, নিদ্রাতুর শত্রুসৈন্যকে বিনাশ করিবে। রাত্রিতে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত শত্রুসৈন্যকে হত্যা করিবে। সূর্যাভিমুখী হওয়ায় অথবা প্রচণ্ড বাতাসে পড়ায় ভালরূপে দেখিতে পারিতেছে না, এরূপ অবস্থায় পতিত প্রবল শত্রুসৈন্যকে বিনাশ করিবে। এরূপ কূটযুদ্ধে লঘুহস্ত হইয়া শত্রুদিগকে বধ করিবে। কুয়াসা, অন্ধকার, কাল পরিচ্ছদ, গর্ত, অগ্নি, বন, নদী—এইসকলের ছদ্মে বা ছলে কূটযুদ্ধ করিয়া শত্রুবধ করিবে। ছলপূর্বক শত্রুবধে অধর্ম হয় না। দেখা যায়, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে শাণিত খড়্গদ্বারা রাত্রিকালে বধ করিয়াছিল। চরদ্বারা শত্রুদিগের প্রচার অবগত হইয়া রাজা অতিশয় সতর্কতা ও উৎসাহের সহিত যে উপায়ে শত্রুবধ করেন, শত্রুদিগের নিকট হইতেও রাজা সতর্কতার সহিত তদ্রূপ স্বপক্ষের নিধনের আশঙ্কা করিবেন।

কামন্দক পণ্ডিত তাঁহার নীতিসার গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনীতিতে অনগ্রসর ছিল, তাঁহারা কামন্দকের নীতিসার, শুক্রনীতিসার ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারেন। ভারতবর্ষ যে এককালে রাজনীতিতেও প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এই তিনখানি নীতিশাস্ত্রপাঠেই অবগত হওয়া যায়।

স্মরণে

(বদরিকাধামের যোশী মঠের ভূতপূর্ব শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত চরিতকথা ও কয়েকটি উপদেশ)

[উ]পেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌

প্রায় চুয়াত্তর বৎসর আগেকার কথা। অযোধ্যার "গানা" গ্রাম নিবাসী অষ্টম বর্ষীয় এক ব্রাহ্মণকুমার এলো ৺কাশীধামে বিদ্যালাভের জন্য। এক বছর পার হতে না হতেই এলো তার বিয়ের ডাক। তাই ছিল তখনকার প্রথা। বাড়ী থেকে এক আত্মীয় এলো শিশুটিকে নিয়ে যাবার জন্য। আজন্ম উদাসীন শিশুর মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী। আত্মীয়কে ফাঁকি দিয়ে অজানা পথের সন্ধানে গঙ্গার তীর ধরে

কিশোর চলতে লাগল হিমালয়ের উদ্দেশে। তিন দিন গেল, তিন রাত্রিও গেল, স্নান করলো গঙ্গাজলে, পান করলো গঙ্গাজল, বিশ্রাম করলো গঙ্গাতীরে বৃক্ষছায়ায়। বিশ্বম্ভরের উপর অখণ্ড বিশ্বাস, হাত পাতলো না সে কারো কাছে। তিন দিন, তিন রাত্রি পথ চলার পর এক জমিদারের দৃষ্টি পড়ল ঐ সৌম্য বালকের উপর। বৃক্ষতলে বসে তিনি ডাকলেন বালককে। বালক ফিরে তাকালো বটে, কিন্তু এলো না। খানিক পরে জমিদারই এলেন তার কাছে, আহ্বান করলেন তাকে তাঁর বাড়ীতে। কিছুতেই সে হলো না রাজী। অগত্যা জমিদার এক ঘটি দুধ আনিয়ে দিলেন। গঙ্গামাকে ⅓ অংশ নিবেদন করে বাকীটুকু খেয়ে নিয়ে বালক আবার চললো অজানার সন্ধানে। একদিনের জন্যও নাকি তাপসকে থাকতে হয়নি উপবাসে। অযাচিতভাবে পেয়েছেন ফল-মূল খাদ্য।

তারপর সুরু হল হিমালয়ের উত্তর খণ্ডে গুরু-অন্বেষণ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটল উত্তর খণ্ডের পাহাড়ে পর্বতে। দীক্ষা নিলেন শেষে দণ্ডী স্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে।

সুদীর্ঘ বার বৎসর শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যার পর মিললো পরম বস্তুর সন্ধান। সিদ্ধ হল মনস্কাম। তাঁর গুরুদত্ত নাম হল ব্রহ্মানন্দ। তারপর গভীর তপস্যা সুরু হল মধ্যভারতের অমরকণ্টকে। পরে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল চিত্রকূট ও বিন্ধ্য পর্বতের গভীর অরণ্যে। গুরুর আদেশে চাতুর্মাস্যের জন্য আসতেন লোকালয়ে। ভারত ধর্ম-মহামণ্ডল হিমালয়ের জ্যোতির্মঠের পুনরুদ্ধারের জন্য পাহাড় থেকে খুঁজে বার করলেন এ মহাযোগীকে। যে জ্যোতির্মঠ ১৬৫ বৎসর আচার্য-বিহীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল, সেই জ্যোতিষ্পীঠ উদ্ধারের ভার পড়ল এ মহাপুরুষের উপর। শত শত মুমুক্ষু সন্ন্যাসী ও তাপদগ্ধ নরনারী এসে আশ্রয় নিলেন মহাযোগীর পদমূলে। গড়ে উঠল শঙ্করের আদর্শে ধর্মপীঠ—বেজে উঠল চারিদিকে ধর্মের জয় ডঙ্কা।

২১শে মে ১৯৫৩ খ্রীঃ বেলা ১।১৫ মিঃ এ, এই মহাযোগী কলিকাতায় যোগাসনে বসে লাভ করেছেন মহাসমাধি। ২০শে মে তারিখেও দিয়েছেন দর্শন ও দীক্ষা। ২১শে তারিখেও বেলা ১২½টা পর্যন্ত দিয়েছেন দর্শন। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি এই শেষ দর্শন।

নিম্নে আচার্যদেবের কয়েকটি উপদেশ হিন্দী থেকে অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ হল :—

উপদেশ

মানুষের অসাধ্য নেই কোন কাজ। ভারতের ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাস্তিক ও দুর্বলের দলে মিশে মানুষ ভুলে গেছে আপনস্বরূপ—তাই আপনাকে ভাবছে দুঃখী, দরিদ্র, অনাথ। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী আছে?

আগুনের রয়েচে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি—যা কিছু সামনে পড়ে, সমস্তই পারে আগুন ভস্মে পরিণত করতে। কিন্তু এ হেন আগুনের চারদিকে যদি থাকে শৈত্যের আবরণ, তবে দাহিকা শক্তি হয়ে যায় ম্লান—পারে না একটি তৃণকেও সে ভস্ম করতে। মানুষের মধ্যে রয়েছে যে পরমাত্মার অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার—তার চারিদিকে গড়ে উঠেছে বিষয় বাসনার বিশাল প্রাচীর। মানুষ ভুলে গেছে প্রাচীরের ভেতরকার দেবতাকে—যে দেবতা হ'লো অফুরন্ত শক্তি, আনন্দ ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। বাসনা ও আসক্তি কমিয়ে দিয়ে হালকা করে তুলতে হবে সে প্রাচীরটিকে। ভগবানের পূজা আরাধনায় আস্তে আস্তে মনের বৃত্তিগুলিকে করতে হবে অন্তর্মুখী। এ পথে এগিয়ে চলতে পারবে যদি সৎসঙ্গ কর, আর দুর্জনের সংশ্রব থেকে চল নিজেকে বাঁচিয়ে। কালে ভগবানের অনন্ত শক্তি উপলব্ধি করবে।

*　*　*　*

তোমার অন্তঃকরণ অপবিত্র ও মলিন হয়েছে তোমারই কর্মে।—নিষিদ্ধ ও অপবিত্র কর্মই তোমার এ দুর্বল অপবিত্র মনের কারণ। কর্মদ্বারাই এখন পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুলতে হবে অশুদ্ধ মনকে। শাস্ত্রের বিধান মেনে করতে হবে কর্ম, আর সে কর্মের ফল অর্পণ করে যেতে হবে ভগবানকে।

কোন কর্মেরই ফল কখনও চাইবে না। ফল চাওয়া মানেই প্রতারিত হওয়া। চাইবে তো তুমি তোমার মাপে। গরীবের ছেলে হয়তো ২।১ হাজার টাকা চেয়েই হবে সন্তুষ্ট, আর ধনীর ছেলে হ'লে না হয় চাইবে লাখ, দু'লাখ। কিন্তু পরমাত্মা যা দিতে পারেন, মানুষ পারে না তা কখনও কল্পনা করতে, চাওয়া তো দূরের কথা।

কাহারও আয় গেল কমে, স্ত্রীর হ'লো ব্যারাম, ছেলে হলো অবাধ্য। তখন শিবের মাথায় সে গিয়ে ঢাললো একঘটী জল, আর সঙ্গে সঙ্গে চাইলো যত সব অসুখ-অসুবিধার ব্যবস্থা ও শান্তি। এ ভাবের পূজা যেন না হয় তোমার।

সৎকর্ম করে চলো—আর তার ফলাফল কর ভগবানের চরণে অর্পণ। সুখশান্তি পাবে এ জীবনে, আর পরকালও হবে সমুজ্জ্বল।

* * * *

অন্নের জন্য কারো কাছে হাত পাতা হচ্ছে সব চেয়ে ছোট কাজ।—

তুলসী কর পর কর করো
করতল কর ন করো।
জা দিন করতল কর করো
তা দিন মরণ করো॥

এ হ'লো ভক্তের বাণী। অন্নের জন্য পরের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

শিবাজীর একবার মস্ত অহংকার হল এই ভেবে যে, বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর আমি, আমারই সুশাসনে প্রজামণ্ডলীর ভরণ-পোষণ চলছে। কথাটা গেল শিবাজীর গুরু রামদাসের কানে। শিষ্যের প্রাসাদে এলেন গুরু রামদাস। শিষ্য বুঝতে পারলেন না গুরুজীর উদ্দেশ্য। প্রাসাদের সম্মুখেই ছিল এক পাথরের স্তম্ভ। হুকুম করলেন গুরুজী "ভাঙ্গাও স্তম্ভ।" আজ্ঞামাত্র কাজ সুরু হল। হঠাৎ স্তম্ভের ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে পড়ল এক অশ্ব। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন শিবাজীকে—"এ পাথরের ভেতরে কে একে খেতে দিত বল?" সবই বুঝলেন শিবাজী। তখনই গুরুদেবের পায়ে পড়ে নিজের ভ্রান্তির জন্য চাইলেন অজস্র ক্ষমা।

মূলকথা হল এই, সৃষ্টি যিনি করেছেন, সৃষ্ট প্রাণীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তাঁরই।

"যদস্মদীয়ং নহি তৎপরেষাম্।"—

প্রারব্ধার্জিত তোমার ভোজ্য তোমারই কাছে আসবে, যাবেনা তা' অন্য কারো কাছে।

ভ্রমসংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় 'পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা' প্রবন্ধে ৩১৭ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ স্তম্ভের ১ম পঙক্তিতে 'অষ্টমী'-র স্থানে 'নবমী' এবং ৩য় পঙক্তিতে 'নবমী'-র স্থানে 'দশমী' বসিবে।

শ্রাবণ সংখ্যায় ৩৬৩ পৃষ্ঠার 'একটি দিনের স্মৃতি' প্রবন্ধের লেখকের নাম—শ্রীতারকচন্দ্র রায়। (অনবধানতাবশতঃ শ্রীতারকনাথ রায় ছাপা হইয়াছে)

শ্রীকৃষ্ণপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ

প্রাতঃস্মরামি যদুনাথপদারবিন্দং
ভক্তার্তিনাশকরচারুব্রজাঙ্গনাস্বম্।
বজ্রাঙ্কুশাদিপরিলাঞ্ছিতপাটলাভং
যদ্ব্যাধভ্রান্তিমজনয়ন্মনোঽভিরামম্॥ ১॥

প্রাতর্ভজামি পরিবেষ্টিতদেববৃন্দং
কৃষ্ণং তমালঘনকোমলশ্যামলাঙ্গম্।
শ্রীরাধিকাঽবিরহহৃষ্টমনন্তপুণ্য-
বৃন্দাবনালিবসতিং কমলাক্ষিপত্রম্॥ ২॥

প্রাতর্নমামি বসুদেবসুতং বরেণ্যং
গোবিন্দমাদিভুবনং সদসৎপরেশম্।
গর্গাদিভির্মুনিভিরানুতমাপতদ্ভিঃ
পাদান্তিকে বরতনুংকরুণার্দ্রবেশম্॥ ৩॥

প্রাতর্জপামি সততং হরিনাম পুণ্যং
ততোঽধিকং কিমিহ নাথ মমাস্তি বিত্তম্।
আশাং বিহায় সকলাং রসনে মদীয়ে
অহর্নিশং জপ হরীতি যথার্থচিন্তম্॥ ৪॥

প্রাতর্বদামি দয়িতং জগদেকবন্ধুং
কিঞ্চিন্মমাধিহরণং হৃদয়েন দেবম্।
যদ্‌যৎ করোতি করণং শ্রবণাদি কর্ম
তত্তদ্‌দধাতু সকলং ভবদাভিমুখ্যম্॥ ৫॥

কৃষ্ণস্য পঠতি স্তোত্রং য ইদং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
স মোদতে তেন সহ প্রাতঃস্মরণপঞ্চকম্॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদঃ—ব্যাধের ভ্রান্তি-উৎপাদনকারী, ভক্তবৃন্দের আর্তিবিনাশকারী, নয়নাভিরাম, ব্রজবালাগণের পরমসম্পদ্, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নলাঞ্ছিত, ঈষৎ রক্তিমাভ, মনোমোহন যদুপতির চরণকমল প্রভাতে স্মরণ করি। ১

যাঁহার কোমল অঙ্গ তমাল ও মেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ, যিনি শ্রীরাধিকার বিরহাভাবে আনন্দিত, অনন্ত পুণ্যবতী বৃন্দাবনসখীগণের মধ্যে যিনি বিরাজমান, দেবগণ-পরিবেষ্টিত, পদ্মপলাশলোচন সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাতঃকালে ভজনা করি। ২

যিনি জগতের আদিকারণ এবং কার্য ও কারণ সবই, পরমেশ্বর, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া স্তব করেন, বসুদেবনন্দন, বরেণ্য, দিব্য ও করুণার্বিগলিতদেহধারী সেই গোবিন্দকে প্রভাতকালে প্রণাম করি। ৩

হে নাথ! আমি প্রত্যুষে 'হরি' এই পুণ্য নাম নিরন্তর জপ করি, ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কি আছে? হে আমার রসনা, সকল আশা (কথা) পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি অর্থচিন্তন সহ 'হরি' এই নাম জপ কর। ৪

জগতের একমাত্র বন্ধু, পতি, আমার দুঃখহারক দেবতাকে প্রভাতে অন্তরের সহিত কিছু নিবেদন করিতেছি। (হে নাথ!) আমার ইন্দ্রিয়সকল শ্রবণাদি যাহা কিছু করে, সমস্তই আপনার অভিমুখী করুন। ৫

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণপঞ্চক এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন থাকেন। ৬

সমালোচনা

গীতা পরিচয়—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ—প্রণীত ; প্রকাশক রথীন্দ্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১ ; পৃষ্ঠা—১২২ ; মূল্য—১৷৹ আনা।

চিন্তাশীল অধ্যাপক-গ্রন্থকার কোন একটি বিশেষ দার্শনিক মতকে প্রাধান্য না দিয়া বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সহজ সরল ভাষায় গীতার বিষয়বস্তুটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ভাল লাগিল। পুস্তকখানিতে মূল গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মতো ১৮টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের ভাব বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই ; কেবলমাত্র প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশে গূঢ় অর্থদ্যোতক শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া পুস্তকখানির 'গীতা পরিচয়' নামটি সার্থক। পাঠকপাঠিকাগণ বইটিতে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করিতে পারিবেন। 'গীতাধর্ম প্রচারের জন্য গীতাপ্রেমিকগণকে এই পুস্তক বিনামূল্যে প্রদানে'র সাধু ইচ্ছা সত্যই প্রশংসনীয়।

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)—স্বামী সত্যানন্দ গিরি-প্রণীত ; দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক : সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) ; পৃষ্ঠা—৫১ ; মূল্য বার আনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে যে সমস্ত সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল, কাশীপ্রবাসী শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য স্বল্পপরিসর জীবনকাহিনীটিতে যোগিরাজের জন্ম, বাল্য, যৌবন, দীক্ষালাভ, কর্মক্ষেত্র, সাধনা, গুরুভাব এবং তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রারম্ভে শ্রীশ্রীলাহিড়ীমহাশয়ের একখানি আলেখ্য এবং পরিশিষ্টে তাঁহার হস্তাক্ষর, সাধন-প্রণালী (ক্রিয়া), 'অঞ্জলি' ও 'আরতি' সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মপিপাসুগণ এবং যোগিরাজ লাহিড়ীমহাশয়ের গুণমুগ্ধ সাধকবৃন্দ পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত এবং আনন্দিত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ (সংক্ষিপ্ত হিন্দী জীবন-চরিত)—স্বামী জপানন্দ-প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, বিকানীর (রাজস্থান)। পৃষ্ঠা : ১৩৩ ; মূল্য এক টাকা।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে সাধারণের উপযোগী করিয়া স্বামীজীর এই জীবনীটি প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করি। পুস্তকখানির ভাষা সহজবোধ্য ; যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, তাঁহারাও অল্পায়াসে ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও স্বামীজীর জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'প্রথম দর্শন', 'পরিব্রাজক', 'আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার,' 'মাদ্রাজে', 'বেলুড় মঠ'—পরিচ্ছেদগুলি বেশ ভাল লাগিল।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

শ্রীশ্রীচণ্ডী-প্রসঙ্গ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ-প্রণীত। ষোল পৃষ্ঠা ; মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—দীপক প্রিণ্টার্স, ৪৫নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

লেখক এই পুস্তিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে লজ্জা-মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীচণ্ডীর নাম ও রূপ, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রক্তবীজ-বধ, শবাসনা শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীকালীর কলঙ্ক-ভঞ্জন—এই পাঁচটি প্রসঙ্গ গভীর শ্রদ্ধা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সবিশেষ নিপুণতার সহিত

আলোচনা করিয়াছেন। চণ্ডীতে দেবী 'লজ্জা'-রূপে বর্ণিতা ও আরাধিতা হইয়াছেন। লজ্জা শব্দের অর্থ ধর্মবিরুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম হইতে বিমুখকরী বৃত্তি, স্বতঃ অধর্ম-বিমুখতা, অকার্যকরণে চিত্তের সংকোচ। কিরূপে মানুষ লজ্জার প্রভাবে শান্ত ও সংযত হয়, উহার অভাবে অসংযত ও বিপথগামী হয়, কিরূপে লজ্জা শান্তির উৎস, ধারক ও বাহক, এবং মহতী বৃত্তিসমূহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিকারক—এই তত্ত্বটি লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রক্তবীজ-বধ-বৃত্তান্তটিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-শক্তি প্রশংসনীয়, ভাষাও বেশ সরস।

—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

উপনিষৎ—চিত্রিতা দেবী-প্রণীত।

প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—১৪৫; মূল্য—২॥০ টাকা।

ঈশ, কেন, কঠ এই তিনটি উপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং উহাদের সুখপাঠ্য পদ্যানুবাদ-যুক্ত এই সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া স্বর্গত দার্শনিকপ্রবর ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা বিদুষী লেখিকা বাংলা ধর্মসাহিত্যের পাঠকপাঠিকা-গণের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। প্রত্যেকটি উপনিষদের পূর্বে উহার একটি সুলিখিত প্রারম্ভিক পরিচিতি দেওয়া আছে। অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে বইখানির যে সমাদর জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা উহা অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (প্রথম খণ্ড: ১-৯ অধ্যায়)—শ্রীমতিলাল রায়—প্রণীত; প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—৩৫২; মূল্য—৫৲ টাকা।

চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বহুশ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় কিছুকাল পূর্বে বেদান্ত দর্শনের 'জীবনভাষ্য' প্রকাশ করিয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যানে একটি সংস্কার-বিমুক্ত স্বাধীন মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মূল শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ তাঁহার নিজের একটি বিস্তারিত 'ভাষ্যে'র মাধ্যমে সর্বোপনিষৎ-সার গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যানে প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মত অনেকস্থলে গৃহীত হইয়াছে—অনেকস্থলে গ্রন্থকার তাঁহাদের ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য দেখিয়া 'জীবন-বাদের'র আলোকে গীতা-বাণীর অর্থ উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন।

"গীতা শুধু যোগবিশ্লেষণ নহে, তত্ত্ববিচার নহে, বিজ্ঞানশাস্ত্র নহে, সিদ্ধজীবন গঠনের অব্যর্থ বিধানই ইহার মধ্যে আছে।" (পৃঃ ৮২)

"মোক্ষধর্মে আত্মবিচার হইয়াছে প্রচুর, আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার নানাপ্রকার দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু ইহা জীবনের সমাধান নহে। * * সাংখ্যের পুরুষবাদ বা প্রকৃতিবাদ কিম্বা বেদান্তের মায়াবাদ বা অবিদ্যাবাদ বাহির করিয়া এই তত্ত্ব গতানুগতিক পন্থায় বিচার করার আমরা পক্ষপাতী নহি। গীতায় অমৃতময় জীবনবাদের কথাই বলা হইয়াছে; সেই দিকের আলো অনুসরণ করিয়াই আমরা গীতার মর্ম অবধারণ করার পথে অগ্রসর হইব।" (পৃঃ ১৯০)

গীতার উপদেশগুলি যে মানুষের সুখদুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত—গীতা যে জগৎ-সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ, জগতের মধ্যে ভাগবত-সত্তা অনুভব, এবং ভাগবতকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া দিব্য জীবন যাপন করিতে বলে—ইহাই গ্রন্থকারের 'জীবনবাদে'র প্রধান কথা। আমাদের মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী কিছু নূতন নয়। প্রাচীন গীতা-ব্যাখ্যাতাগণের টীকা ভাষ্যাদিতেও ইহার নিঃসন্দিগ্ধ সমর্থন পাওয়া যায়। তবে শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার তাঁহার সতেজ ও সুখপাঠ্য আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর একটি সরস আধ্যাত্মিক প্রেরণা সক্ষমভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং বোধ করি আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই খানেই

যে সকল স্থানে তিনি আচার্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বত্র তাঁহার বিচার-ধারা আমাদিগের নিকট সুসমঞ্জস মনে হইল না।

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত; প্রাপ্তিস্থান—(১) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভবন, ১০৯।১১এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ (২) বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, ২১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬; পৃষ্ঠা—৪২৫; মূল্য—(শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবানুকূল্যে) ৪৲ টাকা।

হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যে এমন বহু বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথা আছে যেগুলি সম্বন্ধে অনেকের (বিশেষতঃ বর্তমানের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানিগণের) মনে নানা প্রশ্ন জাগে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই ধরনের কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং যুক্তি-প্রতিষ্ঠ। যে প্রশ্নগুলি তিনি বাছিয়া লইয়াছেন, উহাদের কতকগুলি বর্তমান হিন্দুসমাজের জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পুস্তকখানি তাই খুব কালোপযোগী হইয়াছে। ধৈর্যসহকারে আলোচনাগুলি পড়িলে পাঠক-পাঠিকার মনে হিন্দুধর্মে ও শাস্ত্রে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর অনেক উক্তি আলোচনাগুলিতে উপজীব্যরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সহজ মানুষ—পশুপতি ভট্টাচার্য-প্রণীত; প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬; পৃষ্ঠা—২৮২; মূল্য—৪॥০ টাকা।

এই বইখানি একটি উপন্যাস—ধর্মমূলক উপন্যাস (Religious fiction) বলাই অধিকতর সঙ্গত। লেখকের উপক্রমণিকায় আছে—"এই কাহিনীর মূল ঘটনাগুলিও সত্য, এর মূল চরিত্রগুলি ও তাদের অনুভবগুলিও সত্য। লেখকের কল্পনার কাজ এতে বিশেষ কিছুই নেই, আগাগোড়াই এক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর কাছে শুনে লেখা।" কাহিনীটি কিন্তু কাল্পনিক-সৃষ্টি হইতেও চিত্তাকর্ষক। গল্পের আরম্ভ—"এই অদ্ভুত মেয়েটির নাম ইলা।" কলিকাতার কোন কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কন্যা গল্পের নায়িকা ইলার মনটি ছেলেবেলা হইতে অনুকূল ও প্রতিকূল নানা পরিবেশের মধ্যে কি করিয়া বিচিত্র ভাবে বাড়িয়া উঠিল—মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি একটি 'সহজ মানুষ' রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার ও বিকশিত করিল তাহা কাহিনীর ভিতর দিয়া অনুসরণ করিতে করিতে মেয়েটিকে সত্যই 'অদ্ভুত' না বলিয়া পারা যায় না। ধর্মসাধনার বহু কথা কথোপকথনগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে স্থানে স্থানে ধর্মপ্রসঙ্গগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় 'উপন্যাসে'র গতি ব্যাহত হইয়াছে মনে হইল।

তপন কুমার—শ্রীকানু কর-প্রণীত; পূর্বাচল পাবলিশার্স, ২৫, দত্ত লেন, কলিকাতা-৭; পৃষ্ঠা—১৮৩; মূল্য—১॥০ টাকা।

আদর্শমূলক উপন্যাস। কর্মজীবনে স্বাবলম্বন, সততা এবং সামাজিক জীবনে ধর্মনিষ্ঠা, সেবা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের মহিমা কাহিনীটির মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সৎ, ভাষাও কাঁচা নয়, তবে গল্পটি যথোপযুক্ত জমিয়া উঠিতে পারে নাই। জায়গায় জায়গায় ঘটনাগুলি খুবই অবাস্তব মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের গল্প—শ্রীজয়দেব রায়-প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীবামনদাস সেন, ৯১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; পৃষ্ঠা—১৬৭; মূল্য—২৲ টাকা।

কুড়িটি পরিচ্ছেদযুক্ত বইখানিতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক অতি সরস ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বৈষ্ণব সাহিত্য, গোরক্ষ-বিজয়, রামপ্রসাদের রচনা, কবির গান প্রভৃতি সব

আলোচনাই কাহিনীর আকারে অতি সুন্দর লাগিল।

শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্র সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১)—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক-সম্পাদিত। কার্যালয়—৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠা—৩২৪; মূল্য—২৲ টাকা।

শিক্ষাব্রতী মাসিক পত্রিকার বহু রচনাসমৃদ্ধ এবারকার রবীন্দ্র সংখ্যাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা লইয়া আলোচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান। বিশ্বকবির কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও জাতীয়তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত। এই সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও জীবনধারার একটি উৎকৃষ্ট পরিচিতি-গ্রন্থরূপে সমাদরণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান—গত ৪ঠা জুন, নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীমা সারদা-দেবীর শতবার্ষিকীর শেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐদিন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ম্যাল্‌ভিনা হফ্‌ম্যান নির্মিত শ্রীশ্রীমার একটি মনোরম আবক্ষ ব্রোঞ্জ্‌মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই কেন্দ্রে এই বিখ্যাত শিল্পীর আরও দুইটি শিল্পনিদর্শন রহিয়াছে। সেইদিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু উৎসাহী শ্রোতার সম্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন মেথডিষ্ট্‌ বিশপ্‌ ডাঃ ফ্রেডরিক ফিসারের বিধবা পত্নী মিসেস্‌ ওয়েল্‌দি এইচ্‌ ফিসার, রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী-রাজেশ্বর দয়াল, নিউইয়র্কের ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর রুথ্‌ আন্‌সেন, আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিলের এশিয়াবিভাগের পরিচালক ডক্টর এইচ্‌ এল্‌ দে এবং সারা লরেন্স্‌ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক মিঃ জোসেফ ক্যাম্প্‌বেল। এই উপলক্ষ্যে প্রার্থনাগৃহটি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমূর্তিস্থাপনের জন্য নির্মিত বেদীর সম্মুখে ভক্ত ও অনুরাগী বন্ধুগণ মাল্য দান করেন।

একটি সংস্কৃত স্তোত্র-পাঠের পর স্বামী নিখিলানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের দুইটি বাণী পাঠ করেন। প্রথমটি শতবার্ষিকী-বৎসরের উদ্বোধন-সম্বন্ধীয় সাধারণ বাণী; দ্বিতীয়টি ছিল ঐদিনকার অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিশেষ বাণী। দ্বিতীয় বাণীটির একস্থানে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন: "প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রীমায়ের এই মূর্তি-প্রতিষ্ঠা যেন তাঁহার ভক্ত-সন্তানহৃদয়ে নিত্য-অধিষ্ঠানের নিদর্শন হয়; ইহা যেন নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও মানবসেবার উৎস হয়।" ইহার পরেই স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীমতী চম্পকলতা দে'র পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা দে ডক্টর এইচ্‌ এল্‌ দে'র পত্নী এবং মিশনের একজন অনুরাগিণী ভক্ত। তিনি শ্রীমা সারদা দেবীর প্রস্তর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রশান্ত সুন্দর ও করুণাময় মুখমণ্ডল যখন প্রথম দেখা গেল, তখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধ্বনি যেন ভাঙিয়া পড়িল। ম্যালভিনা হফ্‌ম্যান নির্মিত শ্রীশ্রীমার তরুণ বয়সের এই প্রতিমূর্তিটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত। আবরণ-উন্মোচনের পর স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, শ্রীশ্রীমার দেহরক্ষা-কাল পর্যন্তও তাঁহার ছবির কথা জনসাধারণ জানিত না। তিনি সর্বদাই নিজেকে 'লজ্জাপটাবৃতা' রাখিতেন। আজ শ্রীশ্রীমার তিরোভাবের ৩৫ বৎসর পরে আমেরিকার অন্যতম এক বিশিষ্ট

শিল্পিনির্মিত মায়ের ব্রোঞ্জ-প্রতিমূর্তি সর্বসমক্ষে উন্মোচিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমা আদর্শ হিন্দু নারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন; ঈশ্বরের মাতৃত্ব হইতেছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি।

সমাগত অতিথি-হিসাবে সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন মিসেস্ ওয়েল্‌দি ফিসার। তিনি তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। মিসেস্ ফিসারের একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আছে; ইহার লক্ষ্য হইল কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের প্রাপ্ত-বয়স্ক-দিগকে লেখাপড়া শেখান। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন স্বদেশে তাঁহার পরিকল্পনার সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবার জন্য। তাঁহার স্বামী বিশপ ফিসার ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুরাগী বন্ধু। স্বামী নিখিলানন্দজী মিসেস্ ফিসারের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে লোকে প্রীতির চক্ষে দেখে। তিনি আরও বলেন, "আমি মনে করি, আমেরিকায় ভারতবর্ষের প্রতি প্রচুর সদ্ভাব বর্তমান রহিয়াছে; ভারতবর্ষেও আমেরিকার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখা যায়।" মিসেস্ ফিসার একটি উদ্দীপনাময় ও হৃদয়-গ্রাহী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী ভারতবর্ষে দয়াসুকোমল সমাজসেবা-ব্রতের নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি একথাও বলেন যে, যাঁহারা প্রেমের মহনীয় ধর্মের অনুশীলন করেন, তাঁহারা সর্বদাই আপন আপন ধর্মনির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট প্রিয়; ইহার কারণ, ভারতবর্ষে এই মহান্ প্রেমধর্মের বহু সাধক রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সমাজসেবীরা জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। তিনি এই বলিয়া শেষ করেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে 'জনসাধারণের সহিত জনসাধারণের সংযোগ'-রূপ আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন—অর্থাৎ ভারতীয় ও আমেরিকার জনসাধারণের পরস্পরকে জানিবার আন্দোলন চালাইতে হইবে।

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন শ্রীরাজেশ্বর দয়াল। তিনি শ্রীমা সারদার অমানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীমা সারদা অকুণ্ঠিত ভাবে সকলকেই তাঁহার ভালবাসা দিয়াছেন। তিনি ছিলেন সকলের মাতা, বিশ্বের জননী। শ্রীদয়াল শ্রীশ্রীমার কয়েকটি উপদেশবাণী পাঠ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁহার মতে মায়ের উপদেশ-রাজী কত কার্যকর, কত ফলপ্রদ, অথচ মাতা ছিলেন নিরক্ষর গ্রাম্য মেয়ে!

পরবর্তী বক্তা ছিলেন ডক্টর রুথ্ আন্‌সেন। তিনি বলেন, বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাপুঞ্জ সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদে এশিয়ার সংস্কৃতিকে ইউরোপ আমেরিকার সংস্কৃতির সহিত যুক্ত করিতেছে। উদ্দেশ্য, সত্যকার একটি বিশ্ব-সভ্যতার গোড়াপত্তন করা। তিনি আরও বলেন, পাশ্চাত্যের অনেক প্রাচীন সভ্যতা নানা সদ্গুণ সত্ত্বেও ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু শত বাধাবিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও প্রাচ্য সভ্যতা এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার রহস্য হইল, প্রাচ্যসভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি।

ডক্টর এইচ্ এল্ দে সস্ত্রীক ওয়াশিংটন হইতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীমা সারদার প্রতি ভক্তি কত বড় শক্তি ও সাহস দান করে তাহার কথাই তিনি বলিলেন।

সর্বশেষে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক জোসেফ্ ক্যাম্প্‌বেল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধ্যাপক জোসেফ্ বলেন, "শ্রীশ্রীমা সর্ব-বিসারী করুণা, অকুণ্ঠ আত্মদান, ধৈর্য, সান্ত্বনা ও ক্ষমার নিখুঁত প্রতিমূর্তি।" তাঁহার মতে শ্রীশ্রীমা শক্তিস্বরূপা; এই শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

(১) To the youth of India—By Swami Vivekananda. প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, (আলমোড়া), ইউ, পি।

পৃষ্ঠা—১৬৮ ; মূল্য—১৸৹ আনা।

ভারতের তরুণদের প্রতি স্বামীজীর বাণীর সঙ্কলন। নিম্নোক্ত ৯টি অধ্যায়ে বাণীগুলি সাজানো হইয়াছে :—(১) জগতের প্রতি ভারতের বাণী (২) ভারত এখনও কেন বাঁচিয়া আছে ? (৩) বেদান্তের ব্রত (৪) আমার সমর-নীতি (৫) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ (৬) ভারত কি করিয়া পৃথিবী জয় করিতে পারে ? (৭) ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ (৮) হিন্দু-ধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ (৯) আমরা যে ধর্মে জন্মিয়াছি।

(২) Laghu Vakya-Vritti of Sri Sankaracharya প্রকাশক—স্বামী অপর্ণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলমোড়া, ইউ, পি।

পৃষ্ঠা—৪৩ ; মূল্য—৷৹ আনা।

১৮টি শ্লোকে নিবদ্ধ ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের একটি প্রকরণগ্রন্থ—'লঘুবাক্যবৃত্তি'র সুখপাঠ্য সংস্করণ। 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত টীকা এবং ইংরেজীতে অন্বয়ার্থ, সরল অর্থ এবং টীকার অনুবাদও দেওয়া আছে।

(৩) The Vedanta Kesari—Holy Mother Birth Centenary Number স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ; মায়লাপুর, মাদ্রাজ—৪ ; পৃষ্ঠা—২০০ (ডবলক্রাউন অক্টেভো) ; মূল্য—২৲ টাকা।

বেলুড় মঠের অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসী এবং ভারতের ও বিদেশের বহু মনীষীর লিখিত প্রবন্ধাবলী, আলোচনা ও স্মৃতিকথা সংযুক্ত এবং ৩২ খানি চিত্র (১ খানি ত্রিবর্ণ) শোভিত জননী সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর মনোরম স্মারকগ্রন্থ। বেদান্ত কেশরী মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গের এই বিশেষ সংখ্যার জন্য আলাদা দাম লাগিবে না। (মে মাস হইতে ৪১তম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে ; বার্ষিক চাঁদা ৫৲টাকা)।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীধীরেশচাঁদ ঘোষ—গত ১৩ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত কলিকাতা মোহনলাল ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীধীরেশ চাঁদ ঘোষ মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাংলাদেশের কাচশিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে শ্রীযুত ঘোষ নিজ কর্মদক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যেই কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সমাজসেবা মূলক কার্য, বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সরলতা ও ধর্মানুসন্ধিৎসা সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ—বিগত ১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) কলিকাতা রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ৪১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে মানপত্র এবং ২৭টি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক বিতরণ করা হয়। উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, "সুযোগ্য পরিচালনার গুণে আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃত

শিক্ষা পরিষদ্ দিকে দিকে সমুন্নতি লাভ করেছে। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে যে ক্ষেত্রে বৎসরে হাজার খানেক পত্রের আদানপ্রদান হ'ত, এখন তা' ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়েছে। পরিষদের ব্যয় পূর্বে ছিল ১৫০০০৲(পনের হাজার) টাকায় সীমাবদ্ধ, এখন তা' তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসরে ছাত্র-সংখ্যা ক্রমবিবর্ধিত হয়ে তিন হাজারের স্থলে নয় হাজারে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে এবং নূতন নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্ট্রীকৃত পণ্ডিতসংখ্যাও আট শত থেকে ষোল শতে উন্নীত হয়েছে। আমাদের ৫৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে সহস্র সহস্র ছাত্র আমাদের পরীক্ষা দেন ব'লে আমাদের পরিষদের সঙ্গে নিখিল ভারতের একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশধর ব'লে তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলীর একটি নাড়ীর টান আছে। উপসংহারে তিনি বলেন, "পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশিসে আমাদের পরিষদ্ উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরূঢ় হোক্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করুক। পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।"

বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন, বর্তমানে পরিষদের বাসস্থান যে প্রকার আবর্জনাপূর্ণ দূষিত স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ অপরিষ্কার স্থানে কোনও প্রকার শিক্ষাসংস্থান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতঃপর তিনি মাসিক একশত টাকা হারে বৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর ছয়টী মাসিক বৃত্তি পূর্বে সরকার বাহাদুর কর্তৃক প্রদানের স্বীকৃতি সত্ত্বেও বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যেও না দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং এবিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গবর্ণমেন্টের ৪র্থ সংস্কৃত কলেজটি কুচবিহারেই স্থাপিত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন। অবশেষে পণ্ডিতমণ্ডলীর বৃত্তিবর্ধনের নিমিত্তও তিনি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন জানান। পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চোধুরী মহাশয় বলেন, বিগত উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর আদিভাগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যকে জনসাধারণের মধ্যে আরও জনপ্রিয়, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় একমাত্র যোগসূত্র সুদৃঢ়তম করবার জন্য যে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফলপ্রসূ হয়েছে। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ ভারতীয় জাতীয় জীবনকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত করবার প্রয়াস করছেন, অদূর ভবিষ্যতে নিখিলভারতে ঐ প্রয়াসই সার্থক প্রয়াস বলে পরিগৃহীত হবে। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্বক নিখিলভারতে সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের প্রয়াসী। প্রত্যেক ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্য এমনভাবে সুপরিপুষ্ট হওয়া বিধেয়, যাহাতে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সংস্কৃতপ্রধান দেশীয় ভাষার মাধ্যমে অনুকূল আকার লাভ করতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গদেশ সংস্কৃতনিষ্ঠ দেশ। বঙ্গদেশের অব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজ, মুসলমানগণ ও নারীসমাজ যেভাবে সংস্কৃতের সেবা করিয়াছেন, তাহাও চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকবে। বঙ্গদেশের ঐতিহ্যের দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক দিয়াও সংস্কৃত সাহিত্যের বিজয়যাত্রা ঘোষণায় বঙ্গদেশের কণ্ঠ সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ হওয়া বিধেয়।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয় বলেন, সংস্কৃতশিক্ষা পরিষদ্ যেভাবে সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচারে সার্থককাম হয়েছে, অচিরে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন অনিবার্য। চুঁচুড়ায় গত বৎসর তিনি নিজেই এবিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন, পুনরায় এই উৎসবেও একই কথা বলছেন।



শ্রীশ্রীদুর্গা

কুমারটুলির জনৈক পটুয়া কর্তৃক
অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত

কালীভূষণ সেন কবিরাজ
মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

মুদ্রণ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং



মহামায়া

মহারূপা মহাপূজ্যা মহাপাতকনাশিনী।
মহামায়া মহাসত্ত্বা মহাশক্তির্মহারতিঃ ॥

মহাভোগা মহৈশ্বর্যা মহাবীর্যা মহাবলা।
মহাবুদ্ধির্মহাসিদ্ধির্মহাযোগীশ্বরেশ্বরী ॥

মহাতন্ত্রা মহামন্ত্রা মহাযন্ত্রা মহাসনা।
মহাযাগক্রমারাধ্যা মহাভৈরবপূজিতা ॥

মহেশ্বরমহাকল্পমহাতাণ্ডবসাক্ষিণী।
মহাকামেশমহিষী মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥

—শ্রীললিতাসহস্রনামস্তোত্রম্‌, ৫৪-৫৭।

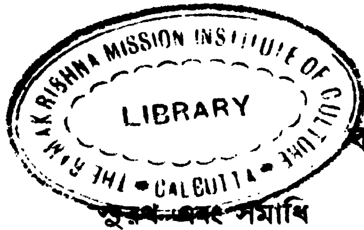
[জগজ্জননী মহামায়ার অতুলনীয় মহিমার কে সীমা করিবে?]

অখিল সংসারে যত মূর্তি সব তাঁহারই মূর্তি—সকল রূপের মধ্যে তাঁহারই রূপ জল জল করিতেছে, মা যে আমাদের মহারূপা। যেখানে যত দেহ সব মাহামায়ারই দেহ, যেখানে যত শক্তি সব তাঁহারই শক্তি, যেখানে যাহা কিছু আনন্দ সব তাঁহারই আনন্দ; মা যে আমাদের মহাসত্ত্বা, মহাশক্তি, মহারতি। সকল পূজা, সকল আরাধনার লক্ষ্য তিনিই; তাই তাঁহার নাম মহাপূজ্যা। এমন কোন পাপ নাই যাহা তাঁহার পুণ্যস্পর্শে তিরোহিত না হইতে পারে—তাই তো তাঁহাকে বলি মহাপাতকনাশিনী।

এই বিশ্বভুবনে যত ভোগ, যত ঐশ্বর্য, যত বীর্য, যত বল সকলই মহামায়ার। মহা-যোগীশ্বর শিবেরও যিনি ঈশ্বরী তিনি নিখিল-মানসে বুদ্ধিবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া সংসারের সকল কার্যকারণশৃঙ্খলা ধরিয়া রাখিয়াছেন, নিখিল জীবের যাবতীয় কর্মের সিদ্ধিও তিনিই।

মা আমাদের মহাতন্ত্রা, মহামন্ত্রা—সকল সাধন, সকল সিদ্ধান্ত তাঁহাকে লইয়াই—সকল মন্ত্র তাঁহারই মন্ত্রে নিহিত। মহাযন্ত্রা তিনি—তাঁহারই অধিষ্ঠান-প্রতীকে সকল দেবতার আবির্ভাব ঘটে; মহাসনা তিনি—তাঁহারই আসন সকল আরাধ্যের আসন। আবার বিবিধ যাগযজ্ঞের দ্বারা যাজ্ঞিকগণের যে দেবতার তুষ্টিবিধানপ্রয়াস—উহারও লক্ষ্য মহাভৈরবপূজিতা জগদম্বাই।

মহাশিবের মহাকামনা—'এক আমি বহু হইব।' সেই কামনাকে ব্যক্ত করিতে অচল শিবের তদাত্মভূতা মহামায়ার আবির্ভাব, অসংখ্য নামরূপাত্মক আকৃতির প্রসব, কত যত্নে পোষণ, সংরক্ষণ। তাহার পর একদিন ঘনাইয়া আসে কল্পের অবসান। মহাকাল প্রলয়তাণ্ডবের নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিপদক্ষেপে লক্ষ কোটি আকৃতি ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বিলীন হইতেছে। কোথায়? ত্রিলোকসুন্দরী মহেশ্বর-মহিষীর পদকমলে। মহাতাণ্ডবের সাক্ষিণী হইয়া মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, প্রলয়-লীন জীবনিবহের কর্মবীজগুলি কুড়াইয়া রাখিতেছেন। পরবর্তী কল্পে আবার উহা হইতে জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিবেন।



কথাপ্রসঙ্গে

সুরথ এবং সমাধি

দশভুজার পূজাকৃত্যের এক প্রধান অঙ্গরূপে নয় দিন বা চার দিন বা তিন তিন দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী নিয়মপূর্বক পাঠ করা হইয়া থাকে। রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্যের কাহিনী অবলম্বনে মহাশক্তিস্বরূপা বিশ্বজননীর দুষ্টদমন, শিষ্টপালন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণ করিবার বর্ণনা আজিও শ্রদ্ধালু নরনারীর চিত্তে যে বিচিত্র আবেগসম্ভার জাগ্রত করে উহার আধ্যাত্মিক মূল্য বিপুল। বেদবেদান্তের নিগূঢ় সত্য উপাখ্যানের ভিতর দিয়া এমন সহজ ও সুস্পষ্টভাবে জনমানসে যিনি গাঁথিয়া দিতে পারিয়াছেন সেই মার্কণ্ডেয় ঋষির রচনা-কীর্তির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ একান্তই অবান্তর প্রশ্ন। চণ্ডী মানুষের সামগ্রিক জীবন-শাস্ত্র—মানুষের মানস-প্রকৃতি, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম—তাহার বন্ধন ও মুক্তি—এই সব কিছুরই অপূর্ব বিশ্লেষণ ও অসন্দিগ্ধ দিগ্‌দর্শন! কে ছিলেন ভূপতি সুরথ, কোন্ দূর অতীতে কোন্ অঞ্চলে কতদিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, কি কি ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহার খুঁটিনাটি তথ্য ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিচার করা বড় কথা নয়; বড় কথা—উপাখ্যানের সুরথের মধ্য দিয়া সংসারের শত শত মানুষের যে একটি বিশেষ পরিচয় প্রতিফলিত হইয়াছে উহাকে চিনিয়া রাখা। সংসারে সব কিছু আছে অথচ কিছুই নাই, সকল শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে অথচ প্রয়োগ করিতে গেলে ব্যর্থ হইতেছে, কুসুমে কুসুমে রম্যোদ্যান পরিপূর্ণ কিন্তু যে কোন একটিও ফুল তুলিতে গেলে আঙুলে কাঁটা বিঁধিয়া যাইতেছে, এমন যখন হয়, হওয়া উচিত নয় তবুও হয়—তখন আমাদের বিপন্নতার যেন অবধি থাকে না। আমাদের সকল পৌরুষ যেন তখন নির্বাণোন্মুখ, বিস্তীর্ণ আকাশের কোন দিকেই কোন কোণেই আর যেন কোন আলোর চিহ্ন নাই—কেবলই অন্ধকার, কেবলই বিভীষিকা। ঠিক এমনই সঙ্কট মুহূর্তে কিন্তু জীবনের এক পরম শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়—জীবন-তরণীর কর্ণধারের দিকে ফিরিয়া চাহিবার কল্যাণ অবসর। প্রশ্ন জাগে—কে, কে? পিছনে কে দাঁড়াইয়া রঙ্গমঞ্চের এই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছে? এই আলোক-আঁধার-ঘেরা, এই হাস্য-রোদন-বিকীর্ণ, এই সফলতা-ব্যর্থতাময় সংসার-নাটকের পরিচালনা? রাজা সুরথের এবং বৈশ্য সমাধির জীবনে ঐরূপই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দুর্ভাগ্যেরই পরিণতিতে মহৎ সৌভাগ্যও। একই মানসিক বিপর্যয়ে পরিক্লিষ্ট হইয়া উভয়ে যুক্তি করিয়া মেধস ঋষির চরণতলে গিয়া বসিলেন—উদ্দেশ্য, জানিয়া লইবেন, কেন, কেন এমন হয়? কাহার ইচ্ছায় এমন করিয়া পুতুল নাচে? এ নৃত্যের লক্ষ্য কি? অবসান কখন?

'ঋষিরুবাচ'—বিপন্ন মানবদ্বয়ের দুঃখে সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া সত্যদ্রষ্টা মুনি বলিলেন,—হে রাজন্, হে শ্রেষ্ঠিন্, তোমাদের প্রশ্ন জগৎ ও জীবনের একটি মৌলিক প্রশ্ন। ইহা শুধু তোমাদের দুজনেরই জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র মানবপ্রকৃতির জিজ্ঞাসা—না, পশুপ্রকৃতিরও বটে। থাকি, থাকি না; জানি, জানি না; পাই, পাই না;—এই দুই রং দিয়াই সমস্ত সংসারের ছবি আঁকা। ইহারই নাম মায়া—এই আলো-ছায়ার অভিব্যক্তি।

প্রতিটি ঘটনার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু সচরাচর ধরা পড়ে না। দ্বন্দ্বকে মানিয়া

লইয়াই সকলে দানাপানি খাইয়া চলে, লাউ কুমড়া সওদা করিয়া অগ্রসর হয়, রাম-শ্যাম মালতী-মাধবী, ঐ মঙ্গলা গাভীটি, ঐ ভুলো কুকুরটা, ঐ উড়িয়া-যাওয়া শালিক পাখীর দলটি—সকল প্রাণীই। জগৎচক্রের এই মানিয়া-লওয়া সহিয়া-চলা রীতি কিন্তু ধরা পড়ে কখনও কখনও কাহারও কাহারও কাছে। বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্ত চোখ দুটি যখন ভিতরে চায়, রাস্তায় ছুটিয়া ছুটিয়া ঘর্মাক্ত দেহ যখন গৃহে ফিরিয়া বিশ্রাম খোঁজে, তখনই মায়া ধরা পড়িবার যোগ্য কাল! নীরন্ধ্র অন্ধকার ফাটিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎরেখা চমকাইয়া উঠে। আবিষ্কার করি মহামায়াকে—যাঁহার মায়া তাঁহাকে—জগৎসূত্রধারিণী জগদম্বিকাকে। ডাকিলে তিনি সাড়া দেন, চাহিলে তিনি প্রার্থনা পূরণ করেন, কাঁদিলে তিনি কোলে তুলিয়া লন।

সুরথ ও সমাধি উভয়েরই জিজ্ঞাসার পটভূমি ছিল এক, কিন্তু চিত্তের সংস্কার ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই নদীপুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া তিন বৎসর একান্ত নিষ্ঠায় তদ্গতভাবে পূজা জপতপ করিয়া তাঁহারা মহামায়াকে যখন প্রসন্ন করিতে পারিলেন এবং দেবী সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন তাঁহাদের বরযাচ্ঞা এক হইল না। নৃপতি প্রার্থনা করিলেন, এই জন্মেই শত্রুকে পরাভব করিয়া রাজ্যোদ্ধারের সামর্থ্য আর পরজন্মে সুচিরকালস্থায়ী নিষ্কণ্টক রাজ্য। বৈশ্য চাহিলেন—'আমি আমার'-রূপ মোহ যাহাতে দূর হয়, এমন তত্ত্বজ্ঞান। জগন্মাতা দুই জনকেই বলিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতি'—হইবে। রাজধর্মশীল রাজা তোমার রাজ্য হইবে, এ জন্মে এবং ভবিষ্যৎ সাবর্ণিক-মনুজন্মে; সংসার-বাণিজ্যনির্বিণ্ণ বৈশ্যবর, তোমার জ্ঞান হইবে, এই জন্মেই, এই দেহেই। সংসার-চক্রে আর ঘুরিতে হইবে না—আলোক অন্ধকারের দ্বন্দ্বখেলা আর খেলিতে হইবে না। তুমি মুক্তিলাভ করিবে।

সুরথ-সমাধি এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছেন এবং বরাবর থাকিবেন—কালে কালে, মানুষে মানুষে। আর্ত মানুষ—আর্তিপরিত্রাণের কামনায় সঙ্কটমোচনী মহামায়ার শরণাগত মানুষ, সুরথ-সমাধিকে চিরদিন মানসপটে ধরিয়া রাখিবে, তাঁহাদের উপাখ্যানালোকে নিজেদের পথ চলিবার প্রেরণা পাইবার জন্য, তাঁহাদেরই মতো মহামায়ার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া ভোগ ও অপবর্গ লাভ করিবার জন্য। ধর্মসঙ্গত ভোগ, অপবর্গের পথের অপরিহার্য ধাপ, কিন্তু চিরদিনই সেই ধাপকে আঁকড়াইয়া থাকাও মানুষের কর্তব্য নয়; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জগৎ-প্রহেলিকা—বা মায়া হইতে মুক্তির অন্বেষণ মানুষের পরমপুরুষার্থ—হিন্দুধর্মের এই মহৎ শিক্ষাটি দুর্গাপূজাবসরে চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে বার বার স্মরণীয়।

রূপ ও অরূপ

রূপ ও অরূপের রহস্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সকল কালের অধ্যাত্ম-সাধকের নিকট প্রচুর শিক্ষাবহ। রূপকে অবলম্বন করিয়াই তিনি ভগবানকে ভালবাসিয়া আসিয়াছেন—ভগবানের মাতৃরূপ। জাগরণে মা, শয়নে মা। সকল আশায়, সকল আকাঙ্ক্ষায়, সকল চেষ্টায় মা। মা ছাড়া চিন্তা করিবার কিছু নাই, ভালবাসিবার, পাইবারও কিছু নাই। কিন্তু জটাজুটধারী সন্ন্যাসীগুরু তোতাপুরী বলিয়াছেন, রূপকে বর্জন করিতে হইবে অরূপে পৌছিবার জন্য, বেদান্তপ্রতিপাদ্য নামরূপাতীত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য। জগদম্বারও আদেশ পাইয়াছেন, নিঃসংশয়ে অদ্বৈত-সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাই মায়েরই আদেশ পালন করিতে বসিয়া রূপ ভুলিয়া অরূপে মন নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। হয় না। পৃথিবীর অন্য যাহা কিছু রূপ হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসে, কিন্তু জগদম্বার বরাভয়করা হাস্যময়ী

মূর্তিকে দূর করা যায় না, রূপ অরূপের রাস্তা রোধ করিয়া দাঁড়ায়! বার বার চেষ্টা সত্বেও পারেন না, অসহায় অবস্থা গুরুকে নিবেদন করেন। তোতাপুরী একখণ্ড কাচের অগ্রভাগ দিয়া শিষ্যের ভ্রূ-মধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলেন, এই বিন্দুতে মন গুটাইয়া আন।

"তখন পুনরায় দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিমগ্ন হইলাম।"

(শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের উক্তি; শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ সাধকভাব, ১৫শ অধ্যায়)

প্রাণপ্রিয় ইষ্টমূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলা নির্মম অভিজ্ঞতা বই কি! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, তিনি যখন মায়ের উপর বিশ্বাস করিয়াছেন তখন মা তাঁহার মান রাখিবেন—তাঁহার যে হাত ধরিয়া আছেন উহা কখনো ছাড়িবেন না; তাই মায়েরই আদেশে মায়ের মূর্তি বিসর্জন দিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চাৎপদ হন নাই। জানিতেন, রূপ হইতে অরূপে যাইবার নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে, মায়েরই কাজে। কত যে প্রয়োজন ছিল তাহা উত্তরকালীনরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। রূপ হইতে অরূপে গিয়াছিলেন আবার অরূপ হইতে রূপে ফিরিয়া রূপ ও অরূপের তাদাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তো শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমন্বয়াচার্য। নহিলে একদেশদর্শী পথিকদের মতো তাঁহাকেও বলিতে শুনিতাম—'গাছের উপর গিরগিটিকে দেখিয়া আসিয়াছি; তাহার বর্ণ লাল বা হলুদ বা বেগুনী।' সে যে বহুরূপী—দিবসে নানা সময়ে নানা রঙ ধরিতে পারে, আবার কখনও বা কোন বর্ণ থাকে না, এ তত্ত্ব শুনিতে পাইতাম না। ইহাই সমন্বয়ের বাণী।

"যে সমন্বয় করেছে, সেইই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তমত—সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ। * * * বেদে যাঁর কথা আছে তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।"

(শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৫।১)

যে মায়ের মূর্তিকে একদিন নির্মমভাবে 'দ্বিখণ্ড' করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল পুনরায় সেই মূর্তিকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কাছে রাখিয়াছিলেন; পাইয়াছিলেন—বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা আরও নিবিড়তর ভাবে। পঞ্চবটীতে সন্ন্যাসী-গুরু ও সন্ন্যাসী-শিষ্য সারাদিন বেদান্ত-বাক্যের বিচার করিতেছেন—কিন্তু সন্ধ্যা আসিলে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের নেতি নেতি বিচারে ছেদ পড়িয়াছে। হাতে তালি দিয়া মায়ের নাম করিতেছেন। তোতাপুরী উপহাস করিয়া বলেন, আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো?—হাতে আটার গুলি পিটাইয়া পিটাইয়া যেমন রুটি গড়ে সেইরূপই যে করিতেছ দেখিতেছি, উহা আবার কিরূপ বেদান্তসাধনা? শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকে বুঝাইতে পারেন না, মা যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যে সর্প স্থির, সেই সর্পেরই তির্যক্ দেহগতি।

মা কিন্তু নিজেই তোতাপুরীকে বুঝাইয়াছিলেন, বুঝাইয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভাব পূর্বার্ধ, অষ্টম অধ্যায়) গ্রন্থে এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বনামরূপভেদ-বিকল্পাতীত অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—নামরূপ মায়ার প্রতিভাস মাত্র; পুরুষকারসহায়ে সেই প্রতিভাসকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মসত্যে সুস্থির থাকাই জীবনলক্ষ্য—ইহাই ছিল তোতাপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি। ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্মশক্তি মহামায়াকে মানিবার, আরাধনা করিবার কোন সঙ্গত স্থান নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল শারীরিক ব্যাধিতে ভুগিয়া এক গভীর নিশীথে নশ্বর দেহকে গঙ্গাগর্ভে

বিসর্জন দিবার সঙ্কল্পে সন্ন্যাসী জলে নামিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার পুরুষকার ব্যর্থ। জলে নামিলেই ডোবা যায় না। ডুবিলেও মরা যায় না। মহামায়ার ইচ্ছা না হইলে মরিবার উপায় নাই। এই সংসার মহামায়ার এলাকা—নিগুর্ণ ব্রহ্ম সেখানে অটল নিস্পন্দ শুইয়া আছেন মাত্র! মহামায়ার 'হাঁ' তে সব কিছু চলিতেছে, তাঁহার 'না' তে সব কিছু থামিতেছে। তোতাপুরীর লব্ধ শিক্ষা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় অনুপম ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন তত্রাচ ডুবজল পাইলেন না। ক্রমে যখন রাত্রির ঘন অন্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই। একি ঈশ্বরের অপূর্বলীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্য শক্তিমা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা। তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নিগুর্ণা মা!—এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তিভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্তিতে অবস্থিত! — ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!"

*　　　*　　　*

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রূপ ও অরূপের রহস্য বিশেষভাবে খ্যাপন করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া। নিরাকার উপাসনায় অভ্যস্ত এবং সাকার দেবতার পূজাদিতে অনাস্থাসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক অভাব দূরীকরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহার হইয়া ভবতারিণী কালীকে জানাইতে, যাহাতে তাঁহাদের পরিবারের আর্থিক অনটন দূর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন? * * মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন—তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন?" শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে মঙ্গলবার রাত্রে নরেন্দ্র কালীমন্দিরে গিয়াছেন। কিন্তু দেবীর সম্মুখে গিয়া সংসারের দুঃখকষ্টের স্মৃতি আর রহিল না। প্রার্থনা করিয়া আসিলেন—"মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।" শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়া বলিলেন,—"যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।" নরেন্দ্র পুনরায় গিয়া জগদম্বার নিকট ঐ একই প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনর্বার পাঠাইলেন, এবারও পূর্বঘটনার পুনরাবৃত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তা আমি কি কোরব?" নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিলেন, মায়ের গান শিখাইয়া দিন। 'মা ত্বং হি তারা'—এই মাতৃসঙ্গীত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে শিখাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ সারারাত ঐ গানটি ভাববিহ্বল প্রাণে গাহিয়া কাটাইলেন। পরের দিন জনৈক ভক্ত দ্বিপ্রহরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়া লক্ষ্য করিলেন তাঁহার ঘরে নরেন্দ্রনাথ শুইয়া আছেন এবং ঠাকুর নিজে একটি অপূর্ব আনন্দাবেশে নিজের খাটে বসিয়া রহিয়াছেন। ভক্তটি আসিলে শায়িত নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সোৎসাহে পূর্বরাত্রির ঘটনা বলিলেন এবং বালক যেমন নূতন কোন মূল্যবান সামগ্রী উপহার পাইলে উৎফুল্ল হয় সেইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বার বার ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?" রূপ ও অরূপের সমন্বয় সাধন না করিলে অধ্যাত্মজীবন সম্পূর্ণ হয় না; তাই, নরেন্দ্রের—ভাবী বিবেকানন্দের

জীবনে এই সমন্বয়ের পাতনিকা দেখিতে পাইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের অত পরিতৃপ্তি-বোধ! উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন,—"যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের জন্য এক একটি আলাদা ধর্ম থাকিত তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম।" অনন্ত মানব প্রকৃতি—তাই অনন্ত পথে পূর্ণতার অভিযান। ইহা কিছু অসমীচীন নয়। কিন্তু অসমীচীন—উহাদের যে কোনটির উপর কাহারও অসহিষ্ণুতা। প্রত্যেক মানবের ধর্মসাধনাকে সম্মান দান, শ্রদ্ধা করা তাহারই পক্ষে সম্ভব যে রূপ এবং অরূপ দুই এরই মর্ম উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাহাই করিবার আহ্বান আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা"

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

একটি আমের চারা পুতেছিনু জামগাছ তলে
নিতান্তই খেলিবার ছলে।
বহুবর্ষ পরে গিয়ে দেখি
দিব্য সে হয়েছে বড়, একি!
দুহাত বাঁকিয়া গিয়া আলোকের দিকে
তুলিয়াছে তার মাথাটিকে।
আজ—তাই ভাবি
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাবি॥

লতাটি লুটাত ভূমে, জামগাছ কিছু দূরে আছে
ঠিক তারে লক্ষ্য ক'রে চলিয়া তা উঠে সেই গাছে।
আজ তাই ভাবি
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাবি।
পাখী উড়ে যায় কত দূরে!
নিজের বাসাটি চিনে সন্ধ্যাকালে ঠিক আসে ঘুরে।
শুধু তাই কেন, শত যোজনের দূরস্থান হ'তে,
কপোত খপোত-সম বার্তা বহি আসে বায়ুস্রোতে।
ভাবি মোর জনমে বিস্ময়,
কে এদের দিল বুদ্ধি, পথ ভুল কভু ত না হয়।
দেখেছি কুকুরে
হাজার লোকের মাঝে চিনে ফেলে আপন প্রভুরে।

বিড়ালে ছাড়িয়া দিলে দশ ক্রোশ দূরে,
পূর্বস্থানে পথ চিনে পুন আসে ঘুরে।
আহত সৈনিকে বহি শত্রুব্যূহ চিরে
বাঁচাইয়া আনে অশ্ব তাহার শিবিরে।
ক্ষুধিত কেশরী
নিজ প্রাণদাতা সেই গোলামেরে যায় না পাশরি'।
ভাবি মোর জনমে বিস্ময়
কে এদের বুদ্ধি দিল, যোগাল হৃদয়।
সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে মহামায়া করেন বিরাজ,
এ শির প্রণত হয় তাঁহারি চরণ তলে আজ।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার

যিনি সর্বভূতে, সর্ব সময়ে বর্তমান, যাঁর স্থিতিতেই এই জগৎপ্রপঞ্চের অনুভূতি, তাঁর আবাহন, তাঁর পূজা, সর্বকালেই হতে পারে। তাঁর পূজার কালাকাল নেই, কেননা তিনি কালাতীত। মহাকাল তাঁর চরণ বক্ষে ধারণ করে নিশ্চল। তবুও আমরা দেখতে পাই, দেবীর শারদীয়া আবাহনের সময়েই সকলে বেশী উদ্‌গ্রীব, শিশু যুবা নরনারী সকলেই।

যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তিনিই যখন নিজ মায়ার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানবরূপে আবির্ভূত হলেন তখন তিনি অবতার উপাধিধারী শ্রীরামচন্দ্র। তখন তিনি 'মায়াধীন' বলেই প্রতীয়মান। মায়ার অধীনে থাকাকালীন তিনি ভেদজ্ঞানও মেনে নিয়েছেন। তখন তাঁর জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা, তিনি শক্তিহীন—শক্তি ও তিনি ভিন্ন। সেই জন্য যখন তাঁর অসুরাগ্রগণ্য তমোগুণাধিপ রাবণকে জয়ের প্রয়োজন হল, তখন স্বভাবতই তাঁর দরকার হল শক্তিসাধনার, মহাশক্তির কৃপালাভ, অর্থাৎ তাঁর নিজ দেহাধারে মহাশক্তির আবির্ভাবের। সেই জন্যই তাঁকে আরাধনা করতে হল মহাশক্তির সেই ভাবঘন রূপকে; যেরূপে সর্বব্যষ্টি শক্তি সমষ্টিভূত হয়ে, মহাসুর নিধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই ভাবঘন মূর্তিই শ্রীশ্রীদুর্গামূর্তি। মহাশক্তির সমষ্টিভূত এই মূর্তি। সেইজন্য দেখতে পাই, সর্বজ্যোতি ও সর্বকমনীয়তাপূর্ণ অতসীপুষ্প-বর্ণাভা, সর্বশক্তিকেন্দ্রীভূতা, সর্বৈশ্বর্যশালিনী, সর্বজ্ঞান ও সর্বসিদ্ধির সমষ্টিভূতা মায়ের এই অদ্ভুত রূপ। তাঁর সর্ব অঙ্গে, দশদিকপ্রসারিণী দশটি হাতে নানা অস্ত্রের সংযোজনা। যুগে যুগে যখনই অত্যাচারী অসুরকুল (অর্থাৎ তমঃশক্তি) দমনের প্রয়োজন হয়, তখনই মহামায়ার এই চণ্ডিকা শক্তিকেই উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকেনা। তাই শ্রীরামচন্দ্র আরাধনা করলেন মহাশক্তিকে এই দুর্গামূর্তিতে। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বে মহাশক্তির এই

মূর্তির আরাধনা করেছিলেন সুরথরাজা। তিনি পূজা আরম্ভ করেছিলেন বসন্তকালে। সেই হতে শ্রীরামচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বসন্তকালেই এ পূজার প্রচলন ছিল—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী আরাধনা করলেন শরৎকালে। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজাকে আমরা অকাল পূজা বলে থাকি। যাহোক, অকালে পূজা হলেও শ্রীরামচন্দ্র দেবীর প্রসন্নতালাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

যদিও বর্তমানে, চৈত্রমাসে বসন্ত ঋতুতে বাসন্তী দুর্গা ও আশ্বিন বা কার্তিক মাসে শরৎ ঋতুতে শারদীয়া দুর্গা এই দুটি পূজাই আমাদের বাঙ্গালা-দেশে হয়ে আসছে তবুও শারদীয়া দুর্গা পূজাই সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠার কারণ—শ্রীরামচন্দ্র এ পূজা অনুষ্ঠান করে সফলতা লাভ করেছিলেন, আর বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করে থাকেন। কিন্তু এ ছাড়াও শরৎ ঋতুতে পূজাযজ্ঞাদির প্রাধান্যের আরও এক কারণ বৈদিক-যুগের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া যায়। যেমন বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৪।১৬) আছে—"ইষশ্চোর্জশ্চ শারদাবৃতু"। বৈদিক যুগে 'ইষ' বলতে আশ্বিন মাস বোঝাত এবং 'ঊর্জ' অর্থে কার্তিক মাস। বৈদিক ঋষিরা শরৎঋতু বলতে এই 'ইষ' ও 'ঊর্জ' তথা আশ্বিন-কার্তিক মাস বুঝতেন। তাঁরা বলতেন 'শারদেন ঋতুনা দেবাঃ' অর্থাৎ শরৎকালই দেবতাদের (দেব ও দেবী দুই-ই) অর্চনা প্রশস্ত। সংবৎসরের ভিতর শরৎ ঋতুতেই এক সাম্য অবস্থা প্রকটিত হয়—বর্ষাধৌত পরিস্ফুট প্রকৃতি, নাতিগ্রীষ্ম নাতিশীত, জলাশয়াদি সামঞ্জস্যভাবে পূর্ণ, পথ-ঘাট কর্দমাক্তও নয় ধূলিধূসরিতও নয়, মাঠে মাঠে শস্যসম্ভার—এমন সময় মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আসে, তাই দেবীর আরাধনার উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে সকলে মেতে ওঠে—তাই এই উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে 'শারদোৎসব'।

এরপর আমরা আলোচনা করব এই পূজায় 'বোধন', 'সঙ্কল্প', 'আবাহন', 'পূজা নিবেদন', 'নিরঞ্জন' ও 'বিসর্জন' এবং বিসর্জনের পরে আচরিত অনুষ্ঠানগুলিতে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গি কি। আমরা দেখতে পাই দেবদেবীর যত ভাবের পূজার প্রচলন আছে, তার ভিতর একমাত্র দুর্গামূর্তি অর্থাৎ মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার সময়েই 'বোধনের' বিশেষ অনুষ্ঠান। 'বোধন' শব্দের অর্থ উদ্বোধন, উদ্দীপন, জাগানো। আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে, জগন্মাতার যে মূর্তির পূজায় এই শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়, সেই মূর্তির উদ্ভবের উৎস কোথায়? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাগণের তেজ ও শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি হতে রূপ পরিগ্রহ করলেন এক নারী মূর্তি, যথা—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

সমস্ত ব্যষ্টি শক্তি সমষ্টিভূত হয়ে, তা থেকে আবির্ভূত হলেন একটি মাত্র নারী মূর্তি। আমরা যে দুর্গা প্রতিমাতে অন্যান্য দেব ও দেবী মূর্তির সংযোজনা দেখতে পাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুর মর্দিনীর রূপ বর্ণনায়, তার কোনই উল্লেখ নেই। মনে হয়, এই মহাশক্তির অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উপস্থিতিকে, লোকচক্ষুর সামনে রূপ দেবার জন্যে ক্রমবিকাশ পর্যায়ে এগুলি সংযোজিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। প্রকৃতপক্ষে মহিষাসুর নিধনকালে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত একটিমাত্র মূর্তিরই উদ্ভব হয়েছিল, দেবতাগণের আহ্বানে—যে দেবতাগণ এই মহিষাসুর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। মহিষাসুর অর্থে তমঃশক্তি, দেবতাগণ অর্থে সত্ত্বশক্তি। মহিষাসুরের শক্তির উৎসও সেই একই মহাশক্তি—কিন্তু সীমাবিশিষ্ট মাত্র কয়েকটি ব্যষ্টি শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি। তথাপি এমনি শক্তিমান মহিষাসুর যখন সমস্ত জীবের কল্যাণকর দেবশক্তিকে পরাজিত,

দমিত করে জীবের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তমঃশক্তি প্রবল হয়ে পড়ে, তখন সেই শক্তিমানকে দমিত করবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই থাকতে পারে, যিনি মহাতেজসম্পন্ন সর্বব্যষ্টি-শক্তির সমষ্টিভূত আধার ও উৎস। মহিষাসুর শিবাংশজাত। কালিকাপুরাণে আছে, মহিষাসুর রম্ভাসুরের তনয় ও শিব অংশে তার জন্ম হয়। অপুত্রক রম্ভাসুরের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাকে পুত্রলাভের বর দান করেন। এই পুত্রই মহিষাসুর; শক্তিলাভের আশায় সে মহাশক্তির আরাধনা করে। দেবী প্রসন্না হয়ে যখন তাকে বরপ্রার্থনা করতে বলেন, তখন সে প্রথমে প্রার্থনা করে ত্রিভুবনের রাজত্ব (অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) এবং অন্তিমে দেবীর সাযুজ্য (অর্থাৎ সান্নিধ্য)। এহেন মহিষাসুর যখন মর্ত্য ও পাতাল জয়লাভের পর স্বর্গের দেবতাদের (সত্বশক্তি) পরাজিত ক'রে, ত্রিভুবনের ত্রাস সঞ্চার করতে আরম্ভ করল, যখন দেবতাদের ব্যষ্টিশক্তি বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ, তখন সেই শক্তিমান দুষ্ট মহিষাসুরের নিধনকল্পে দেবতাদের প্রয়োজন হলো ব্যষ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা। সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি-সমষ্টি থেকে যে মূর্তির উদ্ভব হল, তার তেজে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হয়ে গেল। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ঋষি বলেছেন :—

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াংত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরিটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥

(চঃ-২।৩৭-৩৮)

"—অনন্তর যাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁহার পদভরে পৃথিবী অবনত, যাঁহার ধনুকের জ্যা-শব্দে পাতাল পর্যন্ত (সপ্তনিম্নলোক) আকুলিত, যিনি সহস্রহস্তে (অনন্ত হস্তে) সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা এবং যিনি গগনস্পর্শী মুকুট পরিহিতা, সেই দেবীকে মহিষাসুর দেখিতে পাইল।"

শক্তিমান অসুরনিধনকল্পে যখন মহাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে, তাঁর পূজার্চনা দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা লাভের প্রয়োজন হয়, তখনই আবার দরকার হয় পূজকের নিজস্ব সুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাগরিত ও কেন্দ্রীভূত করবার দৃঢ় সংকল্প। অতএব এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে বোধন শব্দের অর্থ 'উদ্দীপন' বলা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। তাই মহিষাসুরমর্দিনী মহাশক্তির অর্চনায় প্রথমে হয় বোধন এবং পরে হয় সঙ্কল্প, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। শ্রীরামচন্দ্রও এই মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার্চনার মানসে শরৎকালে 'বোধন' করেছিলেন, সেই হেতুই এই শারদীয়া পূজাকে 'অকাল বোধন' বলা হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, মহিষাসুরকে বধের সময় মহাশক্তি আবির্ভূ'তা হয়েছিলেন দেবী দুর্গারূপে। শ্রীরামচন্দ্র এই দুর্গাদেবীরই আরাধনা ক'রে পূজা করেছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতীককে তখন তিনিও ভিন্নভাবে পূজা করেন নি। পুরাতন দুর্গাদেবীর বিগ্রহে কেবল দুর্গাদেবী ও মহিষাসুরেরই মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, মহিষাসুর যেখানে বধ হয়েছিল বলে প্রবাদ, এবং যার নামানুসারে মৈসুরু বা মহীশূর দেশের উদ্ভব সেখানে দেবী চণ্ডিকার যে মূর্তি চামুণ্ডী পাহাড়ে আছে তা কেবল মহিষমর্দিনী দুর্গার। শারদীয়া দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির কল্পনা ও সংযোজনার ক্রমবিবর্তন বোধ করি হয়েছিল বাঙ্গলাদেশেই; কারণ বাঙ্গালী দেবী দুর্গাকে আরাধনা করে পরম আত্মীয়াভাবে —স্বামী গৃহ হতে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা কন্যারূপে। সমস্ত বিভূতি পরিবেষ্টিত মহাশক্তিকেই সে কন্যারূপে দেখতে চায়, সেবা করতে চায়। বাঙ্গালীর পূজা-পদ্ধতির ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে এইটাই দেখা যায় যে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই বহুদিন পরে গৃহাগত আত্মীয়ের সেবা পরিচর্যার রূপই প্রকটিত

হয়ে ওঠে। বাঙ্গালী কল্পনা করে, দেবীর এক একটি বিভূতি যেন দেবীরই বিভিন্ন পুত্রকন্যার স্বরূপ—তাই মন্ত্রোচ্চারণ করে "সপরিবারায়ৈ শ্রীদুর্গায়ৈ বৌষট্।" এ মন্ত্র, এ ভাব চণ্ডীতে নেই—এ ভাবধারা বাঙ্গলারই বৈশিষ্ট্য। এই ভাবকে ভিত্তি রেখেই তাঁর আরাধনা, তাঁর পূজা—বহুদিন পরে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিতা পরম আদরের কন্যাকে নিয়েই তার আনন্দোৎসব। এমন কি পূজান্তে কন্যারূপিণী মহাশক্তির প্রতিমাটিকে বিসর্জনের আগে বরণ, মিষ্টি-পান-এলাচ প্রভৃতি খাওয়ানো, সিঁথিতে সিন্দুর-দান ও চরণ দুটি অলক্ত রাগে রঞ্জিত করা, স্বামী গৃহে গমন্মোন্মুখ কন্যার জননীর মত স্নেহভারাক্রান্ত কণ্ঠে কানে কানে "আবার এসো" বলে গালে চুম্বন-দানটি পর্যন্ত সবই পরম আত্মীয়ের ভাবে পূর্ণ। তাই দেখতে পাই কেন্দ্রীভূত মহাশক্তির এই প্রতিমাটির পূজান্তে যখন বিসর্জন দেওয়া হয়, জলের মধ্যে তখন সেই বিশ্বব্যাপী মহাশক্তিকে আবার বিশ্বমাঝেই বিলীন হয়ে যাবার ভাবটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেই জলের প্রতি বিন্দুর ভিতর মহাশক্তির স্থিতিকে উপলব্ধি করেই সেই জল সকলের উপর সিঞ্চন ক'রে শান্তি কামনা করা হয়, যেন এই মহাশক্তি সকলের ভিতর প্রবেশ করে, সকল অসুরশক্তি, অশান্তির উৎস তমঃ-শক্তিকে বিনাশ ক'রে দেন শান্তি। এই ভাবই তখন প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, আজ থেকে আমরা সকলে এক। তাই করি পরস্পরকে আলিঙ্গন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে করেন আশীর্বাদ, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে করে ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম। আমরা যেন সকলেই একই জননী থেকে উদ্ভূত, সকলে আমরা এক, ছোট বড়র ভেদ নেই—জাতিবিচার নেই—ধনী নির্ধন নেই—সকলেই আমরা একই মহাশক্তির আধারস্বরূপ। এ ভাবধারা, এ দৃষ্টিভঙ্গি আছে মাত্র বাঙ্গালীরই, অন্তরে বাঙ্গলার এইটাই বৈশিষ্ট্য। তাই বাঙ্গালীর ঘরে দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে হয় মহোৎসব।

কালো মেয়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাজিকরদের কুৎসিত এক মেয়ে,
দেখিলাম মোর দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে,
ম্লান মুখ—তবু, হাসি মোর পানে চেয়ে
হাত পেতে শুধু একটি পয়সা যাচে।
দেখিয়া তাহার মুখ,
স্নেহেতে ভরিল বুক,
লাগিল বড়ই ভালো,
দেখিনি তো হাসি হেন—
দেবের দেউলে যেন,
কালো প্রদীপের আলো।

সুধার প্রলেপ দিয়ে গেল মোর চোখে,
কুশ্রী বলিতে এখন লাগে যে ডর।
জগৎ এখন দেখি তার ছায়ালোকে
কিছুই আমার লাগে না অসুন্দর।
বরাহ, কমঠ, মীন—
রূপে কেহ নহে হীন,
পুণ্য ওরূপ কি না?
যে রূপ স্বয়ং হরি—
ধরেছেন কৃপা করি,
তাহাকে কে করে ঘৃণা?

বিশ্বজননী যিনি ভুবনেশ্বরী,—
কখনো ষোড়শী, কভু তিনি ধূমাবতী,
কত ভাবে আহা, কত রূপ র'ন ধরি
তাঁরে অবজ্ঞা করে—যার দুর্মতি।
সোহাগে মাখায়ে রঙ
মেয়েকে সাজান সঙ
তা দেখিতে জমে ভিড়।
হাসি. সুধাব্ধি তীরে
'মুলিয়া'র সাজে ফিরে
সুতা সম্রাজ্ঞীর।

কুৎসিত রূপ ভুলায় আমার মন
স্নিগ্ধ এবং শুচি করে মোর আঁখি।
ও মোর মায়ের প্রসাদী যে অঞ্জন
জলে ভরে চোখ—অবাক হইয়া থাকি।
কাহারে বলিব পর ?
কাহারে অসুন্দর ?
মুখ নাই বলিবার।
যত করি অভিমান,
আমরা তো সন্তান
কালো কুৎসিত 'মা'র।

বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা*

স্বামী নিখিলানন্দ

ভারতীয় কৃষ্টির সৃজন ও সংরক্ষণে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আজিও ভারতবর্ষে জাতীয় মহাবীররূপে গভীর শ্রদ্ধা যাঁহারা পাইয়া থাকেন তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ও দার্শনিকগণই। ভারতীয় জীবনধারার প্রত্যেকটি দিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"আমি একজন নগণ্য সত্য-সন্ধানী। আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই এই সত্যের দর্শনের জন্যই নিয়োজিত আছে। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় কোন ত্যাগকেই আমি খুব বেশী মনে করি না। সামাজিক, রাজনৈতিক বা মানবপ্রেম ও নীতিজ্ঞান বোধে আমার জীবনের যত কিছু কার্য, সবই ঐ একই লক্ষ্যে অগ্রসর।" বর্তমান ভারতের অন্যতম দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—"ত্যাগ ও সেবাই ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ। ভারতীয় জীবনকে এই ধারাদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহিত কর, অন্যান্য যাহা কিছু আপনা হইতেই সফল হইয়া উঠিবে। আধ্যাত্মিকতার পতাকা এই দেশে যত উচ্চেই তোল, উহা বাড়াবাড়ি মনে হইবে না। আত্মিক সত্যেই প্রকৃত মুক্তি।" পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণের দ্বারা, অথবা বর্তমানকালে স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির যাহা অবদান তাহা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই। আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আদিমকালেও হিন্দু চিন্তানায়কগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম যুক্তি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ-ধ্যানের দ্বারা তাঁহারা মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দুইটি চিরস্থির সত্যকে আবিষ্কার করিয়া 'আত্মা' ও 'ব্রহ্ম' নামে

* এশিয়ার সমস্যাবলী-সম্পর্কিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত লিখিত বক্তৃতার অনুবাদ। অনুবাদক—শ্রীনবশঙ্কর রায়চৌধুরী।

অভিহিত করেন। পরে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু। হিন্দুদের 'দর্শনে' এই চরম সত্যকে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া উপলব্ধি করার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। আর তাঁহাদের 'ধর্মে'র লক্ষ্য হইতেছে কতকগুলি অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে এই তত্ত্বের অনুভব ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ। সাধারণ মানুষের জন্য হিন্দু দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের সত্যতা কখনও অস্বীকার করিতে বলেন নাই। এই কারণেই দেখি, পার্থিব বিষয় সমূহ—নীতিশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিরও সবিস্তার অনুশীলনে তাঁহারা প্রভূত উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্মকে বুঝিতে গেলে 'ধর্ম' শব্দটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ইহার ভাবার্থ অতি গভীর ও ব্যাপক। অনেক সময়ে কর্তব্য, পুণ্যশীলতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা—এই সকল আখ্যায় উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির পূর্বতন কর্ম অনুসারে যখন তাহার 'ধর্ম' নিরূপিত হয়—উহাই তখন 'কর্তব্য'। উচ্চতর বিকাশের জন্য এই 'কর্তব্য' মানুষকে অবশ্যই করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার অন্বেষণ অপেক্ষা কর্তব্যবোধ ও বাধ্যবাধকতাই মানুষের সামাজিক ব্যবহার বেশী নিয়ন্ত্রিত করে।

বর্ণপ্রথা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও আদর্শের পরিকল্পনা হইতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, হিন্দুধর্ম মানুষের সাংসারিক ব্যবহারকে চরম ও পরম সত্যের উপলব্ধিতে প্রয়োগ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ হইতেছেন ইহার স্রষ্টা, ক্ষত্রিয় ইহার রক্ষাকর্তা আর বৈশ্য ইহার বিস্তারকর্তা। শূদ্র নিজ দৈহিক শক্তির দ্বারা এই সংস্কৃতির সংরক্ষণে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সমাজের এই চারিটি বর্ণের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। ন্যায়দৃষ্টিই উহাদের নিয়ন্তা। সত্যের উপর ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্ণপ্রথা অতএব ন্যায় ও সত্যে অধিষ্ঠিত। যদিও অধুনা এই প্রথা অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, তথাপি এই বর্ণবিভাগ মানুষের সমাজকে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া একদিন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী সামাজিক কর্তব্যবোধের দ্বারা সাম্যপ্রাপ্ত করা হইয়াছিল।

সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনকে চারটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিদ্যাভ্যাস, দ্বিতীয় পর্যায়ে সংসার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন, তৃতীয় পর্যায়ে সংসারের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চিরন্তন সত্য সমূহের অনুধ্যান। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে মানুষ একটি নির্দিষ্ট পরিবার ও সমাজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অখিল বিশ্বকেই গৃহ জানিয়া পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষের চারিটি জীবনাদর্শ হইতেছে কর্তব্যপরায়ণতা (ধর্ম), অর্থ, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি (কাম) এবং শেষে জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত ভোগ দ্বারা একদিন মানুষ অতিক্রম করিতে পারে। হিন্দুদর্শন সংসারকে অস্বীকার করে না, উহাকে অধ্যাত্ম সত্যে স্থাপন করে। ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে বিশ্বসংসারের সসীমতাকে অতিক্রম করিয়া উহার সহিত তাদাত্ম্যলাভ।

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে নৃপতিগণ যখন সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতেন, তখন উহা মুক্ত, সৃজনক্ষম ও গতিশীল ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর ইহার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। সেই সময় সমাজ ও তৎব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কতকগুলি অনমনীয় নিয়মাদি ও অনুষ্ঠানের দ্বারা তখন সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ধর্ম তখন কেবল

মতবাদে এবং দর্শন বাক্‌সর্বস্ব তর্কশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সাধুসন্তগণ কালে কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইংরেজ জাতির ভারতবর্ষ বিজয়ের পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজীর মাধ্যমে যখন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন ধর্মের ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ সমাজসেবাকে ধর্মের অঙ্গরূপে প্রচলিত করেন। বিদ্যালয়গুলিতে পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিপ্রধান বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ভারতসংস্কৃতির অনুরাগিগণ হিন্দুশাস্ত্রসকল ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া যুবকদের সহজবোধ্য করিয়া গেলেন। ধর্মও পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক ধারায় অধ্যয়ন করা হইতে লাগিল। ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুভূতিসমূহকে যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইতে লাগিল। ফরাসী বিপ্লবের বাণীগুলি সমাজের একটি আমূল পরিবর্তন, বিশেষতঃ স্ত্রী ও নিম্নশ্রেণীর উপর অবিচার বিলোপের দাবী লইয়া উপস্থিত হইল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ভারতবাসীর মনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একদল লোকে হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রূপান্তরিত করিতে চাহিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের অন্য এক অংশ সনাতন প্রথা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে চাহিয়া পাশ্চাত্ত্যের সম্পর্কিত সমস্ত কিছু বর্জনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু একটি তৃতীয় দল পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সাহায্যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের বিশিষ্টতা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া তিলক, রাণাডে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত বর্তমান ভারতের নির্মাতাগণের অনেকেই এই দলভুক্ত। প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্রাবকের সাহায্যে ইঁহারা বর্তমান হিন্দুধর্মের যাহা খাদ তাহা নষ্ট করিয়া উহার উজ্জ্বল সার বস্তুকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ, রমণ মহর্ষি এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ অনেকগুলি ধর্মক্ষেত্রের চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের অবতারপুরুষরূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মনুষ্যসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর-উপাসনার উপর জোর দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে, খালিপেটে ধর্মসাধনা অসম্ভব।

সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন অভিব্যক্তিকে কখনও আক্রমণ করে নাই। অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের ন্যায় লৌকিক বিজ্ঞানও বহুকাল হইতে সমান শ্রদ্ধায় অনুশীলিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান ভারতের ধর্মনেতাগণ বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষাকে অবহেলা করেন নাই। ইহা স্পষ্ট যে, এইগুলি ছাড়া ভারতবর্ষের অভাব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং সামাজিক পশ্চাদ্‌-বর্তিতা দূর করা সম্ভব হইবেনা। শত শত বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে, দুর্লঙ্ঘ্য কর্মফলেই তাঁহারা দুর্দশায় পতিত রহিয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহা সত্য নয়; পার্থিব জীবনের সঙ্গত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আজ তাই তাঁহারা সচেষ্ট।

পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে সুষ্ঠু ভাবধারার আমন্ত্রণে আগ্রহশীল হইলেও সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণ কোন বিরোধী ভাবধারার ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের অপচেষ্টাকে সহ্য করিবে না। অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের শিখিবার অনেক কিছু আছে। যে জাতি শিক্ষাগ্রহণে পরাঙ্মুখ সে তো মৃত জাতি। কিন্তু ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট ভিক্ষুকের মতো দাঁড়াইবে না। বহিঃপ্রাপ্ত পার্থিব বস্তুনিচয়ের পরিবর্তে তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ বিনিময় করিবে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান

ও মুসলমান আছেন। ধর্মান্ধতার সর্ব প্রকার আশঙ্কা নিরসনের জন্য ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, ভারতবর্ষ নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির পরিপোষক। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের জন্য নাগরিক অধিকারে কোন তারতম্য থাকিবে না—ভারতীয় সংবিধানে ইহা জোর করিয়া বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রধানতম। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান পৃথিবীতে সমাদৃত আদর্শগুলি যথা—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিকসাম্য প্রভৃতির সহিত ভারতে ধর্মের কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই। হিন্দু-ধর্ম বরং ঐ সকল আদর্শের ভিত্তি দান করিয়াছে। বেদোক্ত আত্মার দিব্যসত্তাই গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ। সমন্বয়ের আদর্শই বিশ্বভ্রাতৃত্বের সোপান। বিশ্বসংসারের একতারূপ বৈদান্তিক আদর্শের দ্বারাই নৈতিক গুণাবলীর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। নিজের ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভারত-বর্ষকে তাহার ঋষিমুনিগণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা জীবন ও জগতের জড়বাদীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

আগমনী-বিজয়াসংগীত ও বাঙলার গার্হস্থ্যচিত্র

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বসু, এম্-এ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ

অপরাপর প্রাচীন সাহিত্যের মতো আমাদের প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মের প্রভাব। এই প্রভাব হইতে প্রাচীন যুগের কবিগণ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ও উদ্দীপনা। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কাব্যপ্রবাহ মঙ্গল-কাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, নাথসাহিত্য প্রভৃতি বাঁধাধরা খাতে প্রবাহিত হইতেছিল। উল্লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল স্বর্গের দেবতা—মর্ত্যের মানুষ নহে। দেবদেবীর মহিমা কীর্তন ও ধর্মের জয়গানের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছিল ধূলার ধরণীর রক্তমাংসেগড়া মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা ও আশানৈরাশ্যের কাহিনী। কবি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই কাব্যিক ধারা অপ্রতিহত-গতিতে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল।

ভারতচন্দ্রের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙলায় কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় না। দেশে তখন চলিতেছিল এক-প্রকার অরাজকতা। কলঙ্কমাখা পলাশীর আম্রকাননে বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশে পররাজ্যলোলুপ বিদেশী বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অরাজকতার দিনে যাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহারা কবি নহেন—কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকার। বাঙলার সহজ সরল পল্লীবাসীরা কর্মক্লান্ত দিবসের অবসরে তাঁহাদের রচিত গানগুলির রস উপভোগ করিয়া চিত্তবিনোদন করিত। কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা যেমন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়া মান, বিরহ, সখিসংবাদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদরচনা করিতেন, তদ্রূপ রচনা করিতেন সুকুমার মানবিক সম্বন্ধ প্রকাশক শাক্ত পদাবলী। শাক্ত পদাবলীর একটি বিশিষ্ট শাখা—আগমনী ও বিজয়া সংগীত। আগমনী ও বিজয়া সংগীত এবং

তাহাদের উৎস আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের রচিত গানগুলি বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি অনবদ্য অবদানরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। সন্ধানী পাঠকমাত্রেরই জানিবার কথা যে, বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের প্রেরণা পশ্চিম হইতে নূতন আমদানি করা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর মহিমাকীর্তনের পাশে পাশে যে মানবিক সুরটি অস্পষ্টভাবে অনুরণিত হইতেছিল তাহা পরবর্তীকালের কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের গানে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাবে স্পষ্টতমরূপে মাইকেল মধুসূদনের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিল। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—বাঙলা কাব্য কুঞ্জের পিকোপম চণ্ডীদাসের কণ্ঠনিঃসৃত এই বাণীই নবযুগের সাহিত্যিক আদর্শরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তাঁহাদের রচিত আগমনী এবং বিজয়াসংগীতে মানবিক সুরটি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং এইগুণেই গানগুলি চিরকালই বাঙলার দরদী মানুষের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত হইতেছে। বাৎসল্যরসের প্রেরণায় অভিভূত হইয়া কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা জগজ্জননীকে মায়ের আসন হইতে নামাইয়া মেয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই গানগুলি পুরাতন বাঙ্‌লার সমাজের নিরক্ষর পল্লীবাসীদিগকে যুগপৎ আনন্দ এবং শিক্ষা দিয়াছিল। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি তৎকালীন বাঙলার গার্হস্থ্যজীবনের হর্ষবিষাদময় কাহিনী হইতে সংগৃহীত উপাদানে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্‌লার সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবনের বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, কন্যার পিতৃগৃহে আগমন ও পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের চিত্র এইগানগুলিতে বাস্তব ও প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। কোথায়ও কৃত্রিমতার আবরণ ও কৃত্রিম আভরণের চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক পরিকল্পনার সহিত বাঙলার জননীর বৎসলতা মিশাইয়া স্বকীয় প্রতিভার সাহায্যে বাঙলার গার্হস্থ্যচিত্রের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এই গানগুলির সার্থক রূপদান করা হইয়াছিল। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথিরায় প্রভৃতি আগমনী ও বিজয়াসংগীত রচয়িতাদের উদ্ধৃতি আলোচনা করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙলার তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল বাল্যবিবাহ। সংসারানভিজ্ঞা কিশোরী তনয়াকে পতিগৃহে বিদায় দিয়া বাঙালী জননী কখনও সজলনয়নে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, কখনও বা নিশীথরাত্রে স্নেহের দুলালীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অশ্রুজলে শয্যাপ্রান্ত সিক্ত করিতেন। এই গার্হস্থ্যচিত্রেরই ছায়া অবলম্বনে রচিত হইয়াছে আগমনী গানের ভূমিকা। শরৎকালের রাত্রিশেষে মাতা মেনকা রাজকন্যা, অধুনা শিবের গৃহিণী উমাকে স্বপ্নে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন,—

"আমি কি হেরিলাম নিশিস্বপনে
গিরিরাজ ! অচেতনে কতনা ঘুমাও হে ॥
এই এখুনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা
গেল হে।"
(কমলাকান্ত)

তনয়াবিশ্লেষের ব্যথায় ব্যথিতহৃদয়া বঙ্গজননীর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হয়, আসে বৎসর। বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার কন্যাকে পিতৃগৃহে আনিতেই হইবে—ইহা লইয়া পিতামাতার মধ্যে সাময়িক কলহও সংঘটিত হয়। অবশেষে কন্যাকে আনিবার জন্য মাতা পিতার নিকট জানান কাতর প্রার্থনা। এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি আগমনী-গানেও চিত্রিত হইয়াছে। সংবৎসরান্তে উমাকে

জামাতার গৃহ হইতে আনিতে হইবে—এই বিষয় লইয়া গিরিরাজ ও মেনকার মধ্যে ঝগড়া বাধে। স্নেহাভিভূত মাতা মেনকা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের যাতনায় কাতর হইয়া উমাকে আনিবার জন্য অনুরোধ করেন গিরিরাজকে। কিন্তু পিতৃহৃদয়ের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বাঙালী পিতা যেমন তনয়াবিরহকাতর জননীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, তদ্রূপ গিরিরাজ ও বিরহবিহ্বলা মেনকাকে বুঝাইয়া বলেন —"কন্যা আমার স্বামীর সহিত পরমসুখে আছে, সুতরাং মনকে সান্ত্বনা দাও, ধৈর্যহারা হইওনা।" কিন্তু মায়ের প্রাণ শুধু কথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে কি? কন্যা বিত্তশালী স্বামীর হস্তে পরিলেও যে মায়ের হৃদয় অকারণ অমঙ্গল আশংকায় অস্থির হইয়া পড়ে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও সতীনের সংসারে পড়িলে তাহা যে অধিকতর উদ্বেল হইয়া পড়িবে ইহা আর বিচিত্র কি। আগমনীগানে এই চিত্রেরও ছায়া সুপরিস্ফুটরূপে অংকিত হইয়াছে। জামাতা শিব একে তো নিঃস্ব, তদুপরি তিনি সতীন গঙ্গাকে মস্তকোপরি স্থান দিয়াছেন। জননী মেনকার চিত্ত তাই কন্যার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে।

"গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥"

(কমলাকান্ত)

কোমলপ্রাণা বঙ্গ-জননীর অশ্রুসজল করুণ প্রার্থনা যেমন কঠিনপ্রাণ পিতা উপেক্ষা করিতে পারেন না, তেমনই মেনকার মিনতি কঠিন গিরিরাজকেও আর্দ্রপ্রাণ করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহার অশ্রুজলের পুরস্কার মিলিয়াছে,—

"তখন গিরি যায়, আনিতে গিরিজায়।
দুনয়নে বহে বারি, বলে উমা আয়লো আয়॥"

প্রতিবেশীর মুখে কন্যার আগমনবার্তা শুনিয়া প্রতীক্ষমাণা বাঙালী মা আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন না। আলুলায়িতকুন্তলা বিস্রস্তবসনা জননী পথে অগ্রসর হইয়া যেমন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়া কন্যাকে বরণ করিয়া লন, সেইরূপ আগমনীসংগীতে জননী মেনকাও—

"শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রানী,
বসন না সম্বরে।
গদ্‌গদ্ ভাবভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে
পাছে করি গিরিবরে
অমনি কাঁদে গলা ধরে॥"

(রামপ্রসাদ)

দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মাতাকন্যার অশ্রুসিক্ত এই করুণ মিলনের মধ্যে সময়ের দীর্ঘব্যবধানের ভিতর একবারও তাহাকে পিতৃগৃহে আনিতে পাঠায় নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়া কন্যা মাতার উপর অভিমান প্রকাশ করে এবং ইহাও জানাইয়া দিতে সে ভুলেনা যে, সে দুইদিনের জন্য আসিয়াছে এবং দুইদিন পরে চলিয়া যাইবে। মেনকা এবং উমার এই মান-অভিমানের চিত্রের ভিতর দিয়া তৎকালীন বাঙলার সাংসারিক চিত্রটি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কই মেয়ে ব'লে আনতে গিয়েছিলে।
তোমার পাষাণপ্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
রব না, যাব দুদিন গেলে॥"

পিত্রালয়ে কিছুদিন থাকিতে না থাকিতেই জামাতার ডাক আসিয়া পড়ে। তাহার উপর মাতাপিতার কোন জোর নাই। "অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব।" বিবাহের পর কন্যা পর হইয়া যায় - এই কথা বাঙালী মা বুঝিয়াও বুঝেন না। জননী মেনকার কথায় ও গার্হস্থ্যধর্মের এই করুণ ও মর্মান্তিক দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।"

(রামপ্রসাদ)

দশমী তিথিতে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা কল্পনা করিয়া বাঙলার জননীর ন্যায় উমাজননী মেনকা অধীর হইয়া বলেন—

"আর তোরে পাঠাব না
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারু কথা শুন্‌ব না।
আমরা মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া
জামাই বলে মান্‌ব না॥" (কবিরঞ্জন)

কিন্তু যতই ঝগড়া করুন না কেন কন্যাকে শেষপর্যন্ত পাঠাইতেই হয়, আর এই বিদায়ের প্রাক্কালে জননীর প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠে। মাতা মেনকা উমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

"আমার প্রাণ উমা,
আজ কি যাবি গো কৈলাসপুরে।
আজ কি মা যাবি ছেড়ে হিমালয় শূন্য করে॥"

অনন্যোপায় হইয়া মাতা শেষে মনে মনে বলেন,—"ওরে নবমী-নিশি না হইও রে অবসান।" অথবা

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে॥"
(মধুসূদন)

কিন্তু মাতার কাতর প্রার্থনা ও মিনতিসত্ত্বেও নবমীর নিশি প্রভাত হয় এবং দশমী তিথিতে স্নেহের দুলালীকে বিদায় দিতে হয়।

আগমনী ও বিজয়াসংগীতের করুণ মানবিক আবেদন আজও বাঙালীর নিকট অব্যাহত রহিয়াছে। শরতের শিশিরসিক্ত সোনালী প্রভাতে শিউলিঝরা পল্লীপথ দিয়া পথিক যখন আপনমনে গাহিয়া চলে—"গা তোল, গা তোল মাগো, বাঁধো কুন্তল"—তখন কোন্ বাঙালী জননীর মন দূরদেশবাসিনী কন্যার মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল না হয়? আবার বিজয়া দশমীতে কোন্ বাঙালী মা-ই বা আপন তনয়ার আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত না করেন? বাঙলার গার্হস্থ্য-চিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত এই গানগুলির প্রভাব বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনে আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ এম্-এ, ডি-লিট্

জাভা ও বলীদ্বীপে গিয়েছিলাম ১৯২৪ সালে। আবার ত্রিশ বছর পরে সেদিন ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শন করে ফিরলাম। ১৯২৭ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ দেশে গিয়েছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি যে তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী লেখেন তার নাম দেন "দ্বীপ-ময় ভারত।" অর্থাৎ সেখানে দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য যা কিছু তার বেশীর ভাগ ভারতীয় সভ্যতা—দ্বীপে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। বিজয়ী ওলন্দাজগণ এ ব্যাখ্যা পছন্দ করবেন না এবং এখন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার মানুষও ভারতের প্রভাব অতটা মানতে রাজী নন। তার কারণ আছে। হিন্দু বলীদ্বীপ ও লম্বক দ্বীপে আজও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য) সভ্যতা—বহু প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকলেও ভারতবাসীদের কাছ থেকে তারা সাহায্য কমই পায়। সংস্কৃত ভাষা তাদের দেবভাষা কিন্তু সে ভাষা শিখাবার উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষক ও পাঠ্য-পুস্তকাদি পাঠাবার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা এ পর্যন্ত

ভারতে করা হয়নি। অথচ পাকিস্তানীদের আবির্ভাব ও মসজিদ-নির্মাণাদি বলীদ্বীপে সুরু হয়েছে এবার দেখে এলাম। তার উপর ডলার-ছড়ান মার্কিন "টুরিষ্ট" দল ও খৃষ্টান মিশনারীরা ত আছেনই। ভারতীয় ব্যাপারী বলীদ্বীপে কম, (যবদ্বীপে ও সুমাত্রায় বেশী) তবু তাঁদের সাহায্যে একজন পাঞ্জাবী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও মন্ত্রপাঠাদি বলীদ্বীপের ছেলেমেয়েদের শিখাচ্ছেন এবং ভারতের নেতাদের সাহায্যে ক্রমশঃ এক বৃহত্তর ভারত কেন্দ্র (নামকরণ হয়েছে "ভুবন সরস্বতী") গড়ে উঠবে এই আশা আছে। বলীর পেতাণ্ড বা পণ্ডিতবংশের এক ছাত্র শান্তিনিকেতনে পাঠ শেষ করে দেশে ফেরেন এবং তাঁর ইচ্ছা আবার ভারতে এসে একটি বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব মানুষ ও নীরব কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে এসে এবার মনে হল উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশবাসীদের এই আবেদন জানাই যে, তাঁরা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন; আর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা যে, তাঁরা ইন্দোনেশিয়ায় (প্রথম রাজধানী জাকর্তা—Jakarta) কেন্দ্র স্থাপনের উৎসাহ দিন। জাকর্তা ও সুরবায়া প্রভৃতি সহরে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আছেন, তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে এবং সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশন এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানকার বিচক্ষণ এক কর্মীকে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠালে কাজ হবেই—এ আশা রাখি। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি-শিক্ষায় বলীদ্বীপের হিন্দুদের বিশেষ আগ্রহ এবং গ্রামে গ্রামে মন্দিরগুলি কেন্দ্র করে পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি—তাঁরা করে চলেছেন। এসব বিষয়ে ভালরকম গবেষণা করে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি রচনা করতে পারেন এমন সুযোগ্য যুবককর্মী যেমন পাঠান দরকার তেমনি সহানুভূতিশীল জনকল্যাণব্রতীদেরও পাঠান চাই। প্রায় ১০।১৫ লক্ষ হিন্দু এ অঞ্চলে আছেন এটা মনে রেখে কাজে নামতে হবে।

কিন্তু কঠিন সমস্যাও আমাদের সামনে, সেটা চাপা দেওয়া চলবে না। পূর্ববঙ্গ যেমন (mass conversion এর ফলে) আজ পাকিস্তানের কুক্ষিগত, তেমনি বিরাট ইন্দোনেশিয়ার ৮৫ মিলিয়ন মানুষ সভ্যতায় হিন্দু হলেও ধর্মে প্রধানতঃ মুসলমান। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় masjumi নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে ইসলাম রাষ্ট্র গঠন করতে প্রবল চেষ্টা করছে এবং প্রেসিডেণ্ট Soekarno-র ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ অতি সুস্পষ্ট। এই দল আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম রাষ্ট্র অনিবার্য। খৃষ্টান (সাদা ও অ-সাদা) কয়েক লক্ষ মাত্র—তাঁরাও প্রটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক্ দলে বিভক্ত—সুতরাং দুর্বল। পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ-মন্দির Borobudur মধ্য জাভার মধ্যমণি; এত বিরাট স্থাপত্য ও অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন ভারতেই মেলে না। তাই জাভার জনসাধারণের মধ্যে বহু বৌদ্ধ যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা যেন ঐতিহাসিক পরিহাসের ফলে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ"! Census-বিভাগ তাদের বৌদ্ধ বলে না লিখিয়ে শতকরা ৯০ জনের মত "মুসলিম" বলে পরিচয় দেয়। অথচ এশিয়ার স্বাধীন বৌদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যথা বর্মা, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতির রাষ্ট্রদূতগণ এ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের প্রকাশ্যে বৌদ্ধ বলে Census এ নাম তুলতে সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে সিংহল ও বর্মার দূত, স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে Borobudur মন্দিরে বুদ্ধ জন্মতিথি বৈশাখে পালন করতে সুরু করেন; সে ত বহু শতাব্দী পরে—গত দুই বছর পালিত হচ্ছে। কিন্তু স্থায়ী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শাক্যমুনির ২৫০০ বর্ষ-পূর্তি উৎসবের আয়োজন অবিলম্বে করা উচিত। ব্রহ্মদেশ শ্যাম-কাম্বোজ সিংহল প্রভৃতি দেশে বহু অর্থব্যয়ে উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এখন ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করে Borobudur

মন্দিরে উৎসবাদির জন্য ভারত থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা উচিত। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি (Bengal Buddhist Association, 1, Buddhist Temple Road, Bowbazar P.O.) সম্প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এই শুভ প্রচেষ্টায় দেশবাসীদের পূর্ণ সহযোগ দিতে অনুরোধ করি। কারণ উদারনৈতিক রাষ্ট্রপাল Soekarno এ বিষয়ে তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য দান করবেন ; তিনি গত ডিসেম্বর মাসে Prambanan এর বিরাট শৈব মন্দিরটির পুনর্নির্মাণের পর উদ্বোধন করেন। এবার মধ্য জাভার সেই মন্দির দেখে এলাম—এরই ভিত্তিগাত্রে আগাগোড়া রামায়ণের প্রস্তর-খোদিত চিত্রাবলী হাজার বছর আগে (৯ম শতকে) রচিত হয়েছিল। ভাস্কর্য শিল্পে সেগুলি অতুলনীয়—ভারতের কোন মন্দিরেই এমন অপূর্ব রামায়ণ চিত্র মেলে না। শিব মন্দির ছাড়া ব্রহ্মা বিষ্ণু দুর্গা নন্দী প্রভৃতির মন্দির ধ্বংসপ্রায়—সেগুলির সংস্কারাদির ব্যবস্থা শীঘ্র হওয়া উচিত—যদিও সেকাজ বহু ব্যয়সাপেক্ষ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (Archaeological Survey) থেকে আমরা কতটুকু সাহচর্য করতে পারি সেটাও ভাবা দরকার। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে হয়ত ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নূতন প্রাণ ও প্রেরণা লাভ করবে। সিংহশারীর যে মন্দির আমাদের কোনার্কের সমকালীন, সেই মন্দির—Surebaya থেকে এবার দেখলাম। মনে পড়ে গেল বুদ্ধের অধ্যাত্ম জননী প্রজ্ঞাপারমিতার প্রস্তরমূর্তি এখান থেকে সরিয়ে ডাচ্ কর্তারা Leyden চিত্রশালায় রেখেছেন (হলণ্ড ভ্রমণের সময় দেখে এসেছি)। সেই অপূর্ব মূর্তিখানি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় ফেরৎ পাঠাবার দাবী করা উচিত · যেমন ইংলণ্ড ভারতে ফেরৎ দিয়েছেন বুদ্ধশিষ্য শারীপুত্র ও মোগ্গলায়নের "শরীর"। স্থাপত্য ভাস্কর্য ছাড়া সংগীত নাট্য নৃত্যাদি লোক-সংস্কৃতির কত অমূল্য উপাদান আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে প্রায় ১৫০০ বছর ধরে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ সমধর্মী ও সহকর্মীরূপে কাজ করে এসেছে—সে যেন এক অলিখিত মহাকাব্য! শূরকর্তা ও যোগ্যকর্তার সুলতান মহোদয়দ্বয় ১৯২৪ সালে আমাকে তাঁদের অতিথি করে যে রামায়ণ মহাভারতাদির অভিনয় দেখিয়েছিলেন তা' জীবনে ভুলতে পারব না। প্রতি বৎসর তাই ভারতীয় বন্ধুদের অনুরোধ করি 'বিলাত-ভ্রমণ' কিছুদিন স্থগিত রেখে ইন্দোনেশিয়া—তথা এশিয়ার দেশগুলি পরিদর্শন করে কৃতার্থ হোন্। যাঁদের কাছে আমাদের নাড়ীর যোগ তাঁদের উপেক্ষা করে ভুলে থেকে হিন্দুজাতি ও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়েছে—সেটি সত্য ও সুদৃঢ় করতে যেন পরাঙ্মুখ আমরা না হই। ভারতের বাইরে ৫০ লক্ষ নরনারী "বৃহত্তর ভারত"-পরিবারের অন্তর্গত, এ ঐতিহাসিক চেতনা জাগ্রত হোক এই শেষ নিবেদন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের গোড়ার কথা

অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

"যত মত তত পথ"—রামকৃষ্ণদেবের এই কথাটি আজিকার যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ। ইহা ধর্মমতের উদারতা সম্বন্ধে চরম ঘোষণা। আজ মনে হইতে পারে যে ইহা কি এমন মহান্ শিক্ষা যাহাকে বিপ্লবাত্মক বলিয়া স্বীকার করিব? কিন্তু মধ্যযুগে বহুদেশের মানুষ ইহা স্বীকার করিতে চাহে নাই।

সে যুগে ধর্মের জন্য কত যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। কত নিরীহ মানুষকে ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে বলিদান করিতে হইয়াছে। আজ ভারতবর্ষে নানা ধর্ম-সম্প্রদায় বসবাস করে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে সাম্প্রদায়িক কলহ প্রায়ই হইত। স্বাধীনতার পরেও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং, আজ স্বাধীন ভারতের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেবের ঐ বাণীটি উদারতার সমুন্নত বাণী। আজ বিনা দ্বিধায় তাঁর এই অমর বাণী গ্রহণ করিতে হইবে। সব ধর্মই ভাল। সব ধর্মেই মুক্তি আছে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীগণ অনুদার ভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, উহারা বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এমন পথ ধরিয়া চলিয়াছিল যে, তাহাতে মনে হইত যে, ইহাই বুঝি চিরন্তন ব্যবস্থা। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব ও রেশারেশি চিরন্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব যে আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

আজ রাজনীতি ভারতের হিন্দু মুসলমানকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, রাজনৈতিক পার্থক্য একেবারেই কৃত্রিম। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবাদ হয়, আবার তাহা মিটিয়াও যায়। তাহা চিরকাল জাগিয়া থাকে না। তেমনি একই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইয়া থাকে। দেশে আরও নানা কারণে দলাদলি হইয়া থাকে। কিন্তু এইসব ঝগড়া বিবাদ সাময়িক ব্যাপার, চিরন্তন ব্যবস্থা নয়। এইসব তিক্ততার অন্তরালে প্রবাহিত হইতে থাকে একটা মানবিকতা, একটা ঐক্যের ধারা। আর এই ঐক্যধারাই চিরকালের বস্তু। এইটি ধরিতে পারিলে সব ভেদজ্ঞান ও কলহ দূর হইয়া যায়।

বাস্তবিকই রাজনীতি হইতেছে একটা পথ, পথের শেষও নহে, উদ্দেশ্যও নহে। আমাদের পূর্বতন নেতারা ও দেশকর্মিগণ এই রাজনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতি জীবনের সর্বস্ব নহে। রাজনীতিরও গভীরে যে ধর্মীয় আদর্শ আছে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি আমরা একটা সুগঠিত জাতি গঠন করিতে চাই, তবে রাজনৈতিক দাবীদাওয়া অতিক্রম করিয়া আরও গভীর দেশে প্রবেশ করিতে হইবে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব হইতে সত্যকার মিলনের ভিত্তি রচিত হইবে। প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় তাহার নিজের যে সব মৌলিক আদর্শ, বিশ্বাস ও ধারণাকে প্রিয় মনে করে অপর ধর্মসম্প্রদায়কে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে হইবে। এই ভাবে যখন ধর্মগত বিদ্বেষ দূর হইবে, তখন সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে খাঁটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর "যত মত তত পথ" শিক্ষার দ্বারা এই কথাটার উপরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এযুগে তিনিই সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের রাজনৈতিক সমাধান করিতে চাওয়া অর্থে গোড়া কাটিয়া ডালের অগ্রভাগে জল দিয়া চারাটিকে বাঁচাইতে যাওয়া। ইংরেজ আমলের কিছুদিন হইতেই আমাদের দেশের অনেকের মনে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধটা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি এই থিওরীর উপর আমরা জোর দিয়াছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে সাম্প্রদায়িক দল উপদল গঠনের চেষ্টা করিয়া ছিলাম। এইভাবে আশা করা গিয়াছিল যে, এই স্বাতন্ত্র্যবোধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিবে, কিন্তু আমরা এই পথে শক্তি সঞ্চয় করিতে গিয়া আরও নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্টি করিয়াছি—যাহার পরিণতি ভারত-বিভাগ। সাংস্কৃতিক দিক দিয়া আমরা যদি

প্রথম হইতে সৌহার্দ্য ও মিলনের কথা চিন্তা করিতাম তবে এ দুর্গতি হইত না। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য গঠন কর্মকে Revivalism বলা চলে না। Revivalism একটা অনুদার প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা সৃষ্টি করে কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠনের কর্মপরিক্রমা বিপ্লবাত্মক আদর্শ—ইহা মানুষের মনকে অগ্রগতির পথে লইয়া যায়, পশ্চাতের দিকে নহে।

সাতশত বৎসর ধরিয়া ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন সাধকের সাধনার ফলে যে সাংস্কৃতিক মিলন ধীরে ধীরে হইয়া আসিতেছে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হইতেছে সেইসব ঘটনা ও বিষয়কে লোক সমাজের নিকট তুলিয়া ধরা। বৃটিশ আমলে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। আমরা যদি তাহা না করি, অথবা তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি তবে তাহা নিতান্ত ভুল হইবে। পাঠান মোগল যুগের শিল্পী কবি সাধকগণের প্রভাবে যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল, সেগুলিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে নূতন করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। সেই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাকে লইয়া কবিতা, নাটক, উপন্যাস রচনা করিতে হইবে। কিন্তু এ সবের মধ্যে থাকা চাই একটা সহানুভূতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ।

স্থায়ী ভিত্তির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে হইলে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিভেদকারী উপাদান যতদূর সম্ভব বর্জন করা প্রয়োজন। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারতবর্ষ সকল মতের সঙ্গে আপস করিতে জানে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন, "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" অন্য কোন দেশে এই আপস (adjustment) এর ব্যবস্থা নাই। অতীত কালে আর্য অনার্য দ্রাবিড় হুন শক, গ্রীক প্রভৃতি কালচারকে ভারত আপন উদার বক্ষে ধারণ করিয়াছে। শুধু ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই। সবই ভারতের এক দেহে লীন হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যেমন—পাঠান মোগল তুর্কি প্রভৃতি জাতি—তাহারাও ভারতের সহিত এক হইয়া এমন কালচার সৃষ্টি করিয়াছে যাহার অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে কালচারের সমন্বয় ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য কালচারকে ভারতবর্ষ একেবারে বর্জন করে নাই। স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শাসন-তন্ত্রে পাশ্চাত্য কালচারের নিদর্শন চিরকালের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। এই সব সাংস্কৃতিক নিদর্শনকে বর্জনে কৃতিত্ব নাই—কৃতিত্ব আছে ইহাদের সমন্বয়ে নূতন ভারত রচনায়। আমাদের সম্মুখে বৃহত্তর ও কঠিনতর দায়িত্ব আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহাকেই পূর্ণ পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়াই আমাদের যুগের প্রধান কাজ। ইহাতে আমাদের ভারতীয়ত্ব নষ্ট হইবে না, বরং বৃহত্তর ভারতের ভিত্তি রচিত হইবে।

এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে পূর্ণ রূপ দিবার জন্য আজ ভারতের সম্মুখে মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। ভারত বিভক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও আজ ভারত যেরূপ সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত পূর্বে কখনও সেরূপ ছিল না। উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত এই যে বিরাট ভূভাগ যাহা একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত, এরূপ সুগঠিত ভারত পূর্বে ছিল না। আজ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশের, উত্তর হইতে দক্ষিণের দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হইয়াছে —একই শাসনতন্ত্রের অধীনে একই সিভিক আইন

অনুসারে সকলেই নিয়ন্ত্রিত। আজ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত নহে। একদেশ হইতে অপর দেশের যাতায়াতের পথ সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে। বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিতে প্রস্তুত। ভারতের সহিত নিখিল বিশ্বের মানসিক সংযোগ স্থাপিত হইতেছে। আজ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় একই বিদ্যালয়ে একই ধরনের পাঠ্য পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় ভাষা হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাইয়াছে। এই এক ভাষা সমগ্র ভারতকে এক করিতে সাহায্য করিতেছে। চতুর্দিকের আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সকল মানুষের মনকে সমানভাবে দোলাইয়া দিতেছে। সামাজিক সুবিচার সম্বন্ধে সকলেই একই ভাবধারার বশবর্তী। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সমগ্র দেশের উপর একটা নবজীবনের স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। নূতন সমাজব্যবস্থার রচনার ইহাই উপযুক্ত সময়। সমগ্র এসিয়া, সমগ্র জগত ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া আছে এই নবযুগের নূতন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ কি করে তাহাই দেখিবার জন্য। সকল সম্প্রদায়কে লইয়া সকলের সমন্বয়ে নূতন ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে।

এই সম্মিলিত ভারতের আদর্শ রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহামানবগণ নিজেদের জীবন-দর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমাদের চোখের সামনে গান্ধীজী তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে কয়েকবারই উপবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে জীবনদান করিতে হইল। কিন্তু তবুও দেশবিভাগ বন্ধ হইল না। সাম্প্রদায়িক প্রীতিও আশানুরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল না। এইরূপ ব্যর্থতার কারণ কি? সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহের কোন অভাব হয় নাই। অভাব ছিল পদ্ধতির। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে প্রীতির পথের সকল বাধা দূর হইতে পারে সে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। বিভেদের কারণগুলি দূর না করিয়া কেবল রাজনৈতিক আপস রফার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যদি পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস থাকে, একে অপরকে যদি ভাল করিয়া চিনিতে না পারে তবে কিছুই হইবে না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাইতে হইবে। রাজনৈতিক নেতাগণ রাজনৈতিক পদ্ধতির দ্বারা যাহা পারেন নাই সাংস্কৃতিক আবেদন দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাগণ এদেশের অতীত ইতিহাসের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আদর্শ সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই যে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয় হইয়া আসিতেছে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাহার কি গুরুত্ব ও মূল্য থাকিতে পারে সে সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করেন নাই। আর একদল লোক আছেন যাঁহারা পুরাতন সংস্কৃতিকে উদ্ধার করিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাঁহারা সংস্কৃতির নামে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির কথাই বুঝেন। একদিকে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সংস্কৃতি-সমন্বয়কে গ্রাহের মধ্যেই আনেন নাই, আবার অপরদিকে প্রাচীন সংস্কৃতির নামে রক্ষণশীলগণ সংস্কৃতিকে একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরই স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এখন দরকার হইয়াছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করা। সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াই পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারিবে। সেই মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে সর্বাগ্রে। ভারতে

রামকৃষ্ণমিশনের কর্মিগণ সর্বধর্মসমন্বয়ের যে আদর্শ প্রচার করেন তাহা জাতীয় ঐক্যের সহায়ক। আমাদের এই স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, Race, ধর্ম, সম্প্রদায় সবই রহিয়াছে। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের সকলের স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করিয়া কোন লাভ নাই। বরং ইহাদের সকলকেই সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেককে তাহার সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। এই সবকে একীভূত করিবার জন্য আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনের দরকার। ভারতে সাধারণ ঐতিহ্য আছে যাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা জনের নানা চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ উৎসব পালপার্বণ আছে যাহা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বহু ঐতিহাসিক নজীর আছে যাহা সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি। হিন্দুমুসলমান মিলিত হইয়া দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে এবং একত্র হইয়া সকলের সাধারণ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে। সম্রাট আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহনের সময় পর্যন্ত বহু বিষয়ে এই দুই সম্প্রদায় একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়াছে। আর রামানুজ, দাদূ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকগণ কত উদার-ভাবে সমন্বয় ও ঐক্যের আদর্শকে রূপ দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশে যে মাতৃভাষাকে হিন্দু মুসলমান সমভাবেই সেবা করিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে তাহা উভয় সম্প্রদায় দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। পাঞ্জাবী, হিন্দী, উর্দু, বাঙ্গলা, আসামী ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু এইসব ভাষা সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রধান বাহন। একই ভাষা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধকে অনেকটা দূর করিয়াছে ও একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মানসিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করিয়াছে। এইসব ঐক্যের উপাদানের উপর জোর দিতে হইবে। সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের চরিত্রকে সহানুভূতির ভাব লইয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শের ভিত্তির উপর আবার আমাদের সাধারণ কালচার বা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপরোক্ত মহাসাধকগণ একদিক দিয়া বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ট্রাডিসনের নামে অতীত-পূজার মোহ ছিলনা। তাঁহারা নিজেদের বৈপ্লবিক আদর্শসম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহারা উন্নত জীবনের মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। গতানুগতিকতার মোহ তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে নাই। ক্ষুদ্রতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহারা জীবনকে পৃথকভাবে দেখেন নাই। তাঁহাদের মতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক—সবই ছিল একটা বেগবান জীবনবোধের বিকাশ। তাই দেখি যে পণ্ডিত ও মৌলবী অপেক্ষা তাঁহারাই সমাজের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ও চেতনার ভাব জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ভাবাদর্শের জন্য আবুল ফজল মহাভারতের ফার্সি অনুবাদের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন: "সত্য অনুসন্ধান করিতে হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থগুলি অপর সম্প্রদায়ের পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে মিথ্যা ধারণা দূর হইবে, নৈকট্য স্থাপিত হইবে এবং সত্যসন্ধানে অগ্রসর হইবে। তাহারা যখন পরস্পরের ভালমন্দ গুণাগুণ দেখিতে পাইবে তখন আপনা হইতেই তাহাদের মনে উদারতার ভাব জাগ্রত হইবে।" আর এই ভাবাদর্শের ফলেই সে যুগের বহু হিন্দুসাধক ও মুসলমান অপরাপর ধর্মসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। পরস্পরকে ভালভাবে বুঝিতে হইবে—সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইহাই বড় কথা। এই উপলব্ধির অভাবে সমস্ত রাজনৈতিক আপস-ব্যবস্থা পণ্ড হইয়া যাইবে। যদি এই আদর্শ অনুসারে আজিকার মুসলমানগণ গীতা

উপনিষদ্ পাঠ করে এবং হিন্দুগণ কোরআন, হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে তবে তাহাদের অনেক ভ্রম দূর হইবে—মুসলমান দেখিবে যে হিন্দুধর্ম ইসলামের মূলনীতির বিরোধী নহে। আর হিন্দুও বুঝিবে যে ইসলামের সহিত তাহাদের ধর্মের বিশেষ পার্থক্য নাই। এই ভাবে এমন একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় হইবে যাহার ভিত্তি কিছুতেই শিথিল ও দুর্বল হইবে না।

আয় মা

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

সূর্যকরোজ্জ্বল শ্যামল ধরণীতল
শারদ-জননি তোরে চায় মা !
ধানক্ষেতে ঢেউ তুলে, পুষ্পিত বনফুলে
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !
শুভ্র মেঘের পালে আয়রে,
নিশির শিশির—মৃদু বায় রে,
গুঞ্জিতা ভ্রমরের শোন্ তান গুঞ্জন,
ঐ শোন্ বিহঙ্গ গায় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

ঐ নীল অম্বরে কত নীল রং ঝরে,
সুহাসিতা শ্যামলিতা পৃথ্বী,
দুল্ দুল্ কাশফুল, ঝুম্‌কা দোদুল দুল,
শেফালি-আঁচলে শোভে মূর্তি।
মন্দিরে বাজে মহাডঙ্কা
দূর করি' যত ভয়-শঙ্কা,
দিকে দিকে, আগমনী-আনন্দ-শিহরণ
শানা'য়ের শত সুরে লায় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

আসিয়াছে ভাই-বোন হেথা-হোথা অগণন
সদা আকুলিত হৃদি-চিত্ত,
নাই ধনী, নাই দীন,—মাতোয়ারা নিশিদিন
ঢালে জীবনের স্নেহ-বিত্ত।
আনন্দময়ী তুই তাই যে,
তুই বিনা গতি কিছু নাই যে,
আশা নাই, ভাষা নাই,—আছে শুধু অনশন
দৈন্যের নিপীড়ন হায় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীরূপে আয়,
আন্ প্রাণে আন্ দৃঢ় ভক্তি,
অস্ত্রের ঝঞ্চনা তোল্ তুই ঘোরাননা,
বাহুভরা দুর্জয় শক্তি।
শত্রুবিনাশে লভি' অংশ
শত্রুরে কর্ আজ ধ্বংস,
নৃত্যের তালে যাক্ ঘুচে পাপ-আচরণ,
অন্ন দে ! অন্ন দে'—আয় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

পৌষপার্বণ তথা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হিন্দুদের—বিশেষ করিয়া পল্লীবাসীদের নিকট একটি বিশেষ পবিত্র দিবস। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপিতামহ দক্ষিণায়নে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু ভীষ্মের ইচ্ছাধীন ছিল; সেজন্য তিনি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। "সূর্য যখন উত্তর দিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন, তখন আমার প্রিয় সুহৃদতুল্য প্রাণ ত্যাগ করব।" (মহাভারত—শ্রীরাজশেখর বসু) এই সংকল্প করিয়া তিনি যুদ্ধে পতিত হইয়াও শরশয্যায় বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি শরশয্যায় অবস্থান করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায় ও রাজ্যশাসন নীতি সম্পর্কে সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ সমাগত হওয়ার পর ভীষ্ম দেহরক্ষা করেন। পল্লীর হিন্দুরা আজও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পুণ্য দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

ভীষ্মের দেহত্যাগে মাতা ভাগীরথী শোকে অধীর হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সরোদনা ভাগীরথীকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। আজও সেই পুণ্যদিবসে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে শত শত ধর্মপ্রাণ যাত্রীর বিপুল সমাগম হয়। সেখানে যাত্রীরা কপিল-মুনিও দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের সকল প্রান্ত হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যকামী স্নানার্থী সেখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

"গীতগোবিন্দ"-রচয়িতা অমর বৈষ্ণবকবি জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তি দিবসে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে বিরাট মেলা বসে। সেদিন শত সহস্র হিন্দু অজয় নদে প্রত্যূষে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। প্রবাদ আছে, সেদিন অজয় নদেও গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। বাউল, কীর্তন ও অন্নসত্রের জন্য এই মেলা বিখ্যাত। আটশত বৎসর পূর্বে জয়দেব মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু জয়দেবের মেলা প্রতিবৎসরই মহাসমারোহে আজও সংঘটিত হয়।

কেন্দুবিল্বের একাধিক মন্দিরে মর্মর শিলার উপর জয়দেব রচিত বিখ্যাত কবিতা—"স্মর-গরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্" ভক্তপ্রাণে আজও স্পন্দন জাগায়। কিংবদন্তি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পদটি পূরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার একটি পল্লীতে আমার পিতৃগৃহ ছিল। ছেলেবেলায় আপন পল্লীতে পৌষপার্বণের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ জীবনে সেরূপটি দেখিবার আশা নাই বলিলেও চলে। মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও সেখানকার পল্লীর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনস্রোত কতখানি বেগবান ছিল, হিন্দুর বার মাসের তের পার্বণ কত না জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত, আর উৎসবসমূহকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার পল্লীর সামাজিক জীবন কতখানি স্পন্দিত হইত, তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে আজ অনুভব করা সহজ নয়। আজকাল শহরে নগরে সার্বজনীন পূজাপার্বণের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু পল্লী-উৎসবের সার্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার

* এই প্রবন্ধে পরিবেশিত রেখাচিত্রগুলি আঁকিয়াছেন শ্রীসুখময় মিত্র।

জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মোটেই হইত না। উৎসব সমাগমে সকলের প্রাণমন স্বতই আনন্দে নাচিয়া উঠিত। পল্লীজীবন এখন পারতপক্ষে কাহাকেও আকর্ষণ করে না, আর শ্রীহট্ট জেলার হিন্দুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনও দ্রুত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে যাঁহারা শহরে দেশান্তরে বাস করিতেন, তাঁহারাও উৎসব পর্বাদি উপলক্ষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন। পল্লীজীবন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিত।

শ্রীহট্ট জেলার যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেখানে বর্ষার জল নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ফসল ধান কাটার কাজে পল্লীবাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিত। বাড়ীর উঠান ও ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট মাটিতে লেপন করিয়া করিয়া ধান রাখার উপযুক্ত করিয়া তুলিত। গোলা-ঘর মেরামত করিত। ধান কাটা শুরু হইলে, দিনের বেলা ধান কাটা, রাত্রিবেলা মাড়া দেওয়া, পরদিন রৌদ্রে ধান শুকানো, রাত্রিবেলা আবার মাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে গৃহস্থগণ বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। এসকল রীতি ঐ অঞ্চলে এখনও বলবৎ আছে, কিন্তু নাই কেবল পল্লীজীবনের পূর্বেকার আনন্দের হিল্লোল।

অগ্রহায়ণে ধান উঠিয়া গেলে আর পৌষমাস সমাগত হইলেই পল্লীর ছেলেরা 'গুলী' বাহির করিত। বন্দুকের গুলী নয়, খেলার গুলী। সর্বজন প্রিয় গুলীখেলা সুরু হইলেই পৌষ সংক্রান্তির উৎসবের বাণী সকলের মনে পৌঁছিত। সংক্রান্তি দিবসের কর্মসূচী এইরূপ ছিল:—প্রাতঃস্নান, ভ্যাড়াঘর পোড়ানো, গুলীখেলা ও নগর সংকীর্তন। স্বতঃস্ফূর্ত সেই উৎসবের স্মৃতি আজও মনকে আলোড়িত করে।

শীতারম্ভে স্থানীয় কুমোরেরা হাঁড়ি পাতিলের সঙ্গে তিন হইতে চার ইঞ্চি পরিধির উৎকৃষ্ট মাটির গুলী তৈরি করিয়া রাখিয়া দিত। পল্লীর খেলোয়াড়ের দল ছিল এই গুলীর গ্রাহক। আধুনিক খেলার ন্যায় গুলী খেলার নিয়ম কানুন ছিল। যতজন খেলোয়াড়, ততগুলি গুলীর প্রয়োজন হইত। গুলীখেলার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, সংখ্যায় যত খুশী লোক খেলায় যোগ দিতে পারিত। খেলোয়াড়ের দল সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতিযোগিতা করিত। বিজোড় অর্থাৎ অতিরিক্ত খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও বাদ দেওয়া হইত না। তাহাকে উভয় পক্ষেই খেলিতে দেওয়া হইত। মুদ্রা-নিক্ষেপ,—মুদ্রার অভাবে হাঁড়ি পাতিলের ভাঙ্গা টুকরা নিক্ষেপ করিয়া কোন্ দল প্রথম খেলিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইত।

সমকোণী লম্বাকৃতি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র খেলার স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। লম্বা ও চওড়া নির্ভর করিত উপযুক্ত ভূমির উপর। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একদিকে মাটির উপর একটি চৌকোণ চার পাঁচ ইঞ্চি বাহু বিশিষ্ট ঘর আঁকা হইত। ইহাতে দ্বিতীয় দলের গুলী বিশেষ আকারে স্থাপন করা হইত। সীমানার বিপরীত রেখার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম দলের খেলোয়াড়েরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের গুলী ছুড়িত। এই গুলী ছোড়াকে "গুলী গাওয়া" বলা হইত। গুলী গাওয়ার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিত দ্বিতীয় দলের গুলী ঘরের যথাসম্ভব নিকটে যাওয়া। গাওয়া গুলী স্থির হইলে একই পর্যায়ে বসিয়া দ্বিতীয় দলের গুলিকে মারিতে হইত। এইভাবে গুলী মারিয়া নির্দিষ্ট সীমানা পার করিতে পারিলে "গোল্লা" হইত। গোল্লাকে আজকালকার ভাষায় পয়েন্ট বলা যাইতে পারে। গুলী খেলার বহু বিধি ও অনুশাসন ছিল; যেমন এক পক্ষের এক জনের গুলী অন্য পক্ষের কোন গুলীর অতি নিকটে চারি আঙুল মধ্যে অবস্থান করিলে "ব" বলা হইত। একবার 'ব' হইলে ইহা ভাঙ্গিবার বিধি ছিল। 'ব' না ভাঙ্গিয়া খেলা চলিত না। বিপক্ষদলের মারা

গুলী সীমানার নিকটে আসিয়া থামিলে "যাদ্দু" অথবা "চুম্‌কা" হইত। গুলীর স্থান হইতে জোড়পায়ে লম্ফ দিয়া সীমানায় পৌঁছিলে যাদ্দু হইত। যাদ্দুর গুলী মারিতে হইলে দুই পায়ের গোড়ালির মধ্যে গুলী রাখিয়া 'গুলী গাহিতে' হইত। চুমকা স্থিরীকৃত হইত অন্যভাবে। চুম্‌কার গুলী মারিতে হইত খেলার মাঠের বিপরীত দিক হইতে এবং তাহা প্রায় কঠিন হইত। গুলী গাহিবার সময় বিশেষ কবিতা ব্যবহার করা হইত। যেমন—

"গুলীরে ভাই, ঘরের কাছে যাইতে চাই।"

মারিয়া ভাঙ্গিতে পারিলে অমনিই একটা পয়েন্ট হইত। কোন কোন খেলোয়াড় বিপক্ষের গুলী ভাঙ্গিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতেন। পল্লীর বয়োবৃদ্ধেরা খেলার মাঠে উপস্থিত থাকিয়া খেলোয়াড়-দিগকে উৎসাহ দান করিতেন। খেলার নিয়মে কোন সঙ্কট দেখা দিলে বয়োবৃদ্ধেরা তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। পৌষসংক্রান্তি দিবসে গুলীখেলা চরম পর্যায়ে পৌঁছিত। সেদিনকার খেলার জন্য প্রচুর নূতন গুলী আমদানি করা হইত। বয়োবৃদ্ধেরাও সেদিন খেলার উৎসবে যোগ দিতেন।

সংক্রান্তির পর গুলীর মরসুম শেষ হইয়া যাইত। গুলীর মালিকেরা মৃত্তিকামধ্যে গুলী পুতিয়া রাখিতেন। ইহাতে নাকি গুলী শক্ত থাকিত। আবার পর বৎসর পৌষমাস সমাগত হইলেই পুরাণ গুলী মাটির নীচ হইতে বাহির করিয়া খেলা আরম্ভ করা হইত। গুলীখেলা এখনও হয়ত কোন কোন পল্লীতে বাঁচিয়া আছে কিন্তু, সংক্রান্তির গুলীখেলার উৎসবে ভাটা পড়িয়াছে।

ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর প্রথাও সেই অঞ্চলে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ কখন ভ্যাড়াঘর-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা জানা সহজ নয়। উত্তরায়ণ-সমাগমে অগ্নিদ্বারা আলোকের আহ্বান বা শীতাবসান ঘোষণা করাই হয়ত ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল। ঋতু-উৎসব বহুদেশেই বিদ্যমান দেখা যায়। স্কান্‌ডিনাভীয় দেশসমূহে 'লুৎসিয়া' উৎসব অনেকটা এই ধরনের বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঁশের খুঁটি ও ঠাট এবং ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়া দ্বারা ভ্যাড়াঘর নির্মিত হইত। আমাদের জলাদেশের ধানগাছ স্বভাবতই বড় হইয়া থাকে। বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান-গাছও যেন সাঁতার কাটে। ধান কাটার পর গাছের যে অংশ (বৃহত্তম নিম্নাংশ) ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তাহাই ন্যাড়া নামে অভিহিত হয়। ধান-সিদ্ধ করিবার জন্য কৃষকেরা জ্বালানিরূপে ন্যাড়া ব্যবহার করিয়া থাকে। খড়ের অভাবে অসমর্থেরা ঘরের চালেও ন্যাড়া ব্যবহার করে। ভ্যাড়াঘরের জন্য পল্লীর যুবকদল প্রচুর ন্যাড়া সংগ্রহ করিত।

সংক্রান্তির পূর্বদিবস প্রতিঘরেই অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিত। নারীরা বাসনপত্র বিশেষ-ভাবে পরিষ্কার করিতেন, ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়া নিকাইয়া তকৃতকে করা হইত। উঠান ও তুলসীতলা নিকাইয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত করা হইত। পুরাতন রান্নার মাটির বাসন ফেলিয়া নূতন বাসন সেদিন ব্যবহার করা হইত।

ভ্যাড়াঘর নির্মাণে ও গুলীখেলার মাঠ পরিষ্করণে তরুণ ও যুবকদের দল সংক্রান্তির পূর্বদিবসে মাতিয়া উঠিত। পল্লীবাসীর বাঁশঝাড় হইতে ঘনগাঁট-বিশিষ্ট কাঁচা বাঁশ কাটিয়া আনা হইত। কেহ কেহ 'মুক্তা' সংগ্রহ করিত। মুক্তা একজাতীয় বেতগাছ —আমাদের অঞ্চলে জলাভূমির নিকটে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বাঁশ-মুক্তা-সংগ্রহ ও গুলীখেলার মাঠের পরিষ্করণ স্নানের পূর্বেই সারিয়া ফেলা হইত। স্নানাহারের পর আবার সকলে কাজে মত্ত হইয়া উঠিত। কেহ দা লইয়া বাঁশ কাটিত, কেহ বা বাঁশ 'কাস্তাইত'—(খুঁটির মাথা V আকারে কাটাকে বাঁশ কাস্তান বলা হয়),—যাহাতে মারুলের বাঁশ বসিতে পারে। কেহ খন্তা দ্বারা খুঁটির উপযোগী গর্ত করিত। বাঁশের কাঠামো শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়ার কাজ হাতে হাতে সমাধা করা হইত। প্রবল উৎসাহে কাজ চলিত। পল্লীর বালকের দলও সেদিন ভ্যাড়াঘর নির্মাণের কাজে সহায়তা করিয়া আত্ম-গৌরব বোধ করিত। ভ্যাড়াঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঘরের মেজের উপর ন্যাড়া বিছাইয়া চাটাই দেওয়া হইত। এই ভ্যাড়াঘরে সারারাত্রি 'বাউলা' গানের আসর বসিত।

প্রথানুযায়ী তামাকু সেবনও সারারাত্রি চলিত। বাউলা গায়কদের কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন করিতেন। বোধ করি সেজন্য বয়োবৃদ্ধেরা বালকদিগকে বাউলাগানের আসরে যাইতে দিতেন না। পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে সমগ্র পল্লীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলিত। নারীরা পাকালের (চুল্লী) নিকটে



পৌষপার্বণের পূর্বরাত্রে 'ভ্যাড়াঘরে' বাউল ও কীর্তনগানের আসর

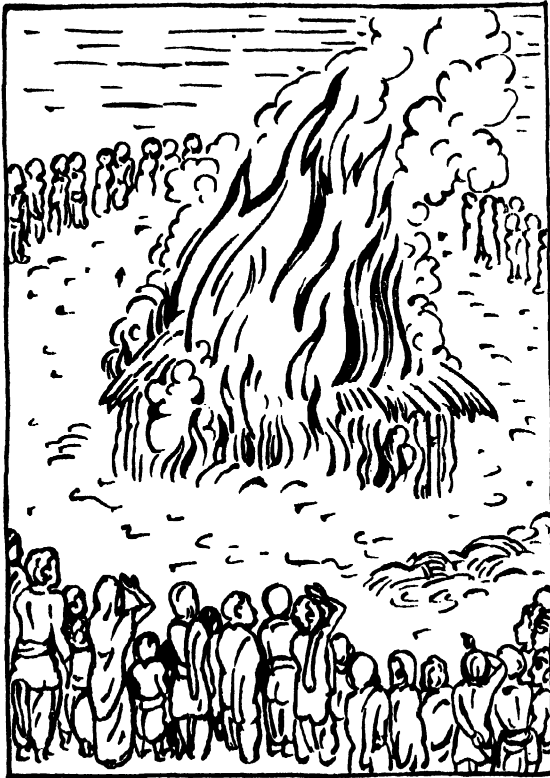
বাউলের গানকেই আমাদের অঞ্চলে বাউলা বলা হয়। এই আসরের জন্য চাঁদা তুলিয়া প্রচুর আহার্যবস্তু সংগ্রহ করা হইত। ফলের মধ্যে শ্রীহট্টের কমলা, উক্‌রা (খইয়ের মুড়কি), কদমা, বাতাসা ইত্যাদি সকলে উপভোগ করিত। তাছাড়া পল্লী-

বসিয়া পিষ্টক, লাড়ু ইত্যাদি উৎসবের আহার্য তৈরী করিতেন।

বাউলাগানের আসরে লাউয়ের একতারা, খঞ্জনি, ঢোল ও করতাল সহযোগে গান চলিত। প্রথমে 'তিন্‌নাথের' গুণ গাওয়া হইত। তিন্‌নাথ—

ত্রিনাথ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ত্রিনাথ শব্দের অর্থ—যিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিন কালের অধিপতি। রাত্রি অবসানের কিয়ৎকাল পূর্বে গানের আসর ভাঙ্গিয়া যাইত। চাটাই সরাইয়া ভ্যাড়াঘর প্রচুর অতিরিক্ত ন্যাড়ায় পূর্ণ করিয়া সকলে ঘরে ফিরিত।

আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। অরুণোদয়ের পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাড়াঘর পুড়াইবার পর্ব শেষ করিয়া পুরুষের দল গুলী খেলার মাঠে সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীর চন্দ্রমোহন নামক একজন উৎকৃষ্ট গুলী-খেলোয়াড়কে সত্তর বৎসর বয়সেও ঐ দিনের গুলীখেলায় যোগ দিতে দেখিয়াছি।



"দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা আকাশে বিস্তারলাভ করিত......"

আমরা অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই স্নান করিতাম। স্নানান্তে পরিস্কার কাপড় ও শীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সকলে ভ্যাড়াঘরের নিকটে জড় হইতাম। তারপর ভ্যাড়াঘরে অগ্নিসংযোগ করা হইত। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা আকাশে বিস্তারলাভ করিত এবং বাঁশের ঘন গাঁটগুলি একটি একটি করিয়া সশব্দে ফুটিত আর ছেলে মহলে

সেদিন খেলোয়াড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। খেলার উৎসাহ যেন কোন বাধাই মানিত না। অবশ্য এরূপ ভিড়ে খেলা বড় সহজ হইত না। এত লোকের গুলী চিনিয়া রাখাই কঠিন হইয়া পড়িত। তাছাড়া খেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য হেতু ঘন ঘন 'ব' হইত। 'ব' লাগিলেই খেলোয়াড়ের দলকে নূতন করিয়া গুলী গাহিয়া আনিতে হইত। ঘণ্টা-

কাল উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পর সকলেই দ্রুতপদে যার যার ঘরে ফিরিত এবং পর্বদিনের প্রাতরাশ, যথা ঘরের দৈ, ঘরের চিড়া, পিঠা ইত্যাদি খাইয়া সংকীর্তনের আসরে একে একে জড় হইত।

চারিশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যরূপী মহামানব প্রেমগীতির যে বন্যা আনিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ এদেশে এখনও স্তিমিত হইয়া যায় নাই। শ্রীহট্ট বৈষ্ণবপ্রধান জেলা। আমাদের পল্লীর একাধিক গৃহে বিগ্রহ ছিলেন। একসময়ে গৃহদেবতার নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আড়ম্বর সহকারে সম্পন্ন হইত। পৌষসংক্রান্তি দিনে পালা-ক্রমে কোন বাড়ীর বিগ্রহের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গায়কগণ সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীতে একটি "নট" পরিবার ছিল। কৃষিই ছিল নট পরিবারের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বস্তুতঃ পরিবারটি এক সময়ে সচ্ছল গৃহস্থ ছিল। কিন্তু নট পরিবারের প্রধান পেশা ছিল গান বাজনার চর্চা। পল্লীর উৎসবে নাচগানে বাদ্যে নটেরাই অগ্রণী হইতেন। নট পরিবারের ছেলেদিগকে অল্পবয়সে ওস্তাদের নিকট গানবাজনার শিক্ষা লইতে হইত। হিন্দুর সকল পর্বের সময়োচিত গানের চর্চা নটেরা করিতেন।

সংক্রান্তি দিবসে কোন বাড়ীর মন্দির প্রাঙ্গণে গায়কগণ খোলকরতালসহ সমবেত হইতেন। প্রথমেই ধামালী। খোলীর দল বাদ্যদ্বারা সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতেন। এই খোলের বাজনা পল্লীবাসীর কর্ণকুহরে পৌছিলে সকলেই দ্রুতপদে কীর্তনের আসরে আসিয়া জড় হইতেন। প্রথম গান—গৌরচন্দ্রিকা, যেমন—

নগরবাসী ওরূপ দেখ্‌বি যদি
শীঘ্র আয়,
শচীর দুলাল গৌর
নেচে যায়।
ওরূপ যে দেখেছে, সে ভুলেছে
তারে কি পাশরা যায়।
(নগরবাসী, ওরূপ দেখে যা রে)

তখনকার দিনে পল্লীতে দুচারজন লোক দেখা যাইত, যাঁহারা অবসর সময়ে সাধন ভজন ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাইতেন এবং অন্য সকলকেও আনন্দদান করিতেন। ভক্তশ্রেণীর সেই সকল গায়ক সেদিন কীর্তনের আসরে যেন শচীর দুলালকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গীতে এই প্রেমলীলাগীতির আনন্দ-হাট অপূর্ব শ্রী লাভ করিত। নৃত্যকালে তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিখা খাড়া হইয়া উঠিত। চৈতন্যের প্রেমগীতির আবেশে কাহারও কাহারও শরীরে অশ্রুকণা পুলকাদি প্রকাশ পাইত। বাদকের দল বিভিন্ন তাললয়ের কলা-কৌশল প্রদর্শন করিতেন। পল্লীরমণীগণ হাতের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরে কোন একদিকে সমবেত হইয়া উলুধ্বনিতে পর্বদিনের মঙ্গলগীতিকে অভ্যর্থনা করিতেন। এই চিরাচরিত কীর্তন এখনও হয়; কিন্তু তাহা নিছক সংস্কার ও নিয়ম রক্ষার জন্য!

মন্দির-প্রাঙ্গণে দুএকটি গান গীত হইবার পর কীর্তনীয়ার দল পল্লী-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। এই দলকে পল্লীর প্রতিটি বাড়ীতেই যাইতে হইত। সেদিন সকলের বাড়ীতেই লুটের ব্যবস্থা থাকিত। পল্লীর সকল বয়সের নরনারীর হৃদয় মন আনন্দে উদ্বেলিত হইত। পৌষপার্বণ বস্তুত গণ-উৎসব ছিল।

চৈতন্যের সহযোগী নিত্যানন্দের প্রেমগাথা গাহিয়া কীর্তনীয়ার দল যখন উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া এক হাটি হইতে অন্য হাটিতে যাইত, তখন কী যেন অপূর্ব প্রেমভাবপ্রবাহ চলিত! ইহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

আয় সবে ভাই
নিতাই গুণ গাই
অভিমানশূন্য
গৌর নিতাই।
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় (রে)
(নিতাই) যারে দেখে, আপন করে
হরির নাম বিলায় (রে)।

'অভিমানশূন্য' 'অক্রোধপরমানন্দ' মহাজন যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, চারিশত বৎসর-কাল বাংলার পল্লীর হিন্দুসাধারণ তাহা হইতে প্রেমের ও অহিংসার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। পৌষসংক্রান্তিতে সেই বাণীর জয়গীতি সমগ্র পল্লীর হৃদয়মনকে আলোড়িত করিত।

বহুরকমের কীর্তন সেই দিন গাওয়া হইত। দীনভাবে উদ্বুদ্ধ গায়কগণ গৌর নিতাইয়ের পদধ্বনি যেন সেদিন প্রত্যাশা করিতেন।

আমাদের পল্লীর এক কোণে চৈতন্য মহাপ্রভুর আখড়া আছে। ইহার সুপ্রাচীন অট্টালিকাসমূহ, পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি মন্দিরের শ্রেণী ও সুবিশাল নাটমন্দির আখড়ার প্রাচীন ঐশ্বর্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। বহু সিদ্ধসাধক এই আখড়ায়



পৌষপার্বণে কীর্তনীয়াদের পল্লীপরিক্রমা

পল্লীপরিক্রমার আর একটি গানের নমুনা এখানে দিতেছি—

ওরে কে রে, হরিবল বলে যায়
গৌর যায় কি নিতাই যায়,
যা রে মাধাই দেখে আয়,
সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।

প্রেমধর্মের আচরণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আখড়াটি প্রাচীনতমের একটি। বৈষ্ণবধর্মপ্রবাহ একসময়ে শ্রীহট্টবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আখড়া-সমূহ ইহার সাক্ষী। বিথলঙ্গের আখড়ার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বিথলঙ্গে অতিথিদের

জন্ম বিশাল অট্টালিকার শ্রেণী ও সহস্রাধিক লোকের বাসস্থান দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয়না, চৈতন্যবাণী একসময়ে শ্রীহট্টে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংক্রান্তিদিবসে কীর্তনীয়ার দল আখড়ায় পৌঁছিলেই আবার নূতন উৎসাহে নব নব কীর্তন গাওয়া হইত। এই কীর্তনের একটা বিশিষ্ট ধারা ছিল। যেমন—

নিতাই রে,
ঐ নাকি রে ব্রজধাম
শ্রবণে না শুনি কৃষ্ণ নাম।
বৃন্দাবন হত যদি
শুকসারী করত গান।

কী বেদনা! বৃন্দাবনে আসিয়াও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না। শুকসারীর গানও কর্ণকুহরে পৌঁছে না! আখড়ার বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এই গান যেন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিত। গায়কদের কাহারও কাহারও অশ্রুপ্রবাহ যেন আর বাধা মানিত না। এই প্রেমগীতি পার্থিব সুখের তো কোন সন্ধান দিত না! আমার মনে প্রশ্ন জাগিত। প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতাম না। ইহা বিকার বলিয়াও মনে করিতে পারিতাম না।



"অক্রোধপরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
যারে দেখে আপন করে হরির নাম বিলায়।"

আমাদের জীবদ্দশায় দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রকোপে আমাদের পল্লীসংস্কৃতির মর্মবাণীও মরুভূমিতে নদীস্রোত বিলীন হইবার মতো অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। হিংসাদ্বেষে ও কালোবাজারী মনোবৃত্তিতে কলুষিত যুদ্ধোত্তর পল্লীসমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পল্লীর পূর্বেকার পৌষপার্বণের

প্রেমগীতির ধারা ও অনুরূপ উৎসব—যেমন বিজয়া-দশমীর প্রীতির আলিঙ্গনের রীতির তুলনা করিলে স্বতই মনে হয় অহিংসার সাধনা এদেশের সমাজের সকল স্তরে কিভাবে অনুষ্ঠিত হইত।

যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন আরম্ভ হইত কীর্তনীয়ার দল পরিক্রমা শেষ করিয়া আবার সেখানেই পৌঁছিতেন। তখন একাধিক কীর্তন গাওয়া হইত। যেমন চৌতালের গান :—

আমি ব্রজপুরে যাব রে,
গুণের ভাইরে নিতাই
মায় যে জানে না।
জানিলে সন্ন্যাসের কথা রে,
(মায়) পাষাণে ভাঙ্গিবে মাথা রে—
(মায় যে জানে না)

চৈতন্যের সন্ন্যাসের গান জমিয়া উঠিলে দেখিতাম, রমণীগণ গৃহের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরের কোণে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেন। গৃহকর্ম বিস্মৃত হইতেন। অনেকের চোখে অবিরাম জলের ধারা বহিত। মাতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভব করিয়া চৈতন্য নিতাইকে সতর্ক করিতেছেন। পল্লীর মাতৃহৃদয়ও সেই বেদনায় ভারাক্রান্ত হইত। চারিশত বৎসর পরও চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণচিত্র পল্লীরমণীদের হৃদয়ে ব্যথা জাগাইত। এই চৌতালের গান কত-দিনের জানি না। অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি যে, তাঁহারাও বাল্যকাল হইতে এই গান শুনিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পিতা, প্রপিতা-মহেরাও এই গান গাহিয়াছেন। ধীর লয়ে নৃত্য-সংযোগে এই ধরনের চৌতালের গান দ্রুতলয়ে শেষ হইত। আর একটি গানের নমুনা দিতেছি :—

জয় রাধে শ্রীরাধে বলে মুদিলা নয়ন,
হরিদাস ত্যজিলা জীবন।
হরিদাসের গলে ধরে, প্রভু তুলি নিলেন কোলে
প্রেমভরে দিলেন আলিঙ্গন।
চৌদিকে খোল করতাল বাজে
(সবে) করে নাম সংকীর্তন।

হরিদাসের মহাপ্রয়াণের চিত্রটি গানে ফুটিয়া উঠিত। এরূপ কত প্রাচীন গান সেদিন শোনা যাইত। লুটের গান গাহিয়া কীর্তনের পালা শেষ করা হইত। তারপর লুট; লুটের পর সকলে খিচুড়ি, পরমান্ন, ফলাদি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া প্রসাদ পাইতেন। কাহার প্রসাদ!—চৈতন্যরূপী বিশ্বাত্মার নামে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ,—যাঁর গুণে সকলের আত্মা তৃপ্তিলাভ করে। প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া সকলে প্রেমধ্বনি দিতেন। সেই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হইত। ইহাই ছিল পৌষসংক্রান্তির বাণী,—ধর্মরূপী কুরুপিতামহ ভীষ্মের অহিংসার বাণী। মহাভারত আজও মানবীয় প্রেরণার আধার।

পল্লীজীবনের বাল্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করিত, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বেদনা জাগাইত। ফলে প্রৌঢ় বয়সে আবার পল্লীতে ফিরিয়াছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত একটানা পাঁচ বৎসর পল্লীতে অতিবাহিত করিয়াছি। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বহুলোককেই আমার মত উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে। হয়ত ইহা স্বাধীনতার মূল্য। কিন্তু জন্মপল্লীর শেষ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এইটুকু ধারণা হইয়াছে যে, যে শাশ্বত প্রেমধর্ম এদেশের পল্লীজীবনের ঐতিহ্যকে নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও সঞ্জীবিত করিয়াছে, ফল্গুর ধারার ন্যায় সেই ঐতিহ্যের প্রবাহ এখনও এ দেশের পল্লীধমনীতে প্রবহমান।

চৈতন্য নিত্যানন্দের উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ গঠনের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর বাণী এবং গান্ধীজীর প্রেম ও অহিংসার অমৃতসম বাণী বর্তমান যুগকে নূতন করিয়া ঐশ্বর্য-মণ্ডিত করিয়াছে। সেই ঐতিহ্যকে সর্বলোকের সম্পদে পরিণত করায় পথ নিরঙ্কুশ করিবার মত মহামানবতার জাগরণের প্রতীক্ষা স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

তাপসী অপর্ণা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

সতীর অংগ ছিন্ন ভিন্ন, প'ড়ে আছে মৃত-ভার
নিঃসাড় জড়পিণ্ডের সম ভুবনের চারিধার !
হর-কোপানলে সৃষ্টি-সুষমা পেয়েছে সকলি লয়,
পুঞ্জিত দুঃখ-দৈন্যের স্তূপ দিকে দিকে ভরি রয় !
মহাদেব রন উদাসীন ডুবি গভীর ধ্যানেতে আজ,
পরমাত্মার অটল গহন নীরব-সত্তা মাঝ।
বিশ্বের ছায়া নাহিক সে ধ্যানে শুদ্ধ কালের স্রোত
সীমার পরিধি অসীমের বোধে রয়েছে ওতপ্রোত।
এমনি সময়ে হিমালয়-গৃহে দক্ষরাজের সুতা,
পার্বতী-রূপে মেনকা-গর্ভে হ'লেন আবির্ভূতা।
বাতাসে সেদিন কি মধু পরশ—কি যেন বারতা জাগে,
কোন্ শুভরূপ বিকশি উঠিল অরুণ-কিরণ-রাগে !
গৌরী সবার নয়নের মণি, সবার বক্ষ-ধন,
হৃদয়ে হৃদয়ে আনিল সে বহি' স্নেহের প্রস্রবণ !
শশি-কলা সম দিনে দিনে বাড়ে অতি কমনীয় দেহ,
নব নব আশা, বিমল শান্তি ছায় গিরিরাজগেহ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে একদা নারদ উপনীত হিমাচলে,
গৌরীরে হেরি অনুপম সুখ লভিলেন হিয়াতলে।
ডাকি' গিরিরাজে কহিলেন মুনি, "শুন রাজা মোর বাণী
তব কন্যার যোগ্য পাত্র সদাশিব শূলপাণি !"
দেবর্ষি-কথা শুনি হিমালয় হর্ষিত-অন্তর,
ভাবিলেন মনে, "কেমনে গৌরী লভিবে মহেশ্বর !
যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা-পালক, হর্তা ও অধিপতি,
একি সম্ভব—তাঁহারে লভিবে পতিত্বে পার্বতী !"

গঙ্গা-নদীর পূত-ধারা যেথা দেবদারুবন পাশে,
ব'য়ে যায় ধীরে, সুরভিত বায়ু মৃগ-নাভি-মধু-বাসে,
যেথা কিন্নর-সংগীত-তানে দশদিশি মুখরিত,
সেই সুরম্য পর্বত-দেশে মহেশ অবস্থিত।
ধবল-গিরির সদৃশ-কান্তি, জটাজুট শোভে শিরে,
অর্ধ-চন্দ্র-সমুদিত-ভাতি অর্ধ-ললাট ঘিরে।
অর্ধমুদিত-নয়ন-পদ্মে স্ফুরিছে দিব্য-প্রভা,
ধ্যান-প্রশান্ত নিশ্চল-কায়—অরণ্য করে শোভা !
অনিমেষ-চোখে চাহিয়া গৌরী শান্ত শিবের পানে,
পরমাগ্রহে পতি-রূপে তাঁরে বরিলেন নিজপ্রাণে।
ভাবিলেন মনে—বিনা মহাদেব ব্যর্থ জীবন তাঁর,
তাঁরে না লভিলে এ মহাভুবনে কিবা সুখ আছে আর !
প্রভাতে নিত্য পার্বতী তাই সাজায়ে পূজার ডালা
আনিতেন কুশ-সিত-চন্দন, সুরভি-কুসুম-মালা।
স্বাদু বন-ফল সংগ্রহ করি রাখিতেন শিলাতলে,
দিতেন ধুইয়া সানুদেশ নিতি পূত-জাহ্নবী-জলে।

একদা মদন সেই বনভূমে বসন্তে ল'য়ে সাথে,
রূপময়ী মায়া করেন রচনা কুসুম শায়কাঘাতে !
দুই সখী সাথে সেথা পার্বতী হ'লেন উপস্থিত,
হেরিছেন দেবী—কাননভূমির সব যেন বিপরীত !
পুষ্পে পুষ্পে সাজিলেন নিজে ক'রি দেহ মনোহর,
মদন-শায়ক বিঁধিল তাঁহার সুকোমল অন্তর !
অশোক-পুষ্প অংগে ধরিল পদ্ম-রাগের প্রভা,
কর্ণিকা হ'ল কণ্ঠ-বাহুতে হেম-আভরণ-শোভা !
মহেশ সকাশে ক্রমে পার্বতী করিলেন আগমন,
ভক্তিতে শির ক'রি লুণ্ঠিত বন্দেন ত্রিনয়ন।
যত্ন-চয়িত নব-পল্লব, সুগন্ধি ফুল-দল,
আরাধ্য-পদে সঁপেন গৌরী ভ'রি দুই করতল।
হৃদয়ের মাঝে ছিল সঞ্চিত যাহা কিছু বৈভব,
ঈশান-চরণে দিলেন ঢালিয়া মানি' পূজা-গৌরব !
অভয়-হস্ত ধীরে প্রসারিয়া চাহি' গৌরীর প্রতি,
কহিলেন শিব—"কর' তুমি লাভ মনোমত তব পতি !"
সহসা তখন অনংগ-দেব ল'য়ে কুসুমের শর—
দাঁড়ালেন উঠি করিতে বিদ্ধ মহেশের অন্তর !
নেহারি' মদনে প্রলয়-দেবতা উঠিলেন রোষে জ্বলি,'
কম্পিত হ'ল সে-তেজ-অনলে বিজন-বনস্থলী !

তৃতীয় নয়ন জ্বলে ধক্ ধক্—ভ'রে যায় দিগ্‌দেশ,
মদনের রূপ সে অনলে পুড়ে—ভস্মেতে অবশেষ !
স্বামীরে হারায়ে কেঁদে ফিরে রতি, কাঁদে সারা চরাচর—
প্রলয়-আভাস হ'ল কি সূচিত আবার ধরার পর !
সখীদের সাথে ব্যথিত-হৃদয়ে ফিরিলেন পার্বতী,
অন্তর তাঁর করিল আহত কি যেন দারুণ ক্ষতি !
হৃদয়ের ধ্যান করেছেন যাঁরে, তাঁরে কি যাবে না পাওয়া ?
সুকঠোর তপ সাধিলে তবে কি সফল হইবে চাওয়া ?
কহেন মেনকা—"হও নিবৃত্ত, তপস্যা অকারণ,
তনু আর মন নিগ্রহ ক'রি শিবে কিবা প্রয়োজন ?
ভবনে মোদের কত দেবতার মূর্তি বিরাজমান্,
যাঁহারে ইচ্ছ', তাঁর করে তোমা করিব সম্প্রদান !"
শিবের চরণে তিলে তিলে উমা বিলায়েছে আপনারে,
তনু মন প্রাণ তাঁহাতে ন্যস্ত, চাহিবে অন্য কারে ?
তপের আসনে বসিলেন তাই দৃঢ় ক'রি প্রাণমন,
চারুবেশ খুলে লইলেন দেহে বল্কল আবরণ !
জটাজুটাকারে বাঁধিলেন কেশ, হলেন নিরাভরণা,
সকল ত্যজিয়া কাঙালিনী আজ হিমাচল-নন্দনা !
বৃক্ষপত্র সম্বল তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি-তরে,
অপর্ণা ক্রমে তাও ত্যজিলেন লভিতে মহেশ্বরে !
দিনে দিনে উমা হ'লেন শীর্ণা, তবুও ক্লান্তি-হারা
সাগরের পানে ছুটে যেন চলে স্রোতস্বিনীর ধারা !
রাত্রি কি দিবা, বর্ষা কি শীত, কিছু ভ্রূক্ষেপ নাহি,
প্রতীক্ষা-ভরে দিন কেটে যায় আশা-পথ-পানে চাহি'
বেদনার মাঝে কি যেন পুলক গভীর হিয়ায় জাগে,
নয়নের তারা শুধু চেয়ে থাকে অন্তর-অনুরাগে।
শিব তাঁর ধ্যান, শিব তাঁর জ্ঞান, সব তাঁর শিবময়,
বিরহের মাঝে মিলনের সুর প্রাণে ঝংকৃত হয় !

একদিন সেথা আসিলেন এক দণ্ডী ব্রহ্মচারী,
সূর্যের সম প্রতাপ তাঁহার, মুরতি হৃদয়হারী।
তাপসী উমারে শুধালেন তিনি—"কহ হে নিষ্ঠাবতি,
কিসের লাগিয়া সুকঠোর ব্রতে রয়েছ সতত ব্রতী ?
চাহ কি স্বর্গ ? চাহ সম্পদ ? কি তব অভাব আছে ?
ছাড় তপস্যা মিনতি আমার জানাই তোমার কাছে !
তনুলতা তব হয়েছে শুষ্ক, শ্রীহীন চন্দ্রানন,
তব অংগের স্বর্ণ-কান্তি দহে যেন হুতাশন !"
ব্রহ্মচারীর বচন শুনিয়া কহেন সখীদ্বয়—
"তপোরতা উমা চাহেন লভিতে মহেশ-পদাশ্রয় !
ত্রিভুবন মাঝে তিনি তাঁর পতি, চির-আরাধ্য ধন,
তনু প্রাণ মন করেছেন উমা তাঁহারে সমর্পণ !"
কহেন দণ্ডী—"জানি সে মহেশে, অতিশয় দীনহীন,
ভস্ম-বিভূতি মাখা তার গায়, সংসারে উদাসীন !
ভিক্ষুক সম বেড়ায় ঘুরিয়া, শ্মশানে মশানে রয়,
কেহ কোন দিন পায়নিক' তার জন্মের পরিচয় !"
কহেন গৌরী ব্রহ্মচারীরে রোষ-কম্পিত-স্বরে,—
"কেন করিছেন অযথা নিন্দা সেই পরমেশ্বরে ?
এই জগতের ত্রাণকারী তিনি, বাসনা-বিবর্জিত,
নির্ধন তিনি, সব সম্পদ তাঁহাতেই বিধৃত !
শ্মশান-নিবাসী হ'লেও তিনি যে ত্রিলোকের অধিপতি,
তাই এ হৃদয় তাঁহার চরণে স্বীকার করেছে নতি !"
কহি' এই বাণী তাপসী গৌরী করিলেন উত্থান,
নিমেষে সেথায় অপূর্ব রূপ হইল দৃশ্যমান্ !
এ যে মহাদেব, ত্রিভুবন-স্বামী, এ যে শিব-শংকর !
ছলিতে উমাকে এসেছেন নিজে সাজিয়া দণ্ডধর !
পার্বতী-দেহ কাঁপে থর থর, ঝরে দ্রব স্বেদ-ধারা,
প্রাণের দেবতা দিয়াছেন দেখা, নয়ন নিমেষ-হারা !
শিবের আননে ঝরে মধু-হাসি, প্রসন্নতায় ভরা,
সেই মাধুরীতে উজ্জ্বল নভঃ, উছল মাটির ধারা !
বিরূপ-দিঠিতে অপরূপ-ভাতি বরষে করুণাভয়,
বিশ্ব-প্রকৃতি পায় নব প্রাণ, নিখিল জ্যোতির্ময় !
কহিলেন হর পার্বতী প্রতি—"আমি তব চিরদাস !
বরণ করিয়া লহ মোরে দেবি, পুরাও প্রাণের আশ !"

প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

উত্তরমীমাংসাদর্শনে পূজ্যপাদ আচার্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫—'যাঁহারা প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন না, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।' (ছাঃ ৫।১০।২), ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে—যাঁহারা প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না; সুতরাং ক্রমমুক্তিও হয় না। বর্তমানকালে বেদপন্থী হিন্দুগণ পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গা, কালী, শিব ও বিষ্ণু ইত্যাদি তত্তৎ প্রতিমাবলম্বনে প্রতীকোপাসনাতেই ব্যাপৃত। শুদ্ধ বৈদিক উপাসনার অনুশীলনকারী এখন অতি বিরল। পুরাণ ও তন্ত্রাদি তত্তৎ স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণে যাঁহারা প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে শ্রীশ্রীদুর্গা শিব, কালী ও বিষ্ণু ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মুক্তি হয়, অথবা হয় না—এই বিষয়ে উত্তরমীমাংসাকার ও বেদ এবং পুরাণের বিভাগকর্তা,[১] পূজ্যপাদ আচার্য বাদরায়ণ বেদব্যাসের অভিপ্রায় কি তাহাই এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রধান বিচার্য বিষয়টিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুক্তি কি, উপাসনা কি, প্রতীকোপাসনাই বা কাহাকে বলে, তাহাদের বিভাগ ও ফল ইত্যাদি প্রারম্ভিক বিষয়গুলিতে কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাত করিতে চেষ্টা করিতেছি। উত্তরমীমাংসা, পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদিই এই বিষয়ে আমাদের উপজীব্য।

মুক্তি কি?

"সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তিরই" নাম মুক্তি। ব্রহ্মস্বরূপভূতা সেই মুক্তি একই প্রকার হইলেও, তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূতা বিদ্যার বিভিন্নতা এবং সাধকের প্রাপ্তব্য অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ দুই প্রকাররূপে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের (ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বজ্ঞানের) উদয় হইলে মূলাবিদ্যার আত্যন্তিক নাশ বশতঃ জীবের যে ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপে স্থিতি, তাহাই 'সদ্যোমুক্তি'। 'সদ্যোমুক্তি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান-সমকালে মুক্তি',[২] ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি; এক্ষণে জ্ঞানোৎপত্তি হইল, আর মুক্তি কর্মফলের ন্যায় কালান্তরে হইবে, এইরূপ নহে। জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই—'ইহার পূর্বেও আমি

১ অনেকেই জানেন ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ সকলের রচয়িতা। কিন্তু "পুরাণমেকমেবাসীৎ পর্বকল্পেষু মানদ। ** হরির্ব্যাসস্বরূপেণ জায়তে চ যুগে যুগে। ** তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূলোকে নির্দিশত্যপি"। ইত্যাদি বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে—ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণসকলের রচয়িতা নহেন, পরন্তু অষ্টাদশভাগে তাহাদের বিভাগকর্তা।

২ কেহ কেহ মনে করেন—'সদ্যোমুক্তি' শব্দের অর্থ—'জ্ঞানসমকালে দেহত্যাগ।' তাহা ভ্রম। যেহেতু উত্তরমীমাংসার ৩।৩।৩২ যাবদধিকারাধিকরণে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদেরও লোকব্যবস্থা সম্পাদনরূপ অধিকারকালপর্যন্ত শরীরস্থিতি ও পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। আর নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির পরই শরীরপাত হইলে সেই বিদ্যার বিষয় বলিবার কেহ না থাকায় মনুষ্য সমাজে সেই বিদ্যার অস্তিত্বই থাকিত না। আর তাহা হইলে আমরা যাঁহাদিগকে ঋষি বা অবতার পুরুষ ইত্যাদি বলি, যাঁহারা এই নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্যার কথা বলেন, তাঁহাদিগকে মিথ্যাভাষী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উপরন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতির প্রবৃত্তিও ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ শরীরপাত ভয়ে মনুষ্যগণ আর তাহাতে প্রবৃত্তই হইতে চাহিবে না। আর শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্তির বিচার-প্রসঙ্গে প্রারব্ধকর্ম রূপ প্রতিবন্ধক, লেশ অবিদ্যা ইত্যাদির বিচার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কর্তা বা ভোক্তা ছিলাম না, বর্তমানকালেও তাহা নহি, আর ভবিষ্যৎকালেও তাহা হইব না', সত্তোমুক্ত পুরুষ এইপ্রকার অনুভব করিতে থাকেন।[৩] আর তখনই তিনি "নবদ্বারেপুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্" (গীতা ৫।১৩), এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা হইল সত্তোমুক্তের স্বদৃষ্টিতে অবস্থা। অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাদৃশ সত্তোমুক্তেরও প্রারব্ধকর্ম বশে যতদিন শরীর থাকে, ততদিন তাঁহাকে বলা হয় 'জীবন্মুক্ত', সুতরাং তৎকালে তাঁহার মুক্তির আখ্যা হয় 'জীবন্মুক্তি'। আবার অস্মদাদির দৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্মশেষে সেই সত্তোমুক্ত পুরুষের শরীর বিনষ্ট হইলে, তাঁহাকে বলা হয় 'বিদেহমুক্ত' বা 'নির্বাণমুক্ত'। সুতরাং তৎকালে তাঁহার মুক্তির আখ্যা হয়—'বিদেহমুক্তি' বা 'নির্বাণমুক্তি।' এইরূপে দেখা গেল—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি বা নির্বাণমুক্তি সত্তোমুক্তিরই দৃষ্টিভেদে নামান্তর মাত্র। নিগুর্ণ ব্রহ্মাত্মবিদের স্বদৃষ্টিতে শরীর বা প্রারব্ধ কর্ম ইত্যাদি কিছুই না থাকায় কোন কোন আচার্য সত্তোমুক্তি মাত্রই স্বীকার করেন, জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন না। আর স্বগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা যে মুক্তি, তাহাকে বলে ক্রমমুক্তি। ইহাতে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি এবং নানা ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যভোগান্তে কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) সহিত সত্তোমুক্তিলাভ হয়। ক্রমমুক্ত পুরুষকে পুনরায় আর ইহলোকে আসিয়া জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইতে হয় না। এই ক্রমমুক্তাবস্থাকে সগুণ ব্রহ্মাত্মবিদের সত্তোমুক্তিলাভের পূর্বাবস্থা বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সগুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্‌কেও তাঁহার জীবদ্দশাতে 'জীবন্মুক্ত' বলা হইয়াছে। ইহাই হইল মুক্তির একটা মোটামুটি পরিচয়।

উপাসনার পরিচয়

'উপাসনা' শব্দটির অর্থ—'উপ' + 'আসনা' অর্থাৎ 'নিকটে অবস্থান।' কিন্তু যে পরমেশ্বরকে আমরা দেখি নাই, যাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা নাই, তাঁহার নিকটে অবস্থান করা যাইবে কি প্রকারে? যিনি ধরা ও ছোঁয়ার বাহিরে তাঁহার নিকট অবস্থান করা তো বাতুলের প্রলাপমাত্র। না, তাহা নহে। আমাদের প্রিয়জন যখন বিদেশে থাকেন, তখন তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলেও আমরা তাঁহার নিকটেই থাকি। কি প্রকারে? অবিরাম চিন্তার দ্বারা। মাতা প্রবাসী পুত্রের চিন্তায় তন্ময় হইয়া যেন পুত্রের নিকটেই থাকেন। লবণপিণ্ডের সর্বত্রই যেমন লবণ ওতপ্রোত থাকে, আমাদের ভগবানও তদ্রূপ এই বিশ্বে সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্ম এব ইদং সর্বম্" 'এই সমস্তই ব্রহ্ম,' স্মৃতি বলিতেছেন—"যদেতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৮।৮)— 'এই অখিলজগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন কিছুই নহে'; সুতরাং মাতার সহিত প্রবাসী পুত্রের দেশজ ব্যবধান থাকিলেও জগন্মাতার সহিত আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান এতটুকুও নাই। অতএব মাত্র তদ্বিষয়ে চিন্তারই আবশ্যকতা, তাঁহাকে চিন্তা করিলে তাঁহার নিকটে সত্যকার অবস্থান স্বতই আসিয়া পড়ে। এই কারণে অন্য বিষয়ক চিন্তার দ্বারা ব্যাহত না হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে যে ভগবদ্বিষয়ক চিন্তা, তদ্বিষয়ে মানসবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই উপাসনা, তাহাই 'তাঁহার নিকটে অবস্থান'।

কিন্তু বাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে স্বভাবতই আকৃষ্টচিত্ত আমাদের চিন্তাধারা পরমেশ্বরের প্রতি ধাবিত হয় না। তাঁহাকে চিন্তা করিতে বলিলেই তদ্বিষয়ক চিন্তা মনে আসে না, কারণ কি চিন্তা করিব, কি তাহার অবলম্বন? মনতো একটা অবলম্বন ব্যতিরেকে কিছু ধরিতে বা বুঝিতেই পারে না। মানবের এই দুর্বলতা বুঝিয়া পরম করুণাময়ী শ্রুতি তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—সর্বব্যাপী

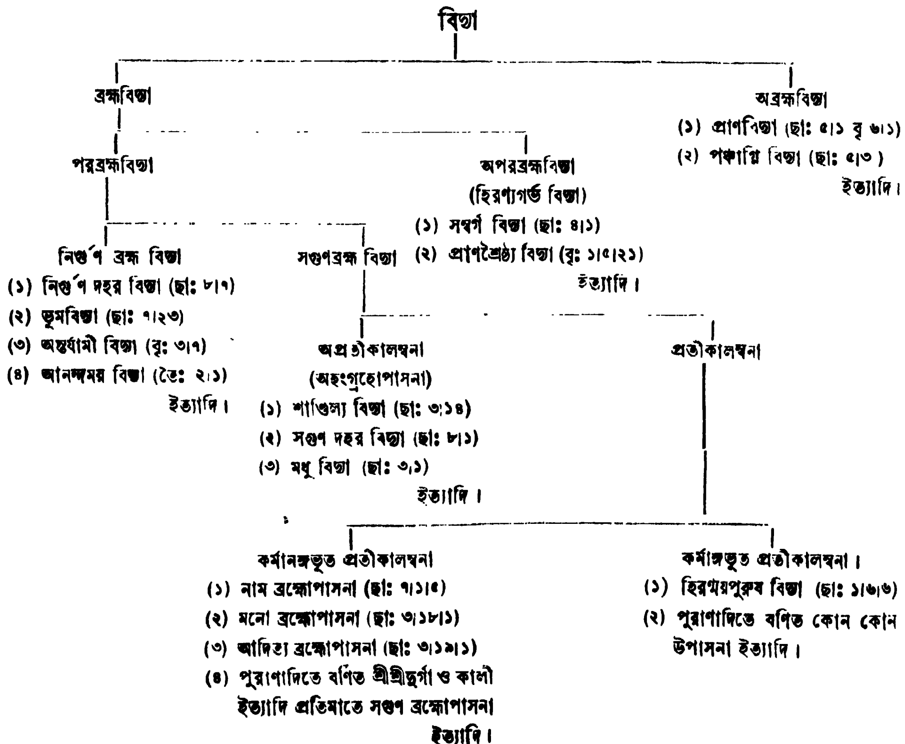
[৩] উত্তরমীমাংসা ৪।১।১৯ তদধিগমাধিকরণ ভাষ্য।

নিরাকার নির্গুণ পরমেশ্বরে কতকগুলি গুণের আরোপ করিয়া। [এই 'আরোপ' কথাটা বোধ হয় এখানে সঙ্গত হইল না, কারণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আরোপ, কিন্তু উপাসকের নিকট ইহা সত্য।] সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, পাপরাহিত্য, অশেষকল্যাণগুণাকরত্ব, জরামরণরাহিত্য ইত্যাদিই সেইগুণ। এই গুণসকলের যোগে যে পরমেশ্বরবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ, তাহাকেই বলে ভগবদুপাসনা বা ধ্যান।

আমাদের প্রস্তাবিত প্রতীকোপাসনারূপ বিচার্য বিষয়টিতে অবতরণ করিবার পূর্বে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তাহার সম্বন্ধ কিপ্রকার, মূলেই তাহা ব্রহ্মবিদ্যা কি না, ইহা বুঝিবার জন্য শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার বিভিন্ন প্রকার ধারার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব—

শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার বিভাগ

যে বিদ্যাবলে ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, তাহাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা। তদ্ব্যতিরিক্ত বিদ্যাকে বলে অব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা দুইপ্রকার, যথা—পরব্রহ্মবিদ্যা এবং অপরব্রহ্মবিদ্যা (হিরণ্যগর্ভবিদ্যা)। পরব্রহ্মবিদ্যা আবার দুইপ্রকার, যথা—সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা এবং নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার দুই বিভাগ, যথা—অপ্রতীকালম্বনা এবং প্রতীকালম্বনা। প্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা আবার দুইপ্রকার, যথা—কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা এবং কর্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা। উদাহরণ ও আকরের (শ্রুতিতে যে স্থলে উক্ত বিদ্যাটি পঠিত হইয়াছে, সেইস্থলের) পরিচয় সহ নিম্নোক্ত বিভাগ চিত্রটি হইতে ব্রহ্মবিদ্যার বিভাগবিষয়ে কতকটা পরিষ্কার ধারণা হইবে মনে করিয়া তাহা সন্নিবেশ করা হইতেছে—



অব্রহ্মবিদ্যারও উক্ত প্রকার বিভাগসকল আছে, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতীকালম্বনা উপাসনা কি প্রকারে কর্মানঙ্গভূত প্রতীক ও কর্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা উপাসনার অন্তর্গত হইয়া পড়ে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। শ্রৌতবিদ্যা না হইলেও বোধ-সৌকর্যের জন্য বিভাগচিত্রমধ্যে তাহারা সন্নিবিষ্ট হইল।

নিগুর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তাবিত প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা, কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে কি বুঝায় অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ কি, সাধনক্রম এবং ফলই বা কি, এইসকল বিষয়ের একটা পরিষ্কার ধারণার আবশ্যকতা আছে। নতুবা আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় যে পৌরাণিক প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, তদ্বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হইবে না। এক্ষণে আমরা তাহাই বর্ণনা করিব—

[অপ্রতীকালম্বনা শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যার (-অহংগ্রহোপাসনার) পরিচয়, সাধনক্রম ও ফল]

অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা—ইহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মকে কতকগুলি গুণযুক্তরূপে উপাসনা করা হয়। সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব ইত্যাদিই সেইগুণ, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রুতিতে যে যে বিদ্যাতে যে যে গুণযোগে উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই গুণযোগেই সেই সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। স্বীয় ইচ্ছামত কতকগুলি গুণের সমাবেশ করিলেই চলিবে না। তদ্ব্যতীত এই জাতীয় উপাসনাতে আরও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহা এই—শ্রুতি বলেন, "তৎ যঃ অহং সঃ অসৌ, যঃ অসৌ সঃ অহম্" (ঐতঃ আঃ ২।২।৪।৬)—'আমি যাহা উনিও (-পরমেশ্বরও) তাহা, উনি যাহা আমিও তাহা'; "ত্বং বা অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহংবৈ ত্বমসি" (জাবাল)—'হে পূজনীয় দেবতা, তুমিই আমি, আমিই তুমি'; "অথ যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি, ন সঃ বেদ, যথা পশুঃ এবং সঃ দেবানাম্" (বৃঃ ১।৪।১০)—'উনি (—আমার উপাস্য আমা হইতে ভিন্ন এবং আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন, এই প্রকারে যিনি অন্য [নিজ হইতে ভিন্ন] দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি তত্ত্ব, অবগত নহেন। [মনুষ্যগণের নিকট] পশু যে প্রকার, সেই ব্যক্তিও দেবগণের নিকট সেইপ্রকার'; "দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২)—'দেবতা হইয়া দেবতাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) 'ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন,' ইত্যাদি। এইসকল বেদবাক্যবলে এই অপ্রতী-কালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতে উপাসনাকালে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে এবং নিজেকে স্বীয় ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই প্রকারে যে নিজের ও দেবতার মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণভাবের পরিবর্তন করিয়া ধ্যান, তাহাকে বলে **ব্যতিহার ধ্যান** (উত্তরমীমাংসা—৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিকরণ)। কিন্তু এইপ্রকার ব্যতিহারধ্যানের সময় উপাসক নিজেকে দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত ও জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীবরূপে চিন্তা করিবেন না। পরন্তু তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ, এইরূপে নিজের স্বরূপের চিন্তা করিয়া নিজের সেই দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভেদ চিন্তন করিতে হইবে। এই প্রকারে শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত পাপরাহিত্যাদি তত্তৎ গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভিন্নতামূলক যে চিন্তাপ্রবাহ অর্থাৎ ধ্যান, তাহাকে বলে **অহংগ্রহোপাসনা**। "উপাস্যস্বরূপস্য স্বাভেদেন চিন্তনম্" ইহাই অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ। এইপ্রকার ধ্যানে ঈশ্বরনিষ্ঠ পাপরাহিত্যাদিগুণসকল জীবে ধ্যেয় হওয়ায় নিকৃষ্ট জীবের উৎকৃষ্টতা

সিদ্ধ হয়। উপাস্যদেবতাপ্রাপ্তি যাহার ফল, সেই সকল প্রকার অপ্রতীকালম্বনা উপাসনাতেই এইপ্রকার 'অহংগ্রহধ্যান' করিতে হয় (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩।৩।৩৭ সূঃ), [প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখিতে হইবে যে—ঈশ্বর চৈতন্য হইতে উক্ত সর্বজ্ঞত্ব ও পাপরাহিত্যাদি গুণসকলকে বাদ দিয়া সেই শুদ্ধ ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত শুদ্ধ জীবচৈতন্যের যে অভেদধ্যান, তাহাকে বলে 'নিদিধ্যাসন।' ইহা নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্যার সাধন, সুতরাং এখানে আলোচ্য নহে]

শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪), সগুণদহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১) ইত্যাদি অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাসকলে এই প্রকারে ব্যতিহারধ্যানদ্বারা উপাস্য ও উপাসকের অভিন্নতা চিন্তন করিতে হয় বলিয়া উক্ত অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাসকলকেই অহংগ্রহবিদ্যা বা অহংগ্রহোপাসনা বলা হয়। তন্নামক অন্য কোন স্বতন্ত্র বিদ্যা নাই। যদিও সম্বর্গবিদ্যা (ছাঃ ৪।৩।৬) ইত্যাদি অপরব্রহ্মবিদ্যাতে এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (ছাঃ ৫।৩) ও প্রাণবিদ্যা (ছাঃ ৫।১) ইত্যাদি অব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবতার সহিত উপাসকের 'অহংগ্রহ' (—আমিই সেই দেবতা, এইপ্রকার চিন্তন) পরিদৃষ্ট হয়,[৪] তাহা হইলেও সেইসকল উপাসনাকে 'অহংগ্রহোপাসনা' বলা হয় না। উক্ত শব্দটি এই অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতেই রূঢ়, শাস্ত্রালোচনাতে ইহাই প্রতিভাত হয়[৫]।

উপাস্যসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত এই অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যে কোন একটির অতি যত্নসহকারে আদরের সহিত নিরন্তর অভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের বিক্ষেপকর হওয়ায় এই বিদ্যার একাধিকের অনুশীলন নিষিদ্ধ। আর এই বিদ্যাসকলের মধ্যে একাধিকের অনুশীলনের কোন আবশ্যকতাও নাই, কারণ সকলপ্রকার অহংগ্রহবিদ্যার ফলেই সাধকের সগুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান, দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন ও তথায় ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যভোগ হয়। উত্তর মীমাংসার ৩।৩।৩৪ বিকল্পাধিকরণ, ৩।৩।১৮ অনিয়মাধিকরণ এবং ৪।৩।৫ কার্যাধিকরণে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রে যে সালোক্য (ইষ্টের সহিত সমান লোকে অবস্থিতি), সারূপ্য (—তাঁহার ন্যায় চতুর্মুখাদিরূপপ্রাপ্তি), সামীপ্য (—ইষ্টের সমীপে অবস্থান) ও সার্ষ্টি (—ইষ্টের ঐশ্বর্যের সমান ঐশ্বর্যলাভ), ইত্যাদি মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই অপ্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যারই ফল। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সিদ্ধসাধক উক্ত বিভূতিসকল লাভ করেন। এই বিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধককে আর ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে (পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে) হয় না, কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান লাভ পূর্বক নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন। এই প্রকারে অপ্রতীকালম্বনা সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলে সাধক ক্রমশঃ নির্বাণমুক্তির সন্নিহিত হইয়া কল্পান্তে তাহা লাভ করেন বলিয়া এই প্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হয়। ইহাই হইল শ্রৌত অহংগ্রহোপাসনাবিষয়ে মোটামুটি জ্ঞাতব্য।

(ক্রমশঃ)

৪ সম্বর্গবিদ্যাতে অহংগ্রহ—ছাঃ ৪।৩।৬ ; পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে অহংগ্রহ—(ছাঃ ৫।১০।১ ভাষ্য) ; প্রাণবিদ্যাতে অহংগ্রহ—ছাঃ ৫।২।১ আনন্দগিরিটীকা দ্রষ্টব্য।

৫ উত্তরমীমাংসা ৩।৩।৩৪ বিকল্পাধিকরণের এবং ৪।১।১ আবৃত্ত্যধিকরণের ভাষ্য ও ন্যায়নির্ণয়াদি টীকা দ্রষ্টব্য।

নামকরণ *

(কীর্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জানি না তো সখী, আমি যে কী—তোরে কেমনে বলিব বল্ ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে—কোথা সখী, এর তল !

হরির অধরে রাজে যে-মুরলী—আমি বুঝি তারি তান।
হরিনামটংকৃত যে-ধনুক তাহারি একটি বাণ।
ভক্তের মুখবন্দিত আমি কীর্তনঝঙ্কার।
প্রেমিক যে-হার মেনে লভে জয়—আমি বুঝি সেই হার।
নই নই সখী, কিছু নই আমি ঃ
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী ঃ
জানি না তো সখী, আমি যে কী তোরে কেমনে বলিব বল ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে কোথা সখী, এর তল !

আমি উচ্ছলা গোপীর আঁখির অশ্রুমুকুতামোতি।
কালো নিশাপথে চলে যে-পান্থ—সে-পথে জোনাকি-জ্যোতি।
নাথের চরণে নিবেদিতা আমি একটি কুসুমহার।
সুরসুন্দর প্রেমের বীণার আমি মঞ্জুল তার।
নই নই সখী, কিছু নই আমি ঃ
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী ঃ
জানি না তো সখী আমি যে কী—তোরে কেমনে বলিব বল্ ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে কোথা সখী, এর তল !

বৃন্দাবনের বালা আমি মীরা—নন্দিনী মেবারের।
সাধুচরণের ধূলিকণা—দাসী শ্যামল বল্লভের—
গোপালের হাতে যে বিকালো হ'তে খেলার পুতুল তার
করুণাশাখায় লগ্ন একটি হিল্লোল লতিকার।
নই নই সখী, কিছু নই আমি ঃ
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী ঃ
জানি না তো সখী আমি যে কী—তোরে কেমনে বলিব বল্ ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে কোথা সখী এর তল !

* শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর রচিত হিন্দী মীরারভজনের অনুবাদ

রামায়ণে সৎকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রাদ্ধ

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌, শাস্ত্রী

জীবমাত্রই মরণশীল অথচ জীবমাত্রই দেহকে অত্যন্ত আপনার মনে করে। জীব দেহের সঙ্গে সহজে সম্বন্ধ নিঃশেষ করিতে চাহে না। মৃতদেহ প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই দেহ বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মৃতদেহকে চিরন্তন করা অসাধ্য, সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ণু মৃতদেহের যথোচিত গতি করাকে আত্মীয়-স্বজন অত্যাবশ্যক মনে করিয়া ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ মানুষমাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে পরলোকে বিশ্বাস করে। পরলোকে সদ্গতি মানুষের ইহলোকের কর্মের উপর নির্ভর করে বলিয়া মানুষের সহজ বিশ্বাস। তেমনি মৃত ব্যক্তির সৎকার পারলৌকিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া মানুষের বিশ্বাস। ইহলোকের কর্মের জন্য মানুষ স্বয়ং দায়ী, কিন্তু মৃতদেহের সংকারাদির জন্য পরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতদেহ ভক্ষণ করার রীতি আছে। কোন জাতি মৃতদেহকে উচ্চ বৃক্ষে বিলম্বিত করিয়া রাখে এবং সেই দেহ পশুপক্ষীর খাদ্য, কোন জাতি মৃতদেহকে জলে নিক্ষেপ করে, তাহা মীন কূর্ম কুম্ভীর ইত্যাদি জলজন্তুর খাদ্য, কোথাও মৃতদেহকে রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা চিরন্তন করিয়া রাখার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহ অগ্নিদাহ করে; অস্থি, নাভি ইত্যাদি অংশ জলে নিক্ষেপ করে। পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বর ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মৃতদেহের সংকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মৃতদেহের সংকার মানুষের সভ্যতা ও সংস্কারের সাক্ষ্য দেয়। রামায়ণে নর, বানর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ সংকারের উল্লেখ আছে। এই সংকারবিধি, অশৌচপালন, শ্রাদ্ধ, উদকদান, তর্পণাদি কার্য পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যেন এই জাতিগুলি একইপ্রকার সমাজব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইত। পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ঐক্য ছিল। রামায়ণে দেবতাদের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কারণ তাঁহারা অমৃত ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়াছিলেন। রামায়ণে এই কয়েকটি মৃতদেহের সংকার, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারের উল্লেখ আছে:

নররাজ—দশরথ

শাপগ্রস্ত—বিরাধ

গৃধ্ররাজ—জটায়ু

বানররাজ—বালী

রাক্ষসবীর—ইন্দ্রজিৎ

রাক্ষসরাজ—রাবণ

মানবরাজ দশরথের মৃত্যুর সময় তাঁহার কোন পুত্রই অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। রাম-লক্ষণ বনবাসে ছিলেন, ভরত-শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে পল্লীগ্রামে ছিলেন; পুত্রাভাবে মুখাগ্নি হইতে পারে না বিবেচনায় তাঁহার মৃতদেহ দশ দিন পর্যন্ত তৈলদ্রোণীতে স্থাপিত ছিল।

> ঋতেতু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে
> র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
> ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ন্
> বিচিন্ত্য রাজনমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥ ২.৬৬:২৭

দশরথের মৃত্যুর দশ দিবসান্তে ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের পরামর্শ-অনুসারে রাজা দশরথের মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করা হইল। মৃতদেহকে তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে উত্তোলন করিয়া ভূমিতে স্থাপন করা হইল।

সৎকারের সময় ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যের জন্য ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং আচার্যের প্রয়োজন হইল। সেই যুগে প্রতি গৃহস্থের গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি থাকিত। সেই অগ্নি হইতে আনীত অগ্নি দ্বারা হোম করা হইত। মৃতদেহকে শিবিকামধ্যে স্থাপন করাইয়া শ্মশানে বহন করিল, শবদেহের অগ্রে মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত সুবর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র রাজপথে ছড়াইয়া দেওয়া হইল।

পদ্মক, দেবদারু, চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করা হইল। চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য চিতামধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। ঋত্বিক্‌গণ চিতামধ্যে দশরথের শব স্থাপন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, কালোচিত মন্ত্র জপ করিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে সামগান করিলেন।

> তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ ॥
> তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তু ঋত্বিজঃ।
> জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ॥
> ২।৭৬।১৭-১৮

শ্মশানে রাজমহিলারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা পদব্রজে গমন করিতেন না। শিবিকা এবং রথে শ্মশানে গমন করিলেন। নারী ও ঋত্বিক্‌গণ চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। শবদাহ শেষ হইলে রাজকুমার ভরত পুরনারী, পুরোহিত এবং অমাত্যগণ সহ সরযূতীরে গমন করিয়া উদকক্রিয়া বা তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

> কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
> নৃপাঙ্গনামন্ত্রিপুরোহিতাশ্চ।
> পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
> ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্। ২।৭৬।২৩

অনন্তর দশ দিন ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিলেন। দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে দশরথ-তনয় ভরত কৃতাশৌচ হইলেন, দ্বাদশ দিবসে ঋত্বিক্‌গণ শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে মৃত রাজার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন, রজত, ছাগ, গো, দাসদাসী ও গৃহ দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে পিতার অস্থি সংগ্রহ করিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইলেন।

> বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ।
> ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।
> সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে ॥ ২।৭৭।২১-২২

দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় পুত্র ভরত মৃত পিতার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতের নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি পাষাণপিষ্ট ইঙ্গুদীফল আনয়ন কর। নূতন চীরবসন আহরণ কর, মহানুভব পিতার তর্পণাদির জন্য গমন করিব।"

> আনয়েঙ্গুদিপিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
> জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ ॥ ২।১০৩,২০

তর্পণ-উদ্দেশ্যে সীতাকে পুরোভাগে উপস্থাপিত করিয়া রামলক্ষ্মণ মন্দাকিনী অভিমুখে গমন করিলেন। জলে অবতরণ করিয়া রামচন্দ্র পিতার নামগোত্র উচ্চারণপূর্বক তর্পণজল প্রদান করিলেন। দক্ষিণমুখী হইয়া রামচন্দ্র জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উচ্চারণ করিলেনঃ—

> এতত্তে রাজশার্দুল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
> পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু ॥ ২।১০৩।২৭

তর্পণ সমর্পিত হইলে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। এই পিণ্ড বদরীফলমিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত দর্ভাসংস্তরে ইঙ্গুদীফল দ্বারা রচিত হইয়াছিল। পিণ্ডদান কালে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"হে মহারাজ, আমাদিগের যাহা ভোজ্য তাহাই ভোজন করুন। মানুষ নিজে যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাসকল তাহাই আহার করেন।"

> ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
> ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥

ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষাঃ রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥
২।১০৩।২৯—৩০

দশরথের সংকার ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন মানবের সংকার ও শ্রাদ্ধের কোন উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায় না।

রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিলেন কিন্তু তাহার মৃতদেহের সংকারের সম্বন্ধে কোন বিবরণ রামায়ণে নাই।

রামচন্দ্র বিরাধ রাক্ষসকে পরাজিত করিলেন। এই বিরাধ পূর্বে তুম্বুরু নামধারী একজন গন্ধর্ব ছিলেন। কুবেরের শাপে গন্ধর্ববীর তুম্বুরু রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে বিরাট গর্ত খনন করিয়া বিরাধ রাক্ষসকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুর পরে গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষস-দিগের চিরন্তন ধর্ম। মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষস গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকে।

রক্ষসাম্ গতসত্ত্বানাম্ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। ৩।৪।২২

সুতরাং দেখা যায় যে, কোন কোন রাক্ষস-শ্রেণীর মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করার রীতি ছিল, কারণ উহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থ বিহিত ছিল। রাক্ষসের মধ্যে মৃতদেহের সলিলসমাধিও দেওয়া হইত। লঙ্কায় যুদ্ধের সময় রাবণের আদেশে মৃত রাক্ষসদিগকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসকুঞ্জরৈরঃ।
হতাহতাস্তে ক্ষিপ্যন্তে সর্বেএব তু সাগরে॥ ৬।৫৬।৭২

সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রাম জটায়ুর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের বন্ধু ছিলেন এবং সীতারক্ষাহেতু যুদ্ধে তিনি রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—"এই বিহঙ্গরাজ আমার পিতৃবন্ধু, সুতরাং তিনি পিতৃতুল্য মাননীয় ও পূজনীয়। লক্ষ্মণ, তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। আমি অগ্নি উৎপাদন করিয়া এই গৃধ্ররাজের সংকার করিব। কেননা, তিনি আমাদের হিতের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

রামচন্দ্রের এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, পিতৃবন্ধুর পারলৌকিক কার্যে বন্ধুপুত্রের অধিকার ছিল এবং এই জাতীয় প্রাণীদিগের দেহ অগ্নিতে দাহ করা হইত।

তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ কাষ্ঠদ্বারা চিতা রচনা করিলেন এবং রামচন্দ্র জটায়ুকে জলন্ত অগ্নিমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্।
দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ॥ ৩।৬৮।৩২

পরে তিনি মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ কুশোপরি জটায়ুর উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ এবং ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্রজপ দ্বারা প্রেতের স্বর্গগমনে সাহায্য করেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন।

যৎ তৎ প্রেতস্য মর্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎ স্বর্গগমনং ক্ষিপ্রং তস্য রাম জজাপ হ॥ ৩।৬৮।৩৪

সুতরাং দেখা যায় যে, সেই যুগে মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করা হইত, দাহের অব্যবহিত পরে সদ্যসদ্যই প্রেতের উদ্দেশ্যে মন্ত্র জপ করা হইত, ব্রাহ্মণ আদি মানব এবং গৃধ্র প্রভৃতি জাতির পারলৌকিক কার্য একই প্রথায় সম্পন্ন হইত। মৃত্যুর পরে মানব, রক্ষ, যক্ষ প্রভৃতি জাতির স্বর্গ এবং পারলৌকিক কার্যের ধারণা একই প্রকার ছিল।

মন্ত্রজপ ও মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ডদান সমাপ্ত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে গিয়া জটায়ুকে জলদান করিয়া উদকক্রিয়া সম্পন্ন

করিলেন। তারপর শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে স্নানপূর্বক তাঁহার তর্পণ সমাপ্ত করিলেন।

ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরোবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ॥
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা॥ ৩।৬৮।৩৫-৩৬

জটায়ুর সৎকার, শবদাহ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ড, মন্ত্রজপ, তর্পণ-ক্রিয়া হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, ভারতের সর্বত্র একই প্রকার পরলোকে বিশ্বাস ছিল এবং একই প্রকার পারলৌকিক কার্যদ্বারা আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করিত।

এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের সঙ্গে কবন্ধ দানবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই কবন্ধ দনুর পুত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি দানব এবং স্থূলশিরা ঋষির অভিশাপে বিকট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবন্ধ দানবের হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। কবন্ধ বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যু নিকট। তিনি বলিলেন, "রামচন্দ্র আপনি আমাকে আগে দাহ করুন। সূর্যাস্তের পূর্বে আমাকে গর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাশাস্ত্র দাহ করুন।"

তাবন্মামবটে ক্ষিপ্‌ত্বা দহ রাম যথাবিধি।
দগ্ধস্ত্বয়াহমবটে ন্যায়েন রঘুনন্দন॥ ৩।৭১।৩২

লক্ষ্মণ চিতা প্রজ্বলিত করিলে অল্পে অল্পে কবন্ধের শরীর দগ্ধ হইল। সুতরাং দেখা যায় যে, দানব সম্প্রদায়ের মধ্যেও মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করা হইত। এই কবন্ধ অগ্নিসৎকারের পরে শাপবিমুক্ত হইয়া রামচন্দ্রকে বানররাজকুমার সদাচারী সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করিবার পরামর্শ দিলেন। কারণ সমদুঃখভাক্ কবন্ধের সাহায্য ব্যতীত রামচন্দ্রের পক্ষে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। পত্নীবিচ্যুত রাজপুত্র সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের অবস্থার সমতা ছিল। কবন্ধের উপদেশ সীতার উদ্ধারের পক্ষে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

বানররাজ বালীর মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বলিলেন, "তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর সৎকারাদি অন্তিমকার্য সম্পাদন কর। তাঁহার সৎকারের জন্য বহুল কাষ্ঠ ও সুবাসিত চন্দন সংগ্রহ কর। অঙ্গদ বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, ঘৃত, তৈল আনয়ন করুক।" তারা নামক একজন বানর অমাত্য শিবিকা আনয়ন করিলেন। সেই শিবিকা বর্তমান যুগের মৃতদেহ-বহনোপযোগী সাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য নির্মিত বাহিকা নয়। উহা সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায়। উহাতে বিচিত্র পুষ্পমাল্যশোভিত, চিত্রাঙ্কিত জাল সদৃশ বাতায়ন ছিল।

মৃত বালীকে বহু অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্যদ্বারা ভূষিত করিয়া শিবিকায় স্থাপন করা হইল।

ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।
আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈব তু॥
আরোপ্য শিবিকাঞ্চৈব বালিনং গতজীবিতম্।
অলঙ্কারৈশ্চৈব বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্॥ ৪।২৫।২৮-২৯

বানরগণ মৃতদেহ নদীকূলে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বহন করিয়া আনিল, পথে তাহারা অগ্রে অগ্রে নানাবিধ ধনরত্ন বিতরণ করিতে করিতে চলিল। অঙ্গদ স্বয়ং পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন। তিনি মৃত পিতাকে শাস্ত্র বিধি অনুসারে অগ্নিপ্রদান করিলেন এবং দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন।

সুগ্রীবেণ ততঃ সার্দ্ধং সোঽঙ্গদ পিতরং রুদন্।
চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ॥
ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্ত্বা সোপসব্যং চকার হ॥
পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪।২৫।৪৯-৫০

তারপর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নদীসলিলে উদকক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। বানরের মধ্যে নারীগণ পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেন। সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য বানরগণ অঙ্গদকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ততস্তে সহিতাস্তত্র অঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরাঃ জলম্॥ ৪।২৫।৫২



বালীর শ্মশানকার্যের উল্লেখ রামায়ণে আছে, কিন্তু তাঁহার শ্রাদ্ধের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এই সংকারের মধ্যে দেখা যায়, মৃতদেহতে চন্দনকাষ্ঠ সজ্জিত করা হইত। মৃতদেহবহনের সময় পথে পথে ধনরত্ন বিতরণ করা হইত। পুত্র মৃতদেহের মুখে অগ্নিসংযোগ করিত। শবদাহ শেষ হইলে নদীসলিলে উদকক্রিয়া সমাপ্ত করিত। নারীগণও পারলৌকিক ক্রিয়াতে যোগদান করিত।

জটায়ুর ভ্রাতা তাঁহার মৃত ভ্রাতার উদকক্রিয়া বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্তাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ॥ ৪।৫৮।৩৩

বহু রাক্ষস ও বানরবীর লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহাদের মৃতদেহ সংকারের কোন সংবাদ রামায়ণে নাই। মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ৬।৫৬।৭২

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইলে রাবণ স্বয়ং তাঁহার প্রেতকার্য সম্পন্ন করিলেন। ইন্দ্রজিতের পারলৌকিক কার্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ নাই। কেবল একমাত্র রাবণের বিলাপের অবসরে রাবণ বলিয়াছিলেন—"হে বীরপুত্র! কোথায় আমি যমালয়ে গমন করিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তাহা না করিয়া আমাকেই তোমার বিপরীত প্রেতকার্য করিতে হইল।"— অর্থাৎ পিতা হইয়া পুত্রের প্রেতকার্য রাবণ সম্পন্ন করিলেন।

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।
প্রেতকার্যাণি কার্যানি, বিপরীত হি বর্ততে। ৬।৯৩।১৪।

এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষসসমাজে পিতা অবস্থাবিশেষে পুত্রের পারলৌকিক কার্যের অধিকারী। রাক্ষসরাজ রাবণের প্রেতকৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রাবণ নিহত হইলে রামচন্দ্র শোকার্ত বিভীষণকে বলিলেন,—"যাহারা জয়ের আশায় ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনপূর্বক সম্মুখ রণে প্রাণ বিসর্জন করে তাহাদের নিমিত্ত শোককরা উচিত নয়।........ প্রাচীনগণ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়সম্মতা গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে॥
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥
৬।১১১।১৫,১৮

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাবণ রাক্ষসসমাজভুক্ত হইলেও ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্মানুযায়ী তাঁহার সংকারকার্য সম্পন্ন করা উচিত। বিভীষণ বলিলেন, "রাবণ আহিতাগ্নি, মহাতেজস্বী, বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।"

ইহার দ্বারা বিভীষণ বলিতে চাহিলেন—রাক্ষসরাজ রাবণের সংকার্য যথাবিধি সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

এষোহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ॥
৬।১১।২৩

লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্বক দশাননের অগ্নিহোত্র বাহির করিলেন। অচিরকালমধ্যে শকট, দারুপাত্র, চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য, মণিমুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সংগ্রহ করিলেন।

সা প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রাবণস্যাগ্নিহোত্রস্তু নির্যাপয়তি সত্বরম্॥
শকটান্ দারুপাত্রাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা।
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ॥
অগুরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা।
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ॥
৬।১১৩।১০৪—১০৬

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনায়ন করা হইলে রাবণের মাতামহ মাল্যবানের সহযোগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

আরম্ভ হইল। রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। সেই শিবিকা বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় সুশোভিত করা হইল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষসের মৃতদেহকে নববস্ত্র পরিধান করান হইত। রাজা দশরথ এবং বানররাজ বালীকেও নূতন বস্ত্র পরিধান করানো হইয়াছিল। পারলৌকিক কার্যের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা স্বয়ং বাল্মীকি উল্লেখ করিয়াছেন।

সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্।
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুপূর্ণমুখা দ্বিজাঃ॥ ৬।১১৩।১০৭

তারপর রাবণের মৃতদেহ বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহের জন্য চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্মাণ করা হইল। ঋত্বিক্‌গণ বেদী নির্মাণপূর্বক যথাস্থানে অগ্নিস্থাপন করিলেন। রাক্ষসরাজের পিতৃমেধবিহিত কর্ম সমাপন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ মৃতের স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যপূর্ণ স্রব, পদদ্বয়ে শতক, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদূখল এবং অরণি—উত্তর অরণি এবং অন্যান্য দারুপাত্রসকল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। শাস্ত্র-বিধান অনুসারে মেধ্য পশু হনন পূর্বক তাহার চর্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলেন। তারপরে রাক্ষসরাজের দেহ গন্ধ, মাল্য এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কৃত দেহের উপরে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। সর্বশেষে বিভীষণ যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিলেন।

রাবণং প্রয়তে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ।
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ॥
ব্রাহ্ম্যা সংবর্তয়ামাসূ রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্।
প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্॥
বেদীং চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্।
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ॥
পাদয়োঃ শকটং প্রাদাদন্তরূর্বোরুলূখলম্।
দারুপাত্রাণি সর্বাণি অরণিঞ্চোত্তরারণিম্॥
দত্ত্বা তু মুষলম্ চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ॥
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্মাল্যৈরলংকৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ॥
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তদা॥ ৬।১১৩।১১২-১৯

শবদাহান্তে শ্মশানবন্ধুগণ স্নান সমাপ্ত করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে বিধিপূর্বক তিল ও দর্ভ মিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান্।
উদকেন চ সংমিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্॥ ৬।১১৩।১১

রামায়ণে বর্ণিত সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মানব, দানব, গৃধ্র, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জাতির পরলোকে বিশ্বাস ছিল। মৃতদেহের সৎকারের উপর ঔর্ধ্বদৈহিক গতি নির্ভর করে বলিয়া এই সমস্ত জাতি বিশ্বাস করিত। শবদেহকে দাহ করা, জলে নিক্ষেপ করা, ভূমিতে প্রোথিত করা প্রথাই প্রশস্ত ছিল। মানব দশরথ, শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব বিরাধ, গৃধ্ররাজ জটায়ু, বানররাজ বালী, রাক্ষসরাজ রাবণকে দাহ করা হইয়াছিল। শাপগ্রস্ত দানব কবন্ধকে প্রোথিত করা হইয়াছিল। লঙ্কায় নিহত রাক্ষসগণকে সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

শববহনের সময় ধনরত্নাদি বিতরণ করা হইত। শবদেহ বহনের জন্য শিবিকা ব্যবহার করা হইত। দাহকার্যের জন্য চিতা, চিতার জন্য চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু, মাল্য, গুগগুল্ ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। দশরথ, বালী এবং রাবণের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। জটায়ু এবং বিরাধকে বনমধ্যে দাহ করা হইয়াছিল, সুতরাং বনবাসী রামের দ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্যসংগ্রহের উপায় ছিল না।

চিতায় অগ্নিসংযোগের নিমিত্ত পরিবারের জন্য সুরক্ষিত অগ্নিই ব্যবহার হইত। দশরথের ও

রাবণের জন্য গৃহসংরক্ষিত অগ্নিহোত্র হইতে সংগৃহীত অগ্নি ব্যবহৃত হইয়াছিল। (২।৭৩।১৩) জ্যেষ্ঠপুত্র, জ্যেষ্ঠের অভাবে অন্যপুত্র, পুত্রের অভাবে পিতা (রাবণ মেঘনাথের কার্য), পিতৃবন্ধু (জটায়ুর কার্যে রাম), বা ভ্রাতাকে (রাবণের প্রেতকার্যে ভ্রাতা বিভীষণ) ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যের অধিকারীরূপে রামায়ণে দেখা যায়। অগ্নিসংযোগের পরেই প্রেতের উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপ করা হইত। দশরথ ও রাবণের প্রেতকার্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্র জপ করা হয়। (২।৭৬।১৭-১৮) ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ শ্মশানকার্য সমাধা করিতেন। শ্মশানে হোম করার বিধি ছিল। দশরথের শ্মশানে হোম করা হইয়াছিল। (২।৭৬।১৩)

দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করার রীতি ছিল। নারী ও ঋত্বিক্‌গণ দশরথের চিতা প্রদক্ষিণ করেন। অঙ্গদ বালীর চিতা প্রদক্ষিণ করেন। বিভীষণ ও পুরনারীগণ রাবণের চিতা প্রদক্ষিণ করেন। নারীগণ শ্মশান-কার্যে উপস্থিত থাকিতেন।

মেধ্য পশু হনন করিয়া তাহার চর্মদ্বারা রাবণের শবদেহের মুখকে আবৃত করা হইয়াছিল। (৬।১১৩।১১৭) রাবণের শবদেহের মতন অন্য কাহারো দেহকে আবৃত করা হয় নাই। চীরবসন দ্বারা দশরথের দেহ, বালীর দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়। রাবণের মৃতদেহকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করান হয়।

ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর পর দশ দিবস অশৌচ থাকিত। একাদশ দিনে কৃতাশৌচ হয়। দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণকে দান করা হয় (২।৭৭।২১)। ত্রয়োদশ দিবসে শবের অস্থি সংগ্রহ করার রীতি ছিল। (২।৭৭।২২) বালী বা রাবণের শ্রাদ্ধবিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মৃতের সৎকারের পর পিণ্ডদান করা হইত। জটায়ুর পিণ্ডদান করা হইয়াছিল (মাংসদ্বারা), দশরথের পিণ্ডদান করা হইয়াছিল বদরী, তিল ও ইঙ্গুদীফল দ্বারা (২।১০৩।২৯)। জল দ্বারা তর্পণ-বিধি মানব, বানর এবং রাক্ষসের মধ্যে যেমন দেখা যায়, তেমন জটায়ুর জন্য তাঁহার ভ্রাতা সম্পাতি এবং রামচন্দ্র স্বয়ং তর্পণ করিয়াছিলেন। (৪।৫১।৩৬)। তর্পণের জন্য নদীতীর প্রশস্ত স্থান। ভরত কর্তৃক দশরথের উদকক্রিয়া সরযূতীরে সম্পন্ন হয় (২।৭৬।২২)। রামচন্দ্র দশরথের উদকক্রিয়া মন্দাকিনী তীরে সম্পন্ন করেন (২।১১৩।২৮)। জটায়ুর উদকক্রিয়া রামচন্দ্র কর্তৃক গোদাবরী তীরে সম্পন্ন হইয়াছিল (৩।৬৯।৩৫)। সম্পাতিকে তাঁহার ভ্রাতার উদকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাবণের শ্মশানকার্য সমাপ্ত হইলে বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই স্নান করিয়াছিলেন। সুতরাং রাবণের শ্মশানের পার্শ্বে নিশ্চয় জলাশয় ছিল, সেখানে কোন নদীর উল্লেখ নাই।

"তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মিলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার; কিন্তু এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎসব

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

[বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে; তথাপি ঐ অবিস্মরণীয় ঘটনার জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে বর্তমান লেখক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যযুক্ত এই যে স্মৃতিধ্যানটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।—উঃ সঃ]

প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর আগেকার কথা। সেই পুণ্য স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়। পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একদিন এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের দিন-তারিখ-সমেত বেলুড়মঠের দুর্গোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইলাম। এই স্মৃতির অর্ঘ্য পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইব।

বাংলা ১৩০৮ সাল—ইংরেজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। সেবার মহালয়া ২৬শে আশ্বিন, শনিবার। বেলুড়মঠে গিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আছেন। কয়েকমাস পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও কামাখ্যাতীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্যেই সদানন্দ মহাপুরুষের মুখমণ্ডল দিব্য ভাব-জ্যোতিতে দীপ্তিমান্। আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় তেজঃপূর্ণ, প্রেমকরুণায় সমুজ্জ্বল। মহালয়ার দিন মঠে শুনিলাম, বেলুড়মঠে প্রতিমায় দুর্গোৎসব হইবে, ইহা ঠিক হইয়াছে।

সুহৃদ্বর, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে শ্রীশ্রীমা দশভুজার পূজার সঙ্কল্প স্বামীজীর মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু মহালয়ার পূর্বে বহু বার যাতায়াত করিয়াও কাহারও নিকট স্বামীজীর এই সঙ্কল্পের কথা শুনিতে পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহ্নে পশুপক্ষীদের লইয়া খনিকক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বিল্বমূলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি মধুরকণ্ঠে আপন মনে গাহিতে লাগিলেন—বোধনের গান।

"গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী॥
মেঘের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি॥"

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—স্বামীজী ধীরে ধীরে দোতালায় নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই রাত্রিতে আমি মঠে বাস করিলাম। পরদিন রবিবার প্রাতে একটু বেলা হইলে স্বামীজী নীচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের গঙ্গা-তীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও স্বামী প্রেমানন্দজী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত ৺পূজার আয়োজন এবং নানাবিধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ আলোচিত হইল। নানা স্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ এবং বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে, জাতিবর্ণনির্বিচারে সকলকে এবং বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণগণকে পূজার দিবসত্রয় প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদগ্রহণের আমন্ত্রণ করিবার

কথা হইল। স্বামীজী গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে বলিলেন—"খরচের জন্য ভাবনা নেই—মহামায়ার ইচ্ছা, তা পূর্ণ হবে। নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে মা ঠাকরুণ সদল-বলে থাকবেন। একমাসের কম যখন ভাড়া দেবে না—তখন তাই স্বীকার করে নিতে হবে।" মহারাজ বলিলেন,—"ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে কোনও কুমোরই এত অল্প সময়ে নূতন প্রতিমা তৈয়ার করতে রাজী হল না। তৈয়ারী প্রতিমাতো কৃষ্ণলাল * পেলে না। একজনের মাত্র একখানি ফরমাশী প্রতিমা আছে, ৫।৭ দিন পূর্বে তার নেবার কথা ছিল, কিন্তু নেয়নি। কৃষ্ণলাল ঐ প্রতিমাখানি নিতে চাইলে—খুব ইতস্ততঃ করছে, আরও দুদিন অপেক্ষা করতে চাইছে।"—

স্বামীজী বলিলেন,—"বাবুরাম, তুই যা কৃষ্ণলালকে নিয়ে। যে টাকা চায় সেই টাকা দিয়ে প্রতিমাখানি কিনে ফেল্। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, তোরা গেলে সে রাজী হ'য়ে যাবে। আমিও তোদের সঙ্গে কলকাতায় যাব।"

গুরুভ্রাতারা অমনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুমি এখানে বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল থাকলে, তবে তো আনন্দময়ীর উৎসবে সকলে আনন্দোৎসব করতে পারবে।"

স্বামীজী বলিলেন—"মার কৃপায় ভাল থাকব, ভাবিস নি। প্রতিমা ঠিক করে মা ঠাকরুণকে নিমন্ত্রণের পর সিমলা আমার মার কাছে যাব, তাঁকে পূজোয় মঠে আসতে বলব। আজ রবিবার, এখনই নৌকা ঠিক কর, আর দেরি করা হবে না। প্রতিমাখানি না কেনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না।"

কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) নিকট শুনিলাম, দুইদিন আগে স্বামীজী নৌকায় কলিকাতা হইতে মঠে আসিবার সময় দেখিলেন যেন মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে, মায়ের প্রতিমাখানি চারিদিক আলো করিয়া শোভা পাইতেছে। মঠে নামিয়াই রাজা (মহারাজ) কোথায় খোঁজ হইল। মহারাজ আসিলে তাঁহাকে "এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়োজন কর্" বলিয়াই স্বামীজী তাঁহার দর্শনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মহারাজও বলিলেন,—"মঠে এই বেঞ্চিতে বসে গঙ্গাদর্শন করছি—এমন সময় দেখি, মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে একেবারে বেলতলায় উঠলেন।" তাহা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক্ এবার মঠে পূজো করতেই হবে।" মহারাজ বলিলেন, "সময় সংক্ষেপ—আগে প্রতিমা পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে হবে—দুদিন পরে তোমাকে কথা দেব।" এদিকে মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা আয়োজন ও নিমন্ত্রণ করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছেন, মঠে দুর্গোৎসব—স্বামীজীর ইচ্ছা কে রোধ করিবে?

যে প্রতিমা কুমারটুলিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার গ্রাহক আর আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রার্থিত মূল্য দিয়াই কিনিলেন।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন,—ধীরে ধীরে যত্নসহকারে ঠাকুর ঘরের নীচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি—আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তর দিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়—সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

* পরে স্বামী ধীরানন্দ

১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধন হইল—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন—"

স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমাও এইদিন কলিকাতা বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রী-জগজ্জননী দুর্গামায়ীর আজ বোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হইলেন পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন—তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রসুনচৌকীর সানাই মধুরস্বরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ কেহ ফলমিষ্টি প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীদুর্গা-মায়ীর শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশু-বলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন—একদিকে দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভূজা—দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ—বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমল-দলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপর দিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা—উপাস্য ও উপাসিকা ভাবে পূজামণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।

স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (প্রথম ভাগ) আছে—শ্রীমা বলিতেছেন, "পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা, একি হল এখন কি হবে?' নরেন বললে 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে ত খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হ্যাঁ মা, এই উঠলুম

আর কি'—বলে সুস্থ হ'য়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।" মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ স্বামীজীকে এদিক ওদিক পায়চারি, গল্প ও হাস্যকৌতুক করিতে দেখিয়াছি—সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে বসিয়া আছেন—কখনও গুণ গুণ স্বরে গাহিতেছেন—

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।"

রবিবার, মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী দোতালায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে—ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ।

পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা—ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ—স্বামীজী পূজা মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দনজবাবিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন? উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল,—ভাবগম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল—স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।

মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল।

৫ই কার্তিক মঙ্গলবার ৺বিজয়া দশমী। অপরাহ্ণে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে লোকারণ্য হইল। প্রতিমা যখন নৌকায় উঠান হইল—তখন ঢাক, ঢোল, রসুনচৌকী এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বাদ্য ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল, চারিদিকে "মহামায়ী-কী জয় দুর্গামায়ী-কী জয়" শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।—এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব ভাবময় মনোরম মধুর নৃত্য সকলে নির্বাক্‌ভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্যে ভিড়ে নীচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়া মঠের দোতালার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘনঘন উচ্চকণ্ঠে "মহামায়ী-কী জয়—দুর্গা মায়ী-কী জয়" ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা চলিল—প্রতিমার বিসর্জনে।

পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন। আজও বেলুড়মঠে দুর্গোৎসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী সাধুব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজায় যে আনন্দ ও অপূর্বভাব উদ্দীপিত হয়—তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

পূজার মুখ্য উপায় ও উদ্দেশ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের পুনরাগমনে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে শারদ লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রসাদ ও প্রভাব পরিব্যাপ্ত। তড়াগতটিনী ও সরিৎসরোবর বর্ষা-বারিপুষ্ট, কানায়-কানায় পরিপূর্ণ, জলচরসমাকুল, প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পে পরিশোভিত, সন্তরমান মৎস্য ও হংসের ক্রীড়াক্ষেত্র। স্থলে কাশকুসুম ও শেফালিকা পুষ্পে প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ, তৃণ-গুল্ম-লতা-পাদপে পুষ্প-পল্লবের সমাবেশ; ফলফুলে বনভূমি সুশোভিত, ক্ষেত্র-সকল শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। অন্তরীক্ষে নীলাকাশে বর্ষণলঘু ক্ষুদ্র বৃহৎ মেঘ-সম্ভারের ললিতলীলা; তন্নিম্নে শুভ্র বলাকাশ্রেণীর বিচিত্র বিহার। যামিনীযোগে দীপ্তিমান্ তারকা-পুঞ্জে পরিবেষ্টিত-শশাঙ্ক-কিরণে মহীমণ্ডল উদ্ভাসিত; মৃদুমন্দ বায়ুর স্নিগ্ধ সঞ্চলনে দেহমন পুলকিত। অভাব-অভিযোগের তিরোধানে প্রাচুর্যের সমাবেশ; আধিব্যাধির স্বল্পতা-হেতু গৃহস্থগৃহে সচ্ছলতা-প্রসূত সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজিত। এই তো জগজ্জননী দুর্গাদেবীর শুভাগমনের প্রকৃষ্ট সময়,—অন্নপূর্ণা অম্বিকাদেবীর পূজার্চনার যোগ্য কাল। দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য যে নাই, তাহা নহে; অশান্তি-উপদ্রব যে ঘটে না, তাহা নহে। তথাপি অন্যান্য ঋতুর তুলনায় শরৎকালই বসন্ত অপেক্ষা সমধিক প্রীতিপ্রদ। পীড়ারও এই সময় প্রচুর প্রশমন ঘটে।

পূজা আমরা কেন করি? পূজার সুমহান উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক উন্নতি। পুণ্যকামী গৃহীর অভীষ্ট কামনা-বাসনা সংযমন ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত দেহ ও মনের উৎকর্ষ-সাধন প্রয়োজন। আহারে যেমন দেহের পুষ্টি,—দৈবকর্মে তেমনি মনের তুষ্টি। মনই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনই দেহকে পরিচালনা করে। মনই সঙ্কল্পবিকল্পের কর্তা। প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন। মনের স্থিরতা ঘটিলে, সঙ্কল্প-বিকল্প থাকে না। সেই স্থির মনই আত্মা। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা—এই চতুষ্টয় একই। স্থান ভেদে, অবস্থা ভেদ; এবং অবস্থা ভেদে উপাধি ভেদ। প্রাণকে স্থির করিয়া, ভ্রূর ঊর্ধ্বে রাখিতে পারিলে মনরূপ উপাধির নাশ হয়—মন আত্মার স্বরূপ ধারণ করে। মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে, তখন তদ্ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কণ্ঠের ঊর্ধ্বে থাকিলে সাত্ত্বিক ভাব, নাভির ঊর্ধ্বে ও কণ্ঠের নিম্নে থাকিলে রাজসিক ভাব এবং নাভির নিম্নে আসিলে তামসিক ভাব। মন সর্বদাই সুখলাভের জন্য লালায়িত। চঞ্চল মন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে আসক্ত হয়, কিন্তু কোথাও সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না। এই চঞ্চল মন কোথায় ও কিরূপে অবিচলিত ভাবে শান্তিলাভ করিতে পারে—তাহাই সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানহেতু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—অভ্যাসযোগের বিশ্লেষণ। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করা যায়। মনের স্থির অবস্থা কিরূপ?

মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনম্।
বায়ু স্থিরো যত্র বিনাবরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যত্র বিনাবলোকনম্॥

সাধকের মন যখন সাধনা দ্বারা এইরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া, সাত্ত্বিকী বৃত্তি লাভ

হয়। ইহা অতি দুরূহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগ সহজ-সাধ্য হইতে পারে না; এবং বৈরাগ্যও সহজ-লভ্য নহে। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন উপাধি ধারণ করে এবং সেই মন হইতেই সৃষ্টি। আত্মা যখন নির্গুণ, তখনই তাহার নাম পুরুষ; আর যখন সগুণ, তখন তাহার সংজ্ঞা প্রকৃতি। আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গুণের স্থান। সংযম-সাধন, অর্থাৎ অভ্যাস-যোগ দ্বারা, মনকে ভ্রূর উর্ধ্বে রাখিতে পারিলে, উপাধির নাশ ঘটে। সাধক তখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দেখেন। আর সাধন-দ্বারা কণ্ঠের উর্ধ্বে মন রাখিতে পারিলে, রজস্তমঃ অতিক্রম করিয়া কেবল মাত্র সত্ত্বগুণে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থান করা যায়। তখন তিনি এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত দেখেন। আজ্ঞাচক্র হইতে অধোদেশে থাকিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি। সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থায় সাধক যে সকল কর্ম করেন, তৎসমুদয়ই সাত্ত্বিক কর্ম; কারণ তখন তিনি কামনাশূন্য। ইচ্ছা থাকিলেই কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ইচ্ছারহিত হইয়া কর্ম করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। কর্ম না করিয়া কর্মত্যাগকে ত্যাগ বলে না।

পূজার্চনার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন—এই মন। চঞ্চল মন লইয়া কোন কার্য করা সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে কার্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। প্রাণ চঞ্চল বলিয়া মনও চঞ্চল। প্রাণ বিনাবরোধে স্থির হইলে, মনও বিনাবলম্বনে স্থির হয়। যতদিন মনের চাঞ্চল্য একেবারে না যায়, ততদিন অনন্য ভক্তি হয় না। যে অবস্থায় মন রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদির দ্বারা বিচলিত না হয়, তাহাই অনন্য ভক্তির অবস্থা। যতদিন ফলাফলে লক্ষ্য থাকে, ততদিন কিছুতেই মনের স্থিরতা জন্মে না। অথচ মন স্থির না হইলে পূজার্চনা তো দূরের কথা, কোন কর্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। এই হেতু সাধনদ্বারা মন স্থির করিতে হয়। মন স্থির করিতে পারিলে, সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়,—ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। প্রাণের সংযম, অর্থাৎ স্থিরতা হইলে, বাক্য, শরীর ও মনের সংযম হয়। প্রাণ কি?

প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ ॥

প্রাণই ভগবান্। ভগবান্ প্রাণরূপে প্রতি ঘটে (জীবে) ও সর্বত্র সমানভাবে বিরাজিত আছেন। প্রাণায়ামই আমাদের মুখ্য ধর্ম। এই হেতু আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। প্রাণকর্মই আত্মকর্ম। আত্মকর্ম—আত্মযোগ। প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইলে উপরে উল্লিখিত সাত্ত্বিকী ধৃতি লাভ হয়। তখন —শম, দম, তপঃ, শৌচ প্রভৃতি স্বাভাবিক কর্মে পরিণত হয়; অর্থাৎ এসব কর্ম চেষ্টা বা ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। আত্মকর্মদ্বারা মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে পারিলে, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষার ত্যাগ হয়; নতুবা ব্রতপূজাদির সময় মন তণ্ডুলমিষ্টান্নাদি উপকরণের দিকে থাকে। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রতপূজাদি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে স্থির মন ও শুদ্ধ চিত্তের একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥

অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত মোহজালে সমাবৃত এবং কামভোগে আসক্ত হইলে, নরকে নিপতিত হইতে হয়। পূজাপার্বণে—"সত্ত্বসংশুদ্ধি" অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা, বিশুদ্ধতা ও উপরতি এবং দুঃখ প্রভৃতি অবসাদেও চিত্তের দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক। হিংসা-দ্বেষ-শূন্যভাবে তদ্গতচিত্ত না হইলে দেবতার প্রসাদলাভ ঘটে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।

মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদয়

সাংসারিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। সুতরাং তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পূজা ও প্রার্থনা করিতে হইবে। পূজা দ্বিবিধ। বাহ্য ও মানস। মানস পূজা যতির ধর্ম অর্থাৎ যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ সাংসারিক লোকের পক্ষে বাহ্য পূজা বিহিত। ঘট-পট-প্রতিমাদিতে পঞ্চ, দশ বা ষোড়শ উপচারে পূজাকে বাহ্য পূজা বলে। বাহ্য পূজা হইতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে, মানস পূজার অধিকার জন্মে। মানস পূজার অর্থ —মনে মনে পূজা। শান্ত, দাস্য অথবা সখ্য,— যে কোন ভাবে, নিজের ইষ্টে-ঈশ্বরত্ব আরোপ পূর্বক অথবা বিরাট ঈশ্বরের কোন এক শক্তিকে ধ্যেয়মূর্তিরূপে হৃদাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে হয়। ইহাতে ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি উভয়ই পরিবর্জনীয়। তবে যাঁহারা সাধারণ গৃহস্থ—পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়-স্বজন লইয়া ঘরসংসার করেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা অসম্ভব। তাঁহারা প্রার্থনা করেন,—

"বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্"। এবং "বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।" মা আমাদের কল্পতরু। আমাদের অদেয় তাঁহার কিছুই নাই। আমরা ধন, পুত্র, কলত্র—যাহা চাই, তাহাই পাইতে পারি, যদি আমরা তাহা পাইবার উপযুক্ত হই, আর তাহাতে যদি অন্যের কোন অনিষ্ট না ঘটে।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র মজুমদার

গত ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট, ১৯৫৪) বৃহস্পতিবার, ৬৭ বৎসর বয়সে খ্যাতনামা দেশসেবক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশে এবং বিদেশে যাঁহারা এই দৃঢ়চরিত্র চিরকুমার অক্লান্ত কর্মযোগীটিকে জানিতেন তাঁহারাই শোকবিহ্বল হইয়াছেন। মুদ্রণ-শিল্প ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত সাফল্যই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র কথা নয়। দেশসেবার আরও বহুতর ক্ষেত্রে সুরেশ বাবুর মনীষা, অধ্যবসায় এবং কর্মোদ্যমের ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিত তাঁহার বহু বৎসরের সংযোগ ছিল। সেই সূত্রে সুরেশ বাবুর উদার চরিত্র ও পরদুঃখকাতরতার আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁহার ন্যায় মানবহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন দেশসেবকের অভাব বাস্তবিকই অপূরণীয়। বঙ্গজননী ও ভারতমাতার এই কৃতী পুত্রের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ—লেবাননের বিখ্যাত কবি ওয়াদি কারিস বোস্তানি ছয়খানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। উহাদের নাম—রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, শকুন্তলা, নলদময়ন্তী এবং পুরাণ। সম্প্রতি ভারতসরকার ছয় হাজার ষ্টার্লিংএ অনুবাদের পাণ্ডুলিপিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন।

লণ্ডনে ভারতীয় শিল্পীদের সমাদর—লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্‌স্টিট্যুটে বর্তমানে কমনওয়েলথ শিল্পীদের যে দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী

অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের শিল্পকলা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের শিল্পীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছে। গত ২রা জুলাই লণ্ডনস্থ অষ্ট্রেলীয় হাইকমিশনার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে যে সকল ভারতীয় শিল্পী অংশ-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন পি, চন্দ্র দে। মিঃ দের চারখানি ছবি প্রদর্শিত হইতেছে। অপর একজন ভারতীয় শিল্পীর নাম হইল জে. অধিকারী। এই প্রদর্শনীতে তাঁহার তিনখানি ছবি প্রদর্শিত হইতেছে। অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের নাম হইল—ওম্ স্বরূপ (একখানি ছবি), এফ. এন. সুজা (চারখানি ল্যাণ্ডস্কেপ), দুর্গা লাল (দুইখানি ছবি), এ. টমাস (দুইখানি ছবি), এবং এস. কে. বাখড়ে (যাঁহার 'ক্রুসিফিকশন' নামক কাঠ খোদাইয়ের কাজটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছে)। —ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস্।

সমুদ্রগর্ভে যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি—গত ২৯শে আগষ্ট, ইতালীর সান্‌ফ্রতোসোর নিকট অগভীর উপসাগরে সমুদ্রমগ্ন নাবিক ও ধীবর প্রভৃতির স্মৃতিতে জলের ৩৫ফুট নিম্নে জনৈক ইতালীয় শিল্পী-নির্মিত ভগবান্ যীশুর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। আটফুট উচ্চ এবং ৮০ টনেরও অধিক ওজনের দণ্ডায়মান মূর্তিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। জলগর্ভে যীশুর মূর্তিস্থাপন ইতিহাসে এই প্রথম। সকলে আশা করিতেছেন, উক্ত স্থানটি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের নিকট একটি তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হাওড়া 'বিবেকানন্দ রোভার্সক্রু'—এই প্রতিষ্ঠানের ১৩৬০ সালের অষ্টাদশ বার্ষিক সুলিখিত কার্যবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য স্কাউটধর্মের দশটি নিয়মকে বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ করিয়া জনসেবা করা। বর্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা ৪৯। আলোচ্য বর্ষে সভ্যগণের শান্তিনিকেতন ভ্রমণ, গড়পা গ্রামে রাস্তা-নির্মাণ ও সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়টির উৎকর্ষ-সাধন, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুণ্য-ভূমি জয়রামবাটীতে সেবাকার্য, কলিকাতা Blood Bankএ রক্তদান, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি কার্য উল্লেখযোগ্য। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সাঁত্রাগাছিতে অনুষ্ঠান—সাঁত্রাগাছি (হাওড়া) পাবলিক লাইব্রেরী সাহিত্য-সমিতির উদ্যোগে রামরাজা পূজামণ্ডপে সম্প্রতি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মাতৃবন্দনা করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

সাঁতরাগাছি ইনষ্টিটিউট-প্রাঙ্গণে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর রেলকর্মী ও নিকটবর্তী গ্রামের সর্বসাধারণের সহযোগিতায় গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে সারাদিন ধরিয়া শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর আনন্দ-উৎসব পালিত হইয়াছে। উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল ভজনগীতসহ নগর-পরিক্রমা, বিশেষপূজা ও হোম, ধর্মসভা ও কীর্তন। পূজাদি নির্বাহ করেন শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। বিশিষ্ট অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধাচৈতন্য।

চন্দ্রকোণায় অনুষ্ঠান—চন্দ্রকোণা শহরে (মেদিনীপুর) গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ দশহরা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, পূজাপাঠহোমাদি, রামনাম সঙ্কীর্তন, সভা, ছায়াচিত্রসহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি হয়। প্রায় ছয় শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভবানন্দ, এবং বেলুড়মঠের স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, স্বামী মুকুন্দানন্দ ও স্বামী প্রশান্তানন্দ যোগদান করেন।



জাগো যোগি!

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখস্ফূর্তিঃ প্রিয়াসু স্থিতা।
তৎ সংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধ্বা বুধা বোধকা
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্॥
—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৩৪

সাগরের বুকে তরঙ্গের নৃত্য দেখিয়াছ কি? কত উঁচু মাথা তুলিয়া এক একটি ঢেউ নাচিয়া আসে, কিন্তু কতক্ষণই বা থাকিতে পারে? চকিতে সেই সমুন্নত রূপ ভাঙিয়া পড়ে, ঢেউ নিরবয়ব জলে মিলাইয়া যায়। বিষয়ভোগসুখও এইরূপই। যখন আসে, কত উঁচু হইয়াই আসে, কত শক্তি কত আনন্দ কত আকর্ষণই না বিস্তার করে, কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অস্থির তরঙ্গভঙ্গের মতো তাহাদেরও প্রকৃতি যে ভাঙিয়া পড়া, মিলাইয়া যাওয়া।

দেহের মধ্যে প্রাণের নৃত্যবিলাস কী অদ্ভুত! শিরায় উপশিরায় রক্তের প্রবাহ, লক্ষ লক্ষ জীব-কোষে সুসংহত জীবনীশক্তির পরিবিস্তার, শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরামহীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সহস্র সহস্র স্নায়ুমণ্ডলীতে বিস্ময়কর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আশ্চর্য সহযোগিতা—এই সকলই প্রাণের লীলা। কিন্তু হায়, এ লীলা বরাবর উপভোগ করা যায় না। সহসা রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়ে। অকস্মাৎ একদিন প্রাণের নৃত্য থামিয়া যায়।

প্রিয়ার সাহচর্যে যৌবনের সুখের দিন কাহার না কাম্য? কিন্তু সেদিনগুলির সংখ্যা কতই না অল্প! দিনের প্রকাশের দিকে চাহিতে না চাহিতেই দিনান্তের কৃষ্ণ অন্ধকার চক্ষুকে আচ্ছন্ন করে। শিথিল জরা ক্রূর হাসিয়া চকিতে উৎফুল্ল যৌবনের গলা চাপিয়া ধরে।

এই তো সংসার। ভাবা যায় কতই না সার—মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বলে, সঙ্‌ই শুধু সার। শুধু আলেয়ার আলো—মরুপ্রান্তরে জলের ভ্রম—কায়াহীন ছায়া। নিখিল সৃষ্টি জুড়িয়া এই নিঃসার 'সঙ্‌'-সার খেলা চলিয়াছে। যদি চোখ থাকে তো ধরিতে পারিবে, বুদ্ধি থাকে তো বুঝিতে পারিবে।

জাগো বোধিসত্ত্ব! সংসার-প্রহসন-বিড়ম্বিত শত শত ক্লান্ত পথিক তোমারই দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদিগের ভাগ্য-লাঞ্ছনা দেখিয়া সহানুভূতিতে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। ক্ষণিক সুখসম্ভোগের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইবার সময় তো তোমার নাই। এই জীবনে, এই দেহেই সত্য লাভ করিবার বিপুল আগ্রহ তোমার সমগ্র মনঃপ্রাণকে মাতাইয়া রাখুক।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি

"টাকা মাটি, মাটি টাকা"

তখন মনে হইয়াছিল ইহা একজন অত্যুগ্র-উৎসাহশীল অধ্যাত্ম-সাধকের ব্যক্তিগত মানস-প্রতিচ্ছবি—একান্তই সীমাবদ্ধ উহার পরিধি। বৈরাগ্য সকলের জন্য নয়—কঠোর বৈরাগ্য আরও অল্পজনের। টাকার মূল্য যে একেবারেই মৃত্তিকা, মাটি ও টাকা দুয়েরই মর্যাদা যে একই- এই দুঃসাহসিক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে পারেন বলুন, কিন্তু সমাজের রাম-শ্যাম-মালতী-মাধবীকে ইহা শুনাইবার প্রয়োজন নাই, শুনাইলে বরং ক্ষতি আছে, সম্পদ্-বৃদ্ধিতে ঔদাস্য সমাজপ্রগতির মারাত্মক প্রতিবন্ধক। শ্রীরামকৃষ্ণও ইহা অস্বীকার করিতেন না; ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মানুষের সম্মুখযাত্রার এই চারিটি ধাপ-সংযুক্ত সনাতন ধর্মের বহু-পরীক্ষিত সর্বসম্মত ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিলে তাঁহাকে 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' বলিয়া প্রণাম করিতাম না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের বাণী শুনিয়াও তাই আমরা তখন ভয় পাই নাই। জানিতাম, তিনি নিজে 'ষোল টাং' করিয়াছেন, আমাদের এক টাং বা দু', তিন, সাড়ে তিন টাং করিলেই চলিবে। "টাকা মাটি, মাটি টাকা"—উক্তির শিক্ষা তাই নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের কোন কথাই তখন উঠে নাই। অবাধ বিত্তসঞ্চয়ের সহিত ধর্ম-জীবনের কোন বিরোধ নাই ইহাই বুঝিয়াছিলাম এবং এই জন্য নেড়ামাথা সন্ন্যাসীদের মঠের ন্যায় পুত্রকলত্রাধিশ্রিত গৃহে গৃহেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠাকুরের আসন স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হই নাই।

কিছু ভুল বুঝিয়াছিলাম। অন্তর্যামী হাসিতে-ছিলেন—একদিন যেমন আতঙ্কাভিভূত ভাবী বিবেকানন্দের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ।* তাঁহার সামান্য একটি উক্তিরও যে গভীর অর্থ আছে, তাঁহার সাধন-জীবনের প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপের যে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে তাহা তিনি তখনই খ্যাপন করিতে ব্যস্ত হন নাই। আজ বোধ হয় আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি অশ্বত্থামার তূণীরে অলস-ভাবে-পড়িয়া-থাকা বাণটি স্বয়ং ব্রহ্মাশির অস্ত্র—যখন অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা ঈপ্সিত জয়লাভ ঘটিয়া উঠে না তখন মন্ত্রপূত করিয়া উহা প্রয়োগ করিলে পলকে মহাশক্তি জ্বলিয়া উঠে, মহাবীর অর্জুনকেও ভয় পাইতে হয়। ধনতৃষ্ণা-মত্ত পৃথিবী প্রাচীনকাল হইতে অনেক সদুপদেশ শুনিয়াছে—'দান কর', 'পরদ্রব্যে লোভ করিও না' 'তীর্থ-দেবসেবা-ব্রাহ্মণসেবা-লোকহিতে ব্যয় কর' ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর লোক কখনো কিছু শুনিয়াছে, কখনো একেবারেই শুনে নাই; সবটা

* "তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' অদ্ভুত পাগল আমার ঐকথা শুনিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্ত দ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।' (স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ৩।৪)

শুনিয়াছে এমন ব্যক্তি খুব বিরল। বিত্তের প্রতি স্বাভাবিক স্পৃহা মানুষকে সদুপদেশ কাজে লাগাইতে দেয় না। সরিষায় ভূত ঢুকিয়া থাকে। মানুষ পরলোকের ভয়ে, পৌরোহিত্যের চাপে, নীতির খাতিরে কিছু দান করে, কিন্তু নিজের কোলে শতগুণ ঝোল টানিয়া রাখে। দানে প্রচুর ফাঁকি রহিয়া যায়। দান করিয়াও দাতার ধন-স্বার্থ সম্পূর্ণ-ই বজায় থাকে। বিত্তবানদের এই স্বভাব যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা সহিয়া যাইতেন। ভাবিতেন, আহা উনি কিছু তো দিয়াছেন—নিজের টাকা আছে, জমান্ না, ক্ষতি কি? আবার না হয় পরে কিছু চাওয়া যাইবে—আরও কিছু তখন পাওয়া যাইবে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এইরূপ একটা বোঝাপড়া চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু 'অজীর্ণ' তখন সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর ঘরোয়া অসুখ মাত্র, কিছু টোটকা দুচার দিন ব্যবহারেই সারিয়া যায়; মারাত্মক সান্নিপাতিক ব্যাধিরূপে উহা তখনও সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। তখনকার ধনতৃষ্ণা ও আজিকার যুগের বিত্তস্পৃহা—এই দুইয়ে বিপুল পার্থক্য। ধন উপার্জনের ও সঞ্চয়ের তখন একটা বাঁধাধরা রাস্তা ছিল। উদ্যমশীলরা সেই রাস্তায় গিয়া অভিলষিত সম্পদের অধিকারী হইত। কিন্তু হাজার হাজার লোক বিরাট প্রাসাদ, যানবাহন, দাসদাসী, বিবিধ ভোগসম্ভারের কথা ভাবিত না—ভাবিত, 'ও সব যে দু দশজনের তাহাদেরই থাকুক। একদিক দিয়া তাহারা তো সমাজের শক্তি, শোভা বটে। আমরা—সাধারণেরা চাষবাস কুটীরশিল্প লইয়া মোটাভাতকাপড় ও সাদাসিধা আশ্রয়ে সন্তুষ্ট থাকিব।' ধনোপার্জনের প্রচলিত রাস্তায় না গিয়া যাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে ঐশ্বর্য আহরণের চেষ্টা করিয়াছে তখনকার ইতিহাসে তাহাদের নাম কলঙ্কিতই হইয়া আছে যেমন, সুলতান মাহ্‌মুদ।

আজ কিন্তু অন্য দিন আসিয়াছে। আজ কাঞ্চনাসক্তি মানুষের অন্যান্য সকল আসক্তিকে গৌণ স্থান দিয়া ব্যষ্টির ও সমষ্টির মনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। টাকাই আজ মানুষের ধ্যান, জ্ঞান, লক্ষ্য। টাকা রোজগারের কোন লোকসম্মত বিবেক-সঙ্গত পথও নির্দিষ্ট নাই। ন্যায্য অন্যায্য যে কোন উপায়ে সোনারূপার তাল করায়ত্ত করিতে পারিলেই হইল। এই তৃষ্ণা শুধু মসনদধারী একা সুলতান মাহ্‌মুদের নয়—সমাজের প্রত্যেক স্তরে অধিষ্ঠিত সহস্র সহস্র লোকের। জীবনের মান উন্নয়নের স্লোগান আওড়াইয়া বিত্তাধিকারের কী দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষা, কী অবিশ্রান্ত চেষ্টা! কে কত অপরকে দাবাইয়া, বঞ্চিত করিয়া কত বৃহৎ মোহরের থলি দখল করিতে পারে ইহাই রঙ্গমঞ্চের উত্তেজনাবহ দৃশ্য। জীবন-মান-উন্নয়নেরও কোন মান নাই। যাহাদের বঞ্চিত জীবনের মান উঠানো একান্তই দরকার তাহারা নীচুতেই পড়িয়া থাকে। বিত্তবানেরা তাহাদের কথা সহজেই ভুলিয়া যান—নিজেদের ভোগ-পরিধি বাড়াইয়া চলিতে চলিতে তাঁহাদের নীচুতে তাকাইবার সময়ই বা কোথায়? বাড়ী—একখানা, দু'খানা, দশখানা দশরকমের স্থাপত্যে; গাড়ী—একটি, দুটি, পাঁচটি পাঁচপ্রকার মডেলের; অশন, বসন, ব্যসনের শত সহস্র বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার; ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক—তবুও তাঁহাদের 'জীবনের মান' লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই! চাই—চাই আরও চাই। এই 'মান-উন্নয়নের' শৃঙ্খলহীন দৌড়কে কেহ আজ শাসন করিতে পারে না—কোন ঐতিহাসিক ইহাকে দস্যুতা বলিয়া গালি দেয় না। ইহা আজ মানুষের বরণীয়তম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে অর্থের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পরিকল্পনাতেও ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে অর্থের বর্তমান সর্বগ্রাসী প্রধানত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নাই, ধর্মসঙ্গত বিত্তসংগ্রহেরই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কাঞ্চনের এবং কাঞ্চনলভ্য ভোগসম্ভারের প্রতি উন্মত্ত তৃষ্ণা

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে শিখিয়াছি। এই তৃষ্ণার ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে কী ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে তাহা আজ আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

যাহারা অর্থসঞ্চয়ের সিঁড়িতে অনেক নিম্ন-সোপানে পড়িয়া আছে—মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত, বা সর্বহারার দল—তাহারা শীর্ষোপনীত বড়লোকদের গালি দেয়, কিন্তু বড়লোক হওয়ার অভিলাষটিকে সারাপ্রাণেই নিজেরা পোষণ করে। একজনকে বড়লোক হইতে গেলে যে দশজনকে দারিদ্র্যভোগ করিতেই হইবে, বঞ্চিতরাও যদি ভাগ্যক্রমে বাড়ী-গাড়ী টাকার থলির মালিকানা লাভ করে তাহারাও যে অপর শত শত বঞ্চিত সৃষ্টি করিবে, উহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার কথাও তখন মনে থাকিবে না—এই অর্থ নৈতিক সত্যটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে না। ফলে কাঞ্চন-তৃষ্ণা একটি সাংঘাতিক গুপ্ত রোগের মতো সমগ্র সমাজ-মনে বাসা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের দেহে কখন কি ভাবে কোথায় উহা কি বিস্ফোটকের জন্ম দিবে কেহ জানে না। সামান্য তোকমারির পটিতে সে দুষ্টব্রণ হয়তো ফাটিবে না। সময়মত শক্তিমান প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন।

কিছু স্পষ্ট কথা, সাহসের কথা বলিবার বোধ করি তাই সময় আসিয়াছে। যাহারা শুনিবে তাহারা সকলেই হয়তো মাদকের নেশায় সম্বিৎ-হারা কিন্তু তবুও নেশা কাটাইবার ব্যবস্থায় দেরি করা উচিত নয়। হয়তো দুচার জনের অর্ধজাগ্রত কানে একটি আধটি কথা প্রবেশ করিবে—হয়তো তাহাদের হুঁশ ফিরিবে। সেই দুচারজনকে দেখিয়া আরও দশ বিশ জন জাগিয়া উঠিবে।

ব্রহ্মশির অস্ত্র অশ্বথামারই তূণে আছে। সেই দুঃসাহসিক বাণী ভারত-সন্তান ব্যতীত অপর কেহ উচ্চারণ করিতে পারিবে না। বিত্ত যে মানুষের চরম ও পরম সন্ধান নয়, সে কথা অধ্যাত্ম-ভারত তাহার বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি-পুরাণে একদিন নানাভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগে-নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ—"ধন দ্বারা নয়, প্রজাবৃদ্ধির দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।" মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন—যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাং কথং তেনামৃতা স্যামিতি—"ভগবন্! এই সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্তদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমার অধিকারে আসে তাহা হইলে, আমি কি সেই সামর্থ্যে অমর হইতে পারিব?"

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ, অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। "যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না, তাহা হইবার নয়। যেমন সংসারে প্রচুর ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া লোকে আরামে থাকে সেইরূপই পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন তুমি লাভ করিতে পারিবে মাত্র, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।" আমাদের পুরাণে যযাতির কথা আছে। সহস্র বৎসর যৌবনের বিবিধ ভোগসুখে মত্ত থাকিয়াও তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। পরিশেষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

"উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত পড়িলে আগুন যেমন আরও জলিয়া উঠে সেইরূপ ভোগ বাড়িতে বাড়িতে বাড়িয়াই চলে।"

ভারতবর্ষের জীবনে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া পৃথক্ একটি কক্ষ কখনো ছিল না। মানুষের সমস্ত জীবনটাই 'আধ্যাত্মিক' করিয়া তুলিবার রীতি তখন জীবন-প্রণালীর মধ্যে ছিল। উপরোক্ত উদ্ধৃতি-গুলির দৃষ্টিভঙ্গী তাই শুধু সন্ন্যাসীরাই সাধিতেন না, গৃহস্থরাও অভ্যাস করিতেন। গৃহস্থের পক্ষে ধনোপার্জন ও সঞ্চয় নিন্দনীয় ছিল না—নিন্দনীয়

ছিল বিত্তসর্বস্বতার মনোবৃত্তি, লোভ, অপরকে বঞ্চিত করিয়া স্বাধিকার রক্ষা। বিত্ত মানুষের জীবনের অন্যতম অভীষ্ট কিন্তু একমাত্র অভীষ্ট নয়, অপরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিলেই সঞ্চয়ের সার্থকতা—এইটিই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শের প্রচার ও প্রয়োগ ব্যাপকভাবে ভারতীয় সমাজে এক সময়ে হইয়াছিল। বিত্ত তখন সমাজের মঙ্গল ছিল—মানুষের কলহ ও হিংসার উৎস ছিল না। বিত্তকে আজ আবার তাহার যথার্থ স্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইলে ভারতের ঐ আদর্শকে পুরোভাগে আনিতে হইবে। এইজন্য 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—উক্তির মহাশক্তিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। মনে করিব না উহা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রেই মাত্র প্রযোজ্য, উহা শুধু একটি আধ্যাত্মিক বুলি—আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উহার কোন সার্থকতা নাই। না—না—না। মন্দাকিনী-ধারা যদি ভাগীরথী হইয়া মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াই থাকে তাহা হইলে ষাট সহস্র সগর-সন্ততির তৃষ্ণা না মিটিলে বৃথাই সে অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা পেটিকায় বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সঞ্চিত হয় নাই। বিকারগ্রস্ত পৃথিবীর কাঞ্চন-জ্বর উপশমিত করিবার জন্য 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—সকলকেই শুনাইতে হইবে। বিত্তহীনকে বলিবনা বিত্ত চাহিওনা; বলিব—চাও, কিন্তু বিত্তের মূল্য ভুলিও না। ভুলিলে তুমিও যখন বিত্তবান হইবে তখন তোমারও মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। বিত্তবানকে বলিবনা,—তুমি টাকার থলিগুলি সাগরের জলে ফেলিয়া দাও। বলিব,—মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্, তোমার লোভকে সংযত কর দশজনের সর্বনাশ করিয়া নিজের পুঁজিবৃদ্ধির অধর্ম ত্যাগ কর, টাকা ছাড়াও জীবনের অপর আর দশটা বৃহৎ বরণীয় আছে সেগুলিরও অনুশীলন কর।

দরিদ্রের জীবন-মান উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার,—জাতির ঐহিক উন্নতিমূলক এইসকল পরিকল্পনার সহিত 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—আদর্শের কোন বিরোধ নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ হন্তি ন নিবধ্যতে॥

"যাঁহার অহঙ্কার-ভাব নাই, বুদ্ধি যাঁহার আসক্ত নয়, তিনি সমস্ত লোক হনন করিয়াও বস্তুতঃ হনন করেন না এবং তাহার ফলে কর্মবন্ধনও প্রাপ্ত হন না।"

দৃষ্টির পরিশুদ্ধি থাকিলে বাহিরের কর্ম মানুষের মনকে বাঁধিতে পারে না। যে কর্মের পশ্চাতে থাকে স্বার্থপরতা, লোভ, দম্ভ, বিদ্বেষ সে কর্ম ব্যষ্টি ও জাতিকে অবনত করে। ভারতবর্ষের বাণী মানুষকে এই দিকে অবহিত হইতে বলিয়াছে। সংসারের উন্নতি অবশ্যই কাম্য কিন্তু মানুষের আত্মাকে মারিয়া ফেলিয়া নয়। এমন কৌশলে আমাদিগকে জাগতিক অভ্যুদয়ের ব্যাপৃতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে জাগতিকতা আমাদের মনুষ্যত্বকে না গ্রাস করিয়া বসে। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—সেই কৌশল-বিধায়ক নির্দেশ, বিত্ত-পরিশোধনের শক্তিমন্ত্র। বিশ্বপ্রসারী বিত্ততৃষ্ণারূপ যে মারাত্মক ব্যাধি মানুষকে—মানুষের সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনাকে আজ ধ্বংস করিতে বসিয়াছে সেই ব্যাধি কাটাইতে গেলে দুর্বল দুই চারটি নীতিকথায় কুলাইবে না! তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ তীব্র ভৎর্সনা—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' যাহাকে এতই রমণীয় মনে করিতেছ, যাহার জন্য এতই আত্মবিভ্রান্ত হইয়াছ, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি বিসর্জন করিতে বসিয়াছ—দেখ, তাহার মূল্য-নিরূপণ করি। তাহার মূল্য পদতলের এই হেয় মৃত্তিকা! মানুষের বিবেক যখন একেবারেই ঘুমাইয়া পড়ে তখন অনুনয়, মিনতিতে সে বিবেক জাগে না; জাগে কঠোর ভৎর্সনাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু একটু করিয়া আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছেন সঞ্চয়-পেটিকা-গোপনেচ্ছু আমাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিতে। অদ্ভুত পাগলের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শুধু 'এক টাং' করিয়া পালাইলে চলিবে না। হাসপাতালে নাম লেখানো হইয়াছে, ব্যাধি—আমাদিগের কাঞ্চন-জ্বর আরোগ্য না হইলে ছুটি নাই। আমাদিগের হাতেও ত্রেকেটে তাক্ না উঠিলে তাঁহার নিজের তবলার বোল সাধা সার্থক হইবে না। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' তাই শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা নয়, আমাদেরও সাধনা।

বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা

গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা শ্রীকুমুদবন্ধু সেন লিখিত 'বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎসব'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনেক পাঠক-পাঠিকার নিকট আমরা ইহার জন্য অভিনন্দিত হইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠের অধ্যাত্মসাধন-রীতির একটা দিকের বিশেষ পরিচয় উক্ত লেখাটি হইতে পাওয়া যায়। ধর্মের যেমন একটা তাত্ত্বিক (metaphysical) দিক আছে, তেমনি উহার আর একটি দিক হইতেছে ক্রিয়া (rituals)। ক্রিয়াকে একেবারে বাদ দিলে ধর্ম বাস্তব জীবনের সহিত সংস্পর্শশূন্য হইয়া একটি নীরস দার্শনিক বিচারমাত্রে পর্যবসিত হইতে পারে। উহা তখন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বিপদ। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু উপাসনামূলক ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুধর্ম বরাবর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া এই ধর্মে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অনেক বেশী। তত্ত্ব এবং ক্রিয়ার সামঞ্জস্যরক্ষাই হিন্দুধর্মের আদর্শ। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে কখনও কখনও অবশ্য এই সামঞ্জস্য ব্যাহত হইয়াছে দেখিতে পাই। হয়তো তত্ত্ব পিছনে পড়িয়া গিয়া আচারবাহুল্যে মানুষ মত্ত হইয়াছে, অথবা ক্রিয়াকে অনাদর করিয়া শুষ্ক তত্ত্ববিচারে সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, এইরূপ সঙ্কটকালে কোন শক্তিশালী আচার্য আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় ধর্মজীবনের এই গরমিল দূর করিয়া দিয়াছেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষানুযায়ী তাঁহার এই বিষয়ে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। স্বামীজীর বিবিধ বক্তৃতা ও রচনাবলীতে ইহার সম্যক্ দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। বেলুড়মঠে যেভাবে তিনি দুর্গাপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মের দিকে কি ধরনে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজসিক আড়ম্বর পরিবর্জন করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শুদ্ধভাবে দেব-দেবীর আরাধনা—ইহাই স্বামীজী চাহিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠ এই আদর্শ লইয়াই দুর্গাপূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সংসার-কামনা-বর্জিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সাত্ত্বিকীপূজার পরিবেশ সত্যই দেখিবার মতো। এবারও সহস্র সহস্র নরনারী মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে দশভুজার ত্রিদিবসব্যাপী সেই মহাপূজা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কত শ্রদ্ধা, কত সংযম নিষ্ঠা সতর্কতা, কত শিক্ষা যত্ন মমতার প্রয়োজন হয় মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিৎসত্তার আবির্ভাব ঘটাইতে—তাহাই দর্শকগণ অনুভব করেন বেলুড়মঠের পূজামণ্ডপে বসিয়া।

বেলুড়মঠের যে সকল শাখাকেন্দ্রে এবার প্রতিমায় দুর্গোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল সে সকল স্থানের পূজাও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ সকল পূজাও যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, 'হাঁ, ঠিক মায়ের পূজা দেখিলাম বটে।'

স্মরণে

গত ২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) অপরাহ্নে কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে বাঙ্গলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক এবং বহুশ্রদ্ধা-ভাজন দেশহিতব্রতী, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরলোকগমনে আমরা স্বজন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। বাঙলাদেশের শিক্ষিত জনসাধারণ এই তেজস্বী কর্মীকে সহজে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার ৬৩ বৎসরের জীবন যেমন একদিকে অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা ও জন-সেবাদ্বারা সমুজ্জ্বল, অপর দিকে তেমনি উহাতে লক্ষ্য করিবার ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত মানস-প্রগতি, দৃঢ়চিত্ততা, আবার আর্তের প্রতি কোমল সহানুভূতি, বন্ধুবাৎসল্য, উদার লোকব্যবহার। স্বামী বিবেকানন্দের বৃহৎ বাঙলা জীবনী সত্যেন বাবুর অন্যতম সাহিত্য-কীর্তি। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি উদ্বোধনে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতে-ছিলেন। গতবৎসর (১৩৬০) আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধীয় তাঁহার মনোজ্ঞ স্মৃতিকথা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্বোধনে সত্যেন বাবুর শেষ রচনা শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তীসংখ্যায় প্রকাশিত—'সারদাদেবী'-নামক স্মৃতিকাহিনী। প্রবন্ধের শেষ কথাগুলি—

> "মার স্নেহ ক্ষমা আশীর্বাদ বিনা চেষ্টায় অর্জিত সম্পদের মত পাওয়ার পর, আর কিছুর জন্যে কাঙালপনা কোনদিন করিনি। তাঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম, জীবনের সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের পুণ্যক্ষণগুলি স্মরণ করে আজো চিত্ত-মন-বুদ্ধি ক্ষোভহীন তৃপ্তিতে ভরে আছে।"

প্রার্থনা করি জগদম্বা তাঁহার এই স্নেহধন্য বিশ্বাস-বলিষ্ঠ সন্তানটিকে তাঁহার অভয় পাদপদ্মে চিরশান্তি দান করুন।

শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসব

১৩৬০ সালের পৌষ হইতে ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৯৫৩—ডিসেম্বর, ১৯৫৪) ভারতে এবং বিদেশে একবৎসর ব্যাপী শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল কার্যক্ষেত্রে এ পর্যন্ত উহা আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্যেই শত শত শহরে ও গ্রামে জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনার্থ উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল উৎসবের মাধ্যমে ভারতীয় নারীর মহিমোজ্জ্বল আদর্শ দিকে দিকে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীসারদাদেবী-শতবর্ষযয়ন্তীর সমাপ্তি-অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ বেলুড় মঠ ও কলিকাতায় উদ্‌যাপিত হইবে। কাজের সুবিধার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমিতি ১৬৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁহাদের একটি কার্যালয় (টেলিফোন: ২৪-৩০৩৬) খুলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথি—৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার) হইতে একাদশ দিন বেলুড় মঠে উৎসবাঙ্গীভূত নানা অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতি নিম্নোক্ত কর্ম-সূচীও পরিনির্বাহ করিবেন।

(ক) সর্বভারতীয় চারুকলা, কারুশিল্প এবং সংস্কৃতি প্রদর্শনী।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪, রবিবার হইতে ২রা জানুয়ারী, ১৯৫৫, রবিবার পর্যন্ত ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোডে এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে।

(খ) রচনা প্রতিযোগিতা।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা-বিষয়ক এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ, নেপাল, পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিবেন। ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, উর্দু, অসমীয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু, মালয়লম, কান্নাড়া, সিন্ধী, কাশ্মিরী, মনিপুরী,

খাসী, নেপালী, বার্মী, সিংহলী এবং সংস্কৃত—এই সকল ভাষার প্রবন্ধ গৃহীত হইবে। ইংরেজী রচনা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। স্নাতকোত্তর (Post Graduate) ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য ইংরেজী রচনার (৫০০০ শব্দের বেশী নয়) বিষয় :—'ভারতীয় ধর্মজীবনে নারীর অবদান (শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষার বিশেষ উল্লেখ সহ)'। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারের মূল্য :—(১ম) ২০০৲ টাকা (২য়) ১৫০৲ টাকা (৩য়) ১০০৲ টাকা। কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য ইংরাজী রচনার (৪০০০ শব্দের মধ্যে) বিষয় :—'ভারতনারীর আদর্শ-মূর্তি—শ্রীমা সারদাদেবী' পুরস্কারের মূল্য :—(১ম) ১০০৲ টাকা (২য়) ৭৫৲ (৩য়) ৫০৲ টাকা।

সংস্কৃত রচনা (৩০০০ শব্দের মধ্যে) কেবল চতুষ্পাঠী ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য। বিষয় :—'শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা' পুরস্কার-মূল্য :—(১ম) ৫০৲ টাকা (২য়) ৪০৲ টাকা (৩য়) ৩০৲ টাকা।

অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রচনা-প্রতিযোগিতা কেবল স্কুলের বিদ্যার্থি-বিদ্যার্থিনীগণের জন্য। বিষয় :—'শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা'; (শব্দসীমা—৩০০০) প্রত্যেকটি ভাষার জন্য পৃথক পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। বালক ও বালিকাগণের জন্য পুরস্কার আলাদা।

পুরস্কার-মূল্য (প্রত্যেক ভাষার) বালক প্রতিযোগিগণের জন্য :—(১ম) ৩০৲ টাকা (২য়) ২০৲ টাকা। বালিকা প্রতিযোগিনীগণের জন্য : (১ম) ৩০৲ টাকা (২য়) ২০৲ টাকা। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪। কোন্ শ্রেণীর রচনা কোথায় পাঠাইতে হইবে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যালয়ে (উপরোক্ত ঠিকানায়) অনুসন্ধনীয়।

(গ) সর্বভারতীয় মহিলা সঙ্গীত সম্মেলন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে।

(ঘ) মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে। ২৫শে ডিসেম্বর সিনেট হলে পৃথক একটি ছাত্র-ছাত্রী দিবসের উদ্‌যাপনও পরিকল্পিত হইয়াছে।

(ঙ) শোভাযাত্রা।

২৬শে ডিসেম্বর সকালে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে বিভিন্ন দলের শোভাযাত্রা কলিকাতা ময়দানে উপস্থিত হইবে। তথায় শ্রীমা সারদাদেবীর শুভাবির্ভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হইবে।

পাদপূরণ

'অনিরুদ্ধ'

সব লেখা সাঙ্গ হলে স্থান যাহা ফাঁক রয়ে যায়
কোনও কিছু দিয়া তাড়াতাড়ি অবকাশ পুরাই হেলায়।
সকল প্রাপ্তির শেষ, তবু মোরে ডাকে যে অ-পাওয়া
সে পাদপূরণআশে ভগবান তোমারে কি চাওয়া?

ব্যাকুলতা ও ত্যাগ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কয়েকটি উপদেশ সকল দেশের সাধকদের কাছে চিরকাল সমান শ্রদ্ধা লাভ করবে। অপূর্ব সে উপদেশগুলি।

বলতেন—শিশুদের কাছে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত; শিশুর মতো সরল না হলে, পবিত্র না হলে, ভগবানলাভ হয় না। বাইবেলে আছে—Blessed are the pure in heart, for they shall see God (পবিত্র-হৃদয় লোকেরাই ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবে।)

অষ্টপাশে আমরা আবদ্ধ। এই বন্ধন হতে মুক্তিই আমাদের আদর্শ। বন্ধনমুক্ত হলে বালক-অবস্থা হয়। মোহ, অহঙ্কার, অভিমান ত্যাগ করে আমাদের বালকবৎ হতে হবে। তাই ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন,—পাশবদ্ধ জীব, পাশ-মুক্ত শিব।

বালকের স্বভাব—সরলতা, পবিত্রতা, শরণাগতি ও নির্ভরতা। ঠাকুরের জীবনে বালকের এই গুণগুলি ফুটে উঠেছিল। তিনি ছিলেন বালকের মতো সরল, বালকের মতো পবিত্র ও একান্ত নির্ভরশীল। যিনি যীশুখ্রীষ্টের 'পিতা', তিনিই রামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদের 'মা'।

সাধকদের জীবনে দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে বহু বিঘ্ন আসে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট—এঁদের জীবনে দেখা যায়, 'মার' ও 'শয়তান' এসে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। ঠাকুরের জীবনেও এইরকম প্রলোভন এসেছে, কিন্তু ঠাকুর তা সহজে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। মা তাঁকে দিতে চাইছেন—কিন্তু ঠাকুর কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে বলছেন—মা আমি তোর দুর্বল ছেলে, আমায় প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করিসনে। আমি অষ্টসিদ্ধি চাইনে, নাম যশ চাইনে তোর পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি দে। যাঁরা সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে এই প্রলোভনের পরীক্ষা এসেছে। স্বামীজীর জীবনেও দেখা যায়,—ঠাকুর তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইছেন, কিন্তু স্বামীজী তা প্রত্যাখ্যান করছেন।

যাঁরা গুরুর আদেশ-পালনের জন্য নিয়মরক্ষা হিসেবে সামান্য একটু জপধ্যান করেন, তাঁদের জীবনে এ পরীক্ষা আসে না। তবে যাঁরা ঠিক ঠিক আন্তরিক ভাবে ভগবানলাভের জন্য সাধনা করেন, তাঁদের প্রত্যেককে এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকে উপদেশ শুনে যায়, কিন্তু ধারণাশক্তি কই? কাজে পরিণত করে কতটুকু? একটুও না,—তাই আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না।

ভগবানলাভ কি সহজ কথা! তার জন্য কত খাটতে হয়, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হয়; দেখা যায় দেশশুদ্ধ লোক মুখে 'সীয়ারাম' 'সীয়ারাম' জপ করে যাচ্ছে—কিন্তু সেই সীতাদেবীর জীবনেই কত দুঃখ, তাঁকে কত কষ্ট সহ্য করতে হল, অশোকবনে কত কাঁদতে হল—এ কথা কেউ একবারও ভাবে না, মা ঠাকুরুণ, তাই বলতেন শ, ষ, স,—অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর।

* * * *

ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করতেন চাতকপাখীর কথা। চাতকপাখী স্বাতী নক্ষত্রের জল ছাড়া পান করে না। নদ নদী সাগর পড়ে

* কাটিহার (পুর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বক্তার ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত।

আছে, কিন্তু সে সর্বদা আকাশের পানে হাঁ করে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে।

একজন তার গুরুকে প্রশ্ন করেছিল, কি রকম অবস্থা হলে ভগবদ্দর্শন হয়; গুরু তাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতর চেপে ধরলেন। শ্বাস নেবার জন্য যখন শিষ্যের প্রাণ আঁটুপাটু করতে লাগলো তখন গুরু তাকে বললেন—যখন ভগবানের জন্যে এমনি প্রাণ ছটফট করে, তখন তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

একটি ঘরে একটা চোরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। চোর জানতো তার পাশের ঘরে এক থলে মোহর আছে। চোর তার বন্দী অবস্থার দুর্দশা ভুলে গেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রা ভুলে গেছে। সবটুকু মন পড়ে আছে সেই মোহরের থলেটার ওপর। আমাদের অন্তরস্থ আত্মা সেই মোহরের থলে। সেই আত্মাকে পাবার জন্যে চোরের মতো প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা দরকার।

তুলসীদাস বলেছেন, জরু জমীন আর টাকা এই তিন টান বিষয়াসক্ত করে রেখেছে মানুষকে। ঠাকুরও ঠিক তিন টানের কথা বলেছেন, যা হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। সতীর পতির ওপর টান, কৃপণের ধনের ওপর টান ও বিষয়ীর বিষয়ের ওপর টান। এই তিন টান এক হলে তবে তাঁর দর্শন মেলে।

ঠাকুরের ব্যাকুলতাও ছিল তিন স্তরের। প্রথম —মা আমায় দেখা দাও, আমি সাধনহীন জ্ঞানহীন, আমায় দেখা দাও। যখন আরও তীব্রতা এলো, তখন পোস্তায় গিয়ে আকুল হয়ে মুখ ঘষড়ে কাঁদতেন মা মা করে। লোকে মনে করত, হয়তো তাঁর মা মারা গেছেন, কেউ বলত, শূল ব্যথায় বিকল হয়ে কাঁদছে। আরও যখন তীব্রতা এলো, তখন মায়ের খড়্গ নিয়ে নিজের গলায় বসাতে গেলেন। এই বিরহ যখন বেশী হয় তখন এমনি অবস্থা হয়; বৃন্দাবনে রাধা তাই বলেছেন—"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।"

ঠাকুর তারপর মায়ের দর্শন পেলেন, কিন্তু তাঁর সাধনা সেইখানেই শেষ হল না সাধারণ সাধকের মতো। তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এসেছিলেন, তাই সুদীর্ঘ বারো বছর দক্ষিণেশ্বরে চলল বিভিন্ন মতের ও পথের সাধনা। এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, এলেন তোতাপুরী, ইসলাম ধর্মের গুরু, ও খ্রীষ্টান ধর্মের গুরু; ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ইসলাম মতে ও খ্রীষ্টান মতে সাধনা করে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে যাননি, তিনি হিন্দুই রয়ে গেলেন।

ঠাকুরের আরও একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি এসেছিলেন মাতৃভাব প্রচার করতে, তাই অন্যান্য অবতারের মতো পত্নীকে ত্যাগ না করে তাঁকে সাধনার পথে ঠিক ঠিক সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে এক অপূর্ব অধ্যায়।

সাধারণতঃ যখন কোনও ছেলের ভগবানে মতি হয়, তখন সংসারের মায়েরা কি করেন? তাড়াতাড়ি তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরের মা-ও ঠিক তাই করেছিলেন। যখন ঠাকুর ভগবানলাভের জন্যে ব্যাকুল, সেই সময় তিনি গোপনে ঠাকুরের বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। গোপনে, কেননা জানতে পারলে ছেলে যদি পালিয়ে যায়! কিন্তু ঠাকুরের কাছে এ খবর গোপন রইল না। যখন চন্দ্রাদেবী মেয়ে খুঁজে মনের মতো পাত্রী পাচ্ছেন না, তখন একদিন ঠাকুরই বলে দিলেন,—দেখগে, জয়রামবাটীতে মুখুজ্যেদের মেয়ে কুটো বেঁধে রাখা আছে। 'কুটো বাঁধা' কথাটা আজকাল অনেকেই বোঝে না। আগে নিয়ম ছিল, গাছের প্রথম ফলটি দেবতার উদ্দেশ্যে কুটো বেঁধে অথবা একটা ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে চিহ্নিত করে রাখা হ'ত। সারদাদেবীও ঠাকুরের জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছেন একথা ঠাকুর জানিয়ে দিলেন।

* * * *

একদিন পূজ্যপাদ মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে কাশীতে ৺বিশ্বনাথ দর্শনে গেছি। মহারাজ মন্দিরে ঢুকেই দেখেন একজন ঝাড়ুদার মন্দিরের বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছে। মহারাজ ঝাড়ুদারের কাছ থেকে ঝাড়ুটা নিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণ একটু ঝাঁট দিলেন। সামান্য একটি ঘটনা, কিন্তু কি অপূর্ব শিক্ষাই না আমাদের দিয়ে গেলেন। ভগবানের কাছে যেতে হলে দীনের মতো যেতে হয়, সব অহঙ্কার শূন্য হয়ে দীন হীন শরণাগত হতে হয়—মহারাজের আচরণে এই কথাটিই ফুটে উঠেছে। মহাপুরুষদের জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার ভেতর দিয়েও তাঁদের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। ঠাকুরের সাধক জীবনে আমরা পাই এই দীন ভাব। ঈশ্বরের শ্রীচরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, দীনহীন—কাঙাল, কৃপার ভিখারী!

কিন্তু জগতের লোক ভগবানকে কেউ চায় না; তারা বিষয় নিয়ে মত্ত। স্ত্রীপুত্র পরিজন অর্থ—এই সব নিয়ে ব্যস্ত। এ সেই জাগা ঘুরে চুরি! রামপ্রসাদ বলতেন—

"আমি এই খেদে খেদ করি, তুমি মাগো থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।" 'জাগা ঘরে চুরি' অর্থাৎ যে মন দিয়ে ভগবানকে ভালবাসবো সেই মন স্ত্রী পুত্র বন্ধু প্রতিবেশী, বিষয় সম্পদ এই সবে ছড়িয়ে আছে। এই ছড়ানো মনকে একত্র করে ঈশ্বরমুখী করা একপ্রকার অসম্ভব। ঠাকুর তাই বলতেন,—সরষের পুঁটুলি খুলে ছড়িয়ে গেলে সবটুকু সরষে আর ফিরে পাওয়া যায় না। দরজার ফাঁকে, ইঁদুরের গর্তে কোথাও না কোথাও ঢুকে পড়ে, তাকে আর পাওয়া যায় না।

ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটা নতুন কথা আমাদের বলেছেন, কাঁচা আমি ও পাকা আমি। আমি কর্তা, আমার ঘর বাড়ী জমি টাকা, এই বোধ—কাঁচা আমি; আমি ভগবানের দাস—এটি পাকা আমি। আমাদের কাঁচা আমি ত্যাগ করে পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

* * * *

সকল ধর্মের উৎপত্তি বিষাদ থেকে। গীতা চণ্ডী ভাগবতই এর প্রমাণ। আমরা গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখি অর্জুনের ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ—"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।" (হে অচ্যুত উভয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথটি স্থাপন কর)। সারথি কৃষ্ণ সেখানে রথ স্থাপনা করলেন। কিন্তু সমযোদ্ধাদের দেখতে গিয়ে অর্জুন তাদের ভেতর নিজের আত্মীয় বন্ধুদের দেখে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হলেন। যুদ্ধের ইচ্ছা দূর হয়ে গেল। এই হ'ল বিষাদ। আমি আমার এই চিন্তা থেকে অর্থাৎ ভোগের চিন্তা থেকে বিষাদের উৎপত্তি হয়। গীতায় এটিকে যোগ বলা হয়েছে, কারণ ভোগে বিতৃষ্ণা হওয়ায় অর্জুন ভগবানকে সে সম্বন্ধে নিবেদন করে আত্মসমর্পণ করলেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

(চিত্তের দীনতাদোষে আমার শৌর্যাদি স্বভাব অভিভূত, ধর্ম-বিষয়ে আমি বিমূঢ়। শিষ্যরূপে আমি আপনার শরণাগত, যাহা আমার পক্ষে নিশ্চিত শ্রেয়ঃ তাহাই আমাকে বলুন।) তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলেন।

চণ্ডীতেও সমাধি বৈশ্য ও রাজা সুরথ দুজনেই ভোগী। কিন্তু বৈশ্য সংসারের নানাপ্রকার অশান্তিতে বিষাদগ্রস্ত হয়ে মেধস মুনির কাছে এসেছে। রাজা সুরথও হৃতরাজ্য; তাঁরও বিষাদ অর্থাৎ ভোগে বিতৃষ্ণা হয়েছে। তাই তাঁদের ধর্মপথের আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা পরীক্ষিৎ যখন জানতে পারলেন, তাঁর সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে, তখন ভোগে নিস্পৃহ হয়ে শুকদেবের কাছে ভাগবত কথা শুনলেন।

ভগবান বুদ্ধও জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আমারও এমন হবে? গোপারও এমন হবে? (গোপাকে তিনি এতই ভালবাসতেন।) ছন্দক বলল,—হবে। বুদ্ধ বিষাদগ্রস্ত হলেন ও একজন সন্ন্যাসীকে দেখে পথ স্থির করে ফেললেন।

এর থেকে আমরা এই শিখি যে, ভোগে নিস্পৃহ না হলে ধর্মাচরণ হবে না। সংসারে নানা রকম দুঃখ শোক আছেই। কিন্তু তাতে ম্রিয়মান না হয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে সংসার অসার। কোনও কারণেই আমাদের অধর্মের পথে যাওয়া উচিত নয়। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা-রূপে কি কষ্টই না ভোগ করেছেন! আমাদের ত্যাগ করতে হবে। নিস্পৃহ আর নিরভিমান হতে হবে। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ঠাকুর দেখিয়েছেন। স্বামীজী তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে বিছানার তোষকের তলে একটি টাকা রেখেছিলেন। ঠাকুর তার স্পর্শও সহ্য করতে পারেন নি। তিনি কেবল মনে নয়, কাজেও ত্যাগ করেছিলেন। তবে ঠাকুর যা করেছিলেন, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি বলেছেন, আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর। আর তাও যদি না পারিস্ আমার উপর ভার দে, বকল্‌মা দে।

অমৃতায়ন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
(লালগোলারাজ)

দেব দানবেরা মিলে সাগর-সলিলে মন্থন করে যবে,
ওঠে তীব্র গরল, অমৃতফল কমলার বৈভবে।
আছে দেবের ভাগ্যে লিখা
সেই বিজয়-লক্ষ্মী টীকা
জ্বলে দানবের মনে হিংসা-দহনে বিষের বহ্নিশিখা—
যত অসুরের দল করে কোলাহল জীবনের পরাভবে।

সেই আদিম প্রভাতে, মরণের সাথে, দিশাহারা সংগ্রাম
চলে কোন্ অমরার সুধাভাণ্ডার-সন্ধানে অবিরাম!
তাই বিষের পাত্রখানি
নিজ কণ্ঠে লইল টানি'
সেই জগতের নাথ শিব ভোলানাথ,—বিস্ময় মনে মানি',
এই বিশ্ব নিখিল তাই রাখে নীল-কণ্ঠ তাঁহারি নাম!

কবে জড়ের মাঝারে প্রাণ-সঞ্চারে মূর্ত হইল কায়া—
প্রাণে জাগিল বেদনা, মানস-চেতনা কে গো সেই মহামায়া
চাহি' ঊর্ধ্বলোকের পানে—
সে কী উন্মন আহ্বানে,—
বাহি' যুগ যুগ ধরি' সাধনার তরী অমরার সন্ধানে,
আসে বিদ্যুৎসম আলো নিরুপম ভেদিয়া কুহেলি ছায়া।

তাই, মর-দেহ-লোকে করুণা-আলোকে, কখন আসিবে নামি'-
সেই দিব্য-বিভূতি?—জানায় আকূতি নিখিল মুক্তিকামী!
এই মানসের খেলা শেষে,
যেথা আঁধারে আলোক মেশে—
সেই স্বরগের সুধা খুঁজিবে বসুধা অতি-মানসের দেশে!
শুধু তারি আয়োজনে, মনের গহনে, চেতনা ঊর্ধ্বগামী।

তবু আজো জাগে ক্ষণে মানবের মনে বিক্ষোভ, সংশয়—
পুজি' অসুর-বৃত্তি, লভিল তৃপ্তি—জীবনের সঞ্চয়!
হায়, জানে না বিষের জ্বালা—
সে কী তীব্র বহ্নি ঢালা—
আজি পাগল মহেশ অঘোরের বেশ কণ্ঠে কপাল মালা—
গাহে ভস্মের মাঝে মহাকাল সাজে মরণের মহাজয়।

কেন ভুলে যাই মোরা সেই সে অ-ধরা আলোক-স্বপ্নখানি?
গড়ি' দানব মূরতি জীবনের গতি পঙ্কিল পথে টানি!
কেন অমৃত প্রয়োজনে,
সাড়া জাগিয়া ওঠে না মনে—
যদি দিব্য সুধায়, মানস ক্ষুধায়, খুঁজে ফিরি ক্ষণে ক্ষণে,
এই দেহ মণিপুরে অন্ধ অসুরে, নাশিতে হইবে, জানি।

শিক্ষার ভিত্তি

(এক)

'বনফুল'

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চাটার্জি' বক্তৃতা]

সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সহিত এই সভায় মিলিতে পারিয়াছি এই সামান্য ঘটনাটুকু মানবজাতির অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে অসামান্য বলিয়া মনে হইবে। একদা যে মানব-পশুরা দেখা হইলেই পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া নিজেদের শৌর্য প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত ছিল কোন্ শিক্ষা বলে কিসের প্রেরণায় তাহারা মিলিত হইবার শক্তি লাভ করিল? বস্তুতঃ মিলিত হইবার শক্তি অর্জন করিয়াই মানব প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে।

নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে, নানা সুরে, নানা প্রয়োজনে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মিলনের সাধনা করিয়াছে এবং অবশেষে এমন এক মিলনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যাহা সুলভ নহে, যাহা সভা-সমিতিতে মেলে না, যাহা তপস্যাসাধ্য। ইহার জন্য কবি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তপস্বী কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। এই মিলনের নাম কেহ দিয়াছেন মুক্তি, কেহ নির্বাণ, কেহ পরম মিলন, কেহ উপলব্ধি। এই মিলনের আগ্রহ যখনই যাহার মনে জাগে তখনই এই বাহিরের বিশ্ব, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রয়োজনের উপকরণ-সম্ভার তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, এমনকি অনেক সময় বাধাও মনে হয়। সর্ব দেশের শ্রেষ্ঠ মানব-মনীষা যে মিলনের জন্য সাধনা করিয়াছেন তাহা বহুর সহিত মিলন নয়, তাহা একের সহিত মিলন। তাহা সত্যের সহিত মিলন। কথাটা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যে মিলনের বাসনা একদিন বহুলোককে একত্রিত করিয়াছিল সেই মিলনের যখন চরম অভিব্যক্তি ঘটিল, তখন তাহা হইতে 'বহু'টা বাদ পড়িয়া গেল। শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন বহুর মধ্যে সেই একেকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যাহা শাশ্বত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা বন্দী করেনা, যাহা মুক্তি দেয়। মানবের মধ্যে যতক্ষণ পশু প্রবল থাকে ততক্ষণ তাহার বিভিন্ন সামাজিক প্রচেষ্টা তাহাকে যে ভোগ-স্বর্গ রচনায় প্রবৃত্ত করে তাহার মনীষা আর একটু উন্নত হইলেই সেই স্বর্গ কারাগারে পরিণত হয়।

আমরা অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। এই মিলনের প্রকৃত মর্ম আমাদের অনেকেরই নাগালের বাহিরে। আমরা অনেকের সহিত মিলিত হইয়াই আনন্দ লাভ করিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আনন্দ লাভ করিতে পারি কি? আমরা হাটে-বাজারে মিলি, সভা-সমিতিতে মিলি, ট্রেনে-জাহাজে মিলি, ধর্ম-ক্ষেত্রে মিলি, রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিলি, সাহিত্যক্ষেত্রে মিলি, বিদ্যামন্দিরে মিলি। মিলনের নানা ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু মিলনের প্রকৃত আনন্দ আমরা লাভ করিতেছি কি? আমাদের জীবন কি আনন্দময়, শান্তিময়? যদি সত্যকথা বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, না আমরা সুখী নই, আমাদের জীবন আনন্দহীন, অশান্তিপূর্ণ। আমরা বাহিরে একটা সুখের ভান করিতেছি মাত্র, ভিতরটা আমাদের পুড়িয়া যাইতেছে, যখন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাও পড়িতেছে তখনও আমরা দন্ত বিকশিত করিয়া বলিতেছি, চমৎকার লাগিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তো বটেই, আমাদের ধর্মক্ষেত্রেও এই ভান, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই, সর্বত্রই আমরা মুখোশ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মুখোশের প্রয়োজনে কাঁদিতেছি, হাসিতেছি, অপমানিত বা সম্মানিত হইতেছি। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নিকটও সর্বতোভাবে হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

তাই আমাদের শিক্ষার কথা যখনই চিন্তা করি তখনই মনে হয়, শান্তি এবং আনন্দই যদি জীবনের কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষার বনিয়াদটা কিরূপ হওয়া উচিত? আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে—শিক্ষার লক্ষ্য আত্ম-বিকাশ, না, সামাজিক উন্নতি? প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে আত্ম-বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলেই যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে এমন কোন কথা নাই। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি ঘটিলে প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে সম্যকরূপে সম্মানিত হইবে না, ইতিহাসেই তাহার বহু প্রমাণ আছে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি আধুনিক সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই, সক্রেটিস্, জোয়ান অব আর্ক, পদ্মিনী, রাণাপ্রতাপ, নেপোলিয়ন, লেনিন, মহারাজ নন্দকুমার, বাংলাদেশের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত বীরেরা, মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিংকন্, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। ব্যক্তির

সহিত সমাজের বিরোধ যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সমাধান না করিতে পারিলে শান্তির আশা নাই। এ সমস্যা যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, কারণ শত শত শতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের পশুত্বকেই নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়াছে। এখনও মানবসমাজের অধিকাংশ লোকই পশু-স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। বস্তু-বিজ্ঞানচর্চার ফলে যে প্রগতি আমরা অর্জন করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই পশুত্বেরই প্রসাধন ও বিনোদন, এতদপেক্ষা মহত্তর কোনও লক্ষ্যে সমগ্রভাবে এখনও আমরা পৌঁছিতে পারি নাই। বিজ্ঞানচর্চার আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্বিঘ্নে পশুজীবন যাপন করিবার জন্যই একদা সমাজ স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সমাজের সুখসুবিধা বর্ধনের জন্যই বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। সেই অতীত যুগেও ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ছিল। যে কোনও দ্বন্দ্বে শক্তিরই জয় হয়। সে সমাজেও যাহারা বুদ্ধিমান শক্তিমান ছিল, তাহারা দলপতি, যাদুকর, চিকিৎসক, পুরোহিত প্রভৃতি হইয়া অন্য সকলের উপর আধিপত্য করিত। এই যাদুকর পুরোহিতের দলই কালক্রমে সমাজপতি, দিগ্বিজয়ী বীর, রাজা-মহারাজা-সম্রাট-ফারাও, সিজার-জার-ডিক্‌টেটারে রূপান্তরিত হইয়া দীর্ঘকাল মানবসমাজকে শাসন করিয়াছে, এখনও করিতেছে। এখন নামটা শুধু বদলাইয়াছে, সাধারণ লোককে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ অথবা সন্ত্রস্ত করিবার মন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে ; মূল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। ডেমোক্র্যাসিও বহুর উপর কয়েকটিমাত্র লোকের আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। জনগণ যেসব ব্যক্তিকে শাসনকর্তারূপে নির্বাচন করেন তাঁহারা সব সময়ে নির্বাচন-যোগ্য ব্যক্তিও নহেন, নানারূপ কায়দা-কৌশল করিয়া, শক্তি ও বুদ্ধির নানাবিধ জটিল জাল সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা নির্বাচিত হন।

এই সব আধিপত্যকে মানুষ কিছুদিন মানিয়া লইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় আধিপত্যে সে সুখে থাকে না। তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার অহরহ বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে হয় সে পরাজিত হয়, না হয় বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া অবাঞ্ছিত আধিপত্যের অবসান ঘটায়। ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব আমাদের অশান্তির একটা প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে? ব্যক্তিত্বকে নিষ্পিষ্ট করিয়া একরঙা একটা সমাজস্থাপন করাই কি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হইবে? না, প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আমরা শিক্ষার আয়োজন করিব? ব্যক্তি ও সমাজের ঐক্য ঘটিলেই কি শান্তি সুলভ হইবে? এসব সমস্যা আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কি তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রতিটি মানুষই একটি বিশেষ সত্তা, আলাদা জগৎ। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে দ্বিবিধ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথম সংগ্রাম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে। এ সংগ্রাম জীবন-মরণ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে পরাজয় মানে মৃত্যু। তাহার দ্বিতীয় সংগ্রাম সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে। এই উভয়বিধ কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা সে মাতৃজঠর হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনে। শুধু পিতা-মাতার নয়, বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের যোগ্যতা অযোগ্যতা শক্তি দুর্বলতারও উত্তরাধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। যে বংশে তাহার জন্ম দেহে মনে চরিত্রে সেই বংশের ছাপ লইয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই ছাপ এড়াইবার উপায় নাই, আমড়ার বীজ হইতে আমড়াগাছ হইবে—আম বা আপেলগাছ হইবে না, অ্যালসেশিয়ান দম্পতীর বংশে অ্যালসেশিয়ানই জন্মিবে, বুল্‌ডগ্‌ জন্মিবে না। বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রত্যেককে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের

সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইতে পারে, কিংবা যেমন ছিল তেমনি থাকিতে পারে। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপায় নাই। জুঁইগাছে গোলাপ কখনও ফুটিবে না। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য বলেন যে, শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে বংশ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ বিশ্বাস পোষণ করেন না, কারণ পরীক্ষাদ্বারা তাহা সমর্থিত হয় নাই। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বংশের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নয়। হয়তো ইহাই প্রালব্ধ বা fate; এই প্রালব্ধ প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র। বিচিত্র উপায়ে প্রতিটি প্রাণী এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীরাও বংশের উত্তরাধিকার সমভাবে লাভ করে না, কারণ যে genes পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া জন্মকালে ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহারা প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতিবারই বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়, প্রতিবারই তাহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য থাকে। তাই সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীদের ভিতর স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য দুইই প্রতীয়মান। যমজরাও সম্পূর্ণরূপে এক নয়, তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট সত্তা লইয়া আমরা প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করি সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজ ও প্রকৃতি আবার প্রত্যেকটি সত্তাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া নূতন রূপ দান করে। একই কাদার তাল কেহ হয় হাঁড়ি, কেহ হয় সরা, কেহ হয় মূর্তি। মানব সমাজের যত বয়স বাড়িতেছে আমাদের তথা-কথিত সভ্যতার জটিলতাও তত বাড়িতেছে এবং প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরও জটিল, আরও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। মনঃসমীক্ষণ করিয়া মানবমনের বিভিন্ন স্তরের যেসব খবর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড আমাদের দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক। প্রতিটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, রুচি-আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়বোধ এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে এত স্বতন্ত্র যে, কোনও একটি বাঁধাধরা নিয়মাবলীর খাঁচায় সুখে শান্তিতে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি আপনার স্বতন্ত্র কল্পনায় মনে মনে এক একটি আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখে এবং বাস্তবে তাহা মূর্ত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেই অশান্তি। এই অশান্তির চিহ্ন আমরা সমাজে সর্বদা নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্তমানের নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ। কেহ অতীতের দিকে চাহিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন, ভবিষ্যৎকে মনোমত করিয়া গড়িবার জন্য কেহ বৈধ, কেহ বা অবৈধ উপায় অবলম্বনে উদ্যত, অনেকে আবার মনের প্রবল ভাবসমূহকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

অশান্তি দূর করাই যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই সব বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যদৃচ্ছ-ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দিলেও কিন্তু শান্তির আশা নাই। কারণ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যদি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, এবং সমাজের অস্তিত্ব না থাকিলে সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না। দুই একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো পারিবেন। শান্তিলাভের আশাতেই সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির সহায়তা লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যক্তিগত সুখ খানিকটা বিসর্জন দিই, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে বিসর্জন দিয়া সুখী হই না। ব্যাপারটা অনেকটা যেন Tax দেওয়ার মতো হইয়া দাঁড়ায়। এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে

পাই স্বার্থবিসর্জনের বিনিময়ে যে পরিমাণ সুখ সুবিধা লোকে প্রত্যাশা করে সে পরিমাণ সুখ সুবিধা তাহারা পায় না। মিউনিসিপালিটিতে আমিও Tax দিই, মিউনিসিপালিটির মেম্বরও দেন। আমার বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা কিন্তু মেরামত হয় না, নালা পরিষ্কার হয় না, মেম্বরের বাড়ির চতুর্দিক কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তখন মন বিষাইয়া ওঠে এবং সুযোগ পাইলে নিজেই মেম্বর হইবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। সমাজের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজেও দেখি কয়েকটি বিশেষ ধরনের লোক বিশেষ নীতি বা কৌশল অবলম্বন করিয়া বেশী সুবিধা লাভ করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই তখন সেই বিশেষ কৌশল বা নীতি আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। বর্তমান যুগে তো বটেই, অতীতের পুরাণ ইতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ মিলিবে। পুরাণের গল্পে দেখি দানবেরা দেবত্ব লাভের জন্য সমুৎসুক, ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য লোলুপ, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র হইতেছেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হইয়া ধর্ম-প্রচার করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন দেখি বেদ-পন্থীরা দলে দলে বৌদ্ধ হইতেছেন, বৌদ্ধধর্ম যখন অধঃপতিত হইল মুসলমানরা আসিলেন, তখন দেখিলাম এই বৌদ্ধরাই আবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। মুসলমান রাজত্বের অবসানে আমাদের দেশে যখন ইংরেজের আগমন ঘটিল তখন আমরা মুৎসুদ্দি হইলাম, খ্রীষ্টান হইলাম, ইয়ং বেঙ্গল হইলাম ওই একই প্রেরণায়। তাহার পর কেরাণীকুল সৃষ্টি করিবার জন্য যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হইল—যে শিক্ষার মূল মন্ত্রটি বাঙালীর ছড়ায় আজও অমর হইয়া আছে—'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'—তখন আমাদের মনে এই ধারণাটা পুরাপুরি বসিয়া গেল যে অর্থোপার্জনের জন্যই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, শিক্ষার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। এই অর্থকরী শিক্ষার রূপও যখন যেমন বদলাইয়াছে আমরাও তখনই তেমনি ঝুঁকিয়াছি। প্রথম যুগে যখন কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানিলেই চাকুরি মিলিত তখন আমরা ডিক্‌শনারি মুখস্থ করিতেও ইতস্তত করি নাই। তাহার পর আসিল ডিগ্রীর যুগ, ধুয়া উঠিল কোনক্রমে বি. এ. পাশ করিলেই জীবনসমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, আমরা দলে দলে গ্র্যাজুয়েট হইলাম। তাহার পর ঝোঁক পড়িল আইন-শিক্ষার উপর, চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার উপর, টেকনিকাল শিক্ষার উপর। পূর্বে আমরা কেরাণী, হাকিম, অধ্যাপক হইয়াছিলাম, এইবার দলে দলে উকিল, ডাক্তার ও এনজিনিয়ার হইতে লাগিলাম, দেশী ডিগ্রীর উপর বিলাতী ডিগ্রীর অলঙ্কার চড়াইয়া সামাজিক পশার প্রতিপত্তিও বাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মনে হইতেছে এ মোহও কাটিয়া আসিতেছে। এখন আরম্ভ হইয়াছে হিন্দী শিখিয়া নেতা এবং আধ্যাত্মিক ভেলকি দেখাইয়া গুরু হইবার যুগ। দেখা যাইতেছে এ বাজারে রাজনৈতিক নেতা অথবা আধ্যাত্মিক গুরু হইতে পারিলে নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা পাওয়া যায়।

অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য যুগে যুগে আমরা নানারঙের আলেয়া অথবা নানা ঢঙের মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছি, কিন্তু আমাদের সুখও মিলিতেছে না, শান্তিও নাই। এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যে আজই আবির্ভূত হইয়া আমাদের দগ্ধ করিতেছে তাহা নয়, এ আগুন বরাবরই আছে। একটা হালের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩০৬ সালে —চুয়ান্ন বৎসর পূর্বে—যে কালের দিকে চাহিয়া আমরা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া থাকি—"আহা, সে সময় কি সুখই ছিল"—সেই সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়

একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে লিখিতেছেন—"আমাদের সমাজে একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা বড় একটা আশায় বুক বাঁধিয়া এতকাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়াছিলাম সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে কোথাও পরিস্ফুটভাবে সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি?" বলা বাহুল্য, এই নৈরাশ্যের মূল কারণ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ। আমরা অশান্তি যে কেবল সজ্ঞানে ভোগ করিতেছি তাহা নহে, আমাদের নিজ্ঞান মনও নানারূপ অশান্তির হেতুকে আত্মসাৎ করিয়া নানা-ভাবে ভারাক্রান্ত হইতেছে। আধিভৌতিক অভাবও এই অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে এমন লোক মোটেই বিরল নহেন যাঁহাদের কোনও অভাব নাই, যাঁহারা যশস্বী, ধনী, পদস্থ কিন্তু যাঁহাদের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পারিপার্শ্বিকের সহিত কেহই যেন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিতেছি না, প্রত্যেকেই যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি।

সমাজের ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিকে খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা সমাজ-পত্তনের কিছুকাল পরেই হইয়াছে। সমাজপতি ও রাষ্ট্রনেতারা অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্র একমত না হইলে সে সমাজ বা রাষ্ট্র বেশী দিন টেকে না। এই খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা মুখ্যত দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। একদল সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া সমাজ-চেতনা, রাষ্ট্র-চেতনা অথবা বিশেষ-কোনও-উদ্দেশ্য-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তজ্জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন। একজন নিয়ন্তার নির্দেশে সমস্ত সমাজ বা রাষ্ট্র ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয়দল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে গঠন করিতে চাহিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট লিংকনের ভাষায় এই দলের আদর্শ,—Government of the people, by the people, for the people. কিন্তু কোনও ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের সুখশান্তি পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে আমরা যেন ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নই, আমাদের মালিকরা আমাদের কপালে যেন Free citizen এই লেবেলটা নিজেদের আত্মপ্রসাদের জন্য কেবল আঁটিয়া দিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা টাকা দিয়া বাজার হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দাস-দাসীও কিনিয়া আনিতেন। মানবতার শোচনীয় অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া আমরা এ প্রথা অবলুপ্ত করিয়াছি। এখন কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিয়াছে, এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে যন্ত্রসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দাস-প্রথা নব কলেবরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের মানসিক শান্তি হরণ করিয়াছে, আমাদের আত্মসম্মানও আর নাই। সেই প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অপেক্ষাও আমরা যেন বেশী অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় আমরা কেহই আর সুস্থ সবল প্রাণরসে সঞ্জীবিত স্বাধীনচেতা মানব নহি, আমরা একাধিক যন্ত্রের এবং যন্ত্র-নায়কের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এই যন্ত্র আমাদের শক্তি, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান, সমাজ, সম্পদ সমস্ত নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যটুকুও আমাদের নাই, আমাদের বুদ্ধিও বিকৃত হইয়াছে, যান্ত্রিক অত্যাচারের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ

করিয়া আস্ফালনও আমরা করিতেছি বটে, কিন্তু নির্জ্জীন মন এই সব অপমান ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে এবং আমাদের নানারূপ উৎকট অভব্য অসঙ্গত আচরণে তাহা প্রায়শই প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন দাস-প্রথা যেমন নূতন রূপে আসিয়াছে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে আমাদের পুরাতন সমাজও তেমনি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি Cowper বলিয়াছেন—Man, in Society is like a flower blown in its native bud. এ-রকম সমাজ আমাদেরও হয়তো একদিন ছিল কিন্তু এখন আর নাই। আমাদের সে সমাজ ছিল পল্লীতে, সে সমাজের কিছু কিছু আভাস প্রবীণ লেখকদের লেখা হইতে পাই। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্র নাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাতে সে সমাজের রমণীয় চিত্র আঁকা আছে। শরৎচন্দ্র যে পল্লীসমাজের ছবি আঁকিয়াছেন তাহারও বাহিরের রূপটা বদলাইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সমাজ বলিতে যাহা বোঝায় সে সমাজ বহুপূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। এখন সমাজপতি নাই, সামাজিক নিয়মও কেহ মানে না। দশবিধ সংস্কারের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি বিবাহও আজকাল সামাজিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় না, বয়স্ক যুবকদের খেয়াল খুশী অনুসারে হয় এবং প্রায়শই নিয়ন্ত্রিত হয় আর্থিক মানদণ্ডে। তথাকথিত সভ্য-সমাজে কিশোরী কন্যার বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনুর বিধান বহুপূর্বেই অচল হইয়াছে। বয়স্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া যান নাই। বিবাহ করিলে যে সব সুখ-সুবিধা-আনন্দ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা কোনও দায়িত্ব বহন না করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখা আজকাল প্রয়োজন মনে করি না। প্রতিবেশীও আমাদের খবর রাখা অনেক সময় অপছন্দ করেন। যে সব ছোটখাটো সামাজিক উৎসব পুরাকালে আমাদের পরস্পরকে নানা বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত সে সব উৎসব সভ্য সমাজ হইতে ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। যে সব দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বে আমরা মিলিত হইতাম, সে সব দেবতা এখন অন্তর্হিত, বহু হিন্দুঘরে আজকাল ঠাকুরঘর পর্যন্ত নাই। কয়েকটি উৎসব এখনও অবশ্য সাড়ম্বরে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেগুলিতে সামাজিকতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। দেখি অহঙ্কারের আস্ফালন, টাকার মহিমা, দরিদ্রের সঙ্কুচিত অপ্রতিভতা, পরশ্রীকাতর অক্ষমের ক্ষোভ; দেখি অকারণ অপব্যয়, অশ্লীল উন্মাদনা, অসংযত আচরণ। বহুকাল পূর্বে বড় দুঃখে দুর্গাপূজা উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম—

"দিবসে নিশীথে যাহার স্বপ্ন
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি,
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি
যাহার পূজায় কত বলিদান,
কতনা আরতি, মন্ত্র কত
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত
আকার তাহার যেমনই হউক
নানাভাবে করি টাকারই পূজা
হোক না তাহার যেমন চেহারা
বংশীবদন বা দশভুজা
অয়ি মৃন্ময়ি অতসী-বরণি,
ভিখারী-ঘরনি শিবানি, অয়ি,
রূপার তলায় চাপা পড়ে গেছ
তোমার পূজার মন্ত্র কই।
টাকার পূজায় মত্ত সবাই
তোমার পূজাও টাকার পূজা
লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষই
ওগো মৃন্ময়ি হে দশভুজা।

সুদখোর ওই হারু-পোদ্দার
বাড়িতে তাহার পূজার ধুম
গর্জন করে লাউডস্পীকার
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম।
তাহার নিকট কর্জ করিয়া
পূজার বাজার করেছি সব
অর্থ নহিলে জমে কি জননী
তোমার পূজার এ উৎসব ?
অর্থ পুড়িছে আতস বাজীতে,
আলোক মালায় জলিছে টাকা
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে
প্রণাম না করে যায় কি থাকা ?
বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই
রাজারাজড়ায় প্রণাম করি,
হারুর বাড়িতে তেমনি জননি
তোমারেও নমি হে শঙ্করি।
অর্থাৎ কিনা হারুকেই নমি
কারণ তাহার টাকা যে আছে
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে
আমরা নমিব তাহারই কাছে।

দুর্গাপূজায় তিনদিন ধরিয়া অনাবিল আনন্দে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এখন আর আমরা মিলিতে পারি না। সকলে পাশাপাশি বসিয়া এক পূজামণ্ডপে মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হই না। গ্রামের পুরোহিত, গ্রামের শিল্পী, গ্রামের গোয়ালা, গ্রামের ময়রা, গ্রামের কবিরা সে পূজায় অংশ লইবার সুযোগ পায় না। ট্রেনে বা এরোপ্লেনে করিয়া আমরা কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন ও প্রতিমা, শান্তিনিকেতন অথবা বোম্বাই হইতে গায়ক-গায়িকা আমদানি করি এবং তাহা অসম্ভব হইলে রেকর্ড বাজাই। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের গ্রামকে ধ্বংস করিয়াছে। সে গ্রাম আর নাই, সে গ্রাম্য সমাজও আর নাই। গ্রামের ধনীরা আজকাল শহরে আসিয়াছেন। গ্রামে তাঁহারা গণ্যমান্য ছিলেন, শহরে তাঁহারা নগণ্য, তবু আসিয়াছেন। সুযোগ পাইলে অনেকে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন।

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রাচীন সমাজের মাধুর্যকে অবলুপ্ত করিয়াছে কিন্তু ভিতরের গলদগুলিকে দূর করিতে পারে নাই; পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রী-কাতরতা এখনও ঠিক তেমনি আছে, যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে তাহার বাহিরের ঢংটা কেবল বদলাইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ নাই, কিন্তু খবরের কাগজ আছে, ক্লাব আছে পার্টি আছে, সভা-সমিতি আছে এবং ইহাদের মধ্যে বেণী ঘোষালরাও আছেন। পরনিন্দা পরচর্চা এখন পল্লীসমাজেই নিবদ্ধ নাই, তাহা বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখি না কিন্তু কোরিয়ার খবর রাখি, আমেরিকা ইংলণ্ডের খবর রাখি, চীনের রুশিয়ার খবর রাখি, ফরেন পলিসি লইয়া উত্তপ্ত আলোচনা করি। গ্রামের বা স্বদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের ততটা লজ্জিত করে না কিন্তু বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে দুই চারিটা বুক্‌নি ছাড়িতে না পারিলে বর্তমান সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। বুক্‌নি সংগ্রহ করিবার সুযোগও আজকাল মেলে, আজকাল প্রকৃত পণ্ডিত দুর্লভ কিন্তু পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের অভাব নাই।

অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতা আমাদের সমাজের বাহিরের রূপটা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু আমাদের চিত্তকে উন্নত করিতে পারে নাই, বরং তাহা নীচাশয় স্বার্থপর ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে বৃহত্তর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইবার সুযোগ দিয়াছে। যে 'ঘোঁট' পূর্বে সঙ্কীর্ণ সমাজে নিবদ্ধ থাকিত তাহা এখন নানাবিধ আন্দোলনের জয়-ঢাক বাজাইয়া পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে। আমরা কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। স্থির থাকিবার উপায়ও নাই। প্রত্যহ খবরের কাগজের উত্তেজক হেড

লাইন, দৈনিক তিন চারবার সিনেমায় চিত্ত চাঞ্চল্যকর নৃত্যগীতের এলাহি আয়োজন; রেডিওর শূন্যপথে আক্রমণ, আমাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

যে শিক্ষা আমাদের স্বস্থ করিতে পারিত সে শিক্ষাও আর নাই। শিক্ষক এখন আর শিক্ষক নন, তিনি বেতনভোগী মজুর মাত্র। সাহিত্যও আজকাল ব্যবসায়ের পণ্য।

যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাঁহাদের সহিত রসিক-সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর নাই। যখন ছাপাখানা ছিল না তখন গ্রন্থকর্তা নিজের পুস্তক স্বহস্তে সযত্নে লিখিয়া রসিক পণ্ডিতসমাজকে পড়িয়া শুনাইতেন। পুস্তক ভাল হইলে লোকে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, টুকিয়া রাখিত, পূজা করিত। ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল ভাল বই, খারাপ বই একই বেশে সজ্জিত হইয়া বাজারে বাহির হয়, তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকও সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে প্রথম শ্রেণীর পুস্তকের পাশে সম-গৌরবে স্থান পায়। সমাজেও দেখি আজকাল গণিকা ও সতী সাধ্বী একই বেশে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন। যন্ত্রসভ্যতার সাম্যবাদ মুড়ি-মিছরিকে একাসনে বসাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম, ছাপাখানা হওয়াতে এ যুগের সাহিত্যিকদের আর একটা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্বে কবির সহিত রসিকের সরাসরি যোগ ছিল। কবি নিজের লেখা রসিককে পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা লইয়া রসিকের সহিত সামনসামনি আলোচনা করিতেন, লেখা ভাল কি মন্দ, কোথায় সুর জমিয়াছে কোথায় বেসুরা বাজিয়াছে সহৃদয় আলোচনার দ্বারা তাহা স্পষ্ট হইত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এক মহা আপদ জুটিয়াছে, সমালোচক বলিয়া একদল স্বয়ম্ভু পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেরসিক, কিন্তু ইঁহারা রসের ক্ষেত্রেই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বেড়ান। কাহার লেখা সংবেদনপূর্ণ, কাহার লেখায় দরদ আছে, কাহার লেখায় প্রগতির পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোন লেখক প্রতিক্রিয়াশীল, সাহিত্য রাজ্যে কে সম্রাট কে মন্ত্রী, কে উজির, কে গোমস্তা এই সব লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান এবং বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন। শুনিয়াছি ইঁহাদের সুনজরে পড়িবার জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থব্যবসায়ীদের নাকি বহুবিধ কসরৎ করিতে হয়, পুস্তক ভেট দিতে হয়, খোশামোদ করিতে হয়, আরও অনেক কিছু করিতে হয়, তবে নাকি তাঁহারা সদয় হইয়া তাঁহাদের রচনার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না এই সব একদেশদর্শী আত্মম্ভরিতাপূর্ণ রচনা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইত না। প্রকৃত রসিকরাই তখন কাব্য-সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। এখন সে ভার পড়িয়াছে কতকগুলি মতলববাজ ব্যবসায়ীর উপর। সুতরাং এই ধরনের প্রবন্ধ ছাপা হয়, রেডিওতে নিনাদিত হয়। ফলে, বহুলোক সৎ সাহিত্যের সন্ধান হইতে বঞ্চিত হন।

সাহিত্যিকের তৃতীয় বিপদ প্রকাশক। প্রকাশক মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী। যে বই বেশী বিক্রয় হয় তিনি সেই বই-ই ছাপিতে চান। উত্তেজক যৌন-কাহিনী, গরম গরম পলিটিকাল প্রপাগ্যাণ্ডা, ডিটেক্‌টিভ কাহিনী, সরস গাল-গল্প প্রভৃতিরই চাহিদা বেশী, ভাল প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোট-গল্পের বই বাজারে চলে না শুনিয়াছি। অভিনীত না হইলে নাটকও চলে না। যাঁহারা নাটক অভিনয় করেন বা করান তাঁহারাও ব্যবসাদার এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধু। কোন ভদ্র নাট্যকারের পক্ষে তাঁহাদের ব্যবহার বরদাস্ত করা কঠিন। সুতরাং যাঁহাদের নাটক লিখিবার প্রতিভা আছে তাঁহারা নাটক লিখিতেই চান না। সাহিত্যসাধককে বাধ্য হইয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হয়, এমন বই লিখিতে হয় যাহা প্রকাশক-গ্রাহ্য। বলা-বাহুল্য,

সে সব পুস্তক সব সময় সুসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে প্রকৃত সাহিত্যসাধকের ক্ষোভ হয়, রসিক-সমাজও ক্ষুণ্ণ হন। সাহিত্য সমাজের যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিত তাহা পারে না।

যন্ত্র সভ্যতার আরও দুইটি 'অবদান' বর্তমান সভ্য সমাজের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে—সিনেমা ও রেডিও। সুপ্রযুক্ত হইলে হয়তো ইহারা মানব সভ্যতার কল্যাণ-সাধন করিতে পারিত কিন্তু বর্তমান যুগে তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ প্রত্যেক যন্ত্রের পিছনে যে যন্ত্রপতিরা বর্তমান, মানবজাতির কল্যাণ-সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থসাধন। অধিকাংশ মানবকে শোষণ করিয়া তাঁহারা নিজেরা শক্তিমান হইতে চান। পূর্বে খাইবার পাশ দিয়া বহিঃশত্রুরা আসিয়া এ দেশ জয় করিয়াছিল, এখন তাহারা আসিতেছে যন্ত্রের ভিতর দিয়া। মানুষ পশুকেই জয় করিতে পারে, মানুষকে পারে না। এই সব যন্ত্র তাই অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিতে চায়। পূর্বে পাশ্চাত্ত্য বণিকরা চীনাদের অকর্মণ্য করিবার জন্য জোর করিয়া তাহাদের আফিঙের নেশা ধরাইয়াছিল, আমাদের দেশের চাষীকে দরিদ্র করিয়া ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কারণ নেশাগ্রস্ত বা দরিদ্র জাতিকে শোষণ করা বা শাসন করা সহজ। শোষণ এবং শাসন করিবার জন্য এখন তাহারা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—যন্ত্রের পন্থা। আর্ট পরিবেশনের ছলে সিনেমা এবং রেডিওর মারফৎ তাহারা যাহা পরিবেশন করিতেছে তাহা সেই আর্ট নয় যাহা আমাদের সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান দেয়, তাহা সেই আর্ট যাহা আমাদের কামনাকে মোহিনীবেশে সাজাইয়া আমাদের সর্বনাশ করে। পূর্বে দুই চারি জন ধনী কামুক বাইজী-বিলাসের সুযোগ পাইতেন। যন্ত্রের কল্যাণে সকলেই এখন সে সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞাত-সারেই আমরা সকলেই ক্রমশ অক্ষম কামুক পশু হইয়া যাইতেছি। শাসক ও শোষকদের সুবিধা বাড়িতেছে।

এই সব যন্ত্র আমাদিগকে আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। মহৎকে সুন্দরকে শ্রেষ্ঠকে গুণীকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা সভ্য মানবচরিত্রের একটি প্রধান সম্পদ। যন্ত্রযুগের পূর্বে মহৎ সুন্দর শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ করা সহজ ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তাই সাধারণ লোকের ঔৎসুক্য ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। প্রকৃত জিজ্ঞাসুরা, অকপট ভক্তেরা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যন্ত্র এখন সমস্তই সুলভ করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি রেডিওতে যখন কোন গুণী সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন বা কোনও বিখ্যাত পণ্ডিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িতেছেন, তখন আমরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে সব শুনি না, রেডিওটা খুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে হাসি-গল্প-তামাসায় মাতিয়া উঠি। যদি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া বহু সাধনা করিয়া উক্ত গুণীদের সমীপবর্তী হইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মুখে আমরা এতটা বেসামাল হইতাম না। ইহাতে উক্ত মনীষীদের বিশেষ ক্ষতি হয় না, হয় আমাদের। সবকিছুকেই যন্ত্রের সহায়তায় অতি সহজে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া আমরা কিছুই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না যে পাইলেই গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করিবার জন্য সাধনা দরকার। পল্লবগ্রাহীসুলভ একটা মিথ্যা অহঙ্কারের মুখোশ পরিয়া আমরা সবজান্তা সাজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, আমাদের নির্জ্জন মনে কিন্তু আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি এবং তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের অশান্ত করিয়া তোলে।

যন্ত্রসভ্যতার অর্থনৈতিক দিকটা তো আরও

ভয়ঙ্কর। পল্লীসমাজ ভাঙিয়া গিয়াছে, ভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা শহরে আসিয়াছি, কুটিরশিল্প অবলুপ্ত, পেশা এখন আর বংশগত নাই, ব্রাহ্মণ জুতার দোকান খুলিয়াছে, মুচী অধ্যাপনা করিবার চেষ্টায় পরীক্ষা পাশ করিতেছে, ময়রার ছেলে ডাক্তার হইতে চায়, বৈশ্যের পুত্র এনজিনিয়ার হইয়াছে, তবু কিন্তু কাহারও অন্ন জুটিতেছে না, ঘরে বাহিরে দোকানে ফ্যাকটরিতে সর্বত্রই অশান্তি। সকলেই আমরা ছটফট করিতেছি—পূর্বযুগে দাসচালকদের চাবুকের আঘাতে ক্রীতদাসরা যেমন ছটফট করিত নূতন যুগের অভিনব ক্রীতদাস আমরা ঠিক তেমনি ভাবেই ছটফট করিতেছি—অনেকে হয়তো বুঝিতে পারিতেছি না এক অদৃশ্য Simon hegvee আমাদের চাবকাইতেছে। পূর্বে ক্রীতদাসরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত, কোনও কোনও সহৃদয় প্রভু ক্রীতদাসকে স্বাধীনও করিয়া দিতেন, এখন কিন্তু দাসত্বের যে নাগপাশে আমরা আবদ্ধ তাহা হইতে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। তাই অশান্তি আরও বড়িয়াছে। কোনরকম 'ইজ্‌মে'ই আর মন প্রবোধ মানিতেছে না। সমাজ রাষ্ট্র সমস্তই যেন কারাগাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রতিবেশীকে মনে হইতেছে শত্রু, ধার্মিককে মনে হইতেছে ভণ্ড, পণ্ডিতকে মনে হইতেছে বেকুব, ধনীকে মনে হইতেছে শোষক। কোথাও শান্তি নাই।

আধুনিক অশান্তির চেহারাটা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম। পরবর্তী প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিব আমাদের শিক্ষার দ্বারা এ অশান্তি নিবারণ সম্ভব কি না। নূতন কিছু বলিবার স্পর্ধা করি না। নূতন বলিয়া কিছু আছে কি? আমরা পুরাতনকেই বারংবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করি। বেদান্তকে সাংখ্যকে থিওরি অব রিলেটিভিটির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া চমকিত হই। অতি আধুনিক আণবিক বোমার স্বরূপ যে বেদব্যাসের কল্পনাতে অন্তত ছিল তাহার প্রমাণ পাই ব্রহ্মশির বা পাশুপত অস্ত্রের বর্ণনায়।

অশান্তি মানবসমাজের অতি পুরাতন ব্যাধি। অতীতকালে যাঁহারা চিন্তানায়ক ছিলেন তাঁহারাও এ ব্যাধির প্রতিকার-চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রয়াস যে নিষ্ফল হয় নাই তাহার প্রমাণ অতীতের গৌরবময় ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমাদের শিক্ষার বহুবিধ সংস্কারের কথা শুনি—উড সাহেবের ডেসপ্যাচ, গোখলের বিল, স্যাডলার কমিশন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার, স্বাধীন ভারতেরও শিক্ষার নানাবিধ সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, কিন্তু আমার মনে হয় আসল ব্যাপারটার উপর যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। খাদ্যদ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়—প্রাচীন বলিয়া এ সত্য আমরা বর্জন করি নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অশান্তি নিবারণেরও একটা প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়াস পাইব।

ক্রমশঃ

"আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি'ভাবই প্রবর্তিত করায় সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পরিচয়

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

"আদি মানবের সন্তান আমি
দেবতার চেয়ে অভিজাত,
সত্যেরে আমি সম্ভ্রমে নমি
মিথ্যারে করি পদাঘাত।
ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি
বিশ্বেরে নাহি করি ভয়,"—
মানুষের কাছে নাহি মানুষের
এর চেয়ে বড় পরিচয়।

"মানুষ জাতির স্বজাতি যে আমি
মানুষ আমার বোন্ ভাই ;
মানুষেরে ভালবাসি দিবানিশি
সেবা করি তার গুণ গাই।
মানুষে মানুষে হিংসা নিত্য
কঠোর চিত্তে করি জয়"—
মানুষের কাছে নাহি মানুষের
এর চেয়ে বড় পরিচয়।

"মানুষ-ধর্ম আমার ধর্ম
অপর ধর্ম কিছু নাই,
মানুষের যাহা করণীয় আমি
সদা তারি পিছু পিছু ধাই।
জীব-নারায়ণে সেবি প্রাণপণে
সংযমে করি অরি জয়,—"
মানুষের কাছে নাহি মানুষের
এর চেয়ে বড় পরিচয়।

ধর্ম

শ্রীমতী লীলা মজুমদার

একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক একবার বলেছিলেন যে, হিন্দুরা ধার্মিকভাবে খায় দায়, শোয় ঘুমোয়, চলে ফেরে ; ধার্মিকভাবে চিন্তা করে, পুণ্য করে, পাপ করে। কথাটার মধ্যে অনেকখানি শ্লেষ আছে বলা বাহুল্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতটা সত্যও আছে যে, মনে গিয়ে আঘাত করে। এই হিন্দুরা যারা মিথ্যাকথা বলে থাকে, প্রবঞ্চনা করে, পরনিন্দা করে কিন্তু অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াবার যাদের সৎসাহস নেই, তারাই নাকি ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করে, কথাটার একমাত্র অর্থ করা যেতে পারে যে, নিজেদের কাজের দায়িত্ব বহন করবার সাহস পর্যন্ত হিন্দুদের নেই, ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনও মতে সেটুকুকে এড়িয়ে যেতে পারলেই হ'ল। সেইজন্য এদেশের সমাজকে সংস্কার করা এত

কঠিন। ভিতর থেকে আপদ কিছুতেই বিদায় হয় না, বাইরে থেকে আইন্ করে জবরদস্তির সাহায্যে তার কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে এমন জাতির ও এমন ধর্মের কতটুকু মূল্য?

আসল কথা হ'ল ধর্ম শব্দের অর্থ নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হ'য়ে গেছে। কতকগুলি আচার নিয়মের ফিরিস্তি দিয়ে কি আর একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়? এমন কি ধর্ম বলতে শুধু মানুষের সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধটুকুও বোঝায় না। ধর্মের প্রয়োগ আরও ব্যাপকভাবে হওয়া চাই? ধর্ম মানে একটা সম্পূর্ণ জীবনের ধারা, জীবনধারণের পদ্ধতি। যে আর্য প্রপিতামহরা নিয়মনিগড়ে আমাদের গোটা জীবনটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্ম শব্দের এই অর্থটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কালের ফেরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ধর্মের নিয়ম পালনটি শুধু টিকে রইল, মাঝখান থেকে ধর্মই কোথায় খসে পড়ল।

ফলে এখন কাউকে 'ধার্মিক' আখ্যা দিলেই চোখের সামে সর্বপ্রকার আনন্দের শত্রু, চোখবোঁজা একজন ভণ্ডের চিত্র ভেসে ওঠে।

ধার্মিক বলতে আর ধর্মপরায়ণকে বোঝায় না। এমন কি অনেকের মতে ধর্মই হ'ল পৃথিবীর অর্ধেক দুঃখের প্রধান কারণ। ধর্ম বলতে যদি শুধু আনুষ্ঠানিক, ধর্ম বোঝায় তা' হ'লে এ কথাটার মধ্যেও অনেকখানি মর্মান্তিক সত্য আছে।

কিন্তু ধর্মের একটা বৃহত্তর সংজ্ঞা আছে যা'র প্রয়োগে একজন নাস্তিকও একদিক দিয়ে যতই না দীন হ'ক, অপরদিকে ধর্মপরায়ণ আখ্যার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। যে জিনিসকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছে, তাকে যারা অবলম্বন করে, তারা ধার্মিক। যা'রা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা দণ্ডায়মান হয়, তারা ধার্মিক। যা'রা শত্রুকে ক্ষমা করে, দুঃখীকে দয়া করে, স্বার্থকে ত্যাগ করে তারা সকলেই ধার্মিক। মনুষ্যত্বকে যা প্রস্ফুটিত ক'রে তোলে, তাই ধর্মের অঙ্গ। যা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতে, গুণীকে সম্মান করতে সহায়তা করে, সেও ধর্মের অঙ্গ। ধর্মের এই সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া যায় না, নব নব উদয়াচলে নিয়ত সে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে।

আমরা ধর্মের এই অর্থকে ভুলে গিয়েছি ব'লে ধর্ম আমাদের কাছে কতকগুলি পুঁথিগত মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, বেঁচে থাকার একটা প্রণালী না হ'য়ে কতকগুলি ফুল গঙ্গাজল বেলপাতার একটা অর্থশূন্য ক্রিয়ামাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভাবি ধর্মকে অবলম্বন করলে বুঝি সংসারের সব আনন্দগুলিকে বর্জন করতে হবে। বুঝি বন্ধুবান্ধব, সুখ সখ সব ছাড়তে হবে, বুঝি একটা অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে।

বলা বাহুল্য, এই বৃহত্তর অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করলে স্বার্থসেবাকে খানিকটা কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কেবল এমন ধর্মই সমাজের কল্যাণের হেতু হয়। অপর সকলের দ্বারা সকল মঙ্গলের অন্তরায় যে আত্মপ্রসাদ, তাকে ছাড়া আর কিছুকে লাভ করা যায় না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরাও ধর্মের এই বড় অর্থই গ্রহণ করেছেন। পরমহংসদেব গির্জা দেখলেই নমস্কার করতেন, সাধু দেখলেই আলিঙ্গন করতেন, অনাসক্তকে দেখলেই মাথা নত করতেন? অনেকে তাই হাসাহাসি করত। ভালোকে ভালো বলবারও যেমন আমাদের সাহস নেই, মন্দকেও তেমনি মন্দ বলবার আমাদের সৎসাহস নেই! অসৎ কাজ ক'রে আমরা বলি যে, আজকাল সকলেই এমন ক'রে থাকে, যেন পাঁচজনে অন্যায় করলেই অন্যায়টা কমে যায়। আর অসৎ কাজের ফলে যদি ঘরে অর্থ-সমাগম হয়, তা' হ'লে মুক্তকণ্ঠে আমরা ঐ কীর্তিমানের বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে থাকি, এবং

বারংবার বলি অন্যায় কাজ করতে হ'লে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, অনেকেরই সে সাহস নেই ব'লে তারা সৎপথে থেকে যাচ্ছে। এমন কি ধর্মে আমাদের এতই অনাস্থা, যে কেউ যদি নিজের চেষ্টায় নিজের অবস্থার উন্নতি ক'রে থাকে, তখুনি আমাদের সন্দেহ হয় নিশ্চয় অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে, নইলে, কি আর বড়লোক হ'তে পারত। আবার নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বাইবেল থেকে নজির দিয়ে বলি, যীশু বলেছিলেন যে বরং একটা স্থচের ছিদ্র দিয়ে একটা উট গলে যাবে, তবু ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করা হবে না।

পুরুষপরম্পরায় আমরা বলে আসছি যে, ধর্মের সঙ্গে পার্থিব সুখ খাপ খায় না, অতএব সময় থাকতে ধর্মটিকে ত্যাগ ক'রে বিষয় আশয় রক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা ঢের ভালো। এবং ধর্ম যদি করতেই হয়, বেশ কোশাকুশি ফুল জল দিয়ে এক কোণে বসেই পড়গে না, তা'র চেয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। তা'তে সংসারের অনিষ্ট হ'তে পারে।

ধর্ম যে বেঁচে থাকবারই পদ্ধতি, সংসারযাত্রা নির্বাহ করবারই প্রণালী—সে কথা কই কেউ ত' আজকাল বলে না।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ

(এক)

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর ঢেউ আকাশে বাতাসে লেগেছে। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের বহু কৃতী সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে জড়িত তাঁদের অনেক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ ক'রে নিজেরা ধন্য হয়েছেন এবং ভক্তদেরও ধন্য করেছেন। কয়েকজন বন্ধু, বিশেষ করে, দু'একজন সন্ন্যাসী মহারাজও আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমার যা জানা আছে তা লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করেছিলেন। এতদিন তা করা হয়নি, কিন্তু এখন ভাবছি আমি যত দীনই হই না কেন, শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষ করে এই শুভ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমিও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো। তবে শ্রীশ্রী-মায়ের চরণে আশ্রয় নেবার পূর্বের ঘটনাগুলি না লিখলে অনেক কথাই বলা হবে না, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রধান তীর্থস্থান বেলুড়মঠে আমার প্রথম দিনের অভিযানের ইতিহাস দিয়েই সুরু করবো। *

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে (১৯১৫ খ্রীঃ) কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হই। সেই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে পড়তে এক ছুটির দিনে ইচ্ছা হলো বেলুড়মঠে বেড়াতে যাব। দুই বন্ধুও সঙ্গী হলেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা তিন বন্ধু মঠে গেলাম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর ঘরের

* মনে পড়ে অত্যন্ত ছেলেবেলায় একদিন সন্ধ্যায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে জনৈক ভদ্রলোক আমার পিতাকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মশায় একটা পাগলা বামুন কি কাণ্ডটাই না করলে। ক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক গল্প করলেন। সেই প্রথম আমি ঠাকুরের নাম শুনেছিলাম। আরও মনে পড়ে, স্বামীজীর দেহত্যাগের খবর যখন সাপ্তাহিক কাগজে বের হলো তখন গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকটি কাগজ পড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন,—সর্বনাশ হয়েছে। আমি বালকসুলভ কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি হয়েছে? তিনি বললেন, তুই এখন বুঝবি না, বড় হলে বুঝবি দেশের কি সর্বনাশ হলো।

১৯১৫ সালে যখন ম্যাট্রিকুলেশন টেষ্ট পরীক্ষা দিই তখন পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ময়মনসিংহে আসেন। ওখানে আমি স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রথম দর্শন করেছিলাম—তবে কথাবার্তা কিছু হয়নি।

পাশের ঘরে একটা তক্তাপোশে শুয়ে ছিলেন। গায়ে একখানা চাদর মাত্র ছিল। আমরা যখন ঢুকলাম তখন আমার পূর্ব পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক আমাকে কানে কানে বললেন,—"ইনিই বাবুরাম মহারাজ, এঁকে প্রণাম কর।" আমার ভিতরে তখন ভীষণ সমস্যা। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে এত ভাল লেগেছে যে প্রাণ চাইছে প্রণাম করতে, কিন্তু সংস্কার বলছে—ইনি কি ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কিনা না জানলে আমি প্রণাম করবো না। শেষ পর্যন্ত সংস্কারই জয়ী হলো। আমি প্রণাম করলাম না, আর আমার পূর্ব পরিচিত বন্ধুটিও জোর করেই প্রণাম করাবেন! এই অবস্থায় আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "উনি ব্রাহ্মণ কিনা না জানলে আমি কিছুতেই প্রণাম করবো না।" এদিকে এই কথা শুনেই পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ লাফিয়ে তক্তাপোশ থেকে নামলেন এবং একহাতে আমাকে ধরে টানতে টানতে নীচে পূবের দিকের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার মাথার উপর (ব্রহ্মতালুতে) চুমু খেলেন। সে কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমার মনে হলো এক মুহূর্তে জীবনের ধারা যেন সম্পূর্ণ বদলাতে লাগলো। আমি অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই কান্না থামাতে পারলাম না। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বললেন,—"আর কাঁদছিস্ কেন? কান্না শেষ।" [illegible]াৎ বলে উঠলেন,—"চল্, তোকে ঠাকুরের ঘ্রিত্যার পরিচয় [illegible] যাই।" এই বলে আবার টানতে টানতে ঠা[illegible] ঘরের সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন এবং এক পা সিঁড়ির উপর দিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। ঠিক এই সময়ে আমি শুনতে পেলাম যেন মিলিটারী বুট পরে তালে তালে পা ফেলে এলে যেমন একটা গুরুগম্ভীর ভাব মনে আসে ঠিক সেইভাবে কে যেন আসছেন। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে যিনি নেমে এলেন তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই মনে হলো, এভাবের বিরাট লোক আমার জীবনে কখনও দেখিনি, যেন সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট আমার সম্মুখে উপস্থিত! ইনিই শ্রীশ্রীমহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। আমাদের কাছে এসে বাবুরাম মহারাজকে বললেন—"বাবুরাম দা, ছেলেটার মাথাটা খেলে?" বাবুরাম মহারাজ উত্তর করলেন,—"মহারাজ, তুমি এই ছেলেটাকে গ্রহণ করো।" এই বলে তিনি আমাকে দুহাতে ঠেলে দিলেন শ্রীমহারাজের কাছে। শ্রীমহারাজ আমাকে বাম হাতে জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"পারবি?" আমার ভিতর থেকে জবাব বের হলো—"আপনি কৃপা করলে নিশ্চয়ই পারবো।" এই যে 'কৃপা' ইত্যাদি কথা আমার মুখ দিয়ে বের হলো তার সঙ্গে যেন আমার পূর্বেকার জীবনের কোন সামঞ্জস্য নেই। মহাপুরুষদ্বয়ের স্পর্শে আমি অনুভব [illegible] জীবনের ভিতরটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এঁদের কি অসম্ভব আপন মনে হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রীমহারাজ আমার ব্রহ্ম-তালুতে আঙুল দিয়ে একটা কি যেন লিখলেন। আমি প্রণাম করলাম। আস্তে আস্তে তালে তালে পা ফেলে তিনি আবার উপরে উঠে গেলেন।

কলকাতার হোষ্টেলে ফিরে এলাম। জীবনের ভিতরে একটা মানুষ মরে যেন আর একটা মানুষ জন্মালো। চিন্তা এবং কর্মধারা সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়ে গেল, আর ভিতরে একটি নাম দিন রাত ঘড়ির [illegible]টার মত চলতে লাগলো। রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও বুঝতে পারছি—নাম চলছে। কৃপা জিনিসটা যে কি আমি এই মহাপুরুষদ্বয়ের কৃপাতেই বুঝতে পারলাম। তারপর থেকে সুবিধে পেলেই মঠে যেতাম। আত্মীয়স্বজন, এমন কি পিতামাতাকেও অত্যন্ত দূর মনে হতে লাগলো। ছুটি হলে দেশে যেতাম না। এই অবস্থায় একদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গেলাম। তখন তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। শ্রীশ্রীমহারাজ ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে অত্যন্ত আপন মনে হতো।

তাঁদের কাছেই যেতাম। কাছে বসে থেকে তাঁদের দেখেই অত্যন্ত আনন্দ পেতাম। কোন প্রশ্ন করা অথবা কিছু প্রার্থনা করা—এসব আসতো না। যাহোক্ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাওয়া হল। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মাটিতে বসে আছেন দু'পা ছড়িয়ে। যেই চৌকাঠের কাছে গেছি, দেখলাম ঘরে আর কেউ নেই। শ্রীশ্রীমা এক হাতে ঘোমটা একটু খুলে বললেন,—"ওখান থেকেই প্রণাম করো।" আমার মনে ভীষণ দুঃখ হলো, কিন্তু কি করবো, মা তো ঘরে ঢুকতে দিলেন না, কাজে কাজেই আমি চৌকাঠের উপর প্রণাম করেই চলে এলাম। পথে বের হয়ে খুবই কাঁদলাম। হোষ্টেলে এসেও কাঁদলাম। শুধুই মনে হলো মা যেন আমাকে দূরে তাড়িয়ে দিলেন—কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়—এই কথা মনে হলো।

দু' তিন দিন পর আবার উদ্বোধন আফিসে গিয়েছি। উপরে গিয়ে দেখলাম শ্রীশ্রীমা পূর্বদিনের মতোই দু'পা লম্বা ক'রে ছড়িয়ে বসে আছেন। এবার আমি সাহস করে চৌকাঠ পার হয়ে গেলাম। ঘরের ভিতর ঢুকে মেজেতে মাথা ঠুকে প্রণাম করলাম। কেন জানি না শ্রীচরণ স্পর্শ করার সাহস হলো না। শ্রীশ্রীমাও ঘোমটা খুলে একটু দেখলেন। আমিও চলে এলাম। পথে বের হয়ে সেদিনও মন খুব খারাপ হয়ে গেল। অনুশোচনা হতে লাগলো কেন সাহস করে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করলাম না। যাক্, হোষ্টেলে ফিরে এলাম। এবার সংকল্প করলাম আর একবার উদ্বোধনে যাবো এবং এবার শ্রীশ্রীমায়ের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবো। এবার বোধ হয় তার ঠিক পরদিনই বা একদিন মাঝে বাদ দিয়ে গেলাম। উদ্বোধন আফিসে ঢুকে বারান্দা দিয়ে উপরে যাবো, হঠাৎ পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন,—"এই ছোকরা, তুই কোথায় যাচ্ছিস্?" আমি বললাম,—"মাকে প্রণাম করতে উপরে যাচ্ছি।" তিনি বললেন,—"তুই ত কাল এসেছিলি, আবার আজ এসেছিস? প্রত্যেক দিনই মাকে প্রণাম করতে যাবি নাকি?" আমি বললাম,—"কেন যাবো না? আমি চললাম উপরে।" তিনি আমায় আর বাধা দিলেন না। আমি উপরে গেলাম। এবারও শ্রীশ্রীমা ঠিক পূর্ব দু' দিনের মতোই বসেছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে মেজেতে লম্বা হয়ে পড়ে আমার মাথাটা তাঁর শ্রীচরণে রেখে প্রণাম করলাম। সেই স্পর্শের কি অদ্ভুত গুণ! 'মা কৃপা কর', 'মা কৃপা কর' বলে আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই যেন আমাকে সামলাতে পারছিলাম না। শ্রীশ্রীমা হাত দিয়ে তাঁর ঘোমটা ফেলে দিলেন, আর অতি সকরুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,—"এসে যখন পড়েছ, আর ভাবনা কিসের? কেঁদো না, কান্না তো ফুরিয়ে গেল এখন হাসবে।" আমি কিন্তু ঠিক তেমনই কাঁদতে লাগলাম। মনে হলো যেন অনেক জন্মের জমাট দুঃখ কান্নার ভিতর দিয়ে গলে বের হয়ে আসছে। আমার কান্না শুনে দু'একজন সাধু, এমন কি পূজনীয় সারদানন্দ স্বামীজীও উপরে এলেন। আমাকে এ অবস্থায় দেখে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন। শ্রীশ্রীমা কিন্তু বার বার বলতে লাগ[illegible] "কান্না ফুরিয়ে গেল, এখন হাসবে।" কথাপ্রসঙ্গে ব[illegible] পরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণামান্তর নীচে করলে। [illegible] পূজনীয় সারদানন্দজীকে প্রণাম করে হোষ্টেলে ফিরলাম। তারপর মাঝে মাঝে সময় পেলে উদ্বোধনে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আসতাম। ১৯১৭ সালের পূজার ছুটিতে দেশে (মৈমনসিং) কয়েকদিন কাটিয়ে আসবো বলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সন্ধ্যায় গাড়ীতে উঠেছি। রাণাঘাটে সি আই ডি ডিপার্টমেন্টের দুজন লোক আমাকে Defence of India Act অনুসারে আটক করে এবং কলকাতায় নিয়ে আসে। ২৫দিন

রাজনৈতিক বন্দীরূপে কারাবাসে ছিলাম। ঐ সময়ে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত কৃপা প্রত্যক্ষ করি। ২৫ দিন পরে ছাড়া পাই। শ্রীশ্রীমাকে ঐসব অলৌকিক দর্শনাদির কথা নিবেদন করতে চাইলে তিনি বললেন—"আমি সব জানি।"　　(ক্রমশঃ)

প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

[প্রতীকোপাসনা—প্রতীকের পরিচয়]

এক্ষণে আমরা প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় আলোচনা করিব। "দেবতাদৃষ্ট্যা সংস্কৃত্য উপাস্যমানানি অনাত্মবস্তূনি প্রতীকানি" (বৈঃ ন্যায়মালা, ৩৷৩৷৩৪ অধিঃ)—'দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া যে অনাত্মপদার্থসকল উপাসিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বলে 'প্রতীক'। যেমন 'শালগ্রাম' একটি শিলাপিণ্ডমাত্র, সুতরাং অনাত্মপদার্থ, কিন্তু 'ইনিই বিষ্ণু'—এইপ্রকার দৃষ্টিদ্বারা সংস্কার করিয়া তাহাকে উপাসনা করা হয় বলিয়া 'শালগ্রাম'কে বলি প্রতীক। এই প্রকারেই ধাতু, পাষাণ, কাষ্ঠ, বা মৃত্তিকাদি-দ্বারা নির্মিত চতুর্ভুজ বা দশভুজাদি সমন্বিত অনাত্মভূত মূর্তিসকলকে তত্তৎ কালী বা দুর্গাদি দেবতাদৃষ্টিদ্বারা সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হয় বলিয়া উক্ত চতুর্ভুজ বা দশভুজাদি সমন্বিত প্রতিমাসকল হয় প্রতীক। এইরূপেই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যখন সামগান করা হয় 'শস্ত্র'নামক স্তোত্রবিশেষ পাঠ করা হয়, তখন সেই অনাত্মভূত সাম প্রভৃতিকে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদৃষ্টিতে (ছাঃ ১৷৬৷১) সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হয় বলিয়া উক্ত 'সাম' প্রভৃতি প্রতীক। এই প্রতীকসকল অবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই প্রতীকোপাসনা।

[প্রতীকাবলম্বনা শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয়, তাহার বিভাগ, সাধনক্রম ও ফল]

এই প্রতীকোপাসনাসকল দুইভাগে বিভক্ত; যথা—**কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা** এবং **কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা**। শালগ্রামে বিষ্ণুদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা, নামে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৭৷৫৷১) মনে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৩৷১৮৷১), আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৩৷১১৷১) ইত্যাদিস্থলে শালগ্রাম, নাম, মন ও আদিত্য ইত্যাদি প্রতীকসকল 'সাম' প্রভৃতির ন্যায় কোন যজ্ঞের অঙ্গ নহে। সেই হেতু এইসকল প্রতীককে বলে—**কর্মানঙ্গভূত প্রতীক**। ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা সংস্কার করিয়া তদবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনা। আর সাম, ঋক্, ও উদ্গীথ (ইহা সামের অংশবিশেষ) ইত্যাদি হইতেছে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অঙ্গ। সেই যজ্ঞাঙ্গসকলকে অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি ও মুখপ্রাণ ইত্যাদি দৃষ্টির দ্বারা সংস্কারপূর্বক তদবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই **কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনা**। কর্মানঙ্গভূত ও কর্মাঙ্গভূত এই উভয়প্রকার প্রতীকোপাসনাই

যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার ন্যায় অদৃষ্ট উৎপাদন করত সাধককে ফলপ্রদান করে। সেই ফলসকল শ্রুতিতে তত্তৎ উপাসনার বিধানকালেই পঠিত হইয়াছে, যথা—'নাম ব্রহ্মোপাসনা'তে—নামের যত দূর গতি, সাধকেরও ততদূর যথেচ্ছগমন অর্থাৎ বেদ ও সকলপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শিতা (ছাঃ ৭।১।৪-৫)। 'মনো ব্রহ্মোপাসনা'তে—যশ, কীর্তি, বেদজ্ঞানজনিত তেজোলাভ ইত্যাদি (ছাঃ ৩।১৮।৬)। এইরূপে কর্মানঙ্গভূত বিভিন্নপ্রকার প্রতীকোপাসনাতে বিভিন্ন ফল শ্রুত হয়। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাসকল জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সামগান ইত্যাদি অঙ্গসকলের অনুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহারা সেই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি সম্পাদন করে (ছাঃ ১।১।১০)। কোন কোন স্থলে এই উপাসনাসকলের তদতিরিক্ত ফলও শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, যথা—'ঊর্ধ্ববর্তী ও অধোবর্তী লোকসকল তাহার ভোগ্য হয়' (ছাঃ ২।২।৩) ইত্যাদি। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাতে বিশেষ এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋত্বিক্ (পুরোহিত) কর্তৃক এইগুলি অনুষ্ঠিত হয় এবং যজমান দক্ষিণাদ্বারা উহার ফল ক্রয় করিয়া লন (উত্তর মীঃ দঃ ৩।৪।১৩ অধিঃ)। কিন্তু কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাতে যজমান নিজেই উহার অনুষ্ঠান করেন এবং ফললাভও হয় তাঁহারই।

এই উভয়প্রকার প্রতীকোপাসনাতেই আর একটি বিশেষ এই যে—কর্মের ন্যায় অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা ফলপ্রদান করে বলিয়া বিভিন্নফলকামী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুযায়ী বহু প্রতীকোপাসনার অনুষ্ঠান করিতে পারেন; এক ফল কামনায় কিয়ৎক্ষণ একটি প্রতীকাবলম্বনে উপাসনা করিয়া অন্য ফল কামনায় অন্য প্রতীকাবলম্বনে কিয়ৎক্ষণ উপাসনা করিতে পারেন। অহংগ্রহোপাসনার ন্যায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত (উঃ মীঃ দঃ ৪।১।১৮ আপ্রয়ণাধিঃ) একটি উপাসনাতেই উপাসককে নিবিষ্ট থাকিতে হয় না। উত্তরমীমাংসা দর্শনের ৩।৩।৩৫ কাম্যাধিকরণে এবং ৩।৩।৩৬ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণে এই কর্মাঙ্গভূত ও কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে।

[অধ্যাসোপাসনা ও সম্পদুপাসনা]

শাস্ত্রে যে অধ্যাসোপাসনা ও সম্পদুপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা এই প্রতীকালম্বনা উপাসনারই প্রকারভেদ। প্রত্যেকটি প্রতীকোপাসনাই এই উভয়প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সাধকের মানসিক সামর্থ্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের উপর এই উপাসনাদ্বয় নির্ভর করে। ধ্যানকালে সাধক যখন শালগ্রামাদি প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তাই প্রধানভাবে করে, তখন বিষ্ণু প্রভৃতি আরোপ্যের চিন্তা অপ্রধান হইয়া পড়ে, এই প্রকার যে উপাসনা তাহাকে বলে **অধ্যাসোপাসনা**। আর সাধকের মানসিক সামর্থ্য উন্নতিলাভ করিলে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তা যখন তাহার নিকট অপ্রধান হইয়া পড়ে এবং স্বীয় ইষ্টদেবতারূপ আরোপ্যের চিন্তাটিই প্রধান হইয়া উঠে, তখন এই উপাসনাকে বলা হয় **সম্পদুপাসনা**। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই সম্পদুপাসনাতে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটি অপ্রধান হইয়া পড়িলেও সাধক তখনও তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না, উপাসনাকালে তাহা অনুবৃত্ত হইতেই থাকে। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ঐ প্রতীকটিকে অবলম্বন না করিলে তাহার মন ঐ প্রতীকে আরোপিত ইষ্টের দিকে ধাবিত হইতে পারে না। [সাধকের মানসিক সামর্থ্যের আরও উন্নতি হইলে এই সম্পদুপাসনা কি প্রকারে অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি লাভ করে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব]। যাহা হউক ইহাই হইল শ্রৌত উপাসনাসকলের মোটামুটি পরিচয়।

[স্মার্ত উপাসনা ও শ্রৌত উপাসনার সহিত তাহার সম্বন্ধ]

এখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বিচার্য বিষয়ের অবতারণা করিব। বেদের অপর নাম শ্রুতি এবং শ্রুতিভিন্ন যে সকল শাস্ত্র, তাহাদিগকে বলে স্মৃতি। স্মৃতি আবার দুই প্রকার—বেদ-বিরুদ্ধ স্মৃতি, যথা সাংখ্যাদি শাস্ত্র এবং বেদের অবিরুদ্ধ স্মৃতি, যথা—পুরাণ ও তন্ত্র ইত্যাদি। ইদানীন্তনকালে এই পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও কালী ইত্যাদি নানা দেব-দেবীর পূজা আমরা তত্তৎ প্রতিমাবলম্বনে করিয়া থাকি। তত্তৎ দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয় বলিয়া এই অনাত্মভূত প্রতিমাসকল যে প্রতীক, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা যে দেবতাসাক্ষাৎদ্বারা মোক্ষপ্রদ নহে, পরন্তু অদৃষ্টদ্বারে তত্তৎ অভীষ্ট ফলপ্রদ, ইহাও আমরা প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাকালে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং সন্দেহ হয়—বর্তমানকালে পুরাণাদির অনুসরণ করিয়া প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজারত আমরা মোক্ষপ্রদ কোন বিদ্যার অনুশীলন করিতেছি, অথবা করিতেছি না? আমরা কি ইহলৌকিক কোন প্রকার কামনা পূরণের জন্যই 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' ইত্যাদির ন্যায় এই প্রতীকোপাসনাসকলের অনুষ্ঠান করিতেছি? কেহ হয়তো বলিতে পারেন—"তুমি বৈদিক উপাসনা-সকলকে এই স্মার্ত উপাসনাসকলের সহিত জড়াইতেছ কেন? বেদে যাহা থাকে থাকুক্, পুরাণাদি স্মৃতিতে বর্ণিত উপাসনাসকলের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? বৈদিক প্রতীকোপাসনাসকল মোক্ষপ্রদ না হইলেও, পুরাণ ও তন্ত্রাদি স্মৃতিতে বর্ণিত এই উপাসনা সকল অবশ্যই মোক্ষপ্রদ, যেহেতু সেই স্থলে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'যং সমভ্যর্চ্য বিপ্রেন্দ্রঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ধ্রুবম্' (বৃঃ নারদীয় পুরাণ ৩২।৪৫; 'গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মমসাধনাৎ' (মহানিঃ তন্ত্র ৪।৫), ইত্যাদি। সুতরাং তুমি আবার অনর্থক একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি করিতেছ কেন?" তাঁহাকে বলিব—অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অপৌরুষেয় বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীল স্মৃতি প্রভৃতি পৌরুষেয় শাস্ত্রসকল এই বিষয়ে আমাদের কোন সহায়তাই করিতে পারে না। সুতরাং যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা আমরা গ্রহণ করিতেই পারি না। অতএব বেদের সহিত না জড়াইয়া উপায় কি বল? দেখ, ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

"আর্ষং ধর্মোপদেশংচ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।" (মনুসং ২২।১০৬)

"আর্ষ (ঋষিগণদৃষ্ট বেদ) এবং ধর্মোপদেশকে (বেদমূলক স্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণিত উপদেশসকলকে) যিনি বেদের অবিরোধী তর্কের দ্বারা (—পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাসম্মত যুক্তির দ্বারা) বিচার করেন, তিনি ধর্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।" সুতরাং কর্মানুষ্ঠানে পূর্বমীমাংসার এবং উপাসনা ও জ্ঞানানুশীলনে উত্তর মীমাংসার গতি অপ্রতিহত। অতএব উত্তর মীমাংসার আলোকে এই স্মার্ত উপাসনাসকলের বিচার ব্যতিরেকে তাহাদের প্রামাণ্য ও বেদানুগামিতা নির্ণয়ের প্রতি অন্য কোন উপায়ই নাই। "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রে আচার্য বাদরায়ণ "প্রতীকালম্বনে উপাসনা-কারীর ক্রমমুক্তিও হয় না"—ইহা বলিয়াছেন। সেই হেতু স্মার্ত উপাসনাসকল মোক্ষপ্রদ কিনা এবং কি প্রকারে তাহারা জীবের মোক্ষ সম্পাদন করে, তাহা অবশ্যই বিচারযোগ্য। এই উপাসনাসকল যদি

উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রের অবিরোধী হয়, তাহা হইলেই আমরা বুঝিব, তাহারা বেদবিরুদ্ধ নহে। আর তাহা হইলেই তাহারা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে, নতুবা নহে।

[বিচারের অবয়ব]

আমরা যে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার অবয়বসকল এই প্রকার—

বিষয়—প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনে উপাসনা।

সংশয়—উত্তরমীমাংসা বলেন, 'প্রতীকোপাসনা মোক্ষপ্রদ নহে,' কিন্তু পুরাণাদি স্মৃতিসকল বলেন, 'তাহা মোক্ষপ্রদ।' সেই হেতু সংশয় হয়– প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ অথবা নহে।

পূর্বপক্ষ—উত্তর মীমাংসার বিরোধী হওয়ায় প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ নহে।

সিদ্ধান্ত—নিম্নোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণসকলের বলে উত্তরমীমাংসার অবিরোধী হওয়ায় প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনে আরব্ধ হইলেও স্মার্ত উপাসনাসকল ইহলৌকিক তত্তৎ কামনা স্বর্গ, ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি-রূপ ফলপ্রদ।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, পুরাণাদি সর্বথা ত্যাজ্য। সিদ্ধান্তে—বেদের অবিরোধী হওয়ায় তাহারও সর্বতোভাবে গ্রহণীয়।

[সংশয়ের হেতুভূত উত্তরমীমাংসা সূত্রটির অর্থ]

উত্তরমীমাংসার যে সূত্রটি হইতে প্রতীকোপাসনা হইতে মুক্তি বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সূত্রটির অর্থ প্রথমে অনুধাবনযোগ্য। সূত্রটি এই—**অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাদোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥** ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫]

পদচ্ছেদ—অপ্রতীকালম্বনান্, নয়তি, ইতি, বাদরায়ণঃ, উভয়থা, অদোষাৎ, তৎক্রতুঃ, চ।

সূত্রার্থ—অপ্রতীকালম্বনান্—প্রতীক্ অবলম্বন না করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে, [ব্রহ্মলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে আগত অমানবপুরুষ (ছাঃ ৫।১০।২) ব্রহ্মলোকে] **নয়তি**—লইয়া যান; [সকল প্রকার উপাসককে লইয়া যান না] **ইতি**—ইহা,

বাদরায়ণ—আচার্য বাদরায়ণ [মনে করেন। যদি বলা হয় ইহা স্বীকার করিলে, "অনিয়মঃ সর্বাসাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪১) এইস্থলে যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যারূপ প্রতীকালম্বনা বিদ্যা এবং দহরাদি বিদ্যারূপ অপ্রতীকালম্বনা বিদ্যা—এই সকলপ্রকার বিদ্যাতেই উপাসকের দেবযানমার্গে গমন হয় বলা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **উভয়থা অদোষাৎ**– কোন উপাসককে লইয়া যান এবং কোন উপাসককে লইয়া যান না, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা স্বীকৃত হইলেও কোন দোষ হয় না। (—উক্ত 'অনিয়মঃ সর্বাসাম্' এই সূত্রোক্ত ন্যায় প্রতীকোপাসককে বিষয় করে না, তদ্ভিন্ন সকল উপাসকই তাহার বিষয়। সেই হেতু কোন বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব। আস্থা, উক্ত সূত্রোক্ত ন্যায় যে প্রতীকোপাসককে বিষয় করে না, তাহার নিয়ামক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তৎক্রতুশ্চ**—যিনি তাঁহার (—সগুণ ব্রহ্মের) ক্রতু—উপাসনা করেন, তিনি তৎক্রতু। [যিনি যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। সেই হেতু সগুণব্রহ্মের উপাসক দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করত সগুণব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদি—প্রতীকোপাসনাতে প্রতীকে আরোপিত হন বলিয়া ব্রহ্ম হইয়া পড়েন অপ্রধান, নামাদি প্রতীকের কিন্তু প্রাধান্য থাকে। সেই হেতু তদুপাসক আর

ব্রহ্মক্রতু (—ব্রহ্মোপাসক) হইতে না পারায় তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না—ইহাই ভাব। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাবিদ্‌গণ ব্রহ্মোপাসক না হইলেও বিশেষ শ্রুতিবচন বলে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গমন স্বীকৃত হয়, ইহাই অন্যান্য প্রতীকোপাসনা হইতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রভেদ]।—ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাবলম্বনে।

[পূর্বপক্ষ]

এক্ষণে পূর্বপক্ষী বলেন—আচার্য বাদরায়ণের মতানুযায়ী তবে তো নিশ্চিত হইল যে প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে আমরা যে উপাসনা করি, তাহা ব্রহ্মলোকে প্রাপক না হওয়ায় ক্রমমুক্তিরও হেতু নহে। সদ্যোমুক্তি তো দূরের কথা।

[স্মার্ত উপাসনাতে সিদ্ধান্ত বর্ণনারম্ভ]

উত্তরমীমংসাতে প্রদর্শিত এতদ্বিষয়ক যুক্তিসকলের প্রয়োগ করত এক্ষণে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছি। সিদ্ধান্তী বলেন—পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে অনুষ্ঠিত এই উপাসনাসকল সাধকের কামনা ও ক্রমপরিণত মানসিক সামর্থ্যানুসারে কর্মাঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা হইতে কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা এবং অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতে পরিণতি লাভ করে। কি প্রকারে তাহা হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

[কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা স্মার্ত উপাসনা]

মানবজীবন অনন্ত কামনাতে পূর্ণ। সেই কামনার পূর্তির জন্য সে যেমন লৌকিক উপায়সকল অবলম্বন করে, তদ্রূপ অলৌকিক উপায়েরও সহায়তা গ্রহণ করে, ইহা তাহার স্বভাব। প্রচীনকালে নানা কামনার পূরণের জন্য সে বৈদিক যজ্ঞাদির অশ্রয় গ্রহণ করিত, ইদানীন্তন কালে সে ঐ বৈদিক যজ্ঞেরই স্থানাপন্ন স্মার্ত নানাবিধ দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা প্রভৃতিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনধান্য পশু পুত্রাদি ও দেহান্তে স্বর্গলাভের জন্য সে দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়। এই দুর্গোৎসবাদির কালে সেই অর্চনার সাঙ্গতা সম্পাদনের জন্য সে যে শ্রীশ্রীগণেশ ও বিষ্ণু ইত্যাদি নানা অঙ্গ দেবতার অর্চনা করে তাহাই কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা। কারণ প্রধান পূজার অনুষ্ঠানকালে শ্রীশ্রীগণেশাদির প্রতিমাতে যে ধ্যানাদি পূর্বক অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রধান যে দুর্গোৎসব কর্ম—তাহার সাঙ্গতা ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করে। আবার স্থানবিশেষে উক্ত দেবার্চনাসকলের কোন অবান্তর ফল থাকিলে, তাহাও সম্পাদন করে। এই অর্চনাসকল পুরোহিত কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই উপাসনাসকলে অদৃষ্টদ্বারে ফলোৎপাদন ইত্যাদি বৈদিক কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ধর্মসকলই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ধ্যানাদিযুক্তভাবে এতদৃশ দেবার্চনাসকলকে কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাই বলিতে হইবে। কোন কোন ব্যক্তি নিষ্কাম বা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়াও এই দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠানও করেন। তাহার ফলে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ন্যায় এই শ্রীশ্রীদুর্গার্চনা প্রভৃতিও অনুষ্ঠাতার চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করে। তাদৃশস্থলেও শ্রীশ্রীগণেশাদির উপাসনা কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনারূপ স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যাহা হউক এইরূপে প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনা উপাসনাসকলের কর্মাঙ্গভূত স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

[কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা স্মার্ত উপাসনা]

একণে আমরা প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনা উক্ত উপাসনাসকলেরই কর্মানঙ্গভূত স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি। উপরে যে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের কথা বলিয়াছি—তাহাকেই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা বলা যাইতে পারে, কারণ শ্রীশ্রীদুর্গার অর্চনাই সেই স্থলে প্রধান, অন্য কোন দেবার্চনার তাহা অঙ্গ নহে। অধিকারিভেদে এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা স্মার্ত উপাসনা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—**সকামীর উপাসনা** এবং **মোক্ষকামীর উপাসনা**। বেদ ইত্যাদিতে পারদর্শিতা, যশ ও কীর্তি ইত্যাদি তত্তৎ কামনা পূরণের জন্য যেমন 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদি কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য কর্মানঙ্গভূত এই স্মার্ত প্রতীকোপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, যথা—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ॥

(আহ্নিকতত্ত্বে ১৬৩ পৃঃ ধৃত মৎস্যপুরাণ বাক্য)

'আরোগ্যকামী ব্যক্তি ভাস্করের, ধনকামী বহ্নির, জ্ঞানকামী শঙ্করের এবং মোক্ষকামী বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন।' একই পরম দেবতার নাম রূপ ও গুণভেদে এই বিভিন্নতা—ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্র বলেন—

"এক এব পরানন্দো নির্গুণঃ পরমাৎ পরঃ।
স তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরূপধরোঽব্যয়ঃ॥ (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।৬৮)

অর্থ স্পষ্ট। শ্রুতিও বলেন —"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—'একই সৎস্বরূপকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ [নামরূপযোগে] বহুপ্রকারে বর্ণনা করেন," ইত্যাদি। যাহা হউক পুত্রকামীর স্কন্দার্চনা, মহামারী-শান্তিকামীর রক্ষা-কালিকার্চনা ইত্যাদি দেবার্চনাসকল এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনারই অন্তর্গত, কারণ অন্য কোন প্রধান দেবার্চনার অঙ্গরূপে ইহারা অনুষ্ঠিত হয় না। বৈদিক কর্মানঙ্গভূত উপাসনাসকলের ন্যায় ইহারাও অদৃষ্টোৎপাদন দ্বারাই উপাসককে ফল প্রদান করে। তবে তজ্জাতীয় বৈদিক উপাসনা হইতে এই স্মার্ত উপাসনার প্রভেদ এই যে, স্বয়ং অসমর্থ হইলে যজমান ইহা ঋত্বিক্ দ্বারাও সম্পাদন করাইতে পারেন। বৈদিক এই জাতীয় উপাসনাসকল কিন্তু সাধকের নিজেরই অনুষ্ঠেয়।

[মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা স্মার্ত উপাসনা]

শালগ্রাম ও প্রতিমা ইত্যাদি প্রতীকাবলম্বনে আরব্ধ হইলেও সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-কামীর এই উপাসনা সাধকের মানসিক সামর্থ্যের ক্রমবিকাশবশতঃ কি প্রকারে ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে (—অহংগ্রহোপাসনাতে) পরিণত হইয়া তাঁহার মোক্ষের হেতু হয়, ইহাই আমরা এক্ষণে পূর্বমীমাংসার ২।৪।২ শাখান্তরাধিকরণ এবং উত্তরমীমাংসার ৩।৩।১ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণের *

* পূর্বমীমাংসার শাখান্তরাধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখা হইতে একই কর্মের বিভিন্ন অঙ্গকলাপের যে একত্র সমাবেশ হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর উত্তরমীমাংসার সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ উপাসনার অঙ্গকলাপ যে একত্র সংগৃহীত হইয়া উপাসনাতে প্রযুক্ত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসরণে একই উপাসনাতে অবিরুদ্ধ অঙ্গসকল বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

সিদ্ধান্ত-অবলম্বনে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"জপশ্চ পরমং নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
কোটিসূর্যসমং তেজো ধ্যায়েদাত্মনি নির্মলম্॥
শালগ্রামশিলারূপং প্রতিমারূপমেব বা।
যং যং পাপহরং বস্তু তত্তদ্বা চিন্তয়েদ্ হৃদি॥" (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৬৩-৬৪)

"জপকালে হৃদয়মধ্যে কোটিসূর্যসমপ্রভ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক নিত্য নির্মল পরম তেজকে ধ্যান করিবে। [তাহাতে অশক্ত হইলে] শালগ্রামশিলারূপ অথবা প্রতিমারূপ পাপনাশক বস্তুসকলকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে।" লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে পরমজ্যোতির ধ্যানে অসমর্থ সাধকের জন্য শালগ্রামাদি প্রতীক ব্যবস্থাপিত হইল। শুধু যে শালগ্রামাদিরূপ দুই একটি প্রতীক শাস্ত্রে এতাদৃশ সাধকের পক্ষে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে, বহুপ্রকার প্রতীকেরই ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে কয়েকটি এই—সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, নিজের দেহ (—হৃদয়াকাশ), সকল প্রাণী (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৪১), প্রতিমা, দ্বিজ, এবং চিত্র (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।৩৩), ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন প্রতীকে পূজার প্রণালীও বিভিন্ন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৪২-৪৪)। এই প্রতীক-সকলের মধ্যে প্রতিমা সম্বন্ধী বিশেষটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রতিমা আট প্রকার, যথা—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৭।১২)

"প্রস্তরনির্মিত, কাষ্ঠনির্মিত, সুবর্ণাদি ধাতুনির্মিত, মৃত্তিকা বা চন্দনাদি লেপনের দ্বারা প্রস্তুত, চিত্রপট, বালুকার দ্বারা নির্মিত, মনোময়ী এবং হীরক ও স্ফটিকাদি মণির দ্বারা নির্মিত, এই আট প্রকার প্রতিমা স্মৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।" এইস্থলে এই **মনোময়ী** প্রতিমার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া বহু কথাই পরে আমাদিগকে বলিতে হইবে। যাহা হউক জ্যোতির্ধ্যানে অসমর্থ সাধক যে জপকালে মাত্র প্রতীকটিরই ধ্যান করিবেন, তাহা নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের স্থূল-রূপ আরোপ করত ধ্যান করিতে হইবে, তৎযথা—

"মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥" (মহানিঃ তন্ত্র ৫।১৩৯)

'মনের ধারণার জন্য, শীঘ্র নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এবং সূক্ষ্মধ্যানে যোগ্যতাসম্পাদনের জন্য তোমাকে স্থূল ধ্যানের কথা বলিতেছি।'

"ন তদ্‌যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ।
ততঃ স্থূলং হরে রূপং চিন্তয়েদ্বিশ্বগোচরম্॥" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৫৫)

'হে রাজন্, যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি প্রথম প্রথম সেই অরূপাখ্য পরমরূপ যেহেতু চিন্তা করিতে পারে না, সেই-হেতু শ্রীহরির বিশ্বাত্মক স্থূলরূপ চিন্তন করিবে', ইত্যাদি। অনন্তর উক্ত শাস্ত্রেই শ্রীহরির বিশ্বাত্মক স্থূলরূপ কি কি তাহার বর্ণনা করিয়া প্রতীকে শ্রীহরির কিপ্রকার মূর্তির ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—

"যচ্চ মূর্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারা ধারণা নোপপদ্যতে॥

প্রসন্নবদনং চারুপদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্॥
কিরীটহারকেয়ূরকটকাদিবিভূষিতম্।
শার্ঙ্গশঙ্খগদাখড়্গচক্রাক্ষবলয়ান্বিতম্॥" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৭৯-৮৪) ইত্যাদি।

"হে নিরাধিপ, শ্রীহরির যে মূর্ত রূপ যে প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করুন, যেহেতু কোন আধার ব্যতিরেকে মনের ধারণা সম্ভব নহে। তাঁহার মুখ প্রসন্নতাযুক্ত, চক্ষু সুন্দর পদ্মপত্র সদৃশ, কপোলদেশ অতি সুন্দর এবং ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল। তিনি কিরীট, হার, কেয়ূর ও কটকাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, তাঁহার হস্ত শৃঙ্গনির্মিত ধনুক, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, চক্র এবং অক্ষমালাযুক্ত" ইত্যাদি। প্রতীকে তাঁহাকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া কি প্রকারে অর্চনা করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন—

"পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ।
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভি র্ধূপদীপোপহারকৈঃ॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৫৩) ইত্যাদি।

অর্থ স্পষ্ট। ইহাই হইল মোক্ষকামী সাধকের প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনা। প্রথম প্রথম সাধকের নিকট তাহার অবলম্বিত প্রতীকটিই প্রধানভাবে প্রতিভাত হয়, আরোপ্য দেবতা তখন তাহার নিকট হন অপ্রধান। ধ্যান সে বিশেষ করিতে পারে না, তবে চেষ্টা করিতে থাকে। বাহ্য জপই হয় তাহার সাধ্যায়ত্ত। সুতরাং সাধকের এই প্রকার অবস্থায় তাহার ধ্যেয় আরোপ্য রূপটি অপ্রধান থাকায়, তাহার এই উপাসনাকে **অধ্যাসোপাসনা** বলিতে হইবে। [স্মরণ রাখিতে হইবে—মানসচিন্তার অর্থাৎ ধ্যানের প্রাধান্য না থাকিলে যৎকিঞ্চিৎ জপসহ তাদৃশ দেবার্চনাকে উপাসনা বলা যাইবে না। কতকগুলি উপচার-নিবেদন-প্রধান যে দেবার্চনা, তাহা যজ্ঞাদির ন্যায় কর্মমাত্র]। যাহা হউক এতাদৃশ সাধক তখন—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

"ভগবদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ, তাঁহার নামগুণ কীর্তন, তাঁহার গুণ স্মরণ, পিতা, আচার্য ও গুরু প্রভৃতির পাদসেবন, প্রতিমার পূজন, বিগ্রহকে নমস্কার, স্বীয় ইষ্টের প্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানাত্মক দাস্যভাব, সখার ন্যায় ব্যবহারাত্মক সেবা এবং আত্মনিবেদন—এই নয় প্রকারে ভক্তির অনুশীলন করত সখ্য দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভাবালম্বনে প্রীতিসম্পাদনে যত্ন করিতে থাকে।"

[মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা স্মার্ত সম্পদুপাসনা]

এই প্রকারে বাহ্য রূপ ও বাহ্য পূজাদির অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মানসিক সামর্থ্য ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে থাকে। তখন তাহার বাহ্যমন্ত্রজপ মানস জপে এবং বাহ্যপূজা মানস পূজাতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে সেই মানস জপ এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—

"অষ্টাক্ষরমহাবাক্যমিত্যাদীনাঞ্চ যো জপঃ।
স্বাধ্যায়শ্চ সমাখ্যাতো যোগসাধনমুত্তমম্॥
* * *
জপস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাংশুমানসৈঃ।
জপেষ্বেতেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ পূর্বাৎ পূর্বাৎ পরোবরম্॥ (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।৯০,৯৩)

"অষ্টাক্ষর মহাবাক্য ইত্যাদি মন্ত্রসকলের * যে জপ তাহাই স্বাধ্যায় নামে কথিত হয়, তাহাই যোগের উত্তম সাধন। সেই জপ বাচিক উপাংশু ও মানসভেদে ত্রিবিধরূপে কথিত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র, এই সকলের মধ্যে পূর্ব পূর্বটি হইতে পরবর্তীটি শ্রেষ্ঠ।" স্পষ্টভাবে মন্ত্রটির উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে বলে 'বাচিক জপ'। নিজের শ্রবণযোগ্য, অথচ অপরে শ্রবণ করিতে পারে না—এই প্রকারে উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে বলে 'উপাংশু জপ'। যাহাতে ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদির এতটুকুও কম্পন হয় না, অথচ মনে মনে স্পষ্টভাবে জপ চলে, তাহাকে বলে 'মানস জপ'। এই মানস জপই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানস পূজা বিষয়ে শাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণনা আছে—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্তয়েৎ।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্।" ইত্যাদি (মুণ্ডমালাতন্ত্র)
"সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।
অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিগুণং ভবেৎ॥" (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)
"নিত্যান্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম মায়া ভবেৎ।" (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী)

অর্থ স্পষ্ট। যাহা হউক অতি আদর ও যত্নসহকারে বাহ্য পূজা ও জপাদি করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ অন্তর্মুখীন হইয়া যেন স্বীয় অন্তরেই প্রবিষ্ট হইতে থাকেন। তখন বাহ্য প্রতিমাদিরূপ প্রতীকে সাধক যে শঙ্খচক্রাদিধারী স্বীয় ইষ্টদেবতাকে আরোপ করত অর্চনা করিতেছিল, এক্ষণে নিজ হৃদয়পদ্মেই তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে থাকেন। তখন—

'যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ধৃত্বা দৃঢ়ং হৃদি।
আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ সর্বধাতারমচ্যুতম্॥
* * *
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
অষ্টারে হৃৎসরোজেঽন্তর্দ্বাদশাঙ্গুলবিশ্রুতম্॥" (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৩৪-৩৬)

"জিতেন্দ্রিয় যোগী ইন্দ্রিয়সকলকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া সকলের নিয়ামক অবিনাশী পরমাত্মাকে ধ্যান করিবেন। * * যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিদ্যমান যিনি দেব ও দানবগণ কর্তৃক নমস্কৃত তাঁহাকে স্বীয় হৃদয়মধ্যে অষ্টদলপদ্মে দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিতরূপে ধ্যান করিবেন।"

* অনেকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—'মন্ত্র কি?' তাহার প্রয়োগই বা কি প্রকারে করিতে হয়, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আলোচ্য না হইলেও এই প্রশ্নসকলের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া নিতান্ত অপ্রসাঙ্গিক হইবে না। "প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ (মীমাংসান্যায়প্রকাশ)—'প্রয়োগকালে অনুষ্ঠানের উপযোগী 'অর্থের' যাহা স্মারক, তাহাকে বলে মন্ত্র। এই 'অর্থ' শব্দটির অর্থ—সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। মন্ত্র হয়, সেই দেবতার বাচক। বস্তুতঃ যে দেবতার মন্ত্র, সেই দেবতাই হন সেই মন্ত্রের অর্থ। সুতরাং উপাসনার প্রয়োগকালে যে তদুপোযোগী স্বীয় ইষ্টদেবতার স্মারক শব্দ, তাহাই মন্ত্র। শাস্ত্র বলেন— "মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।" অর্থ স্পষ্ট। মন্ত্রজপ করিবার সময় সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ যে দেবতা, সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হয়, ইহাই মন্ত্রের প্রয়োগ। সেই দেবতার স্বরূপ কি, তাহা সেই দেবতার ধ্যানমন্ত্রে শাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে, যেমন "প্রসন্নবদনং চারুপদ্মপত্রোপমেক্ষণম্" ইত্যাদি বিষ্ণুর ধ্যান, উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেকটি বীজমন্ত্রের অর্থমধ্যেই একটি প্রার্থনাও সূচিত হয়। যেমন 'দুঁ' এইটি ৺দুর্গাদেবীর বীজ, ইহার অর্থ—"দ দুর্গাবাচকং দেবি, উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্বর্থো বিন্দুরূপকঃ॥" (বরদাতন্ত্র)—'দ' শব্দটি দুর্গার বাচক, উকারটির অর্থ-'রক্ষণ'। নাদটির অর্থ—বিশ্বমাতা, বিন্দুটির অর্থ—'কর'। তাহাতে উক্ত বীজটির অর্থ হইল—"হে বিশ্বমাতা দুর্গা, আমায় রক্ষা কর।" এইরূপে প্রত্যেক বীজমন্ত্রেরই তত্তৎ বাচ্য দেবতা ব্যতিরেকে এইপ্রকার একটি প্রার্থনাত্মক অর্থও আছে।

বলা বাহুল্য উদাহরণরূপে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান ও উপাসনা বর্ণিত হইলেও স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যানই এখানে বিবক্ষিত। শাস্ত্রও তাহাই বলেন, যথা—মহাপুরুষম্ অভ্যর্চেৎ মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৪৯)—"নিজের উপযোগী ও অভিপ্রেত মূর্তিতে মহান্ পুরুষ শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন।" এইরূপে সাধক স্বীয় দেহমন্দিরে মনোময়ী প্রতিমাতে (শ্রীভাঃ ১১।২৭।১৩) শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে আরম্ভ করেন। তখন "হৃদি ভাবেন চৈব হি" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২৭।১৫)—ভাবময় (—মনোময় মনঃকল্পিত) উপচার সকলের দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে তাঁহাকে অর্চনা করিতে থাকেন, বাহ্য উপচারের আড়ম্বর ক্রমশই তাঁহার কমিয়া আসিতে থাকে। তখন তিনি—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥" (মহানিঃ তন্ত্র ৫।১৪৩)

"হৃদয়স্থ অষ্টদল কমল তাঁহাকে আসনরূপে প্রদান করিবে, সহস্রার পদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃতদ্বারা তাঁহার চরণযুগলে পাদ্য এবং মনকে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিবে" ইত্যাদি প্রকারে সাধক মানস উপচার সহযোগে অন্তর্যজনে † প্রবৃত্ত হন।

তখনও কিন্তু সাধক প্রতীককে একবারে ত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু হৃৎপদ্মেই স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যান ও অর্চনাতে তাঁহার প্রীতি ক্রমশঃ অধিকতর হইতে থাকে। এইরূপে যে প্রতীকে তিনি ইষ্টদেবতাকে আরোপ করিয়া এতদিন অর্চনা করিতেছিলেন, সেই প্রতীকটি হইয়া পড়ে অপ্রধান এবং তাহাতে যাঁহাকে আরোপ করিতেছিলেন, সেই স্বীয় হৃৎকমলমধ্যগত ইষ্টদেবতা হইয়া পড়েন প্রধান। তাঁহাকেই ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অনায়ন করত যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে লইয়া সাধক নিজ অভ্যন্তরেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপে সাধক অধ্যাসোপাসনার স্তর অতিক্রম করিয়া সম্পদুপাসনার স্তরে প্রবেশ করিলেন—এক্ষণে তাঁহার নিকট অধিষ্ঠান প্রতীকটি অপ্রধান হইয়া আরোপ্য উপাস্যই প্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রতীকটিকে তখনও তিনি একেবারে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তখনও তাঁহার এই উপাসনা 'কর্মানঙ্গভূতা প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যারই অন্তর্গত থাকিতেছে, বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটীকার শেষাংশ—

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের দিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রত্যেক মন্ত্রেরই প্রয়োগকালে সেই মন্ত্রের ঋষি দেবতা ও ছন্দের স্মরণ করিতে হয়। সেই বিষয়ে শ্রুতি এই—"যদার্ষেয়ং তমৃষিং, যাং দেবতাম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতাম্ উপধাবেৎ। যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ, তচ্ছন্দঃ উপধাবেৎ" (ছাঃ ১।৩।৯—১০)—'সেই মন্ত্রের যিনি ঋষি, সেই ঋষিকে এবং যে দেবতার স্তব করা হইবে সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হইবে। যে ছন্দের দ্বারা স্তব করিবেন, সেই ছন্দকে চিন্তা করিতে হইবে।' "যো হবা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বা অধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি, গর্ত্তং বা প্রতিপদ্যতে, তস্মাৎ এতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ" (১।২।৮ দেবতাধিকরণ শারীরকভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য।) ইহার অর্থ "যিনি ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা যজনা করেন, অথবা অধ্যাপনা করেন, তিনি স্থাবর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, অথবা নরকে পতিত হন। সেই হেতু প্রত্যেক মন্ত্রেই এই সকলকে জানিতে হইবে অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হইবে। মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে, তাহা বর্ণনার স্থল ইহা নহে। আমরা এখানে উপাসনার দার্শনিক দিকটিরই আলোচনা করিতেছি।

† অন্তর্যজনের বিস্তৃত বিবরণ "মহানির্বাণে"র ৫ম উল্লাসে ১৪৩ শ্লোক হইতে এবং "কাল্যার্চন চন্দ্রিকা"তে ২৭০ এবং ২৮৩ ইত্যাদি পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।



আরতি

শান্তশীল দাস

আঁখিজলে মোর সকল বেদনা
বন্ধু হে, মুছে দিও।
দিয়েছ যা তুমি আমার জীবনে,
সে যে চির বরণীয়।

দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ বেদনা ;
তাই দিয়ে করি তব আরাধনা ;
হৃদয়-প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার
আরতি করি গো প্রিয়।

তোমার দানের মাঝারে বন্ধু,
নাহি কোন সংশয় ;
আঁধারের বুকে চলি হাসিমুখে
অন্তরে নিরভয়।

দেখি দিকে দিকে আলোকে-আঁধারে,
বন্দনা-গান ওঠে চারি ধারে ;
তারই সাথে মোর নীরব আরতি
ও-চরণে তুলে নিও।

সময় ও সুকৃতি

জ্যোতির্ময়ী দেবী

অনেকদিন আগের কথা। ১৩৩৬ সালে কাশীতে ছিলাম কিছুদিন। কেমন করে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সাধুর সঙ্গে একটু পরিচয় হয়ে গেল। তারপর তিনি একদিন আমার হাতে একখানি শ্রীশ্রীমায়ের কথা এনে দিলেন। নতুন বেরিয়েছে। দাম দিতে গেলাম ; হাসলেন, বল্লেন আমার জন্যই এনেছেন। নিলাম। পড়লামও।

আজ মনে হয়, সেদিন কি এমন করে পড়েছিলাম ?—পড়েছিলাম তো, কিন্তু এমন মন নিয়ে নয় ! যা' আজকে ক্ষুব্ধভাবে ভাবে, ১৩২৭ সাল অবধি মায়ের দেহ ছিল, আমরা কেন মানতে পারিনি? কেন দেখা হয়নি ? ১৩১০ সালে দক্ষিণেশ্বরে তো গিয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ কথামৃতও পড়েছিলাম উদ্বোধনে। বাড়ীতে 'কথামৃত' ছিল ; বড়রা পড়তেন। সাধু সন্তদের যাওয়াআসাও বাড়ীতে ছিল—অবশ্য জয়পুরের বাড়ীতে, কলকাতায় বড় থাকা হ'ত না। ক্ষেত্রীর পথে জয়পুরে স্বামী বিবেকানন্দও গেছেন, বাড়ী তাঁর চরণস্পর্শে পবিত্র হয়েছিল। কিষণগড়ে স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী অসীমানন্দজীর সঙ্গেও গুরুজনদের পিতা পিতৃব্যদের দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ কেন দর্শন করতে আসেননি উদ্বোধনে ? তাঁরা কি তাঁর কথা কারো কাছে শোনেননি? ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর তিনি ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন—তবু তাঁকে আমরা কেউ দর্শন করতে পারিনি !

জ্ঞানীরা বলেন সময় না হলে এবং সুকৃতি না থাকলে সাধুসঙ্গ হয় না। সেইটেই ঠিক মনে হয়। সময় আমাদের আসেনি। দর্শনের সুকৃতিও ছিল না। তাই আমাদের ক্ষোভ মেটাতে হয় যেন শুধু 'মায়ের কথা' পড়েই। এবং পড়েই সঙ্গলাভ করতে চায়।

সেদিনও তো যেদিন সেই সাধুটি বইখানা

দিয়েছিলেন এমন করে পড়িনি! আজ উদ্বোধন পড়ি মাসের পর মাস, কত লোকের কত স্মৃতিকথা বেরোয়, কত সাধুসঙ্গের বিবরণ বেরোয়—আমাদের জীবন ছিল, জ্ঞান হয়েছিল কিন্তু সে-সব দুর্লভ সঙ্গলাভ ঘটেনি। একেই বলে সময় ও সুকৃতি না আসা।

এরও আগে কিন্তু সর্বপ্রথম ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে আমরা শ্রীমতী সারদামণি দেবীর জীবনকথা পড়ি, এবং আশ্চর্য হয়ে দেখি, সে লেখার লেখক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আশ্চর্য হবার কারণ আমাদের ছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোক, তিনিই এমন সুন্দর সহজভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে (তিনি ভক্তদলীয় লোক নন) সকল লেখকের আগে সকল পত্রিকার আগে ঐ চমৎকার সরল ভাষায় ঐ মহীয়সী মহিলার সরল জীবনটি আমাদের সামনে ধরে দিলেন। তা' প্রবাসী তো সব বিষয়েই অগ্রণী ছিল, এতেও 'প্রবাসী'কেই 'অগ্রণী' দেখলাম। 'শ্রীমতী সারদামণি দেবী'ও যেন প্রবাসী দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হলেন নিজের ভক্তদের গণ্ডী ছাড়িয়ে সকল সমাজের সকল সম্প্রদায়ের লোকের কাছে।

এবং আজ যখন তারও আগের কথা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আগে কেমন করে সকলের কাছে পৌছয় সে আলোচনা দেখি 'সমসাময়িকের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস বই'য়ে, তাতেও দেখি—সেই সেদিনেও ব্রাহ্মসমাজই ঐ 'দক্ষিণেশ্বরের সাধু'কে আশ্চর্য হয়ে সকলের কাছে প্রচার করেছিলেন তাঁদের পত্রিকায়, তাঁদের উপাসনামন্দিরে মিলন সভায়,—বাড়ীতে ষ্টীমারে কত জায়গায়। ব্রহ্মবাদী একেশ্বরবাদী তাঁরা ঐ সরল বহুদেববাদী হিন্দুকে শ্রদ্ধা করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন। এবং তাঁর কথামৃত শুনে আশ্চর্য হয়ে কাগজে লিখেছিলেন।

কিন্তু পরমহংসদেবকে তো তাঁরা দেখেছিলেন জেনেছিলেন কথা শুনেছিলেন, যে কথার অপূর্ব রস আজো তাঁকে না দেখেও যেন সমান সরস আছে, মাকে তো কেউ দেখেননি কেউ জানেননি। এই সরল মহীয়সী মহিলাটিকেও রামানন্দ বাবুর রচনাতেই আমরা যেন প্রথম দেখতে পেলাম। এবং আশ্চর্য হয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ঐ পরম পুরুষের সহধর্মিণীত্ব উপলব্ধি করলাম।

তবু সে যেন বই পড়া বা মহৎ লোকের জীবন-চরিত পড়া। সেদিনেও কোন আকাঙ্ক্ষা জাগেনি তাঁর কথা আরো জানবার অথবা না জানার জন্য কোনো ক্ষোভও মনে জাগেনি। কতদিন পরে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়ে নানা উৎসব সভা মেলার মাঝে "শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয়খণ্ড" কিনলাম। সেদিন সহসা মনে পড়ল মা এতদিন ছিলেন আমাদের জ্ঞান হওয়ার পরেও! কেন দেখা হ'ল না? এমন যে মানুষটি এমন অসাধারণ পুরুষের স্ত্রী আমাদের দেশে আমাদের কালে একেবারে ঘরের পাশে ছিলেন, তাঁকে জানার দেখার সুযোগ হলনা, এযেন পরম দুঃখের ক্ষোভের বিষয় মনে হতে লাগল। মনে হ'ল—তবে কি সুকৃতিই মানুষকে পথ দেখায়?

হয়ত তাই সত্য। একটু অন্য কথা বলি। ১৩২৫ সালের কথা। সহসা ভাগ্য বিপর্যয় হয়ে শ্বশুরবাড়ীর পাট উঠিয়ে জয়পুরে পিত্রালয়ে ফিরে এলাম। মা বাবা অত্যন্ত শোকার্ত, কাতর। মাঝে মাঝে দু'একজন সাধু সন্ত আসাযাওয়া করতেন বাড়ীতে। বাবা তাঁদের বাড়ীতে আনলেন, যদি মনে শান্তি বা সান্ত্বনা আসে। যদি এই শোক বিমূঢ়তা থেকে মন অন্যদিকে একটু সরে আসে।

এক বৈষ্ণব সাধু বুধরামজী নামে অতি মহাত্মা লোক আসতেন বাড়ীতে। বাবাকে বল্লেন, 'আমি আপনার মেয়েকে কিছু মন্ত্র দেবো ওর মনে যাতে শান্তি ও সান্ত্বনা আসে।'

ওঁরা আমাকে বল্লেন।

বয়স কম। প্রথম আঘাত। প্রচণ্ড বিপর্যয়-হওয়া আকস্মিক-বিক্ষিপ্ত স্থানচ্যুত জীবন। যতবা ক্ষোভ অন্যের ওপর ততবা ক্ষোভ অভিমান ভগবানের ওপর। মনে হল যেন অকারণে অযথাভাবে একা আমারই উপর এই ভাগ্যের অত্যাচার হয়েছে। ভাগ্য, কর্ম, জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল কিংবা জীবন-মৃত্যুর সবটাই এই পৃথিবীর এই রকম সাধারণ নিয়ম—অত ভাববার বয়স ধৈর্য কিছুই ছিল না। মন নিজের দুঃখ আর নিজের বিচারবুদ্ধির অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।

মাকে বললাম, 'না মা, দীক্ষা বা মন্ত্র কিছুই আমাকে শান্তি বা সান্ত্বনা দিতে পারবে না। বিশ্বাস নেই আমার।'

আবার বুধরামজী বললেন, 'শুধু সামান্য জপ। বিশেষ কিছু করতে হবে না।'

আমি আবার বললাম, 'না। কি জানি যদি জপ না ভালো লাগে, নিয়ে মিথ্যাচারী হব না।'

শান্ত বৈষ্ণব সাধু নিরস্ত হলেন, আর কিছু বললেন না।

কি ভাবলেন, কে জানে।

আরো একজন সাধু মহানন্দগিরি কিছুদিন বাড়ীতে থাকলেন। কতরকম উপদেশকথা শোনালেন। তিনি কাশী ও হরিদ্বারে থাকতেন। তিনি বাঙালী তান্ত্রিক সাধু—কিন্তু তাঁর কথা সে সব উপদেশ শুনেছি কি? শুনিনি কিছুই। সেসময়ে কান ছিল না, মনের মন ছিল না শোনার। বরং সমালোচনা আলোচনা করেছি তখনকার বয়সবুদ্ধি অনুযায়ী।

ফিরে যাওয়ার দিন তিনি বললেন 'মা একসময়ে তুমি আমাকে মনে করবে।'

অহঙ্কারী মন জবাব দিল না। বিশ্বাসও করল না। অবিশ্বাসও করতে পারলুম না কিন্তু। কিন্তু সাধুবাক্য মিথ্যা হয় না। দীর্ঘকাল পরে হরিদ্বারে গিয়ে তাঁর মিশনে আশ্রয় নিলাম কয়েকদিনের জন্য, তখন মনে পড়ল সেই কথা। তাঁকে মনে করে কত লজ্জিত মনে হ'ল সেদিন, নিজেদের অহংবুদ্ধি মনে পড়ে।

কতদিন পরে কলকাতায় এলাম।

তখনো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' হাতে আসেনি। রামকৃষ্ণ মঠের কোনো সাধুকেও দেখিনি তখনো। 'শ্রীম'কে দর্শন করতে যাবার ভারী ইচ্ছা হ'ল। 'শ্রীম' ছিলেন আমার মাতামহীর ভগিনীপতি। মাতামহী বোনের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন এবং 'শ্রীম'র কথাও বলতেন।

মাতামহীকে বললাম 'তোমার সঙ্গে আমি একদিন যাব তাঁকে দর্শন করতে।' তখন কলকাতায় পর্দা বেশ। ট্রামে বাসে যাওয়ার প্রথা এত চলেনি। একখানি গাড়ী ভাড়া করে যাওয়া হ'ল একদিন দুপুরে। তাঁর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের স্কুলের বাড়ীতে। বাড়ীর কাজ সেরে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা হয়েছিল তাঁর বাড়ী পৌছতে।

গিয়ে শুনি, তিনি বিশ্রাম করছেন আহারের পর। দিদিমার বোনের নিকুঞ্জদিদিমাদের কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পুত্রবধূসহ তখনি নিমন্ত্রণে যাবেন।

আমরা বললাম, আমরা বসে থাকি, তিনি উঠলে প্রণাম করে দেখা করে বাড়ী ফিরব।

তাঁরা বললেন 'কোথায় বসে থাকবে, আজ বাড়ী যাও।'

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও অপ্রস্তুত হ'লাম। বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে শ্রীম একখানি 'কথামৃত'তে আমার নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বইখানি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু মনে যে কোথায় একটু আঘাত লেগেছিল অথবা ক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিভ হয়েছিলাম, আর তাঁর কাছে যেতে যেন ভরসা পাইনি। ভয় হ'ত যদি আমায় ফিরিয়ে দেন, যদি দেখা না হয়। গেলাম না আর।

দীর্ঘদিন পরে তাঁর দেহান্ত হওয়ার পর আর ক্ষোভের সীমা রইল না। নিকুঞ্জদিদিমার সঙ্গে

দেখা করতে গেলাম। বার বার মনে হ'তে লাগল কেন আর আমরা চেষ্টা করিনি, কেন একবার দর্শন করে যাইনি। রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য আত্মগোপনকারী মহাত্মা প্রচারক, আমাদের এমন কাছাকাছি সম্পর্কের লোক, তবু সুযোগ পেলাম না দর্শনের। সেই যে সঙ্কোচ হয়েছিল ফিরে এসে, সেইটা আজ মনে হয়—আমার সহ্য করে আগ্রহের পরীক্ষা ছিল। যদি যেতাম হয়ত কিছু অনির্বচনীয় পেতাম। কে বলবে, কেন এই দর্শন হল না। কেন বুধরামজীর দেওয়া নামটুকু, মন্ত্রটুকু নিইনি, কেন মহানন্দগিরি মহারাজের কথায় মন দিইনি।

আবার ভাবি হয়ত সেদিন কমবয়সের ধর্মে শ্রদ্ধাভরে নাম বা মন্ত্র জপ করতে পারতাম না। 'শ্রীম'র কাছে বিনীত নম্রতায় উপদেশকথা শোনার মন হয়ত সেদিন ছিল না। এবং তারই মধ্যে ভগবানের ইচ্ছায় হয়ত এই দেখা পাওয়া ঘটেনি।

তবু মনের ক্ষোভ যায় না। মনে হয় সুকৃতি ছিল না। সময় হয় নি। এক কথায় কর্ম করি নি দেখা পাওয়ার মত।

এই যে সাধুসঙ্গের সুযোগ না পাওয়া বা না নেওয়া আজ যত সাধুচরিত পড়ি তখনি মনে একটা ক্ষোভ আনে।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'ও পড়তে বসে ঐ এক ধরনের অভাব মনে জাগে। ঐ গত শতাব্দীর কোন্ না জানা গ্রামের পরিবারের মধ্যে লালিতা পালিতা গ্রামের মেয়েটি যাকে বলে শিক্ষা দীক্ষা কিছুই না জানা মহিলাটি কি আশ্চর্য সহজ সরল জ্ঞানে রামকৃষ্ণদেবের অত পণ্ডিত জ্ঞানী শিষ্যদের নিজের ভক্ত শিষ্য শিষ্যাদের সমস্ত সমস্যা-প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতেন কেমন করে। কি সহজে অনায়াসে দেশবিদেশের শিক্ষিত অন্য জাতি, অন্য ধর্মাবলম্বী—যে যখন কিছু সহায় নিতে এসেছে শরণাগত হয়েছে, ভিন্নভাষী ভিন্নজাতি সকলকে সমান স্নেহে সমাদরে দীক্ষা দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা পরম স্নেহের পাত্রী ছিলেন। অন্যান্য বিদেশিনীরাও পরম সমাদরে মায়ের কাছে গৃহীত হয়েছেন। কোথায় বা ভাষার ব্যবধান, কোথায় বা বিজাতীয়তা! মানুষকে এমন করে গ্রহণ করার, এমন উদার ভাবে নেওয়ার ক্ষমতা ঐ গ্রামের পরিবেশে লালিতা মহিলাটি কেমন করে পেয়েছিলেন? এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য কাহিনীর মত যেন! 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ সত্য কোন্ অনুভূতি-বলে তিনি পেয়েছিলেন কে জানে!

শিষ্যদের দীক্ষা দেবার ব্যাপারেও দেখি কি অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যে যেমন যার যা প্রয়োজন ঠিক জানতে পেরেছেন।

একজন বললেন, 'মা আপনার সব ছেলেই তো সমান। যে বিয়ে করবার জন্য মতামত চেয়েছে তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, আর যে সংসার ত্যাগ করতে চায় তাকে ত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার তো উচিত যেটি ভালো সেই উপদেশই দেওয়া, সেইপথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া… ।'

মা বললেন, 'যার ভোগবাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর যে সুকৃতি বলে বহু পুণ্যফলে এইসব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাঁকেই একমাত্র সার ভেবেছে তাকে সাহায্য করব না একটু! সংসারে কি দুঃখের শেষ আছে?'

মার উক্তি,—'দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। …..

দোষ কারো দেখো না। শেষে দূষিত চোখ হয়ে যায়।'

'মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে ভালবাসলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়, তার দুঃখকষ্ট থাকে না।'

'দেখ, সেবাপরাধ একটি আছে বটে। সেটি হচ্ছে সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে নিজের অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মত নাচাতে চায়।… .. সেবার ভাব আর থাকে না।

(কথাটি যেন সর্বত্রই প্রয়োগ করা যায়। শুধু মহাপুরুষ সেবায় নয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠান-ক্ষেত্রেই এই রকম দেখা যায় ; সেবক নাম নিয়ে প্রভুত্বের প্রতাপ।)

মা ছোট কথা, সাধারণ উপমা দিয়ে কতজনকে কত কথা বলেছেন, কে বা তার হিসাব রেখেছে, কে বা মনে রেখেছে। তবু দু চার জন যে সেগুলি মনে রেখেছিলেন তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ মহীয়সী মহিলাটির কত সহজ জ্ঞান ছিল সাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। তিনি যাঁর সহধর্মিণী ছিলেন তাঁরই মত সে কথা সহজ সরল অথচ গভীর।

পথভ্রষ্টা নারীও তাঁর অপার করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। অন্য শোকার্তা নারী এসে কেঁদে পড়েছেন, অশৌচ রয়েছে, পলকের জন্য লোকসংস্কার মনে এলো, মা পরমকরুণাভরে সংস্কার-বুদ্ধিকে সরিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

দেখিনি তাঁকে আমরা—কারো কাছে কথা শুনিনি তাঁর। শুধু মায়ের কথা পড়া হল। তবু যেন তাতেই ঝলকে ওঠে তাঁর সহজ অনুভূতি-ভরা কথা। মনে হয় সাধারণ লোকেরা কি বুঝবে তাঁকে? অসাধারণই অসাধারণকে বোঝেন না! বেলোয়ারী কাঁচ রঙের পর রং বদলাচ্ছে। যে যে ভাবে দেখছে, গ্রহণ করছে তার কাছে সেই রং ফুটে উঠছে মনে হয়। শ্রীশ্রীমায়ের কথা যেন ভাবসমুদ্র, যিনি যেমন মানুষ তিনি তেমনি দেখছেন।

মনে দুঃখ জাগে। মনে হয়, সেই সময়ে যদি দেখা হত আমরা কি ভাবে নিতাম, অথবা তিনিই বা কি ভাবে নিতেন? দেশ দেশান্তরের লোকেরা কি পেয়েছিলেন? আমরা কেন তিনি বেঁচে থেকেও কিছু পেলাম না? ঠাকুরকে দেখার ভাগ্য করিনি কেননা জন্মাইনি, কিন্তু মা তো ছিলেন!

আবার মনে হয়, যুগ যুগান্তর ধরে যে মহাপুরুষ, মহামানব, অবতার এলেন চলে গেলেন—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য মহাপ্রভু, যীশু, মহম্মদ। পৃথিবী ভরে দেশে দেশে যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রইল তাঁদের অমর কথা চিরকাল ধরে। যাঁদের জীবন-চরিত রচনা আজো শেষ হয়নি, কখনো হবে না। যাঁদের অমর বাণীর টীকা ভাষ্য আজো রচনা করে চলেছে মানুষের পর মানুষ—তাঁদেরও আমরা কেউ দেখিনি। তবু তো তাঁরাও অপরিচিত নন, অজানা নন, 'দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে বঞ্চনা'—তখনি সংশয় হয়—তাঁদের বাণী সমস্ত দুঃখ বেদনার উপর অমৃতপ্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

ক্ষোভ মুছে যায়। মনে হয়, তবু তো এই যুগেই এই রামকৃষ্ণ-শতাব্দীর কালেই জন্মেছি, এখনো আকাশে বাতাসে জলে স্থলে তাঁর কথামৃত মিশিয়ে আছে, চোখের দেখার চেয়ে কম কি করে বলি? মনের দেখার রূপে যেন আমাদের যুগের অণুপরমাণুতেও তো ভেসে বেড়াচ্ছে। এও রইল চিরকালের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের লীলার মত, দশ অবতারের কথার মত—পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ মহাভারতের মত টীকার পর টীকা—ভাষ্যের পর ভাষ্য—অনুবাদের পর অনুবাদ—হয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে মিশিয়ে যাবার জন্য। এ যুগের এই রামকৃষ্ণ কথামৃত, এই মহৎ চরিতামৃত, এই সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর লোকোত্তর জীবন-কথামৃত মানুষের অনায়াসবোধ্য। যেন গাছের ফলের, নদীর জলের মত, আলো বাতাসের মত এঁর এই কথামৃতের ধর্মও অনায়াস-প্রাপ্য, অনায়াস-সাধ্য।

এই দেখাও তো কম সুকৃতি নয়!

আগের যুগের রাম রাজপুত্র ছিলেন, পিতৃ-সত্য পালনের জন্য পরম দুঃখ স্বীকার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজকন্যার পুত্র, কম উৎপীড়িত অত্যাচারিত হন নি। করুণাময় শাক্যসিংহও রাজপুত্র ছিলেন, স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এঁরা সকলেই রাজবংশের, রাজপুত্র, সাধারণের কাছ থেকে এঁরা সুদূর, অনেক অন্য স্তরের। এ

যুগে মহাপ্রভু ও রামকৃষ্ণ আমাদের সাধারণ ঘরেরই অতি জানাশোনা আপনার জনের মত, চেনা জনের মত যেন আমাদের আঙিনার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। আচণ্ডাল নরনারী পরম বিস্ময়ে ও আশায় তাঁদের মনের মধ্যে বরণ করে নিল। বিপুল ঐশ্বর্য বিলাসময় রাজবংশের রাজপুত্রদের মহান্ ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধনা, শৌর্যবীর্যের বিরাট আদর্শের কাহিনী এবারে নয়। এবারে আর এক রকম ভাবের করুণাময় সাধনা—'জীব শিব' সেবার প্রেমের সাধনা। পুরানো কথাই নতুন করে শুনল মানুষ। সকল মানুষের জন্য এই কথামৃত। বিশ্বাসী, সংশয়ী জিজ্ঞাসু, অলস আমাদের সকলের শরণদাতা। নাম ও নামী একের সাধনা। মধ্যযুগের ভক্ত নানক কবীর দাদু মীরা বাঈয়ের মত গানের ভজনের প্রেমের সেবার সহজ সাধনা। এ যুগের মানুষের সহজসাধ্য।

কথামৃতের কথায় বলি, 'মা কারুর জন্য মাছের ঝোল রান্না করেন, কারুর জন্য মাছ ভাজা করেন, কারুর জন্য বা ঝাল রান্না করেন, অম্বল রাঁধেন। যার যা ভাল লাগে, পেটে সহ্য হয়।'

কবীরের ভজনে শুনি—

'সাধো সহজ সমাধ ভলী।
গুরু পরতাপ যো দিন জাগী, দিন দিন অধিক চলী।
যাঁহা যাঁহা ডোলো কো পরিক্রমা, যো কুছ করো সো সেবা।
যব সোও তব করো দণ্ডবৎ পুজো ঔরন দেবা।'

মুক্তিসাধনার আরেক দিক

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ

'ব্যক্তির মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬০) এইটিই দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ব্যক্তির মুক্তিবাসনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ এবং বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চাওয়াই স্বাভাবিক, যদি না ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার পথে চলেন এবং ঐশী শক্তির প্রতি অনাস্থাবান্ হন। উক্ত আলোচনায় সত্য-সাধক এবং মুক্তি-সাধকের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রসারের দিকটাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তও সেই দিক থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু এইটি মুক্তিসাধনার একটি সত্য, একমাত্র সত্য নয়; মুক্তিসাধনার আরেকটি দিকও সমভাবেই স্বাভাবিক এবং সত্য। মুক্তিসাধনায় যেমন একটা অনন্ত চিত্তপ্রসারের দিক আছে তেমনি একটি আত্ম-মুখীনতার দিকও আছে। এই দ্বিতীয় দিকটি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা কোরব।

বুদ্ধের মুক্তি-বাসনা বিশ্বমুক্তিকেই চেয়েছিল; উপনিষদের প্রার্থনা, গায়ত্রীর ছন্দোপাসনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে 'বহু'র ধীশক্তিকেই প্রার্থনা করেছিল—একথা ঠিক, কিন্তু মুক্তিসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা (সংকীর্ণ ব্যক্তি-মুক্তি বা উদার বিশ্বমুক্তিই হোক)—মানুষকে কোন্ পথে নিয়ে চলবে ?—এর দুটি সম্ভাব্য পথ। প্রথম পথ ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের, দ্বিতীয় পথ সন্ধানী এবং বিচারশীল মনের। দ্বিতীয় পথটির বিষয় 'ব্যক্তির মুক্তি' প্রবন্ধে আলোচনা করা হয় নি। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, বিশ্বাসের সবটুকুই অন্ধ। বিশ্বাস বিচারের ঊর্ধ্বে এমন একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে বিচারের প্রশ্নই উঠে না এবং বিচারের প্রয়োজনীয়তাও নেই। বিচার সত্যে পৌঁছবার একটি উপায় মাত্র; যেখানে সত্য নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়েই আছে সেখানে বিচারের কথা অবান্তর, নিষ্প্রয়োজন। যে কলকাতায়ই আছে তার তমলুক থেকে কলকাতায় যাবার জন্য

পথগুলো নিয়ে বিচার করবার এবং কলকাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না। 'ঈশ্বর আছেন' এই সত্য যাঁর কাছে নিশ্চিত তাঁর পথ অন্যদের চেয়ে ভিন্ন রকমের হবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। ঈশ্বরে নির্ভরতাই হবে তাঁর মুক্তি-সাধনার একমাত্র পথ। এই পথের কথাই গীতায় বলা হয়েছে :—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'।

এই 'তম্' এ-তে যাঁর বিশ্বাস তাঁর সাধনার পথ তো ওখানেই স্থির হয়ে গেল। সাধনার পথ তিনি যেখান থেকেই চলতে শুরু করে থাকুন না কেন—ব্যক্তি-মুক্তির সংকীর্ণ স্তর থেকেই হোক্ বা বিশ্ব-মুক্তির উদার স্তর থেকেই হোক্—তাঁর পথ তো নিশ্চিত হয়েই আছে, এপথে বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, কারণ সংশয় নেই, রয়েছে বিশ্বাস—'নেহাভিক্রম-নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'। এই নিশ্চিত পথ সাধককে কোথায় নিয়ে যাবে? এর উত্তর আমরা দিতে পারি শুধু শ্রুতি থেকে এবং সত্যদ্রষ্টার সত্যদর্শনের বাণী থেকে। সাধক যেখানে ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলছেন সেখানে ঈশ্বরই তো মুক্তিদাতা ·······'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে'। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মুক্তির সাধক ঈশ্বর-কৃপায় মায়ার অতীত হলেন, পূর্ণ সত্যকে লাভ করলেন। তাঁর সাধনার আরম্ভে ব্যক্তিই থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, তিনি সত্য ও জ্ঞানকে লাভ করলেন। কিন্তু এই চরম প্রাপ্তিতেই তো তাঁর সাধনার পরিণতি পূর্ণ হল—তিনি নিজেকে জানলেন, বিশ্বকে জানলেন, তৃপ্ত হলেন। এখানে তো আর নূতন করে বাসনার উদ্ভব নেই। নিজের জন্যই হোক বা বিশ্বের জন্যই হোক সেই বাসনা সাধনলব্ধ জ্ঞানে বিলীন হয়েছে, তাই মুক্তির সাধনাও শেষ হয়েছে। জ্ঞানের সেই পরাকাষ্ঠা থেকে তিনি দেখলেন তাঁর চাওয়ার কিছুই নেই, নিজের জন্যও না, বিশ্বের জন্যও না—তিনি দেখলেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

বলা বাহুল্য, এখানে যে বিশ্বাসের কথা রাম-কৃষ্ণদেব বলেছেন, তা কুসংস্কারের তথাকথিত বিশ্বাস নয়। কুসংস্কার বা সন্দিগ্ধ মনের গোঁজা-মিলের বিশ্বাসচঞ্চল, ঘটনায় টলমল, বিচারের আঘাতে তা একদিন নিজের ছদ্মরূপ প্রকাশ করবে। যে বিশ্বাসের কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে, সে বিশ্বাসে হয়তো জন্ম জন্মান্তরের বিচার, অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতির দান ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস বিচারমাত্রের উর্ধ্বে এবং বিচারের 'চোখ' তার আর দরকার হয় না—সে বিশ্বাস নিশ্চিত জ্ঞানে সত্যকে কোথাও জেনেছে, এই জানা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভাসামনের (Surface mind) কাছে পরিচিত হোক আর নাই হোক। 'আমি আছি'—এ কথায় বিশ্বাস করবার জন্য কি আর আমার বিচারের প্রয়োজন হয়? তেমনি 'ঈশ্বর আছেন', এই বিশ্বাসও অনেকের স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদেরই জন্য উক্ত সাধনা !!

ব্যক্তির মুক্তিবাসনা যে স্বভাবতই বিশ্বমুক্তির বাসনায় প্রসারিত হয় তাহা বলা হয়েছে এবং বিশ্বাসী মনের এই মুক্তি-সাধনা যে একদিন ঈশ্বরকৃপায় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যক্তিগত বা বিশ্বসম্বন্ধীয় সকল প্রকার বাসনা থেকেই মুক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক সে বিষয়ও বলা হয়েছে।

মুক্তিসাধনার দ্বিতীয় পথ ও সম্ভাবনাটি আরম্ভেই মনকে আত্মমুখী এবং অন্তর্মুখী করতে চাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় পথের সাধনা যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের নয় এবং বিচারপন্থী মনের তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গৌতম ছিলেন এই শ্রেণীর সাধক। গৌতম চেয়েছিলেন বিশ্বমুক্তি কিন্তু পথের সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে বসতে হ'ল ধ্যানে এবং আত্মবিশ্লেষণে। নিজ মুক্তি পথের মাধ্যমেই বিশ্বমুক্তির সাধক বিশ্বমুক্তি-পথের প্রথম সন্ধান খুঁজবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? প্রেরণার

আরম্ভে ব্যক্তিই থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, এই পথের সাধনা মনকে সংগৃহীত করে আনবে অন্তরের সত্য সন্ধানে, আত্ম-সন্ধানে, ইহা আমরা অনুমান করতে পারি। 'আত্মানং বিদ্ধি'ই একদিন এই সাধনার পথে হয়ে দাঁড়াবে প্রধান মন্ত্র।

আত্মজ্ঞানলাভে এবং তল্লব্ধ মুক্তিতে সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানীর অবস্থা কি প্রথম শ্রেণীর ঈশ্বরে বিশ্বাসী সাধকের চরম প্রাপ্তি থেকে ভিন্ন হবে? না, উভয়েই পূর্ণ জ্ঞান ও প্রাপ্তিতে বাসনা মুক্ত হবেন—স্বসম্পর্কীয় এবং বিশ্বসম্পর্কীয় বাসনামুক্ত। সাধনার পথেই নিজের জন্য বা বিশ্বের জন্য মুক্তিবাসনা। জ্ঞানলাভে উভয় প্রকার বাসনারই লয়, শুধু পরম সত্যদর্শন। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থেকে যায়, 'তবে বিশ্বের উপায়?'—বিশ্বস্রষ্টাই বিশ্বের উপায় করেছেন, প্রতি হৃদয়ে সেই একই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন—মহাজনদের জীবনের উদাহরণ বিশ্বের সম্মুখে রেখে, 'মহাজনেন যেন গতঃ সঃ পন্থা।'

পূর্ব প্রবন্ধের আলোচনায় যে বলেছিলাম ব্যক্তির মুক্তি-সাধনা আত্মপ্রতারণার পথে না চললে বিশ্বমুক্তির সাধনাতেই এক হয়ে যাবে, বর্তমান প্রবন্ধে সে সত্য অস্বীকৃত হয়নি। শুধু মনে রাখবার বিষয় এইটুকুই যে 'সাধনা' সম্পর্কেই কথাটি সত্য। সাধনলব্ধ জ্ঞান বা সাধনোত্তীর্ণ জ্ঞানী সম্পর্কে এইটুকুই বলা চলে যে, পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠায় তাঁর সর্ব বাসনাই লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁর 'চাওয়া' যত বড়ই হোক্ না কেন। এখানে জ্ঞানী পূর্ণভাবে সেই পরম ঐশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে একীভূত এবং বিশ্বলীলার স্রষ্টা। এখানেই উত্তর পাওয়া যাবে সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভেও কেন জগতের দুঃখ দূর হয়নি! পথ দু'টি দেখতে ভিন্ন হলেও চরম প্রাপ্তিতে এক—'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।' সাধক-জীবনে ব্যক্তি-সাধকের 'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি' কে উপলক্ষ করে যে সাধনসম্পর্কীয় বাসনা জেগেছিল তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় 'বিশ্বরূপের' বিশ্ববাসনায় বা বিশ্বলীলায়। 'খোদার ওপর খোদকারী' আর যেই করতে যান, জ্ঞানী করবেন না। জ্ঞানী হয়ে যান সত্যদর্শনে নির্বাক, মৌন দ্রষ্টা—যদি তাঁর ভাষা বা কর্ম দৃষ্ট হয়, সে কর্ম বা ভাষা সেই 'বিরাটে'র ভাষা বা কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানেই একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষির জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে পূর্ণজ্ঞানী অথচ কর্মরত যোগীর জীবনে।

প্রকৃত সত্য এই যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং সত্য সন্ধানী বিচারী উভয়েই পূর্ণজ্ঞানলাভে ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় বা বিশ্বসম্বন্ধীয় সব বাসনা থেকেই পূর্ণভাবে মুক্ত হন—'বিশ্বের ভাবনা করেন বিশ্বেশ্বর'—ব্যক্তির অজ্ঞান দশাতেই উদার বা অনুদার 'ছটফট'! প্রবন্ধ দুটিতে আলোচিত সত্যের এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তিবাসনার লয় হয় বিশ্ববাসনায় এবং তারও লয় হয় পরম ঐশ্বরীয় সত্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায়।

"একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে যেতে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে, একটা বাঁশ দিয়েও উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীসারদা-স্বরূপ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস, বিদ্যাবিনোদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মশতবার্ষিকীতে স্বতই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে—মা কে? তাঁর স্বরূপ কি আমরা বুঝেছি?

উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'মা, আপনাকে কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মতন পান সাজেন, সুপারি কাটেন, কখনও বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে তো কিছুই বুঝতে পারি না।' মা উত্তর দেন, 'চন্দ্র তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বুঝবার দরকার নাই।'

একদিন রাধারানীর মা (পাগলী মামী) শ্রীশ্রীমাকে বাপান্ত করে গালাগালি দেন; এই চন্দ্রমোহনই শ্রীশ্রীমার মুখে একথা শোনেন: 'কত মুনি-ঋষি আমাকে তপস্যা করেও পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হারালি।'

অপর একদিন চন্দ্রমোহন শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে হাত বুলাতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'আমার পায়ে হাত বুলোতে হবে না। আমার শরতের পায়ে হাত বুলালেই আমার পায়ে হাত বুলানো হবে।'

শ্রীশ্রীমার এই তিন প্রকার উক্তির তাৎপর্য যথাক্রমে এইরূপ হতে পারে:—(১) পারমার্থিক ক্ষুধা না জাগলে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা বৃথা। (২) তপস্যায় তাঁকে লাভ করা যায় না, মাত্র তাঁর কৃপাবলেই তা সম্ভব। (৩) শিবজ্ঞানে জীবসেবার ফলে, অর্থাৎ নরের মধ্যে নারায়ণের অনুভূতি জাগলে তাঁকে পাওয়া যায়।

ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীমাকে একদিন প্রশ্ন করেন, 'তুমি কেমন মা?' মা বলেন, 'আমি সত্যি মা! গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য জননী।'

শ্রীশ্রীমার স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় তাঁর এই উক্তিমধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সাধক কবির ভাষায় "নিখিল-মাতৃহৃদয়সাগর-মন্থনামৃত-মুরতি"। স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন—অনন্ত শক্তি, অপার করুণা, অসীম ক্ষমার জাগ্রৎ প্রতীক।

মাকে তাঁর জননী শ্যামাসুন্দরী জন্মকালেই চিনেছিলেন 'জগদ্ধাত্রী'-রূপে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁর সম্বন্ধ জন্ম জন্মান্তরীণ—'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।' পাত্রী সন্ধান-কালে ঠাকুরও যেমন শ্রীশ্রীমার সন্ধান বলে দেন, শ্রীশ্রীমাও পূর্বাহ্নে দেখিয়ে দেন, ঠাকুরই তাঁর পতি:

"এতলোক কারে চাহ করিবার বিয়া।
অমনি দেখান বালা তুলি দুই কর।
সন্নিকটে সমাসীন প্রভু গদাধর॥"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি)

ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও সারদা—সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে। ও ছাই-চাপা বিড়াল।' ঠাকুরের চোখে মা ছিলেন 'দয়াময়ী', 'আনন্দময়ী'—তাঁর ধ্যানগঠিতা মানসী প্রতিমা। 'ষোড়শী'-রূপে যাঁর পূজা করে তাই ঠাকুর জপমালাসহ তাঁর সব সাধনার ফল যাঁর চরণে অর্পণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের চোখে মা ছিলেন 'জ্যান্ত দুর্গা'—'কালীর অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা। উপরে শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি।' শ্রীশ্রীমাও ঠাকুরের গৃহী ভক্ত

আরম্ভে ব্যক্তিগ্যাপারে তা বুঝিয়েছেন। স্বামী পথের ...দের নিকট 'মহামায়ী'-রূপে তিনি ১০৮টি অপ্রিফুলে পূজা গ্রহণ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ (যাঁকে শ্রীশ্রীমা মাথার মণিরূপে জ্ঞান করতেন) মার মধ্যে 'মহাশক্তি'র প্রকাশ দেখে তাঁর কৃপার দ্বারে দ্বারী হয়েছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অভেদজ্ঞানে বলতেন, 'টাকার এ পিঠ আর ওপিঠ।' স্বামী অদ্ভুতানন্দকে ঠাকুর বলেছিলেন—'তুই যার ধ্যান করছিস্, সে নহবতে রুটি বেলছে, দেখ্ গে যা।' শ্রীশ্রীমার ডাকাত বাবা ও তার পত্নী তাঁকে বলেছিল—'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। আমরা তোমাকে 'কালী'রূপে দেখলুম। পাপী বলে আমাদের কাছে তুমি রূপ গোপন করছ।' বিষ্ণুপুর স্টেশনে এক পশ্চিমা কুলি শ্রীশ্রীমাকে চিনেছিল 'তু মেরী জান্‌কী' ব'লে। সাধু নাগমহাশয় তাঁর দয়ায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল।' ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর চোখে শ্রীশ্রীমা ছিলেন, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী।' শৈশবে মাতৃহারা এক বালক মার চরণস্পর্শে ভাব-সমাধি লাভ করে পর পর তাঁর মধ্যে 'ঠাকুর', 'মা-কালী' ও 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি' দর্শন করে। দক্ষিণেশ্বরে মার প্রথম আগমনকালে জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় এক চটিতে শ্রীশ্রীভবতারিণীর দর্শন পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'আমি [illegible] হই।' সর্বদেবীস্বরূপা সারদাদেবীর রূপের ধারণা কে করতে পারে?

দেবমানব শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় শ্রীশ্রীমাও দেবী-মানবী ছিলেন—একাধারে নারী ও নারায়ণী। উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলি তাঁর নারায়ণী-স্বরূপের পরিচায়ক। নারীজীবনে শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেবাপরা দুহিতা, স্নেহশীলা ভগিনী, পতিপ্রাণা সহধর্মিণী এবং সন্তানবৎসলা জননী। কন্যারূপে দরিদ্র জনক-জননীর সংসারে তাঁর অকুণ্ঠ সেবাব্যাপৃতির কথা, ভগিনীরূপে কনিষ্ঠ সহোদরগণের সকল আবদার সহ্য ক'রে নিবিড় স্নেহ ও সহিষ্ণুতায় তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবার কথা আর পত্নীরূপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ও আচরণের অপূর্ব কাহিনী অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্রীশ্রীমার অনুপম মাতৃত্ব সকল ভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে। নিঃসন্তানা শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ইচ্ছায় মায়িক অবলম্বন হিসাবে শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি-পালন ভার গ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃত্বের পূর্ণ পরিণাম প্রকাশ পায় ঠাকুরের লীলা সংবরণের পর। জাতি, ধর্ম, বর্ণ—সুপুত্র বা কুপুত্র—বিচার না করে দিনের পর দিন তাঁর সমীপে আগত অগণিত পুত্রকন্যাদের যে অ-মায়িক মাতৃত্বের রসাস্বাদে তিনি তৃপ্ত ও শান্ত করেছিলেন, ধর্মজগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই বললে চলে। তাঁর নিকট গৃহস্থ ও ত্যাগী ভক্তের সমান আদর ছিল—অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগী অপেক্ষা গৃহস্থ ভক্ত সমধিক স্নেহলাভ করেছে। সংসার জ্বালায় জ্বলে শান্তি-লাভের আশায় যারা তাঁর পাদমূলে ছুটে আসত, আসামাত্র বুঝত শ্রীশ্রীমা বৎসহারা গাভীর ন্যায় তাদের প্রতীক্ষা করছেন—পথশ্রান্ত কাহাকেও স্বহস্তে পাখাবীজনে রতা—ব্যস্তসমস্তভাবে ভক্ত অতিথিদের আহার্যের সুব্যবস্থার শেষে দীক্ষাদি দানে তাদের প্রাণের পিপাসা মিটাচ্ছেন। ভক্তগণ শুনতো শ্রীশ্রীমা নিত্যস্নানের পর জগদম্বার উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বলছেন—"মা জগদম্বে! জগতের কল্যাণ কর।" তাঁর আচরণ দেখে তারা সবিস্ময়ে বুঝত যে, তিনি মাত্র তাদের গর্ভধারিণীরও অধিক স্নেহপরায়ণা জননী নন, ভবপারেরও কাণ্ডারী বিশেষ!

...রের তিরোভাবের পর তাঁর অসমাপ্ত জীবোদ্ধার ব্রত মাকে পালন করতে হয়েছিল। গুরুরূপে তিনি দেশকাল পাত্র অনুযায়ী অর্থাৎ 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন', 'যখন যেমন তখন তেমন', 'যাকে যেমন তাকে তেমন' রূপে

ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মার দীক্ষাদানে অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল না। ঠাকুরের নিত্যপূজার পর প্রার্থীকে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে নিজের বাম অথবা সম্মুখভাগে বসিয়ে আচমনাদির পর মন্ত্র দান করতেন। দীক্ষার স্থান অস্থানও অনেক সময় বিচার করেন নাই। প্রার্থীর অন্তরের ব্যাকুলতা দেখলেই মা তাকে কৃতার্থ করতেন। করুণাময়ী কারও চোখের জল দেখতে পারতেন না। অন্তর্যামিনী প্রার্থীর জন্মসংস্কার বুঝে তদনুযায়ী মন্ত্র দিতেন। ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত কেহ কেহ তাঁহাকে উপগুরুরূপে লাভ করেছে। স্বপ্নযোগেও মার কাছে কাহারও মন্ত্রলাভ ঘটেছে। কাহাকেও মা ঠাকুরের নামের মন্ত্র গুরুমন্ত্ররূপে ইষ্টমন্ত্রের পূর্বে জপ করতে বলেছেন। কোনও ভক্ত মন্ত্রলাভের পর ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে না পারায় মন্ত্র ফেরত দিতে আসলে মা তাকে অভয় দিয়ে বলেন—"তোমাকে কিছু করতে হবে না—আমি আছি।" মা অনেক শিষ্যকে দীক্ষা-দান কালে, "আমি জন্মজন্মান্তরে যা কিছু পাপ করেছি, সব তোমায় অর্পণ করলুম"—এই সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করিয়ে তাদের পাপতাপ বরণ করেছেন। মা বলতেন,—"বাবা কি বলবো, এমন সব লোক আসে যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। আমায় এসে মা বলে ডাকে, ভুলে যাই। যে যার যোগ্য নয় তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতা কামড়ায়।" মন্ত্রদান সম্পর্কে বলেছেন—"মন্ত্রের ভিতর দিয়ে গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়—শিষ্যের পাপ গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিয়ে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি।" পূজার বিধান জানতে চাইলে বলেছেন—"যাঁর পূজা করবে, তাঁর মূর্তির সামনে বা তাঁর উদ্দেশ্যে উপকরণ রেখে প্রণাম করবে। ভাবেই পূজা সিদ্ধ হবে।" জপধ্যান-সম্পর্কে বলেছেন—"ধ্যানজপ তাঁকে লাভ করবার জন্য। স্নান করে ভগবানকে প্রত্যহ প্রণাম করবে—প্রত্যেক কাজে মনে মনে তাঁকে স্মরণ করবে। এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। যখন সময় পাবে একমনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। খুব ভোরে আর রাত্তিরে ঘুমাবার আগে যা পার তাই করো।" অপর এক ক্ষেত্রে বলেছেন—'জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না।" কোনও ভক্তকে মা বলেছেন—"ঠাকুরকে ডাকবে, যা কিছু খাবে তাঁকে নিবেদন করে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে।" মন সব সময় জপধ্যানে বসতে চায় না কেন জিজ্ঞাসা করলে মা বলেন—"কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ তো আছে, তেমনই মনের অবস্থা হয়। কখনো ভাল, কখনো মন্দ। এটা প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন অবস্থাই হোক না কেন, সকাল সন্ধ্যা বসতে ছাড়বে না। মন ভাল অবস্থায়ও সকল সময় বসতে চায় না, আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখনও কখনও বেশ বসে যায়। কোন্ মুহূর্তে যে হবে তা বলবার যো নাই।" ধ্যানের সময় গুরুমূর্তি ও ইষ্টমূর্তি দুইটাই আসলে কি করা কর্তব্য জানতে চাইলে মা বলেন—"প্রথম প্রথম এ রকম হলেও পরে দেখবে একটি মূর্তিই আসবে। যে মূর্তিটি আসে তাকেই ধরে থাকবে।" কোনও ভক্ত প্রশ্ন করলেন 'মা, মনের মধ্যে ভালো মন্দ চিন্তা ওঠে, তার কি হবে?" মা বললেন—'এর জন্য ভেবো না। কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়, যদি না কাজে করে। আর আর যুগে মনের সংকল্পেই পাপপুণ্য হতো। কলিযুগে সৎচিন্তা মনে হলে তার উত্তম ফল হবে।" সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা বেশী কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। সাধারণ ক্ষেত্রে তিনি সকালসন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০৮ বার মন্ত্রজপ ও স্মরণমননের উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—"খুব জপ করবে * * *

কোন ভয় নাই আমি আছি। রোজ এক অধ্যায় গীতা পড়বে—মনে মনে সংকল্প করে যে তাঁর প্রীতির জন্য পড়ছি। যেদিন সময় হবে না, অন্ততঃ দু'চার শ্লোক পড়ে নেবে। কোন একটা আসন ঠিক করে নেবে যাতে বেশীক্ষণ বসতে পারো—অন্ততঃ দু তিন ঘণ্টা। যখন দেখবে পা ঝিন্ ঝিন্ করছে, তখন পা বদলে নেবে।" কোনও ত্যাগী ভক্ত মাকে জানান—"মা খুব হাঁপানিতে ভুগছি, কিছু ভাল লাগছে না।" মা অমনি বললেন—"বাবা, ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস—তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।" প্রশ্ন হ'ল—"মা, আপনাদের পাদপদ্মে বিশ্বাস কি করে হয়?" মা জানলেন—"বিশ্বাস কি সোজা কথা, বাবা! বিশ্বাস শেষের কথা—বিশ্বাস হলেই তো হয়ে গেল।" গুরু ও ইষ্টে অভেদজ্ঞান যে এই বিশ্বাস অর্জনের উপায় শ্রীশ্রীমা তা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর অভিন্ন হলেও ব ভিন্ন বোধ হ'ত। ঠাকুর ছিলেন সন্ন্যাসভাবপ্রধান—মার জীবন ছিল গার্হস্থ্যভাবপ্রধান। ঠাকুর বেশীর ভাগ কাল আত্মীয়-স্বজন হ'তে দূরে দেবমন্দিরে কাটিয়ে গিয়েছেন—মা অধিকাংশ কাল পিত্রালয়ে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বাস করেছেন। মুদ্রাস্পর্শে ঠাকুরের হাত বেঁকে যেত, তিনি যন্ত্রণাবোধ করতেন—মা টাকাকে 'লক্ষ্মী' জ্ঞানে বাক্সে রাখতে বা বাক্স থেকে বার করতে মাথায় ঠেকাতেন। অথচ ঠাকুরের ন্যায় অর্থের উপর তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। ঠাকুর নিম্নভূমিতে মন রাখার জন্য 'জলখাব', 'তামাক খাব' রূপ একটা বাসনা রাখতেন—মা'র মনকে সংসারমুখী করবার অবলম্বন ছিল কন্যারূপা রাধারানী। স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব।" গৃহস্থ ভক্তকে মা বাপ-মার সেবাকেই সব চেয়ে বড় ধর্ম বলেছেন। সৎকাজে মুক্তহাত লোককে ভাল বললেও নামপ্রচার বা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন না। গৃহীমাত্রকে তিনি অপচয় হতে সতর্ক করতেন। বলতেন, "অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।" তাদের বার তিথি মেনে চলতে বলতেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে বা পূজার অঙ্গরূপে চণ্ডীপাঠ বিধিপূর্বক না হ'লে কুফল ঘটে বলেছেন। স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ ক'রে সূচীকর্মাদি শিল্পকার্যে মা স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করতেন—তবে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা বা তথাকথিত স্ত্রীস্বাধীনতা সমর্থন করতেন না। অবস্থাবৈগুণ্যে অবিবাহিতা কুমারী, স্বামীপরিত্যক্তা অথবা নিগৃহীতা নারী এবং বালবিধবাদের শ্রীশ্রীমা লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সদ্ভাবে ও স্বাধীনভাবে চিরকুমারী-জীবন-যাপনে সমর্থ দেখলে তিনি জোর করে তাকে সংসারী করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। চালচলনে বা আচরণে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জভাব শ্রীশ্রীমার বিরক্তিকর ছিল।

শ্রীশ্রীমা স্থূল মায়িক দেহ ত্যাগ করলেও আজও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় অ-মায়িক শরীরে বিদ্যমান। আজও তিনি ভক্তহৃদয়বাসিনী হয়ে নানা ভাবে ভক্ত সন্তানকে দর্শন ও শিক্ষাদানে কৃতার্থ করছেন। বিশ্বাস থাকলে ভক্ত মাত্রেই তাঁর নিত্য লীলার স্বরূপ বুঝে কৃতার্থ হবে।

সমালোচনা

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যা-বিনোদ। প্রকাশক—শ্রীমুকুন্দলাল দে, দি সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯।২, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। পৃষ্ঠা—২৪৪+২৬, মূল্য—৪৲।

গ্রন্থকার ঠাকুরের সাধনজীবন বৎসর-অনুযায়ী সাজাইয়া সংলাপ-প্রধান ভঙ্গীতে উহা সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িতে উপন্যাসের মতন চিত্তাকর্ষক লাগিবে, বিশেষতঃ নূতন পাঠক-পাঠিকার নিকট। একটি স্নিগ্ধ ভক্তিভাব বইখানির আগাগোড়া অনুস্যূত। শ্রীমৎ তোতাপুরীর বিদায়-কালে গুরুশিষ্যের কথোপকথনটি খুবই মিষ্ট লাগিল। (২৩৯ পৃঃ)

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের দু একটি ঘটনা গ্রন্থকার সরাসরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া একটু রদবদল করিয়া ঐগুলি লিখিয়াছেন। একটি নূতন কথাও দেখিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি মাতার নিকট শৈশবকালে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, কোনও দিন কাষায় কৌপীন ধারণ করিবেন না। (১৮ পৃঃ)। তাই গ্রন্থে বেদান্তসাধনের সময় ঠাকুর কাষায় কৌপীন ধারণ করেন নাই। উপনয়নের সময় কি করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটি আমাদের ভাল লাগে নাই: "মৃত্যুকাল পর্যন্ত যিনি (ঠাকুর) সপরিবারে খাঁটি গৃহীর জীবন যাপন করলেন।"

আরও কয়েকটি স্থান হয়তো অনেকে পছন্দ করিবেন না। যথা—(ক) "রামকুমারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল রানী রাসমণির অচেতন দেহ"—(৪৭ পৃঃ)।

(খ) দাস্যভাব সাধনকালে ঠাকুরের শ্রীযুত মথুরের সহিত মেছুয়া বাজারে গমন (১০০-১১৫ পৃঃ)।

(গ) শেয়ালে ঠাকুরের দুগাল চাটচে (১২১ পৃঃ)।

(ঘ) ঠাকুরের পাছা বাজিয়ে বিবাহ করিতে যাওয়া (১২৭ পৃঃ)।

(ঙ) আসর ভরতি লোকের সামনে ঠাকুরের ভাঁড়ামি (১৯১ পৃঃ)।

(চ) নির্বিকল্প সমাধির পরেই মুখে "একগাল ক্ষীরের পুলি" (২২৭ পৃঃ)।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম কে দিয়াছিলেন ইহা লইয়া লেখকের একটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম প্রাক্-দক্ষিণেশ্বর জীবনে যে রামকৃষ্ণ ছিল না, গদাধর চট্টোপাধ্যায় ছিল—এই বিষয়ে একটি অবিসংবাদিত প্রমাণ হইতেছে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটি পালাগানের পুঁথিতে শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় বলিয়া স্বাক্ষর। ঐ স্বাক্ষর 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে। এই জন্য বহুতর যুক্তির উপস্থাপনা সত্ত্বেও অতুলানন্দ বাবুর সিদ্ধান্তে সংশয় রহিয়াই যায়।

—শ্রীমায়াময় মিত্র

বেদান্তানুভূতিকারিকা— গ্রন্থকার: শ্রীকালীকুমার মিশ্র, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসার, বোরহাট, বর্ধমান, পৃষ্ঠা—৫০; দক্ষিণা—"তত্ত্বোপলব্ধি"।

সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ এই পুস্তকে লেখক অদ্বৈতবেদান্তমতানুযায়ী ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানে দর্শনাদি বিধি সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না। কেবল চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্মের উপযোগিতা। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম কেবল শ্রুতিগম্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নয়। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসক ও

বৌদ্ধ মত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডন-পূর্বক অদ্বৈতবেদান্তমত সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন। শেষে এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ইহা বলিয়া বিচারের দ্বারা দ্রষ্টৃদৃশ্য বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ কৃতার্থ হয়। পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও রচনা কৌশল বশত বেদান্তশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে উক্ত হওয়ায় গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ গ্রন্থের রচনা বা প্রচার এযুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রচয়িতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী

নরদেবতা বা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন নাট্য (পঞ্চাঙ্ক নাটক)—শ্রীনীলমণি সান্যাল-প্রণীত। ১২নং কুমোরপটী লেন, টিন বাজার, শ্রীরামপুর হইতে গ্রন্থকারকর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৯৬, মূল্য দেড় টাকা।

অবতার-পুরুষের পবিত্র চরিতকথা যে ভাবেই আলোচনা করা যাক্ তাহাতেই মঙ্গল সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সমস্ত জীবনী নাট্যাকারে প্রকাশে অত্যন্ত সংযম ও সাবধানতা প্রয়োজন, নচেৎ তাঁহাদের লোকোত্তর জীবন পাঠকসমাজে বিকৃতরূপ ধারণ করিতে পারে। আলোচ্য নাটকের রচয়িতা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। যে পুণ্যশ্লোক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে পিতৃত্বে স্বীকার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়, তিনি গ্রাম্যসমাজে কিরূপ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পরিচয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" পাঠে জানা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার মুখ দিয়া 'ব্যাটাচ্ছেলেরা', 'গৈলের গরু', 'গুয়োটা' প্রভৃতি অশিষ্ট বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ গ্রাম্য পণ্ডিতগণের চরিত্রচিত্রণও যথোচিত হয় নাই। বাচস্পতি ও তাঁহার সহধর্মিণীর কলহ ঠিক যেন ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনীর ঝগড়া। মনে হয় গ্রন্থকার নাটকে রসসৃষ্টির জন্য ও নাটকখানিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছেন। নাটকে গানগুলিরও ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র বেশ ভালই লাগিল।

বর্ষপঞ্জী, ১৩৬১ (অষ্টম বর্ষ) – সম্পাদক : শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—এস, আর, সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২৫এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য চার টাকা।

সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি ও চলতি ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচিতির জন্য বর্ষপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা আজকাল অনেকেই উপলব্ধি করেন। আলোচ্য বর্ষপঞ্জীখানিতে অনুসন্ধিৎসুগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার মতো বিষয়বস্তুর অভাব নাই। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সম্পাদনা-সহায়তায় 'বীমা বিবরণী', 'খেলাধূলা' ও 'শিল্পবাণিজ্য' বিষয়ক অধ্যায়গুলি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন হইয়াছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'সালতামামী' পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। 'ব্যক্তি পরিচয়' অধ্যায়টিকে আরও পুষ্ট করা উচিত, ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইল। ভারতেতর দেশসমূহের অতি-খ্যাতিমান্ ব্যক্তিগণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হইলে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত ; প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটারী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। ৩, গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৮৬ ; মূল্য দুই টাকা।

১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থখানির ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। এই গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে ভক্তরাজ মহারাজের (স্বামী সদাশিবানন্দ) সঙ্গে লেখকের যে সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, তাহাই সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

৺কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সূত্র ও গোড়াপত্তনের ইতিহাস লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই আছে।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি—শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্তী-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান :—এম. এল. দে এণ্ড কোং, ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা —১২; মূল্য—॥০ আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা শ্রীশ্রীমায়ের চরিত-কথাটি তাহাদের উপযোগীই হইয়াছে। বইখানিতে মাত্র ১৮টি পৃষ্ঠা আছে, এত ক্ষুদ্র না করিয়া পুণ্যজীবনের আরও কিছু ঘটনা ইহাতে সন্নিবেশ করা উচিত ছিল। পড়িতে পড়িতে এক স্থানে একটি অসঙ্গতি দৃষ্ট হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছেলেবেলার নাম ছিল 'গদাধর', মা বাবা আদর করিয়া ডাকিতেন 'গদাই' বলিয়া, 'গদা' নয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সানুবাদ)—সম্পাদক :—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ এবং ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩। ১৯২ পৃষ্ঠা ; মূল্য বার আনা।

এই ক্ষুদ্র পকেট চণ্ডীখানিতে মুখবন্ধে চণ্ডীতত্ত্ব ও চণ্ডীর বিষয়বস্তুর আলোচনা এবং তৎপরে চণ্ডীপূজাবিধি, অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব, কবচ, সপ্তশতীরহস্যত্রয় ও পুরশ্চরণের বিধি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল শ্লোকগুলি প্রথমে ও পরপৃষ্ঠায় সরল বঙ্গানুবাদ থাকায় সাধারণ পাঠকগণ বোধসৌকর্য লাভ করিবেন। শেষাংশে চণ্ডীপাঠের ফল, দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত সংযোজিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। মূল শ্লোকগুলির মত অন্য স্তব স্তোত্রগুলিরও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইলে গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইত।

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

সত্যসম্বেদন ও সত্যদর্শন—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব-প্রণীত ; সাধনসমর কার্যালয়, ২০১, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭ ; পৃষ্ঠা -২৬৬ মূল্য—২৷৷০ টাকা।

পুস্তকখানি কতকগুলি ধর্ম ও দর্শনমূলক প্রবন্ধের সংকলন। ভারতীয় সমাজ সংক্রান্ত কয়েকটি লেখাও আছে। প্রত্যেকটি রচনা শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠ বিচারধারা অনুসরণ করিয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লেখকের একটি স্বচ্ছ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী লেখাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বুদ্ধি-প্রসূত নহে, তত্ত্বানুভূতি এবং সরস ভক্তির দ্বারা অনুপ্রেরিত। ধর্মসাধনানুরাগী পাঠক প্রবন্ধগুলি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। 'জাতিপরিবর্তন' 'অবান্তর জাতিভেদ' এবং 'বিবাহ বিচার' এই তিনটি প্রবন্ধ হিন্দুসমাজের সময়োচিত সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রভূত আলোকসম্পাত করে।

টি. বি. সহজ বোধ্য ও সহজ সাধ্য—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৯১ ; মূল্য—৫৲ টাকা।

বাঙলাদেশে দ্রুত প্রসারশীল টি. বি বা যক্ষ্মা-রোগের মারাত্মক বিপদ সম্বন্ধে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যবিদ্ এবং সমাজ-সেবকগণ উত্তরোত্তরই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। এই ভীষণ কালব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার অন্যতম উপায় হইতেছে সময়োচিত সাবধানতা। আলোচ্য পুস্তকটি জনসাধারণের কাছে টি. বি রোগের একটি সহজ, সুস্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক পরিচিতি উপস্থাপিত করিয়া উপরোক্ত সাবধানতা অবলম্বনে প্রচুর সহায়তা করিবে। জ্ঞানই শক্তি। যক্ষ্মাসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে উহার প্রতীকারের অনেক শক্তি পাওয়া যায়। বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসক-গ্রন্থকার দশটি অধ্যায়যুক্ত এই বইখানির মাধ্যমে সত্যই টি, বিকে যেভাবে সহজবোধ্য ও

সহজসাধ্য করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দিত করি। সাধারণ পাঠক পাঠিকা ব্যতীত পল্লীঅঞ্চল বা মফঃস্বল শহরের চিকিৎসকগণও এই বহুতথ্যপূর্ণ বইটি পড়িয়া প্রভূত উপকৃত হইবেন। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ২০টি চিত্র আছে। গ্রন্থের উপযোগিতার তুলনায় মূল্য খুব বেশী নয়।

পঞ্চপ্রদীপ (কবিতার বই)—শ্রীরণজিত রায় চৌধুরী-প্রণীত ; চৈতন্যপুর, (বর্ধমান) পৃষ্ঠা—১৭৬ ; মূল্য ২৲ টাকা।

পল্লীবাসী যুবক-কবির ইতঃপূর্বে প্রকাশিত দুইটি কাব্যগ্রন্থ প্রখ্যাত অনেক সাহিত্য-রথীর সমাদর লাভ করিয়াছিল। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে আহৃত নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বর্তমান গ্রন্থের কবিতাগুলিও কবিতামোদীগণের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"কবিতাকে আবার জনবল্লভ করতে হ'লে—

১। ছন্দে লিখতে হবে ২। বিষয়বস্তু সকলের পরিচিত হওয়া চাই ৩। ভাষা প্রচলিত বঙ্গভাষা হওয়া চাই ৪। আয়তন অযথা দীর্ঘ না হয় ৫। কবিতায় যে কোন একটা হৃদয়াবেগ থাকা চাই ৬। গঠন অনবদ্য হওয়া চাই। ছন্দে মিলে ভাষায় আদৌ অঙ্গহানি না থাকে।

'পঞ্চপ্রদীপের কবিতাগুলিতে রচয়িতা কাব্য-রচনার এই মান রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

আবাসিক শিক্ষা—রহড়া (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। পিতৃমাতৃহীন, দরিদ্র বালকগণের জন্য এই আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫২-৫৩ সালের কার্য-বিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা এবং সুষ্ঠু পরিনির্বাহে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আশ্রমে ১৯৫৩ সালে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫৩। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিল্প, ব্যবহারিক—এই বিভাগ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতেই ক্রমবর্ধমান প্রসার ও উন্নতি উল্লেখযোগ্য। মাধ্যমিক বিভাগের ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার ১০০%। শিল্প বিভাগের জন্য ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রীত আশ্রমসংলগ্ন একটি দ্বিতল গৃহ সমেত ৩½ একর জমি যথোপযুক্ত পরিষ্করণ ও সংস্কারাদির পর গত ১০ই অক্টোবর (১৯৫৩) পশ্চিম বঙ্গের পুনর্বাসনমন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী রেণুকা রায়ের দ্বারা শিশুবিভাগের ছাত্রাবাসরূপে উদ্‌ঘাটন করা হয়। ইহাতে ৭৫টি ছাত্র থাকিতে পারিবে। ১৯৫২ সালে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৪৮০, ঐ সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৫৩ সালে দাঁড়ায় ১৭০৬তে। খেলাধূলা, ব্যায়াম, সঙ্গীত, অভিনয় ও উদ্যান-কার্যে ছাত্রগণ আলোচ্য বর্ষে প্রশংসার পরিচয় দিয়াছে।

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৫৩ সালের কার্য-বিবরণী পাঠে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে ২১২টি বালক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মিগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত বিদ্যাপীঠের আদর্শ অতি মহান্, ইহা উত্তরোত্তর সেই আদর্শের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে। যে-কোন পরিদর্শকের দৃষ্টি পড়ে ছেলেদের চারিত্রিক উৎকর্ষ, নৈতিক বিকাশ, সুন্দর স্বাস্থ্য, নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। ১৯৫৩ সালে ১৫ জন

স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন উত্তীর্ণ হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রদের প্রতিনিধিমণ্ডলী ও সেবাসমিতির কার্য সমস্ত বিভাগেই প্রশংসনীয়। সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক হস্তলিখিত 'বিবেক' ও 'কিশলয়' পত্রিকা দুইটি নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। 'পাটনা কিশোর দল' পরিচালিত সারা বিহার রচনা-প্রতিযোগিতায় একটি ছাত্র দ্বিতীয় স্থান এবং চারজন বালক 'ভারত-স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়া সোসাইটি, কলিকাতা' ও 'দেওঘর নবীন সঙ্ঘে'র চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ-পরিচালিত সমবায়-ভাণ্ডার হইতে জনৈক ছাত্রকে মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তিদান ইহার পরিচালন-কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। গ্রন্থাগারের ৬২৬৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৮০ খানি নূতন কেনা হয়। ২০টি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে আংশিক এবং পূর্ণ সাহায্য বাবদ ৫০৭০৲ টাকা আলোচ্য বর্ষে ব্যয় করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে বিহার রাজ্যপাল শ্রী আর, আর, দিবাকরের সভাপতিত্বে এবং ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রী কে, রমণের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিহার কলেজ সমূহের ইনস্‌পেক্টরদ্বয় শ্রী পি, এস্, বর্মা ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন ও ছেলেদের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন।

মাঙ্গালোর দক্ষিণ কানাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 'বয়েজ হোম্'এর তৃতীয় বর্ষের কার্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের বিনাব্যয়ে উপযুক্ত আহার-বাসস্থান, পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের বন্দোবস্তসহ সুশিক্ষার ব্যবস্থা-উদ্দেশ্যে মাত্র তিন বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার জনপ্রিয়তা বেশ বাড়িয়াছে। ১৯৬৩ সালের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ উচ্চ শিক্ষারত ৯জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন, গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ১ জন এবং কর্ণাটক পলিটেক্‌নিক্ বিদ্যালয়ের ১ জন—মোট ৩১ জন ছাত্র আশ্রমে ছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিকল্পে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও ললিতসহস্রনাম আবৃত্তি শেখান হয়। আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত সাপ্তাহিক ধর্মক্লাস এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি পালন করা হইয়াছিল। ছাত্রগণের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা গুণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এই ছাত্রাবাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিচালনায় সন্তুষ্ট হইয়া আলোচ্য বর্ষে ২৫৫৫৲ টাকা এবং মাঙ্গালোর পৌর সমিতি ২৫০৲ টাকা দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

(১) **পত্রাবলী** (প্রথম ভাগ)—স্বামী বিবেকানন্দ, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ;—৩০ খানি নূতন পত্র সংযোজিত হইয়াছে। মূল্য—৫৲ ; উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে—৪॥০ টাকা।

(২) **স্বামী তুরীয়ানন্দ**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজ) বিস্তারিত জীবন-কথা। পৃষ্ঠা—৩৪০ (ডবলক্রাউন ১৬ পেজি) ; মূল্য—৪৲

(৩) **প্রার্থনা ও সঙ্গীত**—স্বামী তেজসানন্দ সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) পৃষ্ঠা—৯১ ; মূল্য—১৲

ভগবদ্বিষয়ক সংস্কৃত ও বাঙলা স্তব-স্তুতি-ভজনাদি সম্বলিত সার্বজনীন প্রার্থনা ও সঙ্গীত পুস্তক। কয়েকটি কোরাস গানের স্বরলিপিও আছে। পুস্তকখানি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উপযোগী হইবে।

(৪) **বিবেকানন্দ-বাণী** (অসমীয়া সংস্করণ)—অনুবাদক—শ্রীমহাদেব শর্মা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, শিলং (আসাম), পৃষ্ঠা—৭০ ; মূল্য—৷৷০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী—সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিগত ২৩শে এপ্রিল হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শত-বার্ষিকী জয়ন্তী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি স্থানের উৎসববিবরণী দেওয়া হইল।

(১) রাজকোট :—২৩শে হইতে ২৫শে এপ্রিল তিন দিন ব্যাপী রাজকোটে উৎসব হয়। ২৩শে তারিখের সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী অবিনাশানন্দ, সৌরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী দয়াশঙ্কর ভাই ডাভে, শ্রীহরকান্তভাই শুক্ল, শ্রীদিনুভাই মানকড়। ২৫শে মহিলা সভায় সভানেত্রী হন শ্রীমতী বীরমতী ত্রিবেদী এবং শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী লইয়া আলোচনা করেন শ্রীমতী নন্দিনীবেন কুম্ভানী, অধ্যাপিকা সবিতাবেন সোলাঙ্কি।

(২) মোরভি :—২৭শে এপ্রিল শ্রীওয়াই জি মেরুর পরিচালনায় এবং স্বামী অবিনাশানন্দ, স্বামী ভুতেশানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীনাথালাল ডাবে, শ্রীএ এন্ থন্না প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তার সমাবেশে মোরভির উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

(৩) সুরেন্দ্রনগর :—২৮শে এপ্রিল সুরেন্দ্র-নগরের উৎসব-সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীএস্ এম্ ডুডানি, আই-এ-এস্। বক্তাদের মধ্যে শ্রীলালুভাই আচার্য, এম্ এল্ এ, শ্রীচুনীলাল যাজনিক ও ও শ্রীকীরচন্দ্ভাই কোঠারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(৪) ভাবনগর :—২৯শে এবং ৩০শে এপ্রিল দুই দিন ব্যাপী ভাবনগরের উৎসব জনসাধারণের প্রাণে সাড়া আনিয়া দেয়।

(৫) ভেরাভল :—২রা মে ভজন ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে উৎসব সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

(৬) জুনাগড় :—৩রা মে শ্রীহরিপ্রসাদ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে বক্তৃতা দেন শ্রীপ্রভুলাল কে ডাভে এবং শ্রীপ্রেমচাঁদ সি মাণ্ডব্য।

(৭) পোরবন্দর :—৪ঠা মে অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার শ্রীশিবসিংজী মেরুভা ঝালা।

(৮) জামনগর :—৫ই ও ৬ই মে দুই দিন জামনগরে উৎসব হয়। প্রথম দিনের সভায় সৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ জামসাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। দ্বিতীয় দিন বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে, বক্তৃতা দেন বিচারপতি শ্রীবালকৃষ্ণভাই ত্রিবেদী।

(৯) দ্বারকা :—৮ই মে দ্বারকায় মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান্ শ্রীশঙ্করলাল গান্ধীর পৌরো-হিত্যে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১০) ভুজ :—১০ই মে ভুজে উৎসব-উপলক্ষ্যে একটি মহিলা সভা হয়, সভানেত্রী হন শ্রীতারাবেন্ এস্ ঘাটগে। ১১ই মে কচ্ছের শাসনকর্তা শ্রীএস্ এ ঘাটগের পরিচালনায় সাধারণ সভার অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

(১১) মাণ্ডবী :—১২ই মে মাণ্ডবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

(১২) মুন্দ্রা :—১৩ই মে মুন্দ্রার উৎসবসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরসভার অধ্যক্ষ।

(১৩) অন্জার :—১৪ই মে অন্জারে শ্রীশ্রীমায়ের পূজাদি ও শেঠ শ্রীমানসীভাই রাজার নেতৃত্বে একটি সভা হয়। অনুষ্ঠানান্তে পরিচালকবৃন্দ কাণ্ড্লাতে উৎসব-সভার আয়োজন করেন।

(১৪) গান্ধীধাম :—১৫ই মে গান্ধীধামে সাড়ম্বরে উৎসবের পর শতবার্ষিকী জয়ন্তীর নির্ধারিত কার্য-সূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে।



ইন্দ্রিয়সংযম

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥
বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥
ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥

মনুসংহিতা, ২।৯৩, ৯৭, ৯৯-১০০

ইন্দ্রিয়সমূহ যদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে তবে তাহার ফলে যে মানুষের নানা দোষ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে তাহা হইলে চরিত্রে যে দৃঢ়তা আসে তাহা দ্বারা সে পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বেদাধ্যয়নই বল, দান বা যজ্ঞই বল, অথবা ব্রত আর তপস্যাই বল কিছুই কিছু নয় যদি ইন্দ্রিয়লালসা প্রবল থাকে। নির্বাধ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা যাহার স্বভাবকে দুষ্ট করিয়া দিয়াছে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত।

ইন্দ্রিয়সংযমে যেন কোন আপস না থাকে। জলপূর্ণ চর্মপাত্রের কোন কোণে সামান্য একটি ছিদ্র থাকিলেও যেমন সেই ফুটা দিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া যায় সেইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তো কথাই নাই, একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ও যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তো সেই বিকারই মানুষের প্রজ্ঞা (সৎজ্ঞান) নষ্ট করিতে যথেষ্ট।

ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। উপবাসাদি যোগ দ্বারা শরীরক্ষয় না করিয়া বরং ইন্দ্রিয়গ্রামকে যদি সংযত করিতে পার তাহা হইলে মনও শান্ত হইবে এবং সকল পুরুষার্থ সহজে সিদ্ধ করিতে পারিবে।

কথাপ্রসঙ্গে

অরণ্যে

অরণ্যে পথ হারাইয়াছি।

অসংখ্য বৃক্ষ-লতা-গুল্মাকীর্ণ ভয়াবহ অন্ধকারাবৃত হিংস্রজন্তুসমাকুল লোকপ্রসিদ্ধ অরণ্যে নয়, দুর্বোধ্য পদ এবং অসম্বদ্ধ বাক্যের দিগ্‌বলয়হীন জটিল শব্দারণ্যে। যে শব্দকে নানা দেশের নানা শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানের মহিমা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কত হিতকর তত্ত্ববিদ্যা, দর্শন, কত মনোহারী সাহিত্য, কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই শব্দই যখন অর্থ-উদ্দেশ্য-সঙ্গতি-মাধুর্যহারা হইয়া শুধু অসার আড়ম্বরের সৃষ্টি করে তখন উহা আর মানুষের ক্ষেমাস্পদ নয়, বরণীয় নয়—উহা তখন বিভীষিকা, শত অনর্থের সম্ভাবনার নিলয় 'অরণ্য'। লৌকিক অরণ্যে পথভ্রান্ত হইলে দেহের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, শব্দারণ্যে যখন দিগ্‌ভ্রম হয় তখন মনকে, বুদ্ধিকে, হারাইতে বসি।

শব্দ দিয়া যে অরণ্য রচনা করা যায়, সেই অরণ্যে পথ হারাইয়া মানুষের ঘোরতর অনিষ্ট যে ঘটিতে পারে একথা প্রাচীনকালের মানব-মিত্রগণ জানিতেন। তাঁহাদের সতর্কতার বাণী অনেক পুরাতন পুঁথিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

"অনেক শব্দ লইয়া মাথা ঘামাইওনা, উহাতে লাভ তো শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি।" (রাজা জনকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উক্তি, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪।৪।২১) *

"নারদ।—কত তো পড়িলাম, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ গণিত দৈববিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র নিরুক্ত শিক্ষা-কল্প-ছন্দ ভূততন্ত্র গারুড়তন্ত্র ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পবিজ্ঞান, কিন্তু কই, শান্তি তো হইল না। সত্যের সন্ধান তো পাইলাম না। শুধু কতকগুলি শব্দের বোঝা বহিয়া মরিতেছি।

সনৎকুমার।—হাঁ ঠিকই, যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতত্, —যাহা কিছু এত অধ্যয়ন করিয়াছ সবই কতকগুলি বুলি মাত্র।"

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৭।১।২,৩)

মুণ্ডক-উপনিষদের কথা মনে পড়ে—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, না মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; "বহু শাস্ত্রপাঠের দ্বারা, নানা গ্রন্থের নানা ব্যাখ্যানশক্তি দ্বারা, অনেক শ্রবণের দ্বারা আত্ম-সত্যকে লাভ করা যায় না।" আবার আর এক স্থানে মুণ্ডক-উপনিষদের ঋষি ধমকাইয়া উঠিতেছেন, "মেলা কথা বলা ছাড়"—অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। আচার্যশঙ্কর খুলিয়াই বলিলেন,—

> শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
> অতঃ প্রযত্নাজ্‌জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাত্তত্ত্বমাত্মনঃ॥

(বিবেকচূড়ামণি, ৬০)

"বহু শব্দের আড়ম্বরযুক্ত শাস্ত্র মহারণ্যবিশেষ, উহা শুধু চিত্তকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া ঘুরাইয়া মারিবে। অতএব যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আত্মতত্ত্বের বিষয় জানিয়া লওয়া উচিত।"

তখন যাঁহারা শাস্ত্র লিখিতেন তাঁহাদের আন্তরিকতা ছিল, গভীরতা ছিল; যেটুকু লিখিতেন বুঝিয়া লিখিতেন, যে বিষয়ে নিজেদের পরিষ্কার ধারণা না থাকিত সে বিষয়ে বিদ্যা জাহির করিবার মূর্খতার কথা ভাবিতে পারিতেন না। কিন্তু তথাপি সেই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেও বুধজনদের কত সাবধান-বাণী! জলের প্রবাহ কোথায় কি আবর্ত সৃষ্টি করিতেছে কে জানে, হুশিয়ার হইয়া সাঁতার কাটা ভাল। শব্দের সম্ভার চলিয়াছে, কখন উহা অরণ্যের আকার ধারণ করে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা নিরাপদ।

কিন্তু একালে? একালে তত্ত্বের খোঁজ বড় বেশী কেহ করে না—শব্দের সাজ দেখিয়াই সকলে খুশী। যে যত দুরধিগম্য শব্দ দিয়া যত বেশী অর্থহীন বাক্য

* নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ

লিখিতে বা বলিতে পারিবে তাহার তত বিদগ্ধতা। সত্য একালে বিদূরে—সমীপে, চারিপাশে শব্দেরই মেলা। শব্দারণ্যে আমরা পথ হারাইয়াছি।

সেকালে বড় দুঃখে ঋষি অষ্টাবক্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"নানা মহর্ষি, সাধু ও যোগীদের নানা মত শুনিয়া এবং কোনও মতের সহিত কোনও মতের মিল নাই দেখিয়া কাহার না মনে সাধুসন্তের ব্যাখান ও উপদেশের উপর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়? কাহার না চুপচাপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়?"[২] সেকালে—সেই ব্যাস-বশিষ্ঠ-কপিল-কণাদ-মনু-পরাশরের কালেও শব্দের দুর্গতির জন্য এত দুঃখ, এত লজ্জা, এত শঙ্কা! আর একালে? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই বলুন:—

"এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে নিতে হবে। এই কথা শুনে অবাক। বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে! এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিস সে ব্যক্তি কখনও অনুভব করে নাই।

একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোঁড়া আছে!' এ কথায় বুঝতে হবে ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১।৮।৪,১।১০।৭)

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাত এবং রে গা ধা নি কোমল এই চার—মোট এগারটি স্বর দিয়া সুদক্ষ গায়ক অসংখ্য রূপ ও আকৃতিতে সুরজাল বিস্তার করেন, সঙ্গীতবিজ্ঞানে উহা গৌরব। কাব্যে নাটকে লোকসাহিত্যে শব্দের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগনৈপুণ্য বাঞ্ছনীয়, সমাদরণীয়। কিন্তু ধর্মালোচনায়, তত্ত্বোপদেশে শব্দ সম্বন্ধে সতর্কতা প্রয়োজন। এখানে বেশী কথা কওয়া, লম্বা ভারি কথা কওয়া গৌরব নয়, বিপদ—গহন অরণ্যের বিভীষিকা। সাময়িক ধর্মসাহিত্যে এই বিভীষিকা উত্তরোত্তর যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। উপদেষ্টা কি যে বলিতে চান, শ্রোতাকে কোথায় যে লইয়া যাইতে চান তাহা অনেক সময়েই যেন বুঝিয়া উঠা যায় না। যেন মনে হয়,—অরণ্যে পথ হারাইয়াছি—শব্দারণ্যে।

২ নানামতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ॥
(অষ্টাবক্রসংহিতা, ৯।৫)

দুটি একটি নমুনা—

"দেহ শুদ্ধ না হইলে দেহকে মুক্ত করা যায় না। জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মলাভ ঘটে না। অর্থাৎ মাতৃঋণ শোধ হয় না, মায়াপাশ ছিন্ন হয় না এবং পঞ্চতত্ত্বের স্বাভাবিক আকর্ষণ অটুট থাকে। এই জন্য সোঽহং ভাব জাগে না।"

*　　*　　*

"সৃষ্টি স্ত্রীলিঙ্গ, ইহা পৃথ্বীস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের এক দেশ সৃষ্টি। সৃষ্টির বাহিরেও ব্রহ্মাণ্ড আছে। রজঃ সৃষ্টিরূপী স্ত্রীলিঙ্গ। সত্ত্ব—বালরূপ নপুংস লিঙ্গ। তমঃ—পুংলিঙ্গ। অষ্টধাতুতে সৃষ্টি হয়—তাই আট দিক্ ও আট দিক্‌পাল। আকাশে প্রথমে নক্ষত্র, তাহার উর্ধ্বে চন্দ্র, তাহার উর্ধ্বে সূর্য। নক্ষত্র সব মুক্ত আত্মা, জ্যোতিরূপ ইহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ। নক্ষত্র খসিয়া পড়ে, মানে আত্মা পৃথিবীতে পতিত হয়। পড়িবার সময় সূক্ষ্ম বায়ু-স্তর পর্যন্ত জ্যোতিরেখা যায়, পরে স্থূল পার্থিব বায়ুমণ্ডলে আসিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যায়।"

*　　*　　*

"রাত্রে অধিকাংশ মনুষ্য ঘুমাইয়া পড়ে—তাহাদের তেজঃ নক্ষত্রমণ্ডলে যায় ও নক্ষত্রের সহিত কথাবার্তা বলে। ইহাই স্বপ্নাবস্থা। তাই রাত্রে নক্ষত্র এত উজ্জ্বল দেখায়—তেজে তেজ মিলিত হয়। রাত্রি ১২টার পরে প্রায় কেহ জাগিয়া থাকে না, তাই তখন নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল দেখায়। মানুষ জাগিয়া আপন আপন জ্যোতি বা প্রাণ আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন নক্ষত্র ম্লান হইয়া পড়ে। এক আত্মারই মুক্ত বিন্দু উর্ধ্বে তারারূপে ও বদ্ধ বিন্দু অধোদিকে নানা প্রকার বদ্ধজীব রূপে বিভিন্ন যোনিতে খেলা করে।"

আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে যত সরল পথে অগ্রসর হওয়া যায় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষরা যুগে যুগে মানুষকে সহজ সরল পথেরই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। আজ যদি মানুষের বুদ্ধি নানা স্বয়ংসিদ্ধ 'দ্রষ্টার' আবিষ্কৃত বহু জটিল

শব্দ এবং তাক্-লাগানো কল্পনায় দিশাহারা হইতে থাকে তাহা হইলে 'হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত হইতে আমাকে বাঁচাও' যীশুখ্রীষ্টের এই প্রসিদ্ধ প্রার্থনার অনুকরণে আমরাও যেন প্রার্থনা করি—'হে সত্যস্বরূপ ভগবান, শব্দের উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।'

কাঠগড়ায় ব্রাহ্মণ

আচার্য যদুনাথ সরকার কিছুকাল পূর্বে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় 'হিন্দু একতা কি স্বপ্ন?' (Hindu Unity—a dream?) নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের বহুবিধ বিচ্ছিন্নতার মূলে উচ্চতর বর্ণের গর্ব ও অত্যাচার কতটা দায়ী তাহা ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিবার সময় লেখক এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"বস্তুতঃ, আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যাঁহারা জাতিভেদ-প্রথাকে ভগবানের অপরিবর্তনীয় বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছেন—তাঁহারাই হইতেছেন হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু।"

কথাগুলি বড়ই রূঢ়। কত গভীর দুঃখে অশীতিবর্ষপ্রায় মনীষী ঐতিহাসিকের কলম দিয়া এই কঠিন কথাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুধর্মের বিকাশ ও সংরক্ষণে ব্রাহ্মণের অবদান কি তাহা বহুশ্রুত প্রবীণ অধ্যাপক ভাল করিয়াই জানেন, কিন্তু প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্যের সেই গৌরবের দিক্‌টি একরূপ অনুক্তই রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাহাতে প্রগতিশীল আধুনিক পাঠক-পাঠিকাগণকে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি আংশিক এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবার সুযোগ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার ফল শুভ নয়। স্বামী বিবেকানন্দও ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কঠিন কথা বলিয়াছিলেন—কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের মহিমা বার বার তিনি উচ্চকণ্ঠে খ্যাপন করিতে ভুলেন নাই।

"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বই যে মানুষের আদর্শ তাহা শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে অতি চমৎকারভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল ব্রাহ্মণ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার করিবার জন্য। ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠজন, ব্রহ্মবিৎ, পূর্ণ আদর্শপুরুষ এই ব্রাহ্মণকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। তাঁহাকে কিছুতেই হারানো যায় না। জাতিপ্রথার সমস্ত গলদ সত্ত্বেও আজ আমরা জানি যে ব্রাহ্মণদিগকে এই গৌরব আমাদিগকে দিতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অন্যান্য জাতির তুলনায় তাঁহাদেরই মধ্য হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন বহুতর লোকের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা তো সত্য কথা। আমরা নির্ভীকভাবে এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের দোষগুলি নির্দেশ করিব কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্য যে কৃতিত্ব তাহাও নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার সময় বিচারকগণ স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে হিন্দুধর্মের কল্যাণ হইবে। তামিলনাদে দ্রাবিড় সংস্কৃতির এখন বিজয়ভেরী বাজিতেছে। ব্রাহ্মণ সেখানে ক্রমশই কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছেন। ভারতীয় জাতির একতানতা এবং বলিষ্ঠতার দিক দিয়া ইহা শুভ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসে বিনয়ের মুখ দিয়া ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ, যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত—সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়—সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে, প্রত্যেক কর্মকে সর্বদাই একটি মুক্তির সুর জোগাবার জন্যেই ব্রাহ্মণকে চাই—রাঁধবার জন্য এবং ঘণ্টা নাড়বার জন্যে নয়—সমাজের সার্থকতাকে সমাজের চোখের সামনে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে রাখবার জন্যে ব্রাহ্মণকে চাই। এই ব্রাহ্মণের আদর্শকে আমরা যত বড়ো করে অনুভব করব, ব্রাহ্মণের সম্মানকে তত বড়ো করে তুলতে হবে। সে সম্মান রাজার সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি। এ দেশে ব্রাহ্মণ যখন সেই সম্মানের যথার্থ অধিকারী হবে, তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত করতে পারবে না।"

ব্রাহ্মণত্বের আদর্শটিকে অব্যাহত ও সক্রিয় রাখিয়া উহার কদর্থ এবং অপব্যবহারকে কি করিয়া দূর করা যায় ইহারই দিকে এখন মনোযোগ দেওয়া

বিধেয়। প্রাচীন সংকীর্ণতা গোঁড়ামি প্রভৃতি দূর করিয়া নূতন সমাজ অবশ্যই গড়িতে হইবে—কিন্তু সেই গঠনের জন্য কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের উপর যেন প্রাণদণ্ডাদেশবিধান না করিয়া বসি!

প্রণিধানের বিষয়

গত ১০ই অক্টোবর নয়াদিল্লীর হিন্দু মহাসভা-ভবনে 'ইউনাইটেড্ চার্চ অব নর্দার্ন্ ইণ্ডিয়া'র ধর্মযাজক রেভারেণ্ড স্যামুয়েল সপরিবারে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবার সময় যে উক্তি করিয়াছেন (দৈনিক বসুমতী, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৪) তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।'

"রেভাঃ স্যামুয়েল হিন্দুধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার পিতামহ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মিশনারী স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করিয়া ধর্মযাজকের ব্রত গ্রহণ করেন। তিনিও মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করিয়া ধর্মযাজক হন এবং বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। এই সময়ে তিনি বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে হিন্দুধর্মের খারাপ দিকগুলি দেখান হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার মনে বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি বলেন যে, এই সময়ে তাঁহাকে বিভিন্ন হিন্দু প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া আর্যসমাজের বিরোধীদের সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহাদের যুক্তিতর্কের জবাব দিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া 'সত্যার্থ প্রকাশ' ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য পড়িতে হয়। ফলে তিনি হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল দিকগুলির সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু হরিজনদের খ্রীষ্টান করিয়া তিনি তাঁহাদের আদৌ কোন মঙ্গল করিতেছেন না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে লোকের মন হইতে জাতীয় মনোভাব দূর হইয়া যায়। রেভঃ স্যামুয়েল বলেন, দীর্ঘ দিনের মিশনারী জীবন যাপনের পর আমি ঘোষণা করিতেছি, বিদেশী মিশনারীরা দেশের জাতীয়তা-বিরোধী শক্তি।"

এদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের পশ্চাতে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হইয়াছে যেমন সেই কলঙ্কের ভাগী, বৈদেশিকরাজশক্তি-পরিপুষ্ট খ্রীষ্টান মিশনারীরাও তদ্রূপ তাহার অংশীদার। এই ইতিহাসকে চাপা দিয়া কোন লাভ নাই। হিন্দুসমাজকে নিজেদের বিগত ভুল ভ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে এখন পূর্ণভাবে সচেতন হইতে হইবে। কিছুদিন পূর্বে লোকসভায় ডক্টর কাটজু হিসাব দিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরীকরণের পরিমাণ নাকি পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হয় তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। দেখিতে পাই, ভারতীয় খ্রীষ্টানসমাজের কেহ কেহ মাঝে মাঝে অনেক যুক্তিতর্ক বিন্যাস করিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যদি বাড়ে তো হিন্দুদের চিৎকার করিবার কি আছে। খ্রীষ্টান থাকিয়াও তো ভারতীয় থাকা যায় যথা অমুক বিখ্যাত অধ্যাপক, অমুক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইত্যাদি। তাঁহারা ইংরেজ রাজত্বের সময় এত খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করিতে ভরসা পাইতেন না। এখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে পাইতেছেন। যাহা হউক রেভারেণ্ড স্যামুয়েলের উপরোক্ত উক্তিই তাঁহাদের প্রকৃষ্ট জবাব। ভারতবর্ষে পাশাপাশি বহু ধর্মের লোক বাস করিয়া আসিয়াছে, ইহা কিছু নূতন কথা নয়, হিন্দুধর্মের গভীর উদারতার জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ খ্রীষ্টধর্মে আনয়ন করেন তাহাদের মনে যে হিন্দুর দেবদেবী মন্দির উপাসনা শাস্ত্র সমাজের উপর একটি ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ উপ্ত হয় এবং তাহা দ্বারা ভারতের জাতীয় সংহতি শিথিল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের ধর্মান্তরীকরণ চেষ্টা সর্বপ্রযত্নে বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

"যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

১৯০৪ সালের কথা। পূজনীয় জিতেন মহারাজ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী) ও আমি মাঝে মাঝে বালিতে খেয়াপার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হতাম। পঞ্চবটীতে অথবা ঠাকুরের ঘরে আমাদের রাত্রিযাপন হত। রামলাল দাদা মা কালীর লুচিপায়েস প্রসাদ যা পেতেন তা থেকে কিছু কিছু আমাদের দিতেন। তাতেই কোনও রকমে আমাদের হয়ে যেত। পরদিন থাকত সাধারণতঃ রবিবার। দুপুরে মা কালীর প্রসাদ পেয়ে বিকালে আমরা বাড়ী ফিরে যেতাম। রামলালদাদা একদিন বল্লেন, তিনি কামারপুকুরে যাবেন। ঠাকুরের জন্মস্থান আমরা কখনও দেখিনি, দেখবার খুবই ইচ্ছা ছিল। আমরা বল্লাম, "তবে আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।" যাওয়ার দিন স্থির হল। যাত্রার পূর্বদিন রাত্রে আমরা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের ঘরে রাত কাটালাম। কিন্তু অনিবার্য কি এক কারণে সেবারে রামলালদাদার কামারপুকুর রওনা হওয়া সম্ভব হল না। পরদিন সকালে রামলালদাদা কি একটা জিনিস পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে বরানগরে মহেন্দ্র কবিরাজের নিকট পাঠালেন। মহেন্দ্রবাবুর পূর্বে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত ছিল। বাড়ীতে পৌঁছলে মহেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁর ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন, ঠাকুরঘরে প্রবেশ ক'রে সেখানে ঠাকুরের পার্শ্বে মাকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ইনি কে?" ইতিপূর্বে মায়ের ছবি আমি কোথাও দেখিনি বা তাঁর কথাও কোথাও শুনিনি। মহেন্দ্রবাবু বল্লেন, "ইনি আমাদের মা।" প্রশ্ন করলাম, "ইনি কি জীবিতা আছেন? থাকলে কোথায় এখন আছেন?" মহেন্দ্রবাবু বল্লেন, "জয়রামবাটীতে আছেন।" রাত্রে ঠাকুরের ঘরে স্বপ্নে মাকেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু 'মা' বলে তখন জানতাম না। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির সঙ্গে মায়ের ছবিখানি অবিকল মিলে যাওয়ায় আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে পারলাম।

এর পর থেকেই মাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হতে লাগল। কিছুকাল পরে আমরা উভয়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর যাব মনস্থ করে দিন স্থির করলাম। ট্রেনে বর্ধমান, সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে উচালন এবং সেখানে রাত্রিযাপন ক'রে পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় কামারপুকুর পৌঁছলাম। কামারপুকুরে তখন লক্ষ্মীদিদি থাকতেন। তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আমরা পূর্ব থেকেই চিনতাম। আমাদের পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন, পরিতোষ ক'রে দুপুরে শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ খাওয়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের জানাশুনা বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। তাই সন্ধ্যেবেলা তিনি সংকোচ না ক'রে ঠাকুরের ঘরে বৃন্দে সেজে পায়ে ঘুঙুর পরে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক অংশ অভিনয় ক'রে দেখালেন। আমাদের খুব আনন্দ হল।

লক্ষ্মীদিদির নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন সকালে ন'টা নাগাদ আমরা জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলাম। মা তখন প্রসন্নমামার পুরান ঘরের দাওয়ায় রান্না করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমরা আলাদা আলাদা এক এক জন ক'রে দর্শন করতে তাঁর কাছে গেলাম। আমি যেতে মা আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের ন্যায় আলাপ করতে লাগলেন এবং অনেককাল পরে নিজের ছেলেকে কাছে পেলে যেমন আনন্দ হয়, মা ঠিক সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কী যে স্নেহমাখা স্বরে তিনি আলাপ করলেন তার

আর তুলনা মেলে না। আমরা মায়ের জন্য একটি কাপড় এবং বর্ধমান থেকে কিছু মিহিদানা নিয়ে গিয়েছিলাম। মা খুব আনন্দের সঙ্গে সেসব গ্রহণ করলেন। পথের অনিয়মে এই সময় আমার পেটের অসুখ হল। অসুখ শুনে মা পরদিন সকালে কি টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করলেন এবং খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধেও বাচবিচার করলেন। আমি শীঘ্রই সেরে গেলাম।

পূজনীয় জিতেন মহারাজ মার কাছে দীক্ষা নেবেন এরূপ সংকল্প নিয়েই জয়রামবাটী গিয়েছিলেন। আমার কিন্তু মাকে দর্শন করার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল না। মা একদিন আমাকে বল্লেন, "তোমার দীক্ষা হয়েছে?" বল্লাম "না।" জিজ্ঞাসা করলেন, "দীক্ষা নেবে?" বল্লাম "ও কথা জানি না, ভাবিওনি।" মা বল্লেন, "তবে নাও।" পরদিন সকালে পূজার ঘরে পূজার পর মা আমায় মন্ত্র দিলেন। আনন্দে শরীরটি যেন অন্যরকম হয়ে গেল। পূজনীয় জিতেন মহারাজকেও মা ঐদিনই দীক্ষা দিয়েছিলেন। দীক্ষান্তে আর কয়েকদিন জয়রামবাটীতে বাস করে, এবং তারকেশ্বরে তারকনাথকে দর্শন ক'রে আমরা সেবার দেশে ফিরলাম।

কিছুদিন পরে গৃহত্যাগের জন্য বড় অস্থির হয়ে পড়লাম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পঞ্চবটী থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের ঘরটিতে বসেছি। এই সময় কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরের কাছে একজন তান্ত্রিক থাকতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসতেন, লোকে তাঁকে বাক্‌সিদ্ধ বলে মনে করত। ঠাকুরের ঘরের সামনে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় সেদিন তিনি বসেছিলেন। রামলালদাদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলেটি ঘরবাড়ী ছেড়ে সাধু হবে মনে করছে; ভাল হবে কিনা বলুন তো?" তিনি বল্লেন, "না, ওর সাধু হওয়া ভাল নয়।" আমাকে লক্ষ্য করে রামলালদাদা বল্লেন—"ওহে কী বলছে, শুনছ?" আমি শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। চিন্তিত হয়ে একদিন কালীঘাটে গেলাম—মায়ের আদেশের জন্য বসে রইলাম। অনেক রাতে মনে কিরূপে একদৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে—বাড়ী ছেড়ে সাধু হবার সময় হয়েছে। মনে আর কোনও সংশয় রইল না। অতঃপর একদিন আমরা তিনজনে (আমি, পূজনীয় জিতেন মহারাজ ও স্বামী গিরিজানন্দ) পঞ্চবটীতে মিলিত হয়ে জয়রামবাটী যাওয়ার দিন স্থির করলাম।

জয়রামবাটী পৌঁছে মাকে সাধু হবার অভিপ্রায় নিবেদন করলাম। তাই শুনে মা আমাদিগকে বাড়ীর বিষয় সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—বাড়ীতে কে কে আছে, সাধু হলে কোনও অসুবিধা হবে কিনা ইত্যাদি। আমাদের উত্তর শুনে সেদিন তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। বল্লেন, "কাল সব বলব।" 'মা কি বলেন'—এই আশা আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে আমরা রাতটা কাটালাম। রাত্রি প্রভাতে আমাদের সে চিন্তা দূর হল। নাপিত ডাকিয়ে, মা আমাদের মস্তক মুণ্ডন করতে বল্লেন এবং কাপড় চাদর গেরুয়ায় রং করার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপনান্তে তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রে স্বহস্তে আমাদের তিনজনকে গেরুয়া কাপড় দিলেন, আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন "ঠাকুর তোমাদের সন্ন্যাস রক্ষা করুন।" আর বল্লেন "সাধুদের কার কি সন্ন্যাস নাম আছে আমার সব জানা নাই। তোমরা ৺কাশী গিয়ে তারকের (স্বামী শিবানন্দ মহারাজ) নিকট হ'তে নাম নিও, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।" (এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থের পৃঃ ৪২৯-৩০ দ্রষ্টব্য)

১৯০৯ সালে মাকে দেখবার জন্য কাশী থেকে আমি উদ্বোধনে এলাম। 'উদ্বোধনের' বাড়ী তখন নূতন তৈরী হয়েছে। মাত্র দিন পনের হল মা ঐ

বাড়ীতে এসেছেন। এসে শুনলাম মায়ের বসন্ত হয়েছিল এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাই আমায় বল্লেন—"দূর থেকে মাকে প্রণাম ক'রে এসো।" সেরূপভাবেই আমি প্রণাম করলাম। কিন্তু মা যখন বল্লেন 'আমার পায়ের কাপড়টা একটু তুলে দাও তো', তখন আর পূজনীয় শরৎ মহারাজের কথা রাখতে পারলুম না। প্রসঙ্গক্রমে মা বল্লেন—"তোমাদের সেবার (কাশী) যাবার পর আমি ভাবতাম ছেলেরা কোথায় গেল, খেতেটেতে পাচ্ছে কিনা। সেজন্যে ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলতাম ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো আর চারটি চারটি খেতে দিও।"

কিছুদিন পরে মা সেরে উঠলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করালেন। মায়ের শরীর দুর্বল বলে আমরা ঠাকুরঘরের মেজে মুছে দিতে চাইতাম। 'না, না, আমিই পারব' বলে মা কিন্তু করতে দিতেন না। তাই ফল ছাড়ান, পুষ্পপাত্র সাজান ইত্যাদি অবশিষ্ট কাজ আমরা কিছু কিছু করে দিতাম। ঠাকুরের সেবার কাজ যতটা সাধ্যে কুলায় ততটা মা নিজেই করতেন; অপরের সাহায্য পারতপক্ষে নিতেন না। ভক্তদের প্রণাম করান, তাদের প্রসাদ বিতরণ করান এসব কাজের ভার তখন ছিল আমার উপর। সাধারণতঃ শনিমঙ্গল বারের বিকালে ভক্তরা মাকে প্রণাম করতে যেতেন। সমস্ত শরীর চাদরে মুড়ি দিয়ে শুধু পা'দুটি বের ক'রে ঠাকুরের দিকে মুখ ক'রে মা তক্তাপোশখানির উপর বসতেন। গরম হলে কেউ এসময় তাঁকে হাওয়া করত। কোনও ভক্তের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তিনি সবার শেষে প্রণাম করতেন। প্রশ্নকর্তা মেয়ে হলে অথবা বালক ভক্ত হলে মা ঘোমটা তুলে তাদের সঙ্গে কথা কইতেন অন্যদের বেলা ঘোমটা দিয়েই অনুচ্চস্বরে উত্তর দিতেন। প্রয়োজনমত একটু জোর গলায় মায়ের উত্তরটি উচ্চারণ ক'রে আমরা জিজ্ঞাসুকে শুনিয়ে দিতাম। প্রণামের পর ভক্তরা নীচে গিয়ে বসতেন—আমরা তাঁদের প্রসাদ দিতাম, দর্শনার্থীর তুলনায় একদিন প্রসাদ ছিল কম। আমি বল্লাম, "প্রসাদ তো! একটু একটু ক'রে দিলে এতেই কুলিয়ে যাবে।" মা বল্লেন, "না না, আগে পেটে খেলে তবে তো শ্রদ্ধাভক্তি হবে। তুমি বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আন। আমি প্রসাদ ক'রে দিচ্ছি।" তাঁর কথায় মিষ্টি আনা হল। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়ে প্রসাদ ক'রে দিলে সে মিষ্টি যথারীতি ভক্তদের বিতরণ করা হল।

* * *

একদিন খুব দূর (সম্ভবতঃ শিলং) থেকে এক ভক্ত এসেছেন মাকে দর্শন করবার জন্য। মা তখন সবেমাত্র তেল মেখেছেন। গঙ্গায় নাইতে যাবেন। দূর থেকে এসেছেন ভেবে পূজনীয় শরৎ মহারাজ বল্লেন—"নিয়ে যাও; দূর থেকে প্রণাম করিয়ে আনবে। তেল মেখেছেন কাজেই পাদস্পর্শ না করে যেন।" ভক্তটি কিন্তু প্রণাম করতে গিয়ে দুহাতে মায়ের পা'দুটি জড়িয়ে ধরল। বলতে লাগল—"মা, আমার কী হবে; আমায় কৃপা করুন" ইত্যাদি। "হ্যাঁ হবে" "হ্যাঁ হবে" মা বার বার এরূপ প্রবোধ দিতে থাকলেও ভক্তটি সহজে পা ছাড়লেন না। আমি বল্লাম—"মা তেল মেখেছেন; স্নানে যাবেন দেরি হয়ে যাচ্ছে" ইত্যাদি। কিন্তু কার কথা কে শুনে! অনেক প্রবোধ দেবার পর ভক্তটি তখন মার পা ছাড়ল। স্নানে যেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ আনুপূর্বিক সব কথা শুনে বল্লেন—"মায়ের অসুবিধা হচ্ছিল, তুমি জোর করে পা ছাড়িয়ে দিলে না কেন। মনে মনে ভাবলাম—অসুবিধা তো হচ্ছিল কিন্তু ভক্ত-ভগবানের ব্যাপার আমিই বা কি বুঝব।

* * *

১৫।১৬ বছরের একটি ছেলে বাড়ী ছেড়ে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পালিয়ে আসে। ছেলেটির

বাড়ী মেদিনীপুরে। কিছুদিন পরে ছেলটিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর বাবাও যোগোদ্যানে যায়। যোগোদ্যানের যোগবিনোদ মহারাজ বাপ ছেলে দু'জনকেই মাকে দর্শন করবার জন্য উদ্বোধনে পাঠিয়ে দেন। মা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"পালিয়ে পালিয়ে এস কেন?" ছেলেটি বল্লে—"আমাদের পাড়ায় মাঝে মাঝে সংকীর্তন হয়। কীর্তন করতে করতে আমি ঠাকুরকে দেখতে পাই আর অচৈতন্য হয়ে পড়ি। সেই অচৈতন্য অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকি। বাবা তাই আমায় মারেন। সেজন্যই পালিয়ে আসি।" মা সেকথা শুনে তার বাবাকে ধমক দিলেন ;—বল্লেন—"তোমাদের কুলে এমন ছেলে জন্মেছে, তোমরা ধন্য। এমন ছেলেকে তোমরা মার ?"

* * *

একদল বৈষ্ণবভক্ত গান শুনাবেন বলে উদ্বোধনে এসেছেন। নীচে পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে গান (কীর্তন) আরম্ভ হল। মা উপরে দোতালার বারান্দায় বসে গান শুনছেন—সঙ্গে অন্য মহিলারা। গানের আসরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ রয়েছেন, আমরাও আছি। গান যখন বেশ জমে উঠেছে তখন গায়কদের কেউ কেউ ভাবে বিহ্বল হয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে জড়িয়ে ধরল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ আদৌ বিচলিত হলেন না ; কথাবার্তা কিছুই বল্লেন না। পূর্বের মত নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাবের উপশম হল। কীর্তন শেষ হলে মাকে বল্লাম—"মা ওদের ভাবটাব যা হয়েছিল সেসব কি ঠিকঠিক?" মা কিন্তু তাতে গুরুত্ব দেননি। বল্লেন, "সংসারী লোক একটু ভাব-চাপতে পারে না ; সহজে বিহ্বল হয়ে পড়ে ! ওসব কিছু নয় !!"

* * *

১৯১২ সাল। কাশীতে কিরণবাবুদের নবনির্মিত বাড়ীতে মা অবস্থান করছেন। সঙ্গে অন্যদের মধ্যে দেবব্রত মহারাজও (পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) রয়েছেন। একদিন খবর এল দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে মারবার জন্য বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে তবে তাঁর কিছু হয়নি। মা শুনে বল্লেন—"ওতো ভালমানুষ, ওকে আবার বোমা মারা কেন ?" কিছুক্ষণ পরেই আবার খবর এল পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে যারা যারা জড়িত ছিল তাদের তলব করা হচ্ছে। পুলিস দেবব্রত মহারাজকে (ইনিও পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) অনুসন্ধান করছে। সকলেই এ সংবাদে ভয় পেলেন মহারাজরা তক্ষুনি দেবব্রত মহারাজকে অন্যত্র চলে যেতে বল্লেন। ঘটনা যতই গুরুতর হোক না কেন মা কখনও ভয় পেতেন না। এ সমাচার শুনেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং দৃঢ়ভাবে বল্লেন—"কী হয়েছে ? ওতো এখন কিছু করে না। এরা সব ভয় পাচ্ছে কেন ?" দেবব্রত মহারাজ কিন্তু অপরের অসুবিধা হবে আশঙ্কা করে সিমলায় তাঁর ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "যাদের দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাস-গুরু ভিন্ন তারা কাকে ধ্যান করবে ?"

শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন,—দীক্ষাগুরুই গুরু। দীক্ষা থেকে জ্ঞানবৈরাগ্য হয়ে সন্ন্যাস হয়। দীক্ষাগুরুকেই ধ্যান করবে।"

"তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিনে

শ্রীশৈলেশ

(শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লিখিত)

ওগো মা জননী,
বিশ্ববন্দ্যা, শুভংকরী, স্নেহময়ী ত্রিলোক-পালিনী।
তমোঘন বিশ্বমাঝে অভ্যুদিতা করপুট
প্রেমময়ী ক্ষমা,
হে বিশ্বজননী আজি তব শত জন্মদিন
অয়ি মনোরমা!
নব জ্ঞানবার্তা লয়ে একদিন এ শুভ লগনে
এসেছিলে নেমে।

তব জন্মগ্রাম
কুসুমিত বনানীর তরুচ্ছায়ে হেরি অভিরাম!
কোকিলের কুহুরবে, শিখি-কেকা-ধ্বনি-স্বনে
আনন্দ স্পন্দনে,
কম্পমান আম্রতরু সৌরভবিহ্বল রাতে
তোমারে আহ্বানে;
তব লাগি কুঞ্জদ্বার মুক্ত আজো। বসন্ত পঞ্চমে
অলি গুঞ্জরণে।

আজো যেন শুনি
তব জন্মদিবসের হিল্লোলিত মহামৌন ধ্বনি।
কুললক্ষ্মী-মুখশ্বাসে কুটীরে কুটীরে ওঠে
শঙ্খের মূর্ছনা,
মুখর ভবনে আঁকা বরণ-ডালির পরে
ছন্দে আলিপনা,
হেমন্তে হৈমন্তী নৃত্য নর্মচিত্তে লাগিছে দোলন,
প্রাণের স্পন্দন।

ওগো মা জননী
বিশ্বমাঝে বরাভয় লয়ে তুমি যবে এলে নামি
জাগিয়া উঠিল আশা, রুদ্ধ প্রাণ পেল ভাষা
সারা বিশ্ব ভরি,

পাপীতাপী আর্তজনে অভাগা আলয়হীনে
লভে প্রাণ ফিরি'।
মৃত প্রাণে এল ফিরে ছন্দোময় প্রাণের প্রবাহ
সুখশান্তিবহ।

তোমার আলোকে
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্ত্রি অগ্নিপ্রভা দারুণ ঝলকে!
তব জ্যোতিঃপ্রভাখানি দুর্বার প্লাবন স্রোতে
ধ্বংস করি তমঃ,
রিক্ত করি দিল তারে বৈরাগী আশ্বিনালোকে
তোমা নমোনমঃ।
অলোকচুম্বন তুমি আঁকি দিলে পৃথিবীর ভালে
জীবনের তালে।

ওগো জ্যোতির্ময়ী,
সারা বিশ্ব যাপিয়াছে কত যুগ তব পথ চাহি'।
আরক্ত নয়নে ঊষা নিত্য মেলিয়াছে আঁখি
চাহি তব পথ,
রক্ত অবগুণ্ঠনেতে করিয়াছে অন্তরাল
সায়ন্তনী রথ,
দেব, ঋষি, মহারাজ সর্ব ত্যজি করিল সাধন
চাহি আগমন।

ওগো মা, জননী
সে সবার প্রার্থনায় এই দিনে আসিয়াছ নামি।
জীবনে জীবনে ডাক দিয়ে দিয়ে বারংবার
দিলে পরিচয়;
গীতহীনা রাত্রিটিরে চিরমুখরিত করি
করেছ অক্ষয়
এই ক্ষণে তাই হেরি সবে ফিরে চায়
শিহরিত কায়।

সেই পরিচয়
কেহ জানে কেহ মানে, কেহ তারে কহে নিঃসংশয়।
মানস তরঙ্গতলে প্রস্ফুটিত শতদল
আপন সংস্কারে
আলোড়িয়া তোলে যথা, সেই মত ওঠে কথা
চিত্ত সরোবরে।
সত্য তব পরিচয় "তোরা ত আমার।"—জানি তাই
কোন ভুল নাই।

আজি জন্মদিনে
মোরা লয়ে ভিক্ষাথালি সম্মিলিত তব শ্রীচরণে
যাচি জোড় করপুটে—"মাঙ্গল্যের করস্পর্শে
কর শুভ্রতম
মোদের মানসলোক। অনন্ত-তমিস্র-রাত্রি
হোক্ অবসান!
বহু জন্ম-জন্মান্তের পুঞ্জীভূত ক্লেদ-গ্লানি যত
হোক্ নিষ্কাশিত।"

"ওগো মা শরণ্যা,
আলোকের বর্ত্মে যেতে শাশ্বত সন্ধানে
তুমিই বরেণ্যা।
কর দূর অন্তরায়, সংশয়, অসত্য, মায়া
গ্রন্থি কর ভেদ,
কামনাবাসনা মোর তব তীব্র-অর্চি-ভেদে
করে দাও ছেদ।
দাও মোরে বুঝে নিতে চিদানন্দ স্বরূপ আমার
আপন আত্মার।"

"দীর্ঘ পথ শেষে
আজি এসে উত্তরিনু স্মৃতিময় তব পদপাশে।
ঘুচে যাক্ দুঃখ-নিশা, তৃপ্ত হোক্ সর্ব তৃষা,
সুচিরসঞ্চিত,
দুঃখহীন নিকেতনে জীব-যাত্রা-অবসানে
পশিব নন্দিত।
অনন্ত ক্ষমার তলে দিয়ে ফেলে সর্ব অপরাধ
কর আশীর্বাদ!"

উৎসব ও সংস্কৃতি

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

এক এক যুগে এক একটি কথার চলন একটু বেশী হয়। এযুগে, 'সংস্কৃতি' শব্দটার চলন এতো বেড়েছে যে, ও শব্দটি কিসে ব্যবহার করা হয়, বলার চাইতে কিসে ব্যবহার করা হয় না বলাই বোধ হয় সহজ!

'সাহিত্যে সংস্কৃতি,' 'শিল্পে সংস্কৃতি' 'ধর্মে সংস্কৃতি,' এসব ছাড়াও—'রবীন্দ্র সংস্কৃতি,' 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি' অথবা 'বৈষ্ণব সংস্কৃতি' ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার চাষও যত বেড়ে গেছে, তেমনই বেড়েছে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে'র ঘটা।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি করে, জগতের দুঃখ দুর্দশা, অবিচার সুবিচার, সংগ্রাম শান্তি, প্রার্থনা দাবী, প্রভৃতি যে কোনো সমস্যা নিয়েই আন্দোলন অনুষ্ঠান হোক, তা'র সঙ্গে একটি করে সাংস্কৃতিক উৎসব থাকাই চাই।

লোক আকর্ষণ করবার এইটিই সহজ উপায়!

কারণ—সাধারণ মানুষ কিছুতেই হিতকথা শুনতে চায় না, সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। চিনির আবরণে ঔষধ গেলাবার নীতি হিসেবেই সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা এতো বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে। রোগগ্রস্ত জাতির ঔষধের প্রয়োজন যে সব সময়!

'সংস্কৃতি' কথাটার ব্যবহার এভাবে আগে ছিলো কি না জানি না, কিন্তু সাংস্কৃতিক উৎসব

এযুগের আবিষ্কার নয়! ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'উৎসব' মানেই সাংস্কৃতিক উৎসব।

তবে তফাৎ এই, এযুগে—'সাংস্কৃতিক উৎসব' যেন সভ্যভব্য শিক্ষিত সমাজের বা বিদগ্ধজনের একচেটে সম্পত্তি, আগে সেটা ছিলো না।

ভারতের যে চিরন্তন সংস্কৃতির ধারা, সে শুধু সভ্যসমাজে শিক্ষিত সমাজে বা বিদগ্ধজনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে সংস্কৃতি—তা'র কি ধর্মজীবনে, কি সমাজজীবনে, কি জাতীয় জীবনে, দেহের মধ্যে আত্মার মতোই ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে।

ভারতের সংস্কৃতির চর্চায় অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন ওঠে না, তা'তে সকলের অধিকার। সংস্কৃতির চর্চাই ভারতবাসীর পূজো, ব্রত, নিয়ম!

ভারতের ভাবধারায় উৎসব মানেই শুধু নিছক আমোদ নয়, আবার—ব্রত পূজা মানেই কেবল পরলোকের সুখকামনা নয়, তা'র মধ্যেই রয়েছে, কাব্যের চর্চা, রসের চর্চা, শিল্পকলার চর্চা। উৎসবের দেশ ভারতবর্ষে বারো মাসে তেরো পার্বণ কেন, বারো মাসে বাহান্ন পার্বণ!

একথা সত্যি, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—স্বভাবতই দেশবাসীর প্রকৃতিতে রয়েছে অলসতা। কেবলমাত্র জীবনধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটোনো ছাড়া, আর কোনো কাজ যদি না থাকতো, তা'হলে—এদেশ স্থবির হয়ে পড়তো, এই দেশবাসী জড়ত্ব প্রাপ্ত হতো। নিজেকে আলস্যের পঙ্ককুণ্ড হ'তে টেনে তোলবার শক্তিও খুঁজে পেতো না, প্রেরণাও খুঁজে পেতো না।

আর সত্যি, সাধারণ মানুষের জীবনে আছেই বা কি, যাতে সে নিরুদ্যম হয়ে পড়বে না, স্তিমিত হয়ে যাবে না? দিনের পর দিন কেবলমাত্র জীবন-ধারণের মোটা প্রয়োজন মিটিয়ে একই দিনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে বয়েসটাকে বড়ো আর পরমায়ুটাকে ছোট করে আনা, এই তো? এই তো সাধারণ মানুষের জীবন!

যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, যাঁরা অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধানলাভের আশায় সাধনা করছেন, সেই মুষ্টিমেয় অ-সাধারণদের এই মোটা হিসেবের মধ্যে ফেলছি না, আমি বলছি সাধারণের কথা।

সাধারণের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন অপরিহার্য! দৈনন্দিন একঘেয়েমির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে একটু বৈচিত্র্যের ছোঁওয়া না পেলে বাঁচা শক্ত।

আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহরা একথা বুঝতেন, আর তাঁরা জানতেন—সবাইকে বাঁচতে হবে, আর এক সঙ্গেই বাঁচতে হবে। "আমার সংস্কৃতি নিয়ে আমি আমার মতো করে বাঁচি, তোমার মূর্খতা নিয়ে তুমি তোমার মতো করে বাঁচো" এ অসুন্দর ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেই, তাঁরা বছরের সমস্ত পথটি আলোকিত করে রেখে গেছেন, একটির পর একটি উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়ে।

সে আলোয় সকলের অধিকার, সে উৎসবে সবাইয়ের নিমন্ত্রণ। মন্দিরে অবস্থিত পাথরের বিগ্রহকে স্পর্শ করবার অধিকার সকলে পেতো না সত্যি কিন্তু মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত 'দেবতা'র স্পর্শ পেতো। এটা নিছক ভাববিলাসের কথা নয়। সেকালের পালপার্বণের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁরাই জানেন, তার মধ্যে ছিলো কি পরিপূর্ণ প্রাণের ভাব!

উৎসব যেন বন্দী হৃদয়ের মুক্তি, জড়তার রুদ্ধ-স্রোতে নতুন প্রাণপ্রবাহ। উৎসবই—জীবন পুঁথির জীর্ণ পাতায় এনে দেয় নতুন রঙের জৌলুস!

ভারত একথা বুঝেছিলো, তাই ভারতে বারো মাসে বাহান্ন পার্বণ!

ভারতের উৎসবই ভারতের প্রাণ। ভারতকে বুঝতে হ'লে তার উৎসব-অনুষ্ঠানের মূলতত্ত্বকে বুঝতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কী কল্যাণ-মন্ত্র নিহিত রয়েছে এর মধ্যে!

এটা লক্ষণীয় যে ভারতের সমস্ত উৎসবই ধর্মের কাঠামোকে আশ্রয় করে! বসন্ত-উৎসব বা হোলির মতো উদ্দাম, বা দেয়ালীর মতো দুঃসাহসিক উৎসব থেকে শুরু করে, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা, মাকাল, ইতু, ভাদু পর্যন্ত সব কিছুই ধর্মের ফিল্‌টারে শোধন করা!

ভারতের সভ্যতা, ভারতের শিল্পকলা, ভারতের সৌন্দর্যবোধ, ভারতের দর্শন, সব কিছুই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে।

ভারত তার দেবতাকে শুধু পুজোর নৈবেদ্যটুকু দেয় না, ভোগের পূর্ণপাত্রটিও দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে তবে গ্রহণ করে।

দেবতা সকলেরই হৃদয়ের বস্তু, তাই দেবতাকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হবে তাতে সকলেরই হৃদয়গত যোগ থাকবে—একথা আমাদের পূর্ব পিতামহরা বুঝতেন, তাই ভারতের দেবতা মানুষের সঙ্গে তার সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সব কিছুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

এই হচ্ছে—ভারতের সংস্কৃতি।

তা' বলে—এ শুধু 'ঐহিক চিন্তায় উদাসীন' ভারতের পরলোকের পথ পরিষ্কার রাখবার উপায়-মাত্র নয়।

ভালো করে ভেবে দেখলেই দেখা যায়—এই ব্যবস্থার মধ্যে কেমন সূক্ষ্মভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রাজনীতির কূটকৌশল।

কেদার-বদরী-কৈলাস-মানস থেকে শুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের তীর্থক্ষেত্র।

এ তীর্থ সমগ্র ভারতবাসীর।

বিশ্বনাথ কেবলমাত্র উত্তর ভারতের সম্পদ্ নয়, জগন্নাথ কেবলমাত্র ওড়িষ্যার সম্পত্তি নয়, বৃন্দাবন-লীলা-মাধুরী শুধুমাত্র ব্রজবাসীর একচেটে নয়, ওতে সকল প্রদেশের অধিবাসীরই সমান দাবী।

কতো পথক্লেশ সয়ে, কতো গিরি নদী উপত্যকা, কতো মরুকান্তার, কতো নিবিড় অরণ্য-ভূমি, অতিক্রম করে কতো জীবনমরণের সঙ্কট তুচ্ছ করে, যুগ যুগ ধরে মানুষ চলেছে তীর্থ যাত্রায়! সে যাত্রায় রয়েছে যেন এক চিরন্তন তীর্থ-যাত্রার ধারা!

সে ধারা কখনোই কোনো দুঃখে দুর্যোগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবের বিদারণ রেখায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যয়ে যায়নি।

তীর্থ-যাত্রীকে কেউ কখনো বলেনি, বা বলে না—"আমাদের দেশে ঢুকো না,···আমাদের ধান চাল খেয়ে ফুরিয়ে দিও না।" বরং সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়, সমাদর করে কাছে বসায়, সুবিধের জন্যে ধর্মশালা খুলে রাখে।

আবার তীর্থ-যাত্রীকে অবলম্বন করেই কতো লোকের রুজিরোজগারের পথ খুলে যায়! বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে।

একাধারে প্রাদেশিকতার বিষ দূর করবার এবং অর্থনৈতিক সমস্যা লাঘব করবার এমন সহজ কৌশল এ যুগের রাজনীতিতে সম্ভব?

সর্বসাধারণকে এক করতে, সব প্রদেশকে এক মাল্যে গেঁথে রাখতে, এই যে একটি ধর্মের ডোর, যে ডোরটি দিয়ে জাতীয় বন্ধন সুদৃঢ় হতে পেরেছিলো, সেই বন্ধন-ডোরটির, মূল ভাব-রহস্যকে বিস্মৃত হয়ে, দেবতাকে 'কুসংস্কার' বলে উড়িয়ে দিয়ে আজ আমরা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে পড়েছি! বন্ধনটা গেছে শিথিল হয়ে।

আজ আমরা জাতিভেদ-প্রথার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, তাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে আইন তৈরি করছি, কিন্তু তলায় তলায় নতুন যে ভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, তার কুফলের আশঙ্কায় চিন্তিত হচ্ছি না।

জাতিভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শ্রেণীভেদ গড়ে উঠছে।

দাক্ষিণাত্যের কলঙ্কিত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নিম্নবর্ণ 'পারিয়া'রা ব্রাহ্মণের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার

অনুমতি পেতো না, ব্রাহ্মণরা 'পারিয়া'দের রাস্তার ছায়া মাড়াতো না!

আজকের জাতিভেদ-মুক্ত সমাজে, আর ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, 'দুশো টাকা' বেতনের রাজকর্ম-চারীরা 'তিনশো টাকার পাড়া'য় থাকবার অনুমতি পান না' 'পাঁচশো টাকার পাড়া'র অধিবাসীরা 'তিনশো টাকার রাস্তা'য় পায়ের ধুলো দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না।

একদিন যে কোনো হতভাগ্য, কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে একটা ভালো পোষাক জোগাড় করে পরে ফেলে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যাবে, তার জো নেই। সন্দেহ হলেই আপনি তার 'পাড়া'র ঠিকানা চাইবেন, বাস! সেখানেই হাঁড়ির খবর জানাজানি।

আগেকার যুগের সংস্কৃতিতে ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, রসিক অরসিক, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সকলের জীবনের ছন্দেই একটা ধ্বনিগত মিল ছিলো, একালে সে মিলটা ঘুচেছে।

পৌষ-পার্বণে সবাইয়ের ঘরে পিঠে পুলি হবে, অরন্ধনে কারো ঘরে উনুন জ্বলবে না, যার সামর্থ্য নেই, সে অন্ততঃ চৌদ্দটা দীপ জ্বেলেও 'দীপান্বিতা' পালন করবে, হোলিতে যে যার গায়ে খুসি রং ছিটোবে—এই যে একাত্মবোধ, এটা শুধু উৎসবেই সম্ভব।

এই যে আজকাল প্রায়ই এখানে ওখানে বর্ষা-উৎসব পালন হ'তে দেখি—'বর্ষা-আবাহন' 'বর্ষা-মঙ্গল' 'বর্ষা-বিদায়' ইত্যাদি নানা নামে সে উৎসব পালিত হয়। 'ইচ্ছে-অরন্ধনে'র মতো যার যেদিনে সুবিধে।

কিন্তু এ উৎসবও ওই 'শ্রেণী'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্মের কাঠামোহীন এই উৎসবের রস কি কোনো গ্রামীন্ লোক গ্রহণ করতে পারবে, যেমন পারে ঝুলনযাত্রা-উৎসবের, জন্মাষ্টমী-উৎসবের?

একপক্ষে এগুলিও তো ঋতু-উৎসব!

ঋতু-উৎসব ভারতের চিরন্তন উৎসব।

প্রকৃতির ডালায় যখন যে ফুলটি নতুন ফোটে, যে ফলটি নতুন ওঠে, তা'কে নিয়েই একটা না একটা উৎসব। বৈশাখমাসে বাগান ভরে ওঠে রকমারি ফুলে! গাছের ফুল কি গাছেই ঝরবে? নাকি শুধুই হবে বিলাসিতার উপকরণ?

না, তাদের নিয়ে শুরু করো—শিবপুজো, 'পুণ্যিপুকুর', 'হরিরচরণ', লাগাও রাধাকৃষ্ণের ফুলদোল।

আমের মুকুলে শ্রীপঞ্চমীর পূজা, নতুন আম-কাঁঠালে ষষ্ঠীবাটার ঘটা!···সময় বুঝে বুঝে পাজির পাতায় আছেই একটা কিছু। আর নতুন অন্নের আশায় নবান্ন-উৎসব, তার ঘটার তো কথাই নেই।

এ উৎসবকে নিছক গ্রাম্য উৎসব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই বোধ হয় 'অন্ন' আজ এতো রুষ্ট! অন্নই যে জীবনের প্রধান জীবনীরস একথা তো অস্বীকার করা যায় না।

লক্ষ্মীর প্রয়োজনকেই বা অস্বীকার করবার সাহস কার আছে? তবে তাকে নিয়ে উৎসব অর্চনাকেই বা গ্রাম্য বলে বাতিল করা কেন?

উপকারীর উপকারকে উপকার বলে গ্রাহ্য না করাটাই এযুগের ধর্ম বলে হয়তো অন্নপূজা, সম্পদ-পূজা, ঋতুপূজা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে।

অথচ 'বারো পার্বণে' অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তি নিয়ে আমরা উৎসবের প্রয়োজন অনুভব না করে পারছি না।

তাই যত্রতত্র এতো সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা!

উৎসবকে সারা বছর ধরে জীইয়ে রাখবার চেষ্টায় মহাপুরুষ খুঁজে খুঁজে তাঁদের জন্ম-জয়ন্তী আর তিরোভাব উৎসব করছি! করছি এটা ওটা সেটা।

আমি কিন্তু এক এক সময় ভাবি—চিরাচরিত পূজাপার্বণ এখন এমন করে উঠে গেলো কেন, বা প্রথামাত্র হয়ে রয়েছে কেন? আগের যুগের পাল-

পার্বণ ব্রত ইত্যাদির প্রথা যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা কি সাংস্কৃতিক জ্ঞান বি-বর্জিত ছিলেন ?

বেছে বেছে কেমন সব শুক্লাতিথিতে আর পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় যতো কিছু পূজা অর্চনা !

তার আয়োজন উপচারই বা কি !

ফুল চন্দন, গন্ধ মাল্য, ধূপ ধুনো, আরতি আলপনা—কাব্যিক পরিবেশটি সৃষ্টি করতে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই।

ধরা যাক—সত্যনারায়ণ পুজো !
তার আয়োজনটি যেন একটি কবিতা !

আমার তো মনে হয়—ওই শির্নী জিনিসটি পূর্ণিমা-সম্মিলনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেকালের লোকেরা মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বেশী, তাঁরা জানতেন—আয়োজনের মাঝখানে যদি একটি নারায়ণ স্থাপন করে রাখা যায়, তাহলে অতিথিরা কেউ অভ্যর্থনার ত্রুটি ধরতে সাহস পাবে না, "যেতে সময় হলো না" বলে পাঠিয়ে বাড়ী বসে থাকবে না।

তাছাড়া—উৎসব যেন উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত না হয়, আনন্দের প্রকাশ যেন অসংযমের রূপ না নেয়, সেটাও দেখা দরকার।

সব কিছু উৎসবের মধ্যেই তো লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ?

আক্ষরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না সত্য, কিন্তু আন্তরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো।

কুমারীকালের ব্রত থেকে শুরু করে দুর্গোৎসব পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই লোক শিক্ষা। নীতি ধর্ম, ন্যায় অন্যায় বোধ থেকে পুরাণ উপপুরাণ শাস্ত্র ইতিহাস—কোন্ শিক্ষাটি নয় ?

কিন্তু শুধুই কি শিক্ষা ?

আবহমান কাল থেকে সারা ভারতবর্ষে এই উৎসবের মাধ্যমেই ঘটেছে সঙ্গীতের চর্চা, নৃত্যকলার চর্চা ! 'লোক সঙ্গীতে'র মতো একটি পরম সম্পদ, এইসব চলতি উৎসব বা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই রচিত।

'ধানভানতে শিবের গীত' কথাটা অপ্রাসঙ্গিক অর্থে ব্যবহার হলেও মিথ্যা নয়।

বাঙলাদেশের অনেক জেলায়—নবান্নর ধানভানা উপলক্ষ্যে মেয়েরা শিবের বিয়ের পালা গায়।

অবরোধের দেশ ভারতবর্ষে চিরদিনই মেয়েদের অবরোধ শিথিল হয়ে গেছে উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে।

মেয়েরা দল বেঁধে পথে বেরোয়, গান গাইতে গাইতে 'জল সইতে' যায়। যায় এখানে ওখানে।

বাঙলা বাদে ভারতের সর্বত্রই মেয়েদের নৃত্য-চর্চার প্রথা রয়েছে, এক একটি উৎসবের অবশ্য-পালনীয় অঙ্গ হিসাবে।

মেয়েলী শিল্পগুলিও এই উৎসবের মাধ্যমেই বিকশিত হবার সুযোগ পায়। আলপনা দেওয়া, ঘট চিত্তির আর দেওয়াল চিত্তির করা, পীঁড়ি রঙানো, শ্রী গড়ানো, বরণডালা সাজানো, মালাগাঁথা, ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে, মেয়েরা তাদের শিল্পী মনকে নানাভাবে নানাছাঁদে নানাব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলবার জায়গা পায়। তাই বলছিলাম—সংস্কৃতির চর্চা এদেশে আবহমানকাল থেকেই ছিলো, ছিলো সাংস্কৃতিক উৎসব।

আর তেত্রিশ কোটি মানুষ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশেও সাংস্কৃতিক বন্ধনটা ছিলো এক—অখণ্ড !

এযুগের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন—খণ্ড, খণ্ড !

"মানুষই দেবতা হয়। কর্ম করলে সবই সম্ভব হয়।"

—শ্রীশ্রীমা

দয়াল প্রভু

শ্রীমতী প্রতিময়ী কর, ভারতী

কণ্টকে ঘিরি না রাখিতে যদি
জীবন-মঞ্চখানি,
কামনা-কেয়ার সুরভি কুঞ্জে
না রহিত বিষ-ফণী।

না ফুরাতে আশা নিঠুর মরণ
পরমায়ু না হরিত,
যৌবনবনে স্বপ্নকুসুম
দু'দিনেই না ঝরিত।

ব্যাধির পীড়নে না দমিত যদি
দেহের অমিত বল,
বাধা নিরবধি না ভাঙিত যদি
অহমিকা হিমাচল।

না রহিত যদি এত বঞ্চনা
মিথ্যার ধারাপাত
হিংসা-গরল দ্বেষ-দাবানল
স্বার্থের সংঘাত।

সুখের সাধনা না হইত যদি
আলেয়ার পিছে ছোটা,
ভবের হাটের ভূয়া কারবারে
ভূতের বেগার খাটা।

বিফল না হতো মানুষে মানুষে
মন দেওয়া আর চাওয়া,
ধরি আজীবন করি প্রাণপণ
উজানে তরণী বাওয়া।

চিরসাথীহীন না রহিত যদি
সবারে আঁকড়ি থাকি
জীবনপ্রশ্নে জবাব মিলিতে
কিছু না রহিত বাকি।

মায়ামরীচিকা না সৃজিতে যদি
হে মোর দয়াল প্রভু,
তোমারে কি তবে খুঁজিত মানব
তোমারে চাহিত কভু?

চিন্তা ও অনল

শ্রীদীনবন্ধু মাজি

অনলে সরোষে ডাকি কহে চিন্তাধারা,
নিষ্ঠুর হৃদয় তব দয়ালেশ হারা।
স্বর্ণসম নরদেহ জ্বালাও নিমেষে,
ভস্মে হয় পরিণত তব কর্ম শেষে।

হাসিয়া অনল কহে একথা নিশ্চিত,
মৃতদেহ দহি সাধি মানুষেরি হিত।
জীবিত যে তারে বন্ধু কর তুমি দাহ,
বৃথা মোর অপযশ তবে কেন গাহ?

শিক্ষার ভিত্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

(দুই)

'বনফুল'

[বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' বক্তৃতা]

আমরা এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। শুনিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করাই বর্তমান রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ জ্ঞানে গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল যখন সে সত্যই স্বাধীন ছিল, তখন তাহার শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়াই আলোচনা আরম্ভ করি। তিনি বলিতেছেন—"কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং কোন্ শিক্ষা ভাল কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না" অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় তাহার নামই শিক্ষা। পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি আজকাল সমাজ বলিয়া কিছু নাই। আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীতে স্বাধীনতার আস্ফালন করি বটে, কিন্তু আসলে আমরা সকলেই দাস। যন্ত্রপতিরাই পৃথিবীর মানবসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহারাই আমাদের প্রভু, ভর্তা এবং শাসনকর্তা। আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে তাঁহাদের উৎসাহ নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাহাতে না হয়, সকলেই যাহাতে বিরাট যন্ত্রের নাট্ বা বল্টুতে পরিণত হয়, সেই দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য। আমেরিকার বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার Alexis Carrel তাঁহার Man, the unknown নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিতেছেন—Modern Society ignores the individual. It only takes account of the human beings. It believes in the reality of the universals and treats men as abstractions. The confusion of the concepts of individual and of human being has led industrial civilisation to a fundamental error, the standardisation of men. If we were all idnentical, we could be reared and made to live and work in great herds like cattle. But each one has his own personality. He cannot be treated like a symbol.

Children should not be placed, at a very early age in schools where they are educated whole sale.

As is well-known, most great men have been brought up in comparative solitude or have refused to enter the mould of the school....education should be the object of unfailing guidance. Such guidance belongs to parents. They alone, and more especially the mother, have observed since their origin, the physiological and mental peculiarities whose orientation is the aim of education. Modern society has committed a serius mistake by entirely substituting the school for familial training. The mothers abandon their children to the kindergarten in order to attend to their careers, their social ambitions, their sexual pleasures, their literary or artistic fancies or simply to play bridge, go to the cinema and waste their time in busy idleness. They are thus responsible for the disappearance of the familial group where the child was kept in contact with adults and learned a great deal from them. He learns little from the children of his own age....The neglect of individuality by our social institutions is likewise responsible for the atrophy of the adults...In the immensity of modern cities he is isolated and as if lost. He is an economic abstraction, a unit of the herd. He gives up his individuality. He has neither responsibility nor dignity. Above the multitude stand out rich men, the powerful politicians, the bandits. The others are only nameless grains of dust...."

এই প্রবন্ধটি একটু বেশী করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ ইহাতে আধুনিক শিক্ষার যে সব গলদ এবং তাহার জন্য ব্যক্তিত্ব-বিলোপের যে চিত্র ডাক্তার ক্যারেল অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং যাহা এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে; পুরাকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই সব গলদগুলি এড়াইয়া চলা।

সে শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার পূর্বে তখনকার সামাজিক গঠন জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন যে সে যুগের বিজয়ী আর্যগণ যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা নিজেদের জন্য, বিজিত অনার্যদের জন্য নহে। অনার্যদের প্রথম প্রথম তাঁহারা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। নিজেদের সুবিধার জন্য যোগ্যতা অনুসারে তাঁহারা নিজেদের তিন বর্ণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ইহার মধ্যে কোনরূপ জোরজবরদস্তি ছিল না। অধ্যাপক Altaker তাঁহার Education in India পুস্তকে লিখিয়াছেন—"There is a general impression that Hindu educationists suppressed personality by prescribing a uniform course of education and enforcing it with iron discipline. Such, however, was not the case. The caste system had not become hide-bound down to 500 B. C. and till that time

a free choice of profession or career was possible both in theory and practice....

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনের আদর্শ কি হইবে তাহা নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারাজীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক চর্চা ছিল ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ছিল শক্তির সাধনা এবং বৈশ্যের আদর্শ ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য। প্রত্যেকেই দ্বিজ ছিলেন এবং প্রত্যেককেই উপনয়নের পর গুরুগৃহে জীবনের প্রথম আশ্রম অতিবাহিত করিতে হইত। নিজের নিজের গুণ বা প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য হইতেন। এখন যেমন একই বাড়ির ছেলে কেহ অধ্যাপক, কেহ সৈনিক এবং কেহ দোকানদার, কেহ বা অন্য কিছু হন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার Ancient Indian Education পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

In the sphere of economic life and interests the free choice of occupations or the movement of labour, horizontal or vertical was subordinated to the choice of the ideals and ends of life... some occupations were approved for certain castes and condemned for others.

এই সব ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল না। আর্যসংস্কৃতির মহত্ত্বকে ম্লান করিবার জন্য অনেকে শূদ্রদের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ করেন, এ সম্পর্কে 'শোষক' 'শোষিত' ইত্যাদি নানা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর্যদের শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ তাহাদের উদার সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেজন্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

যাঁহাদের তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন তাহারাই ছিল শূদ্র অর্থাৎ দাস। তখন বিজিত দেশের লোকেরা দাস বলিয়াই সাধারণত গণ্য হইত, তখন সর্বদেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আমরা যেমন গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার স্বাধীনতা স্বীকার করি না, তখনও মানবসমাজ তেমনি দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় যে নূতন দাসত্ব প্রথার প্রচলন হইয়াছে তাহাতেও দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। ভারতবর্ষীয় আর্যদের স্বপক্ষে তবু একটা কথা বলিবার আছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দাসদের উপর যে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা আমরা পাই, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তাহা পাই না। পুরাণে কাব্যে রামায়ণ মহাভারতে মাঝে মাঝে আছে বটে মুনিরা দাসদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, অথবা শুনঃশেফকে যজ্ঞে বলিদান দিবার জন্য কিনিয়া আনা হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবের অনার্য-দলন, খাণ্ডবদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুকবধ প্রভৃতি ঘটনাকেও যদি দাসনির্যাতনের পর্যায়ে গণ্য করি তবু অন্যান্য দেশের তুলনায় এমন কি আধুনিক সভ্যযুগেরও দাস-দলনের তুলনায় সে সব নগণ্য। জালিওয়ানবালাবাগের কথা, বিয়াল্লিশের অত্যাচারের কথা, এমন কি আজকাল কেনিয়ায় যাহা হইতেছে তাহার কথা স্মরণ করুন।

আর্যগণ এদেশে আসিয়াই মহাপুরুষ বা দার্শনিক হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহারাও এদেশে আসিয়াছিলেন বিজেতাসুলভ মনোভাব লইয়া। কিন্তু এদেশে কিছুকাল বাস করিবার পর তাঁহারা যে ধর্ম যে সভ্যতার পত্তন করেন, যে আদর্শ তাঁহাদের পরবর্তী সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, যে আদর্শ সনাতন ভারতীয় আদর্শ নামে পরিচিত তাহাতে শূদ্রদের প্রতি ঘৃণার আভাসমাত্র নাই। পুরাণে কাব্যে এরকম নিদর্শন হয়তো দুই একটা আছে, কিন্তু প্রেমের নিদর্শনও কম নাই।

রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে, তাড়কাকে, রাবণকে, বালীকে এবং আরও অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীকে বধ করিয়াছেন সত্য, লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাকও কাটিয়া দিয়াছেন কিন্তু ওই রামায়ণযুগেই আমরা পাই গুহক চণ্ডালকে, শবরীকে, রামভক্ত হনুমানকে। মহাভারতের যুগে তো একেবারে পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই পুরাপুরি আর্য নহেন, তিনি লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর। পাণ্ডুজননী তাঁহাকে দেখিয়া মূর্ছা গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পিতা ঋষি পরাশর হয়তো আর্য ছিলেন কিন্তু তাঁহার জননী সত্যবতী ধীবরকন্যা। এই সত্যবতী পরে রাজা শান্তনুর ধর্মপত্নীও হইয়াছিলেন। এই মহাভারতেই দেখি, ভীম হিড়িম্বাকে এবং অর্জুন উলূপীকে, চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিতেছেন। রাজা নহুষ রাক্ষস উরগ প্রভৃতিকে পালন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখি উভয়পক্ষেই অনার্য নৃপতিরা রহিয়াছেন, হীন দাসরূপে নহে, নির্ভরযোগ্য বন্ধুরূপে। গন্ধর্ব, কিন্নর, পন্নগ, দৈত্য, দানব, নাগগণ যদি অনার্য হন তাহা হইলে তাঁহাদের মহিমায় পুরাণ মহাভারত পরিপূর্ণ। একলব্য, অধিরতসুত, দাসীপুত্র বিদুর, জতুগৃহের নির্মাতা শিল্পী পুরোচন, মায়াবী অঙ্গারপর্ণ প্রভৃতি যে সব চরিত্র মহাভারতকার উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারা কেহই হেয়চরিত্র নহেন। মহর্ষি নারদ কুবের সভার, বরুণ-সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে অনার্যদেরই আধিক্য দেখিতে পাই। একথা অবশ্য ঠিক ভীম বক, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ, শাল্বকে এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা বহু অনার্যকে ধ্বংস করিয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদের মহিমা, ইঁহাদের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা, কুবেরের অলকাপুরীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় না, তাঁহারা তাঁহাদের ছোট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাল্ব যে আকাশগামী সৌভপুরীতে চড়িয়া পৃথিবী হইতে প্রায় এক ক্রোশ ঊর্ধ্বে থাকিয়া শরসন্ধান করিতে পারিতেন একথা বেশ সাড়ম্বরেই বর্ণিত হইয়াছে।

মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে অনার্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াই হয়তো অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের কল্পনা আর্য ঋষিদের চিত্তে প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই অনার্যগণ সর্বভূতে—এমন কি সর্পে, ব্যাঘ্রে, সর্বপ্রকার হিংস্র অহিংস্র জীবজন্তুতে, বৃক্ষে, প্রস্তরখণ্ডে, আলোকে অন্ধকারে, সর্বত্র দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই হয়তো পরবর্তী যুগে আমরা মূর্তিপূজক হইয়াছি, দেবদেবীদের সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃষ, হংস, পেচক প্রভৃতিরও পূজা করিতেছি।

এই সব হইতে মনে হয় কালক্রমে আর্যদের সহিত অনার্যদের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রীতির সম্পর্ক সত্ত্বেও শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহারও কারণ ঘৃণা নয়, সাবধানতা। আর্য ঋষিদের বিশ্বাস ছিল বেদমন্ত্রের উচ্চারণ যদি নির্দোষ না হয় বিশ্বের অমঙ্গল হইবে। যেহেতু শূদ্রদের মাতৃভাষা বৈদিক ভাষা নয় সেই হেতু তাঁহাদের ভয় ছিল শূদ্রেরা বৈদিক মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করিবে এবং তাহা হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে তাঁহারা খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। প্রথমে আর্য রমণীগণের বেদপাঠে অধিকার ছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, বিশ্ববারা প্রভৃতি অনেকেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কিন্তু এ দেশে বহুকাল বাসের পর আর্য রমণীগণের আর্যত্ব যখন কমিতে লাগিল, আর্যগণও যখন অনার্য রমণী বিবাহ করিতে লাগিলেন তখন ঋষিরা রমণীদের এবং পতিত আর্যদেরও বেদ-পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বেদ

তখন তাঁহাদের সভ্যতা শক্তি ও সংহতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল, বেদের পবিত্রতা রক্ষা করা সে যুগে সমস্ত জাতির আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে এখন যে কারণে মৃত্যুদণ্ড হয় বেদের পবিত্রতা নষ্ট করিলেও সে যুগে ঠিক সেই কারণেই মৃত্যুদণ্ড হইত। ইহাই তখন নিয়ম ছিল, এ নিয়ম পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রাজারও ছিল না। এইজন্যই শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অনার্যদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া কিছুদিন পরে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ পরে দেখিতে পাই অনার্য রাজারাও যজ্ঞ করিতেছেন। অনার্য দানব রাজা বৃষপর্বা কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক সন্নিধানে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞেরই দ্রব্যাদি লইয়া অনার্য ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চমকপ্রদ সভা নির্মাণও করিতেছেন, এমন কি অর্জুনের দেবদত্ত নামক শঙ্খটিও বৃষপর্বার যজ্ঞস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পরে দেখি, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ একজন শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত বলিয়া কীর্তিত, নাগরাজ বাসুকী একজন প্রথম শ্রেণীর তপস্বী বলিয়া সম্মানিত, পুরাণকার তাঁহার মস্তকে সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পরে দেখি, সমস্ত বলশালী অনার্যগণ আর্য সভ্যতার দীপ্তিতে দীপ্যপান, পুরাণের প্রায় সমস্ত প্রতাপশালী দৈত্যদানবেরা তপস্বী, মহর্ষি উশনা দৈত্যদের গুরু-পদে আসীন হইয়া শুক্রাচার্য নামে খ্যাত। আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে দেখি আর্যরা শূদ্রদের ছোঁওয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন না। ইহারও কারণ সম্ভবত ঘৃণা নয়, সাবধানতা। শূদ্ররা পরাজিত, শূদ্ররা অপরিচিত, তাহাদের সামাজিক আচার-আচরণও অদ্ভুত, তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করা তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্যই সমীচীন মনে করিতেন না। প্রথম প্রথম অপরিচিত অনার্য পরিবেশে তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হইত। এমন কি মহাভারতের যুগেও দেখি পাণ্ডবজননী কুন্তী পুত্রদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন, ভাবিতেছেন কোনও মায়াবী নিশাচর তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিল না তো! বলা বাহুল্য মায়াবী নিশাচর মানে অনার্য।

প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁহারা অনার্যদের বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাই সম্ভবত তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালেও তো দেখি ট্রেনে নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে—"অপরিচিত লোকের নিকট হইতে খাদ্য, পানীয় এমন কি বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন না।" আধুনিক সামরিক আইনও এসব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। এই সতর্কতা কি ঘৃণা?

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে ঈষৎ অবান্তর হইলেও আর্যদের সহিত শূদ্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ অনেকে মনে করেন আর্যরা শূদ্রদের ঘৃণা করিতেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরূপ। প্রথম প্রথম বিজেতাসুলভ মনোভাব হয়তো তাঁহাদের ছিল, কিন্তু কিছুকাল এদেশে বাস করিবার পর যে ধর্ম, যে সংস্কৃতির পত্তন তাঁহারা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে ও সমাজকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহাতে ঘৃণার স্থান নাই। জোরজবরদস্তি বা ঘৃণার শাসন স্বল্পায়ু। ন্যায়ের শাসন, প্রেমের শাসন, উদারতার শাসন দীর্ঘজীবী। যে ধর্মের ভিত্তিতে আর্যগণ এদেশে সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন তাহা চারি হাজার বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এখনও সগৌরবে টিকিয়া আছে। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার The Hindu View of Life পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার ভিন্সেণ্ট স্মিথের যে অভিমত Oxford History of India হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—

India, beyond all doubt, possesses a deep fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect. এই unity, বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই একত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাঁহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্রই ছিল একত্বের সন্ধান। ঘৃণার স্পর্শে এই সন্ধান ব্যাহত হইত।

বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রত্যেক আর্যসন্তানের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য আশ্রম, আর্যজীবনের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে আর্য-জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। ব্রহ্মচর্যাশ্রম উত্তীর্ণ না হইলে কোন আর্যসন্তানই পরবর্তী গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। কোনও ভদ্র গৃহস্থ তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদানই করিতেন না। ভিত্তি মজবুত না করিয়া তাহার উপর হর্ম্য-নির্মাণের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। সত্য ও ধর্মই সে ভিত্তির প্রধান উপকরণ। সত্যের সন্ধান এবং সে সন্ধানের উপযোগী চরিত্র-নির্মাণই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একথা তাঁহারা বলিতেন না যে 'লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'—কোনও মিথ্যা আশ্বাস বা অলীক মোহের উপর সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমান যুগের দার্শনিক পণ্ডিতগণও আজকাল বলিতেছেন যে শিশুর মনে শিক্ষার ছলে এমন কোনও জিনিস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত নয় যাহা মিথ্যা, যাহা জীবনের নিকষে যাচাই করিলে মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইবে। Alfred North Whitehead তাঁহার—The aims of Education প্রবন্ধে এই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে বলিয়াছেন। সে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল তাহা ব্রহ্মচর্য এই নামের মধ্যেই স্পষ্ট। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মকে জীবনে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের চরম পরিণতি, সেই পরিণতি লাভ করিবার জন্য যে প্রস্তুতি—তাহাই শিক্ষা। কারণ ব্রহ্মই সত্য, পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্য সেই একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথিবীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা তাহার সত্য রূপ নয়, তাহা মায়াময় রূপ, তাহা মিথ্যা, তাহা ক্ষণস্থায়ী। বহুরূপী বিচিত্র মায়াযবনিকার অন্তরালে যে সত্য, যে ধ্রুব, যে অনাদি অনন্ত অখণ্ড শক্তি বিরাজমান—তাহার নাম ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, God, Primordial Energy, যাহাই দিন—তাহাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ব্রহ্মকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে উপলব্ধি করিতে হয়—এই উপলব্ধির কোন বাঁধাধরা একটা পথ নাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করেন, গুরু তাঁহার সহায়ক মাত্র। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই—মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য মুক্তি-লাভ, চাকরি-লাভ নয়, ডিগ্রি-লাভ নয়, কোন প্রকার ঐহিক সুখ নয়। ঐহিক সুখদুঃখ, ঐহিক জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম একথা তাঁহারা জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বলেন নাই—Eat, drink and be merry, to-morrow you die. কারণ ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই দেহটাই মরণশীল, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা অনুভব করি তাহাই নশ্বর—আত্মা কিন্তু অমর। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মানু-সন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ, আত্মানং বিদ্ধি তাই আর্য শিক্ষার প্রধান উপদেশ। Eat, drink করিয়া merry হইতে তাঁহারা মানা করেন নাই, জীবনকে উপভোগ করায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল, রাজসিক জীবনের বিবিধ বিলাসকে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থ তাঁহারা

প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের জীবন যে বহুবিধ ক্ষুধায় কাতর এ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। কিন্তু তাঁহারা এইসব ক্ষুধাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই ক্ষুধা-প্রসঙ্গে যে উপদেশ তাঁহারা দিয়াছেন তাহাই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মূলমন্ত্র। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—জীবনকে ভোগ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আসক্ত হইও না। আসক্তি মানেই বন্ধন এবং বন্ধনের পরিণামই দুঃখ। যে অনন্ত পথের তুমি যাত্রী সে পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে যদি আসক্তির শৃঙ্খল প্রতি পদক্ষেপে তোমার গতি রোধ করে? সুতরাং আসক্তি ত্যাগ কর, যে কোনও প্রকার আসক্তিই, এমনকি ব্রহ্মের প্রতি আসক্তিও দুঃখ-দায়ক। ভোগ কর, কিন্তু ভোগাসক্ত হইও না। আসক্তি তোমার মুক্তি-লাভের বাধা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলিতেছেন—The Hindu Code of practice links up the realm of desires with the perspective of the Eternal. It links together the kingdoms of Heaven and Earth.

এই perspective of the Eternal, ভূমার পটভূমিকায় জীবনকে দর্শন, আর্যসভ্যতার মূল সুর। আর্য ঋষি বলিতেছেন—দেহের অবসান ঘটিবে, তোমার বিত্ত, তোমার প্রতাপ, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার অলঙ্কার অহঙ্কার সমস্তই লুপ্ত হইবে, কিন্তু তুমি লুপ্ত হইবে না, তুমি অমর, তুমি অনন্ত পথের যাত্রী, তোমার পার্থিব জীবন তোমার অনন্ত যাত্রা-পথের অংশ মাত্র, এই অংশটুকুর সম্বন্ধে মোহ-পোষণ করিও না, আত্মবিস্মৃত হইও না, হইলেই কষ্ট পাইবে।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবং কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥

শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর আর্যশিক্ষার সারমর্ম। জীবন-সম্বন্ধে সত্যদর্শন এবং দুঃখ-নিবারণের প্রকৃত উপায় যে শিক্ষার লক্ষ্য সেই শিক্ষাই তাঁহারা জীবনের প্রথম আশ্রমে আর্যসন্তানগণকে দিতেন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন—Of all the peoples of the world the Hindu is the most impressed and affected by Death as the central fact of Life. He cannot get away from the fact that while man proposes, God disposes. Therefore he feels he cannot take life seriously and scheme for it without a knowledge of the whole scheme of creation.

যাঁহারা মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকের অভিমত মৃত্যুই সম্ভবত আমাদের প্রথম ধর্ম-শিক্ষক। মৃত্যুই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় ইহাই কি শেষ? উপনিষদের ঋষি সত্যসন্ধানের নিমিত্ত তাই নচিকেতাকে যমের নিকটে লইয়া গিয়াছেন।

নচিকেতা যমকেই প্রশ্ন করিতেছেন—

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই
কেহ বলে থাকে কিছু, কেহ বলে নাই
হে যম, তৃতীয় বরে আজিকে তোমার কাছে
সত্য কথা শুনিবারে চাই।

যম তাহাকে এই সত্য কথা, সনাতন গূঢ় ব্রহ্মকথা পরে বলিয়াছিলেন, প্রথমে কিছুই বলেন নাই। নচিকেতা সত্য-লাভের প্রকৃত অধিকারী কি না

তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাকে প্রলুব্ধ করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—

শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থনা
পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দিব চাও যত
বিশাল রাজত্ব লও
নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছামত
এর তুল্য অন্যবর যথা ইচ্ছা, নচিকেতা করহ প্রার্থনা,
লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল রাজ্যের
পূর্ণ কর সকল কামনা
মর্ত্যলোকে দুর্লভ বা সেই সব কাম্য বস্তু
যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে
ওই যে রথের পরে বাদ্যযন্ত্র সহ রমণীরা আছে
মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত ইহারা
মোর বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্যা-সুখ
মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু নচিকেতা হ'য়ো না উৎসুক।

নচিকেতা কিন্তু ভুলিবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন—

অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু
জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ
জীবনই তো ক্ষণস্থায়ী ; বাহন বা নৃত্য-গীত
চাহি নাকো তোমারই থাকুক।

তখন যম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সত্যের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন—

নচিকেতা, তুমি প্রিয়, প্রিয়রূপী কামনা সকল
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়া
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বহুলোক হ'ল নিমজ্জিত
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়া ;
অবিদ্যা ও বিদ্যা এরা অতি ভিন্নমুখী
বহমান বিপরীত ধারে
নচিকেতা, তুমি জানি বিদ্যা-অভিলাষী
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে।
অবিদ্যা অন্তর মাঝে সদা বর্তমান
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান
অন্ধ-নীত অন্ধসম মূঢ় জেনো তারা
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমান।

কামনা, বিষয়, অবিদ্যা ও অহঙ্কার ইহারা সত্য-জ্ঞানের ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপন্থী। 'ব্রহ্ম' কথাটা শুনিবামাত্র অনেকে চমকাইয়া ওঠেন, মনে মনে বলেন—ও বাবা। অনেকের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া ওঠে, ভাবেন এইবার ভণ্ডামির পালা শুরু হইল। ইহার কারণ ব্রহ্মকে লইয়া সত্যই অনেক ভণ্ড যুগে যুগে বহুলোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে, এখনও করিতেছে। ব্রহ্ম শব্দটাকেই তাহারা অশুচি অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্ম না বলিয়া যদি বলি trurh তাহা হইলে অনেকে হয়তো সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কারণ আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে truth-এর সন্ধানই করিতেছি। এই truth—এই সত্যই ব্রহ্ম। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বস্তুত মানব-মনীষার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য —truth, সত্য, ব্রহ্ম। মুনি ঋষি সত্যদ্রষ্টারা যে কেবল পুরাকালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, একালেও তাঁহারা আছেন। একালের সত্য-দ্রষ্টাদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন তাঁহাদের দর্শনের সহিত সেকালের মুনি ঋষিদের দর্শনের বিশেষ কোন তফাত নাই। যম নচিকেতার নিকট ব্রহ্মের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু তাঁর নাম
বেদীতে তিনিই হোতা গৃহে তিনি অতিথি ও দ্বিজ
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তাঁর অবস্থান
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ
মহাসত্য তিনি সুমহান্।
একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।

একই বায়ু ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অমুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।
সর্বলোক-চক্ষু-সূর্য অশুচিদর্শনে যথা
না হ'ন মলিন
সর্বভূতস্থিত আত্মা নির্লিপ্ত তেমনি
জাগতিক দুঃখ মাঝে স্বতন্ত্র অ-লীন।

বাসনা কামনা রহিত হইয়া এই ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা। কারণ আর্যঋষিগণের মতে সুখশান্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ করা। ওই যমই নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

সর্বভূত অন্তরাত্মা, এক যিনি, নিয়ন্তা সবার
আপনার একরূপে করেন বহুধা
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা।
অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক কাম্য যিনি করেন বিধান
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয় তাঁহারাই চির-শান্তি পান।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই আমরা আমাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি জানিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহায্য করে। এই ব্রহ্মজ্ঞান পুস্তক পড়িয়া অথবা বক্তৃতা শুনিয়া লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within, by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrine or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details.

এই ধর্ম-অভিমুখে চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তাহার জন্য ব্রহ্মচারীকে প্রস্তুত করাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষই ছিল এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য গুরুর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম এবং প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যই গুরুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে এবং গুরু যদি শিষ্যকে উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করেন তবেই তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। এই অধিকার বিচার সে যুগে একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। এখন যেমন টাকা দিয়া যে কোনও ছাত্র যে কোনও স্কুলে ভরতি হইতে পারে তখন সে উপায় ছিল না। গুরু শিষ্যকে নির্বাচন করিয়া লইতেন। সে নির্বাচনের মানদণ্ড থাকিত তাঁহার মনে, তাঁহার নিজস্ব বিচারে, বাহিরের কোনও নিয়ম দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হইতেন না। গুরু অসাধু হইলে এরূপ নিয়মে অনেক শিষ্যের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে যুগে গুরুরা প্রায়ই অসাধু হইতেন না; যে যে কারণে লোকে সাধারণত অসাধু হয় সে সব কারণ তাঁহাদের জীবনে আসিবারই সুযোগ পাইত না, তা ছাড়া বিদ্যাদান সেকালে অর্থকরী ব্যবসায় ছিল না। যদিও মনুতে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, স্মৃতিচন্দ্রিকাতে লেখা আছে শিষ্যের ধনদানের

ক্ষমতা তাহার অন্যতম যোগ্যতা* কিন্তু ধনদানটা শিক্ষাব্যাপারে কখনও প্রাধান্য পায় নাই। বিদ্যা বিক্রেয় পণ্য নহে ইহাই ছিল আদর্শ। আধুনিক যুগেও যাঁহারা বিশেষ কোন গুণীর নিকট বিশেষ কোন বিদ্যা শিখিতে যান তাঁহাদেরও নির্ভর করিতে হয় গুরুর নির্বাচনের উপর। অর্থ বা ডিগ্রী সেখানে কোনই কাজে লাগে না। শিষ্য সেই বিদ্যালাভের অধিকারী কি না তাহাই তাঁহারা বিচার করেন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে একটা উপমা প্রচলিত আছে। গুরুর অন্তর যেন একটি জলন্ত প্রদীপ; শিষ্য নিজের অন্তর প্রদীপটিকে গুরুর প্রদীপের শিখা হইতে জ্বালিয়া লইবে। কিন্তু প্রদীপ যতই চাকচিক্যশালী বা বহুমূল্য হোক না কেন ভিতরে তৈল বা সলিতা না থাকিলে সে প্রদীপ জ্বলে না। প্রদীপে তৈলসলিতা আছে কিনা তাহার বিচারই অধিকারবিচার। বীজ বপন করিবার পূর্বে কৃষক যেমন জমির গুণাগুণ বিচার করে শিষ্যকে গ্রহণ করিবার পূর্বে গুরুও তেমনি শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। শিষ্য হইবে শ্রদ্ধাবান, সংযতেন্দ্রিয়, শুশ্রূষু, সে হইবে সাধু, শুচি এবং মেধাবী। মনুতে, ছান্দোগ্যে, গীতায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে শিষ্যের কি কি গুণ হওয়া উচিত তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। বিদ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণ একটি বহুপ্রচলিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তথৈব চ।
অল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণঃ॥

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয় ১৩৫১ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে 'প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করিয়াছেন।

সেকালে শিষ্য-মনোনয়নের ব্যাপারে আর একটি জিনিসকে তাঁহারা প্রাধান্য দিতেন—সেটি শিষ্যের বংশ-পরিচয়। এ যুগে এ নিয়ম হয়তো অচল। কিন্তু অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার Ancient Indian Education গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের মনীষীরাও এখন এই বংশ-বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন—

"The investigations of Haggerty, Nash and Goodenough show further that the educational status and vocation of the parents have a significant correlation with the level of capacity of the children, as indicated by the Intelligence Quotient. For instance, the children of the professional parents or of those of a higher academic standing, possess on the whole, a higher value of I. Q. The implications of such facts cannot be ignored in the scheme of National Education.

পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণ নানারূপ মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া সেকালের আচার্যদের মতোই ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, সকলে সকল রকম বিদ্যার অধিকারী নহেন। ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকারী হইবেনই তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা যে বেশী তাহাও অস্বীকার করা শক্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে বর্তমান সমাজের সর্ব স্তরেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্তমান। যাহারা ব্রাহ্মণপ্রকৃতির, যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত তাহাদের বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার নির্দেশও পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা আজকাল দিতেছেন। Dr. Alexis Carrel বলিতেছেন যে, বর্তমান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অবাঞ্ছিত দুর্বল লোকদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া সমাজকে এক শোচনীয়

* প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি—শ্রীবিমলাচরণ দেব—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫১।

অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। পূর্বে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দুর্বল লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সুস্থ সবলদের জন্য স্থান করিয়া দিত এখন বিজ্ঞানের জন্য তাহা হইবার উপায় নাই। তিনি বলিতেছেন—Many inferior individuals have been conserved through the efforts of hygiene and medicine. We cannot prevent the reproduction of the weak when they are neither insane nor criminal, or destroy sickly or defective children as we do the weaklings in a litter of puppies. The only way to obviate the disastrous predominance of the weak is to develop them strong. Our efforts to render normal the unfit are evidently useless. We should, then turn our attention toward promot ng in optimum growth of the fit. By making the strong still stronger, we could effectively help the weak. For the herd always profits by the ideas and inventions of the elite. Instead of levelling organic and mental inequalities we should amplify them and construct greater men. We must single out the children who are endowed with high potentialities and develop them as completely as possible. ···such children may be found in all classes of society, although distinguished men appear more frequently in distinguished families than in others ···········ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ডেমোক্র্যাটিক আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকও অধিকারী-বিচারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক কলেজে ভরতি হইবার সময় এখনও ছাত্রদের গুণাগুণ বিচার করা হয়, কিন্তু সে বিচার সাধারণত হয় পরীক্ষার নম্বর হইতে। তাহার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুই জোর দেওয়া হয় না। তাই বোধ হয় এতদিনের সর্বজনীন শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা সমাজে দেখিতেছি—

কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী
দোকানী সেতার সাধে
সেতারী লাঙল কাঁধে
কৃষকের লয়েছে ভূমিকা
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাই দেখি—

আমাদের জীবনে প্রচুর
একই ক্ষেতে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু
আতরের ছিটা দিই ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশী জন গড়ে।

আর্য-সভ্যতার যখন পতন আরম্ভ হইয়াছিল তখনও হয়তো ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শ ঠিকমতো অনুসৃত হইত না, মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ তালিকা হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এইবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

গুরুর সম্মতি পাইলে গুরু-সমীপে শিষ্যের গমনের নাম উপনয়ন—ইহা ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রথম সোপান। গর্ভের মধ্যে জননী যেমন শিশুকে গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের অধ্যাত্ম সাধনা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। তাই ব্রহ্মচারী মাত্রেই দ্বিজ এবং গুরু পিতৃস্থানীয়। শুধু পিতৃস্থানীয় নয়,

শিষ্যের জীবনে গুরুই সব। শঙ্করাচার্য তাঁহার গুরু-স্তোত্রে বলিতেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিষ্যের আদর্শ। তিনি তাঁহার চরিত্র দিয়া উপদেশ দিয়া শিষ্যের মনে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন সেই পরিবেশে শিষ্য তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইত। সে যে হুবহু গুরুকে নকল করিত তাহা নয়, গুরু তাঁহার বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ধর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—The seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water and converts them into plant-substance and grows into a plant.

গুরুও তেমনি শিষ্যের অন্তরে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন মাত্র। সে পরিবেশের মূল সুর ছিল সত্যান্বেষণ, সত্যের প্রতি, ব্রহ্মের প্রীতি মনকে উন্মুখ করিয়া তোলা। শিষ্য নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের মতো করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি করিবে, গুরু তাহাকে সে উপলব্ধির পথে পাথেয় দিবেন মাত্র। ইহা ছাড়া পরিচ্ছন্ন সুসভ্য জীবন, সুগঠিত স্বাস্থ্য, নিঃস্বার্থ কর্ম, স্বাবলম্বন, অহঙ্কার ত্যাগ, বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃত সাম্য অর্জনের প্রচেষ্টা প্রভৃতিও সে পরিবেশের অঙ্গ ছিল। সে পরিবেশের আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল প্রকৃতি। লোকালয় হইতে দূরে শান্ত প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহার নাম ছিল তপোবন। রবীন্দ্রনাথ এই তপোবন-বিষয়ের একটি সুরম্য আলোচনা করিয়াছেন। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলাঠেলি ছিল না।···তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভ'রে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়—"

উক্ত প্রবন্ধেই তিনি আর একটু পরে বলিতেছেন—"মানুষকে বেষ্টন ক'রে এই যে জগৎ প্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা ক'রে মরে···"

এই সব কারণে গুরুগৃহ লোকালয় হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইত। আর্যসন্তানগণ শৈশবে এই শান্ত

প্রাকৃতিক পরিবেশে আদর্শচরিত্র গুরুসন্নিধানে শিক্ষার জন্য উপনীত হইতেন। মনুসংহিতায় আছে গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ দ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য। অতি শৈশবকালে নিজ নিজ গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তাহারা থাকিবে। ডাক্তার Alexis Carrel এবং অন্যান্য অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ যে পারিবারিক শিক্ষাকে শিশুর মানসিক গঠনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়াছেন, সে শিক্ষাকে আর্যগণও প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শৈশবকালে নিজ নিজ পরিবারে অতিবাহিত করিয়া তবে তাঁহারা গুরুগৃহে গমন করিতেন। সে গুরুগৃহ আধুনিক স্কুল বা হস্টেলের মতো ছিল না। তাহাও ছিল তাহাদেরই গৃহের মতো গৃহ। সেখানে আদর্শচরিত্র গুরুদেব গৃহকর্তা, জননী-সদৃশা গুরুপত্নী গৃহকর্ত্রী, সেখানেও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তানসন্ততি, গৃহপালিত পশুপক্ষী যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা গৃহেরই পরিবেশ। মাতৃঅঙ্কচ্যুত হইয়া সে হস্টেল-সুপারিন্টেন্ডেণ্ট বা বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের কবলে পড়িত না। আর একটি স্নেহকোমল মাতৃঅঙ্কে স্থানলাভ করিত। গার্হস্থ্য জীবনের সমষ্টি লইয়া সমাজ। সেইজন্য শিষ্যকে একটি আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া তাহাকে সেই পরিবারের আপনজন করিয়া লইয়া তবে শিক্ষা শুরু হইত। তাই অতি বাল্যকাল হইতেই সে পরকে আপন করিতে শিখিত। গুরু ও গুরুপত্নী নিঃস্বার্থভাবে পুত্রবৎ তাহাকে পালন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই সত্যটি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে পরের জন্যই সংসার, অনাত্মীয় অতিথিই সংসারে পূজ্যতম ব্যক্তি, অনাত্মীয় শিষ্যেরাও গুরুগৃহে পরম স্নেহভাজন। গুরুর গৃহ তাহারই গৃহ। প্রতিদিন গুরুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে গুরু তাহার মানসিক প্রকৃতির সেই স্বরূপটি জানিতে পারিতেন, যাহা না জানিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এক শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ প্রত্যেকটি শিষ্যের মনের গঠন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। সেকালে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া সমাজের কল্যাণে তাহাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে সকলেই বুঝি জটাজূটধারী কমণ্ডলু-পাণি সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিত। মোটেই তাহা নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। রাজা, প্রজা, বণিক্, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা, সাধারণ গৃহস্থ সব রকম লোকই সমাবর্তন-শেষে সমাজে আসিয়া প্রবেশ করিত। সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশী ছিল না। যাহারা ছিল তাহারা প্রকৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণের যোগ্য; তাহাদের ব্যক্তিত্বই সন্ন্যাস-প্রবণ। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করাই ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইত একটি বিশেষ পটভূমিকায়, সমস্ত আর্য সভ্যতাই এই পটভূমিকার উপর অঙ্কিত। সে পটভূমিকা ব্রহ্মজ্ঞান, ইংরেজি করিয়া বলিলে বলিতে হয়—The Ultimate Reality, The Eternal Truth. বাল্যকাল হইতেই এই জ্ঞান তাহার মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইত যে, বাহিরের পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, প্রত্যেকটি সৃষ্টি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যেই তাহার মহিমা, তাহার সার্থকতা, কিন্তু একথা ভুলিও না যে সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন ব্রহ্ম, তিনিই নানারূপে নিখিল বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করিয়াছেন, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হইলেও আমরা সকলেই সেই এক একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের প্রকাশ। সমস্ত বিশ্ব যেন বহু বিচিত্র শাখাপত্রবিশিষ্ট একটা বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ, কিন্তু তাহার মূল ঊর্ধ্বে ব্রহ্মে।

সনাতন এ অশ্বত্থ নিম্নে শাখা প্রসারিয়া
উধ্বর্মূল রহে
ইনি শুক্র, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত
সর্বশাস্ত্রে কহে
অতিক্রম কেহ এঁরে না করিতে পারে
সর্বভূত স্থিত এ আধারে।

শৈশব হইতে প্রকৃত সাম্যবাদের পটভূমিকায় প্রতিটি চরিত্র বিকশিত হইত বলিয়া, ধন জন জীবন যৌবন সমস্তই নশ্বর, ব্রহ্মই শুধু শাশ্বত, অহরহ এই সত্যকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে হইত বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্যক্ বিকাশ সত্ত্বেও বিরোধ বাধিত না, অশান্তির সম্ভাবনা কম থাকিত। অন্তরের সাম্যভাবই শান্তির মূল কথা। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনেক দিন পূর্বে (কার্তিক, ১৩৩০) 'সাম্যদর্শন' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"যিনি চিৎ—যিনি পুরুষ—তিনিই আত্মা। তাঁহার সাম্যই সাধনীয়। কে সাধক আছ, সেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পার? কে সাধক আছ, অন্তরের সহিত, কেবল কথায় নহে, কেবল বাহ্যিক আচারে নহে, অন্তরের সঙ্গে সেই সাম্যে আত্মসমর্পণ করিতে পার? আমি জানি বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন 'আমি আছি' 'আমি আছি'—কিন্তু তাহা কি প্রকৃত? যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে সংসার অনেকাংশে স্বর্গতুল্য হইত, আত্মদ্রোহ থাকিত না, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব প্রকৃত নহে। সাম্য উত্তম। ধূর্ততায়, ভণ্ডতায়, বাকচাতুর্যে সে উত্তম বস্তু লাভ হয় না। যাহা উত্তম তাহা পাইতে হইলে উত্তম ভাব উত্তম সাধনা চাই। সকল জাতি মিশিয়া একত্র পান-ভোজন করা, আদান-প্রদান করা, মুখে 'ভাই' 'ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করা, ইহা তো বাহ্য আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত বাহ্য আচরণই ভণ্ডতা। অন্তর সাম্যের প্রতি ধাবিত হইলে বৈষম্য স্বয়ং হীনবল হয়, যেমন সাম্যের প্রতিষ্ঠা তেমনি বৈষম্যের বিসর্জন—যতটুকু সাম্যের বৃদ্ধি ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়, এই অনুপাতে যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে প্রথমে অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রাকৃত বৈষম্যে যাহার মন পূর্ণ সে ব্যক্তি বাহ্য আচরণে যতই সাম্য-দর্শনের পরিচয় প্রদান করুক, তাহার তাহা ভণ্ডতা মাত্র, তাহা সাম্য-সাধনা নহে। সাম্যদর্শন বৈষম্যের ভিতর দিয়াই করিতে হয়, বৈষম্যসমূহকে একত্র করিয়া অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন করিতে হয়। তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদিন বৈষম্য অন্তরে বিলীন না হইতেছে ততদিন সাম্যের ছায়াদর্শনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকল মাত্র লোককে দেখান হয়, যেমন বাঙ্গালার বারবণিতা সীতা সাবিত্রী সাজিয়া থাকে, সেইরূপ সাম্যদর্শনের একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে। যে সাম্য মহৎ উচ্চ পবিত্র সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে......"

অন্তর পরিষ্কার করিয়া প্রকৃত সাম্য-সাধনাই ছিল সেকালের শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ছিল বলিয়াই শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। আজকাল শিক্ষার লক্ষ্য আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা—লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার জন্য আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রি লাভ করিতে যাই, ডিগ্রি লাভ করিয়া দেখি গাড়ি-ঘোড়া তো দূরের কথা অন্নবস্ত্রের সংস্থান পর্যন্ত করিতে পারিতেছি না। সকলেই চাকুরি চাই। বহুকাল পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'সভ্যতার সোপানে, না জাহান্নমের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ ভাগে বাঙালী জাতির চারিত্রিক দোষ-বিশ্লেষণ করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় অর্থার্জনের সকল রকম পথই বাঙ্গালী নিজের অকর্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির

হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না। অথচ অপব্যয় করিতে বাঙালীর কুণ্ঠা নাই···"

দোষ বাঙালীর নয়, দোষ শিক্ষার। যে শিক্ষার বনিয়াদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার এই পরিণতি অনিবার্য। সেকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কোনও বস্তু বা বিষয়সম্পত্তি লাভ নয়, ব্রহ্মলাভ। শৈশব হইতেই গুরু এই আকাঙ্ক্ষাটা শিষ্যের মনে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মলাভের জন্য ডিগ্রির প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চরিত্রের, পুঁথিগত বিদ্যাও অপ্রয়োজনীয়। উপনিষদের ঋষি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন—

অসংযমী, দুশ্চরিত্র, অস্থির, অসমাহিত
অধীর অশান্তচিত্ত যিনি
জ্ঞানী হইলেও এঁরে পাবেন না তিনি।

গুরু যখন দেখিতেন শিষ্য সংযমী চরিত্রবান হইয়াছেন তখনই তাঁহাকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এই অনুমতিই ছিল সমাবর্তন, ইহাই ছিল তখন সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র।

ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করিয়া সমাজের সহিত সেই ব্যক্তিটি যাহাতে খাপ খায় এ বিষয়েও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সামাজিক অশান্তির মূলে থাকে অহঙ্কার, কামনা এবং তজ্জনিত অসাম্যবোধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, এমন কি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিলেও অহঙ্কার, কামনা, অসাম্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া বা সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগরিত হওয়া সহজ-সাধ্য নয়, সারাজীবন সাধনা করিলেও অজ্ঞানতার তিমির দূর হয় না। তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অহঙ্কার দূর করিবার একটা সহজ পন্থা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে হইত, গৃহস্থের নিকট ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিতে হইত যে অপরের দাক্ষিণ্য ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। এই বিনয়, এই সকৃতজ্ঞ নম্র মনোভাব না থাকিলে সমাজসংহতি সুন্দর শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

আজকাল ভিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও একটা কুসংস্কার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ যে ভিক্ষা পরাঙ্মুখ তাহা নহেন। আমরা বই চাহিয়া পড়ি, সুপারিশ ভিক্ষা করি, 'কন্‌সেশন' ভিক্ষা করি, ধার লইবার ছুতায় টাকাও ভিক্ষা করি—একটু মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে জীবনের প্রতিপদেই "I have the honour to beg"—ইহাই আমাদের জপ-মন্ত্র, কিন্তু ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার বেলায় আমাদের ইকনমিক্ তত্ত্বজ্ঞান জাগিয়া ওঠে, আমরা তখন idlenessকে প্রশ্রয় দিতে চাই না। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের যে সভ্যতাকে লইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াই সেই সভ্যতায় ভিক্ষা হীনবৃত্তি নহে, চরিত্রগঠনের এবং মুক্তিলাভের উপায়। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা সকলেই ভিক্ষুক। একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে বর্তমান যুগে আমরা খুব কম লোকই মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছি, কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রায় সকলকেই হীনতম ভিক্ষুকের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই বোধ হয় একজন ভিক্ষুক আর একজন ভিক্ষুকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে আশ্রমের জন্য। গৃহস্থগণও ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষা দেওয়া গার্হস্থ্যজীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখনও গৃহস্থেরা যে কর গভর্ণমেণ্টকে দেন তাহারই একটা অংশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সে নির্দেশের উপর দাতা বা গ্রহীতার কোন হাত থাকে না। দেশের শাসন-পরিষদ অনেক সময় নিজের খেয়ালখুশী-অনুসারে বাজেট করিয়া শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। এ ব্যবস্থায় সব সময় যে সুফল ফলে না, সব সময়

যে সুবিচার হয় না, তাহা আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। সেকালে গৃহস্থেরা শিক্ষার জন্য যাহা দিতেন তাহার কিছুটা অংশ শিক্ষার্থীদের হাতেই দিতেন। ভিক্ষা দ্বারা আর একটা উপকারও হইত। যে গার্হস্থ্য-আশ্রমে ব্রহ্মচারীকে পরে প্রবেশ করিতে হইবে প্রতিদিন কয়েকটি গৃহস্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহার সুখ দুঃখ আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। সে সংসারের সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়াও বুঝিতে পারিত সাংসারিক ব্যাপারে কত ধানে কত চাল হয়। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমেও এ ধারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহারা পাইত, কারণ আশ্রমের সমস্ত কাজই তাহাদের নিজের হাতে করিতে হইত। স্বাবলম্বন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষা ছিল।

বন হইতে কাঠ কাটিয়া যজ্ঞাগ্নির জন্য সমিধ সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া গো-সেবা, আশ্রমকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, কৃষিকর্মের সমস্ত কাজই ব্রহ্মচারীকে করিতে হইত। তাহার দিনচর্যাই ছিল কর্মময়। Dignity of Labour self-help প্রভৃতির উপকারিতা বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইবার প্রয়োজন হইত না। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া, প্রকৃতির নানা রহস্যের আভাস পাইয়া প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারে নিজেই নিত্য নব আবিষ্কার করিয়া সে সেই উপায়ে আনন্দময় জ্ঞান আহরণ করিত, যাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ জ্ঞান-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। রুশো বলিয়াছেন—Don't hurt him by the various sciences, but give him a taste of them and the methods for learning them.........Let him not be taught science but discover it. If you ever substitute authority for reason in his mind he will no longer reason ; he will be nothing but the playing of other people's opinion.

আচার্য কৃপালনী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন—From Bacon, Montaigue, John Locks the Eneyclopaedists up to the present day philosophers and educationists it has been one long protest against scholasticism and its divorce from Nature and Reality.

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল তাহার সবটাই ছিল Nature এবং Reality। প্রকৃতির ক্রোড়েই তাহার শিক্ষা হইত এবং যে Realityর সম্বন্ধে সে উপদেশ লাভ করিত তাহাই একমাত্র Reality, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইত বলিয়া যে মোহ সর্ব প্রকার অনর্থের মূল সে মোহ তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার অবকাশ পাইত না। Alexis Carrel বলিয়াছেন বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষ আত্মসম্মানহীন, অসহায় nameless grains of dust. কিন্তু শিক্ষা যদি সত্য আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে হয়, শিক্ষা যদি বারংবার আশ্বাস দেয়—তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি মহতো মহীয়ান্, তুমি অক্ষয় অমর, তুমিই ব্রহ্ম, সাধনা করিলেই তুমি তোমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিবে, তোমার বিকশিত বৈশিষ্ট্য তোমাকে যে পথেই চালিত করুক না কেন, তুমি একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে তোমার লক্ষ্য—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে"। এই শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী যদি বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, অহঙ্কারশূন্য হইতে পারে তাহা হইলে নিজেকে কিছুতেই সে আত্মসম্মানহীন অসহায় nameless grain of dust মনে করিবে

না। তাহার বরং মনে হইবে—আমি তুচ্ছ নই, সোঽহম্। মনে হইবে—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
　ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু
　শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন, আর্যদের শিক্ষাবিধি যদি এমনই চমৎকার ছিল, তাহা হইলে আর্যসভ্যতার পতন হইল কেন? ইহার ঐতিহাসিক একাধিক কারণ আছে, সে সব বিবৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। উত্তরে একটি কথাই শুধু বলিব আদর্শচরিত্র মানবের জীবনেও যেমন উত্থান-পতন আছে আদর্শ সভ্যতার জীবনেও তেমনি উত্থান-পতন আছে। ইহা অনিবার্য। আধিভৌতিক মানদণ্ডে বিচার করিলে মনে হইতে পারে আর্যসভ্যতার পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার আদর্শের মৃত্যু হয় নাই। চারি সহস্র বৎসরের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও এ সভ্যতা এখনও সজীব আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—Sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundation, but like the waters of the sea-shore in a tremendous earth-quake it receded only for a while, only to return in an all absorbing flood, a thousand times more vigourous and when the tumult of the rush was over, these sects were all sucked in, absorbed and assimilated into the immense body of the mother faith..."

এই Mother faith বহু বিচিত্ররূপে এখনও ভারতের সর্বত্র বিদ্যমান। বারট্রাণ্ড রাসেল, জোয়াড., আলডুস্ হাক্স্লি, রম্যা রলাঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের লেখা পড়িলে মনে হয় ভারতের বাহিরেও ইহার মহিমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এ দেশের মুষ্টিমেয় ট্যাঁস্-মার্কা কিছু লোকের মধ্যে এই faith-এর মহত্ব হয়তো কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরে আর্যধর্মের মহত্ব আর্যসভ্যতার আদর্শ আজও দেদীপ্যমান। মূর্খতম ভারতীয় হিন্দুর সহিতও আলাপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন তাহার অন্তরের অন্তরতম তন্ত্রে এই সভ্যতার সুরটি ঠিক বাজিতেছে।

আমি অবশ্য একথা বলিতে চাহি না যে, এই আর্যধর্মের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেকটি মানুষ মহাপুরুষ হইয়া উঠিবে। কোনও শিক্ষার আদর্শই সমস্ত মানুষকে একযোগে মহাপুরুষে পরিণত করিতে পারিবে না। মানুষ বড় জটিল জীব। প্রত্যেককে নিজের সাধনায় নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে ধীরে ধীরে জটিলতা-মুক্ত হইতে হয়। যে মহাভারতে আমরা আর্যসভ্যতার একটা চিত্র দেখিতে পাই, সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র কি মহাপুরুষ-চরিত? হিংসা-জর্জরিত কৌরবদের সহিত ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদের যুদ্ধই তাহার বিষয়বস্তু। কিন্তু পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-কীর্তনই মহাভারতের চরম বক্তব্য নহে। মহাভারতের চরম বক্তব্য শান্তিপর্বে, যেখানে রাজ্যলাভ করিয়াও যুধিষ্ঠির অনুতপ্ত চিত্তে আত্মীয়-নিধন-শোকে আকুল হইয়া সংসার-ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গিয়াছেন, যেখানে পিতামহ তাঁহাকে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে নানা গল্প বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—"রাজা প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আত্মজয়ী হইবেন, তাহার পর শত্রু জয় করিবেন। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম," যেখানে তিনি বলিতেছেন—জীবের বিনাশ নাই, দেহ নষ্ট হইলে জীব দেহান্তরে গমন করে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার পর অগ্নি যেমন

অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীর ত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে।"

এই সত্য ধর্মই আর্যধর্ম, ইহারই উপর সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে এ শিক্ষা সত্ত্বেও সেকালে দুষ্ট লোকের, বা অসুখী লোকের অভাব ছিল না। শিক্ষা বা ধর্ম একটা আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারে। সেকালে শিক্ষার আদর্শ কি ছিল তাহাই আমি এ প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অনেকে বলেন এই বৈরাগ্যমূলক মনোবৃত্তিকেই আধুনিক যুগে escapism বলে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত ?

আর্যশিক্ষা যে বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে, গীতায় উপনিষদে যে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত তাহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে, তাহা সুস্থ সবল কর্মীর মনোবৃত্তি, তাহা অপরাজেয় যোদ্ধার মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্মকথা পুস্তকে বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। আর্য সভ্যতার মর্মবাণী সে আলোচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"কর্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই, আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্তব্যবোধে কর্মাচরণ কর, ফল কামনা করিও না, কর্মত্যাগে কিন্তু তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল সেকালের বৈরাগ্য, সেকালের কর্মসন্ন্যাস। সে কালের, যে কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল, মনুষ্য নির্ভীকচিত্তে বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; জগতে যাহা কিছু আছে তাহা আত্মার ঈশিত দ্বারা আবৃত এই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুদ্ধজ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি, ভক্তি, তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল। ...সংসারের শোণিত-কর্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া আততায়ীর নিক্ষপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষালাভ হয় তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি..."

এই মনোভাব পলায়নী মনোভাব নহে।

শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় কিছুকাল পূর্বে "বেদ-সংহিতায় নৈতিক আদর্শ" নামক চমৎকার একটি প্রবন্ধে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতি হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, প্রাচীন আর্যগণের জীবনদর্শন কত সুস্থ, কত সবল, কত প্রাণ-দীপ্ত ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির আভাসমাত্র তাহাতে নাই। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল "পশ্যেম শরদঃ শতম্. জীবেম শরদঃ শতম্" আমরা যেন শত শরৎ দেখি, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি; জীবনের বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহারা পলায়নপর হন নাই, নির্ভীককণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং
বীরয়ধ্বং এ তরতা সখায়ঃ।

প্রস্তরসঙ্কুল জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মতো চল। এ নদী উত্তীর্ণ হও।

দেবতার নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল—

তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও,
তুমি বীর্যস্বরূপ আমাকে বীর্য দাও,
তুমি বলস্বরূপ আমাকে বল দাও,
তুমি ওজঃস্বরূপ আমাকে ওজঃ দাও,
তুমি মন্যুস্বরূপ আমাকে মন্যু দাও,
তুমি সাহসস্বরূপ আমাকে সাহস দাও।

জীবন যুদ্ধে তাঁহারা বীরের মতো অগ্রসর হইয়া জয় কামনা করিতেন—

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ
যুদ্ধন্তে যস্যামা ক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ
সা নো ভূমি প্র নুদতাং সপত্না ন সপত্নং
মা পৃথিবী কৃণোতু।

যাহাতে মানবেরা কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে, যাহাতে তাহারা যুদ্ধ করে, যাহাতে রণগর্জন হয়, দুন্দুভি বাজে, সে ভূমি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সরাইয়া আমাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী করুক। বলা বাহুল্য ইহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে। কিন্তু তাঁহারা যে পাপপুণ্যবোধহীন বিষয়ী ছিলেন না তাহার প্রমাণও ওই ঋগ্বেদেই আছে। মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকিয়া, ওই বৈদিক ঋষিগণই প্রার্থনা করিতেছেন—যাহা ভিন্ন কোন কর্ম করা যায় না আমার সেই মন মঙ্গলেচ্ছাযুক্ত হোক। হে পূজ্য দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা শুনি, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা দেখি।"

সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে প্রাচীন আর্যগণ যে জীবন-দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শান্তি ও আনন্দের সন্ধান করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু নমুনা দিতে গিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। পরিশেষে একটি কথা শুধু বলিতে চাই। কেহ যেন মনে না করেন যে অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি করিতেছি। সে প্রয়াস যে হাস্যকর তাহা আমি জানি। ইহাও আমি জানি বর্তমানই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বর্তমানের সমস্যা, বর্তমানের জীবন-স্পন্দন, বর্তমানের সুখ-দুঃখ-জটিলতার একটা বিভিন্নতা আছে, অতীতের মহিমাকীর্তন করিয়া বর্তমানের সে বৈশিষ্ট্য আমি ভুলিয়া যাইতে চাহি না। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনভূমি বর্তমান। অতীতের অভিজ্ঞতাকে বর্তমান ত্যাগ করিতে পারে না, যে সব শাশ্বত সত্য অতীতকালে আবিষ্কৃত হইয়া মানবকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল তাহা অতীতকালে হইয়াছিল বলিয়াই বর্জনীয় নহে। বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকেও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়াই সমাধান করিতে হইবে। অতীতকালে লব্ধ জ্ঞানকেই বর্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমাদের বারংবার এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে কথা আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বহুপূর্বে বহুবার বলিয়াছেন যে ধর্মই আমাদের জীবনপথের প্রধান পাথেয়। এ যুগের মনীষীরাও ঠিক ওই কথাই বলিতেছেন। Joad এর God and Evil পুস্তক হইতে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—Men, in short require to be comforted and re-assured and for this purpose they invoke forces of reassurance which are felt to be both eternal and unchanging. From this conflict of and combination between these various factors God emerges to satisfy our desires and fulfil our needs. আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্ম চাই, ভগবান চাই—এ তথ্য চিরপুরাতন, চিরনূতন।

কি করিয়া ধর্মবোধকে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে জাগ্রত করা সম্ভব, আদৌ তাহা সম্ভব কি না, তাহার বাধা কোথায়, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিব। ক্রমশঃ

"আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জিজ্ঞাসা

শ্রীমতী দীপালি দেবী

কবে, তোমায় স্মরি আসবে প্রভু
আমার চোখে জল
শুনবো কবে তোমার বাণী,
তোমার রাতুল চরণধ্বনি
স্তব্ধ করি বিশ্ব কোলাহল।

প্রভু, আমার এমন দিন কি হবে—
তোমার সাথে কইব কথা যবে—
শান্ত হবে হৃদয় চঞ্চল।

কবে, তোমায় আমি শোনাব মোর গান,
ভুলে সকল গভীর ব্যথা সকল অভিমান,
তোমার প্রেমে উঠবে ফুটে
চিত্ত শতদল॥

করুণা

শ্রীমতী পুষ্প বসু

সেদিন তোমায় চাইনি প্রভু
নিবিড় ক'রে।
সেদিন তোমায় বাসিনি ভালো
আবেগ ভরে॥

সেদিন তোমায় দেখিনি ফিরে
নয়ন মেলে।
সেদিন তোমায় করিনি পূজা
পরাণ ঢেলে॥

সেদিন তোমায় নিইনি খুঁজে
মানস-পুরে।
সেদিন তোমায় ডাকিনি কাছে
প্রেমের সুরে॥

তবুও আমায় রেখেছ প্রভু
তোমার ছায়ে।
তবুও আমায় নিয়েছ ডেকে
রাতুল পায়ে॥

তবুও আমায় বেসেছ ভালো
দুখের সাঁজে।
তবুও আমায় দিয়েছ দিশা
জীবন মাঝে॥

তবুও আমায় করেছ সুখী
প্রাণের গানে।
তবুও আমায় ভরেছ তুমি
অতুল দানে॥

শ্রমণ অহিংসক

শ্রীজয়দেব রায় এম্-এ, বি-কম্

ভগবান বুদ্ধের জীবনব্রত ছিল পাপীকে পাপমুক্ত করা, দুর্জনকে সাধু সজ্জনে পরিণত করা, লোভীকে নির্লোভ ত্যাগীতে রূপান্তরিত করা। তাঁহার কৃপায় দস্যু রত্নাকরের মতন, ডাকাত কেনারামের মতন হিংস্র অঙ্গুলিমালও সাধু শ্রমণ অহিংসকে রূপান্তরিত হইয়া ধর্মকার্যে আত্মোৎসর্গ করেন।

কাশীরাজ এবং কোশলরাজের রথ একবার এক সংকীর্ণ পথে বাধিয়া যায়। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা বিচারকল্পে উভয়ের সারথি নিজ নিজ প্রভুর গুণকীর্তন করিতেছিল। কাশীরাজের সারথি বলিল,—"আমার প্রভু সাধুলোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, কিন্তু দুরাত্মার কাছে তিনি বজ্রের মতো কঠোর।"

কোশলরাজের সারথি হাসিয়া বলিল—"তাইতো স্বাভাবিক; কিন্তু আমার প্রভু ক্রোধীকে অক্রোধে, লোভীকে নির্লোভতায় জয় করেন। অসতের সঙ্গে সৎ ব্যবহার ক'রে, দুরাত্মাকে নিজ পুণ্যের অংশ দান ক'রে তিনি বশীভূত করেন।"

ভগবান বুদ্ধ সেইভাবেই দেশজোড়া হিংসাকে দূর করেন, কত দুর্জন দুরাত্মা হিংস্রক তাঁহার পূত আশীর্বাদে সজ্জন, পুণ্যাত্মা, অহিংসকে পরিণত হইয়াছেন। ধনী শ্রেষ্ঠী এবং রাজারাই যে কেবল তাঁহাদের ধনরত্ন, রাজ্যসম্পদ, ঐহিকসুখ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাই নয়; তাঁহাদের অপেক্ষা কঠোর ত্যাগ করিয়া দস্যু তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, নিষ্ঠুর হিংস্র নরহত্যাকারী মহাপাপী তাহার জিঘাংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছে। অঙ্গুলিমালও ছিল এই ধরণের এক দুরাচার, দুর্বৃত্ত দস্যু।

তাহার অত্যাচারে সমগ্র জনপদ ভয়ে কম্পমান থাকিত, প্রজারা বিব্রত হইয়া ঘরবাড়ী ফেলিয়া ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে উদ্ধার করিলেন, তাঁহার প্রসাদে সেই দস্যুই সাধু অহিংসকরূপে জনপদবাসীর সেবায় পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

অঙ্গুলিমালের পিতা ভার্গব ছিলেন কোশল-রাজের প্রধান পুরোহিত; তিনি এবং তাহার স্ত্রী উভয়েই অতি সাধুপ্রকৃতির ছিলেন। অঙ্গুলিমালের আসল নাম ছিল অহিংসক—প্রথম জীবনে না হইলেও শেষ জীবনে তাহার নাম সার্থকতা লাভ করে। দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে চারিদিকে যেমন দুর্লক্ষণ দেখা যায়, অহিংসকের জন্মক্ষণেও সেইরকম অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র আপনা হইতেই সংঘর্ষিত হইয়া ভীষণ অগ্নি উৎপাদন করে। সাধু ভার্গব ভীত হইয়া নবজাতককে ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। রাজা কিন্তু এই কথা শুনিয়া বাধা দিলেন—

"আপনি রাজগুরু, আপনি যদি পুত্রত্যাগ করেন, প্রজারা কুদৃষ্টান্ত ব'লে ধরে নেবে। তাহ'লে শাসনকার্যে আপনার সুনামের, গৃহস্থের গার্হস্থ্য-প্রশান্তির এবং রাজশক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হবে। আপনি দ্বিধাহীন ভাবেই পুত্রের লালনপালন করুন।"

অল্পদিন পরেই দেখা গেল অহিংসক যথার্থই বুদ্ধিমান, শান্ত, সুশীল বালক। ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র এবং শস্ত্র বিদ্যায় তাহার নিপুণতা প্রকাশ পাইল। সুযশে তাহার নাম ভরিয়া গেল, তাহার জন্মক্ষণের দুর্লক্ষণের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল।

তক্ষশিলায় এক বিখ্যাত অধ্যাপকের গৃহে

অহিংসক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিত। তাহার মেধা এবং রূপগুণের কাছে সহপাঠীরা সকলেই পরাস্ত হইল। ঈর্ষ্যায় জর্জরিত হইয়া তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল।

অধ্যাপকের স্ত্রী অহিংসকের প্রতি স্নেহানুরক্ত ছিলেন। অহিংসকও তাঁহাকে নিজের মাতার মতনই ভক্তি করিত। সহপাঠীরা এই ব্যাপারকে কলুষিত রূপ দিয়া অধ্যাপকের কানে তুলিল।

অধ্যাপক সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ছাত্রকে অভিশাপ দিলেন—"শাস্ত্রে তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার থাকবে না, শস্ত্রবিদ্যায় তুমি নরহত্যা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবে। এক সহস্র নিরীহ পথিকের বৃদ্ধাঙ্গুল সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তোমার মুক্তি নেই।"

নিরীহ নিরপরাধ অহিংসক মিথ্যা অপবাদ এবং গুরুর অভিশাপ মাথায় করিয়া জনপদ ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় লইল। বনের এক অংশে বহু দেশ হইতে বহুপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে, দলে দলে পথিক কর্ম-ব্যপদেশে দিবারাত্রি বন অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিত। অহিংসক তাহাদের হত্যা করিতে লাগিল নির্বিচারে। গুরুর অভিশাপে বাধ্য হইয়াই সে নরহত্যা শুরু করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সাধুবৃত্তি সমস্তই সমূলে উৎপাটিত হইল। সমস্ত জনসমাজের উপর এক বিজাতীয় ক্রোধ, ঘৃণা এবং হিংসার ভাব তাহার মনকে অধিকার করিল, নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পথিককে হত্যা করিয়া সে পৈশাচিক আনন্দ পাইত।

সমগ্র দেশে ভয়ভীতির সঞ্চার হইল, পারতপক্ষে কেহই আর দেশে পথে বাহির হইতে চাহিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়াই লোককে বন অতিক্রম করিতে হইত, দেশের আভ্যন্তরীণ চলাচল তো বন্ধ থাকিতে পারে না। অঙ্গুলি-সংগ্রাহক দস্যু তখন 'অঙ্গুলি-মাল' নামে পরিচিত হইয়াছে।

রাজা প্রসেনজিৎ নানাভাবেই দুর্বৃত্তকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায় সবই বৃথা! অঙ্গুলিমালের পরাক্রমে রাজশক্তি পরাস্ত হইল।

রাজপুরোহিত বহু পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন—অদৃষ্টকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তাঁহার সেই দুর্গ্রহে জাত পুত্রই আজ সমগ্র রাজ্যের শঙ্কাস্থল। পুরোহিত-পত্নী সংকল্প করিলেন তাঁহার গর্ভলজ্জার হাতে তিনি নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন। অঙ্গুলিমাল-জননী একাকী তাহার উদ্দেশ্যে চলিলেন।

ভগবান বুদ্ধ এইসময়ে জেতবনে বিহার করিতেছিলেন। অঙ্গুলিমালের জননী পুত্রের হাতে জীবনোৎসর্গ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন। তাহার পূর্ববৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া বুঝিলেন, এইবার তাহার সৎপথে আসিবার সময় হইয়াছে পাপের পাত্র আজ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে তিনিও যাত্রা করিলেন পাপীকে উদ্ধার করিতে, পাপকে দূর করিতে।

তখনও পর্যন্ত অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ জন নিরীহ পথিককে হত্যা করিয়াছে, আর একজনকে হত্যা করিলেই তাহার ব্রত সিদ্ধ হয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া একটিও শিকার না পাইয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজচ্যুত, ধর্মহীন, নিঃসঙ্গ দস্যু তাহার নিজের পাপনেশাতেই মত্ত হইয়াছিল; স্বাভাবিক জীবন তাহার কাছে এখন সম্পূর্ণ নিরর্থক; নিশ্চিন্ততার অবকাশ তাহার ছিল না।

এমন সময় ভগবান বুদ্ধ তাহার সম্মুখ দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে চলিয়া গেলেন, অঙ্গুলিমাল তখনই তাহার ভীষণ খড়্গ লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিল। পশ্চাৎ হইতে যতবারই দস্যু তাঁহাকে আঘাত করিতেছে—কিন্তু একি! তাঁহার দেহ তো স্পর্শ করা যাইতেছে না! অঙ্গুলিমাল বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"কে তুমি? দাঁড়াও, আমার ব্রত পূর্ণ করি।" ভগবান থামিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া তাহার মস্তকে কৃপাহস্ত রাখিলেন। বহুদিন

পর দস্যু মমতার স্পর্শ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার অবশ হাত হইতে নরহত্যাকারী খড়্গ খসিয়া পড়িল, সে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

করুণাবিগলিত করুণাঘন ধীরে ধীরে তাহাকে ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন—ধর্মহীন দুরাত্মার মনে তাহার গতজীবনের সুকৃতির কথা স্মরণ হইল। মন্ত্রমুগ্ধ অনুতাপী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া চলিতে লাগিল। প্রভু তাহাকে সত্যধর্মে দীক্ষা দিলেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল বহুদিন পরে শ্রমণ অহিংসকে পরিণত হইলেন।

রাজা প্রসেনজিৎ দস্যুর বহুদিন খোঁজখবর না পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে এইবার তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আয়োজন করিলেন। যুদ্ধজয়ের পূর্বে ভগবানের আশীর্বাদ লইবার জন্য তিনি জেতবনে আসিলেন।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"কি রাজা, বোধ হচ্ছে তুমি কোনো রাজ্যজয়ের অভিযানে যাত্রা করেছ!"

রাজা বিব্রত বোধ করিয়া বলিলেন—"না প্রভু, একজন দস্যুকে বন্দী করবার এই আয়োজন।"

প্রভু বলিলেন—"তা হ'লে আর তোমার যাবার প্রয়োজন নেই, সে দস্যুর মৃত্যু হয়েছে।"

এই বলিয়া তিনি যেখানে অহিংসক ধ্যান করিতেছিলেন, রাজাকে সেখানে লইয়া গেলেন। রাজা মহাবিস্ময়ে বলিলেন—"একি! এই তো সেই বর্বর দস্যু!"

ভগবান বলিলেন—"না, এ অন্য লোক। দস্যুর জীবন শেষ হয়েছে, সাধুর জীবনের শুরু হয়েছে। এঁর যোগ্য সম্মান দিতে তুমি কুণ্ঠিত হ'য়ো না।"

রাজা তাঁহার কণ্ঠহার দিয়া সম্মান করিতে গেলে অহিংসক সসঙ্কোচে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি তখন সকল পার্থিব কামনা বাসনার অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করিতেছেন।

বুদ্ধশিষ্য অহিংসক প্রভুর নাম জনপদবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার পূর্বকৃত হিংস্রতার কথা তখনও লোক ভুলিতে পারে নাই, তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে ঘৃণায় লোকে দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল।

তখনও আর এক পরীক্ষা বাকি; সত্যসত্যই তিনি পূর্বজীবনকে অতিক্রান্ত করিয়া আসিয়াছেন কিনা! একদা নগর-উপকণ্ঠে এক কুৎসিতা রোগগ্রস্তা রমণী পথের উপর প্রসবযন্ত্রনায় অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে বিহারে ফিরিয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন, "প্রভু, ওকে উদ্ধার করুন।"

শত শত নিরীহ পথিকের যন্ত্রণাদায়ক নৃশংস হত্যাকারী আজ একটি সামান্যা রমণীর স্বাভাবিক কষ্টদৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না!

অমিতাভ বলিলেন—"ওর যন্ত্রণার উপশম একমাত্র তুমিই করতে পারো। তুমি দ্বিধা-সংকোচ-হীন ভাবে ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে সত্যভাষণ করো—"আমি যদি কোন দিন পাপ ও হিংসা না করে থাকি, তবে আমার পুণ্যের সমগ্র অংশের কল্যাণে এ রমণীর যন্ত্রণার অবসান হোক্, এবং বিনাকষ্টে এ ইন্দ্রোপম সন্তানের জন্ম দিক্।"

অহিংসক ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"কিন্তু প্রভু, সে কথা তো সত্য নয়! আমি যে কত শত শত নিরীহ প্রাণকে খেলার ছলে হত্যা করেছি; আমার যে পুণ্যের এক কণাও সম্বল নেই!"

তবু ভগবান যখন বলিয়াছেন অহিংসক নির্বিশঙ্ক-চিত্তে তাঁহার কথার পুনরুক্তি করিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইল, সে নির্বিঘ্নে প্রসব করিল।

শ্রমণ বিহারে ফিরিয়া ভগবানকে বলিলেন—"প্রভু, আমি তো মিথ্যাভাষণ করে এলাম?"

প্রভু বুদ্ধ সস্মিতবদনে বলিলেন—"না, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার তো পুনর্জন্ম হয়েছে, গত জীবনের ক্লেদ-পঙ্কিল মুছে গিয়েছে, পরহিতে জীবনসেবায় তোমার এ জীবন এখন উৎসৃষ্ট।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেতে—
ঘুরছে আমার মন,
লাগলো দুটি চক্ষে আমার
অমৃত অঞ্জন।

পেলাম আমি এমন শুভ দৃষ্টি,
সবই আমার লাগছে বড় মিষ্টি,
বুকের মাঝে হাজার ময়ূর
করছে রে নর্তন।

২

সত্য হলো 'ঠাকুর দেখা'
সফল হল যাওয়া,
কম লোকেরি ভাগ্যে ঘটে
এমন কৃপা পাওয়া।

দুর্লভেরে হঠাৎ পাওয়া এ যে,
আনন্দে বুক চক্ষু আমার ভেজে,
আপনাকে যাই যে ভুলে
আমি ক্ষণে ক্ষণ।

৩

কাঠ পাথর, কি চুণ বালি নয়—
ভাব দিয়ে এ গড়া,
ধরার মাঝে নূতন যে এক
কান্তিমতী ধরা।

অনুভবে মিলিয়ে আমি যাই।
সে সায়রের থই আমি না পাই
তৃণ কুসুম পারিজাতের
পাই যে আলিঙ্গন।

"সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমনভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন করিতে পারে। পাঁচটি সৎভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবল একটি পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রতীকোপাসনা মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

এক্ষণে আমরা একটু অবান্তর বিষয়ের বিচার করিয়া লইব—এই অধ্যাস ও সম্পদুপাসনার স্তর অতিক্রম করিবার পূর্বেই যদি সাধকের দেহত্যাগ হয়, তাহার কি গতি হইবে? সাধক মোক্ষকামী বা ভগবদ্দর্শনকামী হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবদ্দর্শনের পূর্বে শরীর ত্যাগ হইলে তাঁহার সমস্ত সাধনাই কি বিফল হইবে? তদুত্তরে "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" (গীতা ৬।৪০) ইত্যাদি ভগবদ্বচনের অনুসরণ করিয়া বলিব—দেবযানমার্গে তাঁহাদের দেবলোকে গতি ও তথায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া মনুষ্যলোকে পুনরাবৃত্তি হয় এবং স্বকর্মোচিত কুলে জন্মগ্রহণ করেন (গীতা ৬।৪১-৪২), ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে "নাম ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপাসকেরও তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা কিন্তু সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এইপ্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে, কারণ "নাম ব্রহ্ম" ইত্যাদি প্রতীকোপাসক মোক্ষকামী নহেন, ব্রহ্মক্রতুও নহেন, সাংসারিক কোন বিশেষ ফলকামনা-বশেই তাঁহারা তাদৃশ উপাসনা সকলের অনুষ্ঠান করেন। আমাদের প্রস্তাবিত এই স্মার্ত উপাসক কিন্তু 'ব্রহ্মক্রতু'—ব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মকে জানিবার জন্যই তিনি অধ্যবসায়শীল। সুতরাং 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' ইত্যাদি প্রতীকোপাসনা হইতে এই স্মার্ত ব্রহ্ম-উপাসনার প্রভেদ আছে। আবার উপাসনাও ক্রিয়াবিশেষ, সুতরাং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ন্যায় তাহাও অদৃষ্টের উৎপাদক। আর এইজাতীয় কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা যে অদৃষ্টদ্বারে ফলপ্রদান করে, ইহা উত্তরমীমাংসার ৩।৩।৩৫ কাম্যাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬)—'উপাসনার দ্বারা দেবলোকে গমন হয়', এইপ্রকার শ্রুতিও আছে কিন্তু দেবযানমার্গে গমন ব্যতিরেকে দেবলোকে গমন সম্ভব নহে। আবার "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে"—(গীতা-৬।৪৪) ['ব্রহ্মবিদ্যারূপ'] যোগবিষয়ক জিজ্ঞাসুও বেদোক্ত কর্মফলকে অতিক্রম করে', ইত্যাদি স্মৃতিবচন-বলে এতাদৃশ সাধকের পক্ষে বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানকারিগণের প্রাপ্য যে পিতৃযানমার্গে চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্তি, তাহাও কল্পনা করা যায় না। আর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ফলে যে দেবলোক লাভ হয় না, ইহাও বলা যায় না, কারণ "আকাশ ব্রহ্মোপাসনা" (ছাঃ ৭।১২।২) ইত্যাদি কোন কোন তজ্জাতীয় উপাসনাতে জ্যোতির্ময় দেবলোকলাভাদি * ফলসকলও বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল যুক্তি ও শ্রুতিবাক্য-বলে প্রতীকাবলম্বনে এতাদৃশ

* ইদানীন্তনকালে কেহ কেহ বলেন—এই দেবলোক ও ব্রহ্মলোক ইত্যাদি ভ্রমমাত্র, ইহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব—তোমাদের এই পৃথিবীলোক এবং তোমাদের এই সুখদুঃখাদি সত্য অথবা ভ্রম? ইহা যে সত্য ইহা তাহাদিগকে বলিতেই হইবে। এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তবে স্বর্গাদিলোকই বা ভ্রম হইবে কেন? এই পৃথিবী তোমার নিকট যতটা সত্য, স্বর্গাদিলোকবাসিগণের নিকট স্বর্গাদিও ততটাই সত্য। এই পৃথিবী যদি তোমার নিকট সত্য হয়, স্বর্গাদিই বা স্বর্গবাসীর নিকট মিথ্যা হইবে কেন? আর পৃথিবীলোক যে ভ্রমাত্মক, নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান উৎপত্তির পূর্বে, ইহা তুমি বলিতেই পার না। বলিলে, তাহা কথার কথা বা মিথ্যাভাষণমাত্র হইবে। ব্রহ্মবস্তু ব্যতিরেকে সমস্তই মিথ্যা বলিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তির পর ইহলোক ও স্বর্গাদিপরলোক সমস্তই মিথ্যা ও ভ্রমমাত্রে পর্যবসিত হয়, তাহার পূর্বে নহে।

ব্রহ্মোপাসকের দেবযানমার্গে উচ্চাবচ দেবলোকে গমন স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অদৃষ্ট কখনও বিফল হইতে পারে না। তবে "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫) এই সূত্রোক্ত ন্যায়বলে এতাদৃশ প্রতীকোপাসকের গম্য লোক যে বিদ্যুল্লোকের নিম্নবর্তী কোন দেবলোক, ইহাই নিশ্চিত হয়, কারণ বিদ্যুল্লোকের উর্ধ্বে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮।১-৪, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।৩৩ এবং পাতঞ্জলদর্শনের ৩।২৬ ব্যাসভাষ্যে নানাপ্রকার দেবলোকের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। পুরাণবিদ্‌গণ এই বিষয়ে আরও আলোকসম্পাৎ করিতে সমর্থ। অধ্যাসোপাসকাপেক্ষা সম্পদুপাসকের লভ্য দেবলোক যে আরও উর্ধ্ববর্তী এবং তাঁহার প্রাপ্য স্বর্গসুখও যে অধিকতর হয়, ইহাও এই উভয়প্রকার সাধকের সাধনার তারতম্যদৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক প্রতীকাবলম্বনা হইলেও এতাদৃশ ব্রহ্মোপাসনার ফলে সাধকের দেবলোকপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইলে যে উত্তরমীমাংসা-ন্যায়ের বিরোধ হয় না, ইহা নিশ্চিত হইল।

[স্মার্ত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনার অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি]

ইহা গেল অবান্তর বিচার। এক্ষণে আমরা পুনরায় প্রস্তাবিতের অনুসরণ করিব। দেবতা-প্রতিমাদিরূপ প্রতীকালম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত যে সাধকের নিকট প্রতীকটি অপ্রধান এবং উপাস্য দেবতাই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে, তাদৃশ সাধকের মন সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। লৌহ যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এতাদৃশ সাধকও তদ্রূপ প্রতীকাদি সমস্ত আলম্বন ত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বাভ্যন্তরবর্তী পরম প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত হয়। সেই বিষয়ে শাস্ত্র এই—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥
বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৪।২৫-২৬)

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনিম্।
বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥" (বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৩০)

পুনঃ পুনঃ অঞ্জনযোগে চক্ষু যেমন [দোষ ত্যাগ করত] সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ মদীয় পবিত্র চরিত্রের কীর্তন ও শ্রবণাদি দ্বারা আত্মা (-অন্তঃকরণ) পরিশোধিত হয় এবং সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। যিনি বিষয়ের চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয়সকলে আসক্ত হয়, আমাকে চিন্তা করিলে কিন্তু চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়।" "সেই ব্রহ্ম, ধ্যানশীল মুনিকে আত্মভাবে গ্রহণ করেন (—নিজস্বরূপে লীন করিয়া লন), যেমন চুম্বক নিজের শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লৌহকে নিজের সহিত যুক্ত করিয়া লয়।" সেই পরম প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিতচিত্ত সাধক কোন কোন অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহিত একীভূত হন, শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন—

"তবৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

'সাধনাভ্যাস পরিপক্ব হইলে ভগবানে শরণাগতি 'আমি তাঁহার', 'তিনি আমার' এবং 'তিনিই আমি'—এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে।' ভক্তির অল্প উন্মেষে সাধক মনে করেন—'আমি ভগবানের।' ভক্তির প্রাবল্যে সাধক মনে করেন—'ভগবান আমারই।' আর প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইলে 'তিনিই আমি', সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু 'তিনিই আমি' এই যে সাধনের পরিপকাবস্থা, তাহা সহজলভ্য নহে। কি প্রকারে তাহা লব্ধ হয়, শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন—

"ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম কুর্বতঃ।
নাপয়াতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা॥" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৮৭)

"তিনি গমন করিতেই থাকুন বা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকুন, অথবা স্বেচ্ছায় কোন কর্মের অনুষ্ঠানই করুন, শ্রীভগবানের মূর্তি আর তাঁহার চিত্তমন্দির হইতে দূরে যাইতে পারে না। এই প্রকার যে অবস্থা ইহাকে সাধকের ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা মনে করিতে হইবে।" এই অবস্থা প্রাপ্তির পর সাধককে আরও সূক্ষ্মাবস্থাতে লইয়া যাইবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্॥
যদা চ ধারণা তস্মিন্ অবস্থানবর্তী ততঃ।
কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ॥
তদেকাবয়বং দেবং সোঽহংং চেতি পুনর্বুধঃ।
কুর্যাৎ ততো হ্যহমিতি প্রণিধানপরো ভবেৎ॥* (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৮৮—৯০)

"অনন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও ধনুকাদিরহিত, কিন্তু অক্ষমালা ও যজ্ঞোপবীতযুক্ত শ্রীভগবানের প্রশান্ত রূপকে (ধ্যান) করিবেন। যখন সেইরূপে ধারণা (চিত্তের স্থিরীভাব) স্থায়ী হইবে, তখন শ্রীভগবানের মূর্তিকে কিরীট, কেয়ূর ইত্যাদি ভূষণরহিতভাবে স্মরণ (—ধ্যান) করিবেন। তদনন্তর [পদযুগল, গুল্ফ, হাস্যবিকসিত মুখমণ্ডল ইত্যাদি] এক একটি অবয়বযুক্ত দেবতাকে চিন্তা করিবেন (তাঁহার এক একটি অবয়বে চিত্তসমাধান করিবেন)। ধীমান্ ব্যক্তি অতঃপর "তিনিই আমি" এইপ্রকার ধ্যান করিবেন; তদনন্তর "আমি" ('আমিই তিনি')— এইপ্রকার ধ্যানশীল হইবেন।"

লক্ষ্য করিতে হইবে—সাধক এক্ষণে বাহ্য প্রতিমাদি প্রতীকসকলকে ত্যাগ করিয়া স্বীয় হৃদয়মন্দিরে মনোময়ী প্রতিমাতে 'অহংগ্রহোপাসনাতে' প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও অহংগ্রহোপাসনা' এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—

* এই পাঠ আমরা পাতঞ্জল দর্শনের ৩৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যের 'তত্ত্ববৈশারদীতে' প্রাপ্ত হইলাম। প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণসকলে কিন্তু উক্ত ৬।৭।৯০ সংখ্যক শ্লোকটিতে এই প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয় না। সেই সকল পুস্তকে "সোঽহংং চেতি" এইস্থলে "চেতসাহি" এবং "হ্যহমিতি" এইস্থলে "অবয়বিনি"—এই প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, তাহাতে মূলশ্লোকের এইস্থলে প্রধান প্রতিপাদ্য যে 'অহংগ্রহোপাসনা' তাহাই ব্যাহত হইয়া পড়ে। তত্ত্ববৈশারদীকার পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্তীকালে "অহংগ্রহোপাসনাতে আতঙ্কগ্রস্ত" কোন সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত হয়তো মূলের পাঠ এই প্রকারে বিকৃত করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক আমরা অহংগ্রহোপাসনা প্রতিপাদক আরও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিং সংপূজয়েদ্ধরেঃ।" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৫৫) অর্থ স্পষ্ট। টীকাকার পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অত্রস্থ 'তন্ময়ং' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ভগবদাকারম্' ইতি অহংগ্রহোপাসনা উক্তা। শ্রীমদ্ভাগবতেই অন্যত্র এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"তৎসর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্॥
তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"
(শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৪।৪১—৪২)

"সেই সর্বব্যাপক (—শ্রীভগবানের মূর্তির সর্বাঙ্গে সঞ্চরণশীল) চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একস্থানে (একটী অবয়বে) ধারণ করিবে। পুনরায় অন্য অঙ্গ সকলকে চিন্তা করিবে না, কেবল হাস্যবিকশিত মুখমণ্ডলকে ভাবনা করিবে। চিত্ত সেই স্থলে স্থির হইলে তাহাকে আকর্ষণ করত আকাশে (সর্বকারণাত্মক মৎস্বরূপে*) ধারণ করিবে। আবার তাহাকেও ত্যাগ করত আমাতে আরোহণ করিয়া (—আমার সহিত অভেদ চিন্তন করত 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুভব করিয়া আর কিছু চিন্তা করিবে না (ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান—এই প্রকার বিজ্ঞানকেও চিন্তা করিবে না)।" এই প্রকারে এখানে 'অহংগ্রহোপাসনাই' বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে। ইহাই পরবর্তী শ্লোকে শ্রীভগবান্ আরও স্পষ্ট করিতেছেন—

"এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥" (ঐ ১১।১৪।৪৩)

"এই প্রকারে সংযতচিত্ত যোগী আত্মস্বরূপ আমাকে নিজের মধ্যে দর্শন করে এবং নিজেকে জ্যোতিরও জ্যোতিস্বরূপ সর্বাত্মক আমাতে সংযুক্তরূপে দর্শন করে।" (—শ্রীধর টীকা অবলম্বনে)। এইস্থলে 'আমাকে নিজের মধ্যে' এবং 'নিজেকে আমার মধ্যে'—এই প্রকারে শ্রীভগবান্ উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণে "সোঽহম্" এবং অহমিতি"—এইরূপে পঠিত অহংগ্রহোপাসনাই বিবৃত করিলেন। বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোক বিকৃত হইলেও অহংগ্রহোপাসনা-প্রতিপাদক এইপ্রকার বহু শাস্ত্র-বাক্য তন্ত্র ও পুরাণবিদ্‌গণ উদ্ধৃত করিতে পারেন। অনুবাদ না দিয়া আরও দু একটি বাক্য আমরাও উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদ প্রতিপাদনম্।" (বৃঃ নারদীয় পুঃ ৩১।১৪২)
"নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধং আত্মানং তারিণীময়ম্।
অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েৎ আকারাদ্রক্তপঙ্কজম্।*
* * এবম্ভূতং স্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ তারিণীময়ম্॥" (নীলতন্ত্র, চতুর্থপটল)
"চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্ব্রহ্মসোঽহমীশ্বরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাদ্দেবরূপতা।
আত্মনো জায়তে সম্যগ্ভাবনামাত্র সংশয়॥" (গন্ধর্বতন্ত্র ১২ পটল, ৫৫ পৃঃ)
'গুরুরূপত্বা বিধানেন সোঽহমিতিপুরোধতঃ।
ঐক্যং সম্ভাবয়েদ্ধীমান্ জীবস্য ব্রহ্মণোঽপিচ॥ (ঐ ৯ম পটল ৫০ পৃঃ)

* শ্রীধরস্বামী। + বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

এইরূপে দেখালেন সাধক প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমশঃ তিনি অহংগ্রহোপাসনার স্তরে আরোহণ করেন। প্রতীকে আর তাঁহার কোনও আবশ্যকতা থাকে না; "এই মাটিতে খোল হয়" ইত্যাদির ন্যায় প্রতীক তখন তাঁহার প্রেমাস্পদের উদ্দীপকমাত্র হইয়া পড়ে।

[মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে]

এইস্থলে দুই প্রকার সন্দেহ হয়—অপ্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হইয়াছে। এক্ষণে মনোময়ী প্রতিমাতে জীবের অভিন্নতা ধ্যানকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হইল। কিন্তু মনোময়ী প্রতিমা তো প্রতীক। সুতরাং তাহার সহিত অভেদোপাসনাকে আর অহংগ্রহোপাসনা বলা যায় কি প্রকারে? এই প্রকার সন্দেহের নিরসনের জন্য, মনোময়ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই এক্ষণে আমরা প্রতিপাদন করিতেছি—"দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া যে অনাত্ম বস্তুসকল উপাসিত হয়, তাহাদিগকে বলে প্রতীক," ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীভগবানের যে মনোময়ী প্রতিমা, তাহা কিন্তু প্রতীক নহে, কারণ এইস্থলে কোন অনাত্ম বস্তুকে দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হইতেছে না। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরেরই এইস্থলে আমরা উপাসনা করিতেছি, তবে তাহাতে রূপ ও গুণের আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। প্রতীক তাহাকেই বলে, 'যেখানে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি নির্মিত, সুতরাং অনাত্মভূত প্রতিমাদি বস্তুতে আত্মবস্তুর আরোপ হয়।' মনোময়ী প্রতিমাতে কিন্তু আত্মবস্তুতে রূপাদি অনাত্মবস্তু আরোপিত হইতেছে। সেইহেতু মনোময়ী প্রতিমাকে আর প্রতীক বলা যায় না। কিন্তু কিছু আরোপিত তো হইল? হাঁ, তাহা হইল, কিন্তু কিছু আরোপিত হইলেই তো তাহাকে প্রতীক বলা যায় না। কারণ শাস্ত্রকারগণ তো আরোপিত বস্তুমাত্রকেই প্রতীক বলেন নাই। তাঁহারা যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকে সেইরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর নির্গুণ ও নিরবয়ব পরমেশ্বরে কিছু আরোপিত না হইলে, তাঁহার উপাসনাই সম্ভব হয় না।*

এই বিষয়ে শাস্ত্রও বলেন—

"সত্যং হি নির্গুণা দেবী, সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥"

(কাল্যার্চনচন্দ্রিকাতে উদ্ধৃত মুণ্ডমালা তন্ত্র)

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

(রাম পূঃ তাঃ উপঃ ৭, কুলার্ণবতন্ত্র ৫।৬)

"শিব ও শিবা নির্গুণ, ইহা সত্য, তথাপি উপাসকগণের সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহারা গুণযুক্তরূপে চিন্তিত হন।" চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, অদ্বিতীয়, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদবিহীন, এবং শরীরবিহীন যে ব্রহ্ম, উপাসকগণের উপাসনাস্বরূপ কার্যের জন্য তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়াছে (—তাঁহাতে গুণ ও অবয়ব আরোপিত হইয়াছে।)†

এইরূপে দেখা যাইতেছে—সম্পদুপাসনার স্তর অতিক্রম করিয়া সাধক যে 'মনোময়ী প্রতিমাতে' চিত্তসমাধান করিতেছেন, আত্মবস্তুতে অবয়বাদি অনাত্মবস্তু আরোপিত হওয়াতে তাহাকে আর প্রতীক

* 'আরোপিতরূপেণাপ্যুপাসনোপপত্তেঃ'—বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ, ২।২১২ পৃঃ, বসুমতী।

বলা যায় না। পরন্তু তাহাকে নিরুপাধিক ব্রহ্মের সোপাধিক স্বরূপই বলিতে হইবে। ইহাই হইল মনোময়ী প্রতিমার প্রতীকত্বনিরাকরণে প্রথম যুক্তি। এই বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি এই—শ্রীমদ্ভাগবতে আট প্রকার প্রতিমার বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২৭।১৩)

"প্রতিমা সচলা ও অচলা, দুই প্রকার, [তন্মধ্যে] জীবের হৃদয়মন্দিরে যে মনোময়ী প্রতিমা তাহা অচলা। শ্রীভগবান্ সেখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।* হে উদ্ধব, সেই স্থিরা প্রতিমাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই।" এই ভগবদ্বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই মনোময়ী প্রতিমা, অন্য সাত প্রকার প্রতিমা হইতে ভিন্ন। অন্যান্য প্রতিমার ন্যায় ইহাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। যাহা প্রতীকরূপ প্রতিমা, তাহাতে কিন্তু আবাহন ও বিসর্জন থাকে। মনোময়ী প্রতিমাতে তাহা না থাকায় এবং শ্রীভগবান্ তথায় নিত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাহা যে প্রতীক নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইহা হইল এই বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি। তৃতীয় যুক্তি এই—ভগবান্ শারীরকভাষ্যকার উত্তরমীমাংসা-দর্শনের ৪।১।২ আত্মত্বোপাসনাধিকরণের ভাষ্যে বলিতেছেন—"যেখানে প্রতীকদৃষ্টি অভিপ্রেত, সেইস্থলে বচনটি একবারমাত্র পঠিত হয়, যথা—"মনো ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি। এখানে কিন্তু "তুমিই আমি" এবং "আমিই তুমি" শাস্ত্র এই প্রকার বলিতেছেন। সেইহেতু প্রতীকবোধক বাক্য হইতে ইহার অসাদৃশ্য আছে", ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিষ্ণুপুরাণ* এবং অন্যান্য স্মৃতিবাক্যেও দেখুন—'আমিই তুমি' এবং 'তুমিই আমি' এই প্রকারে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং মনোময়ী প্রতিমাতে এই উপাসনা যে প্রতীকালম্বনা নহে, ইহাই নিশ্চিত হয়। এই বিষয়ে চতুর্থ যুক্তি এই—উত্তরমীমাংসা-দর্শনের ৪।১।৩ প্রতীকাধিকরণে প্রতীকে আত্মদৃষ্টি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এখানে শাস্ত্র কিন্তু মনোময়ী প্রতিমাতে আত্মদৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। সুতরাং মনোময়ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। অতএব মনোময়ী প্রতিমাতে এই উপাসনা যে অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনা অর্থাৎ অহংগ্রাহোপাসনা, ইহাই সিদ্ধ হইল।

[স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার ও ফল]

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল—প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে আরব্ধ কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে (অহংগ্রহোপাসনাতে) পরিণত হয়। সুতরাং সিদ্ধিলাভ

† কেহ হয় তো বলিতে পারেন—নির্গুণ ও নিরবয়ব পরমেশ্বরে গুণ ও অবয়বের এই প্রকার আরোপ করিল কে? অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিগণই কি অস্মদাদির সুবিধার জন্য তাহা করিয়াছেন? অথবা সদা সুবিধাবাদী আমরাই তাহা করিয়া লইয়াছি? তদুত্তরে বলিব—এই উভয়ের মধ্যে কেহই নহেন। অল্পশক্তি জীবের উপর কৃপাপরবশ নির্গুণ নিরাকার ও মায়াধীশ পরমেশ্বরই স্বীয় অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে অবলম্বন করত স্বয়ংই নিজেতে তাহা আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ গুণ ও অবয়বাদিযোগে জীবের নিকট কৃপা করিয়া তিনি প্রকাশিত হন। শ্রুতিতে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"তেভ্যঃ হ প্রাদুর্বভূব" (কেন উঃ ৩।২)—'নিজেকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিলেন।' "সঃ তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্" (কেনউঃ ৩।১২)—তিনি (ইন্দ্র) সেই আকাশে নানা বর্ণালঙ্কারভূষিতা বহুসৌন্দর্যময়ী উমার নিকট গমন করিলেন। ইত্যাদি। স্মৃতিও বলেন—"নির্গুণোঽপি নিরাহারো লোকানুগ্রহরূপধৃক্" (বৃঃ নারদীপুঃ ৩১।১৪), ইত্যাদি।

* "প্রতিতিষ্ঠতি অস্যাং ভগবান্ ইতি প্রতিষ্ঠা"—রাঘবাচার্যকৃতটীকা।

না হওয়া পর্যন্ত বৈদিক অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া যেমন দীর্ঘকাল নিরন্তর অতি যত্ন ও আদরসহকারে তাহার অনুশীলন করিতে হয়; এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনাসকলের বেলাতেও তাহাই করিতে হইবে। শ্রীশ্রীদুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি সগুণ ব্রহ্মমূর্তি সকলের মধ্যে যে কোন একটিকে, অথবা সগুণব্রহ্মের অবতারভূত শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে কোনও একজনকে স্বীয় উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর অতি যত্ন ও আদরসহকারে তাহাতে চিত্তসমাধান করিতে হইবে, যতকাল না সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্ধিলাভ হইলে সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে এবং তাহাই দেহত্যাগকালে অন্ত্যবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (গীতা ৮।৬)

এই বাক্যোক্ত নিয়মানুযায়ী সাধকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির হেতু হয়, ইহা উত্তরমীমাংসাদর্শনের ৪।১।১৮ আপ্রয়ণাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'সিদ্ধিলাভ' শব্দের অর্থ—'তদ্ভাবাপত্তি' অর্থাৎ ইষ্টস্বরূপতাপ্রাপ্তি। যেমন শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানকালে 'আমিই শ্রীবিষ্ণু' এবং 'শ্রীবিষ্ণুই আমি'—এই প্রকার ব্যতিহারধ্যান করিতে করিতে সাধক বিষ্ণুস্বরূপই হইয়া যান্। এই অবস্থাতেই সাধক "দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২)—"দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন," এই বাক্যবর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। আর সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই শ্রৌত অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা প্রাপ্তব্য অবস্থা হইতে এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থার কোনপ্রকার প্রভেদ না থাকায় শ্রৌত এই উপাসনার যাহা ফল, তাহাই স্মার্ত এই উপাসনার দ্বারাও লব্ধ হইয়া থাকে—ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। অতএব শ্রৌত অহংগ্রহোপাসনাতে সিদ্ধ সাধকের যেমন দেবযান-মার্গে বিদ্যুল্লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি, পুনরায় ইহলোকে অনাবৃত্তি এবং কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহমুক্তি লব্ধ হয়, এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসকেরও তাহাই হয়, ইহা অসন্দিগ্ধরূপেই বলা যাইতে পারে। তবে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্‌গণের 'সদ্যোমুক্তি' একরূপা হইলেও, তাঁহাদের ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থায়িত্বানুসারে যেমন তাঁহাদিগকেও 'ব্রহ্মবিদ্বর' 'ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্' ও 'ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ' ইত্যাদি অবস্থাবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অহংগ্রহোপাসকের বেলাতেও তদ্রূপ 'আমিই বিষ্ণু', এইপ্রকার ভাবাপন্ন অবস্থাতে সাধকের স্থিতির তারতম্যানুযায়ী তাঁহার লব্ধব্য ব্রহ্মলোকরূপ ফলও 'সালোক্য', 'সারূপ্য', 'সামীপ্য' ও 'সার্ষ্টি' ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন হইবে, কি না—তাহা চিন্তনীয়। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণ আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই। তবে 'সাধনাধিক্যে ফলাধিক্য'—এই ন্যায়ানুসারে উক্তপ্রকার বিভিন্ন ফলকল্পনা হয়তো অন্যায্য হইবে না। তবে দাস্য সখ্যাদি ভেদভাবাবলম্বী সাধকের উক্ত ব্রহ্মলোকরূপ ফল যে সালোক্যাদিভেদে বিভিন্ন, ইহা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যিনি আমাদের প্রকৃত মাতা ছিলেন

(শ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রীবীণাদেবী সেন, সাহিত্যসরস্বতী

মানুষের জীবনে সব চেয়ে মহৎ জিনিস হচ্ছে ধর্ম—যা মানুষকে ধারণ করে রাখতে পারে। পৃথিবীর মলিন, পঙ্কিল স্রোত থেকে নিজকে দূরে রাখতে হলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত মানুষের জীবনে অন্য কোনো গতি নেই, অন্য কোনো পন্থাও নেই। যতদিন সুখ, ঐশ্বর্য, বা ঈপ্সিত কাম্য যা কিছু মানুষকে আবৃত করে রাখে ততদিন সে অহমিকার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তারই জীবনে এমন দিন আসে যখন পৃথিবী তার নিকট শূন্য, সংসার তার নিকট দুঃসহ ; তখন নশ্বর জগতে দাঁড়িয়ে ধর্মের বিরাট আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত তার আর কোনো উপায় থাকে না। যেদিন পৃথিবীর ছায়া তাকে আবৃত করে, সেদিন মানুষ কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে ? তখন এই নিষ্প্রভ, আলোকহীন ভূমণ্ডলে যিনি আলো বিতরণ করেন তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। বহুদিন পূর্বে এক চিত্রে দেখেছিলুম—উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র, অকূল জলধি—সমুদ্রের উপরে ত্রাণকর্তা যিশু। একটি মেয়ে আলুলায়িত কেশে পরিত্রাতাকে স্পর্শ করতে উদ্যত। নীচে লিখিত আছে other refuge have I none—. ইহা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য—আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ঈশ্বর। যিনি ধর্ম বিতরণ করেন তিনি পুণ্য সঞ্চয় করেন—কিন্তু যিনি সে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন, নিজ অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি তদপেক্ষা পুণ্যবান। ধর্মের ভিত্তির উপর যিনি সমস্ত জীবনের অট্টালিকাকে নির্মাণ করেছিলেন সেই মহীয়সী পুণ্যবতী জননী শ্রীশ্রীসারদামণি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী। তাঁর অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত আমাদিগকে বিস্মিত করে। শৈশবে ছিল তাঁর অতি সাধারণ ভাব, সরলতা ছিল তাঁর মূর্তি। তাঁর শৈশব থেকে ধর্মপ্রবণতা তাঁকে সমস্ত জীবনপথে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর সংস্পর্শে যারা আসতো তাদের তিনি অমায়িক ব্যবহার, সুমিষ্ট ভাষণ দিয়ে মোহিত করতেন। এমনই একজন সৌভাগ্যশালিনী মহামানবীর সংস্পর্শে এসে বহু তৃষিত চিত্ত শীতল হয়েছিল, বহু বিপথগামী জন পরম পথকে অবলম্বন করেছিল, বহু অশান্ত হৃদয়ের উপর তাঁর শান্তিবারি বর্ষিত হয়েছিল। চৈতন্যরূপিণী জগদম্বারূপে তিনি তাঁর মায়ের গৃহে প্রবেশ করলেন। শৈশব তাঁর অতিবাহিত হয়েছিলো কর্মব্যস্ততায়, নিতান্ত সাধারণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে।

অতি শৈশবেই মায়ের বিবাহ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এবং যদিও তাঁদের ভিতর কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিল না তবুও পরস্পরের ভিতর যে মধুর দাম্পত্য-সম্পর্ক ছিল তা জগতের ইতিহাসে বিরল। মায়ের আশৈশব সহৃদয়তা, আজীবন কারুণ্য তাঁকে শৈশবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল, যৌবনে তাঁকে দীপ্তিমতী করেছিল, পরবর্তী জীবনে তাঁকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং শ্রীমায়ের অদর্শন থাকতো বহুদিন, ব্যবধান থাকতো প্রচুর, কিন্তু মায়ের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ছিল অনিন্দ্য, অপরিসীম, অপূর্ব সুন্দর। মায়ের ধৈর্য ছিল অদ্ভুত, সহনশক্তি ছিল অসীম। কামারপুকুরে থাকাকালীন তাঁকে আহারাদি বিষয়ে কত যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা অবর্ণনীয়, তবুও তিনি ভ্রমক্রমেও বাক্য-উচ্চারণে সে অভাবের জন্য দায়ী করেননি একটি প্রাণীকেও। ঠাকুর

রামকৃষ্ণ সাধারণ সন্ন্যাসীর মত পত্নীর সহিত যাহা কিছু মধুর সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। একদিকে সংযম, অন্যদিকে স্নেহ—একাধারে পবিত্র ব্রহ্মচারী, অন্যদিকে স্নেহশীল আত্মীয় এই দুয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ, কিন্তু ইহার মূলে কি মা সারদামণি নাই? অবশ্যই আছে। স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় রাত্রিতে শয়ন করে যিনি আত্মসংবরণ করতে পারেন তিনি ঋষি কিন্তু যে সহধর্মিণী সে পুণ্যদানে পতিকে সহায়তা করেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সহধর্মিণী অর্থাৎ পতির সহিত যিনি ধর্ম সম্পাদন করেন। শ্রীমা হয়তো শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধর্মপথ হতে বিচ্যুত করতে পারতেন নারীর স্বাভাবিক আসক্তি এবং মোহের প্ররোচনায়। প্রেম বিতরণ ক'রে, সারল্য দিয়ে, অতি সাধারণ নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি দিয়ে কিরূপে দুর্বৃত্তের হৃদয় জয় করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেয়েছি আমরা—যেদিন কিশোরী বয়সে একাকিনী নিশীথ রজনীতে পথ হারিয়ে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। ডাকাতকে পিতৃসম্বোধন করে, ডাকাতের স্ত্রীকে মাতা সম্বোধন করে বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছিলেন, এবং অবশেষে তাদের স্নেহ প্রচুর লাভ করেছিলেন। সর্ব ধর্মের সারাংশ হচ্ছে কোন জীবকে তুচ্ছ না করা। সমচক্ষুতে সর্বজীবকে নিরীক্ষণ করাই সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশ। একটি তুঁতে মুসলমানকে বারান্দায় খেতে দেওয়াতে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিবাদ করাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাকে সমাদর করে খাইয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে যে কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা মহত্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি' উচ্ছিষ্ট স্থানটি নিজ হাতে ধুইয়ে দিলেন জননী যে ভাবে সন্তানের জন্য করে। জাতিকুল ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে প্রীতির চক্ষে তিনিই দেখতে পারেন যিনি পরমপিতার সহিত একত্র হতে পেরেছেন। যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন প্রতি মানুষের ভিতরে পরমপুরুষ ঈশ্বরের আবির্ভাব। তাঁর অন্তরে তিনি সাড়া পেয়েছেন।

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" Abu Ben Adam শুধু মাত্র মানুষকে ভাল বেসেছিলেন তাই স্বর্গদূত জানিয়ে গেলেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং তাঁর নাম তালিকার সর্ব উপরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়ে মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা শ্রীশ্রীমায়ের পরিচয় পাই তাঁর অপরিসীম ঔদার্য, করুণা এবং ভক্তির দ্বারা। তিনি তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী ছিলেন সত্য, কিন্তু সংসারের তুচ্ছতম কথা তাঁর দৃষ্টিপথ এড়ায় নাই। সংসারের আবিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তিনি প্রতিটি কার্যে লিপ্ত ছিলেন, তাই তিনি আমাদের পরমমাতারূপে অভিহিত।

তাঁর আদর্শ, তাঁর জীবন আমাদের প্রতি নারীচরিত্রে প্রতিফলিত হোক, তাঁর জীবনে জন্ম লাভ করিয়া সমস্ত নারীজাতি জাগ্রত হোক।

সমালোচনা

ভাগীরথী—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি—প্রণীত। ৯, সত্যেন দত্ত রোড কলিকাতা—২৯ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১০১; মূল্য—আড়াই টাকা।

[illegible] র সিদ্ধহস্ত বাঙলা সাহিত্যের [illegible] ভাগীরথী একখানি কাব্যগ্রন্থ। [illegible] থক ইহাতে প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্ঘ্য, অনুবাদ, বাস্তবিক, অটোগ্রাফ, কাল্পনিক—এই কয়েকটি

বিভাগে ভাগ করিয়া তাঁহার কবিতাগুলি পরিবেশন করিয়াছেন। প্রাচীন পন্থায় রচিত হইলেও কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতা রহিয়াছে যাহা কবিতামোদীদিগের আনন্দবর্ধন করিবে। কয়েকটি উন্নত ধরনের হাস্যরসের কবিতাও বইখানিতে স্থান পাইয়াছে।

শিক্ষার কথা—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্ এ পি-এইচ্ ডি (এডিন)—এফ্ এন্ আই প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১২২; মূল্য দুই টাকা।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভূয়োদর্শী গ্রন্থকার 'শিক্ষার কথা' প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেন। বর্তমানে শিক্ষাসমস্যা ভারতের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। লেখক শিক্ষার গলদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার সুচিন্তিত ও রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়াছেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে অভিভাবকদেরও যে সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা 'অভিভাবকদের জন্য' প্রবন্ধটিতে যৌক্তিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক শিক্ষক ও প্রত্যেক অভিভাবকেরই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।

ভজহরি—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ('ভাস্কর')—প্রণীত; গ্রন্থকার কর্তৃক ৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮৮; মূল্য—আড়াই টাকা।

ভজহরি নামে এক বেকার যুবক কিভাবে দুনিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হইল [illegible] কাহিনী পুণ্যবতী জননী। পান, উপায়, পাইলট, বিচার [illegible] গণক, কলহ, গলো গলো গল্পগুলির মাধ্যমে [illegible] হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পেই বর্তমান সমাজের বিভিন্ন ছবি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। আধুনিকতম ঘটনা ও চিন্তার স্রোতে লোকে কেমন ভাসিয়া চলিয়াছে লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছে। জুয়াচুরিতে ও গণকগিরিতে টাকা রোজগার, পাইলটের চন্দ্রলোকে গমন, গলিতে গলিতে অবতার, সব কিছুই আজ যেন অতি স্বাভাবিক! স্বচ্ছন্দ গতিতে গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে না হাসিয়া পারা যায় না। মাঝে মাঝে সমাজ ও লোক-চরিত্রের উপর কটাক্ষপাতগুলি বেশ উপভোগ্য। বইখানি গল্প-রসিকদের প্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতসন্তান—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীদীপ্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জামতারা, এস্, পি। প্রাপ্তিস্থান ২০১, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭; পৃষ্ঠা—৯৫; মূল্য—১৷৷০ টাকা মাত্র।

যুগ যুগান্তরের ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও ভারতের যে নিজস্ব ভাবধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো আজও প্রবাহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া রচিত এই তিন অঙ্কের নাটকখানি বেশ আনন্দদায়ক। প্রচলিত নাটক সমূহের গতানুগতিকতা-বর্জিত বলিয়া ইহার আবেদন হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু মাঝে মাঝে কথোপকথনগুলি অযথা দীর্ঘ হওয়ায় নাটকের সাবলীল গতি ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

নির্মাল্য—(পত্রসঙ্কলন)—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত। প্রকাশক—শ্রীরবি কর, দি স্কুপ্ট্, ৭৫নং যতীনদাস রোড, কলিকাতা—২৯, পৃষ্ঠা—৫৬; মূল্য দেড় টাকা।

প্রখ্যাতনামা দার্শনিক ও অধ্যাপক স্বর্গত ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের ৩৩ খানি পত্রের সঙ্কলন। পত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লীলাবতী দেবীকে লিখিত। একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, [illegible]ষমী, উন্নতিকামী যুবক কিভাবে তাঁহার সহধর্মিণীকে তাঁহার কর্ম ও ধর্মজীবনের চলার পথে [illegible]গামিনী ও সর্বতোভাবে তাঁহারই যোগ্য করিয়া

তুলিবেন তাহার একটি সুন্দর নির্দেশ প্রথম দিককার পত্রগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ডক্টর সরকারের বিদেশভ্রমণকালে লিখিত শেষের দিককার পত্রগুলির মধ্যে তাঁহার জীবনের সুপরিণত ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। পাঠক-পাঠিকা বহুশ্রদ্ধেয় জ্ঞানতাপসের এই পত্রগুলি পড়িয়া প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সবার মা সারদা—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভারতী—প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন সাহা, নবগ্রন্থ নিকেতন, ৩৭-১, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ; পৃষ্ঠা—২১২; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী আবির্ভাব হইতে লীলাসংবরণ পর্যন্ত বাংলা সাল অনুযায়ী সাজাইয়া শ্রীমায়ের জীবন-কথার মনোজ্ঞ বর্ণনা। ভাষার স্বচ্ছতা থাকায় বইখানি পাঠকপাঠিকাগণের বেশ মনোরম লাগিবে।

রামকৃষ্ণায়ন—শ্রীতুলানন্দ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভারতী। প্রকাশক—শ্রীমুকুন্দলাল দে, দি সারস্বত লাইব্রেরী, ৬।১১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ; পৃষ্ঠা ৫৮; দাম এক টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া রচিত 'গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ', 'মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের 'সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'শ্রীরামকৃষ্ণ-নামরহস্য' নামক প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য কার্তিক মাসের উদ্বোধনে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

Education And Reconstruction : শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ; বিনয়-ভবন, বিশ্বভারতী, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য—৮০ আনা।

শিক্ষা ও পুনর্গঠন বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ চিন্তাশীল গ্রন্থকার ও শিক্ষাব্রতীরূপে সুপরিচিত। ইঁহার পিতা শ্রীবাণেশ্বর সিংহ, কৃষি ও কুটিরশিল্প বিষয়ে শুধু সুপণ্ডিতই ছিলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান গবেষকও। পুত্রকেও তিনি মামুলী শিক্ষার জন্য না পাঠাইয়া নানাবিধ শিল্পকাজ ও তাহার মাধ্যমে কার্যকরী এবং গঠনমূলক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে গ্রন্থকার দীর্ঘ দিন শিক্ষালাভ করেন ও পরে শিক্ষকরূপে কার্যে ব্রতী থাকেন। অতঃপর গান্ধীজীর আহ্বানে ওয়ার্ধা বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একাধিকবার ইনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং শিল্পভিত্তিক শিক্ষার ধারাসম্বন্ধে প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের সুযোগ পাইয়াছেন। বস্তুতঃ শিক্ষাকে জীবনোপযোগী নূতন খাতে প্রবাহিত করার দুর্নিবার আবেগই তাঁহাকে ভারতে ও বহির্ভারতের বরণীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে বারবার টানিয়া লইয়াছে। পরিবার, বিদ্যায়তন ও সমাজকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সাধারণ শিক্ষার স্নিগ্ধ ধারায় সূত্রবদ্ধ করার আগ্রহ তাঁহাকে বরাবর পরিচালিত করিয়াছে এবং কবিগুরুর শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর ওয়ার্ধায় দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষা পরিচালনায় ব্রতী থাকায় তিনি তাঁহার যোগ্যতাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁহার এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতাও শিল্পভিত্তিক, জীবনোপযোগী, যথার্থ শিক্ষার জন্য ঐকান্তিক আবেগের দ্বারা চিহ্নিত। শুধু তত্ত্বকথা নহে, তথ্য ও অভিজ্ঞতামূলক কার্যোপযোগী নির্দেশও গ্রন্থটিতে বিস্তর রহিয়াছে। বুনিয়াদী বা

শিল্পভিত্তিক শিক্ষায় অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত, সাধারণ শিক্ষিত সমাজও উহা পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

Eastern Socialistic State : শ্রীবসন্ত কুমার চ্যাটার্জি। ৩-বি সাগর ধর লেন, কলিকাতা—৬ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৫৪, মূল্য—৮০ আনা।

প্রাচ্যের দেশগুলিকে একটি সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিকল্পনাভুক্ত করিয়া শক্তিশালী, সমৃদ্ধ অখণ্ড অঞ্চলরূপে গড়িয়া তোলার আদর্শ ও তদুপযোগী কর্মসূত্রের প্রস্তাব এই পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এশিয়ার দেশগুলির অনগ্রসরতা ও তাহার কারণসমূদয় এবং এই মহাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মহনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষয়িক ক্ষেত্রে এশিয়াবাসীদের আত্মনির্ভর করা এবং শুধু অনিবার্যতার ক্ষেত্রেই এশিয়া বহির্ভূত অঞ্চল হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা প্রভৃতি মূলনীতির আলোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে,—পাঠকের চিন্তাকেও উহা নাড়া দিবে। এশিয়ার সমৃদ্ধি ও সংহতি শুধু এশিয়ার নহে সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য। বর্তমানে এই চিন্তা সক্রিয় আন্দোলনেরও সৃষ্টি করিয়াছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যেও লেখক এই জটিল ও ব্যাপক বিষয়টির সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। কার্যকরী পরিকল্পনার ভূমিকারূপে নিঃসন্দেহে বইটি সমাদর পাইবার যোগ্য।

শ্রীমনকুমার সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আগামী জন্মতিথি (দ্ব্যধিকশততম) পড়িয়াছে ৩০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪)। শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে ও কলিকাতায় ঐ শুভতিথি হইতে একাদশদিবসব্যাপী নানা অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপিত হইবে, এই সংবাদ আমরা গতমাসের উদ্বোধনে দিয়াছি। প্রতিদিনকার বিস্তারিত কর্মসূচী যথাসময়ে সংবাদপত্রে দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৩ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চচত্বারিংশতম বার্ষিক সাধারণ-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কেন্দ্র : সর্বসমেত ৬৯টি মিশন-কেন্দ্র (প্রায় সমসংখ্যক মঠকেন্দ্র ছাড়া) জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের সেবা ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষসেবা : মিশনের বোম্বাই শাখাকেন্দ্র বোম্বাই রাজ্যের কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির সহায়তায় আহ্‌মদনগর জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার লক্ষ ক্ষুধিতের আহার্যোপযোগী ৮৩২৴০ মণ ও ১০২৬ পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য এবং ২৯৮০ খানি বস্ত্র বিতরণ করেন। দ্বারভাঙ্গায় বন্যার্তদিগকে সাহায্যের জন্য মিশন আগষ্ট মাসে সেবাকার্য করিয়াছেন। ২৫০০ জন লোককে সাত সপ্তাহের অধিককাল যাবৎ খাদ্য দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত ১০৮২ খানি নূতন বস্ত্র ও রোগীদিগকে ঔষধাদিও দেওয়া হয়। করিয়া

রাজমাহেন্দ্রীতে প্রধান রিলিফ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া আগষ্ট হইতে নভেম্বর পর্যন্ত গোদাবরীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরস্থ জেলাগুলিতে সেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছে। ইহা আলোচ্য বর্ষে ৭৮০০০ খানি বস্ত্রাদি, ৩৫০০০৲ টাকা মূল্যের অন্যান্য পরিচ্ছদ, ২২০০ খানি কম্বল এবং ৬০,০০০৲ টাকা মূল্যের গৃহনির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। পুনর্বসতিকার্যও চালানো হয়।

চিকিৎসা-বিভাগ : মিশনপরিচালিত ৬৯৫ সংখ্যক রোগিশয্যা-সমন্বিত ৮টি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে মোট ১৬১৩৬ এবং ৪৩টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে মোট ১৯,৫৬,১২৭ (পুরাতন সহ) জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। রাঁচির সন্নিকটে ডুঙ্গরি যক্ষ্মা-আরোগ্যভবনের অন্তর্বিভাগে ৬০ জন যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

শিক্ষা-বিভাগ : এই বিভাগে একটি প্রথম, একটি দ্বিতীয় ও একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬১৫। ভারত ও পাকিস্তানের মিশন-পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ৭১১০ জন বালক ও ৩১৮০ জন বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭১৭৩ এবং ২৪৮০। শিল্প ও কারীগরী বিদ্যালয়গুলিতে ৩৪৬ জন ছাত্র ছিল। ৩৬টি ছাত্রাবাস কর্তৃক ২৩৫৬ জন বিদ্যার্থী ও ২০৫ জন বিদ্যার্থীনীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে।

সাহায্যদান : কয়েকটি শাখাকেন্দ্র কতকগুলি দুঃস্থ লোকের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং টাকা ২০৯১।/০ আনা দান করিয়াছেন। প্রধান কেন্দ্র নিয়মিতভাবে ৭৩টি পরিবার ও ১৪৫ জন ছাত্র (তন্মধ্যে ৬২ জন সিন্ধু প্রদেশের বাস্তুহারা ছাত্র) এবং সাময়িকভাবে ২৫৯টি পরিবার ও ৯৬ জন ছাত্রকে সাহায্য বাবদ প্রায় ১৮০০০৲ টাকা ব্যয় করেন।

ভারতের বাহিরে কার্যাবলী : সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং ফ্রান্সে মিশন সাফল্যের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক কার্যাবলী পরিচালিত করিয়াছেন। সিংহল শাখাকেন্দ্র-পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ২৪টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। ফিজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২০২। পাকিস্তানে মিশনের কার্য কিছু কষ্টের সহিতই চালাইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপের প্রচারকার্য এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর্থিক অবস্থা : আলোচ্য বর্ষে মিশনের মোট আয় টাকা ৪৩,১১,১৮৩৸/৫ পাই এবং মোট ব্যয় টাকা ৩৮,৫৪,৯৯১।/৯ পাই।

কালাডিতে শ্রীশঙ্কর কলেজ—শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালাডিতে (ত্রিবাঙ্কুর) তাঁহারই পুণ্যনামে মহাবিদ্যালয়ের (শ্রীশঙ্কর কলেজ) শুভ উদ্বোধন-উৎসব বিগত ১২ই জুলাই, ১৯৫৪ একটি আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দিনটি প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিবসরূপে পরিগণিত হইবে। প্রত্যূষে স্বামী মেধসানন্দের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ ও কলেজ ছাত্রাবাসের নবাগত ছাত্রবৃন্দ ভজনসহকারে আশ্রম হইতে কলেজ পর্যন্ত প্রায় দুই মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা করে। বেদান্ত-শিরোমণি শঙ্করশর্মা কর্তৃক কলেজভবনে পূজাদি কার্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা ও বক্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন সাহিত্যশিরোমণি শ্রীশঙ্কর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, স্বামী আগমানন্দ, বিচারপতি শ্রী পি, কে সুব্রহ্মণ্য আয়ার, শ্রী পি. আর মেনন এবং অধ্যক্ষ কে. ভি কৃষ্ণ আয়ার। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে কার্যসূচীর সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংবাদ—পুরী শ্রীরামকৃষ্ণমিশন লাইব্রেরীতে গত ১৮ই ও ১৯শে আষাঢ় শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী

জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন সকাল ৮টায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের যে জীবনী-বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতা হয়, উহাতে ৩০ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। অপরাহ্ণ ৫টায় গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণোস্থিত সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সম্মুখে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুর সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীকুমারস্বামী রাজা। সভায় ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী, ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীকিশোরী মোহন দ্বিবেদী, শ্রীচিন্তামণি আচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ প্রায় দুই সহস্র নরনারী যোগদান করেন। বিভিন্ন বক্তা আবেগময়ী ভাষায় শ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী আলোচনা করায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে পবিত্র মাতৃভাব জাগিয়া উঠে। সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর কাটজু বলেন, কিভাবে আদর্শ নারী-চরিত্র গঠন করিতে হয় তাহা শ্রীসারদাদেবী দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ সকলেরই তাঁর জীবন অনুধ্যান করা উচিত। স্বামী মাধবানন্দজী বলেন, তিনি ছিলেন সকলের মা—সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সকল জাতির। দ্বিতীয়দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার বিশেষ পূজা, কুমারীপূজা, কুমারীসম্মেলন, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, প্রসাদ ও পুরস্কার-বিতরণ

লণ্ডনের ক্যাক্‌স্টন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গত ৩০শে জুন, ১৯৫৪ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী বিপুল উদ্দীপনা সহকারে ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহাতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীজাতির অবদানসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সভার পরিচালনা করেন মিসেস্ মৌড্ অময়। বিশিষ্ট বক্তা হিন্দু, খ্রীষ্ট, ইসলাম, ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। লণ্ডনস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজীর সভাপতিত্বে গঠিত শ্রীসারদাদেবী-শতবার্ষিকীজয়ন্তী-পরিষদ্ কর্তৃক ইংলণ্ডে শ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসবগুলি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে জয়ন্তী উৎসব ১৯শে অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী এবং সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহাদের উপস্থিতি এবং ভাষণাদি দ্বারা সকলকে প্রভূত উদ্দীপনা দান করিয়াছিলেন। বিশেষ পূজা হোমাদি ব্যতীত শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-অবলম্বনে প্রদর্শনী (জয়রামবাটীতে প্রদর্শিত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণের নির্মিত মৃত্তিকা-মূর্তির) দরিদ্রনারায়ণ সেবা, কাশীর বিভিন্ন মঠের সাধুভোজন, বালকবালিকাগণের মধ্যে মিষ্টান্নবিতরণ, রচন -প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণ, হাওড়া সমাজের বিখ্যাত 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির কর্মসচিব শ্রীরোহিত মেটা, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের কর্মসচিব ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং কলিকাতা লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এবং শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু জনসভায় তাঁহাদের মনোজ্ঞ ভাষণ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন।

গত ৭ই নভেম্বর মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ১০টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে জননীর প্রতিকৃতি মনোরমভাবে সজ্জিত করিয়া বিশেষ পূজা, ভজন বক্তৃতাদি এবং ৭০০০ বালকবালিকা ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা

হয়। ছেলেদের প্রধান বিদ্যালয়ে প্রায় দুই সহস্র দরিদ্রনারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা-বিদ্যালয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আহূত একটি জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ, পুলিশ কমিশনার শ্রীপার্থসারথি আয়েঙ্গার এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী ইউ কৃষ্ণরাও। সভান্তে উপস্থিত প্রায় ৮০০০ নরনারী ও বালকবালিকা শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত তৈলচিত্র লইয়া ত্যাগরাজনগর অঞ্চলের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা করেন। এই অঞ্চলে এত বড় ও সুন্দর এবং সুনিয়ন্ত্রিত শোভাযাত্রা ইহাই প্রথম।

গত ২০শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৪) করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর জীবনের আলেখ্যমালার প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। প্রচীন ভারতের ঐতিহ্য চিত্রে মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর পূতস্মৃতিজড়িত 'কাশীপুর উদ্যানবাটী'-শাখাকেন্দ্রে জয়ন্তীউৎসব ১০ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর, ৫৪) হইতে ১৪ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর, ৫৪) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর কয়েকটি :—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী কর্তৃক 'মহাভারতে নারী' সম্বন্ধে আলোচনা, কলিকাতার বিশিষ্ট গায়কবৃন্দ কর্তৃক সঙ্গীত-আসর, হাওড়ার অভয়সঙ্গীতপরিষদ্ কর্তৃক শ্রীশ্রীমা'র লীলাকীর্তন, বাঁকুড়া-সোনামুখীর শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক রামায়ণগান (বিষয়—শবরীর প্রতীক্ষা) চোরবাগান রাধারমণ কীর্তনসমাজ কর্তৃক মাথুর পালা কীর্তন, বৌবাজার সুহৃদ্‌ক্লাব কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-সঙ্গীত ও কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজীর নেতৃত্বে জনসভা (বিষয়—শ্রীশ্রীমা) এবং স্বামী ওঁকারানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ব্যাখ্যা।

পরলোকে বিশিষ্ট আমেরিকান ভক্ত—আমেরিকাস্থ নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রাচীনা সভ্যা ও সম্পাদিকা মিস্ রে বার্বার কয়েক মাস অসুস্থ থাকার পর গত ৩রা জুন, বৃহস্পতিবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া তিনি ইহার প্রাণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। কী দারুণ গ্রীষ্মে, কী প্রচণ্ড শীতে সোসাইটির বেদান্ত-ক্লাসে তাঁহার উপস্থিতির কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নাই। সোসাইটির দুর্দিনে অর্থসাহায্য দিয়া ইহাকে স্থায়িত্বদানে তাঁহার অসামান্য ত্যাগ সোসাইটির ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তাঁহার যে বিনয় শ্রদ্ধা ও সারল্য ফুটিয়া উঠিত, তাহা সোসাইটির কর্মিগণের আদর্শ হইয়া আছে। এই মহীয়সী মহিলার চির-অন্তর্ধানে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

স্বামী বিমলানন্দের দেহত্যাগ—আমরা বিশেষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অক্লান্ত সেবক স্বামী বিমলানন্দের বেলুড়মঠে গত ২১শে কার্তিক (৭ই নভেম্বর, ১৯৫৪) ৫৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি যকৃৎ ও হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা এবং সন্ন্যাসের গুরু। বিভিন্নসময়ে তিনি জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মৈমনসিং আশ্রমের কর্মভার অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। দৃঢ় অমায়িক চরিত্র এবং সেবানিষ্ঠা তাঁহাকে বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্য্য

গত ৮।৮।৫৪ তারিখ হইতে বিহার, বাংলা, আসাম ও পূর্বপাকিস্তানের বন্যাপীড়িত অংশে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্য্য করিতেছেন। নিম্নে দ্রব্যাদি বিতরণের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :

দ্বারভাঙ্গা জেলার রসেরা থানার অন্তর্গত মঙ্গলগড় ও দেওধাতে (গত ১৯।১০।৫৪ পর্য্যন্ত) ২৯০১ মন চাউল, ২৬ মন ৭ সের ডাল, ৭৫ মন লবণ এবং ৭১৭৪ খানি বস্ত্রাদি ৪১,২৯৬ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ৩২০৯ জনকে চিকিৎসাও করা হইয়াছে।

পূর্ণিয়া জেলায় লাভা ষ্টেশনের নিকট পরাণপুরে (গত ৩০।৯।৫৪ পর্য্যন্ত) ৩০৭ মন ৩৬ সের চাউল, কিছু ডাল ও লবণ, ১০৯৯ খানি বস্ত্রাদি এবং ২,০০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ ৪,৬২৫ জনকে এবং বহুলোককে ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে। উপরি-উক্ত তারিখের পর হইতে কেবল বস্ত্রাদি বিতরণ ও চিকিৎসাদির কাজ চলিতেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার রামসাই, আমগুড়ি ও বার্ণেস ইউনিয়নত্রয়ে (গত ২৭।১০।৫৪ পর্যন্ত) ২৯৩ মন ১২ সের চাউল, ৮ মন ৬ সের ডাল, ১৬ মন ১৯ সের লবণ এবং ২৩২৭ খণ্ড বস্ত্রাদি ১৩,১৭১ জনকে এবং ৩৪০ জনকে ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে।

কুচবিহারে (গত ২৯।১০।৫৪ পর্য্যন্ত) ৬২২৫ খানি বস্ত্রাদি ৬০২০ জনের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। নলকূপ বসান হইতেছে।

লখিমপুর (আসাম) জেলার ধোলাতে (গত ১১।৯।৫৪ পর্য্যন্ত) ২৭২ মন ৩৫ সের চাউল, ১৪ মন ১৬ সের গুঁড়া দুধ ৪৫১০ জনের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। দারিদ্রগণকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বেত ও বাঁশের কাজে এবং বয়ন প্রভৃতি কুটিরশিল্পাদির কাজে সহায়তা করা হইতেছে।

গৌহাটির নিকট পলাশবাড়িতে একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের, ঢাকা, কলমা ও নারায়ণগঞ্জে (গত ২৩।৯।৫৪ পর্যন্ত) ১২০ মন ১৪ সের চাউল, ৩৪ মন ৩৮ সের ডাল, ৯ মন ২ সের লবণ, ৮ মন ৫ সের সরিষার তৈল, ৭ মন ৩৬ সের মসলা এবং ২৯৯ মন ১২ সের জ্বালানি কাঠ ২০,৯১৫ জনকে দেওয়া হইয়াছে। ৩৭৫ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং ৩৬ খানি বস্ত্রখণ্ড ২৯২২ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন।
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) ৩।১১।৫৪



শ্রীশ্রীসারদাষ্টকম্

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্‌-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

পাদাম্ভোজরজঃকণৈর্বসুমতীং কৃৎস্নাং পুনন্তী স্বকৈ
র্জাতা যা শুভলক্ষণা জনগণক্ষেমায় সৌম্যাকৃতিঃ।
বঙ্গান্তর্জয়রামবাট্যভিহিতে গ্রামে দ্বিজস্যান্বয়ে
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ১

যামার্তাং পথি দস্যুরপ্যবনতঃ ক্রৌর্যং নিরস্যাদরাদ্
দ্রাগঙ্গীকৃতবাংশ্চিরায় দুহিতেত্যাখ্যায় মোহাত্যয়াৎ।
সেবাদ্যৈরচিরাৎ প্রসাদ্য দয়িতস্থানং তথা নীতবান্
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ২

পূর্বং কল্পিতয়া বিবাহবিধয়ে দৈবেন সদ্বৃত্তয়া
বধ্বা শিক্ষিতয়াত্মনা স্বমনসো বাঞ্ছানুরূপং শনৈঃ।
শুদ্ধাত্মাপি পতির্যয়া শুচিতরো জাতঃ কৃতার্থোঽপ্যহো
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৩

চিত্রং ভোঃ! ফলহারিণীতিথিরজন্যর্ধে স্বসিদ্ধেঃ ফলং
পূজান্তে পুরুষোত্তমেন গুরুণা যস্যৈ রহস্যর্পিতম্।
ষোড়শ্যৈ বিধিবৎ ত্রিলোকজননীবুদ্ধ্যা জপাক্ষস্রজা
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৪

যস্যা নোদ্বিজতে স্ম জীবনিবহঃ শিষ্যা নরেন্দ্রাদয়ঃ
প্রাপ্যাজ্ঞামপি সম্ভ্রমাদপি ভয়াৎ প্রীত্যান্বতিষ্ঠন্নপি।
লীয়ন্তে রিপবঃ প্রণশ্যতি ভবঃ শান্তিশ্চ সঞ্জায়তে
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৫

সেবাপ্রেমদয়াত্রপামতিকথা যস্যাঃ পরং গীয়তে
শ্রদ্ধাভক্তিভরাজ্জনৈরহরহঃ পারেঽব্ধি রাষ্ট্রেষপি।
কারুণ্যং নয়নেঽভয়ং করতলে মুক্তিশ্চ পাদাম্বুজে
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৬

যস্যাং স্নেহনিধৌ প্রকামবিনতাঃ সৌজন্যমুগ্ধান্তরাঃ
সাধ্বীসংঘশিরোমণৌ পৃথুতপোনিষ্ঠাম্বুধৌ সজ্জনাঃ।
স্বেষামাদধতি প্রসন্নবদনাঃ সর্বস্বমপ্যার্তিতো
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৭

মাতর্মাতরয়ে! কৃপাময়ি! ধরোদ্ধার্থমভ্যাগতে!
ত্রায়স্বেহ সুতাননাথপতিতাং ত্বৎপাদপদ্মাশ্রিতান্।
সংপ্রার্থ্যেতি বরং ক্রমাদুপগতাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ যাং
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৮

শ্রীসারদাফুল্লপদারবিন্দে
লগ্নো যথালির্মকরন্দমত্তঃ।
অত্যল্পধী-মাতৃকৃপার্থি-দুর্গা-
দাসাস্তুতোঽস্তু স্তব এষ শস্তঃ॥ ৯

অনুবাদ

আপন পাদপদ্মের পরাগরেণুদ্বারা সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত যে সুলক্ষণা সৌম্যদর্শনা নারী বঙ্গদেশের জয়রামবাটী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ১

মোহ দূরীভূত হওয়ায় নিজ নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া দস্যুও পথে পীড়িতাবস্থায় যাঁহাকে অবিলম্বে সাদরে কন্যাসম্ভাষণপূর্বক চিরতরে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেবাশুশ্রূষার দ্বারা প্রসন্ন করিয়া স্বামিসন্নিধানে সত্বর পাঠাইয়াছিল, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ২

যাঁহার বিবাহব্যবস্থা পূর্ব হইতেই দৈবকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যাঁহাকে তাঁহার স্বামী নিজের মনের মতো করিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যে সুশীলা সুচরিতাকে বধূরূপে পাইয়া শুদ্ধচিত্ত পতিও অধিকতর শুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৩

ফলহারিণী পূজাতিথিতে নিশীথ রাত্রিতে যে ষোড়শী নারীকে জগজ্জননীজ্ঞানে যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া তাঁহার গুরু পুরুষোত্তম পতি আপন জপমালিকার সহিত সিদ্ধির ফল নিভৃতে অভূতপূর্বভাবে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৪

যাঁহার নিকট হইতে প্রাণীসকল কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রাপ্ত হইত না, যাঁহার নিকট হইতে আজ্ঞা লাভ করিয়া নরেন্দ্রপ্রমুখ শিষ্যগণ সসম্ভ্রমে সভয়ে ও সানন্দে তাহা প্রতিপালন করিতেন এবং যাঁহার কৃপা হইতে রিপুগণ বিনষ্ট, সংসার-চক্রে আবর্তনরহিত ও শান্তির উদ্ভব হয়, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৫

সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহেও যাঁহার সেবা, প্রেম, দয়া, লজ্জা ও বুদ্ধির কথা নরনারীগণকর্তৃক পরমভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে প্রত্যহ কীর্তিত হইতেছে এবং যাঁহার নয়নে করুণা, করতলে অভয় ও পাদপদ্মে মুক্তি বিরাজিত, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৬

যে স্নেহপরায়ণা, সাধ্বীকুলশিরোমণি, প্রভূততপোনিষ্ঠাবতী মহিলাকে তাঁহার সৌজন্যমুগ্ধ, বিনয়াবনত সজ্জনগণ আর্তিবশতঃ আপন আপন সর্বস্বও প্রসন্নমুখে অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৭

"জগতের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা দয়াময়ী জননী, তোমার চরণপদ্মে শরণাগত অনাথ ও পতিত সন্তানগণকে উদ্ধার কর"—এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নরনারীগণ যাঁহার নিকটে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইতেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৮

অতীব মন্দমতি ও মাতৃকৃপাপ্রার্থী দুর্গাদাসকর্তৃক বিকীর্ণ এই প্রশস্ত স্তব শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীর প্রফুল্ল পাদপদ্মে মধুমত্ত মধুকরের মতো লীন হইয়া বিরাজ করুক। ৯

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা করা ভাল, কিন্তু অতি-ব্যাখ্যা—ব্যাখ্যাকে মনের খেয়াল ও খুশিমতো টানিয়া উহার অনাবশ্যক পরিধি-বিস্তার শুধু যে ভাল নয় তাহা নয়, অনেক সময়ে ক্ষতিকর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা লইয়া অনেক পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি লেখা হইতেছে, অনেক সভায় অনেক বক্তৃতা শোনা যাইতেছে। লেখক বা বক্তার উৎসাহের প্রাবল্যে অথবা বোধ করি, মৌলিকত্ব-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন লেখা বা ভাষণে মাঝে মাঝে আমরা এমন কথা পাই যাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা'। এগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরব খ্যাপন করে না, তাঁহার উপর অবিচার প্রকাশ করে।

কাহারও কাহারও অভিমতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এত সহজ ও সরল যে উহাদের ব্যাখ্যা করা বাতুলতা মাত্র. ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্তিগুলির গাম্ভীর্য ও মাধুর্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা। এই মতে প্রচুর যুক্তি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথাও ভুলিতে পারা যায় না। স্বামীজী তখনও আমেরিকায় যান নাই।

তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীহরমোহন মিত্রকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে।" হরমোহন বাবু ইহাতে বিস্ময়প্রকাশ করিলে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের 'হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' গল্পটির গভীর দার্শনিক তাৎপর্য তাঁহাকে তিনদিন ধরিয়া বুঝাইয়াছিলেন। (শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, প্রথম অধ্যায়)। ইহার পূর্বেকার আরও একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে। বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠিয়াছে। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন এই তিনটি পালনীয় সাধন ঠাকুর সমবেত সকলকে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবমুখে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

"ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! * * * ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজ যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিতমূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ৯ম অধ্যায়)

ভগবান যে দিন দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষার 'অদ্ভুত সত্য' স্বামীজীর মাধ্যমে দূর দূরান্তরে প্রচারিত হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্মচেতনা সঞ্জীবিত করিয়াছিল তাহা আজ আমরা সকলেই জানি। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের 'ব্যাখ্যা'র প্রয়োজন ছিল—সত্যসন্ধানী তত্ত্বদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপরাপর সন্ন্যাসি-শিষ্যগণও সেই 'ব্যাখ্যা' শুনিয়া হইতেন। 'স্বামি-শিষ্যসংবাদ' গ্রন্থে (পূর্বকাণ্ড, ৭ম বল্লী) লিপিবদ্ধ একটি ঘটনার কথা মনে আসে। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৮৯৭ সালের ১লা মে, বাগবাজারে বলরাম বসুর গৃহে সন্ন্যাসি-গুরুভ্রাতা এবং ঠাকুরের গৃহস্থভক্তগণকে সমবেত করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণমিশনে'র সূত্রপাত করিলেন। সভার পর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীর নিকট সংশয় প্রকাশ করিতেছেন, "তোমার এসব বিদেশীভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তরে গভীর আবেগভরে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই জীবনকে বুঝিবার পক্ষে একটি মূল্যবান দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ। মূলগ্রন্থের ঐ অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যেকের পড়া উচিত। আমরা স্বামীজীর উক্তির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? * * * সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন্। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয়তো, প্রভুর অগম্যভাবের ইয়ত্তা নেই।"

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং লেখাগুলি যদি না থাকিত তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের মর্ম আমরা কতটুকু বুঝিতাম? স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) সত্যই বলিয়াছিলেন,—'শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সূত্র, স্বামীজী তার ভাষ্য।'

কিন্তু ভাষ্য বা ব্যাখ্যানের ভার সকলের উপর দেওয়া চলে না, সকলের লওয়াও উচিত নয়। সকলের উহা সাজে না। স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্যদেব সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ার দায়িত্ব কত।

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।

সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। স্বামী বিবেকানন্দ এই উক্তির মধ্যে কর্মপরিণত বেদান্তের (Practical Vedanta) সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়াই তৎপ্রতিষ্ঠিত সেবাধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছে। রোগীর সেবা, আর্তের সেবা, অন্ত্যদরিদ্র অসহায়ের সেবা—সবই শ্রীরামকৃষ্ণশিক্ষার স্বামীজীনির্ণীত ব্যাখ্যানুসারে ভগবদারাধনা। পরিষ্কার কথা। কিন্তু এই পরিষ্কার কথাটিই অতি-ব্যখ্যার কবলে পড়িয়া আমাদিগের বুদ্ধিভ্রান্তি ঘটাইতে পারে। যেমন, যদি বলি—'জীবের সেবাই পরম ধর্ম—অতএব দেব-দেবীর পূজার্চনাদিতে কোন প্রয়োজন নাই, মন্দিরের বিগ্রহগুলি ছুঁড়িয়া ফেল, ঘণ্টা চামর কোশাকুশিগুলা ভাঙিয়া দাও, গঙ্গাস্নান-ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কুসংস্কার, জপধ্যান প্রার্থনা প্রভৃতি অলসতা মাত্র, কর্মই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ইত্যাদি তাহা হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পপুলার' হয়তো করি, কিন্তু তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নয় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণের বহু-পরিচিত উক্তি—'যত মত, তত পথ'। ব্যাখ্যা—প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বসংসারের এবং মানুষের জীবনের পরমসত্যকে অনুভব করিবার এক একটি প্রণালী—প্রত্যেক ধর্মকেই সহানুভূতির সহিত দেখা, মর্যাদা দেওয়া উচিত—ধর্মে ধর্মে বিবাদ সর্বথা পরিবর্জনীয়। এই ব্যাখ্যা 'অতি-ব্যাখ্যা'র পর্যায়ে কতকটা এইরূপ আকার ধারণ করে:—সমন্বয়, মতে মতে পথে পথে সমন্বয়, সব কিছুর সহিত সব কিছুর সমন্বয়, জড়ে চেতনে সমন্বয়, আলোকে আঁধারে সমন্বয়, সত্যে মিথ্যায় সমন্বয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলে কানে আঙুল দিতেন না কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নির্দেশমত বেদান্ত-সাধনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসি-পার্ষদ স্বামী (সারদানন্দজী শরৎমহারাজ) লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসদীক্ষার বিশদ বর্ণনা আছে। সন্ন্যাস লইয়াও ঠাকুর কেন গৈরিক পরিতেন না তাহার ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অতি-ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নন। স্থূল সূক্ষ্ম বহু যুক্তি বিস্তার করিয়া, কাব্য-সাহিত্য-অলঙ্কারের বহুতর প্রয়োগ হানিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—ঠাকুর আদপে সন্ন্যাসীই ছিলেন না! বেদান্তসাধন করিয়াছিলেন কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। ধর্মপত্নীকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব তিনি বরাবর গৃহস্থ।

বৃথাই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিকের গানে লিখিয়া গেলেন—'ত্যাগীশ্বর হে নরবর'!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, সকলকে নয়—গিরিশচন্দ্রকেই—'আমায় বকলমা দে'। বকলমা দেওয়ার তাৎপর্য কি, উহা দিবার অধিকারী কে, কাহারই বা বকলমা দেওয়া সার্থক ইত্যাদি বিশ্লেষণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে দেখিতে পাই (গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়)। কিন্তু সেই বিশ্লেষণকে অতিব্যাখ্যাতারা টানিয়া লইয়া গিয়া যখন একটি 'সহজ' সাধনে পরিণত করেন, যখন বলেন, "সাধনভজন করবার ক্ষমতা কি আর আমাদের আছে? আমরা 'জয়রামকৃষ্ণ' বলে ভবপারে যাব"—তখন প্রশ্ন জাগে, তবে এত ব্যাকুলতার কথা, এত ত্যাগবৈরাগ্যের কথা, এত একান্তে ঈশ্বরকে ডাকিবার কথা তিনি দিনের পর দিন কাহাদের জন্য বলিয়া গেলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' কিন্তু ইহার অর্থ নিশ্চিতই ইহা নয় যে, উহা দশমুণ্ড-ও বিংশবাহু-সমন্বিত এমন এক অপূর্ব অদ্ভুত অনুভূতি বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্তের সহিত যাহার কোনই মিল নাই।

'তোমরা বুঝিবে না, ইহা বেদবেদান্তের পারের কথা'—ইহা বলিয়া লোককে হয়তো প্রতারণা করা যায়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে নিশ্চিতই মহিমান্বিত করা যায় না। ভুলিয়া গেলে চলিবে না স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'বেদমূর্তি'। বলিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণজীবন বেদবেদান্তেরই জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ, কিন্তু গভীর। যদি গভীরকে ধরিতে না পার সহজ লইয়া পরিতৃপ্ত থাক—কিন্তু গভীরে পৌঁছিতে গিয়া যেন ঘূর্ণাবর্তে পড়িও না এ বিষয়ে হুঁশ রাখিয়ো।

"গতিশীল সংস্কৃতি"

কিছুদিনপূর্বে যক্ষ্মাপীড়িতগণের জন্য একটি আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের সাহায্যার্থে কলিকাতায় যে চিত্রতারকাদের (পুরুষ এবং স্ত্রী) ক্রিকেট ম্যাচ হইয়া গেল উহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। লোক-হিতকর কাজের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারা অর্থসংগ্রহ এদেশে বহুদিন হইতেই চালু আছে কিন্তু সেই আমোদপ্রমোদের ধারা সম্বন্ধে সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বনীয়। আনন্দবাজার পত্রিকা 'নিতান্ত বিসদৃশ'-নামীয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন -

> "চিত্রতারকাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলা যেমন অনুষ্ঠান-হিসাবেই স্ববিরোধী ব্যাপার, তেমনি নৈতিকবিচারেও সৌষ্ঠবহীন ও অশোভন। * * জনসমাজের একশ্রেণীর মনে চিত্রতারকাদিগকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য যে প্রবল কৌতূহল আছে, তাহা উচ্চশ্রেণীর এবং সুস্থ ও সঙ্গত কৌতূহল নহে বলিয়াই আমরা মনে করি।"

'দৈনিক বসুমতী' মনে করেন (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'তারকার নাচ' এবং অপর একটি মন্তব্য 'ভাবিবার বিষয়') এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালী সভ্যতা ও কৃষ্টির অসম্মান করা এবং একটি নৈতিক কুদৃষ্টান্ত দেশের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। একাধিক ভদ্রলোক বিভিন্ন কাগজে প্রতিবাদাত্মক পত্রও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু সমর্থকেরও অভাব নাই। জনৈক পত্র-লেখক 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় বলিতেছেন (২৬।১১।৫৪):—

> "কিছুকাল পূর্বে নূতন দিল্লীতে বয়োবৃদ্ধ এবং গম্ভীরাত্মা লোকসভার সদস্যগণ যখন একটি দাতব্য ক্রিকেট ম্যাচে নামিয়াছিলেন তখন তো আপনাদের বিবেক আহত হয় নাই। * * তরুণ এবং চাকচিক্যময় চিত্রতারকাদিগকে যদি তাঁহাদের পেশাদারী নৃত্যগীতাদি বন্ধ রাখিয়া একদিন কলিকাতায় তাঁহাদের অগণিত অনুরাগিগণকে আনন্দ দিবার জন্য খেলার মাঠে নামিতে অনুরোধ করা হয় তাহাতে দোষ কি? * * * নারীতারকারা খেলায় যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া যদি আপত্তি উঠে তাহা হইলে আমি বলিব স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এত কুণ্ঠা অনুচিত। আমরা তো স্ত্রীজাতিরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের গৃহ যদি নারীর উপস্থিতি দ্বারা সঞ্জীবিত না হইত তাহা হইলে গৃহ আর গৃহ থাকিত না। * * সংস্কৃতি ভাল জিনিস—কিন্তু সংস্কৃতি স্থিতিশীল বস্তু নয় উহা গতিশীল—কালের সহিত উহাও বাড়িয়া চলে।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

এই পত্রলেখকের মন্তব্যের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। লোকসভায় সদস্যদের ম্যাচ আর চিত্রতারকাদের (নারী ও পুরুষ) ম্যাচ—এই দুইটি অনুষ্ঠানের পটভূমি ও আবেদন যে এক নয় তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা স্ত্রীজাতির গর্ভে জন্মিয়াছি এবং স্ত্রীজাতি আমাদিগের গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়াই তো তাঁহাদিগকে আমরা সম্মানের চোখে দেখিব, হাল্কা কৌতূহলের দৃষ্টিতে নয়। নারীর মর্যাদা হৃদয়ের গভীরে তুলিয়া রাখিব বলিয়াই তো খেলার মাঠে তাঁহার রূপ যৌবন লাস্য উপভোগ করিতে যাইব না। 'গতিশীল সংস্কৃতি'র নামে সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বনিয়াদই যদি ধসিয়া পড়ে তো অহো দুর্ভাগ্য!

বাঙ্গালী শ্রমিক

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় (৯ই আশ্বিন, রবিবার) 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' নামক নিবন্ধে

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কয়েকটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকগণকে স্বাবলম্বী এবং শ্রমানুরাগী দেখিবার জন্য এই মহাপ্রাণ দেশসেবকের গভীর আগ্রহ ও প্রাণপাতী চেষ্টার কথা সর্বজন-বিদিত। নলিনীবাবুর সহিত আচার্যের একটি কথোপকথনের অংশবিশেষ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

তিনি বললেন, "তুই বুঝি বাসেই যাতায়াত-করিস ?"

"বাসেও চলি, ট্রামেও চলি।"

"আচ্ছা বল্ দেখি, যতগুলি বাসে চড়েছিস তার মধ্যে কখানা বাঙালীর আর কখানা অ-বাঙালীর ? আর সে সব বাস যারা চালায়, যারা টিকিট বিক্রি করে, তাদেরই বা বাঙালী অবাঙালীর হার কত ?"

আমি বললাম, "তা আমি কি করে বলব ? তবে, এটা ঠিক যে, বাঙালীর হার খুবই কম। অধিকাংশ বাস অ-বাঙালীর। বাসের ভিতরেই মালিকের নাম লেখা থাকে। আর সেসব চালক ও টিকিট-বিক্রেতারা প্রায় শতকরা একশ অবাঙালী।"

আচার্যদেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "বাংলা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে অবাঙালীর হাতে। আর এদিকে তোরা ভারত স্বাধীন করবার জন্যে অন্ধের মত বোমা রিভলবার ছুড়ছিস্।"

এই কথোপকথন যখন হইয়াছিল তখন ভারত পরাধীন। আজ স্বতন্ত্র ভারতে বাঙ্গালী যুবকদের অবশ্যই স্বাধীনতালাভের জন্য বোমা রিভলবার ছুড়িবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আচার্য বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন স্বাতন্ত্র্য-সংগ্রাম হইতে অবসর পাইলেও বাঙ্গালী অর্থনৈতিক ও শ্রমনৈতিক স্বাধীনতার দিকে বিশেষ কিছু চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারে নাই। নিষ্ফল রাজনৈতিক দলাদলিতে তাহার সমস্ত গঠন-শক্তি নষ্ট হইতেছে। মানভূমের বা পূর্ণিয়ার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সংযোজিত হইলেই বাঙ্গালীর জীবনসমস্যার সমাধান হইবে না। বাঙ্গলার যে ভূমিভাগ এখনও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ম্যাপে পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া পরিচিত তাহা নিছক ভূমিভাগই মাত্র। উহার ব্যবসাবাণিজ্য, শ্রমিক সংস্থা, সামাজিক লেনদেন এমনকি সাংস্কৃতিক কাঠামোও যে উত্তরোত্তরই বাঙ্গালীত্বের ছাপমুক্ত হইতেছে ইহা অতি নির্মম সত্য। শ্রীভূপেশচন্দ্র লাহিড়ী 'কলিকাতায় বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কলিকাতায় অবাঙ্গালী শ্রমিকের পরিসংখ্যান দিয়াছেন। কলিকাতা ও হাওড়া ষ্টেশনে ও পোর্টকমিশনারের জেটিগুলিতে প্রায় ২৫ হাজার লোক মাল বহনের কাজ করে, তাহাদের মধ্যে একটিও বাঙ্গালী নাই। বন্দরে মাল খালাস করিবার ৩ হাজার গাধাবোটের ১০ হাজার মাঝি—তাহারা সকলেই প্রায় অবাঙ্গালী (কিছু পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান আছে)। কলিকাতায় প্রায় ৬০০০ রিক্সাচালক ও ৫শত ঘোড়ারগাড়ী-চালক সকলেই অবাঙ্গালী। ঠেলা ও গরুমহিষের গাড়ীর চালক—৩০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। কলিকাতার রাস্তায় ৫ হাজার ঝাঁকামুটে সকলেই অবাঙ্গালী। কর্পোরেশনের জলের কল, রাস্তা মেরামত, রাস্তা পরিষ্কার প্রভৃতি কাজে ১৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে অবাঙ্গালীরই বিপুল সংখ্যাধিক্য। মাটি কাটা, ইট তৈরী প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ৫০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাওয়া দায়। ধুপী, ক্ষৌরকার, মুদি, মিঠাইওয়ালা, গোয়ালা, দারোয়ান ইত্যাদির বহু কাজেও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য। পানের দোকান, বিড়ি সিগারেট ও শরবতের দোকান প্রভৃতিতেও বাঙ্গালী কোণঠাসা। জুতা সেলাই, মেরামত প্রভৃতি চামড়াসংক্রান্ত কাজ সম্পূর্ণভাবে অবাঙ্গালীর করায়ত্ত। পাটশিল্পে মোট লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩ হাজার। তাহার মধ্যে পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং কেরানীগিরি কাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা মোটামুটি ১৫ হাজার, বাকি ২লক্ষ ৮৭ হাজার শ্রমিকের মধ্যে অবাঙ্গালীদেরই বিপুল সংখ্যাধিক্য।

সত্য বটে, বাঙ্গালীর দৈহিক দুর্বলতা গুরুতর শ্রমসাধ্য কাজের উপযোগী নয়—কিন্তু উপরোক্ত তালিকায় এমন বহু কাজ নাই কি যাহা বাঙ্গালী একটু অভ্যাস করিলেই করিতে পারে? যে উৎসাহ লইয়া বাঙ্গালী যুবক পাড়ায় পাড়ায় হাতেলেখা মাসিকপত্র, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' প্রভৃতির আয়োজন করে সেইরূপ বা ততোঽধিক আগ্রহ লইয়া যাহাতে বেকার যুবকদের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করিবার রুচি ও ইচ্ছা জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইহা শুধু বাঙ্গালী বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যই প্রয়োজন তাহা নয়, বাঙ্গালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্যও উহা অপরিহার্য। বাঙ্গালী 'আরামজনক' কাজের দিকে চাহিয়া থাকে বলিয়াই অবাঙ্গালীরা আসিয়া জীবন-সংগ্রামের সব ক্ষেত্রে তাহাকে হটাইয়া দিতেছে। বাঙ্গালী যদি এদিকে আত্মসচেতন হয় এবং যে সকল শ্রমসাধ্য জীবিকা তাহার দেহে কুলায় বৃথা আভিজাত্যবোধ ত্যাগ করিয়া সুসংহতভাবে তাহা গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা একটি সঙ্গত মহান আদর্শেরই বাস্তব রূপায়ণ হইবে, 'প্রাদেশিকতা' হইবে না। 'ছোটকাজ' বলিয়া কোন জিনিস আজকাল আর সমাজজীবনে বর্তমান নাই—কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর মনে এই কুসংস্কার যেন এখনও চাপিয়া আছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থা অনেক ভাল। বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্বের জন্য গর্ব অনুভব করে। কিন্তু এই বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা কি? শুধু মিহি গলায় করুণ টানা সুরে গান, কবিতালেখা, 'সাংস্কৃতিক বক্তৃতা' আর নৃত্যানুষ্ঠান? তাহা দ্বারাই কি বাঙ্গালী বাঁচিবে? বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা যাহাই হউক ছোটবড় কাজের নিষ্ফল বিচার ত্যাগ করিয়া সকলপ্রকার শ্রম-জীবিকায় ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের ন্যায় দলে দলে লাগিয়া না গেলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ও শ্রমনৈতিক কাঠামো দাঁড় করানো যাইবে না—ঐ কাঠামো দৃঢ় না হইলে 'সংস্কৃতি'র মনোরম সৌধও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গত ৭ই আগষ্ট ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়শনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গলার শিল্পপতিগণকে (যাঁহারা অধিকাংশই অবাঙ্গালী) তাঁহাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—এই সমস্ত বাঙ্গালী শ্রমিক অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকদের ন্যায় দক্ষতাসম্পন্ন।' কথা এই যে, শুধু কারিগরী শিল্প নয়, সকল প্রকার শ্রমের কাজেই বাঙ্গালী কর্মীর অভাব না হয় এবং বাঙ্গালীর শিল্প বাণিজ্য সংসার সমাজ দিনের পর দিন প্রধানতঃ বাঙ্গালীর শ্রমেই পরিনিষ্পন্ন হয় এমন শুভদিন বাঙ্গলায় কবে আসিবে?

অভিনন্দন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু এ বৎসর ৬৫ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বয়সও গত ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩ রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪) সত্তর পূর্ণ হইল। সমগ্র দেশের সহিত আমরাও আমাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠিত অভিনন্দন ভারতমাতার এই আদর্শ সেবকদ্বয়ের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করেতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশমাতৃকার সেবাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা জ্ঞান করিবার আহ্বান ভারতের যুবকগণকে মর্মস্পর্শী আবেগে জানাইয়াছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী—দুইজনেই তাঁহাদের জীবন ও কর্মে এই আদর্শকে বিশিষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং স্বার্থবুদ্ধি, লোকমান্য, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিকে দূরে রাখিয়া অতন্দ্রিত পরিশ্রমে দেশকে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনও বহুবর্ষ এই মহাব্রত পরিপালন করিবার শক্তি ভগবান তাঁহাদিগকে দান করুন ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

অতীন্দ্রিয়তা ও মরমী অনুভূতি

স্বামী প্রভবানন্দ

পৃথিবীর সকল ধর্মেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উহা এই যে, ধর্মসমূহের প্রত্যেকটিই মূলতঃ অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐশ্বরিক সত্য লাভ করা যায় না, বিচার দ্বারাও নহে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ঋষি ও প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া দাবি করা হয়। এইগুলি আমরা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই জগতের বিবিধ ধর্মগ্রন্থে। খ্রীষ্টধর্ম যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বাইবেল হইতেছে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রত্যাদিষ্ট সাধক বর্গ (prophets) এবং খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রাপ্ত ঈশ্বরাদেশের সমষ্টি। এইরূপ কোরাণ মহম্মদের ও ত্রিপিটক বুদ্ধের পাওয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের লিপিবদ্ধ সংগ্রহ। প্রত্যেক ধর্মের এক একটি নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে, আর উহাকে বলা হইয়া থাকে ঈশ্বরের বাণী।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ বলেন এই আদেশ একমাত্র তাঁহাদেরই স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রে সংরক্ষিত আছে। হিন্দুগণ কিন্তু এইরূপ কোন দাবি করেন না। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে যখন তাঁহারা বলেন 'অনাদি' ও 'অনন্ত' তখন ইহাই সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বরাদেশকে তাঁহারা কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তকের কতিপয় পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতেছেন না। গ্রন্থের আদি ও অন্ত আছে কিন্তু আপ্তবাণী হইতেছে সনাতন।

প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে যখন কোন বিশেষ ধর্ম-শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি, তখন স্বভাবতই ঐ সত্যের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর কোন জোর দেওয়া হয় না। আমরা বিশ্বাসের বলে ঐ সত্যসমূহকে স্বীকার করিয়া লই। ধর্মকে যদি শুধু 'বিশ্বাস' করা হয় এবং তাহা যদি আমাদিগকে সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সত্যসমূহকে নিজস্ব করিয়া লইতে প্রেরণা না দেয়, তাহা হইলে ধর্ম হইয়া পড়ে নিষ্ফল। সে ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনই হয় মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্রপুস্তকে আমরা কতকগুলি নৈতিক সূত্র ও বিধি নিয়মাদি দেখিতে পাই। মানুষের সমাজকে পরি-চালিত করিবার জন্য এগুলি খুব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভবের চেষ্টা না করিয়া শুধু নৈতিক আচার ও বিধিনিষেধ-সমূহ অনুসরণ করিয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি তাহা হইলে সংসারে আমরা 'ভাল লোক' বলিয়া পরিচিত হই সত্য, কিন্তু উহাই কি সব? একমাত্র ভগবৎ-দর্শন দ্বারাই জীবনে রূপান্তর আসিতে পারে। অতএব কোন ধর্মকে যথাযথ অনুসরণ করা মানে নিজেদের জীবনে ঐ ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট সত্যসমূহের অনুভব। ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহাকে জানা যাইতেছে, তাঁহার দেখা পাইতেছি, ততক্ষণ তো তিনি কল্পনামাত্র। নিছক কল্পনায় জীবনের রূপান্তর হয় না। মহাজ্ঞানী দার্শনিক আচার্য শংকর বলেন,—'ঐশ্বরিক সত্য লাভ করিবার পক্ষে শাস্ত্রসমূহেরই একমাত্র প্রামাণ্য নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই উহার প্রকৃত প্রমাণ।' সত্য হইতেছে চিরন্তন। সেই সত্য যদি অতীতের ঋষি ও প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে তাহা হইলে আধ্যাত্মিক পথের যে কোন পথিকের নিকটই উহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

ধর্মীয় মতবাদসমূহের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধর্মের মূল উৎসকে অনুসন্ধান করিলেও দেখি যে, সেই একই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে—

প্রত্যক্ষানুভূতি। উপনিষদের জনৈক ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন,—"হে অমৃতের সন্তানগণ, শুন, আমি সেই সত্যকে জানিয়াছি যাহা অন্ধকারের অতীত। তোমরাও উহা জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম কর।" বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে,—"যে ব্যক্তি কথা অনুযায়ী কাজ করে না তাহার বাক্য যেন গন্ধহীন সুন্দর পুষ্প—মনোরম কিন্তু ব্যর্থ।" হয় তো কাহারও ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় সত্যগুলি জীবনে কার্যকরী করিতে না পারিলে তাহার সুন্দর কথাগুলি নিরর্থক হইয়া যায়। "যে কথা অনুযায়ী কাজ করে, বর্ণে ও গন্ধে পরিপূর্ণ সুন্দর পুষ্পের মতো তাহার কথাগুলি পবিত্র ও ফলপ্রসূ হয়।"

খ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—"সত্য কি তাহা জানিতে হইবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে মুক্ত করিবে।"

কাহাকেও ধর্ম প্রচার করিতে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"তুমি কি আদেশ পাইয়াছ?" অর্থাৎ তুমি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ? তাঁহাকে জানিয়াছ ও অনুভব করিয়াছ? অপরে আহার করিলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না। ধর্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ধর্ম তখনই সার্থক যখন উহা জীবনে পরিবর্তন আনে এবং মানুষকে আধ্যাত্মিকতার এমন এক স্তরে লইয়া যায় যেখানে রহিয়াছে বিশুদ্ধ আনন্দ এবং জ্ঞানের অনুভব। উহাই ধর্মের সার্থকতা। উপনিষদে আছে—"আনন্দেই এই বিশ্বের জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয়।" এই সত্যের অনুভবই ধর্মের সার কথা। অতএব ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়তা অভিন্ন। ইহা কোন বিশেষ মতবাদ বা অন্ধবিশ্বাসের উপর স্থাপিত নয়। ইহার অর্থ এই যে, মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে, তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারে, ঈশ্বরসত্তার সহিত নিজের যোগস্থাপন করিতে পারে। মরমীরা (Mystics) সব যুগেই ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তাঁহারাই নিজেদের অন্তরে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্ত্রে নিহিত সত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন।

মানুষ ধর্ম চায় কেন? গভীর মনোবিদ্যার দিক হইতে বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কোন মতবাদ বা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয় লন নাই। তাঁহার দৃষ্টি যেন প্রত্যেক মানুষের অন্তরের গভীরতায় পৌঁছাইয়াছিল। বুদ্ধ বলিলেন—জগতের সকলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করে। প্রত্যেক প্রাণীই দুঃখকে জয় করিবার ও অসীমের সন্ধান পাইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। ইহাই ধর্মের সূত্রপাত। মানুষ যতদিন মনে করে ঈশ্বরানুভূতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে দুঃখকষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে ততদিন তাহাকে সুখ দুঃখের রাজ্যে থাকিতে হয়। দ্বন্দ্বাতীত না হইলে, দ্বৈতবোধের পারে না যাইতে পারিলে, অবিমিশ্র আনন্দ লাভ হয় না। সাংখ্যদর্শনকার কপিলের ভাষায় দুঃখকষ্টের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি—ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিই হইতেছে মানুষের চরম লক্ষ্য।

সাংসারিক সুখ বিসর্জন দিয়া বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি দেখিলেন প্রত্যেকের তিনটি দুঃখ—ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু। শুধু নিজের জন্য নয়, মানব-সাধারণের জন্য বুদ্ধ এই দুঃখত্রয়ের হাত হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়াছিলেন। নির্বাণ অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ সকল প্রকার দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধই একমাত্র এই সত্য প্রচার করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ, খ্রীষ্ট এবং জগতের বড় বড় অবতারগণের প্রত্যেকেরই শিক্ষার মর্ম ইহাই।

মানুষ নিজের মাপ দিয়াই সকল জিনিস ওজন করে। তাহার প্রকৃতিতে জড় হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সর্বস্তরের সত্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বুধজনেরা বলেন, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়ে এই মানুষ। সে নিজেকে দৈহিক বা মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক সত্তা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে। নিজেকে স্থূলদেহ মাত্র মনে করিলে বিশ্বের সব

কিছুর স্থূল, পাঞ্চভৌতিক দিকটাই মনে পড়ে। আবার মানুষ যখন নিজের মানস সত্তার সহিত তাদাত্ম্যবোধ করে তখন তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে। আর নিজেকে আধ্যাত্মিক জীব বলিয়া ভাবিলে তাহার আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন সব কিছুকেই সে আত্মারূপে, ভগবানরূপে দেখে। যতদিন আমরা নিজেদের দেহ বা মন বলিয়া মনে করি, ততদিন দ্বৈতবুদ্ধি যায় না। মনের সহিত নিজের একাত্মতা বোধ যতদিন থাকিবে ততদিন সুখ ও দুঃখ উভয় বোধই থাকিতে বাধ্য। মানুষ মূলতঃ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। দেহ ও মনের সার্থকতা উহারা মানুষের এই আত্মিক সত্তা অনুভব করিতে সহায়ক হইবে বলিয়াই। আত্মচৈতন্যের অনুভূতি হইলেই মানুষ সর্বপ্রকার বন্ধনের পারে চলিয়া যাইতে পারে।

এখন ধর্ম বা মরমীবাদের বিপক্ষীয় কয়েকটি আপত্তির বিচার করা যাক। একটি প্রধান আপত্তি এই যে, অতীন্দ্রিয়তা হইল পলায়নবাদ। কিন্তু বাস্তবিক উহা কি অন্যায়? বাড়ীতে আগুন লাগিলে জ্বলন্ত গৃহ হইতে কি লোক পলায়ন করিবে না? সত্য বটে অতীন্দ্রিয়তা জীবনের দুঃখ ও বন্ধন হইতে পলায়নের পথ বলিয়া দেয়, কিন্তু কাহার না তাহা কাম্য? অধিকন্তু মরমী কেবল নিজের মুক্তি অনুসন্ধানের জন্যই দুঃখকষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন না। বোধি লাভ করিয়া তিনি অপর সকলকে অজ্ঞতার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। তিনিই যথার্থ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। বৈদান্তিক আদর্শ হইল—"মুক্তি, নিজের ও মানব জাতির কল্যাণার্থে।"

অমনি আর একটি আপত্তি উঠে—জীবন কি দুঃখময়? এ কথা সত্য যে বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই জীবনকে দুঃখময় বলিয়াছেন; "যে আত্মরক্ষা করিবে সে জীবন হারাইবে।" কিন্তু তাঁহাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য কি ছিল? উক্ত কথার তাৎপর্য এই যে, পার্থিব জীবন স্বতই দুঃখের নহে, কিন্তু উহাকে যখন চরম ও পরম লক্ষ্য মনে করি তখনই উহা দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর এই জীবনকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্যই জীবনের প্রয়োজনীতা। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—"নবজন্ম না হইলে মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" কিন্তু সেই নূতনজন্ম লাভ করিতে হইলে দেহ ধ্বংসের প্রয়োজন নাই। নূতন করিয়া জন্মাইতে হইবে আমাদিগকে চেতনার দিক দিয়া—এই জীবনেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

আর একটি আপত্তি—অতীন্দ্রিয়তাবাদ যুক্তিবাদের বিরোধী। ইহা কিন্তু সত্য কথা নয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হইল যুক্তির সীমার ঊর্ধ্বে। মানুষকে ইহা 'বুদ্ধির অতীত শান্তি'তে লইয়া যায়। জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিবেই ইহা কেহ বলিতে পারে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিককে নূতন নূতন যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। আমরা যাহাকে 'যুক্তি' বলি উহাকে একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কাজ করিতে হয়, আর উহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতেই আপন তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলিও অভ্রান্ত জ্ঞান। সেগুলি কতিপয় ব্যক্তির নিকটেই সীমাবদ্ধ নহে, যে কেহ ইন্দ্রিয়-সংবেদনকে অতিক্রম করিতে পারিবেন তিনিই উহা লাভ করিবেন।

মনগড়া কল্পনা এবং যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতির পার্থক্য কি? ধরুন, কাহারও হয়তো মতিভ্রম হইয়াছে অথচ সে উহাকেই অতিচেতন জ্ঞান বলিয়া দাবি করে। বুঝিব কিভাবে? প্রথমতঃ প্রত্যাদিষ্ট সত্যের লক্ষণ এই যে, উহা অন্য কোন প্রণালী বা উপায়ে জানা যায় না। উহাতে অনেক তথাকথিত "যৌগিক বিভূতি" বাদ পড়িয়া যায়। যেমন, 'দূরদর্শন' বা 'দূরশ্রবণ'—এগুলি তো টেলিভিশন বা বেতারের সাহায্যেও জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ

আপ্তবাণী অন্য কোন প্রমাণের প্রতিকূল হইবে না। যদি আমার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ অপরের অভিজ্ঞতার বিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অখণ্ডনীয় নহে। অন্য কথায়, যুক্তিকে প্রমাণরূপে ধরিতেই হইবে।

ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্তির তিনটি স্তর আছে। প্রথম, শাস্ত্র হইতে বা যাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য শুনিতে হইবে। কিন্তু উহার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। বহুলোক শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করে অথচ উহার অর্থ কি জানে না। অতএব দ্বিতীয় স্তর হইল সত্যকে বিচার করিয়া দেখা। বিচারদ্বারা বোধশক্তি লাভ হয়। তৃতীয় স্তর হইতেছে সত্যের ধ্যান করা। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব একটি পন্থা আছে। রসায়ন শাস্ত্র পড়িতে হইলে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উহার প্রয়োগ শিখিতেই হইবে। সেইরূপ, ঐশ্বরিক সত্যের প্রয়োগ শিক্ষা করাই ধর্ম। কিন্তু এই প্রয়োগ শিখিতে গেলে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত ও নিয়ম মানার প্রয়োজন হয়। একজন মহাপুরুষকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"পথ কি ?" তিনি উত্তর দিলেন "প্রাচীন ঋষিগণ যে পথে গিয়াছেন উহাই পথ।" যেমন ধরুন, আমি পদার্থবিদ্যা শিখিতে চাই। পদার্থ-বিদ্যাবিদের নিকট গিয়া বলিলাম, আমি শুধু ধ্যান করিয়া ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিব। এইরূপ মনোভাব হইলে আমি কখনও পদার্থ বিদ্যাবিদ্ হইতে পারি কি ? উহা শিখিতে হইলে ঐ বিজ্ঞানানুশীলনের নির্দিষ্ট নিয়মগুলি অনুসরণ করিতেই হইবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। প্রাচীন ঋষিরা যে পথে গিয়াছেন উহাই পথ। উহা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সেই পথটি কি ? সংক্ষেপতঃ উহা হইল আত্মসংযম এবং ভগবদ্‌ভক্তি। চঞ্চল মনকে বশ করিতেই হইবে ও সেই মন ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। প্রর্থনা, একাগ্রতা ও ধ্যানই উহার উপায়। এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা গড়িয়া উঠে।

এই নিয়মগুলি অনুশীলন করিলে সাধকের ধর্ম-চেতনা বর্ধিত হয় এবং সে মানুষের ও বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করে। বাহিরের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার পর সূক্ষ্ম দেহ বা মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। ইহার পর কারণ শরীর বা জীব-সংস্কারের আশ্রয়। এই সব কিছুকে ছাড়াইয়া আত্মা বিরাজ করিতেছেন। আত্মাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। আত্মা এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই আবরণত্রয়ে আবৃত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে মানুষ যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বাস করে। এই সকল আবরণকে অতিক্রম করিলেই সে চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয়ে পৌছায়। তখনই হয় বিশুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার।

অনুরূপভাবে এই ভৌতিক বিশ্ব যেন ব্রহ্মের বা আত্মার স্থূল শরীর। আর স্থূল বিশ্বের অন্তরে রহিয়াছে সূক্ষ্ম বা মানসজগৎ। উহা যেন ব্রহ্মের সূক্ষ্মদেহ। এই মানসস্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের কারণ শরীর। কারণ শরীর অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা। তাঁহারই নাম ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। ঈশ্বরের এই কারণ শরীরের পরে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বা নির্গুণ ব্রহ্ম।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সমর্থন করেন। উদাহরণস্বরূপ এক বিন্দু জল লওয়া যাক্। উহার মধ্যে সমগ্র সৌর জগতের প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হইবে। সেইরূপ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা বর্তমান, মানুষের মধ্যেও তাহা বর্তমান। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সাধকের নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যায়। পাঞ্চ-ভৌতিক দৃষ্টি দিয়া আমরা স্থূল বিশ্বকে দেখি। যতই অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি ততই সত্যের অন্য স্তর উন্মুক্ত হয়। সূক্ষ্ম স্তরে লোকের হয়তো অলৌকিক

কিছু দেখিবার ও শুনিবার শক্তি হইতে পারে। স্থূল বিশ্বে স্থূল প্রলোভন আছে। মানসিক বিশ্বে তেমনি মানসিক প্রলোভন আছে। 'সিদ্ধাই' লাভ করিয়া যদি কেহ সেগুলি ব্যবহার করে তবে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। যাহা হউক, প্রত্যেককেই এই স্তর দিয়া যাইতে হয় না। উহার পর কারণ স্তর। এই স্তরে মানুষ দেখে ব্রহ্মের 'ব্যক্তি'-স্বরূপ বা ঈশ্বর-রূপ। তখন কাহারও মূর্তি-দর্শন বা মন্ত্র-দর্শন ঘটে। আবার সেইসব ঈশ্বরীয় রূপ মিলাইয়া শুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে পারে। 'কারণ' স্তর পার হইল ব্রহ্মের নির্গুণ সত্তা বা নিরুপাধিক সত্তা। এখানে আসিলে ঈশ্বরের সহিত ভেদবোধ থাকে না, থাকে নিবিড় তাদাত্ম্যানুভূতি।

হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান প্রত্যেকেই এই অবস্থা লাভ করিতে পারে। সেইজন্যই যথার্থ ধর্ম সার্বজনীন। উহা বলে না, আমার পথই একমাত্র সত্য। সব পথকেই উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে। খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণ যাঁহাকেই অনুসরণ করা যাক না কেন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ উভয়েরই এক সত্তা। পথ যাহাই হউক সর্বদা স্মরণ রাখা চাই যে, খ্রীষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ হওয়া আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের আদর্শ হইল 'শ্রীভগবানের মানুষ' হওয়া।

এস

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ক্ষণিকের এই স্বপন-মায়ায় হারায়ে তোমারে আজ
কত না দহন সহি নিশিদিন, হে মোর হৃদয়-রাজ!

ভাবি যারা প্রিয় অতি আপনার আমি নহি তাহাদের
বেদনার মাঝে ভুলিব কেমনে—তারা শুধু বিলাসের।
যেদিন হিসাব হয়ে যাবে শেষ নাহি রবে পরিচয়
বারে বারে হেরি বেদনাবিধুর জীবনের অভিনয়।
তাই রহে যারা নহে তারা মোর, হারায়ে ফেলেছি যারে
সেই হবে চির পথের বন্ধু—সাথী হবে পরপারে।

ব্যথা-কণ্টকে ছিন্ন যখন আমার হৃদয়খানি
অন্তরে আমি শুনেছি তখন তোমার অভয়-বাণী।
তুমি ভুলিবে না জানি ওগো আমি—তোমারে ভুলেছি তাই
স্বপনের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আজ তাই হে তোমারে চাই।
ধূলায় মলিন আলোকবিহীন জীর্ণকুটীরে মম
বারেকের তরে এস সুন্দর, এস এস প্রিয়তম!

শিক্ষার ভিত্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

(তিন)

'বনফুল'

[বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' বক্তৃতা]

বর্তমানে কি করিয়া ধর্মকে আমাদের শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তাহার অনুকূল কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যে সব মনীষী আমাদের নব্যভারতের নির্মাতা ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজা রামমোহন রায় যে প্রাচীন বেদান্ত ও উপনিষদ্‌কেই আমাদের জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন একথা সুবিদিত।

বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্বে তাঁহার ধর্মতত্ত্ব নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—ধর্ম বলিতে ভারতবাসীর মনে যে ভাবের উদয় হয় ইংরেজী 'রিলিজন' শব্দটি সে ভাবের বাহক নয়। তিনি বলিয়াছেন সংক্ষেপে ধর্মের অর্থ পূর্ণ-বিকশিত মনুষ্যত্ব। উক্ত পুস্তকেই তিনি গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"আমিও সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, 'না, তাহা চলিবে না। আমাদের বিধিগুলির সর্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া যদি এখন চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ হইবে।' হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি।...কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের সর্বাংশই ধর্মকর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্যজাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ, সকল লইয়াই ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময় ধর্ম কি আছে?"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাহিত্য ও সাধনা এই ধর্মেরই মহিমা প্রচার করিয়া জগতের শিক্ষিত সমাজে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তিনি এই ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ নানা দৃষ্টিকোণ হইতে করিয়াছেন। কিন্তু চিকাগো বক্তৃতায় হিন্দু-ধর্মের সারমর্মটি তিনি বলিয়াছিলেন। "Unity in Variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force the society to adopt them...The Hindus have discovered that the absolute can only be realised or thought of or stated through the relative and the images, crosses and crescents are simply so many symbols, so many pegs to hang the spiritual ideas on.

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাশতদল বিকশিত হইয়াছে

এই ভারতীয় ধর্মের মৃণালশীর্ষে। ভারতীয় ধর্মই যেন আধুনিক যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যরূপে নূতন মূর্তিতে, নূতন বর্ণে, নূতন ছন্দে, নূতন দ্যোতনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ধর্মই তাঁহার কবিতায় গানে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে প্রার্থনায় ওতপ্রোত হইয়া আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার সম্মুখে সনাতন অথচ অভিনব বিস্ময়লোকের সন্ধান দিয়াছে। বস্তুত, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে শাশ্বত দেবতাকে তিনি ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারই আরতি তিনি সারাজীবন করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গাহিয়াছিলেন—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসনপাশে
প্রেম-হার হয় গাঁথা
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয়হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা।

এই ভারতীয় ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে তিনি যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা আপনারা সকলেই পড়িয়াছেন, তবু এই প্রসঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে,
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার ;
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ-ত্যজি' সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এই ব্রহ্মময় সনাতন ধর্ম মহাত্মা গান্ধীরও জীবনের প্রেরণা। ইহার মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, আত্মশক্তিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, একমাত্র শক্তি। এই সনাতন ধর্মই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, প্রেমই সভ্য-মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ । গীতার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "I learnt Sanskrit to enable me to read the Gita. To-day the Gita is not only my Bible or my Koran—it is my mother. I lost my earthly mother who gave me birth long ago, but this eternal mother has completely filled her place by my side ever since. She has never changed, she has never failed. When I am in difficulty or distress I seek refuge in her bosom.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা হইয়াছেন এই ধর্মেরই প্রভাবে। তাঁহার সমস্ত জীবন এই জননীর নির্দেশেই পরিচালিত হইয়া বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহাদেরও জীবনাদর্শ ভারতীয় সনাতন ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কিছু কিছু আমেজ হয়তো কাহারও কাহারও চরিত্রে লাগিয়াছে, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহাদেরও চরিত্রের মূল সুরটা যে ভারতীয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদিও তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন—I am an exotic plant : neither of the East nor of the West, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত প্রেরণা সমস্ত চিন্তার উৎস ভারতীয় ধর্মেরই মর্মবাণী। তাঁহার Discovery of India গ্রন্থে লক্ষ্য করি

উপনিষদের মহিমা তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের অভিমত তিনি সাগ্রহে এবং সগর্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শোপেন-হাওয়ার যেখানে বলিতেছেন—"From every sentence of the Upanishads deep, original and sublime thoughts arise and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit. In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of the Upanishads. They are products of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become the faith of the people. The study of the Upanishads has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

যেখানে তিনি Max Muller এর মত উদ্ধৃত করিতেছেন, "The Upanishads are to me like the light of the morning, like the pure air of the mountains, so simple, so true, if once understood..."

যেখানে তিনি আইরিশ কবি A. E.র অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন—"The Bhagavat Gita and the Upanishads contain such godlike fullness of Wisdom on all things that I feel the authors must have looked with calm remembrance back through a thousand passionate lives, full of feverish strife for and with shadows, ere they could have written with such certainty of things which the soul feels to be sure....

সেখানে তাঁহার মনও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষির সহিত সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে চরৈবেতি, চরৈবেতি। পথিক চল, চল।

যেখানে তিনি বলিতেছেন—I have loved life and it attracts me still and in my own way, I seek to experience it, though many invisible barriers have grown up which surround me. But that very desire leads me to play with life, to peep over its edges, not to be a slave to it, so that we may value each other all the more. Perhaps I ought to have been an aviator, so that when the slowness and dullness of life overcame me I could have rushed into the tumult of the clouds and said to myself—

'I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath
A waste of breath the years behind,
In balance with this life, this death'

সেখানে তিনি সত্য-সন্ধী ভূমা-উন্মুখ ভারতীয় সাধকেরই সমগোত্র। কারণ ভারতীয় ধর্ম Negation of life নহে, তাহা নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবনকে অবলম্বন করিয়াই সত্যান্বেষণ।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য আমাদের বর্তমান যুগের অন্য নেতাদের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। পণ্ডিত নেহেরুই তাঁহার Discovery of India পুস্তকে শ্রদ্ধেয় সি. রাজগোপালাচারীর উপনিষদ্‌সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজ-গোপালাচারী বলিতেছেন—"The spacious imagination, the majestic sweep of thought and the almost reckless spirit

of exploration with which, urged by the compelling thirst for truth, the Upanishad teachers and pupils dig into the 'open secret' of the universe, make this most ancient world's holy books still the most modern and most satisfying.

আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বর্তমানে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারাজীবন তিনি ভারতীয় ধর্মেরই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম মানব-ধর্ম, জীবন-ধর্ম। তাহা কোন doctrine বা Dogma র কারাগারে আবদ্ধ শুষ্ক নিয়মাবলীমাত্র নহে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও বিশুদ্ধ ভারতীয় ধর্মেরই সাধক। শুধু তিনি কেন মধ্য-প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল প্রবীণ পণ্ডিত আণে, আচার্য নরেন্দ্র দেব, এমন কি ভিন্নধর্মাবলম্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খাঁ, মহম্মদ আসফ আলী, বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের জীবনাদর্শ ও রচনাবলী হইতে প্রমাণ করা খুবই সহজ যে ভারতের সনাতন ধর্ম—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম বলিয়াছেন—যাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—It is the same light coming through glasses of different colours—সেই ধর্ম ইঁহাদেরও প্রত্যেকেরই জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। সে ধর্ম সুস্থ সবল অনাসক্ত স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যখন এইসব মনীষীদের প্রাণপণ প্রয়াসে ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তখন যে ধর্ম ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড সেই ধর্মটাই শিক্ষা হইতে বাদ পড়িয়া গেল।

আমাদের কন্‌ষ্টিটিউশনের ২২নং আর্টিকেলে বলা হইয়াছে—

(১) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds.

(২) No person attending any educational institution recognised by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given a consent thereto.

ইহাই বর্তমান আইন। Religion সম্বন্ধে এ আইন অন্যায় নহে, কিন্তু যে ধর্মের স্বরূপ আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি তাহা Religion নহে, তাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়া সত্য-সন্ধান, তাহা সুস্থ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা। এক হিসাবে এই এক-পেশে শিক্ষার মাধ্যমেও আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই ধর্মই অনুসরণ করিতেছি। রসায়নে, পদার্থবিদ্যায়, জীব-বিজ্ঞানে, গণিতে, সাহিত্যে, দর্শনে আমরা সত্যকেই অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু সেই সত্য জীবনের চরম সত্যের সহিত অসংলগ্ন বলিয়া আমাদের জীবনে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য মুখস্থ করিয়া ডিগ্রিলাভের কাজে তাহাকে নিয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। যাহার মূল্য

অন্তরের আনন্দিত উপলব্ধিতে, যে উপলব্ধি ব্যতীত সুস্থ সুন্দর জীবন অসম্ভব, তাহার মূল্য বাহিরের বাজারে খুঁজিতে গিয়া হতাশ হইতেছি। এই ধর্মহীন শিক্ষাই আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

একথা মিথ্যা নয় যে রিলিজনের নামে পৃথিবীর সর্বত্র বহু রক্তপাত হইয়াছে, ইহাও সত্য যে এই রিলিজনের ওজুহাতেই মাত্র কিছুদিন পূর্বে হিন্দু মুসলমানের পাশবিকতা ঘৃণ্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি তাহা এ ধরনের Religionএর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর যে University Education commission গঠিত হইয়াছিল (১৯৪৮-৪৯), অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ যে কমিশনের নেতা ছিলেন সে কমিশনও এবিষয়ে সচেতন।

কমিশন বলিতেছেন—What is responsible for the communal excesses is not religion as such but the ignorance, bigotry and selfishness with which religion gets mixed up Selfish people in an attitude of cynical opportunism use religion for their own sinister ends. In his thirtysecond year Napoleon professed himself ready to adopt any religion which might serve his purpose.

তাঁহারা বলিতেছেন যে রিলিজনের এই দ্বন্দ্ব-প্রবণতার জন্যই অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মতো আমাদের রাষ্ট্রও ধর্ম-নিরপেক্ষ secular হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের পার্লামেণ্টে যখন বিতর্ক হইতে-ছিল তখন ডাক্তার আম্বেদকার বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত রিলিজনের সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের নাই। একটি রিলিজনকে রাষ্ট্রধর্মের প্রাধান্য দিয়া অন্যান্য রিলিজনকে ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়, তাই তাঁহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা যে রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তাহাতে সন্দেহ কি। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ধর্মের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইলেও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহারা নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, একটি ভাষাকেই তাঁহারা রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধেই করিয়াছেন এবং হিন্দীকে নির্বাচন করিয়া তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন তাহাও আমি বলিতেছি না, আমার বক্তব্য যে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহারা যেমন একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলেন তেমনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই উদারতম ভারত ধর্মের অনুশীলনকেও শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তত স্থান দিতে পারিতেন। Religion ও Secular state সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া University commission অবশ্য ভারতের উদার ধর্মের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন যে আমাদের রাষ্ট্র যদিও ধর্ম-নিরপেক্ষ, কিন্তু "It does not mean that nothing is sacred or worthy of reverence. It does not say that all our activities are profane and devoted to the sordid ideals of selfish advancement. We donot accept a purely scientific materialism as the philosophy of the state. That would be to violate our nature, our 'Svabhava', our characteristic genius, our 'Svadharma'. Though we have no state religion, we cannot forget that a deeply religious strain has run throughout our history like a golden thread. Besides, in the preamble to our constitution we have

the makings of a national faith, a national way of life which is essentially democratic and religious.

অর্থাৎ তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ধর্মের উদার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন—"The adoption of the Indian outlook on religion is not inconsistent with the principles of our constitution.

ইহার পর তাঁহারা Indian outlook on Religion সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমৎকার। তাহাতে একথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে—"If religion is a mother of realisation it cannot be reached through a mere knowledge of dogmas. It is attained through discipline, training, Sadhana. What we need is not formal religious education but spiritual training....

কিন্তু এই spiritual training কি করিয়া লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। কেবল নিজের চেষ্টায়—যাহাকে তাঁহারা Self-effort বলিয়াছেন—আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া শক্ত। কোনও শিক্ষার পথেই self-effort দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি চুরি-বিদ্যা, পকেটকাটা-বিদ্যার জন্যও গুরু চাই। দুই একজন অসাধারণ ছাত্র হয়তো self-effort দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ছাত্রেরা তাহা পারিবে না। University commission যে শৃঙ্খলা, যে সংযম, যে সাধনার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, যে স্বাধীন জিজ্ঞাসু সত্তার উদ্ভব তাঁহারা ছাত্রদের মধ্যে মূর্ত দেখিতে চাহিয়াছেন, অন্য ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব তাঁহারা প্রতি ভারতবাসীর নিকট প্রত্যাশা করেন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না যদি ছাত্রদের বাল্যকাল হইতে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশে মানুষ না করা হয়। সেকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই পরিবেশ ছিল। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। University commission অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আলোচনায় ভারতবর্ষের আদর্শকে তাঁহারা মুখ্য স্থান দিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু শিক্ষার যেটা আসল ভিত্তি—সুস্থসবলচরিত্র-নির্মাণ সেইখানেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ রহিয়া গিয়াছে। University commission Dogma এবং competitive indoctrination এর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই dogma এবং competitive indoctrination কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ বিভিন্ন রূপে মূর্ত হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করিতেছে না? আমরা প্রত্যেকেই আজ এক বা একাধিক ইজ্‌মের কবলে পড়িয়া বা স্কন্ধে চড়িয়া আত্মভ্রষ্ট হইয়াছি। শুধু কমিউনিজ্‌ম্ নয় গান্ধী-ইজ্‌মও আজ আমাদিগকে কম বিব্রত করিতেছে না। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ কেহ অনুসরণ করে না, কিন্তু তাঁহার নামে দল পাকাইতে অনেকেই উৎসুক। সত্য শিক্ষার ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ যে কোনও মহৎ আদর্শকে লোকে dogma ও doctrine এ পরিণত করিবে। University commission truly religious man এর স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন —The truly religious man is the enemy of the established order, not its spokesman. He is the man of alien vision. He throws existing things into confusion. He is a revolutionary

who is opposed to every kind of stagnation and hardening. He is the advocate of the voice which society seeks to stifle, of the ideal to which the world is deaf.

ভারতবর্ষের ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ truly religious man এর বারংবার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া এরূপ truly religious man সৃষ্টি করা যায় না, প্রত্যেক বালককে বাল্যকাল হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে হয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রে সে সুযোগ আপাতত নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম চিরকাল প্রগতিশীল। তাহা কোনও কালে stagnation কে প্রশ্রয় দেয় নাই। বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড যখন সমস্ত জাতির প্রাণসত্তাকে আবিল করিয়াছিল তখন আমরা পাইয়াছিলাম উপনিষদের ঋষিদের, গৌতম বুদ্ধকে। বৌদ্ধ ধর্মের যখন অধঃপতন ঘটিল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় যখন "বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া উঠিল" তখন আবির্ভূত হইলেন কুমারিল ভট্ট, তাহার পর শঙ্করাচার্য, তাহার পর রামানুজ। মুসলমানের আমলে আমাদের নৈতিক জীবন যখন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা পাইয়াছিলাম শ্রীচৈতন্যকে। যে কয়জনের নাম করিলাম ইঁহারা প্রত্যেকেই শৈশবকালে আর্য ধর্মের আদর্শ-অনুসারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে ইংরেজের আমলে জড়বাদের কবলে আবার যখন আমাদের দেশের ধর্ম বিপন্ন, তখন যে সব বিদ্রোহী সমাজ-সংস্কারকদের আমরা পাই তাঁহারা যদিও বাল্যকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অতিবাহিত করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের আদর্শ ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই আদর্শ। রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকশিত করিয়াছেন।

এই ব্রহ্ম, এই সত্য সকল ধর্মেরই মূল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য, প্রতি ধর্মের ক্ষেত্রে নামটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর সুধী ও সাধক সমাজ বারংবার সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সুখ-শান্তির আশা নাই। কিন্তু কেবল মাত্র self-effort দ্বারা এই ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য Self-effort প্রয়োজন, সাধনার ক্ষেত্র পাইলেও সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় না, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্র না থাকিলে তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ পায়। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে সেরূপ ক্ষেত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই।

আমি অবশ্য ইহা দাবি করিতেছি না যে আমাদের রাষ্ট্র গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়া দিন এবং সেখানে ছাত্রেরা দলে দলে গিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুক। এরূপ ব্যবস্থা করিলে যে রাতারাতি আমরা সকলে ধার্মিক হইয়া উঠিব এ অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এ ক্ষোভ আমার আছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোন ছাপ নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রও পৃথিবীর অন্যান্য জড়বাদী রাষ্ট্রের অনুকরণমাত্র। আজ যখন পাশ্চাত্য দেশের চিন্তা-নায়কগণ জড়বাদের ভীষণ ভবিষ্যৎ দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আশা করিতেছেন যে ভারত-ধর্মই পৃথিবীতে একদিন হয়তো শান্তির পথ প্রদর্শন করিবে তখন ভারত-রাষ্ট্র কিন্তু নকল করিতেছে জড়বাদী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদের, তাহার সমস্ত উৎসাহ ও ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে কেবলমাত্র আধিভৌতিক উন্নতির উপর। পৃথিবীতে শান্তির পথ দেখাইতে হইলে জাতির চরিত্রে যে অধ্যাত্মবোধ জাগরূক করা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্র উদাসীন। আজ

একমাত্র বিনোবাজীর কর্মে ও বাণীতে ভারতের শাশ্বত আহ্বান শোনা যাইতেছে, কিন্তু তিনি শাসন-পরিষদের কেহ নহেন। তিনিও দেশের আধিভৌতিক দুঃখমোচনের জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার পদ্ধতিতে ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ সুরটি লাগিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর সভ্যসমাজ আজ মুগ্ধ বিস্মিত হইয়াছেন। আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রে সে সুর নাই। পরাধীনতার ফলে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি তাহা সত্য, আমাদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করা যে সর্বাগ্রে দরকার এ কথাও সত্য, কিন্তু স্বদেশে সেই অন্নবস্ত্র উৎপাদন করিবার জন্য যে চারিত্রশক্তি প্রয়োজন তাহার দিকে মন না দিলে সমস্তই বৃথা হইবে। হইতেছেও। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের দুঃখমোচনের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন; চাষ, জমি, ট্রাক্টার, সার, জল-সেচনের ব্যবস্থা, গরু ছাগল মুরগী মৎস্যের উন্নতি, বড় বড় নদীকে বাঁধিয়া বিদ্যুৎউৎপাদন; এ সমস্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু যে পরিমাণ সুফল আমরা আশা করিয়াছিলাম সে পরিমাণ সুফল হয় নাই। তাহার কারণ যে সুস্থ, সমর্থ চরিত্রবান্ মানুষ সমস্ত কর্মের প্রথম ও প্রধান উপাদান সেরকম মানুষই আমাদের দেশে বেশী নাই। যে ইংরেজী শিক্ষা আমরা স্কুলে কলেজে এতদিন লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে গলদ ছিল, তাহা ধর্মহীন ছিল, ইংরেজেরা আমাদের শক্ত সমর্থ চরিত্রবান্ মানুষ করিতে চান নাই, মেরুদণ্ড-হীন কেরানী করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতিতেও সে গলদ বর্তমান। আধিভৌতিক উন্নতির জন্য হয়তো আমাদের বাধ্য হইয়া এই সব অপটু অসাধু লোকদের লইয়াই কাজ চালাইতে হইবে, কি যদি ভবিষ্যতের জন্য আমরা সাধু সচ্চরিত্র কর্মী-সৃষ্টির আয়োজন না করি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যে আজ আধিভৌতিক জগতে এত উন্নত তাহার কারণ তাহাদের চরিত্র। তাহাদের শিক্ষাবিধিও চরিত্র-নির্মাণকেই প্রাধান্য দিয়াছে। কেবল নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করাই সে দেশের চরম লক্ষ্য নয়। তাহাদের লক্ষ্য জীবনকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার শক্তি অর্জন করা। তাঁহাদের দেশের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Mr. whitehead বলিয়াছেন—I lay it down as an educational axion that in teaching you will come to grief as soon as you forget that your pupils have bodies. তাঁহাদের শিক্ষাটা ভোগমুখী তাই তাঁহারা আজ ভোগের শিখরে সমাসীন। প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজসিকতার আধার ছিলেন তাঁহারাও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা লাভ করিতেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের চরিত্রে সেই শক্তি সঞ্চার করিত যাহা না থাকিলে ভোগও করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণও যদি আমরা করিতে চাই তাহা হইলেও চরিত্র-নির্মাণ করিতে হইবে। ভোগের শিখরে চড়িয়া আজ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা অবশ্য বুঝিতেছেন যে ধর্মহীন ভোগসর্বস্ব শিক্ষার পরিণাম আণবিক বোমা, বহুকাল পূর্বে তাঁহাদেরই কবি Coleridge যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন —"If a man is not rising upward to be an angel, depend upon it, he is sinking downward to be a devil. He cannot stop at the beast. The most savage of men are not beasts, they are worse, a great deal worse"—সেই বাণীর মর্ম তাঁহারা এখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এখন ভারতবর্ষের বেদে উপনিষদে গীতায় তন্ত্রে angel হইবার সত্য পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ আজ

তাঁহারাও বুঝিতেছেন শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বিষয় নয়, বস্তু নয়, bodies নয়, ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি।

আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের চরিত্রবান্ কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পূর্বে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, সত্যই কি আমরা চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করুক ? আমাদের সত্যই যদি সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে তাহা হইলে উপায়ের অভাব হইবে না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এ বাক্য মিথ্যা নহে। ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ হোক ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা করিয়াছিলাম ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কোন বাধাই আমাদের নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আমাদের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস আমাদের ভাবনা-অনুযায়ী সিদ্ধির ইতিহাস। প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনুশীলন-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবক যুবতীরা মৃত্যুবরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পুলিসের লাঠির সম্মুখে তাহাদের উন্নত শির অবনত হয় নাই, কামান বন্দুক, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের ভীত করিতে পারে নাই। শুনিয়াছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু রাত্রে ঘরের খালি মেজেতে শুইয়া জেল খাটিবার মহড়া দিতেন। নির্যাতনের জন্য অনেক পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের অগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাণদান করিয়াছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত আমরা নানাভাবে যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল বলিয়া সে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা চরিত্রে মনে স্বাস্থ্যে শক্তিতে প্রকৃত ভারতবাসী হোক এ আকাঙ্ক্ষা সত্যই যদি আমাদের মনে জাগে তাহা হইলে তাহাও সফল হইবে।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্য-ধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। আমরা যে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছি তাহা নয়, বহুকাল পরাধীনতার ফলে, আমাদের ধর্ম এক বিকৃত তামসিক রূপ ধারণ করিয়াছে। ধর্ম আজকাল আমাদের হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, তাবিজে মাদুলিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কতকগুলি লোককে অতি সাবধানী ভীতু, কতকগুলি লোককে অতি ভণ্ড ধাপ্পাবাজে পরিণত করিয়াছে, আবার কতকগুলিকে করিয়াছে পলাতক। এই ধর্মের এভাবে কোষ্ঠি এবং পাঁজি আমাদের জীবনে কায়েমী আসন দখল করিয়াছে, ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন লিখিয়াছিলেন—

বুঝেছি আত্মা অবিনশ্বর, বুঝেছি মিথ্যা দুনিয়া
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি
তাই পথ চলি দিনখন দেখে খনার বচন শুনিয়া
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি
কারণ আমরা অধ্যাত্মিক জাতি
ইহলোকে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক
আমরা রহিনু পরকালে হাতপাতি।

আর একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

হারু সন্ন্যাসী বেশ তো—বাঃ
কামনা না যাক কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি বেশ তোফা
কিছুই না ক'রে বছর ভর খেতে চান
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান
বিনা খরচায় গাঁজাচর্চায় মেতে যান
অহো, নমো তায়,
পলাতক ইনি ছাড়ি সুত-জায়া
ছাড়ি যত মায়ামমতায়।
অহো, নমো তায়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে ও রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুকে এ জাতীয় ব্যঙ্গ রচনা অনেক আছে। বস্তুত যে ধর্ম মানুষকে নিষ্কাম নির্ভীক, শান্ত ও উদার করে সেই ধর্মই তামসিকরূপে আজ অনেককে বিষয়ী, কামুক, অশান্ত ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে। গুরু-করা আজকাল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে, বিরিঞ্চিবাবা জাতীয় গুরুরও অভাব নাই, কিন্তু ধর্মে প্রকৃত আগ্রহ জাগিলে রাত্রি-শেষে সূর্যালোকবৎ যে আনন্দচ্ছটা জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় সেরকম আনন্দিত জীবন তো বড় একটা দেখিতে পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি ধর্মও পণ্য, বা সামাজিক সুখ-সুবিধা পাইবার যন্ত্রমাত্র। আমি যাহা বলিলাম সর্বক্ষেত্রে তাহা হয়তো সত্য নয়, প্রকৃত সাধু ও সাধক নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশের শাশ্বত ধর্মকে সেবায়, শিক্ষায়, কর্মে, সংস্কৃতিতে রূপদান করিবার জন্য যে সন্ন্যাসীর দল গৃহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারই ইহার নিদর্শন। ব্যক্তিগতভাবে ইঁহাদের ভিতরের খবর আমি বেশী জানি না, কিন্তু বাহির হইতে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি তাহাতে ইঁহাদের সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধাই জাগিয়াছে। দেশে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাহা না হইলে দেশ রসাতলে যাইত।

কিন্তু একথাও সত্য যে সত্য ধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাতির মনে ব্যাপকভাবে এখনও জাগে নাই। আমরা এখনও আন্তরিক ভাবে কামনা করিতে পারিতেছি না যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত মানুষ হোক। লেখা পড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই—এ মোহ এখনও আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদের দেশবাসী তেমন উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেশের যারা ভাল ছেলে, তারা আমার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে খুব কম এসেছে। যেসব ছেলের কোথাও কিছু হল না তারাই এসে আমার বিদ্যালয়ে ভিড় বাড়াতে লাগল…"

এইজন্যই ক্রমশ তাহা সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল এবং এখন যাহা বিশ্বভারতী নামে পরিচিত তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণমাত্র।

আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া যে বনিয়াদী শিক্ষা-বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের দেশে তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। আমাদের যে রাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধী father of the Nation বলিয়া কীর্তিত সেই রাষ্ট্রও বনিয়াদী শিক্ষাকে যথোচিত মর্যাদা দিতেছেন না। মুখ্যত যে চারিটি প্রস্তাবের উপর বনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাহা এই—

(১) এই শিক্ষা প্রাথমিক, সর্বজনীন, অবৈতনিক, আবশ্যিক (Compulsory) এবং সাতবৎসরব্যাপী হইবে।

(২) শিক্ষার বাহন হইবে কর্ম। সমাজ ও পরিবেশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে।

(৩) এই শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে।

(৪) শিক্ষার ভিত্তি হইবে সত্য ও অহিংসা। প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল শিক্ষাদর্শের সহিত ইহার কোনও তফাৎ নাই। মহাত্মা গান্ধীকে বনিয়াদী শিক্ষায় ধর্মের স্থান কি হইবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—We have left out the teaching of religions from the Wardha Scheme of education, because we are afraid that religions as they are taught and practised to-day lead to conflict rather

than unity. But on the other hand, I hold that the truths that are common to all religions can and should be taught to all children.

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। এই আদর্শের কথাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় পৃথিবীর সজ্জন-সমাজকে শুনাইয়াছিলেন :—

"As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they oppear, crooked or straight, all lead to Thee..."

আমাদের বর্তমান কনষ্টিটিউশনের সহিতও ইহার বিরোধ নাই—কিন্তু তবু বনিয়াদী শিক্ষা দেশবাসীর বা স্বদেশী রাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে নাই।

শুনিয়াছি যে সব ছাত্রের শহরের স্কুলে আসিয়া পড়িবার সুবিধা বা সামর্থ্য নাই তাহারাই বনিয়াদী বিদ্যালয়ে গিয়া ভরতি হয়, শুনিয়াছি গান্ধীভক্ত মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ-পরিচালিত স্কুলে গিয়াই ভরতি হইয়াছে, কিংবা ভরতি হইতে চায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ছেলেমেয়েদের বনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চান না। ভাল শিক্ষকও সেখানে কম আছেন। শুনিয়াছি যে সব শিক্ষকদের অন্য কোথাও ভালো চাকরি জোটে না তাঁহারাই অগত্যা গিয়া এইসব বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

অর্থাৎ দেশের লোকদের এ বিষয়ে সত্য আগ্রহ জাগে নাই। যদি জাগিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের সাহায্যভিক্ষা করারও প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতাম না। গৃহেই আমরা এ ব্যবস্থা করিতাম। আমরা আমাদের ছেলেদের বিলাসী, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছি কারণ আমরা নিজেরাই বিলাসী, অকর্মণ্য পরনির্ভরশীল। ছেলেদের সেই আদর্শে গড়িতে চাই, বুঝি না যে ইহাতে কি সর্বনাশ হইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে স্কুলকলেজ ছিল না, কিন্তু সেজন্য জ্ঞানের ধারা অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই, শিক্ষকেরা নিজ নিজ গৃহেই ছাত্রদের গ্রহণ করিতেন। ছাত্রেরা তাঁহাদের গৃহে গিয়া তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইতেন। আমরা ইচ্ছা করিলে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। এ ব্যবস্থায় আর কিছু না হউক আর্থিক সুবিধা যে হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সেকালে যাহার যেমন সামর্থ্য সে তেমনই গুরু-দক্ষিণা দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিত, এ বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন কড়া নিয়ম ছিল না। একালের শিক্ষকরাও এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই রাজী হইবেন যদি তাঁহারা ছাত্রের মধ্যে প্রকৃতজিজ্ঞাসু এবং ভক্ত সেবককে দেখিতে পান। কিন্তু তাহাই তাঁহারা পাইবেন না। একালে ছাত্রের পিতামাতারা ছেলেদের গুরু-গৃহে ভৃত্যের মতো কাজ করিতে দিতে সম্মত হইবেন কি? সেকালে গুরু-দক্ষিণা সম্বন্ধে বাঁধ-ধরা নিয়ম ছিল না বটে, কিন্তু এ নিয়মটা আবশ্যিক ছিল—শিষ্যকে গুরু-গৃহে গৃহকর্ম করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে কায়েন মনসা বাচা গুরুকে সেবা করা প্রত্যেক ছাত্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল। অধ্যাপক আল্‌টেকার মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ছাত্র গুরুকে সেবা করিবে অগ্নির মতো, দেবতার মতো, রাজার মতো, পিতার মতো, ভর্তার মতো। তিনি দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু গুরুকুলে—"The student was expected to do personal service to the teacher like a son, suppliant or slave. He was to give him water and

toothstick, carry his seat and supply him bath-water. If necessary he was to cleanse his utensils and wash his clothes. He was further to do all sundry work in his monastary or his teacher's house like cleansing the rooms, bringing fuel etc....Tradition asserts that even great personages like Srikrishna had deemed it an honour to do all kind of menial work in their preceptor's house during their student days.

অভিজাত মুসলমান সমাজেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলমগীরের পুত্র মহম্মদ নিজহস্তে তাঁহার গুরুর কর্দমাক্ত পদ-প্রক্ষালন করিয়া দেন নাই বলিয়া আলমগীর বিরক্ত হইয়াছিলেন শুনিতে পাই।

যে Dignity of Labour লইয়া আজকাল আমরা মুখে আস্ফালন করি কিন্তু যাহার আভাস পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নাই, তাহারই পরিপূর্ণ রূপ কর্মযোগ। সেকালে গুরু-গৃহে এই কর্মযোগেরই ভিত্তি স্থাপিত হইত। অনেকে হয় তো বলিবেন, "মশায় সবই তো বুঝলাম কিন্তু সেরকম গুরু কোথায়?"

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে ১৩১৩ সালে তাঁহার 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশী আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু একথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্য যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়, একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মস্তিষ্ক জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়েও কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি উত্থাপিত না হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি খাটিতে থাকিবে ⋯"

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অন্তর হইতে এ প্রার্থনা এখনও উত্থিত হয় নাই। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাই নাই, গান্ধীজীর বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমন উৎসাহী নহি। তাহার কারণ শিক্ষাকে এখনও আমরা অর্থের মানদণ্ডেই বিচার করিতে উৎসুক, সত্য-শিক্ষার মানদণ্ডে নয়। আমরা একথা এখনও অন্তর দিয়া উপলব্ধি করি নাই যে অর্থ উপার্জন

করিতে হইলেও ডিগ্রি অপেক্ষা সত্যের ভিত্তিতে নির্মিত চরিত্রই বেশী কার্যকরী।

আমাদের এই বোধ জাগরিত না হইলে রাষ্ট্রের বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের আপাত-উন্নতির বুদ্বুদ সামান্যতম আঘাতেই ফাটিয়া যাইবে। ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে, অন্নবস্ত্রের জন্যও তাই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শক্তির একমাত্র উৎস যে সত্য-শিব-সুন্দর তাহার প্রতি আগ্রহবান্ না হইলে আধিভৌতিক সুখ সুবিধাও আমরা লাভ করিতে পারিব না। পিতা মাতাদের মনে যদি এ আগ্রহ জাগে তবেই আমরা ধর্মকে—সত্য-মানবধর্মকে, শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভারতবাসী নামের যোগ্যতা দান করিতে পারিব।

এ আগ্রহ জাগাইবার কোনও উপায় আছে কি? একটি উপায় আছে। কিন্তু সে উপায়ের পথও ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সে উপায় সাহিত্য। সৎসাহিত্য মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে, মহৎমানবত্বের দিকে আকর্ষণ করে। আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ ইচ্ছা করিলে ব্যাপকভাবে সৎসাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাহিত্যের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিয়া বা সাহিত্যকে উৎসাহ দিবার নামে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের কিছু বখশিস বা মেডেল দিলে তাহা সম্পন্ন হইবে না। আন্তরিকভাবে সেজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়া যাহাতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সহজে সুলভমূল্যে কথকতা, অভিনয়, সিনেমা, লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে সৎসাহিত্য প্রচারিত হয়, জনসাধারণের অন্তরে যাহাতে তাহা প্রবেশ করে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। করা কিছু অসম্ভব নয়। ইউনিভার্সিটি কমিশনও ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য করিতে বলিয়াছেন তাহা ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশের জন্য করা কি অসম্ভব? দেশের উন্নতির জন্য ছাগ-পরিদর্শক, মুরগী-পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছে দেশের প্রকৃত উন্নতি যে সাহিত্যের মাধ্যমে হয় সে সাহিত্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করিলে তাহা কি খুব অন্যায় দাবি হইবে?

প্রশ্ন উঠিবে সাহিত্য বলিতে কি বোঝায়? যাহাই ছাপার অক্ষরে বাজারে বাহির হয় তাহাই আজকাল সাহিত্য-পদবাচ্য। কিন্তু মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করে সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্য। পুরাকালে তপোবন সমাজের যে স্থান অধিকার করিয়াছিল বর্তমান যুগে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখন সৎসাহিত্যের উপবনেই আমরা সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাই।

আধুনিক জগৎ যখন বস্তুবাদের স্থূল চাপে ম্রিয়মাণ হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে তখন আমরা বিবেকানন্দের সাহিত্য হইতে আশ্বাস পাই—Man has never lost his empire. The soul was never been bound. Believe that you are free and you will be.

রমাঁ রলাঁ তখন উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—উত্তিষ্ঠত! চিত্তকে সকল আপস, সকল হীন মৈত্রীবন্ধন, সকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই চিত্তের দাস। আমাদের আর কোন প্রভু নাই। এই স্বাধীন চিত্তের আলো বহন করা, তাহাকে রক্ষা করা এবং পথভ্রান্ত মানুষকে ইহার আশ্রয়চ্ছায়ায় ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আমাদের দেখাইয়া দেন—মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন। তিনিই বলিয়া দেন মাতৃপূজায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধন নয়, ঐশ্বর্য নয়, এমন কি প্রাণও নয়, ভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন—

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে' কেমন করে' সইব
বাতাস আলো গেল মরে' এ কীরে দুর্দৈব
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে—
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে—
চলবি যারা চলরে ধেয়ে—
আয়নারে নিঃশঙ্ক
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে ওই যে অভয় শঙ্খ।

বস্তুত, সংসাহিত্যই এই যুগে অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। এই আণবিক বোমা-ভীত, ইজ্‌ম্‌-কণ্টকিত স্বার্থপরতার যুগও কবির বাণীকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই। আজও আমরা সাগ্রহে বিশ্বাস করিতে চাই সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর্ত অসহায় মানব আজও উৎকর্ণ হইয়া প্রাচীন কবি ঋষির উচ্ছ্বসিত বাণী শুনিতেছে—হে অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শ্রবণ কর, তমসার পরপারে আমি আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি।

সাহিত্যই আমাদের একমাত্র পথ, একমাত্র পথপ্রদর্শক। আধুনিক ভারতের নব জাগরণের মূলে ছিল এই সাহিত্য। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং আরও অনেকের সাহিত্যসাধনাই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। মহত্তর সংগ্রামে আমাদের যদি আবার অবতীর্ণ হইতে হয় এই সাহিত্যই আমাদের প্রেরণা জোগাইবে। জড়বাদের কোলাহলে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ, কিন্তু সে কোলাহলের উর্ধ্বে এখনও উৎকৃষ্ট কাব্য বর্তমান এবং তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কি করিয়া রাখিয়াছে তাহার রহস্য ব্রহ্মের রহস্যের মতোই অতি জটিল অথচ অতি সহজ। যাঁহারা জড়বাদ-লব্ধ ধোঁয়াটে বুদ্ধি দিয়া ইহা বিশ্লেষণ করিতে যান তাঁহারা জটিলতার সৃষ্টি করেন মাত্র, যাঁহাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, অন্তর রসগ্রাহী তাঁহারা সহজেই ইহার মর্মে প্রবেশ করেন। উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী কাব্য সূর্যের মতোই স্বয়ম্প্রভ, স্বয়ম্প্রকাশ। তাহা তর্ক করে না, সুপারিশ সংগ্রহ করে না একেবারে মর্মে গিয়া প্রবেশ করে, সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করিয়া দেয়।

একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে যাঁহারা উচ্চ-কোটীর বিজ্ঞানী তাঁহারাও সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী। তাঁহারা সে সন্ধান ভিন্নপথে করেন। কবিদের উপলব্ধি ও ইঁহাদের উপলব্ধিতে বিশেষ তফাত নাই। ইঁহাদেরও মনে হয় তিলের মধ্যে তৈলের মতো, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের মতো, ভূগর্ভস্থ নদীর মধ্যে জলের মতো, কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে অগ্নির মতো ক্ষুদ্র সত্যের অন্তরালে বৃহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। এই হিসাবে উচ্চকোটীর বিজ্ঞানীরাও সত্যসন্ধী, সত্যদ্রষ্টা কবি। আইনষ্টাইন তাই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, সুলিভান তাই Limitations of Science লিখিয়াছেন, Julian Huxley তাই ভগবানের স্বরূপসন্ধানে ব্যস্ত, James Jeans তাই সৃষ্টির বিস্ময়ে আপ্লুত, অলিভার লজ তাই পরলোকের রহস্যে নিমগ্ন, H. G. Wells তাই বিজ্ঞানকে কাব্যে এবং কাব্যকে বিজ্ঞানে রূপ দিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র তাই 'অব্যক্ত' নামক অনুপম গ্রন্থের গ্রন্থকার।

বস্তুত যেখানেই প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী সেখানেই তাহার ধর্ম এক—সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই তাই সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবানদের দায়িত্বও তাই অনেক বেশী।

কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এ যুগের সৃষ্টিধর্মী কবি বা বিজ্ঞানীরা সকলে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি এ যুগে সৎ-সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যে যন্ত্রসভ্যতা মানবের শাশ্বত সভ্যতাকে আজ গ্রাস করিতে উদ্যত তাহাই ইহার জন্য মুখ্যত দায়ী।

যন্ত্রসভ্যতা অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টাকেও আত্মভ্রষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির দিকে তত মনোযোগী নহেন যত মনোযোগী Best seller রচনার দিকে। Best seller যে ভাল বই হইতে পারে না তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণত Best seller সেই সব পুস্তকই হয় যাহা অধিকাংশ লোকের সাময়িক উত্তেজনাকে তৃপ্ত করে, শাশ্বত সত্যের খবর যাহাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া এখন আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী লেখক যদি কাব্য রচনা করেন তাহা হু হু করিয়া বিক্রয় হইবে। পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করা সহজ, কারণ সাধারণ মানবের সুখশান্তির দিক হইতে বিচার করিলে কোন রাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত নিখুঁত হইতে পারে নাই। G. B. S এরূপ অনেক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। Swift এর গালিভার্স ট্রাভল্‌স্‌ও ব্যঙ্গ রচনা। ব্যঙ্গ রচনা বা যে কোনও রচনা সৃষ্টি হিসাবে তখনই সার্থক হয় যখন তাহা শাশ্বত রস-বোধকে তৃপ্ত করে, যখন তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দর মূর্ত হয়।

আজকাল বাস্তববাদী এই ছাপ লইয়া যে সব সাহিত্য বাজারে বাহির হয় তাহাতে দেখি সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের যোগ নাই। সমাজের কতকগুলি কুৎসিত চিত্র বা মানবের কতকগুলি কুৎসিত প্রবৃত্তিই সে সব লেখার প্রধান উপাদান। তাহা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শিব ও সুন্দরের সহিত বিচ্ছিন্ন যে সত্য তাহা পূর্ণ সত্য নহে। যেমন ধরুন, Lady Chatterly's Lover নামক বিখ্যাত পুস্তকে যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহা আংশিক সত্য। কাম মানুষের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই যে মানবের একমাত্র ক্ষুধা নহে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা একরূপ নহে সহস্ররূপ। এই সহস্ররূপী ক্ষুধা কেবল কাম বা লোভের পথে নহে নানাপথে যে সুধা সন্ধান করিতেছে তাহার পরিচয় যদি কাব্যে না পাইলাম তবে কাব্যের সার্থকতা কি? কামের কবলে তো সকলেই আমরা অল্পবিস্তর পড়িয়া আছি কেবল তাহারই স্বরূপ জানিবার জন্য কাব্য পড়িবার প্রয়োজন নাই। আর একটা উদাহরণও মনে পড়িতেছে—মমের Rains নামক বিখ্যাত গল্পটি। এ গল্পের মূল কথাটি এই যে একজন মিশনারি একটি পতিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই শেষে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এরকম ঘটনা প্রায়ই সমাজে ঘটে, ইহারই পুনরাবৃত্তি, এমনকি শিল্পায়িত পুনরাবৃত্তিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি নহে, কারণ ইহাতে শিব ও সুন্দরের রূপ নাই। ঠিক এই একই উপাদান লইয়া আনাতোল ফ্রাঁস্, 'থেয়া' (Thais) লিখিয়াছেন এবং তাহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ তাহাতে পূর্ণ সত্য বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইয়াছে। রমা রল্যাঁর জাঁ ক্রিসতফ গ্রন্থের প্রথম ভাগেও কামনার চিত্র আছে, কিন্তু কেবলমাত্র ওই চিত্রটি আঁকিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার কাব্য শেষ করেন নাই। নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া তিনি নায়কের চিত্তকে বৃহতের দিকে বিরাটের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের শিল্প-সঙ্গত মিলন ঘটাইয়াছেন তাই জাঁ ক্রিসতফ্ আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যে অমর কাব্য। ঠিক ওই কারণেই মমের Of human bondage সার্থক সৃষ্টি। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন অনেক চিত্র আছে যাহা আধুনিক শ্লীলতার মানদণ্ডে অশ্লীল। কিন্তু কাম-লীলাই যে বৈষ্ণব কাব্যের একমাত্র বক্তব্য নহে তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব কাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর মনে যে সুর বাজিতে থাকে তাহা কামের সুর নয়, প্রেমের সুর, ভক্তির সুর,, অনন্তের সুর।

কবির সৃষ্টিতে বাস্তব অবাস্তব গৌণ ব্যাপার।

সার্থক সৃষ্টিতে ফুল অভিমান করে, পাখী উপদেশ দেয়, পশুরাও মানুষের ভাষা ব্যবহার করে, ঘড়ার ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হয়, রাবণের দশ মুণ্ড থাকে, রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগেন, রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমান। শাশ্বত রস যেখানে জমিয়াছে সেখানে কিছুই বেমানান মনে হয় না। বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াও যে সার্থক সৃষ্টি হইবে তাহা কেবল বাস্তব হইবে না তাহা সৃষ্টিও হওয়া চাই। বাস্তবকে কবি ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন চিত্রকর যে ভাবে তাঁহার চিত্র-পট ব্যবহার করেন। তাহা কাগজ, কাপড়, কাঠ, পাথর, লোহা, সোনা, তামা, পিতল, কাচ, যে কোনও জিনিস হইতে পারে, কিন্তু সেই জিনিসটার আস্ফালনই চিত্র হইবে না। চিত্রকরকে তাহার উপর ছবি আঁকিতে হইবে। সে ছবিতে কেবল অনন্যতা বা প্রতিভার রূপ থাকিলেই তাহা প্রথম শ্রেণীর শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে মনকে যদি উন্মুখ না করে। বাস্তবের পটভূমিকায় কবিও যাহা সৃষ্টি করিবেন তাহা এই জাতীয় সৃষ্টি তাহা বাস্তবের নকলমাত্র নয়। কবি চিত্রকর, ফোটাগ্রাফার বা সাংবাদিক নহেন। প্রথম শ্রেণীর কবিরা যে কোনও পটভূমিকার উপরই সত্য-শিব-সুন্দরের সম্পূর্ণ সত্যের বাণীকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারেন। তাই শাশ্বত সাহিত্যের বাণীও উপনিষদের বাণীর মতো ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ। তাই শাশ্বত সাহিত্যই শাশ্বত ধর্মের বাহক। যে সব সাহিত্যিক বাস্তবতার অজুহাতে সমাজের মধ্যে যাহা কুৎসিত, যাহা অক্ষম, যাহা পঙ্গু, যাহা কর্দমাক্ত, যাহা কলঙ্কিত তাহাই বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করেন তাঁহারা জীবনের পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান আলোকে ফুটাইবার জন্য কালো পটভূমিকা প্রয়োজন, আলো যদি না ফোটে কালো পটভূমিকা অর্থহীন। সমাজে কুৎসিত চিত্র অনেক আছে, তাহারা সাহিত্যের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া কেহ যদি সেইগুলিকে কাব্যে স্থান দিয়া উগ্রবর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত করিতে থাকেন তখন সন্দেহ হয় লেখকের শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে অন্য মতলব আছে, সম্ভবত তিনি সাহিত্যিক-বেণী মিস মেয়ো, ভালো কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না, কেবল ড্রেনগুলিই তিনি দেখিতে পান।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বর্তমান যুগের যন্ত্র-পতিরাই বর্তমান যুগের প্রভু। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে তো বটেই শাশ্বত সত্যকেও ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের সুবিধামতো standardise করিতে চান। অনেক সাহিত্যিক ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহে অর্থের লোভে অথবা কোন মিথ্যা আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্রীড়নক মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য তাই অনেকস্থলে আজ হীন প্রোপ্যাগাণ্ডা মাত্র। অনেক বিজ্ঞানীরও ঠিক এই দশা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তাই আজ মানবসমাজের হিতকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সঞ্জীবনী সুধা হইতে পারিত তাহা বিষে পরিণত হইয়াছে। পুরাণের গল্পে শুনিয়াছি দৈত্যদানবদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া সৃষ্টিকর্তারা তাহাদের বর দিতেন এবং সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া দানবেরা মানবসমাজকে পীড়ন করিত। বর্তমান যুগের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহারাও অনেকে আজ দৈত্যদানবদেরই বরদান করিয়াছেন।

একটি মাত্র আশার কথা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সর্বত্র এখনও কিছু কিছু আছেন। পৃথিবী যখন জলপ্লাবিত হইয়াছিল তখন নোয়া তাঁহার নৌকায় ভাল ভাল জিনিসের নমুনাগুলি তুলিয়া লইয়া সৃষ্টিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোনও অজ্ঞাত নোয়া হয়তো এই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের রক্ষা

করিয়া মানবজাতিকে একদিন মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই। অথচ ইহাও সুনিশ্চিত যে একমাত্র সত্যধর্মই আমাদিগকে প্রকৃত সুখশান্তির সন্ধান দিতে পারে, আত্মভ্রষ্টকে আত্মস্থ করিতে পারে, পরাধীন মনুষ্যত্বকে স্বাধীনতার আলোকে বিকশিত করিতে পারে। পৃথিবীর প্রতিদেশেই আজ সাধুরা লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্বের কণ্ঠরোধ করিয়া দিবার জন্য নানা মুখোশ পরিয়া যন্ত্রশক্তি আজ উদ্যত। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবিরাই এখন মানবজাতির আশা। তাঁহারাই আজ মানবজাতির সেই বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন যে বিবেক অবিচলিতকণ্ঠে বলিবে 'যন্ত্র বড় নয়, মানুষ বড়। মানুষ যন্ত্রের দাস নয়, যন্ত্রই মানুষের দাস।' শুদ্ধচিত্ত নির্ভীক বিজ্ঞানীদের আজ বলিবার সময় আসিয়াছে —মাদাম কুরীর প্রতিভাশালী কন্যা যেমন এক সভায় বলিয়াছিলেন—বিজ্ঞানের শক্তিকে আমরা বণিকদের হস্তে তুলিয়া দিব না, মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বকে যে নূতন কারাগারে বন্দী করিয়াছে সেই কারাগারের মধ্যেই নূতন যুগের শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করিবেন যদি আধুনিক যুগের সত্যদ্রষ্টা কবি ও বিজ্ঞানীরা তাঁহাকে তেমন করিয়া আহ্বান করিতে পারেন।

বর্তমান যুগের নিপীড়িত মানব সত্যদ্রষ্টাদের কণ্ঠে সেই উদাত্ত আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ

(দুই)

বেলুড় মঠে স্বামী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজের নিকট দেখেছেন। এই সময়ে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে লাগলেন। আমার জীবনের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই আমার দিকে নজর রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। কতদিন যে আমাকে এসম্বন্ধে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন তা এখন ভাবলে আমি বিস্মিত হই। যাই হোক ১৯১৮তে একদিন বলরাম মন্দিরে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে আবার বল্লেন "তুই মার কাছে যেয়ে দীক্ষা নে।" আমি তাঁকে বল্লাম, "না, আমি দীক্ষা নেব না।" কারণ তখন আমার মনের ভাব ছিল দীক্ষার সময় গুরু যা উপদেশ করবেন তা ঠিক ঠিক পালন না করতে পারলে প্রত্যবায় হয় আর মহা অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। কৃষ্ণলাল মহারাজও সেদিন আমাকে যেন রাজী না হলে ছাড়বেন না মনে হলো। তিনি সমস্ত শুনে বল্লেন, —"তোর সাধ্য কি যে গুরুর উপদেশ পালন করতে পারিস তিনি যদি তোকে দিয়ে তার উপদেশ পালন না করান, সাঁতার শিখতে হলে জলে নামতেই হবে। কোথায় শুনেছিস্ মানুষ

সাঁতার শিখেছে জলে না নেমে" ইত্যাদি। কথাগুলো আমার মনের মধ্যে খুব গভীর রেখাপাত করলো আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো, কিন্তু মা দীক্ষা দেবেন কি করে? আমি পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বল্লাম—"মা ত মেয়েমানুষ, মা দীক্ষা দেবেন কি করে?" আমার মনের ভিতর আরও একটা সংশয় ছিল। পূর্বেই বলেছি আমি যেদিন প্রথম বেলুড়ে যাই সেই দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ আমার মাথার উপর ব্রহ্মতালুতে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন একটা লিখেছিলেন আর তখন থেকে আমার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই একটা নাম চলতো। কাজেই আমি পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের কথায় সেদিন যখন দীক্ষার কথা ভাবছিলাম তখন মনে হলো, আমার দীক্ষা কি হয়ে যায় নি? আমি কিন্তু কৃষ্ণলাল মহারাজকে এ সম্বন্ধে কিছু বল্লাম না। যা হোক্ কৃষ্ণলাল মহারাজকে যখন বল্লাম মা মেয়েমানুষ, মা কি দীক্ষা দেবেন, তখন কৃষ্ণলাল মহারাজ হো হো করে হাসতে লাগলেন এবং আমাকে বল্লেন, "বলিস্ কিরে, এসব কথা আবার কোথায় শিখেছিস্?" আমি তাঁকে জানালাম কোন সাধুর লেখা বইএ আমি একথাটা পড়েছি। কৃষ্ণলাল মহারাজ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আমাকে বল্লেন—"আচ্ছা চল্ নীচে যাই, নীচে পূজনীয় হরি মহারাজ আছেন তাঁকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যাবে।" নীচে পূজনীয় হরি মহারাজ একটি ছোট জলচৌকির উপর আসন করে বসেছিলেন। তাঁকে যে কি ভালই লাগলো তা আমি আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমার পরিচয় তাঁকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল্লেন যে—"আমি অনেকদিন থেকে একে বলছি শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিতে, কিন্তু এ ত কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, উল্টো আজ বলছে মা ত মেয়েমানুষ, মা আবার দীক্ষা দেবেন কি?" পূজনীয় হরি মহারাজ এই শেষের কথাটি শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে আমাকে বল্লেন, "এদিকে দেখছি ছেলেমানুষ কিন্তু এর ভিতরেই দেখছি শাস্ত্র টাস্ত্র সব পড়া হয়ে গেছে।" আমি বল্লাম—"না মহারাজ, আমি শাস্ত্র কিছুই পড়ি নি, তবে এক সাধুর লেখা বইএ এ কথাটা পড়েছিলাম।" পূজনীয় হরি মহারাজ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি পূজনীয় মহারাজের সৌম্য এবং প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দর্শনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীন ভারতের কোন মহর্ষি স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রীভগবানের কার্যে সহায়তা করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি আস্তে আস্তে বল্লেন—"তোমাকে কে বলেছে মেয়েমানুষ দীক্ষা দিতে পারে না?" এই বলে একটু চুপ করে থেকে অত্যন্ত তেজের সহিত বল্লেন,—"মা জগদম্বা, আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং, তাতে কখনও সন্দেহ করো না। যিনি বন্ধন দিয়েছিলেন তিনিই বন্ধন মুক্ত করতে সমর্থ। যদি মা স্বয়ং তোমাকে দীক্ষা দিতে রাজী হন তা হলে তুমি ধন্য, তোমার পিতৃকুল ধন্য। জন্মে জন্মে যে মহাশক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তিনি বন্ধন মুক্ত করবার জন্য উদ্বোধন-বাড়িতে বসে আছেন। কৃষ্ণলাল তোমার পরম সুহৃৎ যে—যে মহামায়াকে মুনিঋষিরা ধ্যানে পায় না—সেই মহামায়ার শ্রীচরণে এত আগ্রহের সঙ্গে পৌছে দিচ্ছে।" এই কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে বল্লেন এবং চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো উত্তেজনায়। আবার বলে উঠলেন—"কোথায় লোক সব। মহামায়া বন্ধন খুলবার জন্য উদ্বোধনে বসে আছেন কটা লোক তাঁর কাছে গেল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক যায় না কেন?" পূজনীয় হরি মহারাজ যখন এসব কথা বলে একটু থামলেন, আমি দুহাত জোড় করে বল্লাম, "মহারাজ, তাহলে আপনিও বলছেন যে আমি শ্রীশ্রীমার কাছে যেয়ে দীক্ষা গ্রহণ করি?" মহারাজ

বল্লেন—"একেবারে নিশ্চয় বল্‌ছি। তুমি যাও কৃষ্ণলালের সঙ্গে মার কাছে মার বাড়িতে।" মহাপুরুষদের কথার কত শক্তি! এইযে এতদিন আমি দীক্ষানেওয়া ব্যাপারটা ইচ্ছা করে এড়িয়ে এসেছি শ্রীশ্রীহরি মহারাজের কথা শোনার পর আর স্থির থাকতে পারলাম না। আগে যেন দায় ছিল কৃষ্ণলাল মহারাজের; এবার দায় আমার। আমি ওখানেই ভূমিষ্ঠ হয়ে পূজনীয় হরি মহারাজকে প্রণাম করে কৃষ্ণলাল মহারাজকে বল্লাম—"চলুন মহারাজ এখনই মার কাছে—মার বাড়িতে।" এই বলে আমি কৃষ্ণলাল মহারাজের হাত ধরে টানতে টানতে বলরাম মন্দির থেকে বাইরে এলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের এত স্নেহভালবাসা আমি পেয়েছি যে কোনকথা বলতে ওঁর কাছে সঙ্কোচ হতো না। আমি মহারাজের হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে চল্লাম। মহারাজ বল্লেন,—"ওরে হাত ছেড়ে দে, লোকে কি বলবে?" লোকে কি বলবে সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপই নেই। যাক এভাবে আমরা উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে পৌছুলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের সঙ্গেই উপরে গেলাম। কৃষ্ণলাল মহারাজ দীক্ষার কথা মাকে নিবেদন করতে মা বল্লেন—"কালই তোমার দীক্ষা হবে।" পরদিন স্নানযাত্রা। আমার ছোট ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। আমাদের উভয়েরই দীক্ষা হয়ে গেল। দীক্ষাকালে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের খাটটির উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, আমি নীচে তাঁর সামনে একটি কুশাসনে বসেছিলাম। মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে বল্লাম—আমাদের বাড়িতে আমার বাবা ত এক সময়ে খুবই কালীপূজা করতেন। অবশ্য একথা বলার আগেই মা বল্লেন—"বুঝেছি তোমরা শাক্ত।" তারপর পতিতপাবনী শ্রীশ্রীমা এই দীন সন্তানকে মহামন্ত্র দান করিলেন। কিন্তু ঠিক দীক্ষার একটু আগেই মাকে আমার জেলের অনুভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম। মা বল্লেন—"আমি সব জানি।" এই কথা বলে বল্লেন—"ঠাকুর ত তোমাকে দিয়েছেন আমিও ত দেব আমার কাছ থেকেও নাও।" তারপর বল্লেন—"ঠাকুর তোমার গুরু।" আর দেয়ালে একটি ছবি দেখিয়ে বল্লেন—"ইনিই তোমার ইষ্ট।" "ঠাকুর ত তোমাকে দিয়েছেন" শ্রীশ্রীমার একথার অর্থ কিন্তু আমি এখনও উপলব্ধি করতে পারিনি কারণ আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট থেকে কোন অবস্থায় তখন ত কোন দীক্ষামন্ত্র পাইনি। তবে কি শ্রীমহারাজ যে অঙ্গুলি সঞ্চালনে—বেলুড় মঠে যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম—মাথায় কি লিখেছিলেন এটা শ্রীশ্রী-ঠাকুরের দেওয়া কোন মন্ত্র—এ সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথিবীতে হয়ত আর কেউ নেই। যাই হোক্ দীক্ষা হয়ে গেলে আমি মাকে বল্লাম, "মা আমাকে কি তুমি নিরামিষ খেতে বলবে?" "মা বল্লেন—সে কি তুমি নিরামিষ খাবে কেন?" "আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খাবে দাবে আর ফূর্তি করবে।" "যা প্রাণে চায় তাই পরবে আর যা প্রাণে চায় তাই খাবে বাকীটা আমি দেখবো।" এতক্ষণে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হৃদয়ে অনুভূত হয়ে গেছে। আমি যে আদ্যাশক্তি জগন্মাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছি অথবা জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদায়িনী শ্রীগুরুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সে সব ভুলে গেছি। সামনে মা শুধুই মা—তবে সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই মা। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, "যদি ইষ্টমন্ত্র জপ না করতে পারি তাহলে কি হবে?" মা বেশ উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে বল্লেন—"সে কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না—ইষ্টমন্ত্র জপ না কর তোমারই যাবে আমার কি হবে?" এই মা'র অন্য রূপ কিন্তু এর পেছনেও মার মনে করুণা ও কৃপা পূর্ণভাবে বিরাজ করছিল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বাহিরে এলাম।

ছোট ভাই ভিতরে গেল। তারও দীক্ষা হলো। আমরা উভয়ে নীচে নেমে এলাম। নীচে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে বল্লাম—"মহারাজ আজ আমাদের দীক্ষা হলো।" মহারাজ বল্লেন—"বা বেশ।" বিস্ময়মিশ্রিত হর্ষ নিয়ে হোষ্টেলে ফিরলাম। কোন মানুষ হঠাৎ যদি কোন বিরাট ঐশ্বর্য লাভ করে অথচ তার গতানুগতিক পরিচিত দৈনন্দিন জীবনটাকেও সঙ্গে করে চলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও তদ্রূপ হয়েছিল। একদিকে বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হওয়া। পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ একপ্রকার অন্তরের দিক থেকে ছিন্ন। অথচ হোষ্টেলে থাকার খরচা ইত্যাদির জন্য পিতার দিকেই তাকাতে হয়। মনে ভয়ানক বৈরাগ্য এবং উদাসীন ভাব। বন্ধুবান্ধব যে দু-একজন ছিল তাদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে সব কথা বলা যায় না। অন্তরে মঠে যোগদান করার প্রবল ইচ্ছা। এতগুলো বিসদৃশ ভাবের চাপে পড়ে আমি একপ্রকার মুহ্যমান হয়ে গেলাম। সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা এলেই শ্রীশ্রীমার কথা মনে পড়তো বিশেষ করে ইষ্টমন্ত্র জপ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ নির্দেশ। দুবেলাই বসতাম। খুব যে বেশী সময় দিতে পারতাম অথবা জপ খুব যে বেশী জমতো তা নয়, তবু না বসে যেন থাকতে পারতাম না। এই প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটা ব্যাপার এই হলো যে বি-এ পরীক্ষা সেবারে দেওয়া হলো না। আমি নানাপ্রকারে বাধ্য হয়ে কিছুকালের জন্য দেশে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

লীলাময়ী সারদা

(পাঁচালি)

শ্রীমতী নীহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের শ্যামলা পল্লী, তাহারি সরলা মেয়ে
এমন কিছুই ছিল না সে দেহে দেখিবার মত চেয়ে।
শিক্ষা—'বর্ণ পরিচয়' শুধু, তাও হ'য়েছিল ভুল
সাদাসিধে শাড়ী, শাঁখা দুটি হাতে, যত্নবিহীন চুল।
সরলা নারীর গুপ্ত এ বেশে, সুপ্ত ছিল যে শ্যামা
যখন ছিলেগো নহবত ঘরে, কেহ তো চেনেনি মা।
পাগল স্বামীর সন্ধানে যবে চলিলে সুদূর পথে
ব্যাকুল নয়নধারা যে তোমার রুধিল না কোন মতে।
ধরা নাহি দিলে অরূপা তোমারে
কেমনে চিনিব মাগো!
কভু পথে কাঁদো, কভু মন্দিরে
দেবী-রূপে তুমি জাগো।
কখনো বরদা ভক্ত যখন চরণে পড়িয়া কাঁদে
আপনারে মাতা বিলাইয়া দাও পড়ি করুণার ফাঁদে।
যখন শরীর বলহীন রোগে, বাতের বেদনা পা'য়
নানা দেহক্লেশে শয্যায় শুয়ে কোনরূপে দিন যায়।
জননীর স্নেহে শরৎ তাঁহারে সদা আগুলিয়া থাকে
দরশন আশে দূরদেশী এলে তাদেরও রুখিয়া রাখে।
বরিশালবাসী একটি ভক্ত সে কথা না শুনি কানে
পাগলের মত 'মা, মা,' বলে ডাকে,
কোথা মা তাহা না জানে।
গোলমাল শুনি জগৎ-জননী দেহবোধ গেলা ভুলে
আলু থালু বেশে, আসি দ্বার দেশে,
ডাকেন দরজা খুলে।
কহিলেন, 'কেন আসনি?' সে কহে,
'শরৎ করেন মানা,
রুগ্ন দেহেতে দীক্ষা দানিলে ক্লেশ
বেড়ে যাবে নানা।'

রুষ্টা জননী বলিছেন তারে, 'শরৎ আর কি কবে ?
জানে না সে কি যে, কি কারণে তবে,
আমরা এসেছি ভবে।'
কভু বলিতেন, 'আমার ছেলেরা, পথে পথে দ্বারে দ্বারে
আহার লাগিয়া ফিরিছে এ দুঃখ
পারি না যে সহিবারে।
কখনই নয়, বলেছি ঠাকুরে, হে প্রভু! তোমার ছেলে
কেমনে তোমারে ভজিবে এমন দেহের কষ্ট পেলে ?'
কোন সন্তান কহে, 'মাগো তুমি
ঠাকুরে কি ভাবে দেখ ?'
ক'ন্ গম্ভীরে, 'সন্তানভাবে' এইকথা জেনে রেখো।
শিবের সহিত সতীর মিলন দেহাতীত চিন্ময়
তাইতো জননী ঘোষিলেন এই অভিনব পরিচয়।
কোন বা ভক্ত শূলবেদনায় পাইয়া বিষম ক্লেশ।
তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট শুনিল নাহি সন্দেহ লেশ।
'গুরুপাদোদক পান কর ত্বরা হয়ে যাবে নিরাময়।'
মায়ের চরণসলিল গ্রহণে, কাটিল তাহার ভয়।
কেহ বলে, মাগো! পূজিব তোমারে,
চরণ বাড়ায়ে দাও
কেহ বলে 'আম' চাখিয়া এনেছি,
এখুনি মা তুমি খাও।
কোন বা ভক্ত যোগীজনধন চরণকমল 'পরে
অমল কমলদল জল দিয়া প্রাণ ভরি পূজা করে।
স্নেহের মূরতি জননী আমার ভক্তবাসনা জানি
সকরুণ দিঠি অভয়া বরদা হাসিমাখা মুখখানি।
ধ্যানের মূরতি সম্মুখে পেয়ে কোন যোগী করে ন্যাস
স্বেদজলে ক্রমে তিতে ওঠে মার সবখানি দেহবাস।
ওপাশ হইতে আসিয়া সেবিকা 'গোলাপ' রুখিয়া ওঠে
'ওমা একি পূজা ? মাটির প্রতিমা
ইহারে পেয়েছ বটে!'
আবার কখনো কোন বা ভক্ত দীক্ষা লইতে আসি
ধূলায় রৌদ্রে লুটাইছে তাঁর করুণার প্রত্যাশী।
অন্তর্যামিনী জানিয়া সে কথা, কহেন, 'যাইতে বল'!
হবে না দীক্ষা, মিথ্যা এমন কাঁদিয়া কি আছে ফল।
ভক্ত নীরব, অশ্রুর স্রোত ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়
পুন আসি মাতা, দ্বার হ'তে হেরে, সুনিবিড় মমতায়—
বলেন, 'উহারে হেথা লয়ে এস, এখুনি দীক্ষা হবে।'
এত দয়া তোর না হ'লে কেন গো
জগৎজননী ক'বে ?
এমন কত কি, কত ইতিহাস কে তার সংখ্যা রাখে
সাধারণ চোখে শুধু দেখি মোরা সেই সাধারণ মাকে।
কেহ ভাবে মাকে শুধাইয়া লব সাধন ভজন কথা
নিকটে আসিয়া ভার নাও বলি কাঁদিয়া লুটায় মাথা।
বদনে ফুটে না বলিবার কিছু, শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে
কোন্ বড় ঘর হইতে এসেছে,
কে জানে কাহার মেয়ে।
জননী মোদের আশ্বাসি তারে, ক'ন্ ভার লইয়াছি
বহুদিন হতে রহিয়াছ মোর অতিশয় কাছাকাছি।
ভাবনা কি তার ? ঠাকুরে যে জন নিয়ত স্মরণ লয়
এপথ হইতে বিপথে লইতে কাহারও সাধ্য নয়।
বলিতেন,—'সাধো কলিতে এবার-সত্য পরম ধন
সত্যে রহিলে ভগবানে পাবে, ঠাকুর ইহাই কন্।'
নিরাশা-আকুল সন্ন্যাসী দেন অনুযোগ-ভরা লেখা
'বৃথা এ জীবন বহিতে পারি না মিলিল না তাঁর দেখা।
নামিলে যদিগো দেবতা কেন এ দেউলের প্রয়োজন
গেরুয়া পরিয়া মিছামিছি যেন পথে পথে বিচরণ।'
শুনিয়া জননী গম্ভীরাননে, দীপ্ত তেজেতে কন্
"একি তার কথা ? ভগবৎপদে যদি কেহ সঁপে মন—
ধন্য সেজন এসেছে এখানে, হইবে ইষ্টলাভ ;
জীবনেও যদি না হয় মরণে হবেই আবির্ভাব।"
ভক্ত মায়ের নানান প্রকার আসিছে বিবিধ পথে
যার যেই ভাব, সে তাহা লইয়া, চলে যায় তার মতে।
কার কিবা ভাব, কিরূপ আধার জননী জানিতে পারে
স্বভাব দেখিয়া সাধনার পথ বলে দেন একেবারে।
জয়া বিজয়ার মতো মার কাছে, যোগেন গোলাপ রহে
অনাবিল স্নেহস্রোত সম মার দুজন দুধারে বহে।
একদা যোগেন, নারী-প্রকৃতির বশীভূতা হ'য়ে কয়—
'ভাইঝি ভাইপো লয়ে অস্থির, এ কেমন দেবী হয় ?'

জাহ্নবী তীরে ধ্যানেতে বসিয়া একদা দেখিছে চেয়ে
ঠাকুর দাঁড়ায়ে, জ্যোতিতরঙ্গ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে।
জলের উপরে মরাশিশু ভাসে, দেখান আঙ্গুল তুলি
'উনিও অমনি পতিতপাবনী, একথা যেওনা ভুলি।
উঁহারে আমারে জানিবে অভেদ, মুরতি কেবল ছুটি
ঘন সংশয়-আঁধারে জ্ঞানের আলোক উঠিল ফুটি
ত্বরিতে আসিয়া নমি জননীরে,

কয়, 'মাগো, ক্ষমা কর।

বিশ্বাসহীনা হ'য়ে তোর পদে দোষ করিয়াছি বড়।'
আমূল ঘটনা শুনিলেন দেবি, পরে কহিলেন হেসে,
'অবিশ্বাস তো আসিবেই, পাকা বিশ্বাস হবে শেষে।'
যখন ছিলেন বৃন্দাবনেতে প্রার্থনা ছিল তাঁর
হে রাধারমণ! কারো কোন দোষ

না দেখি যেন গো আর।

এই কর মোর, দোষ দৃষ্টিটি চিরতরে মুছে লও
সবই তো তোমার বিরাট মুরতি,

কোনটিবা তুমি নও?

দোষ কেহ কারো দেখোনা দৃষ্টি দুষিত হইয়া যাবে
সে আঁধার মনে ঈশ্বরালোক

কেমনে প্রকাশ পাবে?

প্রসঙ্গ ক্রমে কহেন,—'নারীরও সন্ন্যাস হ'তে পারে
হোক না সে নারী', গৌরদাসীরে

দেখাইয়া বারে বারে

কন্, 'একি নারী? কত কি করেছে,

স্কুল, গাড়ি, ঘোড়া কত

যে নারী এমন সে ঠিক্ পুরুষ ত্যাগী সন্ন্যাসী মত।'
আরো কত কথা মনে পড়ে নানা পুস্তকে ধরা আছে
বাতুলের মত বলিবারে চাই, আপনা সবার কাছে।
মনে হয় শুধু বার বার আজ

'মা' 'মা' বলিয়া ডাকি

মনের কক্ষে রাখিয়া সে ছবি অনিমেষে চেয়ে থাকি।
আর কেঁদে বলি, আয় মাগো তুই,

আর বার ফিরে আয়

সাধনবিহীন স্বেচ্ছাচারে যে, জীবন বিফলে যায়।
কে আর চরণ বাড়ায়ে জীবের পাপতাপ নিজে লবে।
কে বলিবে 'ওরা ধূলিমাখা ছেলে

মোরে কোলে নিতে হবে।'

কখন যোগিনী, কখন বালিকা, নির্ভরতার বাণী
কহেন, 'যা কর তোমরা সকলে,

আমি কিছু নাহি জানি।'

কভু বা জ্ঞানের মণি মন্দিরে, মন্দারমালা গ'লে
বরাভয় করে সারদা জননী, হাসিছেন কুতূহলে।
'ভয় নাই' আমি আছি যতদিন, সবে নিরাপদে রবে
যারা না পারিবে সাধন ভজন, ঠাকুর-শরণ লবে।
অসহ রোগের যাতনা, তবুও রাত্রে নিদ্রা নাহি
জপের মালাটি হাতে লয়ে র'ন শূন্য দৃষ্টি চাহি।
শুধালে তাঁহারে কহেন,—'আমার শিষ্য সে বহুতর
কেহ বা জপেন, কাহারো বা নাহি একতিল অবসর।
তাহাদের সব অক্ষমতা যে বহি আমি নিজ শিরে
না দিই বিরতি জপে সে কারণে,'

কন্ অতি ধীরে ধীরে।

অন্তিমে মার ভক্ত সে সেরা, কাঁদিলা চরণে পড়ি
কহিল, 'মোদের উপায় কি হবে,

যদি চলে যাও ছাড়ি?'

ক্ষীণস্বর তবু থামিয়া থামিয়া জননী কহিলা তারে
'দরশন তুমি করেছ ঠাকুরে, নরদেহী দেবতারে
আর নাহি ভয়, তথাপি তোমায় শেষ এক কথা বলি,
শান্তি মিলিবে, কখন কাহারও

দোষ দেখিও না ভুলি।

যদি দেখ দোষ, দেখিবে নিজের, বিশ্বে আপন দেখো,
কেহ নহে পর, জগৎ তোমার,

এই কথা মনে রেখো।'

যাদের দুঃখে কাতরা জননী, তাদের কলুষ বহি
দুঃসহ রোগ যাতনার জ্বালা নীরবে লইয়া সহি
সকলের তরে এই শেষ বাণী, রাখিয়া জননী মোর
হাসিয়া একদা চলি গেলা করি লীলার রজনী ভোর।
সহিষ্ণুতার মধুর মুরতি, ক্ষমাময়ী তুমি মাগো!
মোদের আঁধার বক্ষ উজলি চিরদিন তুমি জাগো॥

পরমভাগবত শ্রীউদ্ধব

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

যুগ যুগ ধরে কতো সাধক, কতো ভক্ত, ভগবানের আরাধনা ক'রে তাঁকে লাভ করেছেন অনন্যাভক্তি দিয়ে; কিন্তু শ্রীভগবান্ নিজমুখে যাঁর পরিচয় দিয়েছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে সেই চিহ্নিত প্রিয়তম ভক্ত হলেন শ্রীউদ্ধব।

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১।১৪।১৫

—('হে উদ্ধব) তুমি যেরূপ আমার প্রিয় সেরূপ আর কেহই নয়। ব্রহ্মা যদিও পুত্র, শঙ্কর যদিও আমারই স্বরূপ, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা এবং লক্ষ্মী পত্নী তথাপি কেহই প্রিয় নয় তোমার মতো। এমনকি আমার নিজের আত্মাও তোমার মতো প্রিয় নয়।' ভগবানের এই উক্তি থেকেই ধারণা হয় ভক্তিজগতে উদ্ধবের স্থান কতো উচ্চে। এই উক্তির মধ্যে যে একটুও অতিরঞ্জন নেই তার প্রমাণ তাঁরাই পেয়েছেন যাঁরা সমুদ্রের মতো বিশাল গম্ভীর উদ্ধবচরিত্রের অনুধ্যান করেছেন।

ভক্তমালিকার মধ্যমণি উদ্ধব ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য। যে সাধকপ্রবরকে পিতৃত্বে স্বীকার করে লোকসংগ্রহের জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই যদুকুলতিলক বসুদেবের ভ্রাতা মহাত্মা দেবভাগের পুত্র ছিলেন শ্রীউদ্ধব। তাঁর দেহকান্তি ছিল শ্রীকৃষ্ণের মতোই নবজলধরতুল্য, মুখশ্রী ফুল্লকমলসদৃশ, নয়নযুগল আকর্ণবিস্তৃত। নীতি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎমূর্তি ছিলেন তিনি নিজের গুরুদেবের তুল্যই। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য!

যখন উদ্ধব মথুরায় এলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমদর্শনেই তাঁকে আপন-অন্তরঙ্গ বলে চিহ্নিত করে নিলেন অন্তরের অন্তস্তলে। তাইতো উদ্ধব হয়েছিলেন মথুরারাজের বিশ্বস্ততম সচিব, অনুরাগী মিত্র, হিতকারী বন্ধু।

ব্রজধাম থেকে মথুরা যাত্রার সময় ভগবান্ গোপীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, শীঘ্রই ব্রজে ফিরবেন বলে। তিনি জানতেন তাঁর অদর্শনে তদ্গতচিত্ত গোপীদের কিরূপ অবস্থা হয়েছে, তাই বিরহোৎকণ্ঠা-বিহ্বল গোপাঙ্গনাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে পরমপ্রিয় উদ্ধবকে নির্জনে বললেন, 'হে সৌম্য, একবার ব্রজপুরে যাও। মা বাবা আমার অদর্শনে কতো ব্যাকুল! গোপীরা হয়তো মৃতকল্প। আমার সন্দেশ তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের শান্ত করে এস।' বস্তুতঃ করুণাময় ভক্তবৎসল প্রভু নিজের প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে ব্রজবাসীদের লোকোত্তর প্রেমের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রেরণ করলেন সুদূর ব্রজপুরে।

উদ্ধব ভগবানের সন্দেশবাহক দূতরূপে গোকুলের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনে মনঃপ্রাণ পূর্ণ হল। দিনমণি পশ্চিমগগনে অস্তমিত হতে চলেছেন, সন্ধ্যার সেই গোধূলিলগ্নে দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে তাঁর রথ প্রবেশ করল গোকুলে। গোধূলিধূসরিত রথ সন্ধ্যার অন্ধকারে গোকুলবাসীর দৃষ্টিগোচর হল না। ধীর গতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উপস্থিত হলেন নন্দালয়ে।

নন্দরাজ তাঁকে বাসুদেবজ্ঞানেই স্বাগত ও যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। এতদিনের অদর্শনে পিতা নন্দ মাতা যশোদা কতো উৎকণ্ঠিত, কতো কাতর! তাঁরা কৃষ্ণবলরামের কুশল প্রশ্ন করতে থাকেন ব্যস্তসমস্তভাবে। একটার পর একটা

প্রসঙ্গ চলতে লাগল মধুর লীলামৃতকথার। আলোচনার আর শেষ হয় না। প্রশ্নের সমাপ্তি নেই! মাধুর্যঘন ভগবানের অমিয়চরিতকথা যতই পান করা যাক আশ মেটে না—আরো চাই, আরও। উদ্ধব বাৎসল্যভাবে আত্মহারা নন্দ-যশোদার শ্রীভগবানে পরম অনুরাগ দেখে প্রীত হলেন। একটি জিনিস কিন্তু তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়াল না, তিনি উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করলেন অনুরাগের আতিশয্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের সাধারণ মানুষের মতোই আত্মীয়-বুদ্ধি। তাই বললেন—

"ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥
ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥"

ভাঃ ১০।৪৬।৩৮,৩৯

'তাঁর মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আপন, পর কেউ নেই, তাঁর দেহ, জন্ম, কর্ম, কিছুই নেই, তবে লীলা ও সাধুদের রক্ষার জন্যে কখনো কখনো বিভিন্ন শরীরে (মৎস্যকূর্ম-নৃসিংহাদি) স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন। আরও বললেন,—

"যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা চ ঈশ্বরঃ॥"

ভাঃ ১০।৪৬।৪২

'ভগবান্ হরি কেবল আপনাদেরই পুত্র নন্, তিনি সকলের পুত্র, সকলের আত্মা, পিতা, মাতা ও প্রভু।'

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জগৎকারণত্ব ও অন্তর্যামিত্বের আশ্চর্য মহিমা ও তাঁদের অপূর্ব লীলাকথা-বর্ণনায় কিভাবে যে নিশা অতিবাহিত হল কেউ বুঝল না। আনন্দের মুহূর্তগুলি আনন্দেই দ্রুত এগিয়ে চলে অনন্তের পথে। রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে ভেসে আসে প্রভাতীসুরের মধুরসঙ্গীত। সমস্ত অশুভ নাশকারী সেই শ্রবণমঙ্গল সুরতান উদ্ধবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। তিনি মুগ্ধ হলেন, তাঁর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হল। ধীরে ধীরে পূর্বগগন লালিমায় মণ্ডিত করে জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর দেখা দিলেন। ব্রজগোপীরা দেখলেন নন্দরাজের দ্বারে সুবর্ণরথ। 'কে এসেছেন, কার এই মোহন রথ?' পরস্পর জিজ্ঞাসা চলে।......

তারপর আজানুলম্বিতবাহু, আয়তলোচন, ভাস্বর, কৃষ্ণের মতোই পীতাম্বরধারী উদ্ধবকে দেখে তাঁরা বুঝলেন, নিশ্চয়ই ইনি কৃষ্ণের অনুচর, অন্তরঙ্গ তদ্ভাবভাবিত সখা। গোপীরা তাই লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আবেগভরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রতিটি কথায় ব্যাকুলতা, বিরহজনিত তীব্র দুঃখ ও প্রেমজ্বালা বিচ্ছুরিত হয়ে আসে! ব্রজাঙ্গনাদের সান্ত্বনা দিয়ে উদ্ধব বোঝাতে থাকেন—'শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি যেমন আপনাদের হৃদয়পুরে সেইরকম সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কখনো আপনাদের বিয়োগ হতে পারে না। যিনি অন্তরে, বাহিরে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁর সঙ্গে কি বিচ্যুতি সম্ভব?' এই কথা শুনে গোপাঙ্গনাদের নয়নবারি উথলে ওঠে, অঝোর ঝরে ঝরতে থাকে আর বুক ভেসে যায়। তাঁরা বলতে থাকেন, 'হে উদ্ধব, আপনার কথা সবই ঠিক। একটুও মিথ্যে নয়। কি যমুনা-পুলিনে, কি বৃক্ষলতায়, কি কুঞ্জবনে সর্বত্রই সেই শিখিপুচ্ছধারী কমললোচনকে দেখি, তাঁর হৃদয়হারী শ্যামমূর্তি তিলেকের জন্যেও আমাদের হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয় না। ক্ষণমাত্রও তাঁর চিন্তা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এযে একেবারে দুঃসাধ্য।' উদ্ধব ভাবলেন, গোপীরা মহাভাগ্যবতী। দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, জপ, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা যে ভক্তি লাভ হয়, মুনিগণেরও দুর্লভ সেই ভক্তি সৌভাগ্যবশতঃ এঁদের লাভ হয়েছে। উদ্ধবের ধারণা ছিল, ভগবান্ বৃথাই গোপীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এঁদের উপর অনুরাগের আধিক্য-বশতঃই তিনি এত উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন। গোপীদের

উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই প্রেমভক্তি হয়তো নেই। উদ্ধবের নিজের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা আজ সব চুরমার হয়ে গেল। গোপীদের ভাব-বিহ্বল অবস্থা দেখে তাঁর চোখ ফুটল। ব্রজপুরীর অলৌকিক প্রেমে অভিভূত হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি গোপীদের প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন, গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের তৃণগুল্মলতার মতোও যেন একটা কিছু হতে পারেন।

ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে চোখে প্রেমের অঞ্জন মেখে উদ্ধব প্রত্যাবর্তন করলেন মথুরায়। সেখান থেকে ভগবানের সঙ্গে দ্বারকায় গেলেন। দ্বারকাপুরে সর্বদা ছায়ার মতো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন, রাজ-কার্যে মন্ত্রণা দেন, সর্ববিষয়ে সহায়তা করেন। এমনইভাবে মহানন্দে দিন কেটে যায়। কিন্তু বৈচিত্র্যময় জগতে একটানা একটি ভাবে তো দিনের পর দিন কাটে না। তাই বুঝি বিরহের দিন ঘনিয়ে আসে। মলিন আর বিরহ এই নিয়েই যে সংসার! আলোকের পশ্চাতেই অন্ধকার! অনধিগম্য ভক্তভগবানের অপার লীলা!

নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। দুর্নিবার তার গতি। কালচক্রের নিষ্পেষণে সবাই পিষে যাচ্ছে। তাই যদুকুলও রেহাই পেল না। অদৃষ্টের অমোঘ লিখনে, যদুগণ শাপগ্রস্ত হলেন। এইবার চাই শাপমুক্তি। শাপবিমোচনের জন্যে তাঁরা প্রভাসতীর্থে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। ভগবানের প্রভাসযাত্রার সঙ্কল্প জেনে উদ্ধব বুঝলেন এইবার তাঁর অন্তর্ধানের সময় নিকটবর্তী, মানবলীলা সমাপ্তপ্রায়। একান্তে তিনি সকাতর প্রার্থনা জানালেন, 'হে কেশব, ক্ষণার্ধও আপনার পাদপদ্ম ছেড়ে থাকতে পারবো না, আমাকে আপনার সঙ্গে স্বধামে নিয়ে চলুন।

"নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥"

ভাঃ ১১।৬।৪৩

ভগবান্ তখন প্রিয়তম সুহৃৎকে জানালেন তাঁর অন্তর্ধানের কথা, আর বললেন তিনি অন্তর্হিত হলেই পৃথিবীতে হবে কলির আধিপত্য। তাই স্বজন-বান্ধবে স্নেহমমতা ত্যাগ করে তাঁতে মনঃসন্নিবেশ করে সমদৃষ্টি হয়ে জগতে বিচরণ করতে উপদেশ দিলেন।

"ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্॥"

ভাঃ ১১।৭।৬

উদ্ধব বুঝলেন ভগবান তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে আদেশ করছেন। সেই জন্যে 'অনুশাধি ভৃত্যম্' বলে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ চাইলেন।

এই সময়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে তত্ত্বজ্ঞানের বহু উপদেশ দেন। এগুলি ভাগবতে হীরকখণ্ডের মতো শোভা পাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করলেন শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়ের অপূর্ব কাহিনী ও তাঁর চব্বিশ গুরুর কথা। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, সমুদ্র, অজগর, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, মৌমাছি, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, চিল, বালক, কুমারী, শরনির্মাতা, সর্প, মাকড়সা, কুমুরে পোকা—এই চব্বিশ গুরুর কাছে দত্তাত্রেয় কিভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন সে কথা। তারপর একে একে আত্মার স্বরূপ, বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ, সাধু ও ভক্তের স্বরূপ, সৎসঙ্গ, ভক্তিলাভের উপায়, ধ্যানযোগ, সাধনা ও সিদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ দিলেন। যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা এমনকি সন্ন্যাসও ভগবানকে উর্জিতা ভক্তির মতো বশীভূত করতে পারে না—তাই তিনি বললেন,

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥"

ভাঃ ১১।১৪।২০

ভগবানের কাছে এইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও যোগমার্গের উপদেশ লাভ করে পুলকিত উদ্ধব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে

আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন। চরণারবিন্দে প্রণত ভক্তকে সস্নেহে উঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে উদ্ধব, আমার অন্তর্ধানের পর তুমিই হবে আমার তত্ত্বজ্ঞানের রক্ষাকর্তা, তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার সাধনার কোনও প্রয়োজন নেই। তথাপি লোক-শিক্ষার জন্যে তুমি আমার বদরিকাশ্রমে যাও।'—গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্।' 'আসন্ন ভগবদ্‌বিয়োগকাতর ভক্ত কিছুতেই তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারছেন না—অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাঁর আজ্ঞাপালনের জন্যে কৃপাপ্রদত্ত পাদুকা মস্তকে ধারণ করে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। বিদায়ের এ দৃশ্যটি কী করুণ! এই দৃশ্য চিত্রকূটে রামচন্দ্র ও ভরতের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তরতম ভক্তের অন্তরে ভগবান্ চিরজাগরূক থাকলেও বাহিরেও তাঁর বিরহ যে অসহনীয়! উদ্ধব গোপীদের যে বিয়োগবিধুর অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন আজ তাঁরই সেই অবস্থা!

এরপর বদরিকাশ্রমে গিয়ে ভগবানের আদেশ পালনে রত হলেন। সুকঠিন কার্যের ভার সমর্পিত হয়েছে তাঁর উপর। তত্ত্বজ্ঞানের সংরক্ষণের ভার! দূর দূরান্তর থেকে সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মারা এসে মধুর তত্ত্বকথা শুনে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন। একদিন নয় দুদিন নয় দিনের পর দিন ধরে লোককল্যাণ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানপিপাসা শান্ত করতে করতে প্রেমিককে ভগবৎপ্রেম বিলাতে বিলাতে উদ্ধব এইবার বেরুলেন তীর্থপর্যটনে। এদিকে মহামতি বিদুরও সারা ভারতের একটির পর একটি করে সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। পবিত্র যমুনাপুলিনে দুই মহাপুরুষের পরম মিলন হল অতর্কিতে দৈবযোগে। যেন আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের মিলন! পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানের নাম শ্রবণমাত্রই পাঁচবছর থেকে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কিভাবে তাঁর অকুণ্ঠ সেবা করেছেন সব একে একে স্মৃতিপটে উদিত হতে লাগল। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলক, নয়নে প্রেমাশ্রু, মুখে মৃদু হাস। উদ্ধব সমাধিস্থ হলেন। কী অপূর্ব ভাব! ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে এলে বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণভাস্কর অস্তমিত, আমাদের গৃহ কালসর্পগ্রস্ত। ভাগ্যহীনা এই পৃথিবী। যদুগণ সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এতকাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করেও তাঁর ভগবৎস্বরূপত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাতই রইল।'

* * * *

উদ্ধব-চরিত্রের মতো জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য সত্যই দুর্লভ। একদিকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, অপরদিকে জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। সমুদ্র-দর্শনের মতোই এই চরিত্র যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে। যতই গভীরে প্রবেশ করি, তন্ময় হয়ে যাই। কে পরিমাপ করবে অতলস্পর্শ প্রসন্ন গম্ভীর চরিত্রের গভীরতা! হে পরমভাগবত তাই উদ্দেশে জানাই শুধু শত প্রণতি।

"পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান। তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে—ইট চুন সুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী!"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

[স্মার্ত উপাসনার বলে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ও সদ্যোমুক্তি]

এই স্মার্ত উপাসনাসকলের বলে কেবল যে স্বর্গ ও ক্রমমুক্তিরূপ ফল লব্ধ হয়, তাহা নহে। 'সগুণ দহরবিদ্যা' (ছাঃ ৮।১) অবলম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের যেমন নির্গুণ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের উদয় হয়*, তদ্রূপ গুণ ও অবয়বরূপ উপাধিযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের ভগবৎকৃপায় নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইয়া সদ্যোমুক্তিও লব্ধ হইয়া থাকে, ইহা অবগত হওয়া যায়। সেই বিষয়ে শাস্ত্র এই—

"ভবেন্নিরন্তরধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনম্ ॥
সুষুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশ্চোপরতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্বাতদীপবৎ সংস্থঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সদানন্দৈকবিগ্রহঃ।
নিশ্চলপরিপূর্ণশ্চ সমাধিরভিধীয়তে ॥

*　　*　　*

আত্মা তু নির্মলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তো যোগিনাং ভাত্যচঞ্চলঃ ॥
নির্গুণোঽপি পরো দেবোহজ্ঞানাদ্‌গুণবানিব।
বিভাত্যজ্ঞাননাশে তু যথা পূর্বং ব্যবস্থিতঃ ॥
পরজ্যোতিরমেয়াত্মা মায়াবানিব মায়িনাম্।
তন্নাশে নির্মলং ব্রহ্ম প্রকাশয়তি পণ্ডিতাঃ ॥ ইত্যাদি

(বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৪২—১৪৮)

'নিরন্তর ধ্যান-প্রভাবে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নতা জ্ঞান হয়। ইহাই অহংগ্রহোপাসনার পরিপক্কাবস্থা। এক্ষণে সেই অবস্থা হইতে সাধক কি প্রকারে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন—] অনন্তর সুষুপ্তি অবস্থাতে যে প্রকার হয়, সেইপ্রকারে উপরতেন্দ্রিয় ও পরমানন্দযুক্ত সাধকের বায়ুহীন প্রদেশে দীপশিখার ন্যায় যে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তাহাকে সমাধি বলা হয়। সেই অবস্থাতে সাধক সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া একমাত্র সৎ ও আনন্দাত্মক বিগ্রহ হইয়া পড়েন। (—সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া পড়েন)। তাদৃশ যে নিশ্চল পরিপূর্ণ অবস্থা, তাহাই সমাধি নামে অভিহিত। তখন আত্মার সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত শুদ্ধ ও নির্মল যে সচ্চিদানন্দস্বরূপতা, তাহা যোগিগণের নিকট অচঞ্চলভাবে

* সগুণ ব্রহ্মোপাস্ত্যা নির্গুণধীঃ"—ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪, ভাষ্যরত্নপ্রভা। "পরোপাস্তিদ্বারা প্রতিপত্তিঃ" (ঐ) —ন্যায়নির্ণয়।

প্রকাশিত হয়। তখন নিগুর্ণ হইলেও যে পরম দেবতা অজ্ঞানবশতঃ গুণবানের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিলেন, অজ্ঞানের নাশ হইলে তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, সেইরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন, (—অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জীব ব্রহ্মাভিন্নস্বস্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন)। পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অমেয় আত্মা মায়াধীন জনগণের নিকট মায়াবানের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন, সেই মায়ার নাশ হইলে, হে পণ্ডিতগণ, নির্মল ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতে থাকেন,' ইত্যাদি। এই বিষয়টিই অন্যত্র আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

"তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥

* * *

তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥
বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" ইত্যাদি

(বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৯২, ৯৫—৯৬)

["অহংগ্রহোপাসনাশীল] সেই সাধকের মনের দ্বারা যে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা—এই প্রকার কল্পনাবিহীন স্বরূপের গ্রহণ, যাহা ধ্যাননিষ্পাদ্য, তাহাকে সমাধি বলে। [ইহাই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা]। তখন সেই সাধক পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, যেহেতু পরমাত্মার সহিত যে বিভিন্নতা, তাহা তাঁহার (—পরমাত্মার অর্থাৎ পরমাত্মাকেই আশ্রয় ও বিষয়কারী] অজ্ঞানের কার্য। [পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে] ভেদজ্ঞানের জনক যে অজ্ঞান, তাহার আত্যন্তিক নাশ হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে [পরমার্থতঃ] অবিদ্যমান বিভিন্নতা, তাহা আর কে সম্পাদন করিবে? (—উক্ত প্রকার নির্বিকল্প সমাধির প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান সম্পাদক কিছুই না থাকায় জীব ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন")।

[প্রসঙ্গের উপসংহার—স্মার্ত উপাসনাসকল বেদের বিরুদ্ধ নহে]

এইরূপে দেখা গেল প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনা আরব্ধ হইয়াছিল, এইভাবে নিগুর্ণ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানেই হয়, তাহার পরিসমাপ্তি। অহং গ্রহোপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তিদ্বারেই হউক, অথবা সাক্ষাৎ ভাবেই হউক এই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় না হইলে জীবের সর্বদুঃখের আত্যন্তিক উপশম সম্ভব হয় না। এইরূপে প্রতীকাবলম্বনা বিদ্যাদ্বারাও ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয়, ইহা নির্ণীত হওয়ায় পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন 'প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনা উপাসনা ক্রমমুক্তিপ্রদও নহে এবং সদ্যোমুক্তিপ্রদও নহে,' তাহা নিরাকৃত হইল। আর "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ পুঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রের সহিত যে বিরোধ প্রতিভাত হইতেছিল, তাহাও নিরাকৃত হইল। অতএব উত্তরমীমাংসার অবিরোধী হওয়ায় এই স্মার্ত উপাসনাসকল যে বেদবিরুদ্ধ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

[সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহপাত হইলে অহংগ্রহোপাসকের ও ভেদভাবালম্বী সাধকের গতি]

আরব্ধ বিচার সমাপ্ত হইল। কিন্তু প্রসঙ্গগত আরও দুই-একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে বিচারটি অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যকতা আছে। তাহা এই—অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকের ক্রমমুক্তি হয় এবং কোন কোন সাধক সেই অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) —'তাঁহার প্রাণসকল (—লিঙ্গশরীর) উৎক্রমণ করে না, স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যান', এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই দেহপাত হইলে তাদৃশ সাধকের কি গতি হইবে? আর যাঁহারা অপ্রতীকভূত মনোময়ী প্রতিমাতে সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভেদ-ভাবালম্বনে উপাসনা করেন, 'তুমিই আমি' এবং 'আমিই তুমি'—এইপ্রকার ভাবালম্বনে অহংগ্রহো-পাসনা করেন না, অপ্রতীকালম্বনা হইলেও ভগবদ্দর্শনের পূর্বে শরীরত্যাগ হইলে, তাঁহাদেরই বা কি গতি হইবে? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে গীতা ৬।৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তদনুসরণে বলা যায়—মৃত্যুকালে তাদৃশ সাধকের মনে যদি ভোগবাসনার উদয় হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তিনি দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, নানাস্তরভেদে বিভক্ত* ব্রহ্মলোকে স্ব-সাধনোচিত কোন উচ্চাবচ স্তরে বহু বৎসর নানা দেবোচিত সুখভোগে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করত রাজচক্রবর্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুনরায় ভগবৎকৃপালাভে যত্নশীল হন। আর মৃত্যুকালে তাদৃশ সাধকের মনে যদি ভোগবাসনার উদয় না হইয়া শ্রদ্ধা ও বিবেকবৈরাগ্যাদি কল্যাণগুণসকলেরই প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে "তীব্র সংবেগানাম্ আসন্নঃ" (যোঃ সূঃ ১।২১)—"তীব্র বৈরাগ্যযুক্তগণের শীঘ্রই হয়", এই পাতঞ্জলোক্ত ন্যায়ানুসারে তাঁহার আর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবোচিত ভোগাদিতে সময় নষ্ট হয় না। পরন্তু অচিরাৎ তাঁহার যোগিগণের কুলে জন্ম লাভ হয় এবং পূর্বসংস্কারবশে পুনরায় তিনি সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হইয়া থাকেন।

[ভেদভাবাবলম্বী সিদ্ধ সাধকের পুনরাবৃত্তি]

এক্ষণে আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে—যাঁহারা সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভেদভাবালম্বনে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি গতি হইবে? 'আমিই তুমি' এবং 'তুমিই আমি'—এই প্রকার অভেদভাবালম্বনা না হওয়ায় তাঁহাদের উপাসনা তো ক্রমমুক্তিপ্রদ হইবে না। তদুত্তরে বলা যায়—ভেদভাবালম্বনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও যখন তাঁহাদের পরম-প্রেমাস্পদের দর্শনলাভ হয়, তখন উক্ত ভেদভাব কতক্ষণ থাকে, তাহা চিন্তনীয়। জারভাবরূপ † অতি মলিনভাবালম্বনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপাগত গোপীগণেরও যখন 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ' ‡ —এই

* ব্রহ্মলোক যে উচ্চাবচ নানাস্তরভেদে বিভক্ত, ইহা পাতঞ্জল দর্শনের ৩।২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এবং গীতা ৬।৪১ শ্লোকে মধুসূদনী টীকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

† শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।১২,১০।২৯।১১।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৩।

প্রকার অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন ভেদভাবালম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেও শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষু, শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধভাবাবলম্বী সাধকগণের যে অভিন্নতাবুদ্ধি ঝটিতি উৎপন্ন হইবে, এই বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। * তবে এতাদৃশ সাধক যদি শ্রীভগবানের সহিত লীলা-বিলাসেই অভিলাষী হন এবং শ্রীভগবানের তাহাই অভিপ্রেত হয়, ‡ কারণ ক্রীড়া আর একের ইচ্ছায় হয় না; তাহা হইলে তাঁহারা কখনও স্ব-সাধনোচিত ব্রহ্মলোকের কোন স্তরে, আবার কখনও বা ইহলোকে আগমন করিয়া তাহা করিতে পারেন, ইহাতে কোন প্রকার বিরোধ তো পরিদৃষ্ট হইতেছে না। তবে তাঁহাদের ব্রহ্মলোক হইতে যে পুনরাবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেমন পুরাণোক্ত জয় ও বিজয় প্রভৃতির হইয়াছিল। আর শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের এই লীলাবিলাস যে ভেদভাবাবলম্বী সাধকের একচেটিয়া অধিকার, তাহা নহে। আত্মারাম ও সমস্ত বন্ধনহীন সুতরাং মুক্ত মুনিগণও যে তাদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন শাস্ত্রে তাহা পরিদৃষ্ট হয়, যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৭।১০)

"সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত আত্মরূপ স্বস্বরূপে অবস্থিত মুনিগণও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির এমনই মহিমা।" আর সগুণ এবং নির্গুণ—এই উভয়প্রকার ব্রহ্মাত্মবিদ্ই যে শ্রীভগবানের কৃপায় আধিকারিক পুরুষরূপে ইহলোকে আগমন করত তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করেন এবং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করেন, ইহা উত্তরমীমাংসা-দর্শনে ৩৩।১১ 'যাবদধিকারাধিকরণে' ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণে বর্ণিত হইয়াছে।

[শ্রীভগবানের কৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়]

আচ্ছা, শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সাধনের এত বিভিন্ন ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে সাধনের ঠিক কোন অবস্থাতে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হয়? এতদুত্তরে মহাজনগণ বলেন—যখন যে অবস্থায় শ্রীভগবান কৃপা করিয়া দর্শন দেন, তখনই তাঁহার দর্শন লাভ হয়। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায়ই নাই। সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন —

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্" (কঠ উঃ ১।২।২৩)

"যে সাধককে ইনি অনুগ্রহ করেন, সেই অনুগৃহীত সাধকের দ্বারাই তিনি লব্ধ হন; তাঁহারই নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।" তিনি কোন প্রকার সাধনার বা অন্য কোন কিছুরই বশ নহেন।

"একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্।" (মহাভাঃ শাঃ ৩৫।১৫)

'স্বাধীন-আচরণশীল সেই এক ঈশ্বর প্রাণীসকলের মধ্যে যথাসুখে বিচরণ করেন।" সুতরাং কে কোন্ বস্তু দিয়া তাঁহাকে বশ করিবে। 'তিনি ভক্তির বশ,' কিন্তু তাহাও তো তিনি না দিলে পাওয়া যায়

* শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯-৩০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। তাহাতে ক্রোধ, ভয় ও দ্বেষ ইত্যাদি কলুষিত ভাবাবলম্বনেও মোক্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

‡ "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর হই" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

না। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল, এই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য 'শাক্ ও মাছের ন্যায়' কোন মূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করা যায় না। তবে শ্রুতি ও স্মৃতিতে সাধন-বর্ণনায় এত আড়ম্বর কেন? এতদুত্তরে জ্ঞানী বলিবেন—'হৃদয়মন্দিরকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করিয়া তাহার যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য,' আর নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বলিলেন—কাঁদিতে শিখিবার জন্য'। রাজরাজেশ্বর যখন দীনদুঃখীর পর্ণকুটীরে আসেন, তখন পূর্বেই স্বীয় অনুচরগণকে পাঠাইয়া পরিষ্কার ও সংস্কার করাইয়া সেই কুটীরের যোগ্যতা সম্পাদন করান, তাহার পরেই হয় তাঁহার আগমন। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ সাধনরূপ অনুচর প্রেরণ করত তিনি কাম ও ক্লেশাদি দোষসমূহের নিরাকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে স্বপ্রকাশের উপযুক্তভাবে পরিষ্কৃত করিয়া লন। অন্যথা সেই মহাভাবের বেগ ধারণ করিবার যোগ্যতা সাধারণ জীবের কোথা হইতে আসিবে? ভিক্ষুককে হঠাৎ লাখ টাকা দিলে তাহা তাহার শরীর ত্যাগেরই হেতু হয়। ভক্ত বলেন—মা সন্তানের নিকট ঠিক সময়মত আসেন বটে, তবে বেটীর সময় যে কখন হইবে, তাহার ঠিক কি? পাগলী বেটী কোটি কোটি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিসংহারে ব্যস্ত, তাঁহার কি একটা কাজ? সুতরাং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেটীকে একবারে বিব্রত করিয়া ফেল, দেখিবে বেটী ঠিক আসিয়া গিয়াছেন। এই সাধন-সকল সেই ক্রন্দন। ইহার অভ্যাস কর, বেটীর কৃপা হইবেই। তাই ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাঃ উঃ ৬।২৩)

"পরমেশ্বরে যাঁহার অচলা ভক্তি, পরমেশ্বরে যে প্রকার ভক্তি গুরুর প্রতিও যাঁহার সেই প্রকার ভক্তি, এইপ্রকার যে সাধক, তাঁহার নিকটই শ্রুতিতে উপদিষ্ট এই বিষয়সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।" ইতি। হরি ওঁ। (সমাপ্ত)

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (২৬শে নভেম্বর, ১৯৫৪) বিকাল ৫-২৪ মিনিটে বেলুড় মঠের বহুশ্রদ্ধাভাজন প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর (প্রিয়নাথ মহারাজ) ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং বন্ধুগণের নিকট বিশেষ মর্মবেদনাদায়ক। কিছুকাল যাবৎ তিনি মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন এবং গত বৎসর (১৯৫৩) অক্টোবর হইতে কয়েকমাস তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়া আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে থাকিতে হইয়াছিল। কিছুটা সুস্থ হইয়াও উঠিয়াছিলেন। ১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে তাঁহার 'প্রস্টেট্ গ্ল্যাণ্ড্' অপারেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, কিন্তু দুইদিন পরে হঠাৎ আংশিক পক্ষাঘাতের আক্রমণে বাক্‌শক্তি ও শরীরের দক্ষিণ দিক অবশ হইয়া যায়। ইহার পরে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন আকার ধারণ করে নিউমোনিয়ার আক্রমণে এবং পরিশেষে পূর্বোল্লিখিত সময়ে উপনিষদের মন্ত্র এবং শ্রীভগবানের সর্বমঙ্গলকর নাম শুনিতে শুনিতে নির্মায়িক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বরদেহ বেলুড়মঠে নীত হইয়া গঙ্গাতীরে সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট সৎকারস্থানে বহুসংখ্যক সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে অগ্নিসাৎ করা হয়।

প্রিয়নাথ মহারাজ খ্রীঃ ১৯১২ সালে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্বোধন কার্যালয়) যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক কার্যপ্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মী পরে গঠনমূলক সেবাকার্যে ব্রতী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বলিষ্ঠ নিঃস্বার্থ চরিত্র, অসাধারণ কর্মদক্ষতা এবং পরদুঃখকাতর উদারহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুতর কর্মক্ষেত্রে বিপুল সার্থকতা আনয়ন করিয়াছিল। তিনি বেলুড় মঠের একজন অন্যতম ট্রাষ্টি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের "গভর্ণিং বডি"রও অনেক সদস্য ছিলেন। উদ্বোধনের শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যায় স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর 'মাতৃস্মরণে'-সংজ্ঞক একটি হৃদয়স্পর্শী ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছে। জগদম্বার অভয়চরণে মাতৃগতপ্রাণ সন্তান চিরবিশ্রাম লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

জন্মতিথি—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েক-জন সন্ন্যাসি-শিষ্যের জন্মতিথির তারিখ এই বৎসর যেরূপ পড়িয়াছে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)—অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী, ৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর), সোমবার।

স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ)—পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী, ১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর), শুক্রবার।

স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ)—পৌষ শুক্লা চতুর্দশী, ২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৫), শুক্রবার।

স্বামী বিবেকানন্দ—পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী, ৫৫), শনিবার।

শাখাকেন্দ্র-সংবাদ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ গত ১৯শে কার্তিক (৫ই নভেম্বর) দিল্লী আশ্রমে একটি পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। ৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) কনখল সেবাশ্রমে একটি রঞ্জনরশ্মি (X-ray) গৃহের ভিত্তিস্থাপনও পূজ্যপাদ মহারাজজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ১০ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর) লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমে পদার্পণ করেন। যে সাতদিন তিনি তথায় ছিলেন প্রত্যহ বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নানাবিধ ভগবৎ-প্রসঙ্গ দ্বারা সমাগত ভক্তগণকে পরিতৃপ্তি দান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজজী ৮ই অগ্রহায়ণ আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শুভাগমন করেন এবং প্রায় সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ১৪ই বেলুড় মঠে রওনা হইয়া যান। ১০ই অগ্রহায়ণ প্রাতে তিনি আশ্রমের বিদ্যার্থি-বাস-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রতিদিনই আশ্রমে বার্ণপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, মাইথন, রানীগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার হৃদয়স্পর্শী ভগবৎ-প্রসঙ্গ সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া বিমল শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

পরলোকে মিস্ হেলেন রুবেল—বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট মন্দির প্রধানতঃ যাঁহার আর্থিক দানে সম্ভবপর হইয়াছিল সেই মহীয়সী আমেরিকান মহিলা চিরকুমারী মিস্ হেলেন

ফ্র্যান্সিস্ রুবেল (ভগিনী ভক্তি) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে মিস্ রুবেল আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেন্স কেন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থে ব্যাখ্যাত বেদান্তের সার্বভৌম বাণীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শীঘ্রই বেদান্তের শিক্ষা তাঁহার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় অদ্ভুত পরিবর্তন আনয়ন করিল এবং ভগিনী নিবেদিতার মতোই তিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার ধ্যানলোকের জন্মভূমি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজের সহিত তিনি কয়েকখানি পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন, পরে ১৯৩৫ সালে তিনি যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসিলেন তখন পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে দর্শন এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হইলে ১৯৩৭ সালে উহার উদ্বোধন-উপলক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন এবং তখন হইতে ভারতবর্ষেই থাকিয়া যান। তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মিস্ রুবেল শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের একাধিক শিক্ষা ও পীড়িত সেবার কাজেও বহু আর্থিক সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার জীবনের বড় কথা নয়—বড় কথা তাঁহার একান্ত আধ্যাত্মিক সাধন-নিয়োজিত বৈরাগ্যভাস্বর সরল অনাড়ম্বর নির্মল নিরভিমান চরিত্র। পীড়িত রুগ্ন দেহেও বৎসরের পর বৎসর তিনি যেরূপ কঠোর ধ্যানধারণায় ডুবিয়া থাকিতেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মাঝে স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কিছু দিনের জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া পুনরায় কিয়ৎকাল পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডে যান। ওখানেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল। সত্য সাধিকার বিদেহ আত্মা পরমপদে চিরন্তন আশ্রয় ও শান্তিলাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী সংবাদ—গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৫৪), সন্ধ্যাকালে নিউইয়র্কের ৩৪ ওয়েষ্ট ৭১তম স্ট্রীটস্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে সোসাইটির সদস্যগণকে এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ও জনসাধারণকে শ্রীমা'র স্মৃতির প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধানিবেদন-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগদানের উদ্দেশ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র গাম্ভীর্যময় ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মন্দিরটি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয় এবং পত্রপুষ্পে সুশোভিত শ্রীমার একখানি মনোজ্ঞ প্রতিকৃতি বেদীর নিকট স্থাপন করা হয়। এই বেদীর উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। মন্দিরে এত বিপুলসংখ্যক নর-নারীর সমাবেশ হয় যে, মন্দিরের মধ্যে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। উপরতলায় বাসের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষগুলিতে অবশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের বসিবার এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাঁহাদের শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী পবিত্রানন্দ সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে প্রার্থনা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। অতঃপর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শঙ্করানন্দের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। স্বামী পবিত্রানন্দ তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এরূপ পরিবেশের মধ্যে শ্রীমা জীবন যাপন করিয়াছেন যে, তাহা পাশ্চাত্ত্যের নিকট বোধগম্য হইবে কিনা, তাহা এক প্রশ্ন এবং এমন কি, তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্যের আভাস কিরূপ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও এক সমস্যা। আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলন আরম্ভের ব্যাপারে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার

সিদ্ধান্ত-অনুসারেই বেদান্তের বাণী প্রচারের জন্য বিবেকানন্দের আমেরিকা আগমন চূড়ান্তরূপে স্থির হয়। যে কয়েকজন দুর্লভ শ্রেষ্ঠ ভগবৎসাধকের নীরব অনাড়ম্বর জীবন রহস্যময় কারণে এতদূর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা সমগ্র বিশ্বে তাঁহাদের পরিমণ্ডলসমূহের ক্রমাগত প্রসারে প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাবের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, শ্রীমা তাঁহাদের অন্যতমা। এই দিনের সান্ধ্য সভায় আমন্ত্রিত বক্তা, বেদান্ত-মন্ত্রে দীক্ষিতা মার্কিণ শিষ্যা মিসেস শারলোটি বোস ভারতে এক বৎসর যাবৎ তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া সদ্য প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে তিনি প্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় কথার সাহায্যে যে বাস্তব চিত্র আঁকিয়া যান, তাহা এই দিনের সমগ্র সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আদর্শ-পরিবেশ সৃষ্টি করে। দক্ষিণেশ্বর, বৃন্দাবন, বাঙ্গালোর, কামারপুকুর, ও জয়রামবাটীর যে বিবরণ দেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হন।

ভারতীয় সংসদের সদস্যা, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি ও ভারতস্থিত শ্রীমা'র জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন শ্রীমা'র জীবনের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ভারতীয় নারীদের জীবনাদর্শ যে সমস্ত নারীর পক্ষেই শিক্ষামূলক এবং বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের নারীরা শ্রীমা'র জীবন হইতে যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, শ্রীমতী মেনন তাহা বলেন।

বোষ্টন ও অন্যান্য বেদান্ত কেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীমার জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, যাঁহারা শ্রীমা'র করুণার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের সকলেরই আধ্যাত্মিক জীবনের ভার তিনি বহন করেন। পরিশেষে স্বামী পবিত্রানন্দ বলেন যে, শ্রীমা'র জীবনের সমস্ত ঘটনা সর্বজনের গোচরীভূত করা আবশ্যক। তাহা হইলে লোকে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, নরদেহধারী যে কেহ নিজেকে আধ্যাত্মিক জীবনের কত উচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে পারে। তাঁহার জীবনকথা গল্প-গাথা ও প্রাচীন যুগের পৌরাণিক কাহিনীর মতো। তিনি যে আমাদের সময়ের এত নিকটবর্তী কালে জীবিত ছিলেন, তাহা মনে করিতেও বিস্ময়বোধ হয়।

গত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমা সারদামণির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ১৬৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে চারু ও কারু-শিল্প এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহের এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সম্মেলনে শিক্ষা-মন্ত্রী বলেন যে সারদামাতার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ চতুর্দিকে নারীজাতির মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারতের নারী-সমাজের উন্নতিই সূচিত হইতেছে। নারী-সমাজের এই উন্নতিকে শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। সারদামাতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুদূর পল্লী অঞ্চলে নারীজাতির মধ্যে সামাজিক অবিচার দূরীকরণে ব্রতী হইবার জন্য তিনি কর্মীদের উদ্যোগী হইবার আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শ্রীশ্রীসারদামাতা দাম্পত্য-জীবনে নারীত্বের এক মহিমময় আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা যে কাল্পনিক নয় তাহা আজ সর্বত্র প্রমাণিত হইতেছে।

৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের প্রদর্শনীটি ঘুরাইয়া দেখানো হয়। শিল্পকলা ও সংস্কৃতিমূলক বহু দ্রব্যাদিতে প্রদর্শনীটি সজ্জিত করা হইয়াছে বিশেষ করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নারীসমাজ যে গৌরবময় কীর্তি

রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণ ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ চরিত্র ও জীবন উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ভবিষ্যৎ নারীসমাজ-গঠনে প্রভূত সাহায্য করিবেন। প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারেই একখানি গরুর গাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে তাঁহার এক সঙ্গিনীর সহিত দেখা যাইবে। শিল্পী শ্রীনিতাই পাল উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত স্থানের অনতিদূরে সারদা ভবনে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, মাতা সারদাদেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। উক্ত সারদা ভবনের দ্বিতলে ঐগুলি রাখা হইয়াছে। মাতা সারদা দেবীর ব্যবহৃত বালা, হার, বাটি, থালা, কাপড়, এবং তাঁহার অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাঠের যে আসনে উপবেশন করাইয়া মাতা সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজা করিয়াছিলেন সেই কাষ্ঠাসনখানাও উক্ত স্থানে রাখা হইয়াছে। যে বালা জোড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাতা সারদাদেবীকে উপহার দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের মৃত্যুর পর মাতা সারদাদেবী উহা অপসারিত করিতে চাহিলে উহা পরিত্যাগ না করিবার জন্য ঠাকুর স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন উহা প্রদর্শনীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত একটি পাগড়ী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত লেপটিও প্রদর্শনীতে জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা হইয়াছে। আমেরিকা ও ভারতের শিল্পীদের তৈয়ারী মাতা সারদাদেবী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। সারদা-ভবনের দ্বিতলে ভারতে ও ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা-কার্যালয়ের কার্যাদি সম্পর্কিত আলোকচিত্র, মানচিত্র ও অন্যান্য প্রচারপত্র রাখা হইয়াছে। এইস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি স্থাপন করা হইয়াছে।

সারদা-ভবনের নীচতলায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগ ও প্রসূতিসদনের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। নিবেদিতা স্কুলের কার্যকলাপও প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা যে প্রকারের শিক্ষা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই দেখান হইয়াছে। উহাতে শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ছোট ছোট বালক-বালিকাদের পূজা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ এবং সীতা, সাবিত্রী, গার্গী প্রমুখ মহিয়সী মহিলাদের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সারদা-ভবনের পশ্চিমে সংস্কৃতি-ভবনে অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, সুনয়না দেবী, যামিনী রায়, মণীন্দ্র গুপ্ত, রমেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কিত বহু চিত্র সজ্জিত করা হইয়াছে।

সংস্কৃতি-ভবনের দক্ষিণে শিক্ষাভবন অবস্থিত। এই স্থানে নানাপ্রকার শিল্পের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। এইস্থানে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের অঙ্কিত মাতা সারদাদেবীর বিভিন্ন সময়ের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই প্রতিমূর্তিগুলি মাতা সারদাদেবীর জীবনী অবলম্বনে তৈয়ার করা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার কুটিরশিল্পের মধ্যে চামড়ার কাজ, বেতের ও বাঁশের কাজ, সূচী-কর্ম প্রভৃতি নানা শিল্পের ষ্টল খোলা হইয়াছে। কাশ্মীরের কারুশিল্পও এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। শিল্প-ভবনের নিকটে রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ কর্তৃক একটি আদর্শ গ্রাম্যভবন দেখান হইয়াছে। ইহাতে গোবর হইতে জ্বালানী গ্যাস উৎপাদন দেখানো হইয়াছে।

গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর দেবদেউলবহুল প্রাচীন তীর্থনগরী ও ভাস্করশিল্পের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উৎসবের কার্যসূচী অনুযায়ী প্রথম দিন অপরাহ্ণে নূতন রাজধানীতে ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দ মহারাজজী প্রধান অতিথির ভাষণে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনীর বহু তথ্যবহুল ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ওড়িষ্যার জনসংযোগ-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীচিন্তামণি মিশ্র এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভাপতির অভিভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চৌধুরী এক আবেগময়ী ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী জীবনী আলোচনাপূর্বক বলেন—আজ দেশ স্বাধীন। এখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলেই আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইব। তিনি আরও বলেন— বর্তমান যুগ শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ।

দ্বিতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভোরে মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের একখানি বৃহৎ সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ প্রভাতফেরীদল রাজধানী ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করে। তৎপর পূজা হোম চণ্ডীপাঠ ভজন কীর্তন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৬০০০ ছাত্র ছাত্রী ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতঃপর স্কুলপ্রাঙ্গণে সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্যন্ত এক বিরাট ছাত্র-সম্মেলনে শিশুমেলা ও শিশুপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে নানাবিধ খেলাধুলা নৃত্য দাসকাঠিয়া ও পাসা প্রতিযোগিতা হয়, এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন বেলুড়মঠের স্বামী জপানন্দ মহারাজ।

উৎসব প্রাঙ্গণে প্রথমরাত্রে স্থানীয় কপিলেশ্বর কালিকা ক্লাব কর্তৃক 'সাবিত্রী ও সত্যবান' যাত্রা ও পরদিন পুরী শ্রীক্লাব কর্তৃক 'কুরুক্ষেত্র' নাটক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ওড়িয়া ভাষায় অভিনীত হয়। এইভাবে ভুবনেশ্বরে দুইদিনব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্যামলাতাল (আলমোড়া) বিবেকানন্দ আশ্রম জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করেন গত ২২শে অক্টোবর। বিশেষপূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক, রামনাম সঙ্কীর্তনাদি ব্যতীত একটি জনসভারও অনুষ্ঠান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ। পার্শ্ববর্তী ৪।৬টি পাহাড়ী গ্রামের বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। দরিদ্রগণের মধ্যে ১০১ টি নূতন শাড়ী বিতরিত হয়। সমবেত সকলকে মিঠাই ও হালুয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে বিগত ৪ঠা নভেম্বর হইতে ৭ই নভেম্বর দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিপুল সমারোহে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শিলচরে শুভাগমন করিয়া সভাগুলির পরিচালনা করেন। ৪ঠা নভেম্বর পূর্বাহ্ণে স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী বেদ ও উপনিষদ্ পাঠ করেন। অপরাহ্ণে বিদ্যার্থি-সম্মেলনে চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, শিলংকেন্দ্রের স্বামী চণ্ডিকানন্দ, শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না চন্দ, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্র বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্তা পুষ্পলতা দাসও একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে পূজনীয় মাধবানন্দজী একটি উপদেশমূলক ভাষণ দেন এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে তিনি ছাত্রগণকর্তৃক অঙ্কিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্যের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

৫ই নভেম্বর, শুক্রবার শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচার

পূজা, চণ্ডীপাঠ, কুমারীপূজার অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ এবং এক বিরাট মহিলা-সম্মেলনে হয়। পরে বালকগণকর্তৃক ব্রতচারী নৃত্য, ব্যায়ামকৌশল-প্রদর্শন এবং 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হয়।

৬ই নভেম্বর অপরাহ্নে বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক, পতাকা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক মহতী শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যায় একটি বিরাট জনসভায় স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস, কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনার শ্রীআর, ভি, সুব্রহ্মণ্যন্, অধ্যক্ষ শ্রীজে কে চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি পূজনীয় মাধবানন্দজী মহারাজের মনোজ্ঞ ভাষণ সকলকে অপূর্ব প্রেরণা দেয়। ৭ই নভেম্বর ভজন-কীর্তনসহ সমস্তদিন ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। প্রায় ১২ হাজার নরনারী ঐদিন বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিগত ২৭শে নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত জামসেদপুর শহরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শহরের বিভিন্নস্থানে সভা-সমিতি ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা, বেলুড়মঠ, রাঁচী এবং আরা হইতে আগত বিশিষ্ট বক্তাগণ হিন্দী, বাংলা, ও ইংরেজী ভাষায় অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে মায়ের জীবনালোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সর্বসাধারণের আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিলেন। উৎসবের অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা শ্রীশ্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিকৃতিসহ প্রায় এক মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা। ভজননিরত এবং স্কুলের বিশেষপোষাক-পরিহিত প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী-সঙ্ঘকে (স্থানীয় বিবেকানন্দ সোসাইটি-পরিচালিত) অতি সুশৃঙ্খলভাবে ভক্তিবিনম্রচিত্তে 'জয় সারদাদেবীকী জয়' উচ্চারণ করিতে করিতে পথ অতিক্রমকালে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উৎসবের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা—(১) কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সুহৃদক্লাব কর্তৃক দুই দিন উচ্চাঙ্গের কালীকীর্তন (২) সোসাইটিপ্রাঙ্গণে মহিলাসভা ও বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী মেয়েদের বিচিত্রানুষ্ঠান (৩) মেয়েদের হস্তশিল্পপ্রদর্শনী (৪) প্রধান উৎসবের দিনে (২৮শে নভেম্বর) প্রায় সাত হাজার ভক্ত নরনারী ও ছাত্রছাত্রীগণের পরিতোষসহকারে প্রসাদ-গ্রহণ (৫) সর্বশেষ দিনে প্রায় দুই হাজার দরিদ্র-নারায়ণসেবা।

'সারদা মঠ' প্রতিষ্ঠা—ভারতীয় নারীজাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদিতা ব্রতধারিণীগণের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে গত ১৩ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪) 'সারদামঠ' নামে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ঐদিন সকাল ৯টার সময় মঠের অনেক সন্ন্যাসী এবং ভক্ত নরনারীর উপ-স্থিতিতে ঠাকুরঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, জননী সারদাদেবী এবং আচার্য স্বামী বিবেকানন্দজীর পট স্থাপন করেন। সন্ন্যাসিগণ এবং অপরাপর পুরুষ দর্শকবৃন্দ ৯½ টায় চলিয়া আসেন। মহিলাগণ সারাদিন ভজন, পূজাপাঠ, হোমাদি উৎসবানুষ্ঠান-সমূহে যোগদানে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার মহিলা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই নব-প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী-মঠ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ½ মাইল উত্তরে 'সুরধুনী কানন' নামক উদ্যানবাটীতে অবস্থিত। এখন কয়েকবৎসর ইহা বেলুড় মঠের পরিচালনাধীন থাকিবে—পরে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতার 'The Master as I saw him' গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক—স্বামী মাধবানন্দ
পৃষ্ঠা—৪২০ ; মূল্য—৪৲ টাকা

(২) **রাজা মহারাজ**—স্বামী নরোত্তমানন্দ-প্রণীত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'মানসপুত্র' রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। পৃষ্ঠা—১২২ ; মূল্য—১৷৷০ আনা

বিবিধ সংবাদ

শৃঙ্গেরী মঠাধিপতির দেহত্যাগ—ভারতবর্ষের চারপ্রান্তে আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অন্যতম শৃঙ্গেরীর (মহীশূর রাজ্যে) মঠাধিপতি বহুজনশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী চন্দ্রশেখর ভারতী গত ১০ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে তুঙ্গানদীতে স্নানকালে দুর্ঘটনায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সুপ্রাচীন শৃঙ্গেরী মঠের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ গৌরবের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর বিদেহ আত্মা পরমপদে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

প্রশংসনীয় উদ্যম—সিন্দ্রি কারখানার সংলগ্ন শহরপুরা, রোরাবাঁধ, সিন্দ্রি ও সিলভার টাউনের প্রতিটি ঘরের দ্বারে দ্বারে সংগীতসহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (শহরপুরায় অবস্থিত) নগদ মোট ৬২০৲ টাকা, ১০০৲ টাকা মূল্যের চাউল, ডাল, আটা প্রভৃতি এবং ৯৮ খানি পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সংগৃহীত সাতশতকুড়ি টাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের নিকট পাঠানো হইয়াছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের এইরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং অকৃপণ বদান্যতা থাকিলে এই সেবাশ্রম ভবিষ্যতে মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ থাকিয়া বরাবর সংকার্যে ব্রতী থাকিতে পারিবে সেবকদের ইহাই বিশ্বাস।

দরিদ্রবান্ধবভাণ্ডারের সেবাকার্য—কলিকাতার ৫৬।২-বি বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত দরিদ্রবান্ধবভাণ্ডারের ত্রিংশৎ এবং একত্রিংশৎ বার্ষিকী (১৯৫২ ও ১৯৫৩) কার্যবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। এই জনসেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের চারটি প্রধান বিভাগ :—

(১) শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন (১০৫।২, দীনেন্দ্র স্ট্রীট, হালসিবাগান, কলিকাতা)

১২টি রোগি-শয্যা-যুক্ত এই বিভাগটিতে ১৯৫২ সালে (৬ই অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) ১৪টি এবং ১৯৫৩ সালে ৩৮জন যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

(২) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়

এই বিভাগে আলোচ্যবর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে অ্যালোপ্যাথি মতে ৫০,৭৮৪ ও ৫১,৩৪৩ এবং হোমিওপ্যাথি অনুসারে ৪৬,৫০৩ ও ৪৫,০৯১—মোট যথাক্রমে ৯৭,২৮৭ ও ৯৬৪৩৪ সংখ্যক রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা—২৯,১২৫ ও ২৮,১৬১

(৩) চেষ্ট ক্লিনিক—রবি, বুধ এবং শুক্রবার বেলা ১১টা হইতে ১½টা পর্যন্ত এই বিভাগে সাধারণভাবে হৃদ্‌রোগী এবং বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগীদের ব্যাধিনির্ণয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্যবর্ষদ্বয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ৯৪২২ (নূতন রোগী—১০৬২) এবং ১১,০২৯ (নূতন ও পুরাতন)

(৪) সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার—এই গ্রন্থাগারে (বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥০টা হইতে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে) নানাবিষয়ক পুস্তকাদি নামমাত্র (ছেলেমেয়েদের পক্ষে ৴০ আনা; প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য ।০ আনা) মাসিক চাঁদায় জনসাধারণকে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। একটি অবৈতনিক পাঠাগারও লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত আছে। ১৯৫৩ সালের শেষে পুস্তকসংখ্যা ছিল ৩৮১৫; সভ্যসংখ্যা ১০৪; গড়ে প্রত্যহ ২৫ খানি বই বাহিরে দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত কার্যগুলি ছাড়া দরিদ্র পরিবারে বস্ত্র ও দুগ্ধ বিতরণও প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন—শ্রীশ্রীসারদামাতার শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০ শে নভেম্বর, ৫৪) বাগবাজার পল্লীর স্বর্গত পশুপতি ও নন্দলাল বসুর ভবনে এক মহতী সভায় নেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী। ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। আচার্য মন্মথমোহন বসু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী বেলা দে, শ্রীমতী রাধা মিত্র এবং শ্রীমতী গৌরী সিংহ শ্রীশ্রী-মাতার পুণ্য জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীমাতার পাদপদ্মে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া সভানেত্রী মহোদয়া শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহু ঘটনা সুললিত ও ভাবগম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অপার দয়া, ক্ষমা ও সন্তানের প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা বলেন। শ্রীমতী কান্তি মিত্র ও শ্রীবিমানভূষণ পাল দুইখানি গান করেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের বালিকাগণ কর্তৃক আরতি ও বন্দনার পর সভার পরিসমাপ্তি হয়।

বাঁকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে গত ২১শে ও ২২শে কার্তিক শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামনামসংকীর্তন, সভা ও প্রসাদ বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুশান্তানন্দ এবং স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার মণিপুর গ্রামনিবাসী শ্রীপ্রভাকর মণ্ডল মহাশয় বহন করিয়াছিলেন।

গাজিপুর (হাওড়া) গ্রামে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১১ই অগ্রহায়ণ সকালে শ্রীশ্রীমার পূজা, সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু কর্তৃক জীবনী-আলোচনা এবং পরে কালীকীর্তন হয়। পরদিন পূজা, হোম, কালী-কীর্তন ব্যতীত অপরাহ্নে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন হইয়াছিল। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, অধ্যাপক শ্রীকিরীটিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ বসু এবং আরও কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। গাজিপুর ও গ্রামান্তরের বহু নর-নারী ও বালক-বালিকা যোগদান করিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক দিন শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও নামসঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

'গল্পভারতী'র উদ্যোগ—'গল্পভারতী' মাসিক পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ-লেখক ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—'বিশ্ব-মৈত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৬ পেজী ফর্মার ২৪ পৃষ্ঠার ভিতর সীমাবদ্ধ লেখাটি ৭ই পৌষের মধ্যে গল্পভারতীর ঠিকানায় (২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-৬) প্রেরিতব্য। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখক একটি সুবর্ণপদক উপহার পাইবেন এবং রচনা গল্পভারতীর আগামী বিবেকানন্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

